রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা

পরিবর্ধিত, পুনর্লিখিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ
রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা—কাব্য
ভাদ্র : ১৩৫৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা
শ্রাবণ : ১৩৬০

তৃতীয় সংস্করণ
পৌষ : ১৩৬৪

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস
১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা ৬

বাঁধাই :
নভার্ণ বাইণ্ডার্স
কলিকাতা ৭

সাহিত্যরসবেত্তা ও সূক্ষ্মবিশ্লেষণ-নিপুণ সাহিত্য-সমালোচক

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কিন্তু প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের নাম ছিল 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা'। দ্বিতীয় সংস্করণ অনেকটা পরিবর্ধিত ও স্থানে স্থানে পুনলিখিত হইয়া 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা' নামে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ বৎসরাধিক কাল হইল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'-রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকায় প্রকাশকের পুনঃ পুনঃ তাগিদ সত্ত্বেও এদিকে মনোযোগ দিতে পারি নাই।

এই তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থে উল্লিখিত উল্লেখযোগ্য শব্দ ও বিষয়সমূহের একটি বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচী-সংযোজন ছাড়া বিশেষ কোনো পরিবর্তন করা হয় নাই, তবে স্থানে স্থানে সামান্য কিছু কিছু পরিবর্ধন করা হইয়াছে।

এই বৃহদাকার এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যের গ্রন্থের প্রতি রবীন্দ্র-সাহিত্যামোদী পাঠকগণের বিশেষ আনুকূল্য আমার আনন্দ ও উৎসাহের হেতু হইয়াছে

১০ই পৌষ, ১৩৬৪

৩৩।৫।১সি, কাঁকুলিয়া রোড
কলিকাতা ১৯

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা

রবীন্দ্র-কাব্যের স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাংলায় এক পরমবিস্ময়কর ব্যাপার। বাংলাভাষার পক্ষে, াংলা-সাহিত্যের পক্ষে, বাঙালী জাতির পক্ষে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ঘটনা আর খনো ঘটে নাই। শুধু বাংলা কেন, পৃথিবীর ভাব, অনুভূতি ও রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে বীন্দ্রনাথের দান তাহার অনুপম বৈশিষ্ট্য লইয়া একদিক উজ্জ্বল করিয়া আছে। তাঁহার হিত্য-সৃষ্টি দেশ, কাল ও পাত্রের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক সার্বজনীন প ধারণ করিয়াছে ও বিশ্ব-সাহিত্য-সভায় অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া আছে। ষাট বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের লেখনী কাব্য, সংগীত, নাটক, , গল্প, প্রবন্ধ, কথিকা, ধর্মতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি অজস্রধারায় বর্ষণ করিয়াছে। র অপূর্ব কারুকার্যে, ভাবের বিচিত্র লীলায়, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, শ্রেষ্ঠ শিল্পি- চিত রসসৃষ্টিতে, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের অপরূপ বিলাসে, নিগূঢ় অধ্যাত্ম-অনুভূতির মনোহর কাব্যরূপায়ণে, সেগুলি বাংলা-সাহিত্যের পাঠককে বিস্মিত ও মুগ্ধ াছে। তাঁহার সাহিত্যিক-জীবনের অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অস্তাচলের দেশ পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘপথের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখা যায়,— ধারে ধারে ফুটিয়া আছে ষড়্ঋতুর লীলা-পুষ্প, মোড়ে মোড়ে বিহ্বল করিতেছে স্বষ্টির ঐশ্বর্য ও মাধুর্য, পদে পদে উদ্ভাসিত হইতেছে নব নব সৌন্দর্যের চিত্র, াসে বাজিতেছে কোন্ অজানা সুন্দরের বাঁশী, দিগন্তে কোন্ স্বপ্নালোকের মায়া, বর্ণ, গন্ধ ও গানের বিচিত্র মেলায় এই দীর্ঘপথ পরমরমণীয় উৎসব-বেশ ধারণ া আছে। সমস্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য যেন একটা বিরাট প্রদর্শনী-সৌধরূপে স্থাপত্য- চরম উৎকর্ষ বহন করিয়া সগর্বে দাঁড়াইয়া আছে; ইহার কক্ষে কক্ষে বিরাজ নব নব শিল্প-সম্ভার; অপূর্ব তাহাদের রূপ, বর্ণ ও সুষমা,—ভাব, চিন্তা, , কল্পনা, রহস্য, ভাষা, ছন্দ, অলংকার ও সংগীতের বিচিত্র দীপ্তি ও সমারোহে -সৌধ স্বর্গপুরীর কোনো দুর্লভ শিল্পীর রূপায়িত ধ্যান বলিয়া মনে

বিরাট, বিস্ময়কর, ইন্দ্রজালময় রবীন্দ্রসাহিত্যসৌধ, ইহার প্রবেশমুখে যে রুকার্যশোভিত, সুসজ্জিত, নানাবর্ণের আলোকদীপ্ত, সুবৃহৎ কক্ষটি আমাদের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সেটি কাব্য। সেই কক্ষে আমাদের

রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা

রবীন্দ্র-কাব্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগের কাব্যধারার গতি, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাকাব্যে এক বিপুল শক্তিশালী, যুগান্তকারী প্রতিভা আবির্ভাব হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন পুরাতন কাব্যযুগ ধ্বংস করিয়া ক অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব, অত্যাশ্চর্য নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছেন, কাব্যের গতানুগতিক সংস্কার ও রীতি চূর্ণ করিয়া নূতন ভাব, নূতন আদর্শ, নূতন ভাষা ও ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন— সংকীর্ণ, জীর্ণ, বদ্ধঘরের মধ্যে বাহিরের আকাশের মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। এই বিদ্রোহী কবির প্রতিভা কেবল ধ্বংসের দিকেই যায় নাই, নূতন সৃষ্টিতে অপূর্ব-সুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই কবি-নটরাজের এক পাদক্ষেপে ধ্বংস হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্য পাদক্ষেপে অনবদ্য সৃষ্টি-সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই নবসৃষ্টি, এই মুক্তির অবতারণা সম্ভব হইয়াছে ইউরোপীয় কা প্রভাবকে বরণ করিয়া লওয়ায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙা মনোজগতে একটা পরিবর্তন আসিয়াছিল, বাঙালী কাব্যের নূতন ভাবাদর্শের স পরিচিত হইয়াছিল, বাঙালীর চিত্তে এক নূতন রসস্পৃহা জাগিয়াছিল। মধুসূদ কাব্যে এই নবলব্ধ ভাবাদর্শের একটা রূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং তাঁহার ক এই নবজাগ্রত রসস্পৃহা অনেকাংশে চরিতার্থ করিয়াছে। এই পাশ্চাত্য প্রভ একটা অনুকরণে পর্যবাসত হয় নাই, স্ব-করণে সার্থক হইয়াছে। হোমার, ভার্জি দান্তে, ট্যাসো, ওভিদ, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় করিলেও মধুসূদন তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয় বাঙালীর ভাবাদর্শের সহিত পাশ্চাত্য প্রভাবের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ করি নূতন কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের ক অবলম্বন করিয়া তাহাকে নূতন ভাবাদর্শে, নূতন ভঙ্গীতে, নূতন সৃষ্টিতে রূ করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যসৃষ্টি একটি স্বতন্ত্র রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধু হাতে বাংলাকাব্য তাহার শীর্ণ, বৈচিত্র্যহীন রূপ ত্যাগ করিয়া প্রবল শক্তি ও বিচিত্রসৌন্দর্যভূষিত রূপ ধারণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতের সীমাহীন সম্ভাবনীয়ত উৎসরূপে অনাগত কাব্যপথযাত্রীকে লুব্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছে।

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার মেঘনাদবধকাব্য। এই কাব্যের বিষ সমাবেশে, ভাবাদর্শের উপস্থাপনে ও ছন্দঃপ্রয়োগে পাশ্চাত্য প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষি

বাল্মিকী-কল্পিত ধর্মবলে বলীয়ান, দেবোপম রামকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব বিজয়ী, অমিতবীর্যশালী, আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল, পুরুষকারের জ্বলন্ত মূর্তি

তিনি তাঁহার কাব্যের নায়ক করিয়াছেন। বীরত্বে ও মানবতায় তিনি লক্ষ্মণ অপেক্ষা ইন্দ্রজিৎকে বড়ো করিয়াছেন। ইহা প্রাচীন গ্রীক-কাব্যের জাগতিক শক্তি ও ঐশ্বর্যের পূজা। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী রাবণ নিয়তির হাতের খেলনা-মাত্র—ইহাও প্রাচীন গ্রীক-নাটকের দেব-ইচ্ছাপ্রসূত অদৃষ্টবাদ। কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গে, কাব্যলক্ষ্মীর আবাহন হইতে আরম্ভ করিয়া নানা দেবদেবীর কার্যাবলী ও স্বর্গ-নরক-সঞ্চারী কল্পনার লীলার মধ্যে বিদেশী কবিদের ছায়ামূর্তি আমাদের লক্ষ্যগোচর হইতেছে। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃসম্পদ মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, সেই অপূর্ব ছন্দঃ-সংগীতের মধ্যেও মিল্টনের কণ্ঠস্বরের আভাষ পাইতেছি। কিন্তু সেই অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও অগণিত বীরের রণহুংকার, সেই জল-স্থল-অন্তরীক্ষ-সঞ্চারী কল্পনার লীলার মধ্যেও বাঙালী-হৃদয়ের স্নেহ-প্রেম-সমবেদনার অপূর্ব রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে। তাই পাশ্চাত্য বীরপূজার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'বীররসে মাতি মহাগীত গাহিতে' গিয়াও প্রকৃতপক্ষে তিনি করুণরসের মহাগীত গাহিয়াছেন। মেঘনাদবধ বীররসাত্মক কাব্য না হইয়া করুণরসাত্মক কাব্য হইয়াছে। ত্রিলোক-বিজয়ী দশাননের অন্তরের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হারাইবার যে বেদনা, পুত্রশোকের যে মর্মান্তিক ব্যথা, নিঃসঙ্গতার যে সর্বহারা নৈরাশ্য, তাহাই সমস্ত রণসজ্জার আড়ম্বর ও কোলাহলকে ছাপাইয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই কাব্যের মধ্যে বাজিয়া উঠিয়াছে। শক্তিশেলমূর্ছিত লক্ষ্মণের শিয়রে দাঁড়াইয়া রামের বিলাপ রামকে যেন আমাদের অন্তরের অতি নিকটে লইয়া আসিয়াছে, মুহুর্মুহু মেঘগর্জনের মধ্যে অশোকবনে বন্দিনী নারীর সুকোমল হৃদয়ের বেদনাময় কলকূজন অনির্বচনীয় মাধুর্যে আমাদিগকে আপ্লুত করিতেছে। পাশ্চাত্য আদর্শের মহাকাব্যের মধ্যে বাঙালীহৃদয়রঞ্জনকারী ভাবকল্পনার অভাব নাই। সেই অংশগুলি উৎকৃষ্ট লিরিকে পরিণত হইয়া আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে। মধুসূদন এইভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবের সহিত জাতীয় প্রভাবের সমন্বয় করিয়াছেন।

মধুসূদনের কাব্যসংস্কার ও ভাবধারার উত্তরসাধকরূপে আবির্ভূত হইলেন হেমচন্দ্র। মেঘনাদবধের পর হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের সৃষ্টি হইল। বৃত্রসংহারের উপর মেঘনাদবধের প্রভাব সুস্পষ্ট। মেঘনাদের সহিত রুদ্রপীড়ের, রাবণের সহিত বৃত্রের, প্রমীলার সাহত ইন্দুবালার, রামের সহিত ইন্দ্রের, সীতার সহিত শচীর, সরমার সহিত চপলার বেশ একটা সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিন্তু ভাবাদর্শের দিক হইতে গুরুর সহিত শিষ্যের মিল নাই। হেমচন্দ্র হিন্দু সংস্কার

ও বিশ্বাসকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। মধুসূদন বলদীপ্ত রাক্ষসকে বড়ো করিবার জন্য রামায়ণের আখ্যায়িকাকে নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী পরিবর্তিত করিয়াছিলেন,—Rama and his rabble-কে ঘৃণা করিয়া grand fellow রাবণের উদ্দেশেই তাঁহার কল্পনা ও আবেগের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। বিষয়বস্তু-নির্মাণে হেমচন্দ্র পুরাণের মৌলিক আখ্যায়িকার কোনো পরিবর্তন করেন নাই। দেশীয় নৈতিক ও পৌরাণিক আদর্শকেই তিনি গ্রহণ করিয়া বৃত্রসংহারের কাব্যদেহ নির্মাণ করিয়াছেন। মধুসূদন গ্রীক-আদর্শে দেব-ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত অদৃষ্টবাদকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হেমচন্দ্রের অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ হিন্দুর কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মের দ্বারাই সকলের ভাগ্য গঠিত হয়। দেবতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির উপর ভাগ্য নির্ভর করে না। বৃত্র নিজের কার্যের দ্বারা, তপোবলে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছে। স্বর্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রেরও অধিকতর তপস্যা করিতে হইয়াছে। শেষে মহানুভব মুনির আত্মত্যাগের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই হিন্দু আদর্শ ও নৈতিক ধর্ম তাঁহার কাব্যের মেরুদণ্ড হইলেও, বীরত্ব, গাম্ভীর্য ও অলৌকিক মহিমার বর্ণনায় এবং অন্তরীক্ষবিহারী কল্পনার প্রসারে মধুসূদনের সমকক্ষ হইলেও, শিল্পীর যে যাদুমন্ত্রের প্রভাবে সৃষ্টি সার্থক হয়, সেই মন্ত্রশক্তি তাঁহার ছিল না। ভাব ও কল্পনাকে রসমূর্তি দান করিতে হইলে যে অপূর্ব বাণীদেহ-নির্মাণ প্রয়োজন, সেই বাণীদেহ-নির্মাণের কলাকৌশল তাঁহার জানা ছিল না। উহাই শিল্পীর যাদুমন্ত্র। এই বৃহৎ মহাকাব্যের অনেক অংশেই ভাষা নীরস, গদ্যঘেঁষা, অলংকারহীন, বৈচিত্র্যহীন। ছন্দের যে গুরুগুরু মৃদঙ্গধ্বনির অপূর্ব সঙ্গীতময় প্রবাহ মধুসূদনের কাব্যকে একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের সেই শক্তিতত্ত্বে ছিলেন অনভিজ্ঞ। তাই তাঁহার হাতে অমিত্রাক্ষর হইয়াছে মিলনহীন পয়ার। তারপর পূর্বতন পয়ার-লাচাড়ীর সংস্কারকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া স্থানে স্থানে ছন্দোবৈচিত্র্যের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে মহাকাব্যখানি হইয়াছে আরো আকর্ষণহীন।

হেমচন্দ্রের ভাবাদর্শ ও শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়াই বাংলা-সাহিত্যে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। কাব্যের উপাখ্যানভাগ তিনি হিন্দু পুরাণ ও জাতীয় ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, অসাধারণ ও অতিমানবিক কীর্তিকলাপই তাঁহার কাব্যের বিষয়-বস্তু হইয়াছে। তাই মহাকাব্য হইয়াছে তাঁহার কবি-কৃতি। তাঁহার মহাকাব্যে তিনি মহামানবের জয়গান করিয়া গিয়াছেন। বিরাট আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য ও মহিমাকে তিনি কাব্যরূপ দান করিয়াছেন 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস'-এ; বুদ্ধদেবের জীবনের জয়গান করিয়াছেন 'অমিতাভ'-এ ; 'অমৃতাভ'-এ ও 'খৃষ্ট'-এ প্রেম ও

কারুণ্যের মূর্তিমান প্রকাশ শ্রীচৈতন্যদেব ও যীশুখৃষ্টের মহিমময় জীবনকথা রূপায়িত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে যে মানবতাবাদ প্রচারিত হইয়াছে, সেই মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া নবীনচন্দ্র পৌরাণিক চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মানবতার পূর্ণ আদর্শ দেখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের দেবতা নহেন, তিনি আদর্শ মানব—সমগ্র মানবজাতির মহান্ প্রতিনিধি। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম, শৌর্যবীর্য, স্নেহ-প্রেম-দয়া-প্রীতি, মানুষের সর্বপ্রকার দুর্বলতা-সবলতার সুন্দর সামঞ্জস্য ও পরিণতি সাধিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে, তাই তিনি পরিপূর্ণ মানব। তিনি ভগবানের অবতার নন, তিনি মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ ও চরম আদর্শ। বুদ্ধদেব ও খৃষ্টকেও তিনি দেবত্বে উন্নীত করেন নাই—তাঁহারা মানবের দুঃখ-বেদনার মধ্যে, শোক-তাপের মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তি ও সান্ত্বনার প্রতীকভাবে কল্পিত হইয়াছেন।

আর একটি বিশেষ ভাব বা আদর্শ নবীনচন্দ্রের কবি-মানসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সেই ভাব বা আদর্শ তিনি শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহাভারতের যুগে জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ধর্মে ধর্মে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে একটা বিভেদ ও বিবাদ বর্তমান ছিল। সেই জাতিগত, রাষ্ট্রগত, সম্প্রদায়গত, ধর্মগত সমস্ত বিভেদ দূর করিয়া, সমগ্র জাতিকে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধিয়া, এক ধর্ম, এক রাষ্ট্র, এক জাতি করিয়া মহাভারতে মহাজাতি সৃষ্টি করাই ছিল মানবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন ও সাধনা। এই ভাবে নবীনচন্দ্র মহাভারতের উনবিংশ শতাব্দীর যুগোপযোগী একটা নূতন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু বিষয়বস্তুর বিরাট ব্যাপ্তি ও সমুন্নত মহিমা থাকিলেও শিল্পকলাজ্ঞানের অভাবে তাঁহার কাব্যসৃষ্টি সার্থক হয় নাই। নবীনচন্দ্র যতখানি কবি, ততখানি আর্টিস্ট নন। মাত্রাজ্ঞান, ঔচিত্যবোধ, প্রকাশের পূর্বাপর একটা সামঞ্জস্য-চেতনা তাঁহার একেবারেই ছিল না। কেবল একটা অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাসের চুল্লীতে ক্রমাগত হাপর টানিয়া গিয়াছেন—ভাষা, ছন্দ ও অভিব্যক্ত রূপের দিকে কোনো দৃষ্টি দেন নাই। তারপর একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠার আগ্রহও তাঁহার কাব্যের শিল্পকলা ও রসসৃষ্টিকে অনেকখানি ব্যাহত করিয়াছে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মধ্য দিয়া বাংলাকাব্যে যে যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আমরা বীরযুগ বা মহাকাব্যের যুগ বলিতে পারি। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পুরাণ ও ইতিহাসের অ-সাধারণ ব্যক্তির কীর্তিকলাপ-বর্ণনা, দেশানুরাগের উদ্দীপনা, মানবতার পূজা ও কাব্যকলার বস্তু-আশ্রয়ী বহির্মুখ প্রকাশ।

তারপর এই মহাকাব্যের কবি-সমুজ্জ্বল, অতিমানবিক কর্মকোলাহলমুখর বাংলার কাব্যগগনের এককোণে এক নূতন কবি-তারকার আবির্ভাব হইল। ইনি বিহারীলাল। এই দূরবর্তী, নিঃসঙ্গ তারার সহিত অন্য কোনো জ্যোতিষ্কের মিল ছিল না। এ ছিল নিজের দূরত্ব ও রহস্যময়তার আবরণে সর্বদা আবৃত। এই কবি বাংলাকাব্যে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনিলেন—এক নূতন ধারার পথনির্দেশ করিলেন। এতদিন কাব্যের ধারা চলিতেছিল বহির্বিশ্বকে অবলম্বন করিয়া, জীবনের বহিরঙ্গকে আশ্রয় করিয়া, এখন বিহারীলাল এক নূতন আত্মকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখী, ভাবতন্ময় ধারার প্রবর্তন করিলেন। জগৎ ও জীবনের নানা রূপ ও রস সাক্ষাৎভাবে মধু-হেম-নবীনকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে, তাঁহারা প্রকৃতি ও মানবের বহিরঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই কবি-কর্মে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু বিহারীলাল তাঁহার কবি-মানসকে বহির্জগতে প্রসারিত করিয়া দিয়া তাঁহার মনোজগতের আলোকেই বহির্জগৎকে দেখিয়াছেন। আত্মমনের ভাবসাধনাই বিহারীলালের কবি-কর্ম। এই আত্মসমাহিত ভাবমগ্নতা, কবি-হৃদয়ের এক বিস্ময়ঘন রহস্যময় বিশ্বানুভূতি বাংলা গীতিকাব্যে এক নূতন যুগ সৃষ্টি করিয়াছে। বিহারীলালই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে রোমান্টিক গীতিকাব্যের ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ। এই ধারা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহু বিশালতা ও ব্যাপকতা লাভ করিয়া বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গময় মহানদীতে পরিণত হইয়াছে এবং রবীন্দ্রোত্তর কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ইহার বেগবান প্রবাহ অব্যাহত আছে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের নিকট হইতেই তাঁহার কাব্যসাধনার মূলমন্ত্রটি গ্রহণ করেন। শক্তিশালী সাধক যেমন গুরুদত্ত, স্বল্পাক্ষর, অচেতন বীজমন্ত্রকে একাগ্র সাধনায় জাগ্রত করে, সাধনার স্তরে স্তরে বহু রহস্য, বহু অপূর্ব অনুভূতি, বহু বিস্ময়কর চেতনা লাভ করে, তারপর সেই মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া অত্যাশ্চর্য বিভূতিলাভে জগৎকে স্তম্ভিত করে, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বিহারীলালের মন্ত্রটি গ্রহণ করিয়া—আত্মকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গীতে দীক্ষিত হইয়া, আপন তপস্যা দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, বহু-বিচিত্র রহস্যানুভূতিলাভে অত্যাশ্চর্য বিভূতির ইন্দ্রজালমণ্ডিত কাব্যসৃষ্টি করিয়া জগৎকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছেন।

বিহারীলাল অনুভব করিয়াছেন, বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছে এক সৌন্দর্যময়ী প্রেমময়ী। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া এই অসীম রহস্যময়ীর লীলা চলিয়াছে। জগৎ ও জীবনের মধ্যে এই মায়াময়ী, রহস্যময়ীর বহুবিচিত্র লীলা। এই বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যময়ী ও প্রেমময়ী, এই 'বিশ্বমোহিনী মায়া' কবির 'হৃদয়-প্রতিমা', তাঁহার হৃদয়-বিহারিণী অভিনন্দিতা 'সারদা'—তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী। সেই মায়াময়ী, রহস্যময়ী বিশ্বের রূপে, রসে

সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, আবার সৌন্দর্য, প্রেম ও জ্ঞানরূপে কবির অন্তর ব্যাপ্ত করিয়া অধিষ্ঠিতা আছেন। এই 'সারদা'ই 'সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী মানস-সরস-বিকচনলিনী'—তাঁহার 'আনন্দরূপিণী মানস-মরালী'। বিহারীলাল এই 'মানস-মরালী'র রহস্যলীলা সন্দর্শনে বিস্ময়বিমূঢ়, তন্ময়। এই সৌন্দর্যময়ী ও প্রেমময়ী সারদা বাণীমূর্তিতে যুগে যুগে কবির নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। কবির কাব্যে চিরকাল সৌন্দর্য-মাধুর্য ও প্রেমের প্রকাশ। কেবল বিশ্বের সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যেই এই সারদার প্রকাশ নয়, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভীষণতার মধ্যেও তাঁহার প্রকাশ। তাই সারদার ভৈরবী মূর্তি,—'কভু বরাভয় করে', 'কখন গেরুয়াপরা, ভীষণ ত্রিশূল ধরা', পদভরে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর'; কখনো বা 'দীপ্ত সূর্য হুতাশন, ধ্বক্ ধ্বক্ ত্রি-নয়ন, হুঙ্কারে বিদরে ব্যোম লুকায় মিহির', কখনো 'আলুথালু কেশে, শ্মশানের প্রান্তদেশে, জ্যোৎস্নায় আছেন বসি বিষণ্ণ বদনে'। তিনি কেবল কবির ধ্যানের ধন নন, তিনি আদ্যা-শক্তিরূপা—সৃষ্টির মূলশক্তি; তিনি 'যোগেশ্বরী'—শিবের গৃহিণী। তিনি 'যোগানন্দময়ী-তনু যোগীন্দ্রের ধ্যান-ধন', 'ভোলামহেশ্বরপ্রাণ'।

বিহারীলালের এই রোমাণ্টিক-মিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা-সাহিত্যে একেবারে নূতন। সৌন্দর্যের একটা বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা আপন মনে অনুভব করিয়া জগতের বস্তুপুঞ্জের উপর সেই সৌন্দর্য আরোপ করিয়া তিনি একটা অপূর্বসুন্দর মনোজগৎ রচনা করিয়াছিলেন। আপন মনের মাধুরী বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া বাহিরের জগৎকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন—বাস্তব জগৎ তাঁহার মনোজগতে পরিণত হইয়াছিল। এই মনোজগতে, এই ভাবজগতে তিনি অফুরন্ত রসবস্তুর সন্ধান দিয়াছিলেন—বিপুল সম্ভাবনীয়তার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা কাব্যে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছে। এই আত্মভাব-সাধনার ভঙ্গী পরবর্তী বাংলা কাব্যকে এক নূতন ভাবকল্পনার লীলায় লীলায়িত করিয়াছে। মধু-হেম-নবীনের কেবল গুরুগম্ভীর ও ললিত-মধুর শব্দ যোজনার দ্বারা বস্তুর বহির্মুখ বর্ণনা ও কতকগুলি অতি-সাধারণ ও সুলভ ভাবের উদ্দীপনা-সৃষ্টির যুগ শেষ হইল—আত্মাভিব্যক্তির গভীর আনন্দ, অন্তর্গূঢ় রসানুভূতি ও অলৌকিক প্রেম ও সৌন্দর্যধ্যানের যুগ আরম্ভ হইল।

অবশ্য কবি হিসাবে বিহারীলাল বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই তিনি ছিলেন তাঁহার মনোগত ভাবের আনন্দে বিভোর, সেই ভাবসাধনায় তন্ময়;—তাঁহার গভীর আনন্দকে উপযুক্ত কাব্যরূপদানে অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত করিতে পারেন নাই—ভাবের উপযুক্ত বাণীমূর্তি রচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষা

কোনো অলংকার-পারিপাট্য নাই, শিল্পিজনোচিত সংযম-শৃঙ্খলা নাই,—অনেক সময় তাহা অসংবদ্ধ ও বালকোচিত। তাই তাঁহার কবিতা সাধারণ পাঠকের মনোহরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার কবিতার বাহ্যিক রূপের অন্তরালে গূঢ় রসের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন বিহারীলালের কবিতা এক ভাবতন্ময় সাধকের অনবহিত ও স্বতঃস্ফূর্ত বাণী। নিরাভরণা বাণীর অন্তরালে আছে নূতন সৃষ্টির অপূর্ব সম্ভাবনা, নব নব ভাব-কল্পনার প্রেরণা, অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থকতা। বিহারীলাল নিজে বড় কবি না হইলেও তিনি কবির কবি—বাংলা কাব্যে নূতন ধারার প্রবর্তক।

পাশ্চাত্যপ্রভাবে বাংলা-সাহিত্যে মহাকাব্যের জন্ম হইয়াছে আমরা দেখিয়াছি, এই পাশ্চাত্যপ্রভাবে কি এই নূতন গীতিকাব্যেরও জন্ম হইয়াছে? এ বিষয়ে একটা প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী-সাহিত্যে এই জাতীয় রোমাণ্টিক গীতিকাব্যের একটা স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইংরেজী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি শেলীও এইরূপ বিশ্বের পশ্চাতে সৌন্দর্য ও প্রেমের একটা অদৃশ্যশক্তি অনুভব করিয়াছেন। এই চঞ্চল, বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে চিরকালের মত পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার জীবন দুঃখগ্লানিতে ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে পাইবার জন্য কবি ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন এবং অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বেদনায় একটা চাপা কান্নার সুর তাঁহার কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে। বিহারীলালও সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে মূর্তিমতীরূপে পাইবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। যোগী তাঁহাকে ধ্যানে লাভ করে, তপস্বী তাঁহাকে তপস্যার দ্বারা লাভ করে, কিন্তু কবির সে ধ্যান ও সাধনা নাই। তাই তাঁহার অপ্রাপ্তির বেদনা—অতৃপ্তির সুর। কিন্তু কবির মানসী সারদার পরিকল্পনা আগাগোড়া লক্ষ্য করিলে মনে হয়, শেলীর কাব্যের প্রভাব তাঁহার কবি-মনে বিশেষ ক্রিয়াশীল নহে। হিন্দুতন্ত্রে বিশ্বসৃষ্টির মূলে এক আদ্যাশক্তির কল্পনা করা হইয়াছে, সে শক্তি 'কালিকা', 'চণ্ডী' প্রভৃতি নামে অভিহিত। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'তে এই দেবীকে সর্বভূতে বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষান্তি, শান্তি, কান্তি, লক্ষ্মী, দয়া, তুষ্টি প্রভৃতি রূপে সংস্থিতা বলিয়া বারবার নমস্কার করা হইয়াছে। বিহারীলাল সেই তন্ত্রোক্ত দেবীর বুদ্ধি ও কান্তি মূর্তিকেই 'সারদা'তে রূপান্তরিত করিয়া বিশ্বব্যাপিনী করিয়া পূজা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই শক্তি শিব-সীমন্তিনী,—তাই সারদাকে কবি বলিয়াছেন 'যোগেশ্বরী', 'যোগীন্দ্রের ধ্যান-ধন', 'ভোলামহেশ্বরপ্রাণ'। তারপর 'সারদামঙ্গল' এই নামের সহিত 'চণ্ডীমঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল' প্রভৃতির সাদৃশ্য আছে; মঙ্গলকাব্যে যেমন এই দেবীদিগের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে, কবিও তাঁহার

সারদামঙ্গলে সৃষ্টির মূলশক্তি সারদার বন্দনা-গান গাহিয়াছেন। বিশ্ববিলাসিনী সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী তাঁহার অসীম রহস্যময়ী মূর্তি ক্রমে ত্যাগ করিয়া সৃষ্টির মূলশক্তিরূপে কবির হৃদয়বেদীতে বসিয়া ভক্তি ও বিশ্বাসের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন। কবির রোমান্টিক দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত মিস্টিকে পরিণত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস-গঠনে বিহারীলালের কাব্য অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব সর্বজনবিদিত। কবি একাধিকবার সে কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রথম স্তরে—তাঁহার কবি-মানস সমস্ত বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিবার প্রথম অবস্থায় বিহারীলালের নিকট হইতে যে প্রভাব পাইয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে এই বিষয়গুলি দেখা যায়, –

(১) রোমান্টিক গীতিকবির অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী

(২) সৌন্দর্য ও প্রেমের আদিরূপের কল্পনা

(৩) প্রকৃতির প্রতি প্রবল আকর্ষণ

অবশ্য কবির দীর্ঘ-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা, গৃহপরিবেশ, ব্যক্তি-মনের প্রবণতা, লব্ধ অভিজ্ঞতা, ভারতীয় সাহিত্য ও ধর্ম-সংস্কৃতির ভাব-কল্পনা, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-কল্পনা, পৃথিবীর নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তা প্রভৃতির প্রবল প্রভাব এই ক্ষীণ স্রোতোধারার সহিত মিশিয়া ইহাদিগকে অতি বৃহৎ, সর্বাঙ্গসুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রবাহে পরিণত করিয়াছে, কিন্তু এসব বিষয়ের ইঙ্গিত বা আদি প্রেরণা তিনি বিহারীলালের কাব্যের মধ্য দিয়াই লাভ করেন।

বিহারীলালের প্রভাব ছাড়াও প্রথম-যৌবনে লব্ধ ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কাব্য-প্রেরণা এবং নিজের সহজাত সংগীতপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথের এই অন্তর্মুখী ভাবদৃষ্টি গঠনে সহায়তা করিয়াছে। সাহিত্যিক-জীবনারম্ভের সময় কবি পূর্ব-সংস্কারের বশবর্তী হইয়া মহাকাব্য-যুগের দীর্ঘ-আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আখ্যায়িকাও কোনো পুরাণ, ইতিহাস বা কিংবদন্তীর উপর স্থাপিত নয়, কবির মনঃকল্পিত এক অদ্ভুত রোমান্টিক কথাবস্তু। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব আখ্যায়িকার নায়ক একজন কবি। তারপর রচনার বেলাতেও তিনি একেবারে বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশপদ্ধতিকে অবলম্বন করিতে পারেন নাই, নানাভাবের বিচিত্র উচ্ছ্বাসে তাঁহার কাব্যের কলেবর পূর্ণ হইয়াছে। শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ প্রকার কাব্য-রচনার পথ তাঁহার নয়,—এ কেবল অনুকরণ-চর্চা হইতেছিল—পূর্বের কবিগণের দীর্ঘ আখ্যায়িকা ও বিহারীলালের ভাষা ও ছন্দের অনুকরণ। তারপর সন্ধ্যা-সংগীতের যুগ হইতেই কবি তাঁহার নিজস্ব পথটি

খুঁজিয়া পাইলেন এবং তাহার পর হইতে দীর্ঘ কবি-জীবনে নানাভাবে এই একান্ত অন্তর্মুখী কবিচিত্তের ভাবানুভূতি গীতিকাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

রোমান্টিক কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা নিকটের বাস্তব, চিরপরিচিত আবেষ্টনী, প্রতিদিনের জীবনের সুখদুঃখ, স্নেহপ্রেমপ্রীতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাদের মধ্যে একটা সুদূরের ব্যঞ্জনা, অসীমের স্পর্শ, নিত্যত্বের আভাস কামনা করে—একটা বৃহতের পটভূমিকায় তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চায়। একটা অলৌকিক সৌন্দর্য-পিপাসা ও রসপিপাসার তৃপ্তির জন্য রোমান্টিক গীতিকবি বাস্তব জগৎ হইতে কল্পনার জগতে, নিকট হইতে দূরে, জানা হইতে অজানার দিকে, চেনা হইতে অচেনার দিকে, বহির্জগৎ হইতে মনোজগতের দিকে ধাবিত হয়। সৌন্দর্য ও প্রেম সম্বন্ধে তাহাদের মনে থাকে একটা পরিপূর্ণতার আদর্শ, সেই আদর্শকে তাহারা জগৎ ও জীবনে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহারই ভূমিকায় জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও প্রেমকে কামনা করে। সৌন্দর্য ও প্রেমের বস্তুনিরপেক্ষ একটা ভাবময় আদর্শের দ্বারা তাহারা তাহাদের নিঃসীম সৌন্দর্য-প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। জগৎ ও জীবনের বাস্তব সৌন্দর্য ও প্রেমে রোমান্টিক গীতিকবিরা তৃপ্ত নয় বলিয়াই তাহাদের কাব্যে একটা হতাশা, অতৃপ্তি ও ব্যাকুলতার সুর ধ্বনিত হয়।

সৌন্দর্য ও প্রেমের একটা ভাবময়, মূল আদর্শের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ কেবল বিহারীলালের কাব্য হইতেই গ্রহণ করেন নাই, ইংরেজ রোমান্টিক গীতিকবিদের প্রভাবও পড়িয়াছিল বিশেষভাবে তাঁহার উপর। 'মানসী' হইতেই প্রেমের একটা অনন্ত সত্তা কবি অনুভব করিয়াছেন এবং মানবীর মধ্যে সেই চিরন্তন, আদর্শ প্রেমের সন্ধান না পাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন। প্রেম দেহকামনার ঊর্ধ্বে এক অসীম ভাবময়, আনন্দময় অনুপ্রেরণাতে পর্যবসিত হইয়াছে। সৌন্দর্যের আদি রূপের কল্পনাকে পূর্ণ ও পরিস্ফুটরূপে দেখি 'সোনার তরী'র 'মানস-সুন্দরী' কবিতায়। সেই বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীই কবির মানসসুন্দরী। সেই বিদেশিনী রহস্যময়ীই তাঁহাকে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় সোনার তরীতে উঠাইয়া কোন্ সিন্ধুপারের ঘাটের উদ্দেশে চলিয়াছে। 'চিত্রা'য় সেই 'বিচিত্ররূপিণী' কবির 'অন্তরব্যাপিনী' হইয়াছে। তারপরেই রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের উপর উপনিষদের প্রভাব বেশী মাত্রায় পড়ায় এই চঞ্চল, রহস্যময় অনুভূতি অতি বৃহৎ, সর্বব্যাপী ও গূঢ় তাৎপর্যময় হইয়াছে। সৃষ্টির মধ্যে অসীম আনন্দময়, রসময়ের প্রকাশ, তাই জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমে তাঁহারই অনন্ত সত্তার উপলব্ধি। এই মূল কেন্দ্রীয় অনুভূতিতে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের চাবিকাঠিটি তাঁহার হাতে আসিয়া গিয়াছে। এই অনির্দেশ্য, চঞ্চল, রহস্যময়, রোমান্টিক অনুভূতি স্থির, পরিপূর্ণ মিস্টিক অনুভূতিতে

পরিণত হইয়াছে। যদিও তাঁহার কাব্য-প্রেরণার মূল-উৎস-স্বরূপিণী এই বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মী পরবর্তী জীবনে ক্ষণিকের জন্য দু'একবার দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রাবল্যে তাহার স্বরূপ বেশীক্ষণ প্রকাশ করিতে পারে নাই, ঐ প্রবল মূল, বৃহত্তম অনুভূতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ ও গভীর মমত্ববোধ রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছেলেবেলায় ভৃত্যতান্ত্রিক শাসনের অধীন থাকিয়া প্রকৃতি-পরিবেশ হইতে দূরে মহানগরীর বহুপ্রাচীরবেষ্টিত কক্ষমধ্যে নিরন্তর অবস্থান করায়, কবির মনে প্রকৃতির প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। তারপর বিহারীলালের কাব্য পড়িয়া সেই আকর্ষণ অনেকগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার বিহারীলাল প্রবন্ধে (আধুনিক সাহিত্য, ২১-২৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,—"এই (বিহারীলালের) বর্ণনা পাঠ করিয়া বহির্জগতের জন্য একটি বালক-পাঠকের মন হুহু করিয়া উঠিত…সমুদ্র পর্বত অরণ্যের আহ্বান বালক-পাঠকের অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল…যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস মনে হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিয়া থাকে, বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।" "যে সোনার কাঠির স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে"—রবীন্দ্রনাথ সেই সোনার কাঠির স্পর্শ প্রথম লাভ করেন বিহারীলালের প্রকৃতি-বর্ণনায়। তারপর উপনিষদের প্রভাবে কবির প্রকৃতিপ্রেম গভীর ও বৃহৎ হইল এবং প্রকৃতিকে কবি নবতর দৃষ্টিতে দেখিলেন। একই প্রাণের ধারা প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ায়, কবি প্রকৃতির সহিত জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ অনুভব করিলেন এবং তাহার সমস্ত রূপ ও রসে পরমসৌন্দর্যময় ও পরমরসময়কে আস্বাদন করিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত সর্বব্যাপক, সর্বাঙ্গসুন্দর ও পরিপূর্ণ প্রকৃতির কবি বিশ্বসাহিত্যে বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নাই। কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘজীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও প্রকৃতি তাঁহার কাছে পুরাণো হয় নাই, সর্বদাই তাঁহার চোখে প্রকৃতি অপূর্ব নবীন, রহস্যময়, বিস্ময়ঘন ও বিচিত্ররসমণ্ডিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত স্থির সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও প্রকৃতির উপর হইতে কোনোদিনই তাঁহার মায়াময়, রহস্যমাখা রোমান্টিক দৃষ্টি একেবারে অপসারিত হয় নাই দেখা যায়। প্রকৃতি তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত যেন তিলে তিলে নূতন হইয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যে যে বিশ্ববোধ, প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে গূঢ়তর রহস্য-চেতনা, মানব-মহিমার জয়গান, সার্বজনীন ভাব ও আদর্শপ্রীতি, অপার্থিব প্রেম ও সৌন্দর্যধ্যান

লক্ষ্য করা যায়, তাহার উদ্ভব হইয়াছে এক অতীন্দ্রিয় ও অধ্যাত্ম-অনুভূতি হইতে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার বিশিষ্ট স্বরূপ। এই অনুভূতি কেমন করিয়া কবিমানসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সে সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

সকলের চক্ষুর অগোচরে যে কয়খানি প্রস্তরের উপর স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ এই বিরাট, বিস্ময়কর রবীন্দ্রসাহিত্য-সৌধের ভিত্তি স্থাপিত আছে, তাহার বড় প্রস্তরখানি উপনিষদের শিক্ষা—ভারতীয় আধ্যাত্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠ বাণী। যত বিচিত্র ইহার রূপ হোক, যত বিশাল ইহার অবয়ব হোক, ইহার ভারকেন্দ্রকে রক্ষা করিতেছে এই নিভৃত তলদেশের পাথরখানি। গাছ যেমন সকলের অলক্ষ্যে বাতাস হইতে প্রাণবায়ু ও মাটির নীচে শিকড় হইতে রস টানিয়া লইয়া বর্ধিত হয়, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসও সেইরূপ উপনিষদের রস ও বায়ুতে বর্ধিত হইয়াছে। উপনিষদই রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে বহুল পরিমাণে গঠিত করিয়াছে ও একটা বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টির অধিকারী করিয়াছে। উপনিষদের সঙ্গে বৈষ্ণবদর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব ও লীলাবাদ, হেগেলের Ideal Realism মতবাদ, বার্গসঁর গতিতত্ত্ব ও কবীর, দাদূ প্রভৃতি মরমী সাধুগণের আধ্যাত্মিকরসমূলক কবিতার প্রভাব কিছু পরিমাণে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস গঠনে সহায়তা করিয়াছে।

কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রভাব অর্থে একটা অনুপ্রেরণার সংকেতমাত্র—ভাবসাদৃশ্যমাত্র। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি তাঁহার একান্ত নিজস্ব ও তাঁহার কাব্য-সৃষ্টি, তাঁহারই কবিমানসের বিশেষ ধাতুর নির্মাণ। উপনিষদ-প্রভাব কবির নিজস্ব অনুভূতির বিচিত্র রূপ লইয়া, কবি-মানসের বিশিষ্ট সৃষ্টি হইয়া, তাঁহার সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষির সত্যোপলব্ধির মধ্যে তিনি তাঁহার কবিচিত্তের প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে এক অনির্বচনীয় সত্য-সুন্দর, তাঁহার অসীম সৌন্দর্য ও বিভূতি তাঁহার চিত্তকে প্রতিক্ষণ পরম ও অত্যাশ্চর্য বিস্ময়ে বিভোর করিয়া দিয়াছে আর শতধারে সে বিস্ময় ও চমৎকারিত্বের অনভূতি উৎসারিত হইয়াছে তাঁর কাব্য, নাটক, গান প্রভৃতিতে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহার কাব্যানুভূতি ও ঔপনিষদিক সত্যানুভূতি, কবি-চেতনা ও ধর্ম-চেতনা এক ও অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গবিশেষে কবি এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন—

"আমার ধর্ম হইল একজন কবির ধর্ম—এ ধর্ম কোনো নিষ্ঠাবান সদাচারী লোকের ধর্মও নয়, কোনো ধর্মতত্ত্ববিশারদের ধর্মও নয়। আমার গানগুলির প্রেরণা যে

অদৃশ্য এবং চিহ্নহীন পথে আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই পথেই আমি আমার ধর্মের সকল স্পর্শ লাভ করিয়াছি। আমার কবিজীবন যে রহস্যময় ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছে, আমার ধর্মজীবনও ঠিক ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে। যেমন করিয়াই হোক, তাহারা পরস্পরে পরস্পরের সহিত যেন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে ; এ মিলন গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক দিনের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া, সে তথ্যটা সম্বন্ধে আমি নিজে কখনই সচেতন ছিলাম না।"

প্রত্যেক কবি-মানসের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বা শক্তি আছে,—একটি গভীর আবেগ, অপরটি সৃষ্টিশীল কল্পনা। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস উপনিষদের বাণীর তাৎপর্যকে তাঁহার নিজস্ব আবেগ ও কল্পনার মধ্য দিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদের মধ্যে যে ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাকে নূতন আলোকে পরিস্ফুট করিয়াছেন, উপনিষদের নূতন ব্যাখ্যা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা ছিল গুপ্ত, তাহাকে তিনি করিয়াছেন ব্যক্ত, তাহা হইতে নবতর সত্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, উপনিষদের দ্বারা যতই অনুপ্রাণিত হন না কেন, রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি এবং তাঁহার সাহিত্য তাঁহারই নিজস্ব আবেগ ও কল্পনার সৃষ্টি।

বিশ্বপ্রকৃতি, মানব ও ভগবানের পরস্পর সম্বন্ধ উপনিষদের ঋষি যে ভাবে অনুভব করিয়াছেন, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিও অনেকটা তাহাই হইয়াছে। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ় সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুর্ণশ্চ'—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক ব্রহ্মের ব্যাপ্তি, তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে ও তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। সৃষ্টিও ব্রহ্মের ইচ্ছায়—'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ। সোঽকাময়ত একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়। স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ'। এক ব্রহ্ম পূর্বে ছিলেন, তিনি বহু হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন। নিজে তপস্যা দ্বারা তিনি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার, তিনি সর্বময়। তাঁহার স্বরূপ—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম', 'সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম'। বিশেষ করিয়া তাঁহার স্বরূপ আনন্দময়,—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি'। আনন্দই ব্রহ্ম—আনন্দ হইতেই বিশ্বসৃষ্টি। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'। সৃষ্টিতে যাহা কিছু প্রকাশিত, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ। 'রসো বৈ সঃ'। 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'। ব্রহ্ম রসস্বরূপ,—এই আনন্দরসেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জীবিত।

ভগবান অদ্বিতীয়, অনন্ত, সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, বিশেষ করিয়া আনন্দ-স্বরূপ ও রসস্বরূপ। এই বিশ্ব তাঁহারই ব্যাপ্তি—তাঁহারই আনন্দময় সত্তার অভিব্যক্তি। সৃষ্টির সমস্ত কিছুই সেই মহান আনন্দের অমৃতরূপ। সুতরাং ভগবান, বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে কোনো মূল প্রভেদ নাই—এক অনন্ত জ্ঞানময়, আনন্দময় ব্রহ্মের বিশ্বব্যাপী অভিব্যক্তি। কবির রাজ্য জ্ঞানের রাজ্য নয়, বোধের রাজ্য নয়—কেবলমাত্র অনুভূতি ও কল্পনার রাজ্য। উপনিষদের এই তত্ত্বকে কবি অনুভূতি ও কল্পনা দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বানুভূতিই কবির সমস্ত কাব্যসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই প্রকৃতি, মানব-জীবন ও ভগবৎপ্রেম লইয়াই তাঁহার কাব্যের সমস্ত কারবার চলিতেছে—এই ত্রিধারার সমন্বয়েই তাঁহার কাব্যের মহানদী।

প্রথমে ধরা যাক বিশ্বপ্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৃষ্টি বিশ্বপ্রাণের দ্বারা প্রাণবান। সৃষ্টির প্রথমে এক আদি প্রাণের প্রবল উচ্ছ্বাস এই সৃষ্টিতে রূপায়িত হইয়াছিল। ‘যদিদংকিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্’। তখন মানুষ ও প্রকৃতিতে কোনো ভেদ ছিল না। এখন মানুষ ও প্রকৃতি ভিন্নরূপ ধারণ করিলেও উহাদের মধ্যে সমপ্রাণতা আছে, কারণ উহারা একই প্রাণের ভিন্ন রূপাভিব্যক্তি। তাই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবের প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক স্বাভাবিক; ইহা মূল প্রাণের ঐক্যের যোগ। কবি তাই অতি সহজে এই নিখিল বিশ্বের সঙ্গে নিজের প্রাণের গভীর বন্ধন অনুভব করিয়াছেন। তিনি সৃষ্টির আদিম প্রভাতে জল হইয়া, উদ্ভিদ হইয়া, পৃথিবীর সহিত একদিন মিশিয়া ছিলেন এবং ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া বর্তমানে মানবপর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন, এই অনুভূতি কবির নিকট প্রবল এবং অনেক কবিতায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তারপর বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্ররূপকে কবি নিত্য-আনন্দের অমৃতরূপ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। প্রকৃতির যে সৌন্দর্য তাহাও সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ, তাহারই ব্যক্তরূপ।

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি বিষয়ে পূর্ণ অদ্বৈত-তত্ত্ব ও মায়াবাদকে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিকট এই বিশ্ব-জগৎ ও মানবজীবন সত্য—ইহার মধ্যে নিত্যানন্দময় ও নিত্যরসময়ের প্রকাশ। এই সৃষ্টি ছাড়াও স্রষ্টার সত্তা আছে। স্রষ্টার সত্তা সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত ও সৃষ্টির বাহিরে বর্তমান—একসঙ্গে immanent ও transcendent। অসীম, অনন্ত ভগবানের আত্মপ্রকাশের জন্য, লীলাবিলাসের জন্যই এই সৃষ্টি। তাঁহারই লীলার আনন্দ সৃষ্টির মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইতেছে। অসীম, অনন্ত আনন্দস্বরূপ ও রসস্বরূপ, এই স্থূল, জড়, জাগতিক সৃষ্টি, এই বিশ্ব-

প্রকৃতি ও মানবের মধ্য দিয়াই, নিজের সার্থকতা লাভের জন্য নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন। তাই সৃষ্টি ও স্রষ্টা, জড় ও চিন্ময়, জাগতিক ও অতিজাগতিক, সান্ত ও অনন্ত, খণ্ড ও অখণ্ড একত্র জড়াইয়া আছে—কেহ কাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। সীমার মধ্যে অসীমের যে অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার মূলমন্ত্র, তাহাও এই পথে তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। সীমার মধ্যে, খণ্ডের মধ্যে নিজের আত্মপ্রকাশ না করিলে অসীমের কোনোই সার্থকতা নাই ; অরূপকে তাই রূপগ্রহণ করিয়া লীলার উদ্দেশ্য সফল করিতে হয়। আবার খণ্ড ও রূপেরও স্বার্থকতা এই যে, উহার মধ্যে অখণ্ড ও অরূপ বিরাজ করিতেছে ; না হইলে উহা বাস্তবিকই বৈশিষ্ট্যহীন, খণ্ড ও সীমাবদ্ধ। এই অনুভূতি আসিয়াছে সৃষ্টির মূলতত্ত্বের অনুভূতি হইতে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি এই সান্ত ও অনন্ত, অনিত্য ও নিত্য, জড় ও চিন্ময়, রূপ ও অরূপ মিশ্রিত সৃষ্টিকে সমানভাবে উপভোগ করিয়াছেন। একটি কেন্দ্রগত অনুভূতি হইতেই ইহা তাঁহার পক্ষে সরল ও সহজ হইয়াছে। কবির প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে ভোগ করা—রূপের ভোগ, রসের ভোগ, বৈচিত্র্যের ভোগ। অতি বিরাট কাব্য-প্রতিভার অধিকারী হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই ভোগের ক্ষুধা অতি প্রবল ও ব্যাপক। তাই প্রকৃতি ও মানবসম্বলিত এই বিশ্বকে তিনি ভোগ করিয়াছেন, নানা রসে, নানা রূপে, নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া। কিন্তু এই ভোগের বৈশিষ্ট্য এই যে উহাকে খণ্ডে-অখণ্ডে, সান্তে-অনন্তে, রূপে-ভাবে, অনিত্যে-নিত্যে ভোগ করিয়াছেন। তাই তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি নিতান্ত সংকীর্ণ, বাস্তবমুখী হয় নাই, আবার একেবারে নিরালম্ব, ভাবগগনবিহারীও হয় নাই—উভয় গুণেরই অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে।

প্রকৃতির রূপ-রস-গান তিনি যেমন উপভোগ করিয়াছেন, উহার অলৌকিকত্ব অনন্তত্ব ও অসীমত্বও তাহার সঙ্গে সেই রূপই উপভোগ করিয়াছেন। এই অসীম ও অনন্ত অংশের অনুভূতি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যরূপে তাঁহার চক্ষে ধরা দিয়াছে ও উহা চিরন্তন আনন্দের অমৃতরূপ বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। খণ্ডরূপের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য নির্ভর করিতেছে চিরন্তন আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়। এইভাবে তিনি অখণ্ডের ভূমিকায় খণ্ড রূপ-রস গ্রহণ করিয়াছেন।

রোমাণ্টিক কবি-মানসমাত্রেই সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে প্রত্যক্ষ করে, ক্ষুদ্রকে দেখে বৃহতের ভূমিকায়, রূপের মধ্যে দেখে অরূপের ব্যঞ্জনা—একবিন্দু বালুকণার মধ্যে দেখে অসীম ব্রহ্মাণ্ড। একটা কোনো চিরন্তন ভাব বা অসীম বিশ্বাতীত শক্তি বা কোনো সার্বজনীন মূলনীতি বা চিত্তবৃত্তির পটভূমিকায় এই বাস্তববিশ্বকে রোমাণ্টিকেরা

গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেক রোমান্টিক কবির নিকট এই অতিজাগতিক শক্তি কোনো সুনির্দিষ্ট অনুভূতি নাই; ইহার মূল স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নাই কেবল কাব্যসৃষ্টির চরম অনুপ্রেরণার মুহূর্তে একটা শক্তি অনুভূত হইয়াছে মা এবং তাঁহাদের কাব্যের অনুভূতির সঙ্গে জীবনের অনুভূতির মিল নাই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাতীত শক্তির একটা স্থির, সুসংবদ্ধ অনুভূতি তাঁহা কাব্যপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এবং কাব্যের অনুভূতি ও জীবনের অনুভূ মিলিয়া যাওয়ায় ইহার প্রকাশ হইয়াছে জীবন্ত ও অপূর্ব সুন্দর। রবীন্দ্রনাথে রোমান্টিক কবিমানস সৌন্দর্যের একটা বস্তুনিরপেক্ষ abstract আদিরূপের কল্পন করিয়াছে বটে, কিন্তু সে-রূপ যে চিরসুন্দরের রূপের প্রতিচ্ছবি এবং মূলে একই ইহাও বিশেষভাবে কবি অনুভব করি এক মূল সৌন্দর্য-সাগর হইতে সৌন্দর্যের ঢেউ উঠিয়া নিখিল বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে। বিশ্ব-প্রকৃতির আবর্তন বিবর্তনে, ঋতু-পর্যায়ের মধ্যে যে নব-নব রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা চিরানন্দময়ে লীলানৃত্য ও চিররসময়ের রসবিলাস বলিয়া কবি অনুভব করিয়াছেন। তাই অন্যান্য রোমান্টিক কবিদিগের সঙ্গে তাঁহার একটু প্রভেদ আছে। তাঁহার কবি-মানস রোমান্টিক-মিস্টিক, রোমান্টিক মিস্টিকে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টির মধ্য দিয় সেই পরমসুন্দরের সৌন্দর্য ও পরমরসময়ের লীলাই তো কবি চিরকাল অনুভব করিয়া গিয়াছেন; তাহারই অপরূপ রহস্য, তাহারই সংকেত, তাহারই ব্যঞ্জনা, তাহারই আনন্দ কাব্যে, নাটকে, গানে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

তারপর মানবের কথা। মানবকেও কবি এক অখণ্ড সত্যের অংশস্বরূপ দেখিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত মানব সৃষ্টির অংশীভূত হওয়ায় তাহার মধ্য দিয়া অখণ্ড ও অনন্ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। মানুষের উন্নত বোধের ভূমিতে, জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের সর্বোচ্চ আদর্শের আলোক-পরিধির মধ্যে অনন্ত সত্য-জ্ঞানময়-আনন্দময়ের প্রকাশ। খণ্ডের অসম্পূর্ণতা, দেশকালপাত্রের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে যে সত্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা ও উন্মুক্ত, উদার দৃষ্টি—মানুষের এই পরিপূর্ণ ও সমুন্নত চেতনার মধ্যে এই অনন্ত সত্য ও জ্ঞান প্রকটিত; এইখানেই খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের—জীবসংস্কারাবদ্ধ মানুষের মধ্যে চির-মানবের প্রকাশ। এখানে মানুষে-মানুষে কোনো ভেদ নাই, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিতের কোনো সমস্যা নাই। দেশকালের দ্বারা খণ্ডিত হইলেও মানুষের মধ্যে এই অনন্ত জ্ঞান ও সত্যের বিহারক্ষেত্রই, এই পরিপূর্ণ বোধের ক্ষেত্রই বিশ্বের সকল মানবের মিলনস্থান। মানুষ যখন স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, ছোট-আমির সংস্কার ত্যাগ করিয়া, চিন্তায়, কর্মে, প্রেমে সার্বজনীনতা ও বিশ্ব-আত্মীয়তা দ্বারা একটা পরিপূর্ণতার সাধনা করে,

তখনই সে প্রাকৃত মানুষ-সত্তাকে অতিক্রম করিয়া সেই মহান পুরুষকে অনুভব করে—জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে উপলব্ধি করে।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধের মধ্যে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। সংক্ষেপে সেগুলির আভাস দেওয়া যাইতেছে। প্রথম, ব্যক্তি-মানব বা জীবাত্মা মানবসৃষ্টির আদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া ক্রমাগত পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এক মহৎ পরিণামের আদর্শে তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বিধৃত, ক্রমবিস্তারশীল একটি অখণ্ড মানব-চৈতন্য। মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা আছে,—একটি ক্ষণিক, একটি চিরন্তন, একটি ক্ষুদ্র, একটি বৃহৎ, একটি 'অহং'-এর কারাগারে বন্দী, দুঃখদৈন্য-ক্ষয়ক্ষতি-বিষয়কর্মের অধীন, একটি 'অহং'-মুক্ত, দেশকালের উর্ধ্বগত, পরমাত্মারূপী বিরাট পুরুষের অংশ, অমৃতের অধিকারী। একটি ক্ষুদ্র মানব বা ছোটো-আমি', আর একটি বৃহৎ মানব বা 'বড়ো আমি'। এই বৃহৎ মানব বা বড়ো-আমি', যে বিরাট পুরুষ আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে যুক্ত, জীবন থেকে জীবনান্তরের পথে পরিপূর্ণ আদর্শের অভিসারে চির-যাত্রী। এই বৃহৎ-মানব বা বড়ো-আমি'র সঙ্গে পরম একের অনন্ত প্রেমলীলা চলিয়াছে যুগ যুগ ধরিয়া। ইহাই নিত্য-আমি ও বিরাট পুরুষের বা নিত্য-তুমির লীলা।

দ্বিতীয়, এই যে বৃহৎ-মানব বা 'নিত্য-আমি', সে কেবল 'নিত্য-তুমি'র সঙ্গেই লীলারসে মত্ত নয়। এটি বিশ্বের সমগ্র মানবের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তি-সত্তার জীবন-মৃত্যু, ভাব-চিন্তা-কর্ম সমস্ত জড়াইয়া, সকল দেশে সকল যুগে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে ইহার ধারা। এই বিশ্বমানবতায় মহামানবেরই অভিব্যক্তি—পরম সত্তার প্রকাশ। দেশ-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া মানবসত্তা বিশ্বমানবসত্তার সঙ্গে মিশিয়া মহামানবের সঙ্গে যুক্ত হইলেই তাহার সত্যোপলব্ধি, তাহার সার্থকতা। সমস্ত মানুষের নদীস্রোত এক অখণ্ড সাগরে মিশিতেছে। মানুষের এই যুগযুগব্যাপী অগ্রগমন, এই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের মধ্য দিয়া মহামানবের যে প্রকাশ, তাহার সঙ্গে মানুষের মিলনেই তার সার্থকতা। নিত্য-আমি'র ঐশ্বর্য হইতেছে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দেওয়া—জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, শুভবুদ্ধিতে, কল্যাণপ্রচেষ্টায় নিখিল মানবের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এক অখণ্ড বিশ্বমানব-ইতিহাস-রচনা, বিশ্বমানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য রচনা করা। ব্যক্তি-মানব বিশ্ব-মানবের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহার পরম সার্থকতা লাভ করিতেছে।

তৃতীয়, এই বিশ্বমানবতার ধারা অনন্ত বিশ্বসৃষ্টি-প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হইয়া জল-স্থল-গ্রহ-নক্ষত্রের বিবর্তনধারার সঙ্গে মিশিয়া যে এক বিরাট বিশ্ব-হার্মনি রচনা করিতেছে, মানুষ তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া, তাহার মধ্য দিয়া পরম একের সঙ্গে

যুক্ত হইয়া তাহার চরম সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছে। এইটাই মানবজীবনের চর: প্রাপ্তি, পরম পুরুষার্থ ও চির-অমরত্ব।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তর্নিহিত পরমসত্তাকে মানব বলে উপলব্ধি করেছেন,—

"আমার অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ তিনি ব্যক্তিগত মানবক অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন এবং সর্বকালী মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।" (ভূমিকা, মানুষের ধর্ম)

তারপর, মানবের এই পরিপূর্ণ বোধ ছাড়া, তাহার উন্নত চিত্তবৃত্তির বিকাশের মধ্যেও কবি অনুভব করিয়াছেন অসীম আনন্দ ও চিরন্তন রসের প্রকাশ। স্নেহ প্রেম-দয়া-ভক্তির মধ্যে যে অনির্বচনীয়ত্ব, যে মাধুর্য আছে, তাহা চিররসময়ের রসের পরিচয়। মানবের এই ক্ষণিক অংশের মধ্যে চিরন্তনের অভিব্যক্তি—সান্তের মধ্যে অনন্তের প্রকাশ। মানব-জীবনের এই দুই অংশ, এই বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তিতে কবি অপূর্ব বিস্ময়ের সঙ্গে অসীম জ্ঞান ও প্রেমকে অনুভব করিয়াছেন। সমস্ত ভেদাভেদ দ্বেষহিংসা ভুলিয়া এই মুক্ত, চিরন্তন জ্ঞান ও প্রেমের ক্ষেত্রে, এই মহামানবের বিহার ক্ষেত্রে, তিনি মানুষকে আহ্বান করিয়াছেন তাহার জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ লাভের জন্য। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কবির কাব্যে এই আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে।

প্রেম কবি-চিত্তের শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক রসায়ন। মানুষের খণ্ডজীবনের ক্ষণিক প্রেমকে তিনি অনুভব করিয়াছেন চিরন্তন রসের পটভূমিকায়। জগতের খণ্ড আবেষ্টনের মধ্যে দেহ ও হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া প্রেমের যে প্রকাশ, তাহার অতি সুন্দর চিত্র তাঁহার কাব্যে আছে বটে, কিন্তু এই দেহ ও হৃদয়ের, এই ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারে আবদ্ধ প্রেমই প্রেমের শেষ পরিণতি বলিয়া অনুভব করেন নাই—চিরন্তন রসের আধার বলিয়া তাহাকে অনুভব করিয়াছেন। সেজন্য সাধারণভাবে যাহাকে আমরা প্রেম-কবিতা বলি, যাহাতে দেহ ও হৃদয়ের চরম আবেগ ও আকুলতা একটা অত্যাশ্চর্য গভীর তন্ময়তায় অপূর্ব-সুন্দর রূপ ধারণা করে, সেরূপ প্রেম-কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল। এই চরম অবস্থায় পৌঁছিবার পথেই সে প্রেম, চিরন্তর রসের অংশ বলিয়া অনুভূত হওয়ায় দেহ ও হৃদয়ের উর্ধ্বস্তরে উঠিয়া একটা প্রশান্ত, গম্ভীর সর্বব্যাপী আনন্দরসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে।

মানবের উন্নত বোধের মধ্যে অনন্তত্বের প্রকাশ এবং মনুষ্যত্বের এই শ্রেষ্ঠ বিকাশের ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারিলেই মানুষের চরম আদর্শ লাভ হয়, ধরায় স্বর্গরাজ্য নামিয়া

আসে। এই অনুভূতি তাঁহার প্রবল হওয়ায় মানবের দেশ-কাল-পাত্রের বাস্তব সমস্যার উর্ধ্বস্তরে তিনি উঠিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি কবিতাতে এই মনোভাবের দৃষ্টান্ত মিলিবে। 'চিত্রা'-র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি অন্নহীন, শিক্ষাহীন জাতির দুঃখ-দুর্দশায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। তাহার প্রতিকারের জন্য কবি বদ্ধপরিকর। কিন্তু উপায় যাহা নির্ধারণ করিলেন, তাহা মানবের সর্বোত্তম আদর্শ—ব্রহ্মবোধের দ্বারা, চিরমানবের উপলব্ধি দ্বারা, প্রাদেশিকতা, সংকীর্ণতা, বর্বরতা ও সাম্প্রদায়িকতার সমস্ত ভেদবুদ্ধি কাটাইয়া, সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, এক পরিপূর্ণ সার্বজনীন সত্য-ভূমিতে মানুষে-মানুষে মিলনের আদর্শ। এই আদর্শের সৌন্দর্য-প্রতিমা বুকে ধরিয়া জীবনপথে চলিলেই সংসারে দুঃখ-দৈন্য-পীড়নের কোনো অবসর থাকিবে না; মানুষ মানুষকে আর ঘৃণা-দ্বেষ-পীড়ন করিবে না—তখন সকলেই বুঝিবে যে, সকল মানুষই অনন্তের অংশ, ভেদবুদ্ধি কেবল সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিতে। ইহাই মানুষের অন্তর্নিহিত গৌরব ও মহিমায় একান্ত বিশ্বাসী কবির আদর্শ।

সারা জীবন কবি যে মানবের জয়গান করিয়াছেন, সে মানব সংসারের এই মানবের বৃহত্তর অংশ—যে অংশ জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, আত্মানুভূতিতে, তাহার অন্তরস্থিত নিত্য-মানবকে উপলব্ধি ও অনুভব করিয়া মানবজীবনের চরম পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করিতেছে। এই বৃহত্তর মানবই প্রকৃত মানব—সে ব্যক্তিগত পরিধি উত্তীর্ণ হইয়া দেশে কালে ব্যাপ্ত হইয়া মানবসভ্যতার চিরন্তন সম্পদ দানে সহায়তা করিতেছে। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সে অনন্তের অংশ—নিত্যমুক্ত, স্বাধীন, দেশ-কাল-পাত্র-সংস্কারের উর্ধ্বে, নিজের গৌরবে গরীয়ান। মানুষের প্রতি এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হওয়ায়, রবীন্দ্রনাথ, মানবকল্যাণের একমাত্র পথ যে মৈত্রী, বিশ্বপ্রেম, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি, তাহা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিয়াছেন। মানবজীবনের এই সার্থকতার পথে যে বাধাবিঘ্ন, দ্বেষ, হিংসা, পীড়ন, শোষণ-অত্যাচার—তাহার বিরুদ্ধে তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ যুগে রবীন্দ্রনাথের মত অকপট শান্তিকামী ও বিশ্বমৈত্রীর সমর্থক বিরল। তাই তাঁহার কবি-জীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়, পৃথিবীর যেখানে মানুষের উপর অত্যাচার, অবিচার হইয়াছে, সেখানেই তাঁহার সহানুভূতি পৌঁছিয়াছে, এবং তাঁহার স্পর্শকাতর চিত্তে তিনি তীব্র বেদনা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু সে বেদনা মানবের কোনো রাজনৈতিক অধিকারহীনতার জন্য নয় বা অন্নবস্ত্রের অভাবের জন্য নয়, সে বেদনা মানবের বৃহত্তর অংশের পরিপূর্ণ বিকাশের বাধার জন্য, তাহার লাঞ্ছনা ও অবমাননায়। রবীন্দ্রনাথের মানব দেব ও দানব অংশযুক্ত শেক্সপিয়ার বা ভিক্টর হুগোর রিপুতাড়িত সাধারণ মানুষ নয়, রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমতাকামী জনগণের সমষ্টি

নয়; রবীন্দ্রনাথের মানব—দেশকালের অতীত বিশ্বমানব, জীব-সংস্কারের ঊর্ধ্বগত চিরন্তন মানব।

কিন্তু জীবনের শেষের দিকে কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বহুপূজিত এই মানব-মহিমা সংসারের বাস্তবক্ষেত্রে অস্বীকৃত হইতেছে, মনুষ্যত্বের এই আদর্শ পদদলিত হইতেছে, তাহার জন্য একটা অস্থিরতা, নৈরাশ্য ও বেদনার অনুভূতি তাঁহার শেষ-জীবনের কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজজাতির ন্যায়বোধের উপর রবীন্দ্রনাথের একটা আস্থা ছিল এবং ভাবিয়াছিলেন, ক্রমবিবর্তনের পথে ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার তাহারা দিবে;—ভারতের আত্মশক্তি-বিকাশের সমস্ত বাধা দূর হইবে এবং সমস্ত অবিচার ও অত্যাচারের শেষ হইবে। কিন্তু ক্রমেই দেখিতে পাইলেন, সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ সমস্ত ন্যায়ধর্ম ও মানবতাকে পদদলিত করিয়া ভারতের বন্ধনমুক্তির আশাকে নির্মূল করিতেছে; তখন তাঁহার আশাবাদী, আদর্শবাদী কবি-মনে একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইংরেজের নির্বিচার দমননীতিতে তিনি একটা ঘোর দুর্দিনের অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন দেখিতে পাইলেন—প্রেম, মৈত্রী প্রভৃতি মানবতার বাণী আজ ধরাতল হইতে লুপ্ত: ভগবান কি এই নির্মম অত্যাচারীকে ক্ষমা করিবেন?—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে ॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ॥

[প্রশ্ন, পরিশেষ]

রবীন্দ্রনাথ এতদিন, আমাদের দেশের হিন্দুসমাজের জাতিভেদ ও সামাজিক বৈষম্যে মানবের অন্তরাত্মা নিপীড়িত হইতেছে, 'মানুষের প্রাণের ঠাকুর'কে ঘৃণা করা হইতেছে বলিয়া দুঃখ ও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; এখন দেখিতে পাইলেন

্যহত্তর ক্ষেত্রেও এই একই অত্যাচার ও নিপীড়ন চলিতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত নখদন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, স্বার্থান্ধ, লোভোন্মত্ত জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিকে গ্রাস করিতে চাহিতেছিল, অত্যাচার ও নিপীড়নের উদ্ধত রথ দুর্বলের বুকের উপর দিয়া চলিয়াছিল। স্থানে স্থানে পররাজ্য-গ্রাসের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পদ ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছিল। ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়া গ্রাস, ফ্রাঙ্কো কর্তৃক স্পেনের গণতন্ত্র ধ্বংস, জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ, হিটলারের ক্রমে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগ্রাস ও শেষে সর্বধ্বংসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ—এই সব ঘটনার আলোড়নে মানুষের দুঃখবেদনার, নির্যাতন-নিপীড়নের, ধ্বংস-মৃত্যু-হাহাকারের এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। মানব-মহত্ত্বে একান্ত বিশ্বাসী কবি মানবের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধ্বংসকারী এই রক্তলোলুপ দানবদের শত ধিক্কার দিয়াছেন, আর এই মনুষ্যত্বনাশী দানবদের প্রতিরোধ করিবার জন্য সংগ্রামী জনগণের প্রস্তুতিরও ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'পরিশেষ' হইতেই কবির মধ্যে মানবসম্বন্ধে এই নূতন চেতনা লক্ষ্য করা যায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই নবলব্ধ চেতনা তাঁহার কাব্যে নানা রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইউরোপের সাম্রাজ্যলোলুপজাতি কি করিয়া বর্বর অত্যাচারে দলিত মথিত করিয়া আফ্রিকাকে অধিকার করিল, তাহার এক চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন কবি তাঁহার 'পত্রপুট' কাব্যে,—

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল,
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হোলো ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে;

দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

[পত্রপুট, ষোলো

চীনের সঙ্গে যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী জাপানীরা বুদ্ধের মন্দিরে যুদ্ধের সাফল্য কামনা করিতে গিয়াছিল। 'ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে' রবীন্দ্রনাথ জাপানীদের এই ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ করি

বেজে উঠল তুরী ভেরী গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।
ধূপ জ্বলল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে,
করুণাময়, সফল হয় যেন কামনা—
কেননা ওরা যে জাগাবে মর্মভেদী আর্তনাদ
অভ্রভেদ করে,
ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্র,
ধ্বজা তুলবে লুপ্তপল্লীর ভস্মস্তূপে,
দেবে ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্যানিকেতন,
দেবে চুরমার করে সুন্দরের আসনপীঠ।

[পত্রপুট, সতেরো

ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দির তলে।
গর্জিয়া প্রার্থনা করে
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।......
হত আহতের গনি সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা,
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিঃশ্বাস,
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধের নিতে নিজ দলে।

[বুদ্ধভক্তি, নবজাতক

'মানুষের তীব্র অপমানে', তাহার অন্তরস্থিত দেবতার ব্যঙ্গে কবির অন্তর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি আবেগময় উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,—

মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব, এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু র'বে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
ব'লে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

[জন্মদিন, সেঁজুতি]

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল র'বে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎ-স্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

[প্রান্তিক, ১৭]

এবার আর শান্তি ও মৈত্রীর বাণী নয়—এবার সংগ্রামের আভাস,—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে॥

[প্রান্তিক, ১৮]

অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে এই সব কবিতায় কবির কণ্ঠে যেমন একটা বিদ্রোহের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, তেমনি তিনি এই অন্ধকার যুগের অবসানে এক নূতন যুগের সূর্যোদয়েরও আশ্বাস দিয়াছেন। কবি-চিত্তের চিরদিনের বদ্ধমূল বিশ্বাস ও সংস্কার যে, ধ্বংস-মৃত্যুর পরে নূতন সৃষ্টির উদ্ভব হয়। ধ্বংসের প্রয়োজন আছে—ধ্বংসের মধ্য দিয়াই আমাদের পুঞ্জীভূত গ্লানি-পাপ-দুর্বলতা নিঃশেষ হওয়ায় আমরা নূতন জীবনের উপযুক্ত হই। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নটরাজের একপাদক্ষেপে ধ্বংস,

অন্ত্যপাদক্ষেপে সৃষ্টি। রুদ্রমূর্তির আবির্ভাবের পরেই তো শিবমূর্তির আবির্ভাব। চরম আঘাতের বেদনাই তো কল্যাণের, শান্তির অগ্রদূত। তাই কবি বলিতেছেন,—

নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
বিদীর্ণ হয়ে, তার
কলুষপুঞ্জ ক'রে দিক উদ্গার।......
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়;
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি'।

[প্রায়শ্চিত্ত, নবজাতক]

তারপরে কবির বিশ্বাস,—

যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে॥

[প্রায়শ্চিত্ত, নবজাতক]

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ-পাপ যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী-বেশে
চিতা-ভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

[জন্মদিনে ২১

কবি আশা করেন, মানুষের ঘরে এমন এক তরুণ বীর জন্মগ্রহণ করিবেন, যিনি এই জগদ্‌ব্যাপী অসত্য, অন্যায়, অত্যাচারকে পরাজিত করিয়া, এই রক্তপঙ্কিল, বিদ্বেষ-বিচ্ছেদ-কলুষিত পৃথিবীতে এক শান্তিময় মিলন-তীর্থ রচনা করিবেন—মানবাত্মা আবার তাহার দুঃসহ অবমাননার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাহার নিত্য-শুভ্র, অম্লান জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে; মানুষের অন্তর্নিহিত দেব-অংশ আবার পূজিত হইবে, পৃথিবীতে দেখা দিবে মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির নবযুগ।

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
কী বার্তা নিয়ে মর্ত্যে এসেছ তুমি···
নর-দেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।···
আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি'
আগামী প্রাতের শুকতারা সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাস বাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝিবা দিতেছে আনি'।

[নবজাতক, 'নবজাতক']

সেই নবযুগের নবীন আগন্তুককে, সেই নবযুগের কবিকে, সেই নবজাগরণের প্রভাত-অরুণকে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করিতেছেন তাঁহার চিত্তকে উদ্বোধিত করিবার জন্য, তাঁহার দুঃখ-নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়কে জাগ্রত করিবার জন্য। এই নবীন কবির সংগীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত জাগ্রত হইয়া সারাবিশ্বব্যাপী এক নির্মল, অপরূপ সুন্দর, পরিপূর্ণ আনন্দমূর্তি লক্ষ্য করিবে—দূর হইয়া যাইবে পৃথিবীর সব দুঃখ-গ্লানি, দ্বেষ-হিংসা, বিভেদ-বিচ্ছেদ,—সকল মানুষের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের মিলন হইবে।

যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালী
মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী ডালি।

জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়ত্বজয়ী।
জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহ আপনার স্থান—
তোমার জীবনে স্বার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান॥

[উদ্বোধন, নবজাতক]

সেই নূতন যুগের নব-আগন্তুক—সেই মহামানবের আসন্ন আগমন-সংবাদ তিনি মৃত্যুর একেবারে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

মহামানব বলিতে রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের অন্তরস্থিত অদ্বিতীয় পরম সত্যকে বুঝিয়াছেন। কবি তাঁহাকে 'সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানব', 'বিরাট পুরুষ' প্রভৃতি বলিয়াছেন। কিন্তু জীবনের শেষে যে-মহামানবের আবির্ভাবের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাঁহাকে মানবহৃদয়বিহারী পরম সত্যের মানব-প্রতিনিধি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, পরমতত্ত্বের বা এক তত্ত্বগত আদর্শের মর্তাবতরণ সম্ভব নয়।

যে মানবের মধ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত দেব-অংশের পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, যে তাহার ব্যক্তিজীবনধারাকে বিশ্বমানবজীবনধারার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছে, যে তাহার অন্তরের নিত্য-মানবকে উপলব্ধি করিয়া, দেশকালপাত্রের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া নিজেকে বিশ্বে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে এবং চিন্তায়, কর্মে, প্রেমে ও অনুভূতিতে সর্ববিধ মানবমঙ্গল কামনা করিতেছে, যে মানুষের অন্তর্নিহিত গৌরব ও মহিমাকে পূজা করিয়া মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ বন্ধনমুক্তির চেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে—যাহার চোখে মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে কোনো ভেদ নাই,—বিশ্বরাজ্যে, বিশ্বমানবকে বিশ্বপ্রেমে বাঁধিবার স্বপ্ন ও সাধনায় যাহার জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, সে-ই মানবের মূর্তিমান সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ—পুরুষোত্তম—মহামানব। এই মহামানবের আবির্ভাবেই মানব-দুর্গতির তিমিররাত্রির অবসান হইবে—বিভেদ-বিদ্বেষের যুগ শেষ হইবে—মানবের প্রকৃত মুক্তির যুগ আসিবে—এই পৃথিবীতে 'স্বর্গলোকের বিজয়পতাকা উড্ডীন' হইবে। তাই কবি মহামানবকে আবাহন করিয়াছেন,—

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

[শেষলেখা, ৬]

একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানেই মানুষের দুঃখ-দুর্দশার শেষ হইবে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও ধারণা। মহামানব অর্থে যাঁহার মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে,—মহাপুরুষ, যথা— বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি। ইঁহারা চিন্তা ও কর্মের দ্বারা মানুষের সুপ্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বিদ্বেষ, বিভেদ ও স্বার্থবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে প্রবৃত্ত করান এবং এইভাবে ইঁহাদের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেমের রাজ্য সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথের মহামানব অর্থে সমস্ত মানুষের সমষ্টির একটা abstract ভাব নয়, বা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে রক্তাক্ত গণবিপ্লবসংগঠনকারী নেতা নন। মহাপুরুষগণও গণবিপ্লব সংঘটন করান বটে, কিন্তু সে বিপ্লব আসে মানুষের অন্তরের রূপান্তর-সাধনের মধ্য দিয়া, তাহার পশুশক্তির বিলোপে ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির জাগরণে। সে বিপ্লব রক্তাক্ত বিপ্লব নয়—সে বিপ্লব প্রেম ও শান্তির বিপ্লব। তাঁহারাও যুদ্ধ করেন বটে, তবে সে যুদ্ধ অন্যায়, অসত্য ও পাপের সঙ্গে—সে যুদ্ধের অস্ত্র নৈতিক ও আত্মিক শক্তি। বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের মহামানব।

মানুষের বহুবিধ নির্যাতন লক্ষ্য করিতে করিতে জীবনের শেষ পর্বে কবি সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি—কৃষক-শ্রমিক-মজুরদের প্রতি একটা অকৃত্রিম দরদ অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জীবনকে সত্যভাবে জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এতদিনের জীবনযাত্রা—তাঁহার পারিপার্শ্বিক তাহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে মিশিয়া তাহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ দেয় নাই। এই-সব সংসারযাত্রার প্রকৃত ধারক ও বাহক, অথচ সমাজের অবহেলিত ও নির্যাতিত জনগণের অন্তরের চিরন্তন মর্যাদাকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়া সম্মানদানের সুযোগ কবি পান নাই, তাহাদের অন্তরের সহিত তাঁহার

অন্তর যোগ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার কাব্য একটা সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই,—

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার,
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।...
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

[জন্মদিনে, ১০

তাই কবি সেই অনাগত যুগের অজানিত কবিকে—সেই 'অখ্যাতজনের 'নির্বাক মনের' বাণীরূপদাতাকে সাদর আহ্বান ও অভিনন্দন জানাইতেছেন,—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।......
মূক যারা দুঃখে সুখে
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি,—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

[জন্মদিনে, ১০

কিন্তু আধুনিক কালে এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবন লইয়া, তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সমস্যা লইয়া যে সাহিত্য রচিত হইতেছে, তাহা একটা কৃত্রিম বাস্তব-ভঙ্গীর সৌখীন সাহিত্যপ্রচেষ্টা মাত্র। ইহাদের জীবনসম্বন্ধে লেখকদের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই, শহরে ঐশ্বর্যের মধ্যে আরামে বাস করিয়া কেবল একটা নূতন ভঙ্গী দেখাইবার জন্য বা প্রচার-উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনার মিথ্যা ব্যবসা করিতেছে। কিন্তু যে কৃষকদের কবি হইবে, তাহাকে কৃষকদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে, তবেই তাহার রচনা সত্য হইবে —সার্থক হইবে। তাই কবি বলিতেছেন, সত্যকার কৃষকদরদী কবির কাব্য যেন কেবল ভঙ্গীসর্বস্ব ও কৃত্রিম না হয়,—

সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখীন মজদুরি।

[জন্মদিনে, ১০]

তারপর, ভগবান। কবি ভগবানকে মোটামুটি চাররূপে অনুভব করিয়াছেন। প্রথম, অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে, মহান পুরুষরূপে। তিনি পিতা, প্রভু, বিশ্বেশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ। বিপুল তাঁহার ঐশ্বর্য—অসীম তাঁহার শক্তি। দ্বিতীয়, লীলাময়রূপে, সখাভাবে, প্রিয়তমভাবে—মাধুর্যের বিচিত্র রসসম্ভোগের মধ্য দিয়া। তৃতীয়, অজানা, চিররহস্যময়, চঞ্চল, নিরন্তর অগ্রসর, বংশীবাদক পথিকরূপে। প্রথম রূপের অনুভূতিতে উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্মের প্রভাব দেখা যায়। অনেক ধর্ম-সংগীতে, 'নৈবেদ্যে'র অনেক কবিতায় ও 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র কয়েকটি কবিতায় এবং শেষ জীবনের অনেক কবিতায় ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় রূপের সঙ্গে উপনিষদের দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব ও পরবর্তী বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতবাদের সাদৃশ্য আছে। সৃষ্টির মূলে অদ্বিতীয় একের বহু হইবার ইচ্ছা। সমস্ত সৃষ্টিই তাঁহার লীলার অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে নিজের সঙ্গেই নিজের লীলা। এই যে মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ, জীবাত্মায় পরমাত্মার বিকাশ, সান্তের মধ্যে অনন্তের অভিব্যক্তি, সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা হইয়াছে, ইহা এক গূঢ় উদ্দেশ্যের জন্য। ভগবানের স্বরূপ আনন্দময়; নিজের আনন্দাংশ উপভোগের জন্যই তাঁহার মানবসৃষ্টি। মানুষের প্রেম-ভক্তি-স্নেহে তিনি নিজের আনন্দাংশ উপভোগ করিতে চাহেন।

মানুষের প্রেম না হইলে তাঁহার লীলা সার্থক হয় না। মানুষ যেমন তাঁহাকে প্রেম নিবেদন করিবার জন্য ব্যাকুল, তিনিও মানুষের প্রেমের জন্য নিত্য-কাঙ্গাল।

মানুষ মানুষের সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই ভগবানকে পাইতে চায়; তাই তাঁহাকে পরম-প্রিয়তমরূপে, বন্ধুরূপে, স্নেহের পুত্তলী সন্তানরূপে পাইলে মানুষের হৃদয় তৃপ্ত হয় তাই মানুষের ভিত্তিভূমি হইতে মানবীয় রসের মধ্য দিয়াই সে ভগবানকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করিয়াছে। এই উপলব্ধিতে বৈষ্ণব ভক্তগণ ভগবানের একটি বিশিষ্ট মূর্তিপ্রতীককে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমস্ত মূর্তি-প্রতীক বা রীতি-সংস্কারকে ত্যাগ করিয়া, শুধু ভাবটুকু অবলম্বন করিয়া নিজস্ব অনুভূতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই মাধুর্যভাবমূলক কবিতা 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র মধ্যে অনেক আছে।

ভগবানের তৃতীয় রূপের অনুভূতির মধ্যে আমরা রবীন্দ্র-কবি-মানসের একটা বিশিষ্ট পরিচয় পাই। সৃষ্টির চলমান স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, বিশ্ব-বৈচিত্র্যের ধাবমান ইতিহাস-ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া, আভাসে-ইঙ্গিতে ভগবানের স্পর্শলাভ করা, ও সুদূর, অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পূর্ণ মিলনের জন্য শত শত জন্মের মধ্য দিয়া ভগবানকে অনুসরণ করার যে কল্পনা ও অনুভূতি, ইহা রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব অনুভূতি। কোন্ এক অনাদিকাল হইতে স্রষ্টা এই সৃষ্টির মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে করিতে কতো উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া, সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কেবল অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। মানবজীবনও এই সৃষ্টির স্রোতে লোক-লোকান্তর, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া অনন্ত যাত্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে। নিত্যানন্দময়ের নিজেকে বিভক্ত করিয়া এই যে সৃষ্টি, ইহার উদ্দেশ্য তো নিজের আনন্দ নিজে ভোগ করা। প্রেমের রসের মধ্য দিয়াই সেই আনন্দ-উপভোগ। মানবের প্রেম আস্বাদনের মধ্যেই তাঁহার উদ্দেশ্যের সফলতা। তাই মানবের সঙ্গে চলিয়াছে তাঁহার প্রেমলীলা—অনাদি অতীত হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎব্যাপী, সৃষ্টির দ্রুতপ্রবাহের মধ্যে। সৃষ্টি চলিয়াছে গতির আবেগে মত্ত হইয়া অনন্ত প্রবাহে ভাসিয়া। মানবজীবনের এই যে ক্রমাগত চলা, এই চলার স্রোতের মধ্যেই তাহার জীবনের সত্য। জীবনের এই অখণ্ড প্রবাহের মধ্য দিয়াই সে সার্থক পরিণামের দিকে ছুটিয়াছে। সৃষ্টির এই দ্রুত প্রবাহকে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রভাবে অনুভব করিয়াছেন 'বলাকা'য় সেই অনুভূতির একটা বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। মানবজীবন এই চলার স্রোতের মধ্য দিয়া একটা সার্থকতার দিকে ছুটিতেছে। অনন্ত প্রেমময়ের সঙ্গে যে প্রেমলীলা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরিণাম তো পূর্ণমিলনে—প্রেমের চরম তৃপ্তি ও প্রাপ্তিতে। তাই পূর্ণ-মিলনের আকাঙ্ক্ষায় চলিয়াছে মানুষের এই যাত্রা—এই অনন্ত অভিসার-যাত্রা। পরম দয়িতের মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে এই অভিসারে; তিনিও মানুষের জন্য অভিসারে বাহির হইয়াছেন,

কারণ, তাঁহারো তো মানুষের প্রেম উপভোগ না করিলে এই সৃষ্টির কোনো সার্থকতা মিলিবে না—তাঁহার উদ্দেশ্যও সফল হইবে না। তাই পরম প্রিয়তমের সঙ্গে চলিয়াছে মানুষের এই অনন্ত, চঞ্চল প্রেমলীলা।

মিলন অপেক্ষা কবি মিলনের উদ্দেশ্যে অভিসারের মধ্যে অধিক সার্থকতা ও তাৎপর্য দেখিয়াছেন। ভগবান চলিয়াছেন বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে, আর সেই ঘরছাড়ানো, পাগল-করা বাঁশীর সুর শুনিয়া মানুষ চলিয়াছে অভিসারে। এই চিরন্তন বিরহ-বেদনা বুকে লইয়া মানুষ চলিয়াছে তাহার দয়িতের জন্য প্রেমাভিসারে। বিরহের বেদনা, উৎকণ্ঠা ও অন্বেষণই পথ-চলাকে সুন্দর ও সার্থক করিয়াছে। এই প্রিয়তমের যে স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের মানস-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা অনির্দিষ্ট, রহস্যময়, চঞ্চল, ক্ষণ-অনুভূতির আলোকে মাত্র ছায়া-রেখায় ঈষৎ ব্যক্ত। এই অবারণ চলার স্রোতের দুই ধারে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যে, মানবের স্নেহ-প্রেম-প্রীতিতে, অন্তরের বিচিত্র অনুভূতিতে মানুষ সেই পরমপ্রিয়তমের ক্ষণিক স্পর্শ পাইতেছে। এই ক্ষণ-মিলনের ছায়ার মায়াই তাহার পথ-চলাকে মধুময় করিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ চির-যাত্রী, চির-পথিক হইতে চাহিয়াছেন। এই পথ-চলাতেই যে তাঁহার দয়িতের ক্ষণস্পর্শ মিলিবে। ভগবান তাঁহার অফুরন্ত সত্তাকে চলমান বিপুল সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্ত করিতে করিতে চলিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ এই অ-ধরাকে ধরিবার জন্য, এই অ-জানাকে জানিবার জন্য, তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছেন, আর এই ছুটার মধ্যেই কবি পরম আনন্দ ও চরম সার্থকতা অনুভব করিয়াছেন। ভগবানকে যদি একটা নির্দিষ্ট রূপ বা প্রতীক, বা স্থির প্রকাশের মধ্যে আবদ্ধ করা যায়, তবেই এই লুকোচুরি খেলার, এই অন্বেষণের আগ্রহ ও আনন্দের কোনো অর্থ থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে অজানা, অরূপ, চিরচঞ্চল বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। ইহা রবীন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্ট অনুভূতি—তাঁহার ভগবৎ-রসসম্ভোগের এক মনোহর রূপ। ভগবানের এই রূপের প্রকাশ হইয়াছে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র অনেক কবিতায়, 'বলাকা' ও তাহার পরবর্তী অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের কতকগুলি কবিতায়।

ভগবানের চতুর্থ রূপ মহামানব রূপ। সকল কালের সকল মানুষের ইতিহাস পরিব্যাপ্ত করিয়া যে নিরন্তর সৃজনশীল ভগবৎ-সত্তা একটা সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা, একটা মহান মঙ্গলের আদর্শে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, কবি তাহাকেই মহামানবরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহাকে তিনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানবও বলিয়াছেন।

প্রকৃতি, মানব ও ভগবানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর একটু আভাস দেওয়া গেল। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। এই ভগবৎ-

চেতনা বা এই অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, এই আধ্যাত্মিকতা তত্ত্বজ্ঞানী, যোগী বা সাধুসন্ন্যাসী সৃষ্টি করিতে পারে; কি করিয়া ইহা উৎকৃষ্ট কাব্যের অনুপ্রেরণা যোগাইতে পারে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মনে করা প্রয়োজন যে, কবির রাজ্য অনুভূতির রাজ্য—জ্ঞানের নয়, কর্মের নয়, ধর্মানুষ্ঠানের নয়। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কবি—বিরাট তাঁহার কাব্যপ্রতিভা; প্রচণ্ড তাঁহার রূপ-রসভোগের ক্ষুধা—তীব্র তাঁহার অনুভূতির প্রেরণা। ভগবানের এই বিশ্ব-সৃষ্টি, এই প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ, সৃষ্টির মধ্য দিয়া মানুষের সহিত এই লীলা, ইহা কবি অন্তরের অন্তস্থলে অনুভব করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির সামগ্রী। এই অনুভূতির আবেগ—এই আনন্দের গভীর উচ্ছ্বাস তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইয়াছে এবং সমস্ত কাব্যসৃষ্টির ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই অনুভূতিতে তাঁহার সাহিত্যে একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আসিয়াছে। তিনি যেন সমস্ত রূপরস-সৌন্দর্যের অফুরন্ত প্রস্রবণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে এক অপার্থিব সৌন্দর্যধারা বহাইয়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন—বিশ্বপ্রকৃতিতে চিরানন্দময়ের আনন্দ, চির-সুন্দরের সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাঁহার রূপের আলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাঁহারই সংগীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর বাজিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের পশ্চাতে রহিয়াছে চিরসুন্দরের অঙ্গদ্যুতি—অখণ্ড আদিরূপের আনন্দময় সত্তা মানবের দেহসৌন্দর্যের মধ্যেও রহিয়াছে অনন্ত সৌন্দর্যের বিকাশ। প্রকৃতি ও মানবের সমস্ত খণ্ড সৌন্দর্যের পশ্চাতে কবি অলৌকিক ও অখণ্ড সৌন্দর্য দেখিয়াছেন—কবির চোখে ক্ষুদ্র হইয়াছে বৃহৎ, সামান্য হইয়াছে অসামান্য, খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়াছে অখণ্ড, পরিপূর্ণ। কবির সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির ইহাই বৈশিষ্ট্য জগতের সৌন্দর্য ও প্রেম সার্থক হইয়াছে, প্রকৃত উপভোগ্য হইয়াছে, ইহার অলৌকিকত্বের জন্য, অনন্তত্বের জন্য। স্পষ্টভাবে তিনি বলিয়াছেন, "জীবের মধ্যে অনন্তকে উপলব্ধি করাই ভালোবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য।"

কবির সাহিত্যসৃষ্টিতে সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে ইহা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এর যুগে কবি যখন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি লেখেন, সেই সময়কার একটি ঘটনা তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—

"একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া……চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক-মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম

একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্য সর্বত্রই তরঙ্গিত।... আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।... আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত, তাহাদের গতিভঙ্গী, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল-সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখা অনুভব করিয়াছিলাম, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।...সামান্য কিছু কাজ করিবার সময় মানুষের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে যে গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটি সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণী-ব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য-নৃত্যের আভাস পাইতাম।”

‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ প্রকৃতপ্রস্তাবে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার নিদ্রাভঙ্গ। এই অনুভূতির মধ্যে দুইটি জিনিস লক্ষ্যের বিষয়। প্রথম, কবি অনুভব করিলেন যে, একটা অপরূপ মহিমা ও সৌন্দর্যের আলোকে বিশ্বের সমস্ত প্রাণী ও বস্তু উদ্ভাসিত—আনন্দের প্লাবনে প্লাবিত, এবং কবির হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত সেই আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। দ্বিতীয়, এই খণ্ড, বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য ও আনন্দের দৃশ্যগুলিকে সমষ্টিগত-ভাবে কবির উপলব্ধি। কবির পরবর্তী কাব্যজীবনে এই দুই অনুভূতিই তাঁহাকে কমবেশি সকল অবস্থার মধ্যেই পরিচালিত করিয়াছে। এই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনে কবি চিরকাল অপরূপ সৌন্দর্য ও অলৌকিক মহিমা অনুভব করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন, এবং সৃষ্টির সেই সৌন্দর্যকে কবি অখণ্ডভাবে, অবিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়াছেন। প্রকৃতি ও মানব-জীবনের যে সৌন্দর্য আমাদের সাধারণ চক্ষে পড়ে, তাহার পশ্চাতে এক অলৌকিক সৌন্দর্য আছে এবং সেই অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য, সৃষ্টির মধ্য দিয়া অজস্র ধারায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে—এই অনুভূতিই প্রথম হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সমস্ত জীবনব্যাপী নানারূপে ও ভঙ্গীতে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাই সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ, সীমা-অসীমের মিলন-রহস্য।

এই সীমা-অসীমের মিলন-রহস্য কবির হৃদয়-মন ও ভাব-কল্পনাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁহার কাব্যসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত

করিলেও, কবি একান্তভাবে জগৎ ও জীবনের রূপরস ভোগ করিয়াছেন, সীমাকে পরিহার করিতে পারেন নাই,—নানা রসের ক্ষুধা, নানা বৈচিত্র্যের ক্ষুধা, আত্ম-প্রকাশের বহুমুখী প্রেরণা তাঁহাকে আজীবন বিভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টির পথে পরিচালিত করিয়াছে। বাস্তবকে কবি মোটেই বাদ দেন নাই, তবে তাঁহার জীবনভোগ বাস্তববাদীদের নিতান্ত বাস্তবগত, খণ্ড ও ক্ষণিক ভোগ নয়। বাস্তবের খণ্ড ও ক্ষণিক রূপ-রসকে কবি অসীম আদর্শলোকে, ভাবলোকে উন্নীত করিয়া, তাহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া, মহত্তর ও বৃহত্তর ভূমিকায় ভোগ করিয়াছেন।

তরুণ-যৌবনে কবি অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার যৌবন-স্বপ্নে সারা বিশ্ব রঙীন হইয়া গিয়াছে। নারীর দেহ-সৌন্দর্য তাঁহাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে এবং প্রায় প্রতি অঙ্গের অপূর্ব চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। ভোগ-লালসা এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রবলভাবে ফুটিয়া উঠিলেও শেষে উহাদের মধ্যে, দেহের ঊর্ধ্বগত এক অপার্থিব সৌন্দর্যের বিকাশ হইয়াছে। স্তন 'জননী লক্ষ্মীর কমলাসনে' পরিণত হইয়াছে; বিবসনা নারীর দেহে তিনি দেখিয়াছেন,—'লাজহীন পবিত্রতা'; নারীর সহিত পূর্ণমিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়া বুঝিতেছেন,—'ঈশ্বর ছাড়া' এ 'মিলন' কোথাও সম্ভব নয়। এইরূপে তিনি দেহের মধ্য দিয়া দেহাতীত অবস্থায়, বাস্তবের মধ্য দিয়া ভাবলোকে উপনীত হইয়াছেন; অথচ এই দেহকে, বাস্তবকে, ইন্দ্রিয়জ ভোগকে উপেক্ষা করেন নাই। ইহাই জগৎ ও জীবনকে সীমা ও অসীমে, বাস্তব ও আদর্শে, খণ্ড ও অখণ্ডে, রূপ ও ভাবে ভোগ করা। ইহাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী।

এই দৃষ্টিভঙ্গী আসিয়াছে মূল অনুভূতি হইতে। সৃষ্টির মধ্য দিয়া যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত, যে সৌন্দর্যের বন্যায় বিশ্বভুবন প্লাবিত, সেই সৌন্দর্য-ধারায় স্নান করিয়া বিশ্ব-চরাচর কবির কাছে পরম রমণীয়। বিশ্ব-ভুবনের যেখানে যে সৌন্দর্য আছে, কবির নিকট তাহা মূল সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। খণ্ড ও ক্ষণিক সৌন্দর্য কবির একান্ত কাম্য, কারণ তাহার মধ্য দিয়াই তিনি মূল সৌন্দর্যের রসাস্বাদ করিতেছেন। নারীদেহের সৌন্দর্য কবির নিকট পরম রমণীয়; প্রত্যেক পুরুষের কাছেই তাহা একান্ত কাম্য। কবি তাহা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু একান্ত দেহগত ভোগে তিনি আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাববাদী, রোমান্টিক কবি-মানস নারীর দেহ-সৌন্দর্যকে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে; বাস্তব যৌন-আকর্ষণ একটা ভাবগত আকর্ষণে পরিণত হইয়াছে; খণ্ড ও ক্ষণিক অখণ্ড ও অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

প্রেমের অনুভূতিতেও রবীন্দ্রনাথের এই ভাবমূলক, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা

কে চালিত করিয়াছে। 'মানসী'তে কবি অনুভব করিয়াছেন যে, বাস্তবজগতের যে প্রেম, তাহাকে একান্তভাবে ভোগ করিতে গেলে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ ব্ধি হয় না। মানবীয় প্রেম অনন্ত প্রেমের সান্ত প্রকাশ মাত্র। অখণ্ড, অনন্ত ৱর অংশস্বরূপে উহাকে না দেখিয়া, কেবলমাত্র দেহ-মনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ক ভোগ করিতে গেলে অতৃপ্তিতে চিত্ত ভরিয়া যায়। দেহগত খণ্ড প্রেমে না তৃপ্তি নাই; উহা সংকীর্ণ, ক্ষণিক ও দুঃখদায়ক; ভোগাকাঙ্ক্ষা ও কামনা া ত্যাগ করিয়া প্রেমকে অখণ্ড ও অনন্তভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে যথার্থ বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায় না। প্রেম ও সৌন্দর্যকে পূর্ণভাবে, গুভাবেই পাইতে হইবে।

'রাজারাণী', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি নাট্যকাব্যেও এই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। কবি ভোগলালসাকে জয় করিয়া অখণ্ড সৌন্দর্য ও প্রেমের সন্ধান পাইয়াছেন। এই ঃ দেহাতীত সৌন্দর্য-চেতনা এক অপূর্ব রূপ পাইয়াছে 'সোনার তরী' ও 'য়। তারপর ক্রমে এই অখণ্ড, অনন্ত সৌন্দর্যের মূল উৎসের দিকে কবি হইয়াছেন—তাঁহার রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমে মিস্টিকে পরিণত হইয়াছে। জীবনব্যাপী কবি, যে-অখণ্ড, অনন্ত সৌন্দর্য, প্রকৃতি, মানবজীবন ও বিশ্ব- ণ্ডর রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিরন্তর বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহার নিবিড় অনুভূতি, নানা , নানা রসে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার Creative Unity—একটা ট সৌন্দর্যের ঐক্যানুভূতি। ইহাই তাঁহার বিশ্বানুভূতি বা সর্বানুভূতি—সমগ্র র আনন্দময়, সৌন্দর্যময় অনুভূতি—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'।

কবির প্রৌঢ় বয়সের একটি রচনায় বিশ্বব্যাপী এই আনন্দের অনুভূতি কী র্বচনীয় আবেগে, কী অপূর্ব-সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে,—

"আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। াশের পাণ্ডুর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত ত মৃদুশীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্যে অভিষিক্ত হইল। ার মন বলিতে লাগিল, 'এই তো তাঁহার প্রসাদ-সুধার প্রবাহ'।"

সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে, সেইদিন তাহার মধ্য হইতে একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া 'নহে, নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে—এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী ধারা'।

আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই যে অনির্বচনীয় মাধুর্য স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আছে কোন্‌খানে?

ইহা কি জলে। ইহা কি বাতাসে। এই ধারণার অতীতকে কে করিতে পারে।

ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ। ইহাই দেশে দেশে, কালে কালে, অগণ্য প্রা প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে, মন হরণ করিতেছে—ইহা আর কিছুতেই ফুরাইল ন ইহারই অমৃতস্পর্শে কত কবি কবিতা লিখিল, কত শিল্পী শিল্প রচনা করিল, জননীর হৃদয় স্নেহে গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠি সীমার বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত-ফোয়ারা কত লীলাতেই লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অন্ত দেখি না— দেখি না। তাহা আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য।

ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখ শেষ অর্থ নহে। এই-যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃ শুধুই রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাই তবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম। বস্তুকে দেখিলাম, সত্য দেখিলাম না।

আমার কি কেবলই চোখ আছে, কান আছে? আমার মধ্যে কি সত্য ন আনন্দ নাই? সেই আমার সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগে দিকে চাহিয়া দেখি তখনি দেখিতে পাই, সম্মুখে আমার এই তরঙ্গিত সমুদ্র— প্রবাহিত বায়ু—এই প্রসারিত আলোক—বস্তু নহে, ইহা সমস্তই আনন্দ, সম লীলা, ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাঁহারই মধ্যে আছে। তিনি এ কী দেখাইতেছে

আমি তাহার কী-ই বা জানি। এই আকাশপ্লাবী আনে সহস্র লক্ষ ধারা যেখানে এক মহাস্রোতে মিলিয়া আবার তাঁহারি এই হৃদয়ের ম ফিরিয়া যাইতেছে সেইখানে মুহূর্তকালের জন্য দাঁড়াইতে পারিলে এই সমস্ত-কি মহৎ অর্থ—ইহার পরম পরিণামটিকে দেখিতে পাইতাম। এই-যে অচিন্ত শক্তি, এই-যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই-যে অপরিসীম সত্য, এই-যে অপরি আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম তবে সে ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি। নহে, নহে, এই তো তাঁহার প্রসাদ, এই তাঁহার প্রকাশ, এই তো আমাকে স্পর্শ করিতেছে, আমাকে বেষ্টন করিতে আমার চৈতন্যের তারে তারে সুর বাজাইতেছে, আমাকে বাঁচাইতেছে, আমা জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমা পলে পলে যুগযুগান্তরে পরিপূর্ণ করিতেছে; শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেব আরো আরো আরো; তবু সেই এক, কেবলি এক, সেই আনন্দময় অমৃত

সেই অতল অকূল অখণ্ড নিস্তব্ধ নিঃশব্দ সুগম্ভীর এক—কিন্তু, কত ার ঢেউ, কত তাহার কলসংগীত।” [পথের সঞ্চয়, পৃঃ ৫৮-৬০]
রবীন্দ্র-কাব্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা াজন মনে করি,—

(ক) যুগপ্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ
(খ) রিয়ালিস্টিক সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ
(গ) রোমান্টিক সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ
(ঘ) রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতা ও গানের বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পমূল্য
(ঙ) রবীন্দ্রনাথের মানবতা ও বিশ্বসাহিত্যের মানবতা

(ক) সাধারণত দেখা যায় দেশ, জাতি ও কালের প্রভাব কোনো-না-কোনো- কবিমানস বা সাহিত্যিকমানস-গঠনে সহায়তা করে। যে দেশে কবি বা ত্যিক জন্মিয়াছেন, তাহার প্রাকৃতিক ও সহজাত প্রবণতা, যে জাতির মধ্যে া জন্মিয়াছেন, তাহার ভাবাদর্শ, ধর্ম-সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি-প্রথা, যে তিনি জন্মিয়াছেন, তাহার সাধারণ ভাবধারা, সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মানস-যন্ত্রে ঢালাই হইয়া যে রূপ গ্রহণ করে, তাহাই প্রধানত ব্যক্ত তাঁহার কাব্যে, সাহিত্যে। দেশ ও জাতির ভাবধারা, সংস্কার ও আদর্শ যখন বিশেষ কালোপযোগী রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের াষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়, তখনি আমরা সেই ভাবধারা, সংস্কার ও আদর্শের যুগ- প্রত্যক্ষ করি। এই যুগরূপের প্রভাব বা যুগপ্রভাব অনেক কবিই এড়াইয়া ত পারেন না। সেই সব কবিদের বলা হয় যুগ-প্রতিনিধি-কবি বা বি।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় দুইটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার হইয়াছিল। একটি মধুসূদন, অপরটি বঙ্কিমচন্দ্র। মধুসূদন পাশ্চাত্য সভ্যতা হিত্যের প্রভাবে জীবনে ও তাঁহার কাব্যে ছিলেন ঘোরতর বিদ্রোহী। পাশ্চাত্য বের স্রোতে তিনি বাঙালীর ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, আচার-ব্যবহার-সংস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে যখন তাঁহার অন্তর্জীবন ব্যক্ত হইল, র অবচেতন মন প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল যে প্রচলিত কাব্যসংস্কার চূর্ণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার জন্মগত ও জাতিগত সংস্কার একেবারে ত্যাগ ত পারেন নাই। যুগধর্মকে স্বীকার করিয়া পাশ্চাত্যভাবের দ্বারা বাংলা কাব্যের তনন্ রূপ দিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙালীর জাতিগত সংস্কার ও ভাবাদর্শকে

ভুলিতে পারেন নাই। যে 'মেঘনাদবধ' তাঁহার শ্রেষ্ঠ-কীর্তি, সেই কাব্যে পাশ কবিদের কতো প্রভাব,—প্রাচীন গ্রীক-রোমানের লম্বা 'টোগা' আর ইংরেজে কোট-প্যাণ্টে প্রায় সমাচ্ছন্ন। কিন্তু যখন সরমা সিঁদুরের কৌটা হাতে করিয়া আসি সীতাকে বলিল,—'এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ', তখনই বাঙালী-ব লালপেড়ে শাড়ি আর লাল শাঁখা বাহির হইয়া পড়িল। হিমালয়ের মতো বি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্বর্গমর্তবিজয়ী যে রাবণ, তাহার মণিমাণিক্যখচিত রাজবেশের হইতেও ভাগ্য-বিড়ম্বিত, শোক-তাপপ্রাপ্ত, স্নেহ-কোমল-হৃদয় একটি বাঙ ভদ্রলোকের ধুতি-চাদর ঈষৎ চোখে পড়ে। কবি বীররসের মহাকাব্য লিখিতে বা হৃদয়বান, ভাবপ্রবণ বাঙালীর করুণরসাত্মক মহাগীতিকাব্য লিখিয়াছেন বা মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রও ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপ্রভাবকে গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য সাহি ভাবধারা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা ও বাঙালীর আদর্শবা সহিত মিশাইয়া এক অভিনব সাহিত্যের বিরাট ঐশ্বর্য-সম্ভার বাঙালীর সম্মুখে করিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার লক্ষ্য ছিল—বাঙালীর ভাব-চিন্তা-ব রুচিকে বৃহত্তর করা, মহত্তর করা, বাঙালীর প্রাণকে নব অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কর নবতম সাহিত্য-চেতনা ও ভাব-সাধনায় তাহাকে নূতন স্বর্গে জন্মদান করা। ঊনবি শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজী সভ্যতার স্রোতে বাঙালী তাহার সমস্ত জাতীয় বৈশি ভুলিতে বসিয়াছিল—তাহার আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভাব-সাধনা হইতে সে বিচ্যুত হইয়াছিল। বঙ্কিম সেই আত্মবিস্মৃত জাতির বাংলার আত্মা ও তাহার ভাব-সাধনাকে উজ্জ্বল রঙে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন— সেই বিস্মৃত মূর্তি আবার দেখিতে পাইয়াছিল। তারপর বঙ্কিম ইংরেজী সাহিত প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম অবতারণা করিয়াছিলেন রোমান্সের। তাঁহার সীমাবদ্ধ, ক্ষীণকলেবর, নীরস সাহিত্যে বঙ্কিম আনিয়াছিলেন—কল্পনার অবাধ অসাধারণ ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিস্ময়কর সমাবেশ, অদম্য মানসিক কৌতূহ অন্তর্দৃষ্টির উজ্জ্বল আলোক। বাঙালী এক নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছিল- অদৃষ্টপূর্ব কল্পলোকের দ্বার তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। সে সমস্ত মন- দিয়া জাতীয় ভাব-মন্দাকিনীর ভগীরথকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। বাঙালী জা বৈশিষ্ট্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ও সম্ভ্রম ছিল অগাধ, বাঙালীর ধর্মে ছিল অসীম শ্র একটা অতি গভীর আবেগময় দেশাত্মবোধের স্বর্ণসূত্রে তিনি ধর্ম ও সমাজ বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। এই গভীর, বলিষ্ঠ দেশাত্মবোধই ছিল তাঁ সাহিত্য-প্রতিভার উৎস। এই দুই প্রতিভার সাহিত্য-সৃষ্টিতে বাঙালী

ভাব, চিন্তা, আদর্শ ও মানস-সংস্কারের একটা যুগোপযোগী রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে।

এক-একটা যুগে বাহিরের ঘটনা বা আভ্যন্তরীণ সামাজিক পরিস্থিতি জাতির চলমান ভাব, চিন্তা ও সংস্কারের ধারাকে এক-একটা নূতন বৈশিষ্ট্য দান করে। সেই যুগের কবিদের কাব্যে কম-বেশি সেই বৈশিষ্ট্যের রূপ ও চিহ্নগুলি প্রতিফলিত হয়। ইঁহারাই যুগ-প্রতিনিধি কবি। আমাদের বাংলা-সাহিত্যে আরো দুই-একজন কবিকে এইরূপ কবি বলা যায়। কবি মুকুন্দরাম দেবী-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে বসিয়াও মধ্যযুগের বাংলার রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা, বাঙালী-জীবনের রীতি-নীতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের একখানি নিখুঁত চিত্র দিয়াছেন তাঁহার কাব্যে। তারপর ভারতচন্দ্রের কাব্যেও তাঁহার সময়কার বাংলার নাগরিক জীবনের অতি স্থূল, আদিরসপঙ্কিল রুচি প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল'-এর মধ্যেও তৎকালীন বাঙালী-সমাজের একখানি চিত্র আমরা লক্ষ্য করি। ঘটকের মারফতে তখন বাঙালী-সমাজে বিবাহের ব্যবস্থা হইত। ঘটক ছিল অত্যন্ত চতুর ও বাক্‌পটু, এবং নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহার ব্যবসায় চালাইত। অনেক সময় পাত্রপক্ষ হইতে সে প্রচুর টাকা লইয়া অবাঞ্ছিত বরের বিবাহ ঘটাইত। সে রাতকে দিন করিতে পারিত—বৃদ্ধ, দরিদ্র, কানা, খোঁড়া বরকে সে কন্দর্প বা কুবের বলিয়া চালাইয়া দিত। এইরূপ ঘটক বা ঘটকীর প্রভাব বহুদিন বাঙালী-সমাজে চলিয়া আসিয়াছে। শিব-পার্বতীর বিবাহ-বর্ণনায় বৃদ্ধ, দরিদ্র বরের সহিত সুন্দরী তরুণীর বিবাহের ছবিই কবি আঁকিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যখন মেনকা

ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজভয়।
হাত নাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়॥
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলে চক্ষু খেয়ে॥

তখন কৌতুকের মধ্যেও ঘটকের বিবেকহীন দুষ্কার্যে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হতভাগিনী বাঙালী মেয়ের মাকেই আমরা মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই।

ইংরেজী সাহিত্যে আমরা চসার, পোপ ও টেনিসনকে এই জাতীয় যুগ-প্রতিনিধি কবি বলিতে পারি। চসারের কাব্যে ইয়োরোপের মধ্যযুগ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের একটা বড় অনুষ্ঠান সিভাল্‌রি। এই প্রেম, যুদ্ধ ও ধর্মের অদ্ভুত সমন্বয় একদিন ইয়োরোপের কল্পনা ও রুচিকে গ্রাস করিয়াছিল। চসারের কাব্যে তাহার চিহ্ন বর্তমান। চতুর্দশ শতাব্দীর ইংরেজ-জীবনের ছবি তাঁহার Canterbury Tales-এর ক্যামেরায় তোলা হইয়াছে। টেনিসনের কাব্যেও

ভিক্টোরীয়-যুগের সমাজ, রাষ্ট্র ও চিন্তাধারার একটা ছাপ পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত কল্পনার সমন্বয় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা অনুপ্রাণিত কবি-মানসের অভিব্যক্তি টেনিসন-কাব্যের পাঠকদিগের নিকট সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ভিন্নশ্রেণীর। বিশ্বমুখিতা ও সার্বজনীনতা তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। দেশ, জাতি ও যুগের উর্ধ্বে যে সার্বজনীন ভাব, যে বিশ্বজনীন আদর্শ, যে চিরন্তন নীতি ও শাশ্বত সত্য, তাহারই উপর রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত। দেশ-জাতি-কালের ঐতিহ্য ও সংস্কারকে তিনি ততখানি গ্রহণ করিয়াছেন, যতখানি তাঁহার সার্বজনীন আদর্শ ও নীতির সহিত মিলিতে পারে। বাংলাদেশ ও বাঙালীজাতির সংকীর্ণ ধর্মসংস্কার, যুক্তিহীন সমাজব্যবস্থার উপর রবীন্দ্রনাথের অন্ধভক্তি ছিল না। মনুষ্যত্বের সার্বজনীন মহান আদর্শ ও উচ্চ নীতির কষ্টিপাথরে তিনি দেশ ও জাতির ভাবাদর্শ ও সংস্কার-প্রথাকে বিচার করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি খণ্ডকে, বিচ্ছিন্নকে এড়াইয়া পরিপূর্ণতার দিকে, অখণ্ডের দিকে সর্বদাই অগ্রসর হইয়াছেন। কোনো একটা বিশিষ্ট দেশ, জাতি ও সংস্কার-নিরপেক্ষ যে চিরন্তন সত্য ও আদর্শ, তাহারই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহার কাব্য-প্রচেষ্টায়। যুগ-প্রভাব তাঁহার কবিচিত্তে আঘাত করিয়া অনুভূতি ও আবেগে রূপান্তরিত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে বটে কোনো-কোনো সময়ে, কিন্তু ঐ যুগ-সমস্যার মধ্যেই তাঁহার কাব্যসৃষ্টি নিঃশেষ হয় নাই, যুগের মধ্য দিয়া যুগাতীত অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে, যেখানে সর্বকালের সর্বমানবের সমস্যা রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে।

একদিন প্রথম স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ দেশ-মাতৃকার পাদপীঠে তাঁহার সমস্ত কাব্য-ধূপ পুড়াইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, শেষে তাঁহার কবিদৃষ্টি সংকীর্ণ জাতীয়তা ও শূন্যগর্ভ স্বাদেশিকতার উচ্ছ্বাসের উর্ধ্বে উঠিয়া জাতির অসংখ্য দুর্বলতার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে পথ তাঁহার পক্ষে জ্ঞান ও বিবেকানুমোদিত নয় বলিয়া শীঘ্রই তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভ করা অর্থে তখনকার দিনের নেতারা বুঝিয়াছিলেন, কোনোক্রমে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, অন্তরাত্মার সর্বপ্রকার বন্ধন ও দাসত্বমুক্তিই স্বাধীনতা। আমাদের আত্মশক্তির দ্বারা অন্তর-প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিয়া ত্যাগ, তপস্যা ও কর্মের দ্বারা দেশকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিলে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিব, দেশকে স্বদেশ বলিয়া ফিরিয়া পাইব। কেবল 'বয়কট' ও ইংরেজবিদ্বেষপ্রচারে স্বাধীনতা আসিবে না, রাজদরবারে 'আবেদন-নিবেদনের থালা বহন' করিলেও তাহা পাওয়া যাইবে না।

নির্ভর করে অন্তরের মুক্তির উপর—মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের উপর। ইহাই রবীন্দ্রনাথের মত।

"আমার দেশ আছে, এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু, যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্ম-শক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জেনে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেন যে, 'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এইজন্যই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।"

[সত্যের আহ্বান, কালান্তর, পৃঃ ১৯৩]

তারপর মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যখন আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত উদ্বেলিত, তখনো রবীন্দ্রনাথ এই রাজনৈতিক আন্দোলনকে বৃহত্তর আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিয়াছেন। গান্ধীজীকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসহযোগ ও চরকাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

"আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন ; সে কি এই চরকা চালনায়? চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকে ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি? আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাইনে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই, চোখ বুজে, মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে?

স্বরাজ-সাধন-যাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না?" [রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, কালান্তর, পৃঃ ৩৫০-৫১]

তারপর জীবন-অপরাহ্ণে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদ সময় সময় কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা দেশের রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, চিরন্তন গৌরব ও মহিমার অধিকারী মানব-অন্তরাত্মার নিপীড়ন ও তাহার সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথে বাধাসৃষ্টির জন্যই কবিচিত্তের আবেগ উৎসারিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের পৃথিবীব্যাপী যে অত্যাচার, পীড়ন, হত্যা, যুদ্ধ, ধ্বংস চলিতেছিল জীবন-সন্ধ্যায় কবি তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কতকগুলি কবিতায় তাহাদের চরম ধিক্কার দিয়াছেন; সেখানেও মানবাত্মার এই পীড়ন ও মানবের জ্ঞান ও কর্মের যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তাহারই ধ্বংসের জন্যই তাঁহার কবিচিত্তের আলোড়ন।

প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার কাব্যপ্রবাহ অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে একান্ত আত্মমনের ভাবকল্পনার লীলাতেই তিনি বিভোর হইয়া ছিলেন। তাঁহার পূর্বে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় কবিতা লিখিয়াছিলেন, তরুণ এক কবির পক্ষে পূর্বগামীদের এই ভাবাদর্শকে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক এবং লোভনীয়ও বটে। কিন্তু কিশোর-কবি তাঁহার অপরিণত রচনা 'কবি-কাহিনী'র মধ্যে খুব ঘটা করিয়া বিশ্বপ্রেমের কথা প্রচার করিয়াছেন। তারপর যখন সন্ধ্যা-সংগীতের যুগে তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন, তখন পূর্বেকার দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কেন্দ্রিক, বহির্মুখ বর্ণনাসমন্বিত কাব্য লেখা ছাড়িয়া দিয়া একেবারে আত্মগত ভাবানুভূতি-প্রকাশক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিকবিতা লিখিতে লাগিলেন। তখন হইতে তিনি নিজের মনের ভাবানুভূতির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাহারই নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস কাব্যাকারে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশ্য অন্তর্মুখী গীতিকবিদের ইহাই রীতি। তাঁহারা একেবারে আত্মমন-সর্বস্ব। 'সন্ধ্যা-সংগীত' হইতে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত কবি বহির্বিশ্বকে তাঁহার মনের পর্দায় প্রতিফলিত করিয়া দেখিয়াছেন, অপরিণত কবি-মানসের উচ্ছ্বাস-বাহুল্যে তাঁহার ভাবানুভূতির রসমূর্তি ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই। 'কড়ি ও কোমল'-এর শেষের দিক হইতে যুবক-কবির মনে একটা বাস্তব-চেতনা আসিয়াছে। যুবকের কাছে নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম তাহার অনিবার্য আকর্ষণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। 'মানসী' হইতে যখন তাঁহার কাব্য-প্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তখন এই বাস্তব সৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি ভাবলোকে উত্তীর্ণ করিয়াছেন, অলৌকিক রহস্যের আবরণে মণ্ডিত করিয়া উপভোগ করিয়াছেন। সমস্ত সৌন্দর্য ও প্রেমের অন্তরালে

একটা অখণ্ড সৌন্দর্য ও প্রেমের কল্পনা করিয়া তাহারই প্রতিচ্ছবি ভাবে জগতের সৌন্দর্য-প্রেমকে অনুভব করিয়াছেন। 'মানসী' হইতে 'চিত্রা' পর্যন্ত চলিয়াছে এই মানসিক অবস্থা। তারপর এই অখণ্ড প্রেম ও সৌন্দর্যের সত্তাকে বিশ্বসৃষ্টির মূল অনন্ত সৌন্দর্যময় ও প্রেমময় সত্তার সহিত মিশাইয়া দিয়া জগতের সমস্ত সৌন্দর্য ও প্রেমের মূল রহস্য উদ্ঘাটনে উহাদিগকে এক চিরন্তন, অনির্বচনীয় তাৎপর্য দান করিয়াছেন। জগৎ ও জীবনে সৌন্দর্য ও প্রেমের এই অনুভূতি চিরকাল তাঁহাকে চালিত করিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই অনুভূতি চলিয়াছে 'চৈতালী' হইতে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত। তারপর প্রকৃতি ও মানবজীবনে অভিব্যক্ত এই সৌন্দর্য-প্রেমের ভোগকে ত্যাগ করিয়া, সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত সৌন্দর্যময় ও প্রেমময় স্রষ্টার অনুভূতি ছাড়িয়া, স্রষ্টার প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথ ধরিয়াছেন—সেই অসীম সৌন্দর্যময় ও প্রেমময়ের সঙ্গে লীলায় মাতিয়াছেন কবি 'খেয়া' হইতে 'গীতালি' পর্যন্ত। তারপর 'বলাকা'য় আসিয়া কবি প্রকৃতি, মানব ও ভগবানের এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধের স্বরূপ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন ও সেই তত্ত্বোপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাব্যের সঙ্গে দর্শন ও তত্ত্ব আসিয়া মিশিয়াছে। তারপর বলাকা হইতে 'পরিশেষ'-এর মধ্য দিয়া 'বীথিকা'-'পত্রপুট' পর্যন্ত সৃষ্টির স্বরূপ ও রহস্য, মানবের অন্তর্নিহিত সত্তার রহস্য, অনিত্য প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে নিত্যের লীলা, নিজের জীবন-পর্যালোচন, তাঁহার ব্যক্তি-সত্তার স্বরূপ প্রভৃতি নানা দার্শনিক ভাব-চিন্তা ও রহস্য-ধ্যানের অপূর্ব সমারোহ হইয়াছে তাঁহার কাব্যে। তারপর, 'প্রান্তিক' হইতে তাঁহার ভাবজীবনে আর একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। শেষ-জীবনের কাব্যে এই গভীর দার্শনিক চিন্তা, এই অনিত্যের মধ্যে নিত্যের লীলার রহস্যানুভূতি এক অধ্যাত্ম-সত্যদর্শনে—আত্মোপলব্ধিতে, মানবাত্মার স্বরূপ-উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে। কবি এই শেষযুগে একেবারে অধ্যাত্ম-সত্য-দ্রষ্টা ঋষিতে পরিবর্তিত হইয়াছেন। ইহাই মোটামুটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যধারার ইতিহাস। ইহার মধ্যে যুগপ্রভাব বা যুগসমস্যা বা বাঙালী জাতির কোনো বৈশিষ্ট্য বা সংস্কার বা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় নাই। ইহা একান্তভাবে তাঁহার নিগূঢ় কবিমনের প্রতিচ্ছবি এবং ইহার অনুপ্রেরণা আসিয়াছে এক অপার্থিব সৌন্দর্যানুভূতি হইতে, এক বিশ্বজনীন সত্যের রহস্য-উপলব্ধি হইতে, এক সার্বজনীন চিন্তার ধ্যান হইতে। দেশজাতিকালকে অতিক্রম করিয়া তিনি বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির শাশ্বত সত্যের রসরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। বাংলার যুগ-সমস্যাকে মূর্ত না করিলেও বিশ্বমানব-সমস্যার রূপ তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে একসূত্রে গাঁথিয়া চিরন্তন সৌন্দর্যের অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন,

বাস্তবের শুষ্ক কঙ্কালে আদর্শের বিপুল জীবনবেগ সঞ্চার করিয়াছেন এবং সংসারের ধূলিজালের মধ্যে অক্ষয় স্বর্গ রচনা করিয়াছেন।

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠা হয়তো স্বাভাবিক যে কি করিয়া কবি অত সহজে দেশ-কালের প্রভাব ও জাতি-সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, বাস্তব-চেতনা, সমাজ-চেতনা প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠিয়া সার্বজনীন ভাবসাধনায়, বিশ্বজনীন আদর্শের অনুসরণে এবং অলৌকিক সৌন্দর্যধ্যানে নিমগ্ন হইলেন? মনে হয়, কবির জীবনে প্রথম হইতেই কতকগুলি প্রভাব পড়িয়া তাঁহাকে এমন স্বতন্ত্রধর্মী এবং আত্মগত ভাব ও অনুভূতি-সর্বস্ব করিয়াছে। প্রথম, ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন; দ্বিতীয়, সমাজমুক্ত পরিবারের প্রভাব; তৃতীয়, উপনিষদের শিক্ষালব্ধ অখণ্ড বিশ্ববোধ, অধ্যাত্ম-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-মহিমার জ্ঞান; চতুর্থ, বিহারীলালের কাব্যের প্রভাব; পঞ্চম, কবির গীতধর্মী প্রতিভা। ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাবই হয়—প্রচলিত সংস্কার-বহুল হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ। এই বিদ্রোহ অর্থে পূর্বসংস্কারের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ, চিরাচরিত সামাজিক ও ধর্মচেতনা হইতে আত্মনিষ্কাশণ। কবির মনোজগতে একটা আলোড়ন তাঁহাকে সংস্কারমুক্ত, উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী করিয়াছিল এবং নিরপেক্ষভাবে সত্যদর্শনের উপযোগী মনোবৃত্তি গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। পূর্ব হইতেই পিরালী ঠাকুর-পরিবার দেশের প্রচলিত সামাজিকতার আবেষ্টনী হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের একটা নিজস্ব কাল্‌চার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; তারপর দেবেন্দ্রনাথের নায়কতায় যখন সেখানে ব্রাহ্মধর্ম প্রবেশ করিল, তখন সেই স্বাতন্ত্র্য আরো দৃঢ় হইল। তারপর দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষায় ও সাহচর্যে, উপনিষদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আত্মার অনন্ত সম্ভাবনীয়তা ও স্বাধীনতা, জীবনের প্রথম হইতেই এমন দৃঢ়ভাবে কবি-চিত্তে মুদ্রিত হইল যে, পরবর্তী কালে দেশকালের সমস্ত সংস্কার বাধা-বন্ধন কাটাইয়া ব্যক্তি-চেতনার স্বাধীন, স্বতন্ত্র প্রকাশকেই তাঁহার কবি-কর্মের একমাত্র বিষয় করিলেন। তারপর বিহারীলালের কাব্যের প্রভাব ও তাঁহার আত্মমন-প্রধান লিরিক বা গীতধর্মী প্রতিভা এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অধিকতর পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

উল্লিখিত প্রভাবগুলি রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্রধর্মী কবি-মানস-গঠনে নিঃসন্দেহে সহায়তা করিয়াছে; কিন্তু সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রভাববর্জিত, জাতি-সমাজ-কালের সর্বপ্রকার সংস্কার-রীতি-বন্ধনহীন যে অনন্যসাধারণ স্বতন্ত্র কবিমানস রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করি, তাহার গঠনে সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করিয়াছে উপনিষদের মন্ত্র—ঋষির অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার বাণী। এ সম্বন্ধে একটা চমৎকার বিবৃতি দিয়াছেন কবি 'পত্রপুট'-এর পনেরো-সংখ্যক কবিতায়। এই দীর্ঘ

কবিতার স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিলেই আমার বক্তব্য সমর্থিত হইবে আশা করি। কবি তাঁহার নিজের জীবনে বালককাল হইতেই কী বোধ বা অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন এবং কাব্যে সারাজীবন কী প্রকাশ করিয়াছেন তাহার একটা বর্ণনা দিতেছেন। শিলাইদহের বাউল-সাধকদের লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন,—

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দির-দ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।

ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।......

দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।......

এমন করে দিন গেল ;
আজ আপন মনে ভাবি,—
কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।

শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয়নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন।

মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে,··

বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে,—
আলোর মন্ত্র।······

আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ ······

আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি
শুনেছি আমার রক্ত-চাঞ্চল্যে।
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে
জন্মপূর্বের কোন্ পুরাতন কালযাত্রা থেকে।

বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীম কালে
যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোক-তীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।
আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
এই জাগরণের আনন্দে

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
রীতিবন্ধনের বাহিরে আমার আত্মবিস্মৃত পূজা
কোথায় হোলো উৎসৃষ্ট জানতে পারিনি।
যখন বালক ছিলেম ছিল না কেউ সাথী,
দিন কেটেছে একা একা
চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে।
জন্মেছিলেম অনাচারের অনাদৃত সংসারে,
চিহ্ন-মোছা, প্রাচীরহারা।
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা,
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে, নাম-না-জানা।·····

দেখেছি দূরের থেকে
আমি ব্রাত্য, আমি পংক্তিহারা।
বিধান-বাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানে নি,
তাই আমার বন্ধহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথায়,...
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
......যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে......

তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক
অমৃতের অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা
দেশ-বিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।

তাকে বলেছি হাত জোড় করে,—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল কালের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।

হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।......
ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালোবাসার একটি ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।......
আমার ভালোবাসার আর এক ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারি অতল থেকে।

সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্ব দেহে মনে
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।......

দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে……
দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাট
ছায়ায় আলোয়।……

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হোলো
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

এই কবিতাটির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে—

প্রচলিত ধর্ম ও সমাজসংস্কারের বাহিরে অবস্থান করিয়া ছেলেবেলা হইতেই কবি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত মহান্ জ্যোতির্ময় পুরুষের সহিত অভিন্ন বলিয়া নিজেকে অনুভব করিয়াছেন; তারপর 'সত্যের পথিক', 'জ্যোতির সাধক' উপনিষদের ঋষিদের মন্ত্রের সাহায্যে সঙ্গীহারা মন্ত্রহীন কবি অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত মহান্ পুরুষকে দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন। তারপর নারীর আধারে জগৎ ও জীবনে অভিব্যক্ত সেই মহান্ আনন্দরূপকে, অমৃতরূপকে অনুভব করিয়াছেন। এই সব অনুভূতিই তাঁহার গানে ব্যক্ত হইয়াছে।

মূলে এই সব আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই আদ্যন্ত তাঁহার কাব্যের গানের বিষয়বস্তু। এগুলি একেবারে উপনিষদের শ্লোকের প্রতিধ্বনি।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষ সোঽহমস্মি॥

[ঈশোপনিষৎ, ১৫, ১৬]

স্বর্ণময় পাত্রের দ্বারা অর্থাৎ জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডলের দ্বারা সত্যের অর্থাৎ সত্যস্বরূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের মুখ অর্থাৎ মূল স্বরূপটি আবৃত আছে। হে

জগৎ-পরিপোষক সূর্য, তদাত্মভূত সত্যস্বরূপ আমার উপলব্ধির জন্য আপনি উহা অপসারিত করুন। হে পূষন্, হে একাকী বিচরণকারী, হে নিয়ন্তা, হে প্রজাপতি-তনয়, হে সূর্য, আপনি কিরণসমূহ সংবরণ করুন। আপনার যাহা অতি মনোহর এবং মঙ্গলময় রূপ তাহাই আমি আপনার কৃপায় দর্শন করিব। যিনি আদিত্য-মণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ আমি তাঁহা হইতে অভিন্ন।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

[শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮]

অজ্ঞানান্ধকারের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণস্বরূপ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে, কারণ পরমার্থ লাভের জন্য ইহা ভিন্ন আর কোনো উপায় নাই।

এই দুইটি শ্লোকের প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াও

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে। ইতি
যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ।
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।"

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

প্রভৃতি আনন্দময়ের, রসময়ের সৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্তিজ্ঞাপক অনেক শ্লোকের অপ্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে ইহার মধ্যে। ইহাই তাঁহার সীমার মধ্যে অসীমের লীলা।

সুতরাং উপনিষদের অনুভূতির ধারার সঙ্গে তাঁহার নিজস্ব অনুভূতি ও কল্পনা মিশাইয়া এবং একটা জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। কোনো প্রচলিত ধর্মসংস্কার বা সমাজ-রীতির ধার তিনি ধারেন নাই। এই 'ব্রাত্য', 'সংস্কারবর্জিত', 'মন্ত্রহীন', 'জাতিহারা' কবিমানস সাধারণের দুর্লঙ্ঘ্য স্বাতন্ত্র্য লইয়া নিজস্ব ভাবানুভূতির লীলারসে বিভোর হইয়া ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যুগ-কবি না হইলেও এক নব-যুগের স্রষ্টা। সুদীর্ঘ কালের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়া তাঁহার ভাব, রস, রুচি, ভঙ্গী ও বাক্যরীতি সমস্ত শিক্ষিত বাঙালীর উপর প্রভাব বিস্তার করায় তাহাদের মন ও হৃদয় নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বের তুলনায় তাহারা এক নূতন যুগে বাস করিতেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্য

দিয়া বাঙালীর চিন্তা-জগৎ বহু প্রসারিত হইয়াছে, ভাব-প্রকাশের বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতা আসিয়াছে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা গিয়াছে এবং মানব-চিত্তের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বাণী প্রচারিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোকে এই জড়জগৎ ও মানবজীবনকে আমরা নূতন করিয়া চিনিয়াছি, আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাধারায় এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিয়াছি, আমাদের রসবোধের আদর্শ ও সাহিত্যিক রুচি উন্নত ও পরিমার্জিত হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে ও বাঙালীর মানসলোকে তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রথম আনিয়াছেন—সর্বকালীন মানবসত্যের রূপ, বৃহৎ ভাব ও আদর্শের অনুপ্রেরণা, মনুষ্যত্বপূজার মনোবৃত্তি ও অপরূপ সৌন্দর্যধ্যান। তাঁহাকে ঘিরিয়া কাব্য, সংগীত, চিত্র, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি চারু-শিল্পের এক নূতন ধারা দেশের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের আচার-ব্যবহারে, আলাপ-আলোচনায়, বসন-ভূষণে, গৃহে, সভা-বৈঠকে, সর্বত্রই যেন একটা নূতন সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য আসিয়াছে। এ যুগ প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথের যুগ।

তবে একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, এই যুগ-স্রষ্টার অমর-দান শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি বাঙালীর নিকট মহামূল্য রত্ন বলিয়া গৃহীত হইলেও, সাধারণ বাঙালী পাঠকের উপর খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সাধারণ বাঙালী পাঠকের চিত্তশতদলের উপর কবির কাব্যলোক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, রবীন্দ্র-কাব্যে সৌন্দর্যের যে অপরূপ প্রকাশ, রসের যে অতি সূক্ষ্ম পরিবেষণ, ভাবের যে অতীন্দ্রিয় বিলাস আছে, তাহা সর্বসাধারণের বোধ ও অনুভবশক্তির ঊর্ধ্বে। রবীন্দ্র-কাব্যে রসের একটা আভিজাত্য আছে, তাহা গণ-মনের জন্য নহে। রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনায় এ কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। সাধারণ পাঠকের তিনি নাগালের বাহিরে। এই সুবিশাল, সমুন্নত কল্পনা, বিপুল আবেগ, অজস্র অলঙ্কারময়, অপূর্ব ভাষা, উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি, দার্শনিক চিন্তা, এই রহস্যময় অতীন্দ্রিয় আবহাওয়া—গণ-চিত্ত ইহার কখনই সমঝ্‌দার নয়। তবে সাধারণ পাঠক রবীন্দ্র-কাব্য ভালোরূপ বুঝুক আর না বুঝুক, যে শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি সম্প্রদায় বর্তমান বাংলার ভাব, চিন্তা ও কর্মের নায়ক, যাঁহাদের অন্তরে শিক্ষা ও কলানুরাগের ফলে প্রকৃত রসবোধ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের দানের প্রকৃত মর্যাদা বুঝেন; তাঁহাদের নিকট রবীন্দ্রনাথই বাংলার নবযুগের স্রষ্টা—বাঙালীর মানসপিতা ও তাহার রসপিপাসার অনন্ত নির্ঝর।

(খ) সাহিত্যপ্রসঙ্গে যে রিয়ালিজম্ কথাটা আমরা শুনিতে পাই তাহার জন্ম ইয়োরোপে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে। রিয়ালিস্ট সাহিত্যিকগণের মতে মানুষের জীবনে আদর্শ ও কল্পনার কোনো প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন বাস্তবের সত্যে।

াহিত্যের রসসৃষ্টি এই বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হইবে। জীবনে ী ও সৌন্দর্যের অভাব তো আমরা প্রতি-পদেই দেখিতেছি। তাহাকেই রূপ না দিয়া কাল্পনিক সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করিলে, সাহিত্য তো মানবজীবনকে প্রতিবিম্বিত করিবে না। সুতরাং কাল্পনিক সৌন্দর্যসৃষ্টি প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি নয়। ত্য সুন্দর নাও হইতে পারে, সুতরাং সত্যকে সুন্দর করিয়া প্রকাশের কোনো প্রয়োজন নাই। বাস্তবের যে কঠিনরূপ, যে সমস্যা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত, তাহাকে এড়াইয়া না গিয়া তাহার প্রকাশই সাহিত্যের পক্ষে স্বাভাবিক।

আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই রিয়ালিজম্ আজ জুড়িয়া বসিয়াছে। উপন্যাসে, নাটকে, কাব্যে এই বাস্তব সত্যপ্রকাশের আয়োজন চলিয়াছে। ইহার তকগুলি কারণও বর্তমান। স্থান-বিশেষের রাষ্ট্রীয় বিধিতে অগণিত জনসাধারণ নপীড়িত—তাহাদের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর দিয়া নিষ্পেষণের উদ্ধত রথ ছুটিয়া চলিয়াছে। সমাজ, ভণ্ডামি ও কৃত্রিমতায় ছাইয়া গিয়াছে। নিত্য নব নব মস্যা সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মুখীন হইতেছে—তাহার সমাধান মিলিতেছে না। নিত্য-ূতন অর্থ-নৈতিক সমস্যায় মানুষ আকুল। উচ্চ আদর্শ, বৃহৎ ভাব, নীতির প্রতি াস্থা বা চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতি মানুষের যেন একটা সন্দেহ-পরায়ণতা, একটা বতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষের চিন্তাধারাকে প্রবল আলোড়ন করিতেছে। সর্বোপরি রাশিয়ার সাম্যনীতি ও ফ্রয়েডের সাইকো-ন্যালিসিস ইয়োরোপের ভাব ও চিন্তাজগতে একটা প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ই ঘটনাসমূহ ও আবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্যিকগণ বর্ধিত হওয়ায়, ইহারা তাঁহাদের নে যে রেখাপাত করিয়াছে, তাহারই প্রকাশ হইয়াছে তাঁহাদের সাহিত্যে। তাই এইসব সাহিত্যে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের াস্তব সমস্যাগুলি রূপগ্রহণ করিয়াছে।

ইব্‌সেন কোনো প্রচলিত আদর্শ মানিতে চাহেন নাই। যাহাকে সমাজে ও ানবজীবনে আমরা মহান ও সুন্দর বলি, তাহার মধ্যে কোনো প্রকৃত মহত্ত্ব বা সৌন্দর্য নাই—ইহাই তাঁহার সাহিত্যিক মানসের দৃষ্টিভঙ্গী। এইসব প্রচলিত ধারণা, তাঁহার মতে অন্তঃসারশূন্য উচ্চ আদর্শের মুখোস পরিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে। তাঁহার A Doll's House-এ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের অন্তরালে যে কোনো প্রকৃত বন্ধন নাই—পদে পদে স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব উপেক্ষিত, মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত—পুত্র-কন্যা ইয়া সমস্ত সংসার জুড়িয়া থাকিলেও সেখানে তাহার প্রকৃত স্থান নাই—ইহাই লিতে চাহিয়াছেন। তাহার Ghosts নাটকে দেখাইয়াছেন যে, কি করিয়া পিতার াপ ভয়াবহ মূর্তিতে সন্তানকে আক্রমণ করে ও কি করিয়া সন্তান পিতার পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করে। সত্য ও স্বাধীনতাই সমাজের একমাত্র স্তম্ভ--কোনো সমাজপতি, আইন-কানুন বা বিধিনিষেধ নয়—ইহাই তাঁহার Pillars of Societyর প্রতিপাদ্য বিষয়। এইরূপ প্রায় প্রত্যেক নাটকেই কোনো-না-কোনো প্রচলিত ধারণার অন্তর্নিহিত মিথ্যারূপ তিনি আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বার্নার্ড শ তো স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনি জনসাধারণকে তাহাদের প্রচলিত নৈতিক বিশ্বাস সম্বন্ধে পুনর্বিচার করিতে বাধ্য করাইবার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ করিতেছেন ও সেই জন্যই তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

"My reputation has been gained by my persistent struggle to force the public to reconsider its morals."

সমাজ ও মানুষের যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, রাষ্ট্র, সমাজ ও নীতির সহিত মানুষের যে সংঘর্ষ—তাহারই সমস্যা বার্নার্ড শ'র সাহিত্যসৃষ্টিতে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে। এমন কি তিনি বলিয়াছেন যে, এই সমস্যার প্রকাশই নাটকের একমাত্র কার্য।

"Only in the problem play there is any real drama, because drama is no setting up of the camera to nature; it is the presentation in parable of the conflict between man's will and his environment —in a word of problem." (Preface, Mrs. Warren's Profession)

বর্তমানে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অধিকাংশ নাটকই সমস্যামূলক—নাট্যকারদের প্রচারকার্যের সহায়ক। বার্নার্ড শ প্রচলিত নীতি ও সামাজিক আইন-কানুনের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। জনসাধারণ যে প্রচলিত উচ্চ আদর্শ ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা চালিত হয়, তাহা যে তাহাদের মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়—ইহা তিনি নির্মমভাবে দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের সহিত জীবনের পূর্ণ-মিলন হওয়া উচিত, সুতরাং সাহিত্য, যুগের সমস্ত সমস্যাকে প্রতিফলিত করিবে—ইহাই তাহার একমাত্র কাজ। Arms and the Man নাটকে বার্নার্ড শ বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য কোনো গৌরব বা গর্ব অনুভব করার কোনো হেতু নাই,—যুগে যুগে মানুষ বীরত্বকে বৃথা পূজা করিয়া আসিয়াছে—যুদ্ধ একটা নিদারুণ প্রয়োজনমাত্র—উহার মধ্যে প্রকৃত গৌরবের কিছুই নাই। কেবল মানুষ, কল্পনায় উহার কৌশল ও সাহসকে উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করিয়া, বীরত্ব নাম দিয়া, বৃথা পূজা করিয়া আসিয়াছে। Candida নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রেম একটা অর্থহীন মূঢ় আবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। Mrs. Warren's Profession-এ তিনি দেখাইয়াছেন যে, অর্থের প্রয়োজনই

দহ-বিক্রয়ের একমাত্র কারণ। যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নারী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন রে না— করে অর্থোপার্জনের জন্য। সমাজের পতিতা-সমস্যা একটা অর্থনৈতিক মস্যামাত্র। Widowers' Houses নাটকে বার্নার্ড শ বলিতে চাহিয়াছেন যে, রিদ্র সমাজে সর্বত্র নির্যাতিত। সমাজে যাহারা ভদ্রভাবে জীবনযাপন করিতেছে, াহারা দরিদ্রকে পীড়ন করিয়া, দরিদ্রকে গ্লানি ও কদর্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, াহার অসংখ্য দুর্গতির বিনিময়ে ভদ্রতার ঠাট বজায় রাখিতেছে। Man and uperman নাটকে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, 'প্রেম' 'রোমান্স' প্রভৃতি থার নারীজীবনে কোনো মূল্য নাই। প্রেমের সার্থকতা, প্রজননের সার্থকতায়। চ্চতর জাতির জন্মের জন্য নারী উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষে আসক্ত হয়, এবং য কোনো প্রকারেই হোক, তাহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করে। যৌন আকর্ষণের ূল, উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কিছু নয়। Life-force যখন নারীর ধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন সে প্রজননের জন্যই পুরুষকে আঁকড়াইয়া ধরে। ইহাদের াড়া এমিল জোলা, মাক্সিম গোর্কি, টমাস ম্যান, অপ্‌টন সিনক্লেয়ার, ব্রিয়োঁ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের রচনাতেও মানবজীবনের নির্মম সত্যকে, তাহার নি ও কদর্যতাকে, তাহার অসংখ্য স্খলন-পতন-ত্রুটিকে অকপটে প্রকাশ করা ইয়াছে।

আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে রিয়ালিজমের ইহাই স্বরূপ। সমাজ ও মানব-নের অসংখ্য দুর্বলতার নগ্ন প্রকাশ, চির-প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অন্তর্নিহিত মথ্যা উদ্ঘাটন, মানবজীবন, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় সমস্যার আলোচনাই রিয়ালিস্টিক সাহিত্য জুড়িয়া বসিয়া আছে। উচ্চ আদর্শ বলিয়া কোনো বস্তু , বৃহৎ ভাব একটা মানসিক দুর্বলতামাত্র। সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টিতে হৃদয়কে অগ্রাহ্য রিয়া বুদ্ধির প্রভুত্ব বিস্তারের আয়োজন। এখানে মানবজীবনের অন্ধকার অংশের পর হইতে যবনিকা উঠাইয়া তাহার কদর্যতা দেখাইবার প্রয়াস—সত্যকে প্রাধান্য দিয়া সুন্দরকে বিসর্জন দেওয়ার উন্মত্ততা। এই সাহিত্যসৃষ্টিতে সৌন্দর্য নাই, রিপূর্ণতা নাই, আনন্দ নাই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মূল-প্রেরণা এক অখণ্ড অদ্বৈতের উপলব্ধির আনন্দে, থিবীর অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধে ও জীবনের তুচ্ছতা, খণ্ডতা, ক্ষুদ্রতা নগণ্য বস্তুজালের ঊর্ধ্বে এক অখণ্ড পরিপূর্ণতার অনুভূতিতে। Creative Unity, adhana প্রভৃতি গ্রন্থে ও সাহিত্যবিষয়ক বহু প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, নিখিল যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তাহা এক মহান সত্যের আনন্দময় প্রকাশ। এই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই সাহিত্যের

লক্ষ্য। ইহাই রসসৃষ্টির মূল ও সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রাণ। ভাষায় সেই আনন্দ ব্যক্ত হইলে হয় সাহিত্য—ধ্বনিতে সঙ্গীত—বর্ণে চিত্রকলা। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি এই মতবাদের ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সাহিত্যই এই মতবাদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি এই ঐক্য, এই আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া পৃথিবী ও মানবজীবনের অসংখ্য, বিভিন্ন বিকাশের মধ্যে কোনো খণ্ডতা, কোনো বিচ্ছেদ খুঁজিয়া পান নাই। উহা একই সত্য, একই আনন্দের বিভিন্ন রূপ। সুতরাং, যাহা তুচ্ছ, নগণ্য, তাহার মধ্যে তিনি বিরাটের চিহ্ন পাইয়াছেন—ভূমার স্পর্শ লাভ করিয়াছেন; যাহা ক্ষণিক, তাহার মধ্যে তিনি অনন্তের সন্ধান পাইয়াছেন; যাহা খণ্ড, সীমাবদ্ধ তাহার অন্তরালে দেখিয়াছেন অখণ্ড, অসীমের মূর্তি। তাই ক্ষুদ্র-বিরাট, ক্ষণিক-চিরন্তন, খণ্ড-অখণ্ড, সসীম-অসীম পাশাপাশি তাঁহার সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। পৃথিবীর এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মেলায় তিনি মাতাল হইয়া রসপান করিয়াছেন, মানবজীবনের অতি-ক্ষুদ্র আনন্দ-বেদনাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, কিন্তু এই সমস্ত প্রকাশই যে এক বিরাট আনন্দময় সত্তার অভিব্যক্তি, এই খণ্ডরূপ যে অসীম চিরন্তনেরই রূপ, তাহা তিনি ভুলেন নাই। দুঃখ, বেদনা, পাপ, দৈন্য, গ্লানি প্রভৃতির কোনো সত্যকার অস্তিত্ব নাই; জীবনে ইহাদের প্রকাশ শাশ্বত সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিতে। সত্য-শিব-সুন্দরের যে লীলা এই বিশ্বে, দুঃখ-মৃত্যু-পাপ-শোক প্রভৃতি সেই লীলারই অঙ্গমাত্র—একই প্রকাশের বিভিন্ন রূপ। সেই এক হইতে যখন আমরা উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া দেখি, বৃহৎ হইতে পৃথক করিয়া একান্ত করিয়া অনুভব করি, তখনই উহারা আমাদের নিকট দুঃখ-শোকাদি রূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের কোনো সত্তা নাই। প্রকৃত উপলব্ধির অভাবে—মোহের বশে, আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি। তাঁহার সাহিত্যে দুঃখ, মৃত্যু, শোক প্রভৃতির চিত্র আছে বটে, কিন্তু তাহারা মানুষের জীবনে যথার্থরূপে আবির্ভূত হয় নাই,—কোনো বৃহত্তম সার্থকতার জন্য, কোনো মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের প্রকৃত তত্ত্ব জানিলে, দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়া মনে হইবে না—মৃত্যুকে মহাজীবনের সেতু বলিয়া ধারণা হইবে। রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে পরিপূর্ণতার কবি—অখণ্ড আনন্দের কবি—অনন্ত সৌন্দর্যের কবি।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন সাহিত্যসৃষ্টি আমরা দেখিতে পাই যেখানে জীবনের বহু স্খলন-পতন-ত্রুটি, বহু ক্ষুদ্রতা, ব্যর্থতা, সংকীর্ণতা তাহাদের প্রকৃত রূপ লইয়া বর্তমান আছে; তাহাদের মধ্যে কোনো ঐক্যের চিহ্ন নাই—কোনো সার্বভৌম সত্যের আনন্দ তাহাদের অন্তরালে বিরাজ করে না। সেগুলি কেবল দুঃখেরই কাহিনী, গ্লানিরই ইতিহাস, কদর্যতারই চিত্র। আনন্দ যদি কিছু তাহাদে

থাকে, তাহা ক্ষণিক,—সৌন্দর্য যদি কোথাও ফুটিয়া উঠে, তাহা খণ্ড, সীমাবদ্ধ। প্রচলিত সমাজরীতি-নীতির আদর্শ ও পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার সহিত মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের যে রূপ সে সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের রূপ—মানবজীবনের চিরন্তন ট্র্যাজেডির মূর্তি। আনন্দই যে সত্য, দুঃখ যে কেবল দৃষ্টিভ্রম মাত্র—এই ধারণার কোনো ভিত্তিই এসব সাহিত্যসৃষ্টির মূলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে কি এই প্রকার সাহিত্যের কোনো মূল্য নাই? ইব্‌সেন, ম্যাক্সিম গোর্কি, বার্নার্ড শ, গল্‌সওয়ার্দি প্রভৃতির সাহিত্যসৃষ্টি কি প্রকৃত সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে না? উহা কি ব্যর্থ? নরনারীর আদিম প্রবৃত্তির প্রেরণার সহিত সমাজ, ধর্ম বা নীতির যে সঙ্ঘর্ষ, নরনারীর সম্বন্ধের যে প্রকৃত রূপ,—ব্যক্তিত্ব, সমাজ এবং নীতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, যে জটিল সমস্যা, এই সব সাহিত্যিকদের সাহিত্য-মানসকে আলোড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের সাহিত্যে তাহারই প্রকাশ একটা সত্যের রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সত্যের আলোকে আমাদের মানবজীবন ও সমাজ-জীবনকে যাচাই করিলে, উহাদের মধ্যে অনেক কিছু পাওয়া যায়, যাহা সকল মানব ও সকল সমাজের পক্ষে চিরন্তন। প্রভূত আশায় নিষ্ফলতা, আদর্শ-ভঙ্গের তীব্র নৈরাশ্য, জীবনসংগ্রামে শোচনীয় পরাজয়, ঈর্ষা, হিংসা ও বর্বরতা, সমাজ, ধর্ম ও নীতি দ্বারা ব্যক্তিত্বের নিপীড়ন প্রভৃতি যে অহরহ আমাদের জীবনে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিতেছে, তাহা তো অসত্য বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরণ এই ট্র্যাজেডি জীবনকে দগ্ধ করিতেছে—বেদনা, তিক্ততা ও নৈরাশ্যের উষ্ণ বাষ্পে জীবনের দিক্‌চক্রবাল নিরন্তর আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এখানে বিন্দুমাত্র আনন্দ নাই—দুঃখেই এ জীবনের আরম্ভ—দুঃখেই পরিসমাপ্তি। সাহিত্য মানবমনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ও সমাজমনের মুকুর। ইহার উৎপত্তি মানুষের মনে, গতিও মানুষের মনের দিকে, এবং ইহার সার্থকতাও মানুষের মন হরণ করিয়া। মানবজীবন, সমাজ, ও কাল এ সব সাহিত্যিকদের মনে যে সমস্যার জাল বুনিয়াছে, যে অনুভূতির উদ্রেক করিয়াছে, তাহারই প্রকাশ হইয়াছে তাঁহাদের সাহিত্যে। এই সাহিত্য যে আমাদের মনোহরণ করে—ইহার আলোকে আমরা আমাদের অন্তর্গূঢ় বেদনার পরিচয় পাই—ইঁহাদের সৃষ্ট নরনারীর সহিত যে জীবনে আমাদের বহুবার পরিচয় হয়—তাঁহাদের এই সাহিত্য-দর্পণে আমাদের আত্মদর্শন হয়। আজ বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে দাঁড়াইয়া, ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শকে অনেকখানি গ্রহণ করিয়া এই সাহিত্যকে অসত্য বা অস্বাভাবিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বা বিকৃত মনোবৃত্তির ফল বলা তো সহজ নয়। ঐক্যানুভূতি, আনন্দানুভূতি এখানে না থাকিলেও এই শক্তিশালী সাহিত্যসৃষ্টিকে যে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না।

এই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যে সংসার ও মানবজীবনের এই যে রূপ আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ কবিদৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। নিরবচ্ছিন্ন খণ্ডতা, ক্ষুদ্রতা, দুঃখ, গ্লানি ও নৈরাশ্য, এই আশাবাদী, সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ সাধক ও ভগবদ্বিশ্বাসী কবির সাহিত্য-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। বংশানুক্রম, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকও এই প্রকার কবিমানস-গঠনে অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। শিক্ষা, কলানুরাগ, মার্জিতরুচি ও আভিজাত্যে যে পরিবার একদিন বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, সেই পরিবারে তাঁহার জন্ম, একরূপ মাতৃস্তন্যের সহিতই তিনি উপনিষদের স্তন্যে লালিত; সঙ্গীতের অনির্বচনীয় চমৎকারিত্ব শৈশব হইতেই তাঁহার প্রাণের গভীরতলে প্রবেশ করিয়াছে; সংযম, সৌন্দর্যচর্চা, শালীনতা ও আনন্দের আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহার শৈশব ও প্রথম যৌবন অতিবাহিত হওয়ায়, কবি-প্রতিভা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মর্মকোষে জীবনের সমস্ত মধু সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সর্বোপরি তাঁহার কবিমানস পূর্ণমাত্রায় রোমান্টিক ও মিস্টিক। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে লালিত হওয়ায় এবং রোমান্টিক ও মিস্টিক মানসিকতা-সম্পন্ন হওয়ায় বাস্তবের নগ্ন মূর্তির রূঢ়তা ও খণ্ডতার প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণাই স্বাভাবিক। এই খণ্ডতা, রূঢ়তা ও গ্লানিই যে একমাত্র সত্যের রূপ ধরিয়া জীবনকে গ্রাস করিয়া আছে, তাহা কোনোদিনই তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয় নাই। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের মূলে বাসা বাঁধিয়াছে উপনিষদের ঋষির বিশ্বাস—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'—যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ; 'রসো বৈ সঃ। রসোহ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি'—তিনিই রস—এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়। কবিত্ব-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রূপজগৎ উপভোগের ক্ষুধা তাঁহার মধ্যে প্রবল ভাবে জাগিয়াছে ও রূপজগতের খণ্ড-সৌন্দর্য তাঁহার কাব্যে শতধারে উৎসারিত হইয়াছে। তাহার সহিত, এই রূপজগতের যে প্রকাশ, তাহা যে সেই আনন্দরূপ, অমৃতরূপের প্রকাশ—সংসারের অসংখ্য আধারে যে রস পরিবেশিত, তাহা যে রসস্বরূপেরই রস—এ অনুভূতিও তাঁহার কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই রূপের মধ্যে অরূপের বিকাশ, সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হইয়াছে তাঁহার সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্রগত বৈশিষ্ট্য। অথচ এই দুই জগৎকেই তিনি সমানভাবে উপভোগ করিয়াছেন।

এই যে মানুষের জীবনযাত্রা সুরু হইয়াছে, এই যাত্রাপথে দুঃখ, নৈরাশ্য, দৈন্য, গ্লানির শত শত কণ্টক ঊর্ধ্বমুখ হইয়া আছে। এ কণ্টক তো জীবনের মূল হইতে গজাইয়াছে—ইহাকে তুলিয়া ফেলিবার উপায় নাই। ইহাকে এড়াইবার ভাগ্যই বা কয়জনের হয়। রক্তরঞ্জিত চরণেই মানুষের জীবন-যাত্রা। অথচ এই যাত্রাই জীবন।

ইহাই সৃষ্টিধারা। জগৎ-সৃষ্টির কোন্ আদিম প্রভাত হইতে এই যাত্রার পর্ব আরম্ভ হইয়াছে, কবে ইহার শেষ হইবে কেহ জানে না। এক মহান শক্তির নিঃশব্দ ইঙ্গিতে এই যাত্রা চলিয়াছে। ইহা কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের অঙ্গ। ইহার সমস্ত গ্লানি ও বেদনাকে কোনো মহত্তর আদর্শের সফলতার জন্য—কোনো অপূর্ব সার্থকতার জন্য বহন করিতে হইতেছে। এই গ্লানি ও বেদনায় যাত্রা হয়তো বিষময় হইতে পারে, তবুও ইহা চলার পথের ইতিহাস মাত্র। এইভাবে গ্রহণের মধ্যেই ইহার প্রকৃত তাৎপর্য। যাত্রী বা গন্তব্যস্থানের সহিত ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই। কণ্টক, যাত্রার আনন্দকে কিছু ব্যাহত করিলেও ধ্বংস করিতে পারে না। বরং আনন্দের অনুভূতিকে আরও তীব্র করে এবং দুঃখের বৈচিত্র্যে আনন্দেরও বৈচিত্র্য বর্ধিত হয়। বেদনা, গ্লানি, ধ্বংস, মৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবনপথযাত্রী চলিয়াছে অনন্তের অভিসারে। খণ্ডতা, দুঃখ, গ্লানিও সত্য—আনন্দও সত্য ; প্রভেদ—একটি ক্ষণিক, অপরটি চিরন্তন। ক্ষণিককে চিরন্তন আবৃত করিয়া আছে। ক্ষণিক সত্যের বিকাশ শাশ্বত সত্যের অঙ্গীভূত হইয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া আছে—সুতরাং ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহাই মোটামুটি জীবনের অন্ধকার-অংশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি।

রিয়ালিস্টিক সাহিত্যসৃষ্টিতে খণ্ড-সত্যের তীব্র অনুভূতি, আশ্চর্য শক্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের দুঃখ, নৈরাশ্য, জ্বালা ও গ্লানির যে অনুভূতি, তাহা সর্বকালের সর্বমানুষেরই অনুভূতি। উহার প্রকাশের মধ্যে কোনো অসত্য নাই। প্রকাশ যদি কলাসঙ্গত হয়, তবে সত্যের যে একটা নিজস্ব রস আছে, তাহাতে সে মনোহর। আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি বলিয়া তাহা চিরকালই আমাদের হৃদয় জয় করিবে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এই খণ্ড-সত্যের রূপটির দিকে আকৃষ্ট হয় নাই এবং তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি ইহার একান্ত প্রকাশকে অবলম্বন করে নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রকৃত ট্র্যাজেডির কোনো স্থান নাই। মানুষের জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়া যে মহাসত্যের বিকাশ হইয়াছে, সেই বিকাশের পথে দুঃখ বা কদর্যতা একটা অবস্থা মাত্র—উহার নিজস্ব অঙ্গ নহে। এইটুকুই আমার মনে হয় রিয়ালিস্টিক সাহিত্যের সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভেদ।

(গ) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষত ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী সাহিত্যে যে একটা নবসৃষ্টির জোয়ার আসিয়াছিল, উহার স্বরূপ ব্যক্ত করিবার জন্যই উহাকে রোমান্টিক আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। রোমান্সের প্রকৃত অর্থ—সমুন্নত কল্পনার বিলাস—গদ্যময় দৃষ্টিভঙ্গীর উপর অবাধ কল্পনার রশ্মি-নিক্ষেপ। এই সাহিত্য-

সৃষ্টিতে মূলত দিব্য ভাব-কল্পনার মায়াঞ্জন সাহায্যে প্রকৃতি ও মানবজীবনের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া নিত্য সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস আছে বলিয়া উহাকে রোমান্টিক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রোমান্টিসিজ্‌ম একটা বিশিষ্ট সাহিত্য-রস—একটা মানস-দৃষ্টিভঙ্গী। পূর্ববর্তী সাহিত্যে একটা নিয়মতন্ত্র ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। সে সাহিত্যের প্রকাশ ছিল—স্পষ্ট, সংযত ও বুদ্ধির দ্বারা অনুরঞ্জিত সৌন্দর্যসৃষ্টি সে সাহিত্যেও ছিল—কিন্তু তাহা স্থূল ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট। বিষয়বস্তু ছিল—পৌরাণিক দেবদেবী, ঐতিহাসিক ব্যক্তি, অভিজাত সম্প্রদায়ের কাহিনী বা মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর স্তুতি বা প্রধান দোষসমূহের নিন্দা। রচনাভঙ্গী ছিল—মামুলী ও প্রাচীন রীতির অনুগামী। এই স্থির, সংযত ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের দিকে তাকাইয়া আগামী দিনের প্রচুর সম্ভাবনাকে হয়তো কেহই আশা করিতে পারে নাই কিন্তু একদিন নববর্ষার উদ্দাম প্লাবনে সমস্ত আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খল ভাসিয়া গেল। এক অভিনব অনুপ্রেরণার স্রোতে নব নব সাহিত্য-সৃষ্টির রূপ ফুটিয়া উঠিল। ভূত ও বর্তমানের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া গেল।

এই নূতন রোমান্টিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হইল—অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরত্ব, কল্পনার অবাধ প্রসার, একটা ভাবগত অখণ্ড সৌন্দর্যের জন্য অদম্য কৌতূহল ও নব নব অভিযান এবং রূপজগতর গূঢ় আবেদনে সদাজাগ্রত চিত্তবৃত্তি। সাহিত্যিকের অন্তর-জীবনের অভিব্যক্তিতে ও তাঁহার মানসিক রঙে রঙীন হওয়ায় এই রোমান্টিক সাহিত্য একটা অভিনব গৌরবে গৌরবান্বিত হইল। ইহাতেই ভাবজগতের প্রাধান্য-লাভ হইল এবং রূপজগতের সহিত মিলনও সম্ভবপর হইল। পৃথিবীর তরুলতা, নদী-পর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া, সামান্য ধূলিকণা পর্যন্ত এক মহান সৌন্দর্য ও গৌরব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে বলিয়া রোমান্টিক কবিগণ অনুভব করিলেন। মানবজীবনের অসীম রহস্যময়তার মধ্যে তাঁহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইল এবং দরিদ্র, অবনত জীবনের মহত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাসের কিংবদন্তী ও রূপকথার কল্পনাবিলাস তাঁহাদের কাব্যে আসন পাতিল। এই নব সৃষ্টির দ্বারা সাহিত্যে এক নূতন রাজ্য জয় করা হইল।

অলৌকিক সৌন্দর্যানুভূতি ও অফুরন্ত বিস্ময়ের উপলব্ধিই রোমান্টিক সাহিত্য-সৃষ্টির মর্মকথা। বাহিরের সংসারকে আমরা গ্রহণ করি প্রধানত বুদ্ধি ও অনুভূতির সাহায্যে। বুদ্ধি ও অনুভূতি দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি, কার্যকারণ-সম্বন্ধ, সংসারের সহিত মানুষের অসংখ্য বন্ধনের স্বরূপ, মানুষে-মানুষে, মানুষে-প্রকৃতিতে ভিতরে-বাহিরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই বাস্তব, সাধারণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের

মধ্যে রোমান্টিক কবি দেখেন একটা অ-সাধারণ ব্যঞ্জনা, রূপাতিরিক্ত একটা অত্যাশ্চর্য প্রকাশ, বৈশিষ্ট্যহীনের মধ্যে এক অপূর্ব তাৎপর্য। তাঁহারা জড়বুদ্ধির উর্ধ্বগত এক চিন্ময় বোধ ও এক অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। এক দিব্য-দৃষ্টিতে লৌকিক বুদ্ধির কার্যকারিতা-শক্তি লোপ পায় বটে, কিন্তু এক উন্নত ও সহজ বোধের উদ্ভব হয় এবং বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার হয় অসাধারণ। এই অন্তর্দর্শনে প্রতিপদে অপূর্ব বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়, আর এই বিস্ময় সমগ্র বোধের গণ্ডীর মধ্যে বোধাতীত কোনো অপূর্ব বস্তু আবিষ্কারের বিস্ময়।

প্রকৃতি ও মানবজীবনের শত-সহস্র প্রকাশের মধ্যে রোমান্টিক কবি অনুভব করেন এক অপার্থিব সৌন্দর্য। আপাতদৃষ্টিতে যেটি নিতান্ত সাধারণ, গদ্যময়, সংসারের কুশ্রীতা, মলিনতায় ঢাকা, তাহার মধ্যে আবিষ্কৃত হয় একটা অসাধারণত্ব, সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা। রোমান্টিক প্রত্যেক বস্তুটিকেই দেখেন বৃহতের সহিত সম্বন্ধের আলোকে, বৃহৎ ভাবের পটভূমিকায়। ক্ষুদ্র, তুচ্ছ জিনিস তাঁহার চোখে হয় অপরূপ তাৎপর্য-ও সুষমামণ্ডিত। ক্ষুদ্র একটি গাছের পাতা, ছোট্ট একটা পাখীর ডাক, সূর্যাস্তের একটু রক্তিম আভা তাঁহার কাছে অনন্ত বিস্ময়ের খনি—সাধারণ দৃষ্টির অতীত এক নূতন সৌন্দর্যের লীলাভূমি।

মানুষকেও রোমান্টিক দেখেন অ-সাধারণ চোখে। মানুষের মধ্যে আছে পরম-বিস্ময়, অনন্ত সম্ভাবনীয়তা ও রক্তমাংসের অতীত এক সত্তা। মানব-জীবনের এই বৃহত্তর ও মহত্তর অংশকে রোমান্টিক দেখিয়াছেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই উর্ধ্বতম সত্তায় মানুষে-মানুষে কোনো প্রভেদ নাই—মানুষের এই অংশ, চিরস্বাধীন, চিরমুক্ত —আকাশের মতো তাহার ব্যাপ্তি। মানুষের এই শ্রেষ্ঠতম সত্তা, এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশকে রোমান্টিকগণ অনুভব করিয়াছেন গভীরভাবে। এই বিরাট মানবপ্রাণের বেদীতলে তাঁহারা আলো জ্বালিয়াছেন—আরতি করিয়াছেন—মুগ্ধবিস্ময়ে স্তবগান করিয়াছেন। নর-নারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, উত্থান-পতন, স্নেহ-প্রেমকে তাঁহারা দেখিয়াছেন গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে, নিরর্থকের অর্থ হইয়াছে আবিষ্কৃত, ক্ষুদ্রকে উন্নীত করা হইয়াছে বৃহতের ভূমিকায়। তাঁহারা প্রকৃতি ও মানবজীবনকে এক অপার্থিব সৌন্দর্য, গৌরব ও মহত্ত্বে মণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে, জড়ে ও চেতনে তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন সমপ্রাণতা। প্রকৃতির জড়মূর্তির অন্তরালে বিরাজ করিতেছে একই বিরাট প্রাণের তরঙ্গ—যাহার সঙ্গে মানুষের প্রাণতরঙ্গের কোনো প্রভেদ নাই। তাঁহাদের কাজ হইতেছে দেখানো যে, মানুষের মধ্যে আছে অতি-মানুষের অংশ—প্রকৃতিতে

আছে অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ। বাস্তবের কুশ্রীতা, মলিনতা যদি দূর হয়, তবেই ফুটিয়া উঠিবে দেহ-সরোবরে এক অপার্থিব মানব-কমল। রক্ত-মাংস, অস্থি-মেদ দেখা দিবে দেব-মন্দির রূপে—দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের শত-বন্ধন ও সহস্র সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে প্রকটিত হইবে চির-স্বাধীন মানবাত্মার রূপ। ইহা ক্ষুদ্র মানুষের সীমাবদ্ধ পঙ্কিল সরোবরে মহা-সমুদ্রের জলকল্লোল—জীর্ণ, আর্দ্র গৃহে ঐন্দ্রজালিকের স্বর্গ রচনা! এই রোমান্টিক কবিগণই প্রকৃত স্রষ্টা, অন্তর্দ্রষ্টা—মানুষের ত্রাণকর্তা। ইঁহারাই দেখান—এ জগতের মধ্যে নূতন জগৎ, এই মানবের মধ্যে নূতন মানব, এই প্রকৃতির মধ্যে নূতন প্রকৃতি।

রোমান্টিক সাহিত্য-সৃষ্টির ভাবলোকের মধ্যে প্রাণের নবতম স্পন্দন অনুভব করা যায়—এমন অপূর্ব সম্পদ লাভ করা যায়, যাহাতে ধরণীর শতগ্লানি, শতদুঃখ-জ্বালার মধ্যেও এ সংসার মধুময় লাগে, মানুষের প্রাণে এক অনন্ত সান্ত্বনা নামিয়া আসে। মনে হয় এই শোক-জ্বালাময় মানবজীবন উদ্দেশ্যবিহীন নয়, মানবের স্নেহ-প্রেম নিরর্থক নয়—ক্ষণিকের নয়। সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টির যে নিত্যবস্তু, তাহারই চরমতম প্রকাশ রোমান্টিক আর্টে। রোমান্টিক বাস্তবকে ত্যাগ করেন না—বাস্তবকে পরিশুদ্ধ করেন—সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন—উহার মধ্য হইতে নবরূপ ও নবরস বাহির করেন। বাস্তব জীবনের মধ্যে ভাবলোকের যে কিরণ-সম্পাত—ইহাই চিরন্তন রসলোক। যুগের পরিবর্ত নহয়, রুচিরও পরিবর্তন হয়, কিন্তু মানবের অন্তরতম সত্তার কোনো পরিবর্তন হয় না—তাহারই প্রকাশ যে সাহিত্যে, তাহাই নিত্যকালের। তাই রবীন্দ্রকাব্য, শত অসম্পূর্ণতায় জর্জরিত, দুঃখ-শোক-নৈরাশ্য-পীড়িত মানবের চিত্তে আশা ও সান্ত্বনার সঞ্জীবনী রসায়ন—তাহার চিরন্তন-রসপিপাসার অফুরন্ত সুধা-নির্ঝর।

রবীন্দ্রনাথ অসীম ভাবলোকের কবি, অলৌকিক সৌন্দর্যের কবি, অসীম রহস্যের কবি; জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী মূলত রোমান্টিক—এই দৃষ্টিভঙ্গীই অনেক সময় মিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সামান্যের মধ্যে অসামান্যের ব্যঞ্জনা, ক্ষুদ্র, নগণ্য, তুচ্ছের মধ্যে মহান্ ও বিরাটের স্পর্শ, সংসারের কাদা-মাটি-আবর্জনার মধ্যে ভাবের স্বর্গ-রচনার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার কবিপ্রতিভাকে চিরকাল প্রেরণা দিয়াছে। নারীর সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতি তাঁহার একটা অপূর্ব ভাবদৃষ্টি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। মনে হয় শেষের দিকে সে-দৃষ্টি আরো বিস্ময়ঘন ও রহস্য-সন্ধানী হইয়াছিল। প্রথম যুগের এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয় পূর্বে নানা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, এখন শেষজীবনে কবির

কাব্যে যে এই দৃষ্টি কি অপূর্ব গভীরতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

একেবারে শেষের দিকের কাব্য 'সানাই'-এর 'অনসূয়া' নামে এক কবিতা আলোচনা করিলেই কবির এই রোমান্টিক দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে। কবি বাস করেন একটা জঘন্য গলিতে, সেখানে

কাঁঠালের ভূতি পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্না ঘরের পাঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়—
বীভৎস মাছির দল ঐকতান বাদন জমায়।
শেষরাত্রে মাতাল বাসায়
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদ্‌গদ্‌ ভাষায়,
ঘুমভাঙা পাশের বাড়িতে
পাড়াপ্রতিবেশী থাকে হুংকার ছাড়িতে।......
কুকুরটা সর্বঅঙ্গে ক্ষত
বিছানায় শোয় এসে, আমি নিদ্রাগত।

কিন্তু এই পাড়ায় এই নোংরা বাস্তবের আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয়াও কবি নিজের স্বপ্নলোকের মধ্যে বাস করিতেছেন, বাস্তবের শত-সহস্র কুশ্রীতা তাঁহাকে সচেতন করিতে পারে নাই,—

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্মরোমান্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে পথ জানে—
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা
আকাশ-কুসুম-কুঞ্জবনে
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বারবার।

এই বীভৎস বস্তির মধ্যেই যখন বসন্ত আসে, তখন দেশকাল ভুলিয়া সংস্কৃতকাব্যলোক হইতে 'অযতনে এলায়িত রুক্ষ কেশপাশ' দোলাইয়া, 'পিনদ্ধ বল্কল-বন্ধে যৌবনের বন্দী দূত দোঁহে'র 'উদ্ধত বিদ্রোহ' অঙ্গে লইয়া, 'মৃদুমন্দ গন্ধের আভাস' মেলিয়া

অনসূয়া, আর যে 'কাব্যের ইঙ্গিত আড়ালে অর্ধাবগুণ্ঠিত' ছিল এবং 'অভিসার-যাত্রাপথে কখনো দীপশিখা বহেনি' সেই মালবিকা নিঃশব্দ চরণে কবির হৃদয়-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়। একালের 'ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গ-হাসি-বিহসিত প্রিয়া' বা 'ইকনমিক্‌স-পরীক্ষা-বাহিনী' 'বিংশ শতকিয়া' কোনো নায়িকা আসে না! অনসূয়ার 'পিয়' বাণী কবির হৃদয়ে আনন্দের রোমাঞ্চ সঞ্চার করে, মালবিকা প্রথম কবিকণ্ঠে প্রিয়নাম শুনিয়া 'বিস্ফারিত কালো দুটি চোখের বিস্মিত চাহনি'তে কবির দিকে চাহিয়া তাহার ডালা হইতে 'আধফোটা মল্লিকার মালা' কবির হাতে দেয়। কাব্যের এই দুই উপেক্ষিতা কবি-হৃদয়ের প্রেম-অর্ঘ্য লাভ করে। চৈত্র-দুপুরে কবি এই ধ্যানের ছবি আঁকিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আবার তাঁহাকে সেই বিরক্তিকর বাস্তবের সংস্পর্শে আসিতে হইবে।

স্বপ্নের বাঁশিটি আজ ফেলে তব কোলে
আর বার যেতে হবে চলে
সেথা, যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়
দিন চলে যায়।

এখানে 'বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনা',—কবির সত্যপ্রাপ্তি কেবল কল্পনার রাজ্যে, স্বপ্নলোকে, ভাবলোকে—ইহাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোমান্টিক অনুভূতি।

মধ্যজীবনে একদিন রবীন্দ্রনাথ নারীকে বলিয়াছিলেন—'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ নারীকে পূর্ণভাবে রোমান্টিক ভাবদৃষ্টির আলোকে দেখিয়াছেন। নারী যে একান্তভাবে কবির মনের রচনা একথা শেষ বয়সের নানা রসোচ্ছল কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আমারে বলে যে ওরা রোমান্টিক।
সেকথা মানিয়া লই
রসতীর্থপথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রং লাগায়েছি প্রিয়ে।...
যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধুলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে.
কারশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রং-রস
আনি তাঁরি জাদুর পরশ।

জানি তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে, এরে কভু বলে বাস্তবিক ?
আমি বলি, কখনো না, আমি রোমান্টিক।

[রোমান্টিক, নবজাতক]

পুরুষ যে রূপকার
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী,
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি।

[নামকরণ, আকাশ-প্রদীপ]

'আকাশ-প্রদীপ', 'সানাই' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এইরূপ নারী সম্বন্ধে, প্রেম সম্বন্ধে রোমান্টিক অনুভূতির রসঘন কতকগুলি অনবদ্য কবিতা আছে। সেগুলি রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রত্ন।

সমস্ত ভাববাদী রোমান্টিক সাহিত্যিকই নগ্ন বাস্তবের প্রকাশকে, বাস্তবের ক্লেদ-গ্লানি-পঙ্ককে সাহিত্যরচনার একান্ত অবলম্বন বলিয়া মনে করেন নাই। রচনা অর্থে শিল্পসৃষ্টি। সাহিত্যিক রূপস্রষ্টা। সৃষ্টি স্রষ্টার ভাব, কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—তাহারই ভাবজীবনের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সৃষ্টি বাস্তব-সত্যের অবিকল প্রতিচ্ছবি নয়, অনেকাংশে ইহা পুনর্গঠন, রূপান্তরকরণ। বাস্তব সত্তা হইতেছে সত্য, আর সেই সত্তায় যে আনন্দ তাহাই রস। রসসৃষ্টি অর্থ সত্যের অন্তর্নিহিত আনন্দকে ব্যক্ত করিয়া সম্মুখে ধরা, আর আনন্দের যে ব্যক্তমূর্তি, যে সুঠাম, সুসমঞ্জস, সুবিন্যস্ত রূপ, তাহাই সৌন্দর্য। শিল্পীর কাব্যরূপ গড়ার তাৎপর্য সত্যকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা। সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্যের প্রাণ—সাহিত্যিকের একমাত্র লক্ষ্য। এই সৌন্দর্যকে আমরা উপলব্ধি করি আমাদের অন্তরের চেতনায়—আমাদের হৃদয়ের দিব্যানুভূতিতে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের মতে বাস্তবের সহিত সাহিত্যসৃষ্টির, সত্যের সহিত সৌন্দর্যের সম্বন্ধ।

বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে পাশ্চাত্যসাহিত্যের রিয়ালিজ্‌মের একটা সংক্রামক হাওয়া আমাদের বাংলাসাহিত্যে প্রবাহিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে নানা কারণে যেটা পশ্চিমের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল, বাংলায় সেটা একটা শৌখিন অনুকরণের পথে আসিয়াছিল। সমাজের অতি নিম্নস্তরের নরনারীর কদর্যতা ও গ্লানি এবং যৌন-লালসার বীভৎস চিত্র আঁকিয়া এবং ভাষাকে

ভাঙিয়া-চুরিয়া নানা ভঙ্গীতে সাজাইয়া একটা নূতনত্ব ও মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল সাহিত্যিকদের একটা দল। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের উদ্দেশ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সাহিত্যে বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বেশ বুঝা যায়।

"যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারি প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ, কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, "তুমি কেন?" সে বলে, "তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট।"

যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞা নির্ণয় চলে; কিন্তু যে সীমার বাইরে তাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই নে, তাকে বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ্ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁকে না পাই মনে না পাই বচনে—পাই কেবল আনন্দবোধে। আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে, রূপকলায়।

……সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমত্ত ডিমোক্রেসি তাল ঠুকে বল্‌ছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিকার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলি খেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক করে তুলে তাই চীৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব বলে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন্ করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলিনে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্য-কারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসংগত বলেই আপত্তি করব, অসত্য বলে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদামাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন

করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি? এই প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাৎলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত স্বরলোককে আক্রমণ করতে থাকে, তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কিনা, যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে—এটা সংগীত কিনা। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়, কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ বলে মান্‌তে হয়, তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি দিতে হবে স্বীকার করি। কিন্তু এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয়।"

[বিচিত্রা, শ্রাবণ, ১৩৩৪, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যের পথে]

"বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অ-পূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। একেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখন সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল করে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে তখনি বোঝা যায়, শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে, তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্যধারায় নৌকোচলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; হালের উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি,—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এতে তলিয়ে-যাওয়াই রিয়েলিটি; ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে ভাবগুলোকে স্থানে স্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ।......অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধা গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই বলেই সে হাল-আমলের নূতনত্বের কতকগুলো বাঁধাবুলি সংগ্রহ করে রাখে। বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডার বাঁধা নিয়মে তৈরী করে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে কারি হয়ে ওঠে, লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম শিশিতে-সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেটা হচ্ছে রিয়ালিটির কারি-পাউডার"। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন—আর একটা লালসার অসংযম। সাহিত্যে লালসা জিনিসটা অত্যন্ত সস্তা—ধুলোর উপর শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার অতি অল্পেই হয়।......মানুষের শরীর-ঘেঁষা যে-সব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরোনো—প্রথম অধ্যায় থেকেই তাদের আরম্ভ। একটু ছুঁতে না

ছুঁতেই তারা ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠে। মেঘনাদবধের নরক বর্ণনায় বীভৎস রসের অবতারণা উপলক্ষে মাইকেল একজায়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বমন করে উদ্গীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্ছে—এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘৃণা সঞ্চার করতে কবিত্বশক্তির প্রয়োজন করে না,—কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যে-সব ঘৃণ্যতার মূল তার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে কল্পনাশক্তির দরকার। ঘৃণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে স্থান পাবে না, একথা বলবো না, কিন্তু সেটা যদি একান্তই একটা দৈহিক সস্তা জিনিস হয়, তাহলে তাকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই ভালো হয়।" [প্রবাসী, ১৩৩৪, ফাল্গুন, যাত্রীর ডায়ারী, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে]

ইংরেজী কাব্যে রোমান্টিসিজ্মের প্রভাব খুব বেশী পড়িয়াছিল। শেলী, কীট্স, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোল্রিজ প্রভৃতি কবিদের কাব্য রোমান্টিক কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শেলী, কীট্স্, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের মধ্যে নাই।

শেলী সারাজীবন ধরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন, প্রেমের স্বপ্ন, অনাগত দিনে যে স্বর্গরাজ্য ধরার ধূলায় নামিয়া আসিবে, সেই নবজীবনের স্বপ্নে তিনি বিভোর। সেই স্বপ্ন জীবনে সত্য হইতেছে না বলিয়া নৈরাশ্য তাঁহার জীবনকে ভরিয়া দিলেও তিনি আশাশূন্য হন নাই। তাঁহার বিশ্বাস—দুঃখ ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়াই নবজীবনের প্রভাত দেখা দিবে।

If Winter comes, can Spring be far behind?

শেলী ছিলেন ঘোরতর বিপ্লবী। তিনি চাহিয়াছিলেন—চির-প্রচলিত, সমাজের নৈতিক আদর্শের সমূল উৎপাটন এবং এই জীর্ণ, ব্যর্থ-আদর্শপুষ্ট সমাজের পরিবর্তে এক নূতন সমাজ-গঠন। সেই সমাজে বাহিরের কোন বিধি-নিষেধ থাকিবে না, অবাধ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণই কেবল সে সমাজে বিরাজ করিবে। শেলী আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে এই স্বপ্ন সার্থকভাবে রূপায়িত হোক, এক নবতর আশা ও আনন্দে জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, জীবনের গতি অন্তর-বাসনার তালে তালে ছন্দায়িত হোক।

যখন স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে তিনি বিরোধ দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে হইয়াছে যে, মানুষ সর্বতোভাবে বন্দী বলিয়াই স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইতেছে না। সুতরাং সর্বপ্রকার বাধাবন্ধন-মুক্তিতেই মানুষের চরম বিকাশ। The Revolt of Islam, The Masque of Anarchy, Julian and Maddalo, Prometheus Unbound প্রভৃতি কাব্যে তিনি মানব-মনের মুক্তি ও স্বাধীনতার জয়গান করিয়াছেন। Prometheus-এর বন্ধনমুক্তি মানবাত্মার সর্বপ্রকার বন্ধন-মুক্তিরই প্রতীক।

শেলীর কবি-প্রতিভা বস্তু অপেক্ষা ভাবের দ্বারাই বেশি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। প্রেম যে মানবজীবনের যথাসর্বস্ব, এই অলৌকিক শক্তিস্পর্শে সমস্ত জগৎ যে এক অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত হইয়াছে, প্রেম বিহনে জগৎ যে মিথ্যা, আর কোনো কবি বোধ হয় এমন তীব্র আবেগের সহিত ইহা অনুভব করেন নাই। কিন্তু তাঁহার কাব্যে প্রেমের কোনো বস্তুসাপেক্ষ প্রকাশ নাই। উহা একটা বৃহৎ ভাব বিশেষ—একটা পরমসুন্দর মায়া। তাঁহার Epipsychidion ইহার প্রমাণ। নারীর প্রেমের স্পর্শে যে জীবনের বিরাট পরিবর্তন হয়, বহু দেশের বহু কবি, বহুভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রেম কবির অন্তর-অভিজ্ঞতায় গভীর, উত্তেজনাময় ও জীবন-মরণ-ব্যাপী হইয়াছে, এবং কবির বুভুক্ষিত রসদৃষ্টি প্রিয়ার দেহমনের চারিদিকে কেবল ঘুরিয়া মরিয়াছে—ইহা আমরা উৎকৃষ্ট প্রেম-কবিতায় দেখিয়াছি। কিন্তু শেলীর মানসী এ মর্ত্যের নারী নয়—সে যেন কোনো স্বপ্নলোকের ছায়ামূর্তি—সে

An image of some bright eternity ;
A shadow of some golden dream ; a splendour
Leaving the third sphere pilotless ; a tender
Reflection of the eternal Moon of Love
Under whose motions life's dull billows move ;
A metaphor of Spring and Youth and Morning ;
A vision like incarnate April, warning
With smiles and tears, Frost the anatomy
Into his summer grave.

এই চিত্র কোনো বিশিষ্ট নারীর নহে ;—ইহা সৌন্দর্যের একটা অনির্দিষ্ট ভাবমূর্তি। প্রেম তাঁহার কাব্যে একটা নৈর্ব্যক্তিক ও নির্বিশেষ অবস্থা বা আদর্শ।

ইংরেজী সাহিত্যে শেলীর মতো অত বড়ো লিরিক কবি আর নাই। অপূর্ব গীতিপ্রাণতাতেই তাঁহার কবিতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তীব্র আবেগের উচ্ছ্বাস, গলিত ধাতুস্রাবের মতো অপূর্ব সংগীতের স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হইলেও ক্রমে উহা অশরীরী স্বপ্নলোকের ছায়ার মতো প্রতীয়মান হইয়াছে এবং রূপকে একেবারে ত্যাগ করিয়া ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বস্তু-জগতের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ তাঁহার আবেগ ও কল্পনার ত্রিপল কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, এবং ক্রমে তাহাদের স্বতন্ত্র রূপ ও রেখা বিসর্জন দিয়া একটা তরল সংগীতস্রোতে পরিণত হইয়াছে এবং শেষে সেই প্রবাহ সহস্র ধারায় ফুলঝুরির মতো ঝরিয়া পড়িয়াছে। The Cloud, The skylark, The Flight of Love, Ode to the West

Wind প্রভৃতি লিরিক তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই সব কবিতায় ও অন্যান্য কবিতাতেও ভাব ও কল্পনার অব্যাহত অভিযান চলিয়াছে—বস্তু বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। লিরিক কবি তাঁহার অনন্ত-জীবনকে কাব্যে প্রকাশ করেন। তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতির সুধা ও গরল প্রবল আবেগে তাঁহার কাব্যে প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু শেলী যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ তাঁহার কাব্যে বেশি নাই—বেশি আছে, যাহা তিনি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। যে বস্তু কেবল কল্পনায় বাস করে, যাহা বহুদূরে বা ভবিষ্যতের গর্ভে আছে—সেই পরশ-পাথরের দিকে কবি-ক্ষ্যাপা ক্রমাগত ছুটিয়াছেন এবং তাহা না পাইয়াই হতাশা, ক্রন্দন ও দীর্ঘশ্বাসে চারিদিক মুখর করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই শেলীর কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথকে একদিন বাংলার শেলী বলা হইত। শেলীর কাব্যে যে অনন্য-সাধারণ গীতিপ্রবণতা ও একটা স্বপ্নময়, রহস্যময় ভাব আছে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তাহার নিদর্শন আছে বলিয়া বোধ হয় ঐরূপ বলা হইত। রবীন্দ্রনাথ ও শেলী উভয়েই রোমান্টিক ও লিরিক কবি, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভার মধ্যে প্রভেদ আছে। শেলীর কবিতায় রূপজগতের কোনো মূর্তি নাই। বস্তুকে অবলম্বন করিয়া সাধারণত তাঁহার কাব্য-প্রেরণা উৎসারিত হইলেও শেষে রূপজগতের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া গিয়া ভাবের একটা সংগীতময়, ছায়াময়, নিরালম্ব প্রকাশে তাঁহার কবি-কর্ম নিঃশেষ হইয়াছে। শেলী বস্তুমূর্তিকে গ্রাহ্য করেন নাই—নিজের কল্পনায় তাঁহার মনোমত মূর্তি গড়িয়া, সমস্ত সম্ভব-অসম্ভব-বিচারের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অনন্ত শূন্যে তাহার অভিসারে চলিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথাতেই ইহার আভাস পাওয়া যায়—

Nor heed nor see, what things they be ;
But from these create he can
Forms more real than living man,
Nurslings of immortality !

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রূপজগৎকে কখনো ভুলেন নাই। রূপের উপরেই ভাবের লীলা চলিয়াছে এবং সমস্ত কাব্যসৃষ্টি ছায়ায় পর্যবসিত হয় নাই। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ,' 'বসুন্ধরা', 'বর্ষশেষ' 'মানসসুন্দরী' প্রভৃতি কবিতায় একটা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস সংগীতের স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও রূপকেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভাবের আকাশ-অভিযানের প্রয়াস নাই। ভাব ও রূপের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে।

এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে এক মহান শক্তি বিরাজ করিতেছে, এই ভাব শেলী কোনো কোনো কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। Hymn to Intellectual Beauty-তে কবি বলিয়াছেন যে, সৌন্দর্যের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই বিশ্বের অন্তরালে বাস করিতেছে এবং প্রকৃতির রূপ ও মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কার্যের উপর তাহার সৌন্দর্য

প্রতিফলিত করিতেছে। এই রহস্যময়ী সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার মতো, সংগীতের বিলীয়মান স্মৃতির মতো চঞ্চল আবির্ভাবে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে। মানুষ তাহাকে স্থিরভাবে চিরকালের মতো পাইতেছে না বলিয়া জীবন দুঃখ-গ্লানিতে ভরিয়া গিয়াছে। কবিও তাহাকে স্থিরভাবে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। Adonaisএর শেষ দিকে তিনি বলিয়াছেন যে, এই বিশ্বের অন্তরালে এক মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে এবং সমস্ত পরিবর্তন ও ধ্বংস-মৃত্যুর মধ্যে উহাই একমাত্র সত্য। জীবন সেই একমাত্র মহাসত্যকে ক্ষণতরে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, মৃত্যুতে মানুষ আবার সেই সত্যের সহিত মিলিত হয়। সেই মহাশক্তি সৌন্দর্য, প্রেম ও স্বাধীনতার শক্তি—সেই সৌন্দর্য ও প্রেমের আলোকেই পৃথিবী উজ্জ্বল—সুন্দর। মানুষ সেই শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না বলিয়া সংসারে এতো দুঃখদৈন্য—মানবজীবন এতো বিড়ম্বনাময়। তাই মৃত্যুতে সে মুক্ত হইয়া অনন্ত জীবনে ফিরিয়া যায়। শেলীর এই শক্তি-অনুভূতি কোন সুচিন্তিত জগৎ ও জীবন-রহস্যের মূল অনুভূতি নয়। কবিত্বের অনুপ্রেরণার মুহূর্তে একটা শক্তির চঞ্চল অনুভূতি মাত্র। ঈশ্বর বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার উপর শেলীর কোনো আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না। রোমাণ্টিক কবি-মানস বিশ্বের একটা ভাগবত ঐক্যের সন্ধান করে; হয়তো তাঁহার ব্যক্তিগত মানস-প্রবণতা অনুসারে প্রেম, সৌন্দর্য ও স্বাধীনতার শক্তিকে বিশ্বের মূল কারণ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। তত্ত্বের আকারে দেখিতে গেলে, ইহা অনেকটা ইয়োরোপীয় দর্শনের pantheism মতবাদের মতো, কতকটা আমাদের বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের মতো। শেলীর এই শক্তি বিশ্বানুস্যূত—immanent; বিশ্বাতীত, transcendent নয়। সুতরাং সৃষ্টির মধ্য দিয়া এক অখণ্ড, অনন্ত, শক্তির প্রকাশ ও সৃষ্টিকে চালিত করিয়া এক মহাপরিণামের দিকে অগ্রসর হইবার কোনো ধারণা ইহাতে নাই। কারণগত ঐক্যে নিবদ্ধ হইলেও সৃষ্টির কোনো স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা নাই। অথচ তাঁহার নিকট জগৎ ও জীবন সত্য,—এই শক্তির অনুভূতির সঙ্গে কবি জীবনের কোনো সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারেন নাই; জীবনকে এই অনুভূতির মধ্যে স্থান দিয়া উহার প্রকৃত সার্থকতার রূপ দেখিতে পান নাই। ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে কাব্যগত অনুভূতির মিল হয় নাই। সেই জন্য তাঁহার অন্তর্জীবনে প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তব জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি আকণ্ঠ পান করিতে চাহিয়াছেন—কিন্তু ঐরূপ আদর্শগত অনুভূতির পাত্রে। প্রকৃতপক্ষে উহা একটা বস্তুহীন ভাবগত কামনা মাত্র। কোনো বাস্তব সমাজ বা রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে এই সৌন্দর্য, প্রেম ও স্বাধীনতার শক্তির উপলব্ধি সম্ভব নয়। তাই তিনি যাহা চাহিয়াছেন, তাহা পান নাই বলিয়া ক্রন্দনে ও দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার

কাব্যগগন ধূমায়িত করিয়াছেন। তিনি নিজের মতো যে জগৎ ও জীবন গড়িতে চাহিয়াছেন, তাহা বাস্তবসংস্পর্শহীন—আদর্শ স্বপ্নরাজ্য। ইহা সম্ভব না হওয়ার জন্যই তাঁহার কবিতায় এতো হতাশের সুর। শেলীর এই শক্তির অনুভূতি কোনো ঐশী অনুভূতি নয়—কোনো জগৎ ও জীবনের কারণগত ঐক্যের পরিপূর্ণ অনুভূতি নয়। ইহা নিতান্ত কাব্যগত অনুভূতি। তাই এই অনুভূতি কোনো পরিপূর্ণ ও স্থির রূপ গ্রহণ করে নাই—কাব্যে যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার রূপ অতি চঞ্চল। জীবনে সে সত্যভাবে ধরা দিতেছে না বলিয়াই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নামিতেছে না।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজগতের অন্তরালে এক মহান সত্য-সুন্দরকে উপলব্ধি করিয়াছেন—এই অনুভূতিই তাঁহার কাব্যের উৎস। এই জগৎ ও জীবনের শতরূপ ও শত অভিব্যক্তির যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য তাঁহার কাব্যে ফুটিয়াছে, তাহা তাঁহার মূল কারণগত এক অপার্থিব সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জীবনের অনুভূতি ও কাব্যের অনুভূতির এক অত্যাশ্চর্য মিল হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার অনুভূতি স্থির, নিত্য, আনন্দোজ্জ্বল এবং তাহার প্রকাশও হইয়াছে রসময় এবং পরমরমণীয়। কিন্তু শেলীর সেই শক্তি-অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী এবং কোনো প্রকাশের মধ্যে স্থির মূর্তি ধারণ করে নাই। সেই জন্যই একটা অস্পষ্ট ভাবের কুয়াশায় তাঁহার কাব্য-গগন আচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁহার অনুভূতির সর্বাঙ্গীণ ঐক্য ও পরিপূর্ণতা নাই এবং কাব্যেও কোনো স্থির এবং চিরস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রকাশ নাই।

আর একজন রোমান্টিক কবি কীট্‌স্। পার্থিব সৌন্দর্যের সুতীব্র অনুভূতিই তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ধরণীর রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, গান, তাঁহার কবিচিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে এবং তিনি আত্মহারা হইয়া ইহাদের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের জয়গান করিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের সিংহাসনে কীট্‌সের কাব্য-জগৎ প্রতিষ্ঠিত। 'Oh, for a life of sensations rather than of thoughts', 'a thing of beauty is a joy for ever', 'the poetry of the earth is never dead' -প্রভৃতি উক্তি কীট্‌সের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু রূপজগতের এই সৌন্দর্য যে কোনো আদি, অনন্ত সৌন্দর্যের অংশ—কোনো মূল সৌন্দর্য-প্রস্রবণ হইতেই যে এই রূপকণা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে—এমন কোনো ভাব তাঁহার কাব্যে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইহাই মূলসূত্র।

কীট্‌সের কাব্যে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয়। রূপজগতের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা, জাগতিক সৌন্দর্যের নশ্বরতা, দু'দিনের জীবনের অতৃপ্ত উপভোগ কবিকে যথেষ্ট বেদনা দিয়াছে। কীট্‌স এই মাটির পৃথিবীকে, ইহার বিচিত্র সৌন্দর্য-মাধুর্যকে

পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে চাহিয়াছেন। অকাল ধ্বংস-মৃত্যু, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে মোহভঙ্গ, জীবনে অতৃপ্তি, অবসাদ প্রভৃতিই এই পরিপূর্ণ ভোগের অন্তরায়। এই সব বাধার বিরুদ্ধে কবির অভিযোগ ও অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এক চিরস্থায়ী সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করিয়া এই নশ্বরতার হাত হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার Ode to a Nightingale কবিতায় তিনি ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনের অতৃপ্ত সৌন্দর্যপিপাসায় উদ্বিগ্ন হইয়া Nightingale-এর চিরস্থায়ী সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন,—

Fade far away, dissolve and quite forget
What thou among the leaves hast never known,
The weariness, the fever, and the fret
Here, where men sit and hear each other groan ;
Where palsy shakes a few, sad, last grey hairs,
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies ;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs,
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond to-marrow.

Nightingale কীট্‌সের নিকট অমর পাখী, কারণ সে রোমান্সের অবিনশ্বর রাজত্বে বাস করে, কাব্য ও রূপকথার রাজ্যে সে চিরন্তন, কবির কল্পনায় সে অমর। Ode to a Grecian Urnএ কবি বলিয়াছেন যে, কল্পলোকের যে আনন্দ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দের চেয়ে তাহা অনেক বড়। কানে যে গান শুনি তাহা অপেক্ষা কল্পনায় যে গান শুনি তাহা অনেক বেশি মধুর।

Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter.

বাস্তব জীবনের চেয়ে আর্টিস্টের কল্পনা বৃহৎ ও চিরস্থায়ী। Beauty is truth, and truth beautyর মধ্যে এই কথারই প্রতিধ্বনি। আর্টের সৌন্দর্য চিরস্থায়ী এবং এই সৌন্দর্য সত্য, সুতরাং সত্য ও সৌন্দর্যের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই।

আর্টের সৌন্দর্য-রচনা আর্টিস্টের দিব্য-কল্পনার কাজ, সুতরাং দিব্য-কল্পনা যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তাহা সত্য এবং অবিনশ্বর। কবি জগতের নশ্বরতার উপরে আর্টের স্থান দিয়াছেন। এই ক্ষণস্থায়ী, মরণশীল রূপজগতের ও এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনেরও একটা চিরস্থায়ী রূপ আছে—ঐ রূপ আর্টিস্টের কল্পনার মধ্যে, ভাবের মধ্যে। আর্টিস্ট তাঁহার দিব্য-কল্পনার আলোকধারায় ইহাদিগকে স্নান করাইয়া অমরত্ব দিতে পারেন। এই বিশ্বজগতের সমস্ত খণ্ড-সৌন্দর্য দিব্য-কল্পনায় চিরসুন্দর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত কীট্‌স্ সমস্ত সৌন্দর্যের মূলীভূত ঐক্য উপলব্ধি করেন নাই। সমস্ত খণ্ডসৌন্দর্যই যে অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতীক, এই অনুভূতি কীট্‌সের কবি-চিত্তে অনুপ্রেরণা দেয় নাই। কীট্‌সের সৌন্দর্য সত্য হইয়াছে—সাহিত্য, চিত্রকলা বা সংগীতের সাহায্যে ক্ষণস্থায়ীকে চিরস্থায়ী করিয়া। এই কল্পনার রাজ্যে বস্তুর বন্ধন-মুক্তি—আর্টের দ্বারা খণ্ডকে অখণ্ড করা। আর রবীন্দ্রনাথের নিকট জগতের সমস্ত সৌন্দর্য এক অনন্ত সৌন্দর্যপ্রস্রবণ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে বলিয়া চিরসত্য ও চিরস্থায়ী। কীট্‌স্ খণ্ডসৌন্দর্যকে চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছেন রূপকথা, চিত্রকলা প্রভৃতির নিত্যত্বের সহিত যুক্ত করিয়া—অর্থাৎ আর্টিস্টের কল্পনার রঞ্জনী আলোকের সাহায্যে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমস্ত সৌন্দর্যের প্রাণ-রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট রূপ নিত্য সৌন্দর্যের অংশ বলিয়াই সুন্দর, কীট্‌স্ উহাতে নিত্যত্ব আরোপ করিয়া চিরসুন্দর করিয়াছেন। রূপজগতের উপভোগের মধ্যে কীট্‌সের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক সাদৃশ্য আছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো কীট্‌স্ রূপের মধ্যে রূপাতীত কোনো সত্তার স্পর্শ পান নাই।

প্রকৃতি-পূজায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত রবীন্দ্রনাথের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই 'Poet of Nature', 'Worshipper of Nature' বলিয়া খ্যাত। উভয় কবিই, প্রকৃতি যে প্রাণময়ী এবং প্রকৃতি ও মানব যে একই মহান সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ তাহা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, প্রকৃতির রূপের মধ্যে যে-সৌন্দর্য আছে, তাহা যে পরমসুন্দরের রূপচ্ছটার প্রকাশ—এই অনুভূতিকেই তাঁহার প্রকৃতিপূজার মূলমন্ত্র করেন নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য-উদ্‌ঘাটন তাঁহার কবি-কর্ম নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁহার প্রাণে যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অনুপ্রেরণা দিয়াছে, সেই অনুভূতিই তাঁহার কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতি মানুষের মনকে নব বলে বলীয়ান করে, তাহাকে সাংসারিকতার কলুষ হইতে মুক্ত করে, ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে ও গভীর আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা দেয়।

....she can so inform
The mind that is within us, so impress
With quietness and beauty, and so feed
With lofty thoughts, that neither evil tongues,
Rash judgments, nor the sneers of selfish men,
Nor greetings where no kindness is, nor all
The dreary intercourse of daily life,

Shall e'er prevail against us, or disturb
Our cheerful faith, that all which we behold
Is full of blessings.

প্রকৃতির বিচিত্র রূপের বর্ণনা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতির সেই বিচিত্ররূপ তাঁহার মনে একটা প্রবল ও গভীর ভগবদ্‌ভক্তি জাগাইয়াছে মাত্র।

Magnificent
The morning rose in memorable pomp
Glorious as e'er I had beheld—in front
The sea lay laughing at a distance ; near
The solid mountain shone, bright as the clouds,
Grain-tinctured, drenched in empyrean light ;
... ...
My heart was full ; I made no vows, but vows
Were then made for me ; bond unknown to me
Was given, that I should be, else sinning greatly,
A dedicated spirit.

প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যের সম্মুখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গিয়া ভগবদ্‌ভক্তিতে আপ্লুত হইয়াছে। প্রকৃতির এই সব দৃশ্য, সমস্ত ভাবনা-চিন্তা দূর করিয়া হৃদয়ের গভীর স্থৈর্য সম্পাদন করিয়া উহাকে ভগবদুপলব্ধির উপযোগী করিয়া তোলে।

Ocean and earth, the solid frame of earth
And ocean's liquid mass in gladness lay
Beneath him.—Far and wide the clouds were touched
And in their silent faces could be read
Unutterable love. Sound needed none,
Nor any voice of joy ; his spirit drank
The spectacle ; sensation, soul and form
All melted into him ;......................
In such access of mind, in such high hour
Of visitation from the living God,
Thought was not ;..............

Rapt into still communion that transcends
The imperfect offices of prayer and praise,
His mind was a thanksgiving to the power
That made him ; it was blessedness and love.

Tintern Abbeyর সুবিখ্যাত লাইন কয়টির মধ্যেও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিকে ভগবদুপলব্ধির সহায়ক বলিয়াই অনুভব করিয়াছেন, –

That blessed mood,
In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world,
Is lightened :—that serene and blessed mood
In which the affections gently lead us on,—
Until, the breath of this corporeal frame
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body. and become a living soul :
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy
We see into the life of things.

প্রকৃতির সৌন্দযের নিস্তব্ধ, গভীর ধ্যানে স্থূল জগৎ-চেতনা ও আত্মচেতনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বিশ্বানুস্যূত শক্তির সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন ; এই মিলন-অনুভবের ফলে গভীর আনন্দে তিনি সৃষ্টির প্রাণধারার রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রকৃতি এখানে কবিকে তাঁহার আত্মোপলব্ধির সহায়তা করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দযে চিরসুন্দরেরই সৌন্দর্য অনুভব করিয়াছেন। ষড়্‌ঋতুর উৎসবের বিচিত্র লীলার মধ্যে সেই পরমসুন্দরের লীলা, ঘন মেঘে তাঁহার চরণ, শ্রাবণের ধারায় তাঁহার বিরহ-বাণী, কদম্বের বনে তাঁহার গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়, শরতের আলোক-শতদলের উপর তাঁহার চরণ, বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় তাঁহার স্পর্শ, বৃক্ষরাজি মৃত্তিকার মর্ত্যপটে সুন্দরের প্রাণমূর্তি—প্রকৃতির সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথ এইভাবে অনুভব করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির রূপের বিভিন্ন বিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহার সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন—ইহাদের সৌন্দর্যে অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস পাইয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের মধ্যে, তাহার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যে, ভগবানের উপলব্ধির সহায়ক যে আধ্যাত্মিক শক্তি, তাহাই লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদের রসোপলব্ধি তাঁহার কাব্যে নাই—আছে খৃষ্টীয় ভক্তিবাদ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শুচিতার আবেদন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যের মূলদেশে আছে ধর্ম ও নীতি—রবীন্দ্রনাথের পরমসুন্দরকে ও পরমরসময়কে আস্বাদন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দৃষ্টি প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য খণ্ড সৌন্দর্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয় নাই—যত বেশি হইয়াছে উহার নৈতিক অংশের প্রতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য খণ্ড সৌন্দর্য পূর্ণভাবে উপভোগ করিয়াছেন এবং ধরণীর সমস্ত সৌন্দর্য যে সেই মহান চিরসুন্দরের অংশ তাহাও অনুভব করিয়াছেন।

(ঘ) অনেকে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতিমূলক কবিতাগুলির প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারেন না এবং ইহাদের যথোচিত শিল্পমূল্য দিতে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করেন না। এইরূপ রচনাও যে এক প্রকার উচ্চ শ্রেণীর আর্টের নিদর্শন, তাহা ভুলিয়া যান। তাঁহারা বলেন, কবির যে সমস্ত রচনার মধ্যে ভাব ও রূপের সমন্বয় হইয়াছে, অরূপের রূপ-সাধনা করা হইয়াছে, বাস্তব অনুভূতিকে বাদ দিয়া একমাত্র ভাবের বিলাসই প্রকাশিত হয় নাই, কেবল সেই সমস্ত রচনাই তাঁহার শ্রেষ্ঠদান। এই ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় ভাবসাধনা ও ইয়োরোপীয় বস্তু-সাধনার সমন্বয় করিয়া এমন এক রসবস্তু নির্মাণ করিয়াছেন, যাহা সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির চিরন্তন রূপ। 'মানসী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত তিনি যে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। এই যুগই তাঁহার রসজীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। রূপজগৎ তিনি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পটভূমিতে বৃহত্তর ভাবজগৎ বর্তমান থাকায়, রূপজগতের ক্ষণিকতা, অসম্পূর্ণতা ও নগ্নতা দূর হইয়া, উহা এক অনন্ত সৌন্দর্য-জগতে পরিণত হইয়াছে। ইহাই শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক শিল্পীর কাজ। রবীন্দ্রনাথ এ যুগে নিছক শিল্পী। কিন্তু যেখানে তিনি কল্পনার রথে চড়িয়া অরূপের সন্ধানে অনন্ত ভাব-আকাশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন, যেখানে তিনি আর্টিস্ট না হইয়া মিস্টিক হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'খেয়া' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' 'গীতালি' প্রভৃতি লইয়া যে যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহার কাব্যের অতীন্দ্রিয় যুগ বলা যায়। এই যুগে তাঁহার কাব্যরীতি এক ভিন্ন পথে চলিয়াছে এবং প্রকৃত রসসৃষ্টি হয়

নাই। আর ইহাদের প্রকাশ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলি হেঁয়ালির আকার ধারণ করিয়াছে।

এখানে বিচার্য এই যে, সাহিত্যের অভিব্যক্তি নির্ভর করে প্রধানত দুইটি জিনিসের উপর—একটি বিষয়বস্তু, অপরটি সাহিত্যিক-মানস। কোনো ভাব বা বস্তুর অনুভূতি বা চিন্তায় মনে আবেগ উপস্থিত হয়। সেই আবেগ যখন সংহত হইয়া গভীরতা লাভ করে, তখন তাহার মধ্যে রসের আবির্ভাব হয়। সেই সংহত ঘন আবেগের বসমূর্তির প্রকাশই সাহিত্যের প্রকাশ। এই যে প্রকাশ, ইহা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া হয়। সাহিত্যিকই সেই আশ্রয়স্থল। প্রকাশের সময় সাহিত্যিকের মনের একটা ছাপ লইয়া উহা বাহির হয় ও তাঁহার মানসিক বৈশিষ্ট্যের রূপে রূপায়িত হয়। এইটাই প্রকাশভঙ্গী। সাহিত্যসৃষ্টির কাঠিন্য ও সরলতা, অস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা, সরসতা ও শুষ্কতা সাহিত্যিকের এই মানসিক-গঠন-নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ-ভঙ্গীর উপর নির্ভর করে।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতাগুলির বিষয়বস্তু—ভগবান সম্বন্ধে কবির অনুভূতি। 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' প্রভৃতির অন্তর্গত গীতি-কবিতা ও অন্যান্য অনেক কবিতায় কবি ভগবানের যে অতীন্দ্রিয় স্পর্শ পাইয়াছেন, তাহারই আনন্দবেদনাময় অনুভূতির ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। ধ্যান-ধারণার সাহায্যে নয়, জ্ঞানের পথে নয়, কর্মের সাধনায় নয়, শুধু প্রেম ও সহজানুভূতির পথে ভগবানকে অনুভব ও তাঁহার সহিত রসসম্বন্ধ স্থাপন করাই মিস্টিসিজ্‌ম্। জড়জগতের এই বিচিত্র রূপের মধ্যে, মানবজীবনের অসংখ্য কর্মপ্রচেষ্টার অন্তরালে, মিস্টিক এক অদৃশ্য শক্তির স্পর্শ বুঝিতে পারেন; প্রতিক্ষণ সেই অজানার স্পর্শ তাঁহার মনকে অভিভূত করে, সেই স্পর্শের আনন্দ-বেদনায় তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া থাকে। এই বিশ্বের বহুরূপের মধ্যে সেই অপরূপের স্পর্শ-ই মিস্টিকের অনুভূতিকে সর্বদা জাগ্রত ও রসায়িত করিয়া রাখে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বিশিষ্ট লীলায়, জীবনের বহু কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে অসীম প্রেমময়ের স্পর্শ পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছেন, কখনো আত্মনিবেদনে নিজেকে নিঃশেষ করিয়াছেন, আবার সংসারধূলিজাল যখন সেই স্পর্শলাভে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে, তখন গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছেন,—তাঁহার আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, আশা-নৈরাশ্যের বিচিত্র অনুভূতি তাঁহার গানে উৎসারিত হইয়াছে। এগুলি তাঁহার মিস্টিক কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকৃত মিস্টিক বা মরমী কবি।

ভগবান মানুষের প্রেমের জন্য নিত্যকাঙাল। তাহার প্রেম পাইবার জন্য তিনি ভিখারী সাজিয়া তাহার হৃদয়-দুয়ারে প্রেমভিক্ষা করিতেছেন। সংসার-পঙ্ক-লিপ্ত

মানুষের প্রাণে সেই আহ্বান ক্ষণিকের জন্য পৌঁছিয়া আনন্দ-শিহরণে মাঝে মাঝে তাহাকে অধীর করে। সেও সেই আনন্দ-শিহরণ-জাগানিয়া, অচেনা, অজানা প্রেমময়ের প্রেমস্পর্শে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তাহার প্রেমনিবেদনের জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু সংসার-ধূলি-জাল তাহার দৃষ্টি ব্যাহত করে। সুতরাং এই ক্ষণস্পর্শের মধ্য দিয়াই ভগবান ও মরমীর প্রেমলীলার ইতিহাস রচিত হয়। অনন্ত প্রেমময়, মানবমনের সহিত চিরকাল এই লুকোচুরি খেলিতেছেন। ক্ষণস্পর্শে মানুষের হৃদয়ে দয়িতকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা জাগিয়া ওঠে, মানবজীবন ও প্রকৃতির শত-রূপের মধ্যে সেই চিরসুন্দরের ছায়াপাত হয়, আর ভক্ত-ভগবানের জানাজানি হয় ক্ষণ-মিলনের গোধূলি-আলোকে। অনাদি বিরহের বেদনাই তো শাশ্বত, মিলনের আনন্দ কোনো শুভ মুহূর্তের। অসীমের এই চির-চঞ্চল, রহস্যময়, ক্রীড়া-কুতূহলী রূপই রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিভাত। ক্ষণ-অনুভূতির শুভমুহূর্তগুলিই তাঁহার ভাণ্ডারের চিরন্তন ধন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অসীম ও সসীমের এই লীলাবাদ কোনো নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই। প্রকৃতি ও মানবজীবনের অসংখ্য রূপের মধ্যে সেই অপরূপের লীলা চলিয়াছে কত বিভিন্ন বেশে, কত বিচিত্র রসে। সেই চঞ্চল, লীলাময়, সৃষ্টির প্রবহমাণ গতিবেগের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া কেবলই লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে চলিয়াছেন, আর কবি সেই অধরার সঙ্গে লীলায় মাতিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যজগৎ রহস্যময়, স্বপ্নময়—ইয়েটসের ভাষায়—the flowing, changing world. ইহাই রবীন্দ্রনাথের মরমী কবিতার আসল রূপ। সুতরাং প্রকৃত রসসৃষ্টি হয় নাই বা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি হয় নাই বলা অর্থহীন। বিষয়বস্তুই এখানে রহস্যময়তা ও অস্পষ্টতার দাবি করিতেছে। বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন প্রকারের অন্তরতম অনুভূতির প্রকাশে পৌর্বাপর্য-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তারপর, রূপ যাহা প্রকটিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা নির্দিষ্ট কোনো রূপ পরিবর্তন করিলে রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় কবিতার আর্ট ক্ষুণ্ণ হইত। কারণ স্থান-কাল-পাত্রের নির্দিষ্টতাকে এড়াইয়া চলাই এরূপ আর্টের একটি প্রধান অংশ। এ শ্রেণীর কবিতার আবেদন আমাদের প্রাণের নিভৃততলশায়িনী, পুষ্পপেলব রসতন্ত্রীর উপর। এ যেন বসন্ত-সন্ধ্যায় কোনো মাতাল হাওয়ার শিহরণ—নিভৃত রাত্রে কোনো অজানা পুষ্প-গন্ধের উন্মাদনা—শরৎ-প্রাতের মেঘমুক্ত সোনালী আলোর এক ঝলক—একটা অংশের ক্ষণ-প্রকাশে সমগ্রের পরিপূর্ণ বিকাশ। এর আনন্দ-বেদনা অতি সূক্ষ্ম, অতি তীক্ষ্ণ, অথচ ব্যাপক।

তারপর, একথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লিরিক কবি। তাঁহার গদ্য বা পদ্য যে কোন রচনাই হোক, তার মধ্যে আছে এক

অপূর্ব গীতিপ্রবণতা। কবির কাব্য ঘিরিয়া এমন এক সূক্ষ্ম সংগীতের রাগিণী অহরহ বাজিতেছে যে, উহা কোনো নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিলেও সংগীতের জারকরসে উহার রেখাগুলি অস্পষ্ট হইয়া যায়। পাঠকের সারা-চিত্ত সংগীত-রসে গলিয়া গিয়া এক অপূর্ব ভাবদৃষ্টির অধিকারী হয় এবং উহারই আলোকে পাঠক কবিতাকে নূতন করিয়া দেখিতে পায়। তখন সমগ্র কাব্যসৃষ্টি এক মোহময়, স্বপ্নময়, সংগীতময় আবেষ্টনের মধ্য দিয়া তাহার কাছে প্রতিভাত হয়। এই সংগীত-প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের একটা স্বভাব। তাঁহার অতীন্দ্রিয় কবিতা সমস্তই পুরামাত্রায় গীতি-কবিতা বা গান। সংগীতই ইহাদের প্রাণ। এইজন্যও এই সব কবিতার রূপমূর্তি ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। এখানে কবিমানস-নিয়ন্ত্রিত-প্রকাশভঙ্গীই রূপের বিকাশে বাধা দিয়াছে। অবশ্য একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, এই অতীন্দ্রিয় কবিতার মধ্যে এমন অনেক কবিতা আছে যেগুলি পদ্যে-গাঁথা শুষ্ক তত্ত্বমাত্র। অনুভূতির ক্ষেত্রে উঠিয়া সেগুলি রসরূপ লাভ করে নাই। সেগুলির কথা স্বতন্ত্র।

(ঙ) বিশ্বসাহিত্যে যে তিনটি সাহিত্যিক হিউম্যানিজম্ বা মানবতাবাদের জন্য উচ্চপ্রশংসিত, তাঁহারা শেক্সপিয়ার, ভিক্টর হুগো ও গ্যেটে। ইঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের এক-একজন দিক্‌পাল এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের নিজস্ব ভঙ্গীতে নিজস্ব ভাব-কল্পনা অনুসারে মানুষকে প্রতিফলিত করিয়াছেন তাঁহাদের সাহিত্যে।

শেক্সপিয়ার রিপু-বিড়ম্বিত, নিয়তি-শৃঙ্খলিত সংসারের সাধারণ মানব-জীবনের অপার রহস্যের কবি। আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ-বেদনা, লোভ-হিংসা, কাম-প্রেম, স্নেহ-ভালোবাসা, শত দুর্বলতা, শত সংকীর্ণতা লইয়া যে মানুষ আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে—যে মানুষের মধ্যে সুধা ও গরল, দেবতা ও দানব, স্বর্গ ও মর্ত একাধারে বিরাজ করিতেছে, সংসারের সেই সাধারণ মানুষকে আমরা শেক্সপিয়ারের নাটকে দেখিতে পাই। ধরণীর ধূলির উপর শত অসম্পূর্ণতায় জর্জরিত এই যে মানুষের ক্ষণিক জীবন, ইহার মধ্যে যে মহত্ত্ব, যে মহিমা লুক্কায়িত আছে—তাহার সন্ধান আমরা শেক্সপিয়ারের নাটকে পাই। মানবজীবনের গূঢ়তম সন্ধান ও অসীম রহস্যের উপরই তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। তাঁহার সাহিত্য বহুপ্রকারের মানুষের বিরাট প্রদর্শনী। তাঁহার মিলনান্ত নাটকগুলিতে বহুপ্রকারের নর-নারীর আনন্দ ও হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে; যে পরী-চরিত্র নাটকে অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার একটা স্বপ্নময় ভাব আমাদিগকে প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত রাজ্যের মধ্যদেশের রহস্যে পৌছাইয়া দেয় এবং বিয়োগান্ত নাটকগুলিতে মানুষের প্রবৃত্তির বিরাট সংঘাতের মুকুরে নিজেদের ভালো করিয়া চিনিয়া লইবার অনন্ত বিস্ময় আমাদিগকে মুগ্ধ করে। হ্যামলেটের

বিবেক ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব, আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত বৃদ্ধ লীয়ারের গূঢ় যুক্তিপূর্ণ প্রলাপ, ওথেলোর অন্তিম দুঃখ ও অনুশোচনা, ম্যাকবেথের বিবেকের দংশন ও অন্তরাত্মার বেদনা, ক্লিওপেট্রার মৃত্যুকালীন মর্মান্তিক হতাশায়, আমরা এই নিয়তির খেলনা, রক্ত-মাংসের মানুষের অন্তরলোকের অপাররহস্যময় ছবি দেখিতে পাই। শেক্সপিয়ারের সাহিত্যে আমরা এই সংসারের মানুষের চিরন্তন রূপ দেখি।

এই বিরাট মানবতা বা হিউম্যানিজ্‌ম ভিক্টর হুগোর সাহিত্য-সৃষ্টির মূলমন্ত্র। সমাজের অশেষনিন্দাভাজন, শত-গ্লানি-জর্জরিত, শত অসম্পূর্ণতায় দুর্বল মানবের মর্মান্তঃপুরে যে অমর সৌন্দর্য বাস করে, হুগো তাহাই উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ইহাই মানবতার জয়গান। তাঁহার Notre Dame, Les Miserables প্রভৃতি মানব-জীবনের মহাকাব্য। মানুষের চিরন্তর চিত্তবৃত্তির সংঘাত, তাহার অসংখ্য দুর্বলতা, তাহার বীরত্ব ও মহত্ত্বের এমন রমণীয় প্রকাশ আর কোনো সাহিত্যে আছে কিনা জানি না।

গ্যেটের জগদ্বিখ্যাত নাট্যকাব্য ফাউস্টে দেখি মানবের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের বিজয়াভিযান—মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস—তাহার চিরন্তন মহিমার জয়-ঘোষণা। ফাউস্ট মানবের প্রতীক। ফাউস্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার দ্বারা জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে ব্যর্থ হইয়া জীবনের নানা অভিজ্ঞতার রসগ্রহণের দ্বারা সত্যদর্শনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য শয়তানের শরণাপন্ন হইল। শয়তান ফাউস্টকে নানা রূপরসের ভোগে একেবারে আবৃত করিয়া রাখিল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জভোগে তাহার বিন্দুমাত্র আনন্দলাভ হইল না। জ্ঞানমার্গেও তাহার যেমন ব্যর্থতা আসিয়াছিল, ভোগমার্গে তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যর্থতা ও বেদনা উপস্থিত হইল। ফাউস্ট বুঝিল, চিরন্তন সত্য-লাভের ক্ষমতা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ফাউস্টে গ্যেটে বলিতে চাহেন—মানুষ কেবল এই সত্যলাভের আদর্শকেই বুকে করিয়া জীবনপথে চলিবে—এই আদর্শ-লাভের সাধনাতেই তাহার জীবনের পূর্ণতা, তাহার চরম আত্মোন্নতির সম্ভাবনা। যে মানুষ এই চরম সত্য ও রহস্যলাভের আদর্শকে জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়, কোনো নৈতিক বা চারিত্রিক স্খলন-পতন বা কোনো সামাজিক কলঙ্ককালিমা তাহার অন্তর্নিহিত চরিত্র-গৌরবকে, তাহার চিরন্তন পবিত্রতাকে, তাহার দিব্য সৌন্দর্যকে ম্লান করিতে পারে না। মানুষ চিরন্তন সত্যান্বেষী—এই অন্বেষণের মধ্যে বিচিত্র ভালোমন্দ অভিজ্ঞতা এক-একটা স্তর মাত্র—তাহার পরিপূর্ণ সত্তার সহিত ইহাদের কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। মানুষের স্খলন-পতন-ত্রুটি তাহার জীবনে সত্য নয়—সেগুলি জীবনে এক-একটা আকস্মিক

ঘটনা মাত্র—ইহাদের ফলস্বরূপ যে চিরন্তন মহান মানব-চরিত্র ফুটিয়া বাহির হয়—তাহাই মানুষের স্বরূপ। গ্যেটের কথা,—

Man errs so long as he is striving ;
A good man through obscurest aspiration
Is ever conscious of the one true way.

মানুষের চরিত্র তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিণতি। কোনো নীতি বা ধর্ম বা ভালোমন্দের মাপকাঠি দিয়া মানুষকে বিচার করা বৃথা। সে তাহার অন্তর-প্রেরণায় ক্রমাগত সত্যপথে অগ্রসর হইতেছে।

এই তিন সাহিত্যের দিক্‌পাল মানবতার জয়ধ্বজা তাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে প্রোথিত করিয়াছেন। ইঁহারা মানব-প্রকৃতির সত্যদ্রষ্টা ঋষি—মানবজীবনের মহাসংগীতের উদ্‌গাতা। একটা বিরাট হিউম্যানিজম্‌ই তাঁহাদের সাহিত্যের সম্পদ। তাঁহাদের সাহিত্য এই পৃথিবীর সাধারণ খণ্ড-অখণ্ড, অপূর্ণ-পূর্ণ, পশু-দেব মানুষের জীবনবেদ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মানবতা ইঁহাদের মানবতা হইতে ভিন্ন। শেক্সপিয়ার কিংবা ভিক্টর হুগোর মানুষ সংসারের সমগ্র মানুষ, যার মধ্যে মন্দ এবং ভালো, পশুত্ব ও দেবত্ব দুইই বর্তমান। দেবত্ব অর্থে তাঁহারা কোনো মেটাফিজিক্যাল সত্তা মনে করেন নাই। মানুষের স্বাভাবিক বিবেক, প্রেরণা, জ্ঞান, ধর্মবোধ, সাধুতা, দয়া, স্নেহ, প্রেম, উচ্চতর প্রবৃত্তি—এক কথায় rationalityকেই তাঁহারা মানুষের উচ্চতর অংশ মনে করিয়াছেন। এই নিকৃষ্ট ও উচ্চতর বৃত্তির সংগ্রামে মানুষের মনের অনেক রহস্য আমরা দেখিতে পাই—মানুষের বিচিত্র রূপ বাহির হইয়া পড়ে; মানুষকে যেমন বিবেকহীন স্বার্থান্ধ দেখি, আবার কর্তব্যজ্ঞানে স্বার্থ বিসর্জন দিতেও দেখি। একদিকে যেমন ঘৃণা দেখি, অন্যদিকে তেমন প্রেমের প্রসারিত বাহু দেখি। সুতরাং মানুষ যে অবস্থাতেই থাক না, তাহার পশুত্ব যতই উৎকট হোক না, তাহার অন্তরের উৎকৃষ্ট অংশ—দেব-অংশ কখনোই নষ্ট হয় না। ইহাই মানুষের গৌরব। ইহাই তাহার হৃদয়ের শাশ্বত সৌন্দর্য। নানা পারিপার্শ্বিক কারণে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে নিন্দিত কর্ম করিতে পারে বটে, পরক্ষণেই তাহার ভুল বুঝিতে পারে, অনুশোচনা আসিতে পারে, উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। ইহাই সাধারণ মানবজীবনের রহস্য। শেক্সপিয়ার ও হুগোর মানুষ তাই মন্দ-ভালো-মেশানো সংসারের বাস্তব মানুষ।

গ্যেটের ফাউস্ট প্রকৃতপক্ষে একখানি রূপকনাট্য। একটা আইডিয়া বা তত্ত্বকে গ্যেটে তাঁহার নাটকে রূপ দিয়াছেন। মানুষের মনে একটা চরম সত্যের আদর্শ

আছে, সেই আদর্শে পৌঁছাইতে পারিলেই জগৎ ও জীবনের চরম রহস্য মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়। মানুষ সেই আদর্শ লাভের জন্য জীবনে প্রতিক্ষণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সে আদর্শ মানুষ জীবনে লাভ করিতে পারে না। কেবল ব্যাকুলভাবে সারাজীবন অন্বেষণই করিয়া যায়। ফাউস্ট সেই সত্যলাভের জন্য জ্ঞানযোগী হইল, কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না; শেষে চরম ভোগী হইল, তাহাতে প্রাপ্তি তো কিছুই হইল না, বরং আরো বেদনা ও অশান্তি লাভ করিল। জীবনের দুইটি বিপরীত দিকে সে ধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু কোনটিই তাহাকে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য দিল না। মানুষ জীবনে কেবল সত্যের অন্বেষণই করিবে—সেই অন্বেষণের মধ্যেই তাহার সার্থকতা। জ্ঞানের দ্বারা, কর্মের দ্বারা, বিচিত্র ভোগের দ্বারা সে জীবনব্যাপী অন্বেষণই করিয়া যাইবে. তাহাতেই তাহার জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ, তাহাতেই তাহার চরম প্রাপ্তি—ইহাই গ্যেটের জীবন-দর্শন।

গ্যেটের কাব্যে যে মানুষের কথা আছে, সে মানুষও এই সংসারেরই ভালোমন্দ মিশ্রিত মানুষ, তবে সে তাহার জীবনের চরম সত্যে, তাহার দেবত্বে বিশ্বাসী হইয়া তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু সে উপলব্ধি আলো-আঁধার-মিশ্রিত এই জীবনভোগের দ্বারাই সম্ভব হইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস। জীবনের একদেশ-দাশতায় নয়, জীবনের সমগ্রতাতেই সে সত্যকে পাইতে চায়। না পাইলেও, এই উচ্চ আদর্শের জন্য চেষ্টাতেই সে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস

প্রথম দিকের অপরিণত রচনা বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কাব্যধারায় মানুষের স্পর্শে আমরা প্রথম আসি 'কথা ও কাহিনী'তে। মানুষের বীরত্ব, ত্যাগ, মহত্ত্বের অনুপম কাব্যরূপ এগুলিতে আছে। ইতিহাস ও প্রাচীন সমাজের পট-ভূমিকায় এই সব নরনারীকে আমরা কবির অমর তুলিকার স্পর্শে অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত দেখি। তারপর 'পলাতকা'য় আমাদের গতানুগতিক, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের উপেক্ষিতা নারীদের কয়েকটা করুণ চিত্র আমরা দেখিতে পাই। সমাজের উপেক্ষা ও অবিচারে তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব যে পিষ্ট হইতেছে, কবি সেইটাই আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে তত্ত্বের গন্ধও আছে। তারপর শেষজীবনের কাব্যে মানুষের অন্তরাত্মার লাঞ্ছনায় কবি ব্যথিত হইয়া তাঁহার দুঃখ, বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্য পূর্বোক্ত সাহিত্যিকগণের সাহিত্যের মতো প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে প্রতিবিম্বিত করে নাই। মানুষের পশু-অংশ বা দেব-অংশের কোনো বাস্তব রূপই তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠে নাই। কেবল মানবসত্তা যে বিশ্বসত্তার অংশ, তাহার উপর অবিচার ও লাঞ্ছনায় যে

আমরা ভগবানকেই লাঞ্ছিত করিতেছি, এবং সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির দ্বারা মানুষের এই বৃহত্তর অংশের পূর্ণ-বিকাশ-সাধনাতেই তাহার চরম সার্থকতা—এই ভাব তাঁহার কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের মানুষ মেটাফিজিক্যাল মানুষ—ভগবানের অংশস্বরূপ তাঁহারই এক অত্যাশ্চর্য প্রকাশ-রূপ। সে সংসারের সাধারণ ভালো-মন্দ-মিশ্রিত মানুষ নয়।

কাব্যে এই সাধারণ মানুষের প্রকাশ না থাকিলেও তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'গল্পগুচ্ছ'-এ এই মানুষের অপূর্ব রূপায়ণ আছে। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে এই গল্পগুচ্ছেই আমরা মানুষের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্নার, তাহার হৃদয়ের নীচতা-উচ্চতা প্রভৃতির চিত্র—সমগ্র মানুষের চিত্র পাই। তাঁহার উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে 'চোখের বালি' মানুষের ভিত্তিভূমি হইতে অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টি। 'নৌকাডুবি'কে আমরা এই পর্যায়ে ধরিতে পারি, যদিও রচনাশিল্পে ইহা 'চোখের বালি' অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

তাহা ছাড়া অন্যান্য উপন্যাসগুলির মধ্যে তত্ত্ব, কাব্য এবং রোমান্সের সংমিশ্রণ আছে। এইসব উপন্যাসের নরনারী একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর নরনারী, তাঁহারই কবি-মানসের বিশিষ্ট রঙে রঞ্জিত। শেষ বয়সের মননশীল গল্পগুলিতেও এক বিশিষ্ট শ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। অতিসচেতন মননশীলতার সহিত একটি বিশিষ্ট স্তরের মানুষকে তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়া, তাঁহারই রচিত আবেষ্টনের মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিয়া, তাঁহারই নিজস্ব দৃষ্টি দিয়া তাহাকে দেখিয়া, অপূর্ব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা যে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর নরনারী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি বটে, কিন্তু এই সৃষ্টিতে মানবজীবনের স্বাভাবিক, স্বত-উৎসারিত গূঢ়তর রসবিলাস নাই। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ শক্তিধর লিরিক কবি। তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাণশক্তিই তাঁহার লিরিক্যাল প্রতিভা। লিরিক কবিরা সাধারণত আত্মমনঃসর্বস্ব—অতিমাত্রায় egoist. নিজের মনের রঙে তাঁহারা সংসার ও মানবজীবনকে রঞ্জিত করেন। তাঁহাদের রচনায় আত্মনিরপেক্ষতা বা detachment খুব কম। প্রবল আত্মচেতনা তাঁহাদের সৃষ্ট মানব-চরিত্রের উপর ছায়াপাত করে, নিজের আদর্শ বা কাব্যবিলাস দ্বারা তাঁহারা মানুষের স্বাভাবিক রূপকে আচ্ছন্ন করেন। এই গীতধর্মী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সহজ মানুষের প্রকাশ ও তাহার চরিত্রের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকে বাধা দিয়াছে। আর দ্বিতীয় কারণ, মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির যে লীলা, সাধারণ বাস্তব মানুষের নানা বাস্তব পারিপার্শ্বিকে যে অভিব্যক্তি, তাহারই যথাযথ বর্ণনা কথা-সাহিত্য বা নাটকের মেরুদণ্ড, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি নানাকারণে সে দিকে যাইতে পারে নাই। শেক্স্‌পিয়ার,

হুগো বা গ্যেটে কবি হইলেও তাঁহাদের আত্মনিরপেক্ষতা বা বাস্তব-সচেতনতা প্রবল ছিল, তাই নানা শ্রেণীর মানুষের চরিত্র-চিত্র অতো স্বাভাবিক ও জীবন্ত হইয়াছে। মেফিস্টোফিলিসের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর ফাউস্ট যে ভোগ, যে কামলীলার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহার বর্ণনা সম্ভব হইত না। অথচ গ্যেটের মতো আদর্শবাদীও জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসাস্বাদের দ্বারা জীবনের পরিপূর্ণতার একটা পরীক্ষা করার কল্পনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যেও দেখা যায় তাঁহার নরনারী কোনো নির্দিষ্ট ভাব ও তত্ত্বের বাহন মাত্র, কতকগুলি নাটক আকারে নাটক হইলেও প্রকৃত গীতিকাব্য।

এই সব ছাড়া রবীন্দ্রকাব্যে আরো দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার সহিত ইহার নিগূঢ় যোগ এবং ইহার অসাধারণ বৈচিত্র্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার বৈশিষ্ট্য—জগৎ ও জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করা ব্রহ্মকে সম্মুখে রাখিয়া। জগৎ ও জীবনকে একান্তভাবে গ্রহণ নয়—ভোগের জন্যই ভোগ নয়; ত্যাগের দ্বারা, ব্রহ্মানুভূতির দ্বারা ভোগকে পরিশুদ্ধ করিয়া, উন্নততর করিয়া, মহত্তর করিয়া গ্রহণ করা। এই ভারতীয় সাধনার মর্মবাণী উপনিষদে উচ্চারিত। এই বাণী কেবলমাত্র নেতিবাচক বা ত্যাগমূলক নয়। ইহা ভোগ ও ত্যাগের অপূর্ব সমন্বয়ের নিদর্শন। এই ত্যাগবিদ্ধ ভোগের আদর্শেই প্রাচীন ভারতের তপোবনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা হইত। সাধারণভাবেও প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রায়, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে এই আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের উপর এই ভাব ও আদর্শের যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। এই ভাব ও আদর্শের অনুভূতিই ব্যাপকভাবে তাঁহার কবি-মানসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি তিনি চাহেন নাই, সংসারের 'সহস্র বন্ধনমাঝে' তিনি 'মুক্তির স্বাদ' পাইতে চাহিয়াছেন। তপোবন-আদর্শ তাঁহার অতিপ্রিয়—এই ভোগ ও ত্যাগের মিলনই তাঁহার ভাব ও কল্পনাকে সবলে আলোড়িত করিয়াছে। ইহারই রূপ দিতে কবি কর্মীরূপে বিশ্বভারতী পর্যন্ত গড়িয়াছেন। এই আদর্শ ও তত্ত্বের অনুভূতিই মূলত তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। জগৎ ও জীবনকে তিনি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু সে ভোগ উন্নততর, পবিত্রতর ভোগ—এই জগৎ ও জীবনের আধারে চিরন্তন রূপ ও রসের ভোগ। ইহাদের শত-সহস্র সৌন্দর্য-মাধুর্য কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে, কারণ তাহাদের মধ্যে তিনি অসীম ও অনন্তকে দেখিতেছেন। এই ভাব ও আদর্শের প্রভাব তাঁহাকে ক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে সীমার মধ্যে অসীমের লীলার অনুভূতিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

জগৎ ও জীবনের খণ্ড রূপ ও রসে অখণ্ড ও অরূপ আত্মপ্রকাশ না করিলে তাঁহার কোনো সার্থকতাই নাই, আবার খণ্ড রূপ ও রসের কোনো বৈশিষ্ট্য বা মূল্যই নাই অখণ্ড ও অরূপের সঙ্গে যুক্ত না হইলে। সৃষ্টির মধ্য দিয়া স্রষ্টা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন,—তাই সীমায়-অসীমে, রূপে-অরূপে, বিশেষে-নির্বিশেষে চিরকাল অপরূপ লীলা চলিয়াছে। এই চিরন্তন লীলার অপূর্ব সৌন্দর্য, অসীম আনন্দ, সুনিবিড় রহস্য ও পরিপূর্ণ রস তাঁহার সাহিত্যে শতধারে উৎসারিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির ভিত্তি। তাঁহার "কাব্য-রচনায় একটিমাত্র পালা"—যাহার নাম তিনি দিয়াছেন—"সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা"। মূলত ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতি ও অধ্যাত্ম-সাধনার মর্মবাণী। এই বাণীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-মানসের ব্যাপক ও বিশিষ্ট অনুভূতিতে রূপান্তরিত করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যরস পরিবেষণ করিয়াছেন। জড় প্রকৃতির সহিত তাঁহার জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার অন্তরের সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে তিনি নবরূপে রূপায়িত করিয়াছেন। সান্ত মানুষের দেহ-মন-চিত্তের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্যের বিচিত্র অনুভূতি কতো মনোরম সুরে তাঁহার কাব্য-বীণায় বাজিয়াছে, আর তাহার বুকে তিনি জাগাইয়াছেন অনন্তের জন্য বিপুল আকাঙ্ক্ষা। জগৎ ও জীবনকে এইভাবে তিনি সীমায় ও অসীমে গ্রহণ করিয়াছে তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মূর্ত কাব্যময় প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা লক্ষ্য করিলে একটা জিনিস চোখে পড়ে—সেটা গতির একটা চলমান প্রবাহ। প্রকাশের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ক্রমাগত রূপ হইতে রূপে, রস হইতে রসে কবি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। বাহিরের স্থির প্রকাশের তলে-তলে কেমন একটা অতৃপ্তি ও অস্থিরতার ক্ষীণ সুর যেন লাগিয়া আছে, নূতনত্ব ও বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষা যেন তাঁহাকে ক্রমাগত পরিচালনা করিতেছে—নানা রূপে ও নানা রসে আত্মপ্রকাশের প্রেরণা জোগাইতেছে। তিনি কোনো একটা বিশিষ্ট রূপ ও রসের প্রকাশের মধ্যে বেশিদিন আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। এক আবেষ্টনীর গণ্ডী ভাঙিয়া, একপ্রকার রূপ ও রসের সীমা অতিক্রম করিয়া, তিনি নবতর প্রকাশের মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন; আবার সেখান হইতে চলিয়াছে যাত্রা ভিন্নপথের অভিমুখে। ইহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে বহুমুখী এবং সাহিত্য-সৃষ্টিতে আসিয়াছে বিপুল বৈচিত্র্য। কাব্যে, সংগীতে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কথিকায়, প্রবন্ধে, কতো রূপে, কতো রসে, কতো ভঙ্গীতে হইয়াছে তাঁহার আত্মপ্রকাশ।

মনে হয় এই পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্যের মূলে আছে কবি-মানসের একটা

অনুভূতি—সৃষ্টির নিরন্তর প্রবহমাণ গতিবেগের অনুভূতি। সৃষ্টির মধ্য দিয়া স্রষ্টার প্রকাশ হইয়াছে বিপুল গতির প্রবাহরূপে। পরম সত্য একটা dynamic force. এই গতি কোনো বন্ধন বা সীমা স্বীকার করে না, কোনো দেশ-কালে ইহা বিভক্ত নয়। আদি-অন্তহীন, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানব্যাপী, অখণ্ড প্রবাহের মধ্যে চরম সত্য আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। সৃষ্টির গতিবেগের এই অনুভূতি কবির ব্যক্তিজীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার জীবনও সৃষ্টির অঙ্গীভূত বলিয়া উহারও স্বরূপ নিরন্তর অগ্রসরমান—নিরন্তর পরিবর্তনশীল। এই অবিরাম সম্মুখে চলার মধ্যেই তাঁহার জীবনের সার্থকতা। কবির ভাব-জীবনকে এই অনুভূতি প্রভাবান্বিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে। বিশ্ব-শিল্পী বিশ্বজীবনে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, কবি-শিল্পীও তাঁহার ভাবজীবনে সেইভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কোনো বিশিষ্ট হৃদয়াবেগের বা ভাবধারার মধ্যে, কোনো সীমা বা বন্ধনের মধ্যে তিনি দীর্ঘকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সীমা ভাঙিয়া, বন্ধন ছিঁড়িয়া, ক্রমাগত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাকে নব নব রূপ ও ভাবের মধ্যে বারংবার চলিতে হইয়াছে বলিয়া তাঁহার কবি-সৃষ্টির বৈচিত্র্য হইয়াছে বিপুল। কোনো বিশিষ্ট রূপে বা রসে তিনি তাঁহার কবি-জীবনের পূর্ণ বা শেষ প্রকাশ বলিয়া অনুভব করেন নাই। যেখানে একবার শেষ টানিতে গিয়াছেন, সেখানেই 'অশেষ' নূতন 'দ্বার খুলিয়া' দিয়াছে, সীমার শেষে আসিতে না আসিতেই অসীমের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পথের হাতছানিতে কবি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন। কবি-প্রতিভার উন্মেষের সময় হইতেই কবি কিছু কিছু এই অকারণ, অবারণ চলার আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন, শেষে দীর্ঘ কবি-জীবনের শেষ পর্যন্ত এই 'পথ চলার' আনন্দে ক্রমাগত সম্মুখপানে অগ্রসর হইয়াছেন—এই গতিবেগের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

এই সৃষ্টিবৈচিত্র্যে রবীন্দ্র-কাব্যে বিভিন্ন ভাবধারার কাব্যগ্রন্থের সমাবেশ হইয়াছে। ভাবসাদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেগুলিকে এক-এক শ্রেণীতে সজ্জিত করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীনিবদ্ধ গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রকাব্যের এক-একটি যুগ নির্দেশ করে—সাধারণত একই ভাবধারার বিকাশ তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। তাই 'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে 'শেষলেখা' পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের কাব্যধারাকে কয়েকটি স্তর বা যুগে বিভাগ করা যায়। অবশ্য এ যুগ-বিভাগ হয়তো সর্বসম্মত, ও সর্বাঙ্গসুন্দর বা বিশেষতাৎপর্যবোধক না হইতে পারে, কারণ এক ভাবধারার কবিতা অন্য ভাবধারার গ্রন্থের মধ্যেও দু'চারিটি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে যে এক-এক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাই

সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যকে পাঁচটি প্রশস্ত ভাগে ভাগ করিয়া সেই সেই ভাগের বা যুগের বৈশিষ্ট্যের ভাব-প্রকাশক এক-একটা নাম নির্দেশ করা গেল।

(১) উচ্ছ্বাস-যুগ

'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রভাত-সংগীত', 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল' লইয়া যে যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কবি-প্রতিভার পরিণতির যুগ। রবীন্দ্রনাথের মতেও এ যুগের কাব্যে উচ্ছ্বাস ও অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়াবেগের প্রাবল্য বেশি। আবেগ সংহত ও গভীর হইয়া রসপরিণাম লাভ করিয়া শিল্পসম্মত প্রকাশলাভে সার্থক কাব্যে রূপায়িত হয় নাই।

(২) প্রকৃতি-মানব-রস-শিল্প-যুগ

'মানসী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতি ধরা যাইতে পারে। এই যুগে কবি প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমকে তাঁহার কাব্যের উপজীব্য করিয়াছেন। এই যুগের কাব্যে রূপ ও ভাবের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে, রূপজগৎ ও ভাবজগৎ তিনি সমানভাবে উপভোগ করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার রোমান্টিক শিল্প-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে। অনেকের মতে এইটিই তাঁহার কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ।

(৩) ভগবদ্‌রসলীলা-যুগ

'নৈবেদ্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'খেয়া'র মধ্য দিয়া 'গীতালি' পর্যন্ত এই যুগটি প্রসারিত হইয়াছে। এইটি কবির সহিত ভগবানের অতীন্দ্রিয় লীলার যুগ। এখানে প্রকৃতি ও মানব পিছনে পড়িয়াছে, কবি ভগবানের বিচিত্র অনুভূতিকেই তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু করিয়াছেন।

(৪) কাব্য-দর্শন-তত্ত্ব-যুগ

'বলাকা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'পরিশেষ'-এর মধ্য দিয়া 'বীথিকা' পর্যন্ত এবং 'নবজাতক' ও 'সানাই' পর্যন্তও এই যুগের ধারা চলিয়াছে। সৃষ্টির গতি ও প্রকৃতি, সৃষ্টির সহিত ভগবানের সম্বন্ধ, মানবের প্রকৃত স্বরূপ, মৃত্যুর স্বরূপ, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে গত জীবনের পর্যালোচনা ও তাহার স্বরূপ-নির্ণয়, তাঁহার ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ-নির্ণয়, অনিত্য জগৎ ও জীবনে নিত্যের লীলার বিস্ময় ও রহস্য, প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বরূপ-নির্ণয় ও তাহাদের প্রতি গভীর রোমান্টিক দৃষ্টি প্রভৃতির দার্শনিক চিন্তা ও তত্ত্বোপলব্ধি কাব্যরূপ পাইয়াছে এই যুগে। সৃষ্টি—প্রকৃতি-মানব—প্রত্যক্ষভাবে এ

যুগে কবিকে কাব্য-প্রেরণা দেয় নাই—ইহার চিন্তা বা তত্ত্ববোধই কাব্যের প্রেরণা জোগাইয়াছে।

(৫) ঔপনিষদিক যুগ বা আত্মোপলব্ধি-যুগ

'প্রান্তিক' হইতে 'সেঁজুতি', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা'র মধ্য দিয়া এ যুগের কাব্যধারাটি প্রবাহিত হইয়াছে। মানুষের অন্তরাত্মা মহান ব্রহ্মের অংশ—ভূমার জ্যোতির্মণ্ডলে তাহার নিত্যবাসস্থান। দেহরূপের মধ্যে আবদ্ধ হইলেও সে অসীম অনন্ত। জীবনে নানা আবিলতায় আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ তাহার নিত্যস্বরূপকে ভুলিয়া যায়। ইহাই উপনিষদের ঋষিদের অনুভূতি। এই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি—এই 'আত্মানং বিদ্ধি'র কথাই প্রধানত বিচিত্র ভাব-কল্পনার মধ্য দিয়া এ যুগের কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

‘সন্ধ্যাসংগীত’-এর পূর্ববর্তী রচনা

সাত-আট বৎসর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ ছন্দ মিলাইয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতা-রচনারম্ভ সম্বন্ধে কবি তাঁহার ‘জীবন-স্মৃতি’তে লিখিয়াছেন,—

“আমার বয়স তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যাম্‌লেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। বলিয়া পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষরে যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

পদ্য জিনিসটিকে এ পর্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবনাচিন্তা নাই, কোনোখানে মর্ত্যজনোচিত দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে একথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না…গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল তখন পদ্যরচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না।…ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে? কোনো একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল-কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম।

হরিণ-শিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা-সংগ্রহের উৎসাহে সাংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।”

এই সময় রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলে পড়িতেন ; ঐ স্কুলে সাতকড়ি দত্ত নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মাঝে মাঝে তিনি দুই চরণ কবিতা নিজে রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। একবার তিনি একটি কবিতার এই দুইটি লাইন দিয়া রবীন্দ্রনাথকে পূরণ করিতে বলেন—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘জীবন-স্মৃতি’তে লিখিয়াছেন,—

‘আমি ইহার সঙ্গে যে পদ্য জুড়িয়াছিলাম, তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে। আমার সেকালের কবিতাকে কোনো মতেই যে দুর্বোধ বলা চলে না তাহার প্রমাণস্বরূপ লাইন দুটোকে এই সুযোগে এখানে দলিলভুক্ত করিয়া রাখিলাম—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।'

অধুনা-বিলুপ্ত 'সখা ও সাথী' নামক এক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ, ১৩১২)। উহাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত জীবন-পরিচয়। পরবর্তী সংখ্যায় কবি ইহার কয়েকটি তথ্য সম্বন্ধে ভুলসংশোধন করেন; তাহাতে মনে হয়, এই জীবন-পরিচয়টুকু রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত। উহাতে কবির লেখা 'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে' লাইনটির পাঠভেদ দেখা যায়। 'জীবন-স্মৃতি'তে উদ্ধৃত 'হীন' শব্দটির স্থলে 'সখা ও সাথী'তে 'দীন' পাঠ ছিল। [রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ, 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন, ১৩৪৮]

কবি তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে এই সময়কার একটি ব্যক্তিগত বর্ণনামূলক কবিতার চার লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

আমসত্ত দুধে ফেলি' তাহাতে কদলী দলি',
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হাপুস্ শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

ইহার পর তের-চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত কবি অনেক খণ্ড-কবিতা লিখিয়াছেন এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্য হইতে কিছু কিছু অনুবাদও করিয়াছিলেন। এই সব রচনার কোনো কোনো অংশ সমসাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়, কোনো কোনোটা অনামেও প্রকাশিত হয়। ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য কিছু না থাকিলেও কবির কাব্য-প্রতিভা-বিকাশের ইতিহাসে ইহাদের উল্লেখ প্রয়োজন।

'অভিলাষ' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি অনামী কবিতা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১২৮১ সনের অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে লেখকের নাম ছিল না, নামের স্থলে কেবল 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' বলিয়া উল্লেখ ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই রচনাকে তাঁহার নিজের রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ('শনিবারের চিঠি,' ১৩৪৮, আশ্বিন)

কবিতাটির প্রথমাংশ এইরূপ :—

অভিলাষ

দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত

(১)

জনমনো-মুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ! অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার। তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

(২)

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

এই কবিতাটি যখন মুদ্রিত হয়, তখন কবির বয়স তের বৎসর সাত মাস। তাহারো এক বৎসর বা আরো কিছুদিন পূর্বে এই কবিতাটি রচিত।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার জন্য 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের হিন্দুমেলায় উহা পাঠ করেন। ঐ কবিতাটি ১২৮১ সালের ১৪ই ফাল্গুন, ইংরেজী ১৮৭৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তখনকার দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের নামসংযুক্ত প্রথম রচনা।

['প্রবাসী', ১৩৩৮, মাঘ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উল্লিখিত]

ইহার প্রথমাংশ এইরূপ :—

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত-শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়

২

স্তবধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল ;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ আর একটি কবিতা পাঠ করেন। তখন ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন। সেই সময় দিল্লীতে এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। সেই দরবারে দেশীয় রাজারা সমবেত হইতেছিলেন। কিন্তু তখন ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ। রবীন্দ্রনাথ সেই রাজাদের দাস-মনোবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করিয়া ঐ কবিতাটি লেখেন। কবিতাটির প্রথমাংশ এইরূপ :—

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারই সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ রবে !
শুনিতেছি নাকি শতকোটি দাস, মুছি অশ্রুজল নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে ?

[রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, ৭৯] পৃ

কবির ভ্রাতা ও তাঁহার সাহিত্যপ্রচেষ্টার উৎসাহদাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী নাটকে' রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের একটি দৃশ্য আছে। ঐ দৃশ্যের জন্য নাট্যকার প্রথমে একটি গদ্য বক্তৃতা রচনা করিয়াছিলেন। গদ্যবক্তৃতা ঐ স্থানের উপযোগী নয় এবং পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না বলিয়া কবি মত প্রকাশ করেন, এবং শেষে নিজেই ঐ স্থানের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি গান রচনা করিয়া দেন। গানটির প্রথমাংশ এইরূপ :—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরান স'পিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্‌রে যবন !—শোন্‌রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১৪৭]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৬) রবীন্দ্রনাথের এই গানটি মুদ্রিত হয়। গানটি এইরূপ :—

খাম্বাজ—একতালা

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে স'পিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
তাহলে আসুক বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।

জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন। স্কুলের লেখাপড়ায় যখন রবীন্দ্রনাথকে আর অগ্রসর করানো গেল না, তখন তিনি ভিন্নপথ ধরিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাংলায় অর্থ করিয়া 'কুমারসম্ভব' পড়াইতে লাগিলেন এবং 'ম্যাকবেথ'

নাটকের অর্থ বলিয়া দিয়া বাংলা ছন্দে তাহা অনুবাদ করাইয়া লইতে লাগিলেন। কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের অকাল-বসন্তের বর্ণনা ও মদনভস্মের অংশটুকুর কবি পদ্যে যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ :—

সংস্কৃত	বাংলা
কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ	সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য।	উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়,
দিগ্ দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন,	দক্ষিণের দিক্-বালা প্রাণের হুতাশে
ব্যলীক নিশ্বাসমিবোৎসসর্জ॥	অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিঃশ্বাস।
অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ,	নূপুর-শিঞ্জন-সহ সুন্দরী-কুলের
স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।	চারু পদ-পরশের বিলম্ব না সহি,
পাদেন নাপেক্ষত সুন্দরীণাং,	অশোকের কাঁধ হৈতে সর্বাঙ্গ ছাইয়া
সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ॥	ফুটিয়া উঠিল ফুল পল্লব সহিতে।
সদ্যঃপ্রবালোদ্গমচারুপাত্রে,	কচি কচি নবীন পল্লব উদ্গমে
নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।	সমাপ্তি লভিল যেই নব-চূত-বাণ,
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্,	বসাইল অলিবৃন্দ বসন্ত অমনি
নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য॥	কুসুম-ধনুর যেন নামাক্ষরগুলি।

[ভারতী, ১২৮৪, মাঘ, রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ ৮২]

'ম্যাকবেথে'র বঙ্গানুবাদের নমুনা এইরূপ :—

ইংরেজী

Scene I	A Desert Place
	Thunder and Lightning. Enter three witches.
First Witch—	When shall we three meet again In thunder, lightning, or in rain ?
Second Witch—	When the hurlyburly's done, When the battle's lost and won.
Third Witch—	That will be ere the set of sun.
First Witch—	Where the place ?
Second Witch—	Upon the heath.
Third Witch—	There to meet with Macbeth.
First Witch—	I come, Graymalkin !
Second Witch—	Paddock calls.

Third Witch— **Anon.**
All— **Fair is foul, and foul is fair:**
Hover through the fog and filthy air.

[Witches vanish]

বাংলা

প্রথম দৃশ্য।

বিজন প্রান্তর। বজ্রবিদ্যুৎ। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা— ঝড় বাদলে আবার কখন
মিলব মোরা তিনজনে।
২য় ডা— ঝগড়াঝাটি থাম্‌বে যখন
হারজিত সব মিটবে রণে।
৩য় ডা— সাঁঝের আগেই হবে সে তো;
১ম ডা— মিলব কোথায় বলে দে তো।
২য় ডা— কাঁটাখোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা— ম্যাকেথ সেথা আস্‌ছে আজ।
১ম ডা— কটা বেড়াল! যাচ্ছি ওরে
২য় ডা— ঐ বুঝি ব্যাঙ্ ডাক্‌চে মোরে!
৩য় ডা— চল্ তবে চল্ ত্বরা কোরে!
সকলে— মোদের কাছে ভালোই মন্দ,
মন্দ যাহা ভালো যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। প্রস্থান।

[ভারতী, ১২৮৭, আশ্বিন; শনিবারের চিঠি; ১৩৪৬, ফাল্গুন]

গিরিশচন্দ্র কর্তৃক ম্যাকবেথের অনুবাদ ইহার অনেক পরে হয়। ১২৯৯ সালে নব-প্রতিষ্ঠিত মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়; গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ চমৎকার ভাবব্যঞ্জক হইলেও নাটকীয় প্রয়োজনে তাহার মধ্যে কিছু কিছু অবান্তর শব্দযোজনা করা হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ সহজ, সরল ও মূলানুগ পদ্যানুবাদ যে ঐ বয়সের ছেলের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এই খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন রচনাবলী ছাড়া রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে অনেকগুলি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 'পৃথ্বীরাজ' নামে এক 'বীররসাত্মক কাব্য' লিখিবার কথা কবি 'জীবন-স্মৃতি'তে উল্লেখ করিয়াছেন। এই রচনাটি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে।

কবিই বলিয়াছেন, "তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।" ইহা ছাড়া 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পূর্ব পর্যন্ত নিম্নলিখিত কাব্যগুলি লিখিত হয়ঃ—

(ক) **বনফুল**
(খ) **ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী**
(গ) **কবিকাহিনী**
(ঘ) **রুদ্রচণ্ড**
(ঙ) **ভগ্নহৃদয়**
(চ) **শৈশব সংগীত**

যদিও ইহাদের মধ্যে দু'একখানি গ্রন্থ 'সন্ধ্যাসংগীত'এর পরে মুদ্রিত হইয়াছে, তবুও প্রথম রচনার কালানুসারে ইহারা 'সন্ধ্যাসংগীত'এর পূর্ববর্তী।

(ক) বনফুল

ইহা একখানি কাব্য-আখ্যায়িকা বা কাব্য-উপন্যাস। আট সর্গে বিভক্ত। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক মাসিক পত্রে ১২৮২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বইখানি কবির তের-চৌদ্দ বছর বয়সের রচনা। 'বনফুলে'র আখ্যানভাগ এইরূপ :—

লোকালয় হইতে বহুদূরে, গভীর, বিজন কাননে এক কুটীর। সেই কুটীরে বালিকা কমলা পিতার সঙ্গে বাস করে। শৈশবে মাতার মৃত্যুর পরে সে পিতার সঙ্গে আছে ও তাহার পিতা ছাড়া অন্য কোনো মানুষ দেখে নাই। বনের পশু-পক্ষী-তরুলতাই তাহার একমাত্র সাথী—তাহাদের সঙ্গেই তাহার আত্মীয়তা। কমলার বয়স যখন ষোল বৎসর, সেই সময় তাহার বাবা মারা গেলেন। নিরাশ্রয়া ষোড়শী কমলা পিতার শোকে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। সেই সময় বিজয় নামে পথভোলা এক পথিক সেই কুটীরে আসিয়া উপস্থিত। সে নিকটস্থ নদী হইতে জল আনিয়া কমলার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তারপর নিরাশ্রয়া কমলাকে লোকালয়ে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিল। কিন্তু কমলা এতদিন নির্জন প্রকৃতির কোলেই দিন কাটাইয়াছে, মনুষ্য-সমাজের সংস্পর্শে আসে নাই, সে লোকালয়ে আসিয়া মন বসাইতে পারিল না। মনুষ্য-সমাজের কোনো রীতি-নীতির জ্ঞান তাহার নাই, বিবাহের কি অর্থ সে বোঝে না। সে মনে-মনে বিজয়ের বন্ধু নীরদকে ভালোবাসিল ও তাহার ভালোবাসা ব্যক্ত করিল। নীরদ তাহার বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না বলিয়া কমলাকে তাহার স্বামীর প্রতি চির-অনুরক্ত থাকিতে উপদেশ দিল। কমলা

তাহা বুঝিল না, সে কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে বিজয় নীরদের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে হত্যা করিল। নীরদের মৃতদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত করা হইল। কমলা লোকালয় ত্যাগ করিয়া আবার তাহার বনভূমির নির্জন কুটীরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আর সে পূর্বের বনভূমিকে ফিরিয়া পাইল না। এখানকার সহিত তাহার সম্বন্ধ চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখানে আর সে পূর্বের শান্তি ও আনন্দ পাইল না।

বালক-কবির এই কাব্যের আখ্যান-ভাগ নির্মাণে 'টেমপেস্ট', 'শকুন্তলা' ও 'কপালকুণ্ডলা'র বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে গৃহ-শিক্ষকের নিকট এসব গ্রন্থ মোটামুটি পড়িয়াছিলেন। ইহাদের কাব্যাংশ তরুণ কবি-মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। এই বই যখন পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তখন ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় 'শকুন্তলা'র 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলুনং কররুহৈঃ' লাইনটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আশ্রম-লালিতা শকুন্তলার সহিত তাঁহার নায়িকা বিজন-বনবাসিনী কমলার সাদৃশ্যের কথা পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবার ইচ্ছা যেন কবির ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শকুন্তলা অপেক্ষা মিরাণ্ডা বা কপাল-কুণ্ডলার সহিতই কমলার বেশি সাদৃশ্য আছে। মিরাণ্ডার মতো কমলাও একমাত্র পিতার সহিত মনুষ্যসংস্রবহীন বিজন স্থানে বাস করিত। নিজেদের ছাড়া মিরাণ্ডা ফার্ডিন্যাণ্ডকেই প্রথম দেখিল এবং প্রথম দর্শন হইতেই তাহাকে ভালোবাসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কমলার হৃদয়ে বিজয়ের প্রতি কোনো ভালোবাসা জন্মে নাই। বিবাহের পরেও কমলার হৃদয়ের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। কপালকুণ্ডলারও বিবাহের পর নবকুমারের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা জন্মে নাই। কমলা ও কপালকুণ্ডলা উভয়েরই জীবনের ট্র্যাজেডির মূল এইখানে। শকুন্তলা যদিও লোকালয়ের বাহিরে অরণ্য-ভূমিতে জীবন যাপন করিত, তবুও মানুষের সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ছিল। আশ্রম লোকালয়ের বাহিরে হইলেও মনুষ্য-সংস্পর্শহীন নহে; আশ্রমের একটা রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার ছিল ও সেখানে গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করা হইত। তাই, শকুন্তলা ভালোবাসিয়াছিল, বিবাহ করিয়াছিল ও বিচ্ছেদের পরে শেষে পুনর্মিলিত হইয়াছিল। শকুন্তলার জীবনে অরণ্য ও লোকালয়ের কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় নাই।

প্রেম নারী-হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি; মনুষ্য-সমাজের সংস্পর্শে না আসিলেও ইহা যে বিকশিত হইবে না, তাহা নয়। অন্য কোনো প্রবল বিরুদ্ধ কারণ না থাকিলে, প্রথম যুবককে দেখা মাত্রেই যে বিজন-বন-বাসিনী যুবতীর মনে প্রেম-সঞ্চার হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কপালকুণ্ডলা এই প্রেমের কোনো স্পন্দন

অনুভব করে নাই, কাপালিকের হাত হইতে নবকুমারকে রক্ষা করা একটা সাধারণ করুণা মাত্র। বিবাহের পরবর্তী জীবনে সে অনেকটা উদাসিনীর মতো রহিয়াছে এবং সংসারের সংস্পর্শ তাহার আরণ্য-প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। তাই তাহার বিরুদ্ধে নবকুমারের সন্দেহ স্বাভাবিকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে ও তাহার শোচনীয় পরিণাম ঘটাইয়াছে। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকেরা নারীকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করেন,—mother woman, lover woman ও neuter woman। অবশ্য এই তিন প্রকার মনোবৃত্তির কমবেশি মিশ্রিত সত্তাও সম্ভব, তবে নারীর চিত্তবৃত্তির এই তিনটিই মূল ও ব্যাপক ধারা। Neuter womanরা সাধারণ ও স্বাভাবিক যৌন-আবেদনে সচেতন নয়। তাহার কারণ কতকটা বংশানুক্রম বা জন্মকালীন শরীরযন্ত্রের অবস্থার মধ্যে আছে, কতকটা আছে প্রথম জীবনের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। কপালকুণ্ডলা ঐরূপ একটা neuter woman. তাহার এই স্ত্রীজনোচিত মনোবৃত্তির অভাবের কারণ—তাহার প্রথম জীবনের পারিপার্শ্বিক ও আবহাওয়া, এবং এই প্রভাব তাহার উপর এত বেশি ছিল যে সাংসারিক জীবনে তাহার মনোবৃত্তির কোনো পরিবর্তন হয় নাই। সেই চিরকালই সরল, সংসারানভিজ্ঞ ও জীবনের সাধারণ আকর্ষণের বস্তুতে উদাসীন রহিয়া গিয়াছে। কপালকুণ্ডলার চরিত্র এইরূপ একটা টাইপে পরিণত হইয়াছে এবং সুদক্ষ শিল্পীর হাতে আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

বালক-কবির কমলা-চরিত্রের পরিকল্পনাতেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। বিজন-বন-বাসিনী কমলা প্রথম-দৃষ্ট পুরুষকে ভালোবাসে নাই, বাসিয়াছে দ্বিতীয়কে। সে প্রেমহীনা নয়, বরং অতিমাত্রায় প্রেমে আবেগময়ী। সংসারের সংস্পর্শে সে মানুষকে চিনিয়াছে—তীব্রভাবে প্রেম অনুভব করিয়াছে,—

জেনেছি মানুষ কাহারে বলে !
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে !
জেনেছি রে হায় ভালোবাসিলে
কেমন আগুন হৃদয়ে জ্বলে !

প্রেমহীন বিবাহের বন্ধনকে সে মানিতে চায় না, সংসারের মানদণ্ডে নির্ধারিত পাপ-পুণ্যের সে ধার ধারে না, প্রেমই তাহার জীবনের একমাত্র চালনী শক্তি,—

বিবাহ কাহারে বলে জানি না তো আমি—
কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী ;
এইটুকু জানি শুধু এইটুকু জানি—
দেখিবারে আঁখি মোর ভালোবাসে যারে,

শুনিতে বাসি গো ভালো যার সুধাবাণী
শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে।

স্বামীর কাছে একথা গোপন করিতেও তাহার কোনো লজ্জা নাই,—

বিজয়েরে বলিয়াছি প্রাতঃকালে কাল—
একটি হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান!
নীরদেই ভালোবাসা দিব চিরকাল,
প্রণয়ের করিব না কভু অপমান!

বিজয় নীরদকে চিরকালের মতো তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছে শুনিয়া কমলা দারুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিতেছে—

কমলা তোমারে আহা ভালোবাসে ব'লে
তোমারে করেছে দূর নিষ্ঠুর বিজয়!
প্রেমেরে ডুবাব আজ বিস্মৃতির জলে,
বিস্মৃতির জলে আজি ডুবাব হৃদয়!
তবুও বিজয় তুই পাবি কি এ মন?
নিষ্ঠুর আমারে আর পাবি কি কখন?
পদতলে পড়ি মোর, দেহ কর ক্ষয়—
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয়?

বিজয়ের ছুরিকাঘাতে যখন নীরদ মারা গেল, তখন কমলা বিজয়কে অভিসম্পাত দিতেছে,—

রক্তে লিপ্ত হয়ে যাক বিজয়ের মন!
বিস্মৃতি! তোমার ছায়ে রেখো না বিজয়ে!
শুকালেও হৃদিরক্ত এ রক্ত যেমন
চিরকাল লিপ্ত থাকে পাষাণ-হৃদয়ে!
বিষাদ! বিলাসে তা'র মাখি' হলাহল
ধরিও সম্মুখে তার নরকের বিষ!

কমলা আবার তাহার অরণ্যবাসে ফিরিয়া আসিল; সংসারের বেশ-বাস পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিল, বেণী খুলিয়া চুল আলুলায়িত করিল, কিন্তু তরুলতা পশুপক্ষীর সহিত আর পূর্বের মতো মিলিতে পারিল না। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ায় সে স্বর্গচ্যুত হইয়াছে। বাহিরের প্রকৃতির সবই ঠিক আছে। কেবল তাহার মনের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সে ভিতর ও বাহিরের মিলন করিতে না পারিয়া মৃত্যুতে জীবন শেষ করিল।

কমলার চরিত্রে বন্য-প্রকৃতির হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য আবেগ-প্রবণতা ও দ্বিধাহীন আত্মপ্রকাশের সাহস যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মনুষ্য-সভ্যতার স্পর্শমুক্ত সে যেন এক আদিম নারী। সে যাহাকে ভালোবাসিয়াছে, সমস্ত পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র তাহাকেই চিরদিনের মতো ভালোবাসিয়াছে, তাহার জন্য কষ্ট সহ্য করিয়াছে ও শেষে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। শকুন্তলার হৃদয়ের সৌন্দর্য ও মাধুর্য উহার নাই, কপালকুণ্ডলার রহস্যময় উদাসীনতাও নাই বা মিরাণ্ডার স্নিগ্ধ সৌকুমার্যও নাই। সে যেন সূক্ষ্ম-অনুভূতিহীন, প্রবৃত্তি-তাড়িত বন্য নারী। এইদিক দিয়া কমলার চরিত্র-কল্পনায় বালক-কবির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তবে এই চরিত্র কোনো সর্বাঙ্গীণ রসরূপ লাভ করে নাই। এই বয়সের কবির কাছে জটিল নারী-চরিত্র-চিত্রণ আশা করা বৃথা।

'বনফুলে'র চরিত্র-চিত্রণ অকিঞ্চিৎকর হইলেও, এবং নানা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও, বালক-কবির যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন ইহাতে পাওয়া যায়। ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর অনুসরণ করিতেছেন, ইহা বেশ বোঝা যায়। এই পুস্তকের স্থানে স্থানে প্রকৃতির ও মানুষের যে বর্ণনা আছে, সহজ স্বাভাবিকতা ও অকৃত্রিম সরলতায় সেগুলি সুন্দর ও সার্থক হইয়াছে। কমলা তাহার আজন্মের অরণ্যবাস ছাড়িয়া বিজয়ের সহিত লোকালয়ে যাইতেছে; শকুন্তলার মত সেও বনভূমির পশুপক্ষীকে ছাড়িয়া যাইতে বেদনা অনুভব করিতেছে,—

হরিণ সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি'
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়।
ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি',
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়!
তাদের করিয়া ত্যাগ রহিব কোথায়?

সপ্তম সর্গে শ্মশানের বর্ণনায় শ্মশানের ভয়ংকরতার একটা সহজ ও স্বাভাবিক রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

গভীর আঁধার রাত্রি, শ্মশান ভীষণ!
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন!
... ...
শ্মশানে আঁধার ঘোর ঢালিয়াছে বুক!
হেথা হোথা অস্থিরাশি ভস্ম-মাঝে লুকাইয়া মুখ!
পরশিয়া অস্থিমালা তটিনী আবার সরি' যায়
ভস্মরাশি ধুয়ে ধুয়ে, নিভাইয়া অঙ্গার শিখায়!

বিকট দশন মেলি' মানব-কপাল—
ধ্বংসের মরণস্তূপ—ছড়াছড়ি দেখিতে ভয়াল!
গভীর আঁখিকোটর আঁধারেরে দিয়েছে আবাস
মেলিয়া দশনপাঁতি পৃথিবীরে করে উপহাস।

নারী-হৃদয়ের প্রথম অনুরাগের চিত্রটি বালক-কবি চমৎকার আঁকিয়াছেন। নীরদকে প্রথম দেখিয়া কমলার চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে—

চাহিতে নারিনু মুখপানে তাঁর,
মাটির পানেতে রাখিয়ে মাথা
সরমে পাশরি বলি বলি করি'
তবুও বাহির হ'লো না কথা!
কাল হ'তে ভাই, ভাবিতেছি তাই
হৃদয় হয়েছে কেমনধারা!
থাকি' থাকি' থাকি' উঠিলো চমকি'
মনে হয় কার পাইনু সাড়া!
... ...
দেখি' দেখি' থাকি' থাকি' আবার ফিরায়ে আঁখি
নীরদের মুখপানে চাহিল সহসা—
আধেক মুদিত নেত্র, অবশ পলক-পত্র,
অপূর্ব মধুর ভাবে বালিকা বিবশা!

কবির এই প্রথম কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়। যে আদর্শ কবির ভাব ও কল্পনাকে সারাজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহার একটা ছায়াপাত হইয়াছে ইহার মধ্যে। প্রকৃতির সহিত মানবের যে নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানা রূপে, নানা রসে ব্যক্ত হইয়াছে, এই বাল্য-বয়সের রচনার মধ্যে তাহার অঙ্কুরোদ্গম দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি ব্যতীত মানব সংসারের নানা আবিলতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাহার বৃহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার লোকালয়ের বাহিরে কেবল প্রকৃতির নিজস্ব অঙ্গনে মানব-জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ হয় না। তাই প্রকৃতি ও মানুষের পূর্ণ মিলন হওয়া প্রয়োজন। কবি এই মিলনের আদর্শ দেখিয়াছেন প্রাচীন ভারতের তপোবনে। তপোবন লোকালয়ের বাহিরে থাকিলেও, সেখানে গার্হস্থ্যজীবন প্রতিপালিত হয় ও একটা সমাজ সেখানে বর্তমান। সেখানে কেবল ব্যক্তিগতভাবে নহে, সমাজগত ভাবেও প্রকৃতির সহিত মানুষের মিলন সংঘটিত হয়। লোকালয়ের আবিলতা সেখানে নাই, আবার বিজন বনের অসম্পূর্ণতা ও সংকীর্ণতাও সেখানে নাই। এই

স্থানই মানুষের দেহ-মন-চিত্তের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র। কবি এই তপোবন-আদর্শকে চিরকাল গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। বিজন-কাননে পালিত হওয়া এবং পিতা ব্যতীত অন্য পুরুষকে না দেখার মধ্যে যে দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহাই কমলার সংসার-জীবনের ট্রাজেডির মূল বলিয়া বালক-কবি যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন। তপোবনে বাস করার দরুণ শকুন্তলার জীবনে এ ট্র্যাজেডি ঘটিবার অবকাশ হয় নাই।

(খ) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হইলেও, ১২৮৪ সালে, প্রথম বর্ষের 'ভারতী'তে (আশ্বিন-চৈত্র সংখ্যায়) ইহার কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবির কাব্য-প্রতিভার ক্রম-বিকাশে এই গ্রন্থ কোনো একটা ধারা বা স্তর নির্দেশ করে না। ইহা একটা সার্থক অনুকরণ মাত্র, কবির নিজস্ব প্রতিভার কোনো ছাপ বা বৈশিষ্ট্য ইহাতে নাই।

সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। কিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত সেই কাব্যসংগ্রহ পাঠ করিতেন। বিদ্যাপতির বিকৃত মৈথিলী পদগুলি ও অন্যান্য পদকর্তাদের ব্যবহৃত ব্রজবুলি ভাষা রবীন্দ্রনাথের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। এই অপ্রচলিত ভাষা ও ছন্দ তাঁহার মনে একটা রহস্যের জাল বুনিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে এই প্রাচীন কাব্য-রহস্য সন্ধান ছাড়াও তিনি নিজেকে রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবেন। এ সম্বন্ধে তিনি 'জীবন স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন,—

"গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।"

আত্মগোপন করিয়া ভানুসিংহ ঠাকুরের বেনামীতে পদগুলি প্রকাশ করিবার আর একটি কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয় চৌধুরীর নিকট ইংরেজ কবি চ্যাটারটনের গল্প শুনিয়াছিলেন। কিশোর-কবি চ্যাটারটন প্রাচীন কবিদের ভাষা ও ছন্দের অনুকরণ করিয়া Rowley Poems নামে এক কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন

ও ঐগুলি রাউলি নামে ব্রিস্টলের জনৈক অধিবাসীর লেখা বলিয়া প্রচার করেন। চ্যাটারটন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে বহুদিন র্যন্ত অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথও 'কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটারটন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত' হইলেন।

বর্তমানে প্রচলিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থে পরিণত হাতের অনেক পরিবর্তন আছে। পূর্বের লেখা অনেক কবিতা বাদ দেওয়া হইয়াছে ও নূতন কবিতা সংযোজিত হইয়াছে। 'সজনি গো, আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা' এই কবিতাটি ১২৮৪ সালে, আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে কবি উহার এইরূপ পরিবর্তন করিয়াছেন—'সজনি গো, শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' (বর্তমান নং ১৩)। অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'ভারতী'তে বাহির হয়—'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' (বর্তমান নং ৮)। এই পদটি রচনা সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,—

"সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন আকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরের এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে।' লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম"—জীবনস্মৃতি

পৌষ-সংখ্যায় 'বাজাও রে মোহন বাঁশী' পদটি প্রকাশিত হয় (বর্তমান নং ১০)। মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—'হম সখী দরিদ নারী'। কিন্তু প্রচলিত গ্রন্থে উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং ফাল্গুন-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সখী রে, পিরীত বুঝাবে ক' পদটিও বাদ দেওয়া হইয়াছে।

'ভানুসিংহের পদাবলী' যখন 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন সমসাময়িক সাহিত্য-ক্ষেত্রে বেশ একটু চাঞ্চল্য ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল উহা কোনো প্রাচীন পদকর্তার পদ। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন,—

"আমার বন্ধুটিকে (প্রবোধচন্দ্র ঘোষ) একদিন বলিলাম—সমাজের লাইব্রেরী খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি। এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।' তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম এ লেখা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয়ই বাহির হইতে পারে না, কারণ, এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'নিতান্ত মন্দ হয় নাই।'

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্মনিতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি

বই লিখিয়াছেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।"

অবশ্য এই বই লিখিয়া নিশিকান্ত ডক্টর উপাধি পান নাই, তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল, The Jatras or the Popular Dramas of Bengal; তবে রবীন্দ্রনাথের এইরূপ ধারণা ছিল।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে লোকে জানিত যে উহা কোনো প্রাচীন বৈষ্ণব কবির লেখা। ১২৮৬ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতীতে কবি চ্যাটারটন সম্বন্ধে একটি গল্প লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ কবির ছদ্মনাম গ্রহণকে সমর্থন করিয়া যে যুক্তির অবতারণা করেন, প্রকৃতপক্ষে উহা তাঁহার নিজেরই ছদ্মনাম গ্রহণের কৈফিয়ৎ,—

"একটি প্রাচীন ভাষায় রচিত ভালো কবিতা শুনিলে তাহারা (সাধারণে) বিশ্বাস করিতে চায় যে তাহা কোনো প্রাচীন কবির রচিত। যদি তাহারা জানিতে পারে যে, সে সকল কবিতা একটি আধুনিক বালকের লেখা তাহা হইলে তাহারা কি নিরাশ হয়! তাহা হইলে হয় তো তাহারা চটিয়া যায়, তাহারা সে কবিতাগুলির মধ্যে কোনো পদার্থ দেখিতে পায় না, নানাপ্রকার খুঁটিনাটি ধরিতে আরম্ভ করে। যদি বা কেহ সে সকল কবিতার প্রশংসা করিতে চায়, তবে সে নিজে একটি উচ্চতর আসনে বসিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি গম্ভীর স্নেহের স্বরে বলিতে থাকে যে, হাঁ৷ কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই এবং বালককে আশা দিতে থাকে যে বড় হইলে চেষ্টা করিলে সে একজন কবি হইতে পারিবে বটে তাহাদের যদি বল, এ সকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই···এরূপ অবস্থায় একজন যশোলোলুপ কবি-বালক কি করিবে?"

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র প্রকৃত লেখক কে এই প্রশ্ন লইয়া বোধ হয় সমসাময়িক সাহিত্য-জগতে বহুদিন আলোচনা চলিয়াছিল। এই আলোচনা-কারীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া ১২৯১ সালের 'নবজীবন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে এক অনামা ব্যঙ্গ-প্রবন্ধ লেখেন। উহার একাংশ এইরূপ,—

"ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারিপ্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃষ্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্বে।···আবার কোন কোন মূর্খ গোপনে আত্মীয়বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন।"

এই কবিতাগুলিতে যে কেবল একটা অনুকরণ-চাতুর্যই প্রকাশিত হইয়াছে এ উহারা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রতিভার অকৃত্রিম নিদর্শন নয়—একথা কবি নিজেই বলিয়াছেন,—

"ভানুসিংহ যিনিই হৌন তাঁহার লেখা যদি বর্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহারা ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়

দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহার মাতৃভাষা নহে, ইহা একটি কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতী টুংটাং মাত্র।" (জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৪৫)

তবুও এই গ্রন্থের মধ্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যাহা কেবলমাত্র অনুকরণের ফল বলিয়া মনে হয় না,—তাহারা বাস্তবিকই কাব্যসৌন্দর্যের অধিকারী। ইহার সবগুলি পদই একসময়ে লেখা নয়, পরবর্তী সময়ে লিখিত পদও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, এবং পদগুলির বর্তমান যে রূপ তাহার মধ্যে কবির পরিণত হাতের অনেক প্রসাধন আছে। 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' পদটি কড়ি ও কোমলের যুগে রচিত। ইহার মধ্যে ভাবের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা সাধারণতঃ এই শ্রেণীর বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে দেখা যায় না।

চৈতন্যপরবর্তী যুগে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের রচনায় ব্রজবুলি প্রয়োগের অপূর্ব নৈপুণ্য দেখা যায়। তাহার পর অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে 'ব্রজবুলি' ব্যবহার করিয়া বৈষ্ণব কবিতা লেখা বিরল হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এ যুগে প্রাচীন পদকর্তাদের অনুকরণে ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করিয়া বৈষ্ণব কবিতা লেখেন। ইহাই বোধহয় বাঙালী কবির হাতে ব্রজবুলির শেষ ব্যবহার।

ছেলেবেলাতেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর দিকে আকৃষ্ট হন ইহার কাব্যসৌন্দর্যে ও ব্রজবুলি ভাষার ধ্বনি-মাধুর্যে।

পরবর্তী জীবনে কবি-মানসের উপর বৈষ্ণবপদাবলীর যে অসাধারণ প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহার সূত্রপাত হয় জীবনের এই প্রথম পর্বে। অনেককাল পরে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ, রস, ভাষা, ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট, অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম।"

(পত্র, ২০ আষাঢ়, ১৩১৭; প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৪)

(গ) কবিকাহিনী

ইহা একখানি খণ্ডকাব্যবিশেষ। চার সর্গে বিভক্ত। ১২৮৪ সালে 'ভারতী'র পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় ইহা প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স এই সময় ষোল বৎসর। ১২৮৫ সালে ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ইহাই কবির

প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ। 'বনফুল' ইহার দুই বৎসর পূর্বে রচিত ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও 'কবিকাহিনী'ই পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন,—

"এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়।"

'কবিকাহিনী'র আখ্যান ভাগ এইরূপ :—এই কাব্যের নায়ক এক কবি। শৈশব হইতেই কবি প্রকৃতির সান্নিধ্যে বাস করিতেছে ও প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যের সঙ্গে যেন একপ্রাণ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্যে কখনো কবি মুগ্ধ-বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে, কখনো স্তবগান করিতেছে। প্রকৃতিকে লইয়া কবি একেবারে তন্ময় হইয়া আছে। ক্রমে কবির বয়স বাড়িতে লাগিল। তখন কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া কবির হৃদয় তৃপ্ত হইল না। কবি অনুভব করিতেছে—কোথায় যেন জীবনের একটা বিরাট ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। ক্রমে কবি বুঝিল, মানুষের হৃদয় না হইলে মানুষের মন তৃপ্ত হয় না। প্রকৃতি আর কবির মনকে পূর্বের মতো পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারিল না। শূন্য-হৃদয়ে কবি বনে বনে বেড়াইতেছে। একদিন অপরাহ্নকালে শ্রান্ত হইয়া কবি এক গাছের তলায় শুইয়া পড়িল। এমন সময় এক বালিকা আসিয়া তাহার শিয়রে দাঁড়াইল ও তাহার উদাস ও বিষাদাচ্ছন্ন মূর্তি দেখিয়া তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কবি তাহার নিকট মনের কথা বলিল। এতদিন পরে কবির হৃদয় যেন একটু শান্তি পাইল। বালিকা কবিকে তাহার পর্ণকুটিরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

এই বালিকার নাম নলিনী। নলিনী 'বনফুলে'র নায়িকা কমলার মতো প্রকৃতির কন্যা—বনের পশু-পক্ষী-তরুলতার সহিত তাহার হৃদয়ের মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। কুটীরে একত্র বাস করিতে করিতে উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা জন্মিল। অনেক দ্বিধাসঙ্কোচের পর কবি তাহার ভালোবাসা প্রকাশ করিল, নলিনীও তাহার প্রণয় ব্যক্ত করিল। উভয়ে কিছুদিন উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ঐ কুটীরে বাস করিল। কিন্তু নলিনীর প্রেমে কবির চিত্ত ভরিল না। কবির মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, সে যাহা চাহে, তাহা পায় না। স্বল্পে সন্তুষ্ট হইবার মতো কবির মন নয়। চরম পরিতৃপ্তির সন্ধানে কবি দেশভ্রমণে বাহির হইল। কবি কতো দেশ ভ্রমণ করিল, কতো দুর্গম গিরিনদীকান্তার অতিক্রম করিল, কিন্তু কোনো শান্তি ও তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইল না। সর্বদাই নলিনীর কথা মনে জাগে—নলিনীর বিরহে প্রকৃতির সৌন্দর্যও তাহাকে তৃপ্তি দেয় না। এদিকে কবি চলিয়া যাওয়ায় নলিনীর হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল—ক্রমে সে মরণ-দশায় উপস্থিত হইল। তাহার বড় সাধ—কবিকে

একবার দেখিয়া মরিবে। নানাদেশ ঘুরিয়া কবি অবশেষে কুটীরে ফিরিল। কিন্তু নলিনী তখন চির-নিদ্রায় শায়িতা—কবির সহিত আর তাহার দেখা হইল না।

নলিনীর মৃত্যু-শোকের মধ্য দিয়া কবি জগতের সব-কিছুর নশ্বরতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া শান্তিলাভ করিল। ক্রমে কবি বার্ধক্যে উপস্থিত হইয়া হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল ও সেখানে, ভবিষ্যতে যে পৃথিবীতে সাম্য ও মৈত্রীর যুগ আসিবে, এই বিশ্বাস বুকে ধরিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

'কবিকাহিনী' কাব্যের নায়ক কবি একরূপ প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত হইয়াছে—প্রকৃতির ক্রোড়ে খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে। ছেলেবেলায় সে

জননীর কোল হতে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা।
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধানের শীষ দুলিছে পবনে;
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।

প্রকৃতির সহিত কবির যোগ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল,—

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মতো।
নিজের মনের কথা যতো কিছু ছিল
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে,
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।

রবীন্দ্রনাথের ••বাল্যজীবন••'ভৃত্যদের শাসনে একটা বন্ধন-দশার মধ্যে কাটিয়াছিল। বাড়ির বাহিরে যাইবার অবাধ অধিকার তাঁহার ছিল না। তাই নগ্ন প্রকৃতিকে মুখোমুখি দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার ছেলেবেলায় কোনোদিন হয় নাই। এ সম্বন্ধে তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন,—

"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম।

বাহির বলিয়া একটা অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ ;—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।"

রবীন্দ্রনাথ 'কবিকাহিনী'র নায়কের বেনামীতে তাঁহার শৈশবের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছেন।

কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া কবি-চিত্ত তৃপ্ত হইল না,—

এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর ?
মনের মন্দির মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

কারণ,

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—

প্রকৃতির কোনো রূপই

পারে না পূরিতে তারা বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।

তারপর উভয়ে উভয়ের ভালোবাসায় মগ্ন হইয়া থাকিলেও কবির মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হইল না। এক প্রাপ্তিই তাহার কাছে চরম প্রাপ্তি নয়। আকাঙ্ক্ষা তাহার অপরিসীম। সে নলিনীকে বলিল,—

স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে দেবী
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র সম আছে যাহাদের মন
তাহাদের তরে দেবী নহে এ পৃথিবী।

কবি নলিনীকে পরিত্যাগ করিয়া বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও শান্তি পাইল না। শেষে ঘুরিয়া আসিয়া দেখিল নলিনী মহানিদ্রায় শায়িত। অনেক দুঃখশোকের পর বৃদ্ধবয়সে, মৃত্যুর পূর্বে কবি শেষ সান্ত্বনা লাভ করিল যে, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এক স্বর্গরাজ্য বিরাজ করিবে—কেহ কাহাকেও দ্বেষ-হিংসা-ঘৃণা করিবে না—সকলে সাম্যনীতি ও বিশ্বপ্রেমে পরস্পরের সহিত গভীরভাবে আবদ্ধ থাকিবে,—

কবে, দেব, এ রজনী হবে অবসান ?
স্নান করি' প্রভাতের শিশির-সলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী।
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি'।

নাহিক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা ;
কেহ কারো কুটিরেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস।
... ...
পৃথিবীতে সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।

এই 'কবিকাহিনী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—

"যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বোঝায় তাহা নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজন মাথা নাড়িয়া বলিবে, হ্যাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ, ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতঃই বৃহৎ, তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।"

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যবিচারে তাঁহার বাল্যরচনা নিতান্ত দুর্বল এবং জগৎ ও জীবনের প্রকৃত রূপরসহীন একটা বায়বীয় উচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু এই বাল্যরচনার মধ্যে কবির পরিণত বয়সের একটা বিশিষ্ট ভাব ও চিন্তার যে ছায়াপাত হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। তাঁহার ভাব-জীবনের ক্রমবিকাশে এই আদিযুগের রচনার একটা মূল্য আছে। কবির পরিণত বয়সের একটা ভাব ও আদর্শ—অরণ্য ও লোকালয়ের সমন্বয়-সাধন। প্রকৃতি ও মানব উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। ইহার একটাকে উপেক্ষা করিয়া আর একটিকে একান্তভাবে গ্রহণ করিলে জীবনের পূর্ণতা লাভ হয় না—পরিণাম হয় শোচনীয়। নগ্ন প্রকৃতির ক্রোড়ে অরণ্য-জীবন ত্যাগের ব্যঞ্জনা করে, আবার প্রকৃতিবর্জিত নিরবচ্ছিন্ন নগর-জীবন ভোগের নির্দেশক। একান্ত ভোগ বা একান্ত ত্যাগ কোনোটাই মানুষের পূর্ণ পরিণতির সহায়ক নয়। উভয়ের সমন্বয়ই মানবজীবনকে সার্থকতা দান করিতে পারে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রাচীন ভারতের তপোবন-আদর্শ—ত্যাগের ক্রোড়ে বসিয়া ভোগ। ইহার একটা ক্ষীণ আভাস 'বনফুলে' ও এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে, এবং কবির কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ কাব্য-

গ্রন্থের মধ্যে ইহা কমবেশি বর্তমান। এই কাব্যের নায়ক কবি একাকী প্রকৃতির ক্রোড়ে বাস করিয়া তৃপ্তিলাভ করে নাই, মানব-হৃদয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তারপর প্রকৃতির আবেষ্টনের মধ্যে মানবকে পাইয়াও সে সন্তুষ্ট হইল না। একটা কাল্পনিক বৃহত্তর আনন্দের জন্য সে অরণ্য-বাস ছাড়িয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিল, কিন্তু কোথাও সে আনন্দ বা শান্তি পাইল না। আবার তাহাকে তাহার অরণ্যবাসে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু এই অরণ্যবাসের প্রধান অবলম্বন নলিনীকে সে হারাইল এবং তাহার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। অরণ্য-প্রদেশে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ-বিশিষ্ট যে গার্হস্থ্য-জীবন, তাহাই কবির আদর্শ। সে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া উচ্চতর কাল্পনিক জীবনকে গ্রহণ করিতে গেলে উভয় জীবনকেই হারাইতে হয়। এই তপোবন-জীবনের আদর্শ কতকটা Wordsworth-এর কথায়, True to the kindred points of heaven and home—স্বর্গ-মর্ত একাধারে গ্রথিত এই তপোবন-জীবনে। পরিণত বয়সে কবি যে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ ধ্যান করিয়াছেন, এই অপরিণত রচনার মধ্যে সেই আদর্শেরও একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(ঘ) রুদ্রচণ্ড

'বনফুল' ও 'কবিকাহিনী' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গাথা ও 'রুদ্রচণ্ড' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক। আকারে নাটকের মতো হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা কাব্য। ইহাকে নাট্যকাব্য বলা যায়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাব্য রচনায় একটা নূতন কাব্যশিল্পের পরিচয় দিয়াছেন, 'রুদ্রচণ্ড'ই সে-জাতীয় রচনায় তাঁহার প্রথম হাতে-খড়ি। এই নাট্যকাব্যের রচনাকাল নির্দিষ্ট করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 'জীবন-স্মৃতি'তে কোনো উল্লেখ করেন নাই। অন্য কোথাও ইহার উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার উৎসর্গে-পত্রে দেখা যায় কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গ-পত্রে লেখা আছে,—

ভাই জ্যোতি দাদা,—
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে,
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে

যতখানি ভালোবাসি, তার মত কিছু নাই,
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই।"

মনে হয় কোনো দূর প্রবাস-যাত্রার পূর্বে ইহা রচিত।

প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বে ১২৮৫ সালের প্রথমদিকে কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ কবিকে তাঁহার কর্মস্থল আমেদাবাদে লইয়া যান। প্রথম বিলাতযাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে সেখানে তিনি অনেক ইংরেজ ও ইউরোপীয় কবিগণের রচনা পাঠ করেন। ওই পড়াশুনার মধ্যেও তাঁহার কাব্যরচনার স্রোতে ভাটা পড়ে নাই। ঐ সময় তিনি 'প্রতিশোধ', 'লীলা', 'অপ্সরা প্রেম' প্রভৃতি কতকগুলি গাথা রচনা করেন। ঐগুলি ১২৮৫ সালের 'ভারতী' পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১২৮৫ সালের ৫ই আশ্বিন কবি প্রথমবার বিলাতযাত্রা করেন। ১২৮৫ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও এই নাট্যকাব্যখানি রচিত হইতে পারে।

এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালের ১২ই আষাঢ় (২৫ জুন, ১৮৮১)। অবশ্য ইহার কয়েক মাস পূর্বে ইহা মুদ্রিত হয়, কিন্তু ঐ তারিখে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লিস্টভুক্ত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে (১১ই জ্যৈষ্ঠ) Hindu Patriot দৈনিক পত্রিকায় ইহার সমালোচনা বাহির হয়।

ঐ সময় রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা ঠিক হয় এবং তাহার জন্য ১২৮৮, ৯ই বৈশাখ, দিন ধার্য হয়। রবীন্দ্রনাথ যাত্রা করিয়া মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, জাহাজে ওঠা আর হয় নাই। দ্বিতীয় বার বিলাতযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় অনেকে অনুমান করেন ঐ সময়ই উহার রচনাকাল। তবে চাঁদকবির গান দুইটি প্রথম বারের বিলাতযাত্রার পূর্বে রচিত।

নাম-পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থখানিকে নাটক বলিয়া অভিহিত করা হইলেও ইহাকে অঙ্কে, গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করা হয় নাই—চতুর্দশটি দৃশ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে একখানি কাব্য লেখার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। "তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' বলিয়া একটা বীরসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।" এই 'রুদ্রচণ্ড' তাহারই পরিমার্জিত নাট্যরূপ।

ইহার আখ্যান-ভাগটি এইরূপ:—রুদ্রচণ্ড ছিলেন হস্তিনাপুরের অধিপতি পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ও রাজ্য হারাইয়া তিনি কন্যা অমিয়াকে লইয়া বনের মধ্যে বিজন কুটীরে বাস করিতেছিলেন। রুদ্রচণ্ডের একমাত্র

চিন্তা কি করিয়া নিজের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন—কি করিয়া পৃথ্বীরাজের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন। কিন্তু তাঁহার কন্যা অমিয়া পিতার এই মনোভাব সম্বন্ধে উদাসীন,—সে আপন মনে ফুল তোলে, মালা গাঁথে, গান গায়। চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সভাসদ। তিনি তাহাদের অরণ্য-আবাসে আসিয়া ভ্রাতার মতো অমিয়ার সঙ্গে গল্প করিতেন, অমিয়াকে গান শিখাইতেন। পরম শত্রুর সভাসদের সহিত কন্যার মেলামেশায় রুদ্রচণ্ড অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ও তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়া দিলেন যে চাঁদকবিকে আবার অমিয়ার নিকটে দেখিলে চাঁদকবির আর নিস্তার থাকিবে না। পরদিন চাঁদকবি অমিয়াকে গান শিখাইতেছিলেন। এমন সময় রুদ্রচণ্ড আসিয়া উপস্থিত। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া চাঁদকবিকে আক্রমণ করিলেন। ভয়ে অমিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল ; শেষে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রুদ্রচণ্ড প্রাণভিক্ষা করিলেন, কারণ তিনি বাঁচিয়া না থাকিলে পৃথ্বীরাজের উপর প্রতিহিংসা লইতে পারিবেন না। এমন সময় রাজসভা হইতে এক দূত আসিয়া চাঁদকবিকে সংবাদ দিল যে রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত এবং এখনই তাঁহাকে রাজসভায় যাইতে হইবে। অমিয়া তখনও মূর্ছিতা ; তাঁহার নিকট চাঁদকবির বিদায় লইবার অবসর হইল না, তাড়াতাড়ি তিনি রাজধানীতে ফিরিলেন। অমিয়াই তাঁহার অপমানের একমাত্র কারণ মনে করিয়া রুদ্রচণ্ড অমিয়াকে তাড়াইয়া দিলেন। অমিয়া বিষণ্ণ-মনে চাঁদকবির সন্ধানে রাজধানীতে চলিয়া গেল।

এদিকে মহম্মদঘোরী পৃথ্বীরাজের রাজধানী হস্তিনাপুর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইয়াছে এবং চাঁদকবিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইতিমধ্যে মহম্মদঘোরীর এক দূত রুদ্রচণ্ডের অরণ্য-নিবাসে আসিয়া তাঁহাকে, পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে মহম্মদঘোরীর সহিত যোগ দিতে অনুরোধ করিল। রুদ্রচণ্ড পৃথ্বীরাজকে নিজ হাতে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া এতদিন সংকল্প করিয়াছিলেন, এখন মহম্মদঘোরী তাঁহাকে সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে ভাবিয়া ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তারপর স্বহস্তে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানীর দিকে যাত্রা করিলেন।

চাঁদকবি যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। নেপথ্যে অমিয়া চাঁদকবির শেখানো শেষ গানটি গাহিয়া চলিয়াছে। সে কণ্ঠস্বর চাঁদকবির কানে গেল। তিনি ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিলেন যে এই মধ্যাহ্নে প্রকাশ্য রাজপথে অমিয়া কি করিয়া আসিবে। অমিয়া পথপার্শ্ব হইতে চাঁদকবিকে ডাকিল, চাঁদকবিও সাড়া দিলেন, কিন্তু রণবাদ্য ও সৈন্যদের কোলাহলে উভয়ের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। কেহ

কাহারো কথা শুনিতে পাইল না। অমিয়া হতাশ হইয়া আর কোথাও আশ্রয় নাই দেখিয়া পিতার কাছেই ফিরিল।

এদিকে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। আর প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রুদ্রচণ্ড বনে ফিরিলেন। কেবল তিনি অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই এতদিন জীবিত ছিলেন। প্রতিহিংসা ছাড়া আর তাঁহার জীবনের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন খসিয়া পড়িল। তিনি নিজের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন।

বনে ফিরিয়া আসিয়া অমিয়া দেখিল যে রুদ্রচণ্ড মরণ-পথ-যাত্রী। সে মুমূর্ষু পিতার পায়ের উপর কাঁদিয়া পড়িল। একদিন প্রতিহিংসার উন্মাদনায় রুদ্রচণ্ডের হৃদয়ে পিতৃস্নেহ বিলুপ্ত হইয়াছিল। আজ মৃত্যুর পূর্বে সে-স্নেহ প্রবলবেগে তাঁহার হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া দিল।

মহম্মদঘোরী হস্তিনাপুর- অধিকার করিয়াছে। পৃথ্বীরাজের রাজ্য কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। চাঁদকবি দেশত্যাগ করিয়া অমিয়ার সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের অরণ্য-কুটীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন পিতার মৃতদেহের পার্শ্বে মুমূর্ষু অমিয়া। অমিয়া যেন চাঁদের জন্য বাঁচিয়া ছিল। তাঁহাকে কয়েকটি শেষ কথা বলিয়াই সে চিরদিনের মতো চোখ বুজিল।

যদিও এ রচনার মধ্যে বয়সোচিত যথেষ্ট অপূর্ণতা আছে, তবুও ইহা পূর্ব রচনা অপেক্ষা কিছু পরিণত হইয়াছে এবং ইহাতে কবির কবিত্ব-শক্তিও কিছু বিকশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের আরম্ভে মহাকাল ভৈরবের স্বরূপ বর্ণনায় কিশোর-কবি বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—

মহাকাল ভৈরব-মুরতি
শুন, দেব, ভক্তের মিনতি।
কটাক্ষে প্রলয় তব চরণে কাঁপিছে ভব,
প্রলয়-গগনে জ্বলে দীপ্ত ত্রিলোচন,
তোমার বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া,
অমাবস্যা-রাত্রি-রূপে ছেয়েছে ভুবন।
জটার জলদরাশি চরাচর ফেলে গ্রাসি',
দশন-বিদ্যুৎ-বিভা দিগন্তে খেলায়।
তোমার নিশ্বাস শ্বসি' নিভে রবি, নিভে শশী
শতলক্ষ তারকার দীপ নিভে যায়!

কিশোর-কবির চরিত্র-চিত্রণে একটা নাটকীয় পরিণতি-জ্ঞানেরও বেশ আভাস পাওয়া যায়। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে রুদ্রচণ্ডের অন্তর্জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন হইয়া

গেল। ভাব, চিন্তা ও কর্মে রুদ্রচণ্ড ছিলেন প্রতিহিংসার মূর্তি। প্রতিহিংসার প্রবল ইচ্ছা সম্পূর্ণ মানুষটাকে গ্রাস করিয়া তাঁহাকে একটা হৃদয়হীন, বিবেকহীন হত্যা-বিলাসীর রূপে রূপায়িত করিয়াছিল। জীবনে প্রতিহিংসা ছাড়া তাঁহার আর কোনো ভাবনা-চিন্তা ছিল না—রুদ্রচণ্ডের ব্যক্তিত্ব কেবল প্রতিহিংসাকামীর ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছিল। প্রতিহিংসার পাত্র যখন চিরদিনের মতো নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল, তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ রুদ্রচণ্ডেরও জীবন বৃথা হইল। সুতরাং তাঁহার আত্মহত্যা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কবি এই পরিবর্তনটা বেশ বর্ণনা করিয়াছেন—

মুহূর্তে জগৎ মোর ধ্বংস হয়ে গেল !
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন।
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে-জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে দুরন্ত দৈত্য-শিশু দিন-রাত্রি ধ'রে
হৃদয় মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার।
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
তারি নাম রুদ্রচণ্ড, আমি কেহ নই।

একেবারে মৃত্যুর মুহূর্তে রুদ্রচণ্ডের মানুষ-সত্তা জাগিয়া উঠিল, তাই অমিয়াকে দেখিয়া রুদ্রচণ্ড বলিলেন,—

এতদিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।

রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যকাব্য সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে কোনো উল্লেখ করেন নাই। চাঁদকবির দুইটি গান—

বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল প্রথম মেলিল আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার।

এবং

তরুতলে ছিন্ন-বৃন্ত মালতীর ফুল মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার।

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম সংগ্রহ-পুস্তক 'রবিচ্ছায়া'তে (১২৯২, পৌষ) ও রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম কাব্য-সংগ্রহ (১৩০৩) সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত 'কাব্য-গ্রন্থাবলী'র কৈশোরক বিভাগে গান দুইটি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তারপর কোনো গানের সংগ্রহে বা গ্রন্থাবলীতে তাহাদের স্থান দেওয়া হয় নাই।

(ঙ) ভগ্ন হৃদয়

ইহা নাটকাকারে লিখিত গীতি-কাব্য। বিলাতে এই কাব্যের পত্তন হইয়াছিল, এবং কতকটা ফিরিবার পথে এবং কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া কবি ইহা শেষ করেন। ১২৮৭ সালে 'ভারতী'র কার্তিক হইতে ফাল্গুন সংখ্যায় 'ভগ্নহৃদয়ে'র প্রথম ৬ সর্গ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ও শেষে ১২৮৮ সালের প্রথম দিকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

'রুদ্রচণ্ড'-এর সহিত একই সময়ে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। রুদ্রচণ্ড জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন, ভগ্নহৃদয় উৎসর্গ করেন 'শ্রীমতী হে-কে'। এই 'হে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশেষ স্নেহশীলা কাদম্বরী দেবী বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থের প্রথমে নাটকের মতো পাত্রপাত্রীগণের নামোল্লেখ করা আছে, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় ইহাকে গীতিকাব্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন,—

"এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা-পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুল মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।"

বাস্তবিক ইহা 'ফুলের মালা'—কতকগুলি উৎকৃষ্ট লিরিকের সমষ্টি। ইহার অনেক গীতিকবিতা স্বতন্ত্রভাবে কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে নিবদ্ধ করা হইয়াছিল, পরেও ইহার কোনো কোনো অংশ সংগীতরূপে রবীন্দ্রনাথের অনেক সংগীতও কাব্য-সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। এই যুগের অন্যান্য নাট্যকাব্যে এতো গানের সমারোহ নাই। ইহার কোনো কোনো সর্গের ঘটনা কেবল পাত্রপাত্রীর মুখের গানের দ্বারাই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে অনেকটা গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্যের সংমিশ্রণ হইয়াছে। বিলাত হইতে ফিরিবার পর রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে সুরের একটা প্রবল জোয়ার আসিয়াছিল। সেই জোয়ারের উদ্ভাসিত ফেনপুঞ্জের প্রথম মালা বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য। সে জোয়ারের বেগ সকল দিকেই প্রবাহিত হইয়াছিল।

কাব্যখানা চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত। ইহার আখ্যান-ভাগটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

এই কাব্যের নায়ক কবি ও নায়িকা কবির বন্ধু অনিলের ভগিনী মুরলা। মুরলা কবির বাল্য-সহচরী, এবং কবিও তাহাকে সখী বলিয়া জানে, কিন্তু মুরলা তাহাকে মনে-মনে ভালোবাসে—পূজা করে। মুরলা তাহার গভীর নীরব প্রেম কোনোদিন

কবির নিকট ব্যক্ত করে নাই। কবি মুরলাকে বিষণ্ণ ও চিন্তামগ্ন থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে সে কি কোনো যুবককে ভালোবাসিয়াছে, কিন্তু মুরলা কোনো উত্তর দিল না। মুরলা দুঃখিত হইল যে, কবি তাহার হৃদয়ের গোপন ভালোবাসা বুঝিতে পারে নাই। কবিও তাহার সহচরীর নিকট নিজের মনের অবস্থা বর্ণনা করিল। প্রেমের জন্য কবি পাগল—বিশ্বগ্রাসী প্রেমের ক্ষুধা কবিকে আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছে। নলিনী একটি চপল স্বভাবের কুমারী। সে অত্যন্ত সুন্দরী ও বহু যুবক তাহার প্রণয়-প্রার্থী, কিন্তু সে কাহাকেও ভালোবাসিতে পারে নাই, কেবল প্রেমের মিথ্যা অভিনয় করিয়া সকলকে ভুলাইয়া শেষে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কবি এই নলিনীকে ভালোবাসে। কবি মুরলার নিকট তাহার মনের কথা বলিল। সে কথা শুনিয়া মুরলার হৃদয় ভাঙিয়া গেল বটে, তবুও সে মনে করিল, কবি সুখী হইলে সে সুখী হইবে। ক্রমে ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় মুরলার জীবন দুর্বিষহ হইল; সে কবিকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল। কবি তাহার সন্ধানে বাহির হইল ও শেষে তাহাকে এক তৃণশয্যায় শায়িত দেখিল। মৃত্যু তাহার আসন্ন হইয়াছে। কবি তখন সব বুঝিতে পারিল ও মুরলার প্রতি তাহার প্রেম জ্ঞাপন করিল। মুরলার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল—জীবনের সমস্ত দুঃখ-বেদনা সে ভুলিয়া গেল। কবি আসন্ন-মৃত্যু মুরলার সহিত মালা বদল করিল ও তাহার মৃত্যু-শয্যা কুসুম-স্তবকে সজ্জিত করিয়া দিল।

কাব্যাংশে 'ভগ্নহৃদয়' অনেকখানি পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। ভাবপ্রকাশের কৃত্রিমতা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং ছন্দও একটা সাবলীল গতি লাভ করিয়াছে। নায়ক কবি তাহার হৃদয়ে প্রথম প্রেমের আবির্ভাব বর্ণনা করিতেছে,—

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ-মাঝারে,
মহা-উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে;
মনের এ রুদ্ধ স্রোত দেহখানা করি' বিদারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখী করিতে প্লাবিত।
অনন্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনের ক্রীড়াস্থল;
অগণ্য তারকারাশি হ'ত তার খেলনা কেবল,
চৌদিকে দিগন্ত আসি' রুধিত না অনন্ত আকাশ,
প্রকৃতি-জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস,
দুরন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্য পান করি'
আনন্দ-সঙ্গীত স্রোতে খেলিত গো শূন্যতল ভরি।

মুরলার মৃত্যু-শয্যায় কবি বলিতেছে,—

বিবাহ হইবে সখী, আজ আমাদের,
দারুণ বিরহ ওই আসিবার আগে সই,
অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের !
আকাশেতে শত তারা চাহিয়া নিমেষহারা,—
উহারা অনন্ত সাক্ষী রবে বিবাহের !
আজি এই দুটি প্রাণ হইল অভেদ,
মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ।
হোক তবে হোক সখী, বিবাহ সুখের—
চিতায় বাসরশয্যা হোক আমাদের।

সখী চপলা মুরলার প্রিয়তমের নাম জানিতে পারিলে তাহাকে সেই প্রিয় নাম বার বার শুনাইবে—

তোরে আমি অবিরাম
শুনাব তাহারি নাম—
গানের মাঝারে সে নাম গাঁথিয়া
সদা গাব সেই গান !
রজনী হইলে সেই গান গেয়ে
ঘুম পাড়াইব তোরে,—
প্রভাত হইলে সেই গান তুই
শুনিবি ঘুমের ঘোরে।
ফুলের মালায় কুসুম-আখরে
লিখি দিব সেই নাম,
গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি
তাহারি বলয় কাঁকন-করিবি,
হৃদয় উপরে যতনে ধরিবি
নামের কুসুম-দাম।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের প্রাণ লইয়া খেলা করিতে করিতে নলিনীর নিজের প্রাণের কি পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাই কবি নলিনীর উক্তিতে বর্ণনা করিতেছেন,—

কি হ'ল আমার ? বুঝিবা সজনি,
হৃদয় আমার হারিয়েছে !
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন ল'য়ে সখী গেছিনু খেলাতে

মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি' চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতনা পাইয়া—
সহসা সজনি দেখিনু চাহিয়া—
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি !

চরিত্র-চিত্রণেও রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান শক্তি পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে কবি দুইটি বিভিন্ন টাইপের নারী-চরিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন। একটি লাজুক—তার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, অন্তরের প্রেম সে প্রিয়তমকে প্রকাশ্যভাবে নিবেদন করিতে দ্বিধা-সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করে। আর একটি প্রেমহীনা ছলকলাময়ী নারী—সে মুখে প্রেমের অভিনয় করে কিন্তু কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দেয় না, কেবল সকলের হৃদয় লইয়া খেলা করে। প্রথম শ্রেণীর নারী—মুরলা ও ললিতা; দ্বিতীয় শ্রেণীর—নলিনী। অবশ্য উভয় শ্রেণীর নারীর জীবনই শোচনীয় হইয়াছে—কাহারো জীবন স্বাভাবিক ও সুন্দর পরিণতি লাভ করে নাই।

'কবিকাহিনী'র সহিত ইহার আখ্যানভাগের কতকটা মিল আছে, 'রুদ্রচণ্ডে'র সহিতও কিছু আছে। এই তিন গ্রন্থেরই নায়ক কবি। কবি চায় একটা আদর্শ, একটা সর্বাঙ্গসুন্দর কাল্পনিক রাজ্য, একটা স্বপ্নের জগৎ—যেখানে তাহার মনের আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করে। সেজন্য সে নিকটের বাস্তব আবেষ্টনকে ত্যাগ করিয়া, কাছের জিনিস অবহেলা করিয়া, সেই দূর কল্পনার রাজ্যের সন্ধানে পাগলের মতো ছুটিয়া বেড়ায়। কিন্তু কবির মন ছাড়া সেই আদর্শের আর কোথাও তো অস্তিত্ব নাই, কাজেই তাহার অন্বেষণ নিষ্ফল হয়। এই হতাশার বেদনাই তাহার জীবনের ট্র্যাজিডি। এই তিন কাব্যের নায়ক কবি করতলগত জিনিস উপেক্ষা করিয়া অতিদূরের কাল্পনিক জিনিসকে ধরিতে গিয়াছিল, ফলে নিকটের জিনিসও হারাইল, দূরকেও পাইল না। দূর ও নিকট—বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয়েই জীবনের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবানুভূতি বা তত্ত্বোপলব্ধি পরবর্তী যুগের অনেক রচনার মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। যে বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয়, যে সীমার মধ্যে অসীমের মিলন রবীন্দ্র-কবিমানসের বিশেষ ধর্ম, কবির প্রথম জীবনের লেখার মধ্যে তাহার অঙ্কুর লক্ষ্য করা যায়।

'ভগ্নহৃদয়'-প্রকাশের বারো বৎসর পরে একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধে নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে ওঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল; তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত।" (জীবনস্মৃতি)

(চ) শৈশবসংগীত

ইহা কবির তের হইতে আঠার বৎসর বয়সের রচিত কবিতার সংগ্রহ। কেবল চারিটি কবিতা নূতন সংযোজিত। ইহার অনেকগুলি কবিতা গাথা-জাতীয়। ইহাতে মোট সতরটি কবিতা আছে,—তন্মধ্যে ফুলবালা, দিক্‌বালা, প্রতিশোধ, ছিন্ন-লতিকা, ভারতী-বন্দনা, লীলা, অপ্সরা-প্রেম, কামিনী ফুল, প্রেম-মরীচিকা, গোলাপবালা, হরহৃদে কালিকা, ভগ্নতরী, পথিক—১২৮৫ সালের কার্তিক হইতে ১২৮৭ সালের পৌষ পর্যন্ত 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল; বাকি চারিটি কবিতা অতীত ও ভবিষ্যৎ, ফুলের ধ্যান, প্রভাতী, লাজময়ী, একেবারে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছিল। শৈশবসংগীত ১২৯১ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ কবিতাই 'সন্ধ্যা-সংগীত-এর পূর্বের রচনা।

রবীন্দ্র-কাব্যের এই আদি-পর্বের রচনাকে কবি স্বয়ং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও সাহিত্যের দরবারে অপাংক্তেয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে 'প্রাগৈতিহাসিক', 'গুপ্তযুগের লিপি', 'কপিবুকের কবিতা' প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে 'উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতা' দেখিতে পাইয়াছেন। এই যুগের উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য এবং অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কবি 'জীবনস্মৃতি'তেও বলিয়াছেন,—

"আমার পনেরো ষোল হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপরে বৃহদায়তন অদ্ভুতাকার উভচর জন্তু সকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা

সেইরূপ পরিমাণবহির্ভূত অস্তুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না। তাহারা নিজেকে কিছুই জানে না বলিয়া পদে পদে আর একটা কিছুকে নকল করিতে থাকে। অসত্য, সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলা বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই, তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিণতির যুগে তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের অপরিণত রচনা তাঁহার চোখে নিতান্ত খেলো বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য ইহা মানিতে হইবে যে, এই রচনার মধ্যে অপরিপক্কতার যথেষ্ট চিহ্ন বর্তমান —ভাষা দুর্বল, ছন্দ শিথিল, প্রকাশের নৈপুণ্য নাই, হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাস কোনো সত্যিকার রসমূর্তি ধারণ করে নাই। কিন্তু তবুও একথা ঠিক যে, এই রচনার স্থানে স্থানে যথেষ্ট কবিত্বের স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়,—যাহা বয়সের বিবেচনায়, কবির ভবিষ্যৎ অসামান্যত্বেরই সূচনা করে। তারপর, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব, চিন্তা ও আদর্শের ছায়াপাত হইয়াছে এই রচনার মধ্যে, সেগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভা-বিকাশের ইতিহাসে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে বীজের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম এখানে দেখা যায়, তাহাই একদিন ফুল-ফল-প্রসবকারী বিরাট মহীরূপে পরিণত হইয়াছে। সেজন্য এই বাল্য ও কৈশোরের রচনা একেবারে মূল্যহীন নহে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন,—

"যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, কারণ তাহা সৃষ্টির একটা সবিশেষ অবস্থার সত্য—তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্য-সাহিত্যের একটা সত্যের অপলাপ করিতে হয়।"

১

সন্ধ্যাসংগীত

(১২৮৮)

সন্ধ্যাসংগীতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম গতানুগতিক কাব্য-রচনা-রীতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। এতদিন তিনি তাঁহার পূর্বগামী কবিগণের, বিশেষতঃ বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভাষা ও ছন্দ অনুকরণ করিয়া, এবং প্রধানত কোন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতে সেই বাঁধা রীতি ও চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া আখ্যায়িকা-নিরপেক্ষ বিশিষ্ট-মনোভাবব্যঞ্জক গীতিকবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইখানেই তিনি তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তা উপলব্ধি করিলেন ও তাঁহার নিজস্ব রূপ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কাব্যের এতদিনের অনুকরণসর্বস্ব আঙ্গিক খসিয়া পড়িল,—একান্ত নিজের ছন্দে, স্বাধীনভাবে, নিজের ভাব ও কল্পনাকে তিনি রূপ দিতে আরম্ভ করিলেন।

কাব্যের যে রীতি-সংস্কারের মধ্যে, যে আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহার কাব-প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছিল, সেই সংস্কার ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব তাঁহার কবি-প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। পূর্ব-প্রচলিত রীতর প্রভাব গ্রহণ ও তাহার অনুকরণ ছাড়া তাঁহার উপায় ছিল না, কারণ তাঁহার প্রতিভা তখনো নিজস্ব ধারায় বিকশিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে নাই। তাই সন্ধ্যাসংগীত-এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার পূর্ব সংস্কারের অনুকরণ ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না।

তখন মহাকাব্যের যুগ। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র তখন নূতন কবিযশঃপ্রার্থীর সম্মুখে আদর্শ। তাঁহাদের কাব্য-প্রচেষ্টা পুরাণের দীর্ঘ আখ্যায়িকা ও প্রধান প্রধান পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া রূপায়িত হইয়াছে—মানুষের কতকগুলি উচ্চ ভাবাদর্শ, তাহাদের আদিমপ্রবৃত্তিমূলক সবলতা ও দুর্বলতা ব্যাপক ও সার্বজনীনভাবে এইসব চরিত্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইসব চরিত্রের প্রকাশ বাহিরের ঘটনার সহিত আবদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভার স্বরূপ মনের বিচ্ছিন্ন, খণ্ড, অন্তর্মুখী ভাবানুভূতির বিশিষ্ট প্রকাশে। চরিত্রবিকাশের সঙ্গে ঘটনার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া একটা দীর্ঘ একটানা বহির্মুখী ভাবের প্রকাশ বা বর্ণনা তাঁহার কবিমানসের মোটেই অনুকূল নয়। মহাকাব্য রচনা বা দীর্ঘ-আখ্যায়িকা অবলম্বনে কাব্যরচনা তাঁহার বিপরীত ধর্ম। কিন্তু, আখ্যায়িকাই তাঁহাকে অবলম্বন

করিতে হইয়াছিল। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী না হইলেও এই কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে মহাকাব্যের কতকগুলি রীতি তাঁহাকে মানিতে হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আত্মপ্রকাশের পূর্ণ আনন্দ বা সার্থকতা পান নাই। তারপর ভাষা ও ছন্দ ব্যবহারেও তাঁহাকে অনেকটা পূর্বরীতির অনুকরণ করিতে হইয়াছে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর সহিত তাঁহার অন্তরের যোগ ছিল, কারণ উভয়ের প্রতিভা প্রায় একশ্রেণীর। তাঁহার নিকট হইতে গীতিকাব্যের উপযোগী শিথিলবন্ধ, লঘু শব্দ ও পদ, 'আধ-আধ' ভাষা ও ছন্দরীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভাবপ্রকাশের রীতিতে, ভাষা ও ছন্দে কেবল একটা অনুকরণেরই পালা চলিতেছিল। সন্ধ্যাসংগীতে পৌঁছিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁহার কবিমনের স্বরূপ বুঝিলেন ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেন।

এ সম্বন্ধে তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন,—

"একটা শ্লেট লইয়া কবিতা লিখিতাম।…এমনি করিয়া দুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।…এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন একটা খালের মত সিধা চলে না—আমার ছন্দ তেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল।…বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা তিনমাত্রামূলক…তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়…একদা এই ছন্দোটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মতো। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি… এই বন্ধন ছেদ করিয়াছিলাম। কোনো প্রকার পূর্ব সংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিতে যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়া ছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই।…আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্য হিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি।"

সন্ধ্যাসংগীতের কাব্য-মূল্য হয়তো বেশী নাই, কিন্তু এই হিসাবে ইহার মূল্য আছে যে ইহাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁহার আত্মশক্তির পরিচয় পাইলেন। তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা-বিকাশের ইহাই সূত্রপাত।

১৩২১ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকায় তিনি বলিয়াছিলেন,—

সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি।… সন্ধ্যাসংগীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে সুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের

পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে—গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে।...ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে, তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সেজন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।"

ইহার অনেক পরে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' প্রকাশের সময়ও 'কবির মন্তব্যে' বলিয়াছেন,—

"তাকে আমার বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরেনি তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়।"

সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী রচনার সহিত সন্ধ্যাসংগীতের বহিরাবরণের বন্ধন ছিন্ন হইল বটে, কিন্তু অন্তরের ভাবগত যোগসূত্র সমানই রাহয়াছে। যে হতাশা ও বিষাদের সুর পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে বর্তমান ছিল, সন্ধ্যাসংগীতের মধ্যেও তাহা ধ্বনিত হইতেছে। কারণ এখনো কবিমনের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা আসে নাই। এই যে বেদনা ইহা কৈশোর ও যৌবনের বহু বিচিত্র ভাব-কল্পনা, কামনা-বাসনা জীবনে সফল না হইবার বেদনা—আদর্শ ও বাস্তবের অসামঞ্জস্যের বেদনা—অন্তরের সহিত বহির্বিশ্বের মিলন না হইবার বেদনা।

শৈশব হইতেই প্রকৃতি ও মানুষের সহিত কবির একটি সহজ ও স্বাভাবিক যোগ ছিল। প্রকৃতির বিচিত্ররূপ ও মানুষের বিচিত্রস্পর্শ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে ও তাঁহাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে। কিন্তু যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয়াবেগ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি তখন তাঁহার হৃদয়াবেগের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। প্রথম যৌবনের হৃদয়াবেগের বৈশিষ্ট্য এই যে উহা কোনো নির্দিষ্ট বস্তু উপলক্ষে উত্থিত হয় না, উহার কারণ নির্দেশ করা যায় না ও উহার সার্থকতার কোনো রূপও ফুটিয়া উঠে না। উহা যেন কতকটা বায়বীয় উচ্ছ্বাসমাত্র। এই উচ্ছ্বাস কবির প্রকৃত রসানুভূতির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তখন সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা এই ভাবাবেগকে আশ্রয় করিয়া নানাদিকে ছুটিতে থাকে। এই কল্পনা ও আবেগের লীলা একটা কুয়াসাচ্ছন্ন আবেষ্টনের মধ্যেই ঘুরিতে থাকে। বাহিরের বিস্তীর্ণ বাস্তব সংসারের সহিত উহার কোনো যোগ থাকে না—ভিতরের সঙ্গে বাহিরের মিল হয় না। এই বস্তুহীন কল্পনা ও কারণহীন আবেগের কারাগারে কবির মন অবরুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি এই অবস্থা হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। অথচ এই রুদ্ধজীবনের অনুভূতির সঙ্গে বাস্তবের মিল না হওয়ায় ঐ ছায়া-রাজ্যে কোনো তৃপ্তির সন্ধানও পান নাই। গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। দুঃখই তাঁহার

একান্ত প্রাপ্য বলিয়া তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা তিনি বেশি দিন সহ্য করিতে পারেন নাই। উহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি আপন হৃদয়ের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছেন ও পূর্বেকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। বিশ্বের সহিত যুক্ত না হইতে পারায় এবং বাহিরের সঙ্গে অন্তরের সহজ মিলন না হওয়ায় দুঃখবোধ ও মানসিক দ্বন্দ্বই সন্ধ্যাসংগীতের মূল সুর।

সন্ধ্যাসংগীতের কেন্দ্রগত ভাব বেদনাবোধ। ইহার মধ্যে একটা বিষাদ, অতৃপ্তি ও হতাশার সুর বাজিতেছে। বেদনা-দীর্ণ হৃদয়ের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ইহার মধ্যে আছে। 'সন্ধ্যা' কবিতাটিতে কবি সন্ধ্যার নিকট নিজের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া স্নেহ-কোমল সান্ত্বনা কামনা করিতেছেন,—

ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়!
....
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়
....

'দুঃখ-আবাহন' কবিতায় কবি দুঃখকে মনে-প্রাণে আহ্বান করিতেছেন,—

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি' টানি' উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার-মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস্ শোষণ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ!

নিরন্তর দুঃখভোগে কবির প্রাণ অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাই তিনি বলিতেছেন,—

বসিয়া বসিয়া সেথা, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে এক-ই গান, এক-ই গান, এক-ই গান।

কবি বুঝিতে পারিতেছেন যে তাঁহার এই সুতীব্র দুঃখানুভূতি সুস্থ ও স্বাভাবিক মনের পরিচায়ক নয়—ইহা একটা অস্বাভাবিক ও বিকৃত অবস্থা। কিন্তু তাহার দুর্বার হৃদয় দুঃখকে একান্তভাবে বরণ করিয়া তাহারই নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছে। তাই

তিনি 'হলাহল' নামক কবিতায় হৃদয়কে এই জীবননাশী ছেলেখেলা হইতে বিরত হইতে বলিতেছেন,—

তা নয়, একি এ হল, একি এ জর্জর মন,
হাসিহীন দু'অধর, জ্যোতিহীন দু'নয়ন!
দূরে যাও—দূরে যাও—ছেলেখেলা ভুলে যাও—

'সংগ্রাম-সংগীত'-এ কবি হৃদয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। দুঃখ-ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয় তাঁহার জীবনকে দুঃসহ করিতেছে। পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-ময়, চিরসুন্দর মূর্তির উপর তাঁহার হৃদয় যেন একটা কৃষ্ণ-আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। মানুষের সহজ স্নেহ-ভালোবাসা, প্রকৃতির বিচিত্র লীলা, পৃথিবীর সহস্র স্বাভাবিক আনন্দ হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। এবার তিনি হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে জয় করিবেন ও পূর্বের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবেন,—

আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।
বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিছে ছারখার!
গ্রাসিছে চাঁদের কায়া ফেলিয়া আঁধার ছায়া
সুবিশাল রাহুর আকার।
মেলিয়া আঁধার গ্রাস দিনেরে দিতেছে ত্রাস,
মলিন করিছে মুখ তা'র!

আমি হ'ব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হ'বে পরাজয়,
জগতের দূর হবে ভয়।

'আমি-হারা' কবিতায় কবি প্রথম জীবনের সেই স্বাভাবিক, সরল, সহজ ও আনন্দময় 'সুকুমার-আমি'কে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সন্ধ্যাসংগীতের মর্ম সম্বন্ধে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন,—

"নব যৌবনের আরম্ভে অন্তরে যখন হৃদয়াবেগ প্রবল হইয়া উঠিতেছে অথচ বিশ্বজগতের সহিত তাহার যথোচিত যোগ ঘটিতেছে না—হৃদয়ের অনুভূতির সহিত জীবনের অভিজ্ঞতার যখন সামঞ্জস্য হয় নাই, তখন নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার যে অধীরতা, তাহাই 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর কবিতার মধ্যে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ, ১৮ পৃঃ

কবি নিজেই তাঁহার জীবনস্মৃতিতে সন্ধ্যাসংগীতের মূলভাব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"মানুষের মধ্যে অবস্থা-বিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা।...মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গম্ভীর অন্তরালে যে মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না, তখন সেই অন্তর-নিবাসীর পীড়ায় বেদনায় মানস-প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই—এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে, তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে, সেখানে জীবন কোনোমতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে জাগিয়া উঠিতে চায়—ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে—অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাস অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে।"

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩২১) সন্ধ্যা-সংগীতের এই শ্রেণীর দুঃখ ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক কবিতাগুলিকে 'হৃদয়ারণ্য' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কবি সেই কবিতাগুচ্ছের প্রবেশক হিসাবে যে কবিতাটি লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার প্রথম লাইন—"কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।" সন্ধ্যাসংগীতের এই যে বেদনা ইহা একরূপ পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের অক্ষমতার বেদনা—পরিণতিলাভের আকাঙ্ক্ষার বেদনা।

২

প্রভাতসংগীত

(১২৯০)

(প্রভাতসংগীতের প্রথম কবিতা 'আহ্বান-সংগীত'-এর মধ্যে সন্ধ্যাসংগীতের দুঃখব্যঞ্জক মনোভাবের রেশ আছে। কবি স্বরচিত কারাগারে আপনার জালে আপনি জড়াইয়া আছেন। ক্রমাগত তিনি মরীচিকা-সুরা পান করিতেছেন; তাহাতে কেবল তাঁহার তৃষ্ণাই বাড়িয়া প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে; কোনো তৃপ্তি বা শান্তির সন্ধান মিলিতেছে না। প্রকৃতির মধুর রূপ বাহিরে দীপ্তি পাইতেছে; জগতের উদ্দাম আনন্দস্রোত বহিয়া চলিয়াছে; তিনি কাঙালের মতো তাহার দিকে কেবল

চাহিয়া আছেন ; একবিন্দু তাঁহার পাইবার শক্তি নাই। শুধু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আগুন তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে,)—

চারিদিকে শুধু সুধা ছড়াইছে
যে দিকে পড়িছে দিঠ,
বিষেতে ভরিলি জগৎ, রে তুই
কীটের অধম কীট।

এই কবিতার শেষের দিকে কবি বাহিরের একটা আহ্বান শুনিতে পাইতেছেন,—

দেখরে সবাই চলেছে বাহিরে
সবাই চলিয়া যায়,
পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
শোন্‌রে কি গান গায়!
জগৎ ব্যাপিয়া শোন্‌রে, সবাই
ডাকিতেছে, আয়, আয়!

সেই আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য তাঁহার অসাড় প্রাণকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিতেছেন,—

তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস!
তুই শুধু ওরে করিস রোদন
ফেলিস দুঃখের শ্বাস!
....
আর কতদিন কাটিবে এমন
সময় যে চলে যায়।
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়!

(তারপর হঠাৎ একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। কবি-হৃদয়ের স্বরচিত কারাগার কোথায় ভাঙিয়া চুরিয়া উড়িয়া গেল। কবি মুক্ত হইয়া নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন।) এই বিরাট পরিবর্তনের ইতিহাস তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে (ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছের দিকে) চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম এক অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল, তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের

আলোক একেবারে বিচ্ছুরতি হইয়া পড়িল। সেই দিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।......

......আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল-সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আরেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত, সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

(এই পরিবর্তিত মানসিক অবস্থার দান 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। অনুভূতির তীব্রতায়, প্রকাশের অজস্রতায়, ভাষার মাধুর্য ও ছন্দের সাবলীল গতিতে কবিতাটি অনবদ্য।

ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী গিরিগুহায় আবদ্ধ ছিল। চারিদিকে তাহার পাষাণ-প্রাচীর; হিমানীতে তাহার গতিবেগ রুদ্ধ। বৈচিত্র্যহীন, বিকাশহীন, অবরুদ্ধ জীবনে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল। প্রভাতের আবির্ভাবে, পাখীর কাকলীতে চারিদিক মুখর হইয়া উঠে—নবোদিত অরুণ-আলোয় প্রকৃতি ঝল্‌মল্‌ করে—কিন্তু তাহার কারাগারে কোনোদিন সে আনন্দবার্তা পৌঁছায় না। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রভাত-পাখীর গান ও নবারুণের আলোকচ্ছটা তাহার অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করিল। রুদ্ধ নির্ঝরিণীর অসাড় প্রাণে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল—স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল—বিপুল আবেগে তাহার বক্ষ তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল,—

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে, প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
  রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।

কঠিন শিলায় তাহার চারিদিক আবদ্ধ—এই বন্ধন চূর্ণ না করিলে তাহার বাহির হইবার পথ নাই। তাই ভাঙনের বাণী তাহার মুখে,—

কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন?

ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্‌।

অন্ধকার পাষাণ-কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া নির্ঝর নিজেকে সারা বিশ্বে প্রবাহিত করিতে চাহিতেছে। তাহার ক্ষুদ্র জীবন আজ বৃহৎ জীবনের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে। ক্ষুদ্র প্রাণে সে আজ অফুরন্ত প্রাণ অনুভব করিতেছে,—

আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।

ক্ষুদ্র নির্ঝর আজ মহাসমুদ্রের ডাক শুনিতে পাইয়াছে। সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিয়া সেই সুদূর মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়া যেন সে তাহার চরম সার্থকতা লাভ করিবে,—

জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা গান ;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি প্রভাতসংগীতের মর্মবাণীর উদ্গাতা।)

কবির কাব্যানুভূতি ও অধ্যাত্ম-অনুভূতি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রভাতসংগীত যেমন কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ বা জাগরণ, সেইরূপ তাঁহার অধ্যাত্ম-অনুভূতিরও প্রথম সূত্রপাত। ক্ষুদ্র-আমির পাষাণ-চাপা গুহা হইতে কবি বৃহত্তর বিশ্বে, মহত্তর সত্যের জগতে মুক্তিলাভ করিলেন।

সন্ধ্যাসংগীতে প্রকৃতি ও মানবের সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়া কবি অবরুদ্ধ অবস্থার বেদনা ও অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভাতসংগীতে কবি প্রকৃতি ও মানবের সহিত মিলিত হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে কবি নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া একটা অপূর্ব আনন্দ ও তৃপ্তি পাইয়াছেন। এই নবলব্ধ বিশ্বানুভূতির আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও ব্যাকুলতা প্রভাতসংগীতে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বের— প্রকৃতি ও মানবের—যে বিচিত্র রূপ, রস ও রহস্যের মধ্যে কবি মরালের মত

সারাজীবন সন্তরণ করিয়াছেন। সেই ক্ষীর-সমুদ্রের তটসোপানে কবি প্রথম অবরোহণ করিলেন প্রভাতসংগীতে।

কবি নিজেই সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ব হইতে প্রভাতসংগীত পর্যন্ত তাঁহার কবি-মানসের ধারাটি জীবনস্মৃতিতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—

"মোহিতবাবু গ্রন্থাবলীতে প্রভাতসংগীতের কবিতাগুলিকে "নিষ্ক্রমণ" নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা।......আমার শিশুকালেই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল।......সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল, তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন সুরু হইল—চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্‌ণ হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যা-সংগীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চলিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বার জানিনা কোন্‌ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম, তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম। সহজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়া যখন পাওয়া যায় তখনি পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল।"

অবরুদ্ধ গিরি-নির্ঝরিণী মুক্তির বিপুল আবেগে পৃথিবী প্লাবিত করিতে চলিয়াছে। অন্ধকার হৃদয়-অরণ্যে কবি পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছিলেন, প্রভাতের সূর্যালোক তাঁহাকে বহির্জগতের রাজপথে লইয়া আসিয়াছে—তিনি অধীর আনন্দে জগতের মুখ দেখিতেছেন। আজ সেই পুরাতন জগৎ ক্ষণ-অদর্শনের মধ্য দিয়া তাঁহার কাছে অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে। বিপুল পুলকে প্রাণে মহাপ্লাবনের কলরোল উঠিয়াছে—সারা পৃথিবীময় সেই প্রাণ নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। জগতের নরনারী তাঁহার হৃদয়ে ভিড় জমাইয়াছে, অনন্ত প্রেমে তিনি সকলকে আহ্বান করিতেছেন—বিশ্বপ্রাণী ও বিশ্ব-প্রকৃতিকে তিনি মহাসমারোহে তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়াছেন। 'প্রভাত-উৎসব' কবিতায় এইভাব ব্যক্ত হইয়াছে এবং উহাতে কবি প্রকৃতি ও মানবকে গভীর প্রেমের ব্যাকুলতা দিয়া অনুভব করিয়াছেন।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
* * *
পুলকে পুরে প্রাণ শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর।
* * *
পরান পুরে গেল, হরষে হল ভোর,
জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর।

কবির অপর্যাপ্ত প্রাণ যেন কিছুতেই নিঃশেষ হয় না,—

পেয়েছি যত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে

(বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবকে সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করা ও উহার সহিত একাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। এই বিশ্বানুভূতির আনন্দই রবীন্দ্র-প্রতিভার উৎস। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবি-প্রতিভার স্বপ্নভঙ্গ বা জাগরণ।) যে প্রবল সহানুভূতি ও প্রেমে কবি সৃষ্টির পূর্ণপ্রকাশ মানব হইতে ধরণীর ধূলিকণা পর্যন্ত একান্ত করিয়া আপনার হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছেন—তাহারই প্রকাশ হইয়াছে 'প্রভাত-উৎসব' কবিতায়। এই সময়কার মানসিক অবস্থা কবি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন,—

"মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না। একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহ-চাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া একটি মহা সৌন্দর্য-নৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা পালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম :—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।" (জীবনস্মৃতি)

এই কবিতাটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে প্রভাতসংগীত সম্বন্ধে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়, যেমন নবোদ্গতদন্ত

শিশু মনে করেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন।...প্রভাতসংগীত আমার অন্তর-প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উল্লাস, সেই জন্য ওটাতে আর কিছুমাত্র বাছবিচার নেই।" (জীবনস্মৃতি)

প্রভাতসংগীতের মধ্যে 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা-বিকাশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। উহা একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা এবং অনুভূতির ফল। পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু হইতে উত্থিত বিচিত্রধ্বনি এই জগতের মর্মস্থলে একটা পরিপূর্ণ সংগীতে মিলিত হইতেছে। ঐ সংগীত অন্তহীন ও উহা নিরন্তর অব্যক্ত ধ্বনিতে বাজিতেছে। এই মহান সংগীত আমরা পরিপূর্ণরূপে শুনিতে পাই না, সেজন্য আমাদের চিত্তে একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। কেবল ঐ সংগীতের আভাস বা প্রতিধ্বনি সমূদ্রের কল্লোল-গীতিতে, পাখীর গানে, নির্ঝরের কলধ্বনিতে, ষড়ঋতুর আবর্তনের সুরে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার গতি-সংগীতে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের যে সংগীত তাহা কেবল মূল-সংগীতেরই প্রতিধ্বনি—তাহাদের নিজস্ব সংগীত নয়। এ জগতের সমস্ত সৌরভ, সংগীত ও শোভা সেই মূল সংগীতের প্রতিধ্বনি। এই বিশ্বজগতের মাঝখানে যে সৌন্দর্যের বাঁশী বাজিতেছে, তাহা সেই মহাবংশীর সুর—মহাসংগীতের প্রতিধ্বনি। বিশ্বের সমস্ত খণ্ড সৌন্দর্য ও খণ্ড সুরে সেই মূল সংগীতের প্রতিধ্বনি বাজিতেছে।

বিশ্বের সমগ্র আনন্দময় সত্তাকে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে কবির মধ্যে আর একটি অনুভূতি আসিয়াছে যে, বিশ্বের সমস্ত রূপ-রস-গান একটি মূল উৎস হইতে প্রবাহিত হইতেছে, এবং খণ্ড রূপ-রস-গানের প্রকাশের মধ্যে যে একটা অনির্বচনীয়ত্ব ও চমৎকারিত্ব সকলকে মুগ্ধ করে, তাহার কারণ, উহাদের পশ্চাতে আছে সমস্ত রূপ-রস-গানের চিরন্তন প্রস্রবণ। এই অসীম, অনন্ত সৌন্দর্য ও সংগীত সীমার মধ্যে আসিয়া একটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়া বস্তুগত সত্যে পরিণত হইলেও, উহার মধ্যে এমন একটা অনির্বচনীয় আভাস ও লোকোত্তর-চমৎকার ব্যঞ্জনা আছে যে আমাদের চিত্ত এক অপার্থিব সৌন্দর্য ও অলৌকিক সংগীতের অনুভূতির আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে। এই খণ্ড রূপ-রস-গানে বস্তুগত রূপের অতীত যে অপরূপ, খণ্ড রসের অতীত যে অলৌকিক চমৎকারিত্ব, খণ্ড গানের অতীত যে বিস্ময়কর অনির্বচনীয়ত্ব আমরা অনুভব করি, তাহা মূল, অখণ্ড রূপ-রস-গানের প্রতিধ্বনি বলিয়া কবি অনুভব করিয়াছেন। এই প্রতিধ্বনি অপূর্ব সৌন্দর্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, এবং উৎকৃষ্ট গীতিকবির অনুভূতি ও কল্পনায় এই সৌন্দর্য একটা সংগীতের প্রবাহে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বস্তুর মধ্যে বস্তু-সত্তার অতীত যে অনুভূতি—বাস্তবের অতীত যে ভাবগত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেই অনুভূতির একটি

প্রাথমিক রূপ ব্যক্ত হইয়াছে এই কবিতাটির মধ্যে। এখান হইতেই কবির সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতির সূত্রপাত হইয়াছে। এই স্তরে কবির কাব্য-প্রতিভা পূর্ণতা লাভ করে নাই, এখনো উচ্ছ্বাস ও আবেগ সংহত হইয়া রসরূপ লাভ করে নাই, তাই নব-জাগ্রত অনুভূতির কাব্যরূপ বর্ণদীপ্ত ও শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত হয় নাই।

এই কবিতাটির রচনার ইতিহাস ও তাৎপর্য কবি স্বয়ং তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন—

"কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি লিখিবার সময়কার অবস্থা) ছিল। এমন সময় জ্যোতিদাদা স্থির করিলেন তাঁহারা দার্জিলিঙে যাইবেন। আমি ভাবিলাম এই হইল আমার ভালো—সদর স্ট্রীটের সহরে ভিড়ের মধ্যে যাহা দেখিলাম—হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহাই আরো ভালো করিয়া গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করে তাহা জানা যাইবে।

কিন্তু সদর স্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি আর সেই দৃষ্টি নাই।

আমি দেবদারু বনে ঘুরিলাম, ঝরনার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনজঙ্ঘার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম—কিন্তু যেখানে পাওয়া দুঃসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু আর দেখা পাই না। রত্ন দেখিতেছিলাম, হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া এখন কৌটা দেখিতেছি। কিন্তু কৌটার উপরকার কারুকার্য যতই থাক তাহাকে আর কেবল শূন্য কৌটা মাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশঙ্কা রহিল না।

প্রভাতসংগীতের গান থামিয়া গেল শুধু তার দূর প্রতিধ্বনি স্বরূপ "প্রতিধ্বনি" নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম।......আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি এবং কহিয়াছে—

ওগো প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালবাসি
বুঝি আর কারেও বাসিনা।

......এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি এইজন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দ রূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোক-রশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দ-স্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে।...সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য। সে-সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট,

তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়। "প্রতিধ্বনি" কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে।"

অজিতকুমার চক্রবর্তী 'প্রতিধ্বনি' কবিতার ভাবার্থ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বস্তুজগতের অন্তরালে যে একটি অসীম অব্যক্ত গীতজগৎ আছে, যেখানে সমস্ত জগতের বিচিত্রধ্বনি সংগীতে পরিপূর্ণ হইয়া "অনাহত শব্দে" নিরন্তর বাজিতেছে—তাহার আভাস, তাহার প্রতিধ্বনি প্রত্যেকটি খণ্ড সৌন্দর্যে খণ্ড সুরে পাওয়া যায়—সেইজন্যই তাহারা প্রাণের মধ্যে এমন সুতীব্র একটি ব্যাকুলতাকে জাগায়। বস্তুত পাখীর গান পাখীরই নয়, নির্ঝরের কলশব্দ নির্ঝরেরই নয়, তাহা সেই মূল সংগীতেরই নানা প্রতিধ্বনি—এইজন্যই জগতের যে সকল সুর ধ্বনিত হইতেছে এবং যাহারা ধ্বনিত হইতেছে না সকলে মিলিয়া আমাদের মনে একই সৌন্দর্য-বেদনাকে জাগাইয়া তুলিতেছে। আমরা নানা প্রতিধ্বনি শুনিতে শুনিতে সেই মূল সংগীত শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি।"

অজিতকুমার আরও বলিয়াছেন,—

"রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি—হৃদয়াবেগকে সুরের অনির্বচনীয় ভাষায় ব্যক্ত করাই তাঁহার জীবনের কাজ। গানের সুরে কবির কাছে জগতের একটি রূপান্তর ঘটে। হঠাৎ চোখে-দেখা জগৎ ক্ষণকালের জন্য যেন সুরের জগৎ—কানে-শোনা জগৎ হইয়া উঠে—সমস্ত বিশ্বস্পন্দনকে কেবল আলোকরূপে বস্তুরূপে না দেখিয়া তাহাকে একটি অপরূপ সংগীতের মতো যেন কবি অনুভব করিয়া থাকেন।…গানের সুর আমাদের মনে যে সৌন্দর্য জাগায় তাহাকে কোন সংকীর্ণ কথার দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম তবে সুরের প্রয়োজনই ছিল না। সেইজন্য সুরে যখন কোনো অনুভূতি বাজে তখন তাহার চারিদিকে একটি অনির্বচনীয়তার হিল্লোল খেলিতে থাকে—সে যাহা বলে তাহার চেয়ে ঢের বেশি না বলার দ্বারা বলে…এই গান রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যেই কাজ করিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টিটাই গানের দৃষ্টি—খণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্যসহচররূপে অখণ্ডকে দেখা। সুর যেমন প্রত্যেক কথাটির মধ্যে অনির্বচনীয়কে উদ্‌ঘাটন করে, তাঁহাব হৃদয় সেইরূপ সমস্ত দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটি অপরূপকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে চায়।"

এই অনাহত সংগীতের প্রতিধ্বনি জগতের প্রত্যেক সৌন্দর্যের বুকের মধ্যে বাজিতে থাকে। ইহাই তাহাদের অনির্বচনীয়তা—অনন্তের ইঙ্গিত—সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'ছবি ও গানে'র যুগের রচিত একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—

"শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কানের কাছে ধরো, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য-মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মতো পড়ে। এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌন্দর্যকে এত ভালবাসি।

পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল ; সৌন্দর্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলই তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সৌন্দর্য তাহা করে না—সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই।"

(সৌন্দর্য ও প্রেম, আলোচনা,—রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ—২য় খণ্ড)

রবীন্দ্র-রচনাবলী 'সূচনা'য় কবি এই প্রতিধ্বনি কবিতাটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"প্রতিধ্বনি' কবিতাটি লিখেছিলুম যখন প্রথম গিয়েছিলুম দার্জিলিঙে। যে ভাব তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে—বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে। আবার সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে। এই ভাবগুলি যদিও অস্পষ্ট তবুও আমার মনের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল, মুখে মুখে কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাও করেছি। কিন্তু এ-সকল ভাবনা তখন কী গদ্যে কী পদ্যে আলোচনা করার সময় হয়নি, তখনো পাইনি ভাষাভারতীর প্রসাদ।"

এই গ্রন্থে আর একটা ভাবধারা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রভাতসংগীতের বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবকে ফিরাইয়া পাইবার আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে দেখিতে পাই এই জড়জগৎ ও মানবজীবনের নিত্যত্ব সম্বন্ধে কবির মনে একটা দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কবি-চিত্তে চিরকালই একজন ভাবুক ও দার্শনিক বসিয়া আছে। কবি-জনোচিত স্বাভাবিক অনুভূতির তীব্রতা ও আবেগ কখনোই তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। ভাবুকটি চিরকালই এক একটা সমস্যা তুলিয়াছে এবং তাহারই সমাধানের জন্য কবির ভাবস্রোত বিভিন্নমুখে ছুটিয়াছে। পরিণত বয়সের রচনার মধ্যে ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিশ্বের আনন্দ-যজ্ঞে তাঁহার অধিকার মিলিয়াছে ও তিনি বিভোর হইয়া বিশ্বের আনন্দরস উপভোগ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে যে বিশ্বের কোনো বস্তুই চিরস্থায়ী নয় এবং সকলই কালের হাতে আত্মসমর্পণ করিবে। তাঁহার গানও একদিন ফুরাইবে,—

এ আমার গানও দুদণ্ডের গান
রবে না রবে না চিরদিন,
পূরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন।

পৃথিবী মৃত্যুর অভিসারে চলিয়াছে,—

কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
হাসে খেলে মৃত্যু চারিপাশে।

এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

কবির মনে এই সমস্যা জাগিয়াছে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে এই সান্ত্বনা আসিয়াছে যে মৃত্যুতে এই সৃষ্টি, এই মানব-জীবনের ধ্বংস হয় না। মৃত্যু অনন্ত জীবনধারার এক একটা বাঁক মাত্র। মৃত্যু কেবল সেই নিত্যস্রোতের বেগকে বিভিন্ন-মুখে ফিরাইয়া দিয়াছে। মৃত্যু বারে বারে জীবনকে নব নব রসে পূর্ণ করিতে করিতে চলিয়াছে—নব নব সম্ভাবনায় ভরিয়া দিয়াছে। অনন্ত জীবনস্রোত কোন্ আদিম কাল হইতে ভাসিয়া চলিয়াছে, মৃত্যুই তাহাকে নব নব গ্রহে, নূতন নূতন আবেষ্টন ও অভিজ্ঞতার মধ্যে উপস্থিত করাইয়া নব নব রস পান করাইতেছে। তাই কবি পরম আশ্বাসে গাহিয়া উঠিয়াছেন—

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।

তাঁহার বিশ্বাস,—

মরণ বাড়িবে যত কোথায় কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার।
উঠিবে জীবন মোর কত না আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশী,
যুগ যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি।

সমস্ত জীবনধারা এক মহাসমুদ্রে যাইয়া মিশিতেছে আর সেই মহাসমুদ্রের তটে অনন্ত জীবনদেশ রচিত হইতেছে।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
... ...
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে,
সাগরে পড়িব অবশেষে।
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে
অনন্ত জীবন মহাদেশ।

এ সংসারে ক্ষণিক ভালোবাসারও মৃত্যু নাই—এমন কি যে সব আনন্দের ছবি কবি সংসারে অহরহ দেখিতেছেন ও পরক্ষণেই ভুলিয়া যাইতেছেন তাহারাও নষ্ট হয় নাই। কবির জীবনেই স্মৃতির তলদেশে তাহারা সঞ্চিত হইয়া আছে—

স্মৃতির কণিকা তা'রা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার।

হয়তো একদিন অকারণ তাহারা কবির জীবনে আত্মপ্রকাশ করিবে।

নিমেষের-মোহে জন্মে যে প্রেম-উচ্ছ্বাস
নিমেষেই করে পলায়ন,
সেও কভু জানে না মরণ।
জগতের তলে তলে তিলে তিলে পলে পলে
প্রেমরাজ্য হতেছে সৃজন,
সেথায় সে করিছে গমন।

সুতরাং মৃত্যুর জন্য কবির আর কোনো উদ্বেগ নাই—মৃত্যুর প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইয়াছেন,—

জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ তো নহে তোর পর।
আয়, তারে আলিঙ্গন কর,
আয়, তার হাতখানি ধর!

মৃত্যুসম্বন্ধে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত হইয়াছে এইখানে। জীবন যে অনন্ত, মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, নবজীবনের দ্বার স্বরূপ, এই ভাবানুভূতি রবীন্দ্রকাব্যে বহুবার বহুরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই মনোভাব সম্বন্ধে কবি বহুকাল পরে বলিয়াছেন,—

"সেই সময়ের কথা মনে পড়ছে যখন কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দরমহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ওইগুলোর নাম—অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি। 'অনন্ত জীবন' বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসেছিল—বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর-অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা। এই ভাবনাটা ভিতরে ভিতরে মনকে খুব দোলা দিয়েছিল। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে একটা ধারণা আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল যে আমার প্রতি মুহূর্তের সমস্ত ভালোমন্দ, আমার প্রতি দিনের সুখ-দুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো অনবরত একটা সৃষ্টিরূপ ধরছে, প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে যে সৃষ্টির স্বরূপ। এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই মনে হল, মৃত্যু তাহলে কী। একরকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে, জীবন সব কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরায়

ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে, গাঁথা পড়ছে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। মুহূর্তকালীন মৃত্যু-পরম্পরা দিয়ে মর্ত্যজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবাল-দ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে—আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক-এক ফোঁড়ে এক-এক লোককে সম্বন্ধসূত্রে গাঁথবে। মনে আছে, এই চিন্তায় আমার মনকে খুব আনন্দ দিয়েছিল।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, সূচনা, ১ম খণ্ড)

সমস্ত সন্দেহ, সংশয় দূর হইলে, কবি দ্বিধাহীন, সঙ্কোচহীন হইয়া জগতের সৌন্দর্য-উপভোগে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এখন আনন্দোচ্ছ্বাস অনেকটা সংহত মূর্তি ধারণ করিয়াছে; অনুভূতির তীব্রতা কমিয়া গিয়া উহার গভীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কবি এখন শান্তচিত্তে ও নীরবে সৃষ্টি-সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছেন। 'চেয়ে থাকা' ও 'সাধ' কবিতায় তাঁহার এই নিশ্চিন্ত ও শান্ত চিত্তে সৌন্দর্য-উপভোগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নীরবে তন্ময় হইয়া সৌন্দর্য উপভোগ করিবেন,—

মনেতে সাধ যে দিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব'।
দেখিব শুধু—দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব'।
পরানে শুধু জাগিবে প্রেম,
নয়নে লাগে ঘোর।
জগতে যেন ডুবিয়া রব'
হইয়া রব' ভোর। (চেয়ে থাকা)

আজ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ—তৃপ্ত। মনে হইতেছে তাঁহারি জন্য সৃষ্টি অপরূপ সৌন্দর্যে ভূষিত হইয়াছে,—

আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে।
মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ-ভরা প্রাণ,
আমারি প্রাণ হাসিতে ছেয়ে
জাগিছে উষা তরুণ-মেয়ে,
করুণ আঁখি করিছে প্রাণে
অরুণ-সুধা দান। (সাধ)

'সমাপন' কবিতায় কবি সমস্ত গান বন্ধ করিয়া কেবল সারা বিশ্ববাসীর খেলার সাথী হইতে চাহিতেছেন। খেলার হাল্কা আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরপুর,—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।

জেগেছে নূতন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।
আমারে বুকেতে নে রে, কাছে আয়,—আমি যে রে
নিখিলের খেলাবার সাথী।

প্রভাতসংগীতের শেষের তিনটি কবিতা 'ছবি ও গানে'র মনোভাবের সূচনা করিয়াছে।

প্রভাতসংগীতের মূলসুরের কবিতাগুলি রচনার পঞ্চাশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া উহাদিগের মর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কি করিয়া তিনি প্রথম অহং-মুক্ত হইয়া ভূমার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কেমন করিয়া জীবনের সমস্ত বিচিত্র লীলার সহিত সংযুক্ত হইয়া সেই বিরাট পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুলতায় উদ্বেল হইয়া উঠিলেন—তাহার ইতিহাস এই কবিতাগুলির সহিত সংযুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রভাতসংগীতেই যে কবির প্রকৃত কবিত্বোন্মেষের প্রথম সূত্রপাত হয় তাহা নয়, এই সময় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনেরও প্রথম বিকাশ লক্ষিত হয়। যে অনুভূতি তাঁহার কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই তাঁহার সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুভূতি জীবনের অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, অধ্যাত্ম-চেতনা ও কাব্য-চেতনা এক হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কাব্য, চিন্তা, ভাব, কর্ম ও জীবন-দর্শনের মূলে এক আনন্দময়, সৌন্দর্যময়, রসময় বিশ্বানুভূতি।

উপনয়নের সময়ে গায়ত্রী-মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল।...এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হতো বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।...তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত।...যখন বয়স হয়েছে, হয়তো আঠারো কি উনিশ হবে, বা বিশও হতে পারে, তখন চৌরঙ্গীতে ছিলুম দাদার সঙ্গে।...তখন প্রত্যুষে ওঠা প্রথা ছিল।...সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গীর বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম।...চেয়ে দেখলুম গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হলো গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হলো, মানুষ আজন্ম এই আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হ'লে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হলো সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে।

তাদের দেখে মনে হলো না, তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ। সুন্দর কাকে বলি? বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ, তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপ ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর, যে-মানুষ তার কেবল পাপড়ি না, বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে।…আমি যার অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হলো, এই মুক্তি।…সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল…তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে যে-ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল, তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার এই সময়কার কবিতাতে—'প্রভাতসংগীত'-এর মধ্যে। তখন স্বতঃই যে ভাব আপনাকে প্রকাশ করেছে, তাই ধরা পড়েছে 'প্রভাতসংগীতে'।…

……আমাদের একদিক্ অহং আর একদিক্ আত্মা। অহং যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ যা নিয়ে বিষয়কর্ম, মামলা-মোকদ্দমা, এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই; সে আকাশ অসীম বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বল্‌তে যে-বিরাট পুরুষ, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক্ আছে—এক, আমাতেই বদ্ধ, আর-এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা!
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ 'পরে!
—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপন-গীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে-লীলা, সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা, নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে-জীবন, সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি, দুঃখ, ক্ষতি, সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে, তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই

অহং-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর, ইত্যাদি—

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এলো বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন করবার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান্ বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুরুষ। সেই যে মহামানব, তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে ? এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

কি জানি কি হলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক। দু-চার দিন পরেই লিখেছি 'প্রভাত-উৎসব'। একই কথা, আর একটু স্পষ্ট করে লেখা।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

এই তো সমস্ত মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির যে সম্বন্ধ, সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ করে দেখা, বড়ো ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে তারা একটা ঐক্য, একটা তাৎপর্য লাভ করে। সেদিন যে দুজন মুটের কথা বলেছি, তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম সে সত্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন কিছু যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুশি হয়েছিলুম। আরো খুশি হয়েছিলুম এই জন্যে যে, যাদের মধ্যে ঐ আনন্দটা দেখলুম, তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর বলেই দেখে এসেছি। যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম, অমনি পরম-সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম। মানব-সম্বন্ধের যে বিচিত্র রস-লীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন।...সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি। আমি যে যা-খুশি গেয়েছি তা নয়। গান দু-দণ্ডের নয় ; এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।

কাল গান ফুরাইবে, তা ব'লে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত।

—অনন্ত জীবন

কিসের হরষ কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল্!
আনন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর এক দিন।

এই যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে, তা দেখিনি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ! রসো বৈ সঃ। রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল।

প্রভাতসংগীতের শেষের কবিতা—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হের আজি ভোর বেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারিদিকে,
চেয়ে আছে অনিমেখে,
হের মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখ শোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

—সমাপন

এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন কী ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল …তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতায় আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। …সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই!…স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় সে সত্তা তার মৃত্যু নেই।"

—মানব-সত্য, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪০, মানুষের ধর্ম, পৃ. ৭৯-৮৮

প্রভাতসংগীতে 'মহাস্বপ্ন' 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়' নামে যে দুইটি কবিতা আছে, তাহাদের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাদের মধ্যে মহাকালের স্বপ্নে জগতের অবস্থিতির স্বরূপ ও জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্বন্ধে তরুণ কবির দার্শনিক আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ আছে। এই কবিতা দুইটির মধ্যে কবি-কল্পনার একটা উচ্চতা বা বিশালতা দেখা যায় বটে, কিন্তু কবির শক্তির অপূর্ণতার জন্য এই ভাব-কল্পনা উপযুক্ত বাণীরূপ লাভে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

'মহাস্বপ্ন' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্ট প্রত্যয় ও জীবনদর্শনের প্রাথমিক রূপ লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের সৃষ্টিপ্রবাহ এক এবং অখণ্ড; ইহার শত শত

বৈচিত্র্য—জড় ও চৈতন্যের লক্ষ লক্ষ রূপাভিব্যক্তি এক অনাদি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক মহান্ বিধাতার ('মহাদেব') স্বপ্নের মধ্যে বিধৃত। বিশ্বের অন্তর্নিহিত এই অখণ্ডবোধ ক্রমে নানা ভাব-কল্পনার মধ্য দিয়া তাঁহার সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবি এই অখণ্ড বিশ্বসৃষ্টিকে কোথাও 'মহাস্বপ্ন', কোথাও 'অনাদি স্বপ্ন', কোথাও 'বিশ্বসংগীত' প্রভৃতি আখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিশ্বৈকবোধের সঙ্গে বিশ্বাত্মবোধ মিলিত হইয়া তাঁহার একটা বিশিষ্ট জীবনদর্শন ও উপলব্ধির ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে। আকাশের অগণিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী হইতে ধরণীর ধূলিকণা পর্যন্ত, মানুষের যুগযুগান্তব্যাপী সাধনা, সংস্কৃতি ও কর্মধারার ইতিহাস, তাহার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান একত্র করিয়া তিনি এক বিরাট মহিমান্বিত ঐক্যবোধ ও বিশ্বাত্ম-বোধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

'মহাস্বপ্ন' কবিতায় কবি কল্পনা করিতেছেন,—

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান স্বপন।
বিশাল জগৎ এই
প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয় সমুদ্রে তার উঠিতেছে বিম্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্র-সূর্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার॥
... ...
এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।

কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

পূর্ণআত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন?
অপূর্ণ জগৎ-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন?
... ...
কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন-ভাঙা দিন?
সত্যের সমুদ্রমাঝে আধ-সত্য হয়ে যাবে লীন?

জগতের সমস্ত বস্তুর সত্যকে লাভ করিতে হইবে সেই অখণ্ড সত্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া, না হইলে তাহা সত্য নয়। সত্য নিহিত আছে সমগ্রের মধ্যে।

'সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ে' কবি ব্রহ্মা কি করিয়া প্রথম সৃষ্টি করিলেন, তারপর বিষ্ণু কি অবস্থায় সৃষ্টিকে রক্ষা করিলেন এবং অবশেষে মহাদেব কিরূপে সৃষ্টি ধ্বংস করিলেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা ধ্যানস্থ আছেন,—

দেহশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য 'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান.
সহসা আনন্দসিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া
আদিদেব খুলিলা নয়ন !

তারপর,—

ভাবের আনন্দে ভোর, গীতি-কবি চারিমুখে
করিতে লাগিলা বেদ গান।
আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
... ...
অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া
পড়িল প্রেমের আকর্ষণ।
এ ধায় উহার পানে,
এ চায় উহার মুখে,
আগ্রহে ছুটিয়া কাছে আসে।
বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটাছুটি,
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন।
... ...
শত শত অগ্নি-পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।

তখন বিষ্ণু আসিলেন,—

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
চারিদিকে উঠিছে নিনাদ,
... ...
বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্বাদ।
... ...
থেমে গেল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিভে গেল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
নিভাইল নিজের হুতাশ।

জগতের বাঁধিল সমাজ
জগতের বাঁধিল সংসার,
বিবাহে বাহুতে বাহু বাঁধি
জগৎ হইল পরিবার।

তারপর লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল,—

ধীরে ধীরে জগৎ-মাঝারে
লক্ষ্মী আসি ফেলিলা চরণ।
... ...
একি হেরি যৌবন-উচ্ছ্বাস
এ কি রে মোহন ইন্দ্রজাল,
সৌন্দর্য-কুসুমে গেল ঢেকে
জগতের কঠিন কঙ্কাল।
জগতের মত্ত কোলাহল
রাগিণীতে হল অবসান!
কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি।

তারপর,—

মহাছন্দে বন্দী হয়ে যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর
পড়িল নিয়ম-পাঠশালে
অসীম জগৎ-চরাচর।
শ্রান্ত হয়ে এলো কলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার
আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
উত্তাপ হতেছে একাকার।

তখন মহাদেবের আবির্ভাব,—

... ...
জগৎ কাঁদিল উচ্চরবে,
জাগিয়া উঠিল মহেশ্বর,
তিনকাল-ত্রিনয়ন মেলি
হেরিলেন দিক্ দিগন্তর।
প্রলয় পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া,

জগতের আদি-অন্ত থর থর থর থর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।

কে কোথায় ছুটে গেল
ভেঙে গেল টুটে গেল,
চন্দ্রে সূর্যে গুঁড়াইয়া
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।

... ...

অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্ত—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সমস্তই এক মহান্ বিধাতার মধ্যে নিহিত।

৩

ছবি ও গান

(১২৯১)

সন্ধ্যাসংগীতে দেখা যায়, কবি হৃদয়ের অন্ধকার গুহায় অবরুদ্ধ হইয়া ছিলেন। প্রকৃতি ও মানবজীবনের সহিত তাঁহার সহজ সম্বন্ধটি ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই রুদ্ধ জীবনের বিষাদ ও বেদনার করুণ সংগীত গাহিয়াছেন। প্রভাতসংগীতে সেই সীমাবদ্ধ রুদ্ধ জীবন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি প্রকৃতি ও মানবকে আবার ফিরিয়া পাইলেন। বিশ্বের সহিত—প্রকৃতি ও মানবজীবনের সহিত আবার তাঁহার সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, পুনর্মিলন সাধিত হইল। প্রভাতসংগীতে কবি সেই বিশ্বের সহিত মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ছবি ও গানে' কবি প্রাণ ভরিয়া প্রকৃতি ও মানব-জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছেন। এই উপভোগে কোনো চাঞ্চল্য বা আবেগ নাই; শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে তিনি বিশ্বের অসংখ্য বিচিত্র সৌন্দর্যের উপর চোখ বুলাইয়া লইতেছেন—এক একটি দৃশ্যের উপর কল্পনার রশ্মি নিক্ষেপ করিয়া মনের আনন্দে ছবি আঁকিতেছেন। নিরুদ্বেগে ও সহজ আনন্দে প্রকৃতি ও মানবজীবনের সৌন্দর্য-উপভোগই 'ছবি ও গানে'র মূলসুর।

ছবির পর ছবি চলিয়াছে। কবি-রৌদ্র-ছায়া-খচিত গ্রামের নদীতীরে দুইটি দোলা দেখিতেছেন,—

ঝিকিমিকি বেলা ;
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা।
দুটিতে দোলার পরে দোলে রে
দেখে রবির আঁখি ভোলে রে।

কখনো মেঠো পথের নিরালা যাত্রী পল্লীবালিকাকে দেখিতেছেন,—

একটি মেয়ে একলা,
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে।
ওর মুখেতে পড়েছে সাঁঝের আভা,
চুলেতে করিছে ঝিকিমিকি।
কে জানে কী ভাবে মনে মনে
আনমনে চলে ধিকিধিকি।

কখনো একটা বনফুলকে দেখিতেছেন,—

একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ
একা একটি বনফুল ফোটে-ফোটে হয়েছে,
কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে।

কখনো বা ছেলেমেয়েদের খেলা দেখিতেছেন ও বলিতেছেন,—

ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা,
ঘাসের পরে, সাঁঝের বেলা।
... ...
কতো আর খেল্‌বি ওরে,
নেচে নেচে হাত ধরে
যে যার ঘরে চলে আয় ঝাট্‌,
আঁধার হয়ে এলো পথঘাট।
সন্ধ্যাদীপ জ্বল্‌ল ঘরে
চেয়ে আছে তোদের তরে,
তোদের না হেরিলে মা-র কোলে,
ঘরের প্রাণ কাঁদে সন্ধ্যা হ'লে।

কখনো বা বাদ্‌লা দিনে নির্জন ঘরে একা বসিয়া দেখিতেছেন,-

টুপটুপ বৃষ্টি পড়ে,
পাতা হ'তে পাতায় ঝরে,
ডালে বসে ভেজে একটি পাখী।
তালপুকুরে, জলের পরে,
বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায়,
ছেলেরা মেতে বেড়ায় জলে,
মেয়েগুলি কলসি নিয়ে,
চলে আসে পথ দিয়ে,
আঁধারভরা গাছের তলে তলে।

কখনো বা একটা পাগল তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে,—

আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে,
গান কেউ শোনে, কেউ শোনে না।
ঘুরে বেড়ায় জগৎ-পানে চেয়ে
তারে কেউ দেখে, কেউ দেখে না।

আবার একটা মাতালও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই,—

বুঝি রে,
চাঁদের কিরণ পান ক'রে ওর ঢুলুঢুলু দুটি আঁখি
কাছে ওর যেয়ো না,
কথাটি শুধায়ো না,
ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।
ঘুমের মতো মেয়েগুলি
চোখের কাছে দুলি দুলি
বেড়ায় শুধু নূপুর রনি-রনি।
আধেক মুদি আঁখির পাতা,
কার সাথে সে কচ্ছে কথা
শুনচে কাহার মৃদুমধুর ধ্বনি।

এমন কি, একটা পোড়ো বাড়িও কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই,—

চারিদিকে কেহ নাই, একা ভাঙা বাড়ি,
সন্ধ্যেবেলা ছাদে বসে ডাকিতেছে কাক,
নিবিড় আঁধার, মুখ বাড়ায়ে রয়েছে,
যেথা আছে ভাঙা ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক।

'ছবি ও গান'-এ কবির এই সৃষ্টি-সৌন্দর্য-উপভোগের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কবি বাহিরের এক একটি দৃশ্য দেখিতেছেন ও নিজের কল্পনা ও মনের আনন্দ দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া উপভোগ করিতেছেন। দৃশ্যের বাস্তবতা মিলাইয়া গিয়া কবির কল্পনায় উহা রূপান্তরিত হইয়া এক রঙীন রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহা তাঁহার কল্পনার রূপ—তাঁহার স্বপ্নেরই রূপ। প্রকৃতপক্ষে কবি যেন এক আনন্দময়, স্বপ্নাবেশময় চক্ষে সমস্ত পৃথিবী দেখিতেছেন। 'মধ্যাহ্নে' গ্রামের বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,—

সুদূর মাঠের পারে গ্রামখানি একধারে
গাছ দিয়ে ছায়া দিয়ে ঘেরা,
কাননের গায়ে যেন ছায়াখানি বুলাইয়া
ভেসে চলে কোথায় মেয়েরা !
মধুর উদাস প্রাণে চাই চারিদিক পানে,
স্তব্ধ সব ছবির মতন,
সব যেন চারিধারে অবশ আলস ভরে
স্বর্ণময় মায়ায় মগন।

'গ্রামে' কবিতাটিতে গ্রামের বর্ণনায় এই মায়ার উল্লেখ আছে,—

কাহিনীতে ঘেরা ছোট গ্রামখানি,
মায়াদেবীদের মায়া-রাজধানী,
পৃথিবী বাহিরে কলপনা তীরে
করিছে যেন রে খেলাধূলি।

কবি যে দিকে তাকাইতেছেন সবই যেন স্বর্ণময় মায়ামগ্ন ; চোখে দেখা গ্রাম যেন পৃথিবীর বাহিরে কল্পনার তীরে মায়া-রাজধানী বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার মধ্যে কবির নিজেরই কল্পনার অপূর্ব রস বাহিরের একটা পাত্রকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবি ও গানের উপভোগের বৈশিষ্ট্য এই যে উহা কোনো বস্তুর রসমাত্র-উদ্ঘাটনের উপর নির্ভর করে নাই। মনের আনন্দরস ও কল্পনার রঙ বস্তুতে সংক্রামিত করিয়া উপভোগের আয়োজন চলিয়াছে।

'ছবি ও গান' সম্বন্ধে কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও এইরূপ একটি আভাস পাওয়া যায়,—

"নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত।...নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ

করিয়া দেখিবার একটা পালা এই 'ছবি ও গানে' আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদা কথাকে গভীর করিয়া তোলে তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটিকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহা তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা 'ছবি ও গানে' ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটি যখন সুরে বাঁধা থাকে তখনই বিশ্বসংগীতের ঝঙ্কার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে সেইদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল না। এক একদিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত, দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে।"

ছবি ও গান লেখার সাত বৎসর পরে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত এক পত্রে কবি উহার উল্লেখ করিয়া বলেন,

"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ, [illegible] মনের মধ্যে হয়তো অনুভব করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম।

আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে, তখন যদি তোমরা আমায় দেখতে তো মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষেপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নব যৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্চি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোল এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে [illegible] কিছু ছিল না। কেবলি একটি সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। [illegible] এরকম অবস্থা হয়—

'উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি, মুখে লয়ে হাসি,
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবনমুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।"

"সত্যি কথা বলতে কি, সেই নব যৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোন পুরানো লেখায় হয় না।"

তারপর একেবারে জীবনের শেষ-পর্যায়ে কবি তাঁহার 'ছবি ও গান' সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে।.........এখন এই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে, কিন্তু ছবি আঁকার হাত তৈরি হয়নি তো।

কবি সংসারের ভিতর তখনো প্রবেশ করেনি, তখনো সে বাতায়ন-বাসী। দূর থেকে যার আভাস পথে তার সঙ্গে নিজের মনের রেশ মিলিয়ে দেয়। এর কোনো-কোনোটা চোখে দেখা এক টুকরো ছবি পেনসিলে আঁকা, রবারে ঘষে দেওয়া, আর কোনো-কোনোটা সম্পূর্ণ বানানো। মোটের উপর অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয়নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেই জন্যে চলতিভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষা ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হলো। ছবি ও গান কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সূচনা)।

'ছবি ও গান' নামটির মধ্যে সমস্ত গীতিকাব্যের অন্তর্নিহিত স্বরূপের কথা আছে। চিত্রধর্ম ও সঙ্গীতধর্ম যুগপৎ গীতিকবিতার সার্থক রূপায়নে সাহায্য করে। ভাব একটি চিত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু যখন কবিহৃদয়ের একটা সুর তাহার মধ্যে ঝংকৃত হয়, তখনই তাহার মধ্যে এক নূতন ব্যঞ্জনা—এক অনির্বচনীয়ত্বের সৃষ্টি হয়। তখনই ভাব, রূপ ও সংগীত মিলিত হইয়া অনবদ্য গীতি-কবিতা রূপে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু 'ছবি ও গানে' ভাব, রূপ ও সংগীতের সার্থক মিলন হয় নাই। কাব্যশিল্পের যে অত্যাশ্চর্য উৎকর্ষ রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, তাহা 'ছবি ও গানে' এখনও পরিস্ফুটরূপ গ্রহণ করে নাই।

সত্যই এগুলি পাকা শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি নয়। কল্পনার অন্তর্দৃষ্টির মায়া-তূলিকায় উজ্জ্বল রঙে এগুলি বর্ণাঢ্য হয় নাই। এগুলি পেন্সিল-স্কেচই—ছবি-আঁকায় এখনো কবির হাত পাকে নাই।

ছবি ও গানের মধ্যে 'রাহুর-প্রেম' নামে কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতার তুলনায় ইহাতে কবির কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ভাবের যে অনবদ্য রূপ-সাধনা কবি-শক্তির প্রধান অংশ, তাহার একটু সুস্পষ্ট মূর্তি ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মনের একটা বিশিষ্ট ভাবকে প্রকৃতির মধ্যে বিসর্পিত করিয়া ভিতর ও বাহিরের সাদৃশ্যস্থাপনের যে রীতি রবীন্দ্র-কবি-মানসের অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ, তাহাও সার্থকভাবে এই কবিতার মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। তরুণ কবির চিত্তে প্রবল রূপতৃষ্ণা ও প্রেমের স্বাভাবিক সর্বগ্রাসী ভোগস্পৃহার প্রথম প্রভাব অনুভূত হইয়াছে ইহার মধ্যে। এই সময় হইতে পরবর্তী কিছুকাল ধরিয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের চিরন্তন নির্মল স্বরূপের অনুভূতি ও আত্মসর্বস্ব ভোগকামনার স্বাভাবিক প্রেরণা কবি-চিত্তে যে দ্বন্দ্ব জাগাইয়াছে, তাহারই ইতিহাস রূপ পাইয়াছে কবির পরবর্তী কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থে।

সৌন্দর্যকে চিরকাল আত্মসাৎ ও নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার জন্য মানুষের মনে একটা দুর্বার বাসনা বলবতী থাকে। এই সৌন্দর্যের প্রতি দুর্দমনীয়

আকর্ষণ, এই অন্ধ আসক্তিমূলক প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলেও সে প্রেমপাত্রীকে সবলে করায়ত্ত করিতে চায়, প্রেম বিকৃত হইয়া পরিণত হয় ক্রূর প্রতিহিংসায় এবং তাহা জীবনে এক পীড়াদায়ক অভিসম্পাতরূপে বর্তমান থাকে। রাহু যেমন চন্দ্রসূর্যকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে, এই আত্মকেন্দ্রাভিমুখী ভোগপ্রবৃত্তিও প্রেমাস্পদকে সবলে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে একেবারে গ্রাস করিতে চায়। এই প্রবল ভোগ-তৃষ্ণা প্রেমাস্পদকে আচ্ছন্ন করিয়া, তাহার নিজস্ব সত্তাকে নিপীড়ন করিয়া, অতি নিষ্ঠুর গর্বের জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিয়া, আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে চায়। ইহাই এই কবিতাটির মর্মগত ভাব। 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'তে কবি যে আত্মসর্বস্ব ভোগ-কামনার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রেম ও সৌন্দর্যকে বিশ্বের চিরন্তন ধন বলিয়া মুক্তি দিয়াছেন, রাহুর প্রেম কবিতাটিতে সেই ভোগকামনার বিশ্ববিলোপী অকল্যাণ-জনক শক্তির কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৪

কড়ি ও কোমল

(১২৯৩)

সন্ধ্যাসংগীতের রুদ্ধ-জীবন হইতে হঠাৎ মুক্তি পাইয়া, কবি প্রভাতসংগীতে বিশ্বকে ফিরিয়া পাইবার আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ছবি ও গানে বিশ্বের সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিজের কল্পনার রঙে রাঙাইয়া ও হৃদয়ের রসে রসাইয়া উপভোগ করিয়াছেন। উচ্ছ্বাস ও কল্পনার আতিশয্যে এতদিন একটা নেশার ঘোরে তাহার জীবন কাটিয়াছে, বিশ্বকে ভালো করিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। 'কড়ি ও কোমলে' আসিয়া কবি সর্বপ্রথম স্বাভাবিক দৃষ্টি লইয়া বিশ্বকে দেখিলেন। প্রবল উচ্ছ্বাস সংহত হইয়াছে, স্বপ্নের আবেশ কাটিয়া গিয়াছে এবং পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়াছে - বিশ্ব এখন তাহার স্বাভাবিক মূর্তি লইয়া তাঁহার স্থির দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে। কবি 'কড়ি ও কোমলে' প্রকৃতভাবে প্রকৃতি ও মানব-জীবনের সম্মুখীন হইলেন। কবির মন সমস্ত স্বপ্ন-কুহেলিকা হইতে মুক্ত হইয়া শরৎ-আকাশের মতো সোনালী আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিল। সেই নির্মল সোনালী আলোর আভায় কবি মানবজীবনকে নূতন করিয়া দেখিলেন।

স্বয়ং কবি কড়ি ও কোমলের যুগের মনকে শরৎ-আকাশের সহিত তুলনা করিয়াছেন, —

—"জানিনে কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে আকাশ যে আলোকের মধ্যে দেখিতে

পাইতেছি, তাহা শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষীদের ধানপাকানো শরৎ—সে আমার গানপাকানো শরৎ।…এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোকটির মধ্যে যে উৎসব, তাহা মানুষের।…আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।…বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই আত্মনিবেদন।

…আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বায়ু ও বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ ও অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।…জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাইরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙ্গার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হাল্কা করিয়া দেখা চলে না।" (জীবনস্মৃতি)

কবি বলিতেছেন যে উচ্ছ্বাস ও স্বপ্নের দিন কাটিয়া গিয়াছে, এখন বাস্তব সংসারের সহিত তাঁহার কারবার আরম্ভ হইয়াছে এবং তিনি মানুষের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কড়ি ও কোমল হইতেই তাঁহার কাব্য মানুষের স্পর্শ লাভ করিয়াছে।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই দুইটি লাইনে 'কড়ি ও কোমল'এ যে কবি মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে কবি প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসিতে চাহিয়াছেন। প্রকৃতির রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও মানব-জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-অশ্রু, স্নেহ-প্রেম, বিরহ-মিলন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবজীবনের এই অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্য তিনি চিরকাল উপভোগ করিতে চাহেন—এই বিচিত্র অনুভূতির আনন্দ-বেদনায় জীবনের এক পরমসুন্দর সার্থকতা লাভের জন্য তিনি চির-উৎসুক। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথের এই জগৎপ্রীতি ও মানবতাবাদ একটু স্বতন্ত্র ধরনের। প্রথম যৌবনে 'কড়ি ও কোমল'-এ কবি স্বাভাবিকভাবে সংসারের বাস্তব মানুষের হাসি-অশ্রু, বিরহ-মিলনের সহিত তাঁহার প্রাণের যোগ-সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাঁহার ভাব-কল্পনা ও আদর্শ অনুসারে মানুষ এই সংসারের সাধারণ মানুষ নয়। রবীন্দ্রনাথের মানব ভূমার অংশস্বরূপ, বৃহত্তর দেশে ও কালে পরিব্যাপ্ত, বিশ্বমানব—রক্তমাংসের দেহধারী, শত অসম্পূর্ণতায় বিড়ম্বিত জন্মমৃত্যুশীল মানব নয়। ভূমিকায় ইহার আলোচনা করা হইয়াছে।

তাই পরিণত বয়সে কবি বলিয়াছেন, ইহা বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের আত্ম-নিবেদন। এক বিরাট মহান্ প্রাণ বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবের মধ্যে অভিব্যক্ত। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও রস, মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-ভালোবাসার মধ্যে সেই চিরন্তন পরমসুন্দরের বিকাশ। তাই প্রকৃতি এত সৌন্দর্যময়ী, মানব-জীবন এত মহান্, এত মধুর, এত অর্থপূর্ণ। ধরণীর সমস্ত খণ্ডতা, ক্ষুদ্রতা বিরাটের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার সাধারণত্ব অসাধারণত্বের গৌরব ও মহিমায় উজ্জ্বল। তাই কবি এই অপূর্ব সুন্দর ও মহান্ ধরণী হইতে বিদায় লইতে চাহেন না—এই সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি ও বিচিত্র রসময় মানবজীবনের মধ্যে সেই পরমসুন্দর, সেই পরমরসময়কে উপভোগ করিতে চাহেন। তাঁহার খণ্ড, ক্ষুদ্র জীবন বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবের সহিত যুক্ত করিয়া সমস্ত রূপে অপরূপকে দেখিয়া, সমস্ত রসে রসময়কে আস্বাদন করিয়া, তিনি তাঁহার জীবনের সার্থকতা সাধনা করিতে চাহেন, বিশ্ব-জীবনের সহিত যুক্ত হইয়া চিরজীবী হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন। শেষ বয়সেও কবি এই প্রকার অমরতা কামনা করিয়াছেন, —"আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে· সেই মানুষ ব্যক্তিতে ও অব্যক্তে মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই।· অমরতা তারই মধ্যে যে মানব সর্বলোকে।"

প্রভাতসংগীত হইতেই কবিচিত্তে এই অনুভূতি প্রবেশ করিয়াছে যে এক বিরাট চিরন্তন প্রাণের তরঙ্গে এই বিশ্ব তরঙ্গিত, মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণও তাহারই অংশ। মানুষ সেই বিশ্ব-প্রাণের বিচিত্র লীলার সঙ্গে যুক্ত হইয়া সার্থকতা লাভ করে। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবের মধ্যে সেই প্রাণ সৌন্দর্য ও প্রেম-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে পরমসুন্দরেরই প্রকাশ এবং মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলায় সেই চিরন্তন পরমরসময়েরই অভিব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানবজীবনের সৌন্দর্য ও রসের খণ্ড প্রকাশের মধ্যে সেই পরমসুন্দর ও পরমরসময়কে আমরা আস্বাদন করি। ইহাই অনন্তের শান্ত প্রকাশ—সীমার মধ্যে অসীমের লীলা। এই অনুভূতি প্রভাতসংগীত হইতে অঙ্কুরিত হইয়া কড়ি ও কোমলের মধ্যে প্রথম একটা উন্মেষ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখান হইতে এই অনুভূতি ক্রমে পূর্ণ বিকশিত হইয়া নানা রূপে ও রসে কবির সমস্ত পরবর্তী কাব্যসৃষ্টির মূলে প্রেরণা জোগাইয়াছে।

'কড়ি ও কোমল'-এ রবীন্দ্রনাথের যৌবনাবেগবিহ্বলতাই মূল সুর। ইহার মধ্যে নারীর দেহচিত্রমূলক কবিতাগুচ্ছে কবির বাস্তব সৌন্দর্যস্পৃহার এক অভিনব রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও ইহা অতি সূক্ষ্ম মানস-অনুভূতি ও ভাবময় প্রেরণা তবুও সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে ইহাই কবিজনোচিত স্বাভাবিক রূপতৃষ্ণার নিদর্শন।

যৌবনের সোনার কাঠির স্পর্শে কবির চিত্তে সুপ্ত সৌন্দর্যস্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। চক্ষে যৌবনের মোহাঞ্জন লাগিয়াছে—চিত্তে রঙীন স্বপ্নের জাল বোনা হইতেছে ; তাঁহার প্রাণের রঙে সারা পৃথিবী আজ অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত —

আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।

পুরুষের সমস্ত যৌবন মথিত করিয়া যে কামনা উত্থিত হয়, তাহা নারীর জন্য, যে সৌন্দর্য-স্পৃহা জাগরিত হয় তাহা নারীকেই কেন্দ্র করিয়া। জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে নারী পুরুষের চোখে অপূর্ব সুন্দর ও মধুর দেখায় ; কবির চতুর্দিকের সমস্ত পরিবেশ নারীময় হইয়া গিয়াছে, ফুলের স্পর্শে তিনি রূপসী নারীর স্পর্শ অনুভব করিতেছেন, দক্ষিণা বাতাস তাঁহার কাছে সমস্ত বিরহিণীদের দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো বোধ হইতেছে, পুষ্প-কাননের গোলাপকে দেখিয়া কবির মনে জাগিতেছে ব্রীড়াবনতমুখী তরুণীর লাজরক্ত গণ্ড। নারীকে কেন্দ্র করিয়াই কবির নবযৌবনের সৌন্দর্য-ভোগতৃষ্ণা জাগরিত হইয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি নারীর এক অপরূপ সৌন্দর্যের চিত্র আঁকিয়াছেন। সমস্ত খণ্ড খণ্ড কবিতাগুলি মিলিয়া নারী-সৌন্দর্যের একটি অখণ্ড রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নারীর ক্ষণিক স্পর্শে কবির দেহ-মনে এক অপূর্ব সংগীত ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে, জীবনকুঞ্জে বসন্ত সমীরণ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, নবপল্লবের মতো হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনাগুলি আবার জাগরিত হইয়াছে। কবি বুঝিতে পারিয়াছেন —

প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার।

ক্রমে তাঁহার প্রিয়া সশরীরে উপস্থিত—তাহার অনুপম সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ—মুগ্ধ-কবির স্তবগান শত ধারে উৎসারিত হইয়াছে।

রক্তমাংসময় দেহের যে সৌন্দর্যচিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে উহার মধ্যে লালসার উদ্দীপনা বা স্থূল ভোগকামনা নাই। ভোগের সমস্ত ক্ষণিকত, সংকীর্ণতা, ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে, সৌন্দর্যের যে চিরন্তন পরমমনোহর রূপ আছে, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতাগুলির মধ্যে। ভোগস্পৃহা মিলাইয়া গিয়াছে, লালসার উত্তেজনা স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে, নারী তাহার পরিপূর্ণ, চিরন্তন মাধুর্যময় রূপটি লইয়া প্রস্ফুটিত শতদলের মত শোভায় ও সৌন্দর্যে ঢলঢল করিতেছে।

নারী-দেহের সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। নারীর দেহ-সৌন্দর্যের একটা বড়ো আকর্ষণীয় বস্তু স্তন। সংস্কৃত-কবিগণ রূপ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে পদ্ম-কোরক হইতে আরম্ভ করিয়া পর্বতের চূড়া পর্যন্ত উপমার জন্য ছুটিয়াছেন ; বৈষ্ণব কবিরাও তুলনার জন্য বদরী হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য ফলের সন্ধান করিয়াছেন। সে-সব

বর্ণনায় একটা সৌন্দর্য বিকশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার সহিত একটা স্থূল, পার্থিব ও নিতান্ত দৈহিক লালসার আবহাওয়া মিশ্রিত আছে। নারীদেহের সৌন্দর্যবর্ধন ও পুরুষের মোহতৃপ্তি ছাড়া স্তনের আর কোনো রূপ তাঁহারা দেখিতে পান নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন,—

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্তসমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরান পাগল।

তার পরেই বলিতেছেন—

হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হের নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

'পরান-পাগল-করা', লোভনীয় ভোগের বস্তুটি লক্ষ্মীর আসন ও মন্দিরে পরিণত হইয়াছে।

তারপর উহা—

চিরস্নেহ উৎস-ধারে অমৃত নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।

নারী তাহার ক্ষণিক ভোগের রূপ ত্যাগ করিয়া বিশ্বের জননী সাজিয়া বসিয়াছেন। কবির প্রিয়া প্রেয়সীরূপ ত্যাগ করিয়া মাতৃ-রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। ক্ষণিক সৌন্দর্যের সঙ্গে চিরন্তন সৌন্দর্যের মিলন ঘটিয়াছে।

'কড়ি ও কোমলে' নারীর দেহ-সৌন্দর্যকে কবি অপরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকেই একান্ত করিয়া দেখেন নাই—দেহের মধ্য দিয়াই দেহাতীত সৌন্দর্যে উপনীত হইয়াছেন।

কবির চক্ষে বাহু যেন—

কণ্ঠ হতে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে।
দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।

চরণ যেন—

শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সুধালোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণ ছায়ায়।

তিনি প্রিয়ার দেহ কামনা করিতেছেন—

ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
... ...
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের এক গাছি মালা।

আরো কামনা করিতেছেন তাহার গোপন-হৃদয়,—

সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষ কিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়।

চুম্বন কবির কাছে যেন—

গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশে দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।
... ...
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হ'তে কুসুম চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।

কবি পূর্ণদেহ-মিলন প্রার্থনা করিতেছেন—

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
... ...
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমার সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।

এ মিলনে দেহের আকৃতি থাকিলেও ইহা ইন্দ্রিয়জ মিলনের উর্ধ্বে বলিয়া মনে হয়। দেহ-সায়রের তীরে কবি হৃদয়ের জন্য ক্রন্দন করিতেছেন। বৈষ্ণব-পদাবলীতে

আমরা অপূর্ব তন্ময়ভাব ফলে এই দেহই দেহাতীত অবস্থায় রূপাতীতের ইঙ্গিত পাই। জ্ঞানদাসের সেই—

রূপ লাগি' আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি' কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি' হিয়া মোর কান্দে।
পরান পীরিতি লাগি' থির নাহি বান্ধে॥

কতকটা ইহারই অনুরূপ ভাবব্যঞ্জক হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম-কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার মধ্যে প্রভেদ আছে। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

এই মিলনের পরেও কবি নারীর অনাবৃত যৌবনশ্রী উপভোগ করিতে চাহেন। অনাবৃত নারীদেহেই পূর্ণ সৌন্দর্যের প্রকাশ। নারীর সৌন্দর্য বিশ্বসৌন্দর্যের অংশ। বিশ্বসৌন্দর্য অনাবৃত। নারীকেও কবি বসন-ভূষণের সমস্ত কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিদেবীর বেশ ধারণ করিতে বলিতেছেন। ভাবাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মতো নারীর সহজ সৌন্দর্য প্রকাশিত হোক। সেই নির্মল, পবিত্র, নারীসৌন্দর্যের সম্মুখে সমস্ত স্থূল ভোগ-কামনা-বাসনা মস্তক অবনত করুক

অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানব ভবনে,
লাজহীন পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।

'চিত্রা'র বিজয়িনী কবিতায় এই ভাবের পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়।

কবির ভোগ-ক্ষুধার যেন কিছুতেই শান্তি হইতেছে না। তিনি মৃত্যুর মতো সর্বগ্রাসী মিলন চাহিতেছেন। তিনি প্রেয়সীকে বলিতেছেন,—তুমি আমার দেহ, লজ্জা, আবরণ, সমস্ত হরণ কর,— মন কি জীবন মরণ পর্যন্তও অধিকার করিয়া লও। চরাচর লুপ্ত হইয়া যাক—আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্বে বিলীন হোক। তাহা হইলে আমাদের মিলন অসীম সুন্দর হইবে—সার্থক হইবে। কিন্তু এই পার্থিব দেহ-মিলন কি কখনো অসীম সুন্দর হইতে পারে? তাই বলিতেছেন,—

এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় হা ঈশ্বর
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্ খানে।

কবি বুঝিয়াছেন প্রকৃত পূর্ণ-মিলন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু—এ সংসারের কামনাময় দেহ-মিলনের তাহা বহু ঊর্ধ্বে—তাহা অপার্থিব।

পার্থিব স্থূল সৌন্দর্যভোগে শীঘ্রই দেহমনে ক্লান্তি উপস্থিত হয়। অথচ এই মায়াডোর—এই ইন্দ্রজাল কিছুতেই ছিন্ন হইতে চাহে না। তাই কবির অবস্থা—

কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাস রুদ্ধ হয়,
পরান কাঁদিতে থাকে মুক্তিকার তরে,
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়,
কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,

এই মোহময় স্বপ্নজাল বেষ্টিত জীবনে তাঁহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। প্রিয়া তাঁহাকে সর্বাঙ্গ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে বটে, তবুও তিনি এই মিলন-পূর্ণিমার অবসান কামনা করিতেছেন,—

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহুপাশ।
চুম্বন মদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।

দৈহিক ভোগক্ষুধার মোহ ক্ষণস্থায়ী, সীমাবদ্ধ প্রেমে অতৃপ্তির বেদনা। তাই কবি বলিতেছেন,—

এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়।
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।

যে প্রেম-কুসুম স্বর্গের সৌন্দর্য লইয়া বিকশিত হইয়াছে, তাহাকে কি দেহের আধারে সীমাবদ্ধ করা যায়? সে যে নন্দনের ফুল, সে কি ধরার ধূলিতে ফুটিতে পারে? অন্তরের এই পবিত্র ধন কি দেহের কামনা-পঙ্কে লুটাইতে পারে? তাই কবি উহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছেন,—

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া,
ম্লান করিয়ো না আর মিলন-পরশে।
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা নিশ্বাস তব গরল বরষে।

এই স্বপ্নরাজ্যে, ভোগের আবেষ্টনার মধ্যে, মোহাবিষ্ট অবস্থায় যুগল-প্রেমের উৎসব মরীচিকা মাত্র। এ প্রেমের সার্থকতার জন্য ইহাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বাস্তব আবেষ্টনার মধ্যে যাচাই করা প্রয়োজন। তাই কবি প্রিয়াকে বলিতেছেন,—

এসো, ছেড়ে এসো, সখি, কুসুমশয়ন।
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন।

কেবল দেহের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য—শুধু ক্ষণিকের ভোগ-তৃপ্তির জন্যই এ মানবজীবন সৃষ্ট হয় নাই। মানব-হৃদয়ের প্রেম তো ক্ষণিকের মোহ নয়। তাই বলিতেছেন,—

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি,
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

প্রেম ভগবানের আশীর্বাণী—দেহ স্বর্গের অপার্থিব সৌন্দর্য-আলোকে চির-ভাস্বর।

ভরা-যৌবনে যখন বিশ্ব রঙীন ও সুন্দর দেখায় এবং হৃদয়াবেগ উদ্দাম হইয়া উঠে, তখন সৌন্দর্যভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। নারী তখন পুরুষের চোখে অপূর্ব সুন্দর হইয়া উঠে। নারীর মধ্যেই সে তাহার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের সন্ধান পায় এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া হৃদয়ে অনুরাগ ও প্রেমের আবির্ভাব হয়। যুবক কবি নারীর দেহসৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং প্রেমের স্পর্শে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়াছে। তাহারই প্রকাশ হইয়াছে 'কড়ি ও কোমলে'র এই কবিতাগুলিতে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে, কবি এই সৌন্দর্য ও প্রেম ভোগ করিলেও, সৌন্দর্য যে অসীম-সৌন্দর্যস্বরূপের খণ্ড প্রকাশ, নারীর বিকশিত যৌবনশ্রী যে এই বিশ্ব-সৌন্দর্যের অংশ এবং প্রেম যে স্বর্গের চিরন্তন অনির্বচনীয় সম্পত্তি ও অসীম প্রেমময়কে অনুভব করিবার নামান্তর—তাহাও তিনি অনুভব করিয়াছেন। দেহভোগ-কামনা এক বৃহত্তর ও মহত্তর সৌন্দর্য-পূজার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া শান্ত-স্নিগ্ধ মূর্তি ধারণ করিয়াছে—স্থূল রক্তমাংসের দেহ এক বৃহৎ ভাবের অপার্থিব আলোকে স্নান করিয়া উঠিয়া অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।

'কড়ি ও কোমলে'র এই নারীসৌন্দর্য ও প্রেমের কবিতাগুলি এক অপূর্ব সৃষ্টি। স্বর্গ ও মর্ত, মানুষ ও দেবতার এক অপরূপ মিলন হইয়াছে ইহাদের মধ্যে। মানবীয় সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতি ইহাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী। এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীই রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য। একথা ভাবিয়া আজ বিস্মিত হইতে হয় যে এই কবিতাগুলি একান্ত ভোগলালসার উদ্দীপক বলিয়া কবিকে একদিন যথেষ্ট নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

'কড়ি ও কোমল'-এর আর এক ধারার কবিতায় বিষাদ ও নৈরাশ্যের ভাব দেখা যায়। কবির ভ্রাতৃজায়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের বিকাশের যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন, এই

স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। তাঁহার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত হন। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি এ-সময়কার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"...মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কি ধাঁধাই লাগিয়া গেল!...কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল।"

এই মানসিক অবস্থায় কবি 'কোথায়', 'পাষাণী মা', 'শান্তি', 'যোগিয়া', 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি', 'নূতন', 'পুরাতন' প্রভৃতি কবিতাগুলি লেখেন। কবি অজ্ঞাত মরণ-পথের যাত্রীকে বলিতেছেন,—

হায় কোথা যাবে।
অনন্ত অজানা দেশ নিতান্ত একা যে তুমি
পথ কোথা পাবে!

'পাষাণী মা' কবিতায় পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

এ ধরণী, জীবের জননী,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে,
তবে কেন সবে তোর কোলে
কেঁদে আসে কেঁদে যায় চলে।

'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি'তে কবি সান্ত্বনা খুঁজিতেছেন,—

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগযুগান্তর।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে কোনো ভাব, চিন্তা বা আবেগ উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে তিনি সাময়িকভাবে ডুবিয়া যান বটে, কিন্তু সেই ভাবের গণ্ডীর মধ্যে বেশিদিন আবদ্ধ হইয়া সেই মানসিক অবস্থাকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করেন না; সেই অবস্থার গণ্ডী ভাঙিয়া আবার অবস্থান্তরে উপনীত হন। আবার সেখান হইতে যাত্রা সুরু হয়। এই অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাত্রাই তাঁহার কবি-চিত্তের বৈশিষ্ট্য। তিনি এই শোকের ভাব কাটাইয়া উঠিয়া পুরাতনকে বিদায় দিয়া নূতনকে আহ্বান করিলেন।

হেথা হ'তে যাও পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে!
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
আয় রে, নূতন আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়
তোর সুখ, তোর হাসি গান!

শিশুজীবনের যে রহস্য ও মাধুর্য এবং শিশু-মনের যে বিচিত্র ভাবতরঙ্গ ও শিশুর মনোরঞ্জনকারী যে সব প্রসঙ্গ কবির, 'শিশু', 'শিশু-ভোলানাথ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সূত্রপাত হয় এই কড়ি ও কোমলে। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'সাত ভাই চম্পা', 'পাখীর পালক', 'আশীর্বাদ', 'হাসিরাশি' প্রভৃতি কবিতাতে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান" এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহ মন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো ভুলিতে পারি নাই। এই চারিটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূত ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলে' বিচিত্র রসের ও বিভিন্ন ভাবের বহু কবিতায় তাঁহার অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেন, তবুও তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার শেষ কথা বলা হয় নাই,—

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
... ...
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

কবি প্রকৃতি ও মানবজীবনের বিচিত্র রূপের মধ্যে এক অসীম ও অতীন্দ্রিয় সত্তা অনুভব করিয়াছেন। বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব মানবের সকল সৌন্দর্য ও রসের উৎস যে সেই চিরসুন্দর ও চিররসময়—তাহা কবিচিত্তে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র রূপে ও রসে অসীম সীমাবদ্ধ হইয়াছে—নিত্যসৌন্দর্য ও নিত্যরস ক্ষণিক সৌন্দর্য ও ক্ষণিক রসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবি এই খণ্ড সৌন্দর্য ও রসের অভিব্যক্তিকে চরমরূপ দান করিতে চাহেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার শেষ বাণী বলিতে চাহেন, তিনি মনে করেন যে মানব-বিশ্ব যেন এই শেষ কথা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। তাহার একমাত্র কামনা যে এই খণ্ডরূপ ও রসের চরম প্রকাশ হোক তাঁহার কবি সৃষ্টিতে। তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত সাধনা সার্থক হইবে এবং জীবন কৃতার্থ হইবে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ বা খণ্ডিত রূপ বা রস তো প্রকৃত সীমাবদ্ধ বা খণ্ডিত নয় এই সীমা ও খণ্ডের মধ্য দিয়া অসীম ও অখণ্ড নিজেকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছেন। তাই কোনো নির্দিষ্ট সীমায় বা বিশিষ্ট আকারে রূপ ও রসের চরম প্রকাশ সম্ভব নয়। যেটাকে সীমা বা শেষ মনে করা হয়, তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজিতেছে অসীম ও অশেষের বাঁশি। রূপ ও রস চিরন্তন ও চির-নূতন, তাহা কোনো সীমায় পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও, নব নব সীমায় নব নব ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই কবি ও শিল্পীর সৃষ্টিতে অত বৈচিত্র্য —অত নব নব ভঙ্গী। মানুষ মনে করে সীমার মধ্যে তাহার চরম বক্তব্য শেষ

হইতে পারে ; কিন্তু তাহা হয় না, কারণ সীমা তো অসীমেরই একটা অংশ—একটা ভিন্ন রূপ মাত্র। সুতরাং তাহার বক্তব্য ফুরায় না ও শেষ কথাও বলা হয় না। কবি যদিও তাঁহার শেষ কথা বলিতে ব্যগ্র হইয়াছেন,—কিন্তু তিনি তাহা পারিবেন না। কারণ শেষ কথা কখনোই বলা যায় না—'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে।'

কবিচিত্তের অসীম আবেগ ও সুতীব্র অনুভূতি প্রকাশের ভিন্ন পথ খুঁজিতেছে—নূতন ক্ষেত্র চাহিতেছে। নবতর সৃষ্টির বেদনা কবি অনুভব করিতেছেন। এই প্রকাশ তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ 'মানসী'তে। এইখানে এক যুগের কাব্য শেষ হইল—আবার নূতন যুগ আরম্ভ হইল।

'সন্ধ্যাসংগীত'; 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল' লইয়া যে যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে "উচ্ছ্বাস-যুগ" আখ্যা দেওয়া যায়। এই যুগ কবি-প্রতিভার বিকাশের যুগ। এ যুগে উচ্ছ্বাস ও আবেগের প্রাবল্যই বেশি। উচ্ছ্বাসের বাষ্পে উদার ও গভীর রসানুভূতির দিক্‌চক্রবাল অনেকটা এখনো আচ্ছন্ন। ভাব ও রূপের প্রকৃত সমন্বয় হয় নাই ; এখনো তাঁহার কাব্য প্রকৃত রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

৫

মানসী

(১২৯৭)

'মানসী'তে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার পূর্ণ উদয় সংঘটিত হইয়াছে। এখন হইতে তাঁহার কবি-কর্ম প্রকৃত শিল্পমর্যাদা লাভ করিয়াছে—তাঁহার প্রকৃত কবি-শিল্পীর জীবন আরম্ভ হইয়াছে। আত্মশক্তিতে তিনি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন এবং সার্থক ও ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দপ্রয়োগে এবং মনোমত ছন্দে তাঁহার ভাব ও কল্পনাকে রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন। 'মানসী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাব্য-সৃষ্টি।

কবিও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"পূর্ববর্তী কড়ি ও কোমল-এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনায় এই পর্বেই যুক্ত-অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতে ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"

(রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড, ভূমিকা)

এই বিশ্বের অবারিত শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তাঁহার হৃদয়-বেলায় অবিরাম তরঙ্গাঘাত করিতেছে। এই আঘাতে তাঁহার প্রাণে বিচিত্র অনুভূতি ও ভাব

জাগিতেছে। সেই অনুভূতি ও ভাব যে বাণীরূপ গ্রহণ করিতেছে, তাহাই তাঁহার মানসী। বিশ্ব তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অন্তরের ভাবে ও রূপে রূপায়িত হইয়া তাঁহার কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভিতর ও বাহিরের মিলন হইয়াছে। এই ভিতর ও বাহিরের ব্যাকুলিত মিলন-মুহূর্তেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ আনন্দমুহূর্ত—এই মিলনকে রূপায়িত করাতেই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহার এখন কাজ,—

এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা,
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

অসীম বিশ্ব তাঁহার কবি-চিত্ত স্পর্শ করিতেছে, তাঁহার কবি-চিত্তও সেই বিশ্বের সব খণ্ড সৌন্দর্যের রূপ দান করিয়া সীমা দ্বারা অসীমকে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। এই ভাবেই কবি অসীমের সীমারচনা করিয়া মানসী প্রতিমা গড়িয়া তুলিতেছেন। এইরূপেই চলিয়াছে কবির সৃষ্টি-প্রবাহ। বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের লীলাই তাঁহার কবি-মানসের চিরন্তন সৃষ্টি-রহস্য।

'কড়ি ও কোমলে' কবি মানবজীবনের তীরে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইলেন। তরুণ চোখে নারী অপরূপ সৌন্দর্যে প্রতিভাত হইল। সেই নারীসৌন্দর্য ও প্রেমের জয়গানে 'কড়ি ও কোমল' মুখর। মানসীতে সেই প্রেম বিভিন্ন ছন্দে ও রূপে উৎসারিত হইয়াছে। কবির মানস-প্রিয়ার প্রতি তাঁহার প্রেম-নিবেদন ও প্রেমের সংশয়-সুখ-দুঃখ-হর্ষ-বিষাদময় বিচিত্র লীলাই মানসীর প্রধান বিষয়বস্তু। প্রেমের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে কবি চিরন্তন সৌন্দর্য ও অনন্ত প্রেমের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কামনার সংকীর্ণতা ও ক্ষণিকতা হইতে সৌন্দর্য ও প্রেমকে মুক্ত করিয়া একটি অপার্থিব ভাবস্তরে উন্নীত করিবার জন্য একটা বেদনাময় ব্যাকুলতাই মানসীর মূল সুর।

মানসীর কবিতাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে প্রধানত এই কয়টি ভাবধারার কবিতা দেখা যায়,—(১) প্রেম (২) দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কবির মনোভাব (৩) বিরুদ্ধ সমালোচনায় কবির মনের বেদনা (৪) প্রকৃতি-বিষয়ক।

মানসীর প্রেম-কবিতাগুলির আলোচনার পূর্বে বাংলা কাব্যে প্রেম-কবিতার ধারা ও রবীন্দ্রকাব্যের প্রেম-কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের স্থান ও বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়ের পূর্বে রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের বাংলা কাব্যে প্রেমের রূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলা কাব্যে আমরা সুপরিণত, বিচিত্ররসমণ্ডিত ও উচ্চাঙ্গের প্রেম-কবিতার প্রথম সাক্ষাৎ পাই বৈষ্ণবপদাবলীতে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অনেক পূর্ব হইতেই বাঙালী জন-মানসের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং বাঙালীর কাব্য-কবিতাতেও রূপলাভ করিয়াছিল। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' সংস্কৃত কবিতার একটি সংকলন-গ্রন্থ। ইহা দশম শতাব্দীর সংকলন বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা পাওয়া যায়। বাংলায় সেন-রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া যে কবি-গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেকেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে জয়দেবের, তাঁহার পূর্ববতী ও সমসাময়িক কালের বহু কবির, এমনকি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার পুত্র কেশব সেন-রচিত রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক অনেক প্রকীর্ণ প্রেমের কবিতা পাওয়া যায়। তারপর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ও উল্লেখযোগ্য কাব্য। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে বৃহত্তর বঙ্গে নানা কারণে রাধাকৃষ্ণের লীলারসাত্মক কাব্য বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রেম-কবিতার ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণলীলাই বিষয়বস্তুভাবে গৃহীত হইয়াছে— 'কানু ছাড়া গীত নাই'।

এইসব প্রাচীন প্রেম-কবিতা মূলে লৌকিক প্রেম-কবিতা, ধর্মের প্রেরণা এখানে ছিল নিতান্তই গৌণ। চপল, চঞ্চল, সুন্দরী আভীর-বধূদের সঙ্গে এক রাখাল গোপ-যুবকের প্রেমকল্পনার লীলাবৈচিত্র্য ও নূতনত্বে অপূর্ব সমৃদ্ধ, সুতরাং উপযুক্ত বিষয়বস্তু হিসাবে কবিরা রাধাকৃষ্ণের লীলাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিরা যে বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহারা নর-নারীর লৌকিক প্রেমসম্বন্ধেও অনেক কবিতা লিখিয়াছেন; সেই একই দৃষ্টি, একই প্রেরণা, একই রসবৈচিত্র্য তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ এই কবিদের নিকট আলম্বন-বিভাব রূপে গৃহীত হইয়াছে মাত্র—ধর্মচেতনার প্রশ্ন ইহার মধ্যে নাই। কাব্যরস ও প্রকাশরীতিতে বৈষ্ণবকবিতা ভারতীয় সাধারণ প্রেমকবিতার ধারাই অনুসরণ করিয়াছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব এবং সমসাময়িককাল হইতেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকবিতার মধ্যে বাংলায় এক নূতন সুর বাজিতে লাগিল এবং তাঁহার পরবর্তীকালে অলৌকিক সুরই প্রবল হইয়া উঠিয়া লৌকিক সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে বৈষ্ণবপদাবলীতে যে প্রেম-কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূল ভিত্তি ভারতীয় সাধারণ প্রেম-কবিতা। রাধার যৌবন-

সমাগম, পূর্বরাগের বিচিত্র ভাব, প্রেমানুভূতির চাঞ্চল্য, নিবিড়তা ও গভীরতা, মান-অভিমান, মিলন-বিরহ প্রভৃতির যে অনবদ্য চিত্র পদাবলীতে দেখি, লৌকিক নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া এই প্রকার চিত্র, প্রেমের এই কলা-কৌশল ও প্রসাধন আমরা পূর্ববর্তী প্রেম-কবিতাতেও দেখিতে পাই। পদাবলীতে যে নায়ক-নায়িকার ভেদ দেখা যায়, প্রেমলীলায় নায়িকার বিচিত্র ভাব ও কর্মের যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। 'উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থও মূলত সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রেব উপবই প্রতিষ্ঠিত। তবে বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায়, প্রেমের যে অতলস্পর্শ গভীবতা, যে ধ্যানতন্ময়তা, যে সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি আমাদিগকে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত করে, তাহা পদাবলীর কবিগণের আধ্যাত্ম-তত্ত্বদৃষ্টির প্রভাবসঞ্জাত বলিয়া মনে হয়। পূর্ববর্তী কবিবা সম্ভোগকে প্রাধান্য দিয়া প্রেমকে স্থূল দেহভোগের বেশি উর্ধ্বে উঠাইতে পাবেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ বিরহের অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা ও অতি-সূক্ষ্ম গভীর চেতনাব রূপায়ণে প্রেমকে আধ্যাত্মিক স্তবে উন্নীত কবিয়াছেন। পদাবলীতে প্রাকৃত প্রেম ও অপ্রাকৃত প্রেমের মিশ্রণ হইয়াছে, বৈষ্ণব কবিতা লৌকিক প্রেম-কবিতারই একটি উচ্চাঙ্গেব বসসমৃদ্ধ পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

পদাবলীব মধ্যে পার্থিব প্রেমেব যে মিশ্রণ আছে, সেই অংশটাই ইহাব বমণীয়ত্ব ও চিরন্তন আবেদনের মূল কারণ। ববীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা কবিযাছেন—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।...
সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে...এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।...
এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।...

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণেব পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, অভিসার, বিরহ-মিলন প্রভৃতি প্রেমলীলা যে সাধাবণ মর্তবাসী নর-নাবীব প্রেমলীলার প্রতিফলিত চিত্র, ইহাই আধুনিক কাব্যরসপিপাসুদের বোধ ও বুদ্ধির বাণী। এই পদাবলীর মধ্যে আমরা উৎকৃষ্ট বোমান্টিক প্রেম-কবিতার রূপ দেখিতে পাই। জ্ঞানদাসের পদটি—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

এই যে অসীম ব্যাকুলতা, এই যে সর্বাত্মক মিলনের ব্যাকুল প্রয়াস, ইহার মধ্যে প্রেমের যে-রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেহকে অবলম্বন করিয়াই দেহোত্তীর্ণ অবস্থায় উত্তরণের প্রয়াস। ইহার স্বরূপ নিবিড় ভাবতন্ময়তা ও গভীর আবেগে আত্মবিস্মৃতি।

বৈষ্ণব পদাবলীর পর আমরা ভারতচন্দ্রের প্রেমকাব্য 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মধ্যে প্রেমের যে রূপ দেখিতে পাই, তাহা একান্ত দেহভোগমূলক এবং যথার্থ প্রেমের বিকৃত স্বরূপ। ইহাতে হৃদয়ের কোনো স্থান নাই। ভারতচন্দ্রের এই কাব্যধারা আদিরসের আবিলতায় পঙ্কিল। ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বরগুপ্তের কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যে এই স্থূল ইন্দ্রিয়লালসার প্রাধান্য দেখা যায়। গুপ্ত-কবি তাঁহার নিজকাব্যে এইরূপ কোনো চিত্রাঙ্কন করেন নাই বটে, কিন্তু নারীর প্রতি একটা ঘৃণা ও উপেক্ষার কটাক্ষপাত তাঁহার কাব্যে দৃষ্টিগোচর হয়।

মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে আমরা প্রেমের কবিতার সাক্ষাৎ পাই। বিষয়বস্তু-ব্যবহারে এবং ব্রজবুলি-ভাষাপ্রয়োগে মধুসূদন বৈষ্ণব-ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিলেও বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁহার কোনো আস্থা এবং বৈষ্ণব-ভাবের প্রতি কোনো আনুগত্য ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলীর Mrs রাধাকে তিনি তাঁহার Idyllic কাব্যের নায়িকারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনোহর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে মধুসূদনের রাধায় রাখাল-যুবকের সঙ্গে প্রেমের যে-লীলা বর্ণিত আছে, তাহাতে রাধার ব্যাকুলতা, আক্ষেপ, অনুরাগ ও বেদনা-প্রকাশের মধ্যে পদাবলীর ভাবগভীরতা ও অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনা নাই। ব্রজাঙ্গনার কবিতা রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক হইলেও একান্তভাবে প্রাকৃত প্রেমের কবিতা।

বিহারীলালের কাব্য হইতেই আধুনিক Subjective—আত্মমানসলীলাময় গীতিকবিতার সূত্রপাত ধরা হয় এবং তাঁহার মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই এই আর্টের চরম পরিণতি আমরা দেখি। কিন্তু বিহারীলালের প্রায় সমসাময়িক এবং কিছু পরবর্তীকালে এমন এক গীতিকবি-গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল যাঁহাদের কাব্যে বিহারীলাল-প্রবর্তিত কাব্যরীতি ও তাঁহার নিজস্ব ভাবানুভূতির চিহ্ন পাওয়া যায় না। তাঁহাদের কাব্যে প্রেমের আদর্শ ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবের ঊর্ধ্বগত কোনো অলৌকিক রহস্যময়তা, গূঢ় ভাবব্যঞ্জনা বা আত্মমনের বিচিত্র বর্ণসম্পাত ছিল না। তাঁহারা বাঙালীর সমাজ ও গৃহে বাস্তব নারীর বিভিন্ন রূপ পর্যবেক্ষণ করিয়া সহজ-যুক্তিনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানভিত্তিক এক প্রেমের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

এই প্রেম বাস্তব রক্তমাংসের সম্বন্ধযুক্ত এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সর্বত্র পরীক্ষিত এক বাস্তব অনুভূতি। এই কবিদলের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) এবং অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৮) প্রধান।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার নারীর চরিত্র ও সৌন্দর্য বর্ণনায় কল্পনার বিচিত্র রসাবেশে আপ্লুত না হইয়া সজ্ঞান শ্রদ্ধা, চিত্তের গভীর সহানুভূতি ও মননশীল বাস্তব-দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'মহিলা' কাব্যের নারীস্তুতিমূলক কবিতাগুলিতে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি নারীকে উপলব্ধি করিয়াছেন,—

সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার,
আনন্দের প্রতিমা আত্মার,
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার
মুগ্ধমুখী মূরতি মায়ার ;
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের,
কি বুঝাবো ভাব রমণীর,—
মণি মন্ত্র মহৌষধি সংসার-ফণীর !...
পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়,
হৃদি ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধমুখে কুরঙ্গিনী মুগ্ধমুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে !
স্পর্শে পদ রাগ-ভরা
অশোক লভিল ধরা ;
এলোকেশে কে এল রূপসী !—
কোন্ বনফুল কোন্ গগনের শশী !

দেবেন্দ্রনাথ সেন দাম্পত্য প্রেমের ক্ষেত্রে অপূর্ব সৌন্দর্যমুগ্ধতা, অতিপ্রখর ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensuousness) ও আবেগমুখরতা (emotional fervour) দ্বারা এক নূতন ধরনের প্রেম-কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতিতে ধ্যান বা রহস্যদর্শন নাই, বাস্তব জীবনে গার্হস্থ্য পরিবেশে নারীর যে বিচিত্র সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত হয়, কবি একান্ত মুগ্ধচিত্তে তাহার বিচিত্র রস উপভোগ করিয়াছেন। এই রসোল্লাস শতধারে তাঁহার কাব্যে উৎসারিত হইয়াছে।

একটি চুম্বনের জন্য কবি-হৃদয়ের অসীম উল্লাসময় আগ্রহ যেন রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এই কবিতাটিতে,—

দাও, দাও, একটি চুম্বন,
মিলনের উপকূলে, সাগর-সঙ্গমে
দুর্জয় বানের মুখ, ভাসাইয়া দিব সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন !...
পুষ্পময়, স্বপ্নময়, তোমার ও ভালবাসা,
কবিতা-রহস্যময় নীরব তাহার ভাষা,
কপোত কপোতী-সনে
মগ্ন মৃদু কুহরণে
থাকে যথা, সেইরূপ পরামর্শ করি,
তব ওষ্ঠে মম ওষ্ঠ উঠুক্ কুহরি !

কবি বলিতেছেন যে তাঁহার প্রেয়সীই তাঁহাকে কাব্য-রসাস্বাদনে দীক্ষা দান করিয়াছে,—

'যাদুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি'
টীকাভাষ্য,—তোর ওই চক্ষু-দীপিকায়
বিদ্যাপতি, মেঘদূত, সব বোঝা যায় !
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায় !
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

দম্পতীর গোপন আলাপের সুকুমার মাধুর্য কবির হৃদয়কে রসাপ্লুত করিয়াছে,—

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলন।
লোকে না বুঝিল কিছু, লোকে না জানিল কিছু,
দম্পতীর হ'ল তবু শত আলাপন।
হ'ল মন জানাজানি ! হ'ল প্রাণ-টানাটানি—
আশার চিকণ হাসি, মানের রোদন,
বিজয়ার কোলাকুলি, আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন লেপন,
ওই আঁখির মিলন।

পূর্ববঙ্গের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রেম-কবিতায় প্রেমের বাস্তব অনুভূতি ও দেহভোগ-কামনার তীক্ষ্ণ রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে। ভাবপ্রকাশের নগ্ন অকৃত্রিমতা

ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশে তাঁহার প্রেম-কবিতা সময় সময় সুরুচির সীমা-লঙ্ঘনের উপক্রম করিয়াছে। কবি কোনো ভাবময় দৃষ্টি দ্বারা নারীকে দেখেন নাই,—তাঁহার ভালোবাসা দেহকে কেন্দ্র করিয়াই,—

আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ।
আমিও নারীর রূপে,
আমিও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি কালীদহে—
ও কর্দমে—অই পঙ্কে,
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংস সহ।

আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন বিরহ।
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা
দেহ ছাড়া প্রেমকথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।

অক্ষয় কুমার বড়াল দাম্পত্য-প্রেমের ক্ষেত্রে, গৃহের বাস্তব জীবনসঙ্গিনী নারীর যে-বহুবিচিত্র রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন,—তাহারই মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহার কাব্যে। কবি প্রিয়াকে বলিতেছেন,—

এস প্রিয়া প্রাণাধিকা,
জীবন-হোমাগ্নিশিখা।
দিবসের পাপ তাপ হোক্ হতমান।
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে
ওই স্পর্শে, বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক মনে—আমি যে মহান
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্তপ্রধান।

পত্নীবিয়োগে মর্মান্তিক শোকগ্রস্ত কবির চিত্তবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার 'এষা' কাব্যে। ইহাতে শোকের হাহুতাশময় উচ্ছৃঙ্খল প্রলাপ নাই, আছে বেদনার গভীরতম অনুভূতি। ভাষার অপূর্ব সংযম ও প্রসাদগুণ ইহার বৈশিষ্ট্য। কবি 'মানবীর তরে' কাঁদিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কান্নায় শোকবিলাস বা আতিশয্য নাই, আছে গভীর প্রেমের স্মৃতি।

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিলে কোন্ জনা?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা।

মুরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন!
এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
পূরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে।
কাতর নয়নে চেয়ে—কোথা গেল নাহি জানি—
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি।

বিহারীলাল বাংলা কাব্যে এক নূতন দিগন্ত-প্রদর্শক—নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তক। বিশ্বের নানা বৈচিত্র্যের অন্তরালে কবি এক সৌন্দর্যসত্তার লীলা অনুভব করিয়াছেন। সেই সৌন্দর্যময়ীই বিশ্বের আদি কারণ। এই সৌন্দর্যময়ীর মানবী প্রতিমূর্তি তাঁহার সারদা। এই সারদা তাঁহার কবি-প্রতিভার প্রেরণাদাত্রী, কখনো তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী, কখনো জগতের বিচিত্ররূপিণী প্রাণশক্তি,—সৃষ্টির মূল আদ্যা শক্তি। বাস্তবের ঊর্ধ্বলোকবিহারিণী এই মানস-লক্ষ্মীকে উপলক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে কবির আত্মনিবেদন, মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, মানবিক প্রণয়োৎকণ্ঠা ও প্রেমাবেগ-বিহ্বলতা। বিহারীলাল এই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে মূর্তিমতীরূপে পাইতেছেন না বলিয়া তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছেন। তাহাকে বাস্তবের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া এক অনির্দেশ্য কারণহীন বেদনাবোধ—একটা অতৃপ্তির অনির্বাণ দহনজ্বালা তাঁহার কাব্যে উৎসারিত হইয়াছে। এই অকারণ বেদনাবোধ, সৌন্দর্যের আদিরূপের কল্পনা, এই অন্তর্মুখী ধ্যান—এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্বে উল্লিখিত কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় নাই। বিহারীলাল হইতেই ইহার সূত্রপাত। বিহারীলালেরও রবীন্দ্রনাথের মতো শেষে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী মিস্টিকে পরিণতি লাভ করে। বিশ্ববিলাসিনী সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী তাঁহার অসীম রহস্যময়ী মূর্তি ক্রমে ত্যাগ করিয়া সৃষ্টির মূল শক্তিরূপে কবির হৃদয়বেদীতে বসিয়া ভক্তি ও বিশ্বাসের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের নিকট হইতে রোমান্টিক প্রেরণায় দীক্ষালাভ করেন। বিহারীলাল যতখানি কবি ছিলেন, ততখানি শিল্পী ছিলেন না। তিনি তাঁহার ভাবানুভূতিকে উৎকৃষ্ট কাব্যে রূপায়িত করিতে পারেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তত্ত্বানুভূতি ও কাব্যসৌন্দর্যের পরিপূর্ণ মিলন হওয়ায় এক বিস্ময়কর সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বিহারীলালের মধ্যে এই অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-পিপাসার সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির লীলা, দিগন্তপ্রসারী কল্পনার সঙ্গে একটা বাস্তববোধ, ইন্দ্রিয়াতীত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির মিশ্রণ আছে বলিয়া তাঁহার কাব্য-পাঠকের নিকট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশ অনেকটা আচ্ছন্ন, তাঁহার কবি-কর্ম আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানের রূপায়ণে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

কড়ি ও কোমল-এর নারীর রূপবর্ণনামূলক কবিতাগুচ্ছের মধ্যেই নারী-সৌন্দর্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথেব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আত্মপ্রকাশ করে। মানসীতে প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। মানসীকে সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্য বলা হয়।

সৌন্দর্যের উপলব্ধি হইতেছে রূপের রমণীয়তার অনির্বচনীয় উৎকর্ষবোধ ও সেই রমণীয় রূপের প্রতি প্রবল আকর্ষণ হইতেছে প্রেম। সৌন্দর্য ও তাহার উপর আকর্ষণ প্রেমের মধ্যে আমাদের intellcct ও emotion বুদ্ধি ও অনুভব সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। সৌন্দর্যের উপলব্ধি একটা নৈর্ব্যক্তিক মানস-ক্রিয়া বটে, কিন্তু সৌন্দর্যের আধারের প্রতি আকর্ষণ ও মোহ হৃদয়-রাজত্বের সীমানায়, সুতরাং সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমানুভূতির সূত্রপাত হয়,—এই আবেগই রস। যাহা মুগ্ধ করে, যাহা হৃদয়কে অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত করে, তাহার প্রতি একটা অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হওয়া, সৌন্দর্যেব আধার দেহকে কামনা করা, তাহার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। নারীর সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে প্রেমানুভূতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং প্রেমের মনস্তত্ত্বসম্মত পরিণতির জন্য দেহ একান্ত প্রয়োজন। দেহই সৌন্দর্যের বাস্তব বিগ্রহ এবং দেহের চারিপাশ ঘিরিয়া হৃদয়ের কামনা-বাসনার বিচিত্র রাগিণী গুঞ্জন করিয়া থাকে। প্রেম-মনস্তত্ত্বের ইহা একটি স্বীকৃত সত্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-কল্পনা ভিন্নস্তরের। বাস্তব জগৎ ও জীবনকে তাহাদের নিজস্ব রূপ ও রসে গ্রহণ না করিয়া, তাহাদের মধ্যে কবির মনোগত এক আদর্শ সৌন্দর্য আরোপ করিয়া, ঐ জগৎ ও জীবন যতটুকু তাঁহার মানস-সৌন্দর্যের অনুগত, তাহাই মাত্র স্বীকার করিয়া, তাহা হইতে এক অপার্থিব সৌন্দর্যধ্যানের ভাবজগৎ সৃষ্টি করা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। এই অতীন্দ্রিয় মনোবিলাস বা ভাববিলাসমূলক যে-সৌন্দর্যবোধ, জগৎ ও জীবনকে তাহারই অধীন করিয়া তাহা হইতে এক অপার্থিব রসের উৎসারণই রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান স্বর।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-চেতনা বিশেষভাবে নারীরূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কড়ি ও কোমল-এ কবি নারীর দেহ-সৌন্দর্যের যে উদাত্ত স্তোত্রপাঠ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দেহ-সম্ভোগেব আকাঙ্ক্ষা বা বাস্তব রূপতন্ময়তার উল্লাস নাই। এই রূপের মধ্যে যে এক অপার্থিব সৌন্দর্য আছে, কবির দৃষ্টি তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। স্থূলকে অবলম্বন করিয়াই তিনি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়ের কামনা করিয়াছেন, দেহসীমাতেই দেহাতীত সুন্দরকে ধরিবার প্রয়াস করিয়াছেন। এই অপার্থিব রূপের তৃষ্ণা, এই সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষা, এই ভাবময় সৌন্দর্য-সাধনা হইতে

তাঁহার প্রেমানুভূতির উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং এই প্রেমও এক অতি-সূক্ষ্ম মানসিক পিপাসা—এক ভাবময় আকুতি। এই প্রেম দেহসম্বন্ধবিচ্যুত, নর-নারীর বাস্তব ভোগাকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে এক অনির্বচনীয় আনন্দরস।

মানসী কাব্যে এই প্রেমের স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে-প্রেম বুভুক্ষিত দৃষ্টিতে দেহের চারিপাশে ঘুরিয়া মরে, ব্যক্তি-মানুষের বাস্তব দেহ-মন যাহার ভিত্তি, সেই আবেগময়, আত্মহারা, সাধারণ মানুষের প্রেম রবীন্দ্রনাথের প্রেম নয়। মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত প্রেমের রূপটি সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রেম অসীম, অনন্তের ধন, আত্মার সম্পদ, দেহের সীমায় তাহাকে ধরা যায় না। প্রেমপাত্রী নারীর নয়ন হইতে 'আত্মার রহস্যশিখা'র বিচ্ছুরণ দেখা যায়। সেই 'অমৃত', সেই 'স্বর্গের অসীম রহস্য'কে কবি দেহের মধ্যে খুঁজিয়া না পাইয়া অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বেদনায় অস্থির হইতেছেন। সেই অসীম, অনির্বচনীয় প্রেম-ধনের অধিকারী যে নারী, তাহাকে তো দেহের মধ্যে পাওয়া যায় না, তাই কবি 'সমগ্র মানব'কে পাইতে চাওয়া দুঃসাহস বলিয়া মনে করিতেছেন। 'ক্ষুধা মিটাইবার খাদ্য নহে যে মানব'—অনির্বচনীয় সৌন্দর্য বিকাশ করিয়া প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিশ্বের আনন্দবর্ধনের আর ভগবানের মহিমা প্রচারের জন্য, তাহাকে নিজের ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিতে 'বাসনা-ছুরি' দিয়া কাটিয়া উঠাইয়া লওয়া কি সম্ভব? তাই কবি বলিতেছেন,—

লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়োনা তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

সুতরাং 'নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে'। প্রেম দেহসম্বন্ধবিরহিত, অপার্থিব সৌন্দর্যের নিবিড় অনুভূতি—এক অনির্বচনীয় আনন্দরস। এই রসে সিঞ্চিত করিয়া বিমুগ্ধ শিল্পীর মতো তিনি প্রেমকে আস্বাদন করিয়াছেন। কবির মানসী দেহসম্বন্ধের উর্ধ্বগত এক চিরন্তন সৌন্দর্যময়ী নারী—যাহার অধিষ্ঠান তাঁহার চিত্তলোকে, যাহাকে তিনি মানবীর মধ্যে পাইবার জন্য বারবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ ও হতাশ হইয়াছেন। মানসীতে পূর্ণ যুবক কবির মধ্যে বাস্তব রূপ-রসের অতি-প্রবল আকর্ষণ এবং বাস্তবাতীত সৌন্দর্য-প্রেমের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা—এই দুয়ের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বাস্তব কামনা-বাসনার সংকীর্ণতা হইতে প্রেমকে মুক্ত করিবার

জন্য একটা বেদনাময় ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে মানসীর মধ্যে। এই 'সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা' ও 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা' উভয়েই সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে পরবর্তী গ্রন্থ 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'য়। বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা ও ধ্যান মানসী অপেক্ষা বহুলপরিমাণে গভীরতর, ব্যাপকতর ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত হইয়াছে ঐ দুই গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ প্রেম-কল্পনায় দেহের ঊর্ধ্বচারী বলিয়া তাঁহার প্রেমকবিতা মিলনের আবেগ-উত্তেজনা-চাঞ্চল্য প্রকাশ অপেক্ষা স্থির ও স্নিগ্ধ-মধুর জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। বিরহে তাঁহার মানসী প্রতিমাকে বিশ্বব্যাপিনী করিয়া কবি তাহার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের সমস্ত আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং হৃদয়ের বহু-বিচিত্র প্রেমানুভূতির অর্ঘ সেই অপ্রত্যক্ষ হৃদয়বাসিনীকে প্রদান করিয়াছেন। বিরহেই কবির প্রেমানুভূতির চরম আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে। দেহধর্মের দ্বারা আবদ্ধ প্রেম সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ, বাস্তব কামনার দ্বারা পঙ্কিল ; দেহসম্বন্ধ যেখানে নাই, সেখানেই প্রেমের মুক্তি, প্রেমের সর্বজনীনত্ব, প্রেমের দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ সর্বজনীন রূপ। এই প্রেম অনন্তের সামগ্রী এবং বিরহেই তাহার স্ফূর্তি। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পরিভাষায় রবীন্দ্রনাথ বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গারের কবি।

মানসীর পর রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের আর এক রূপ দেখি 'মহুয়া'য়। প্রেমের অনুভূতি কবি-চিত্তের স্বভাবজ বৃত্তি। চিত্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অনুভূতি নানারূপে পরিবর্তিত হয়। প্রথম যৌবনের প্রেমানুভূতি ও প্রেমের কল্পনা পূর্ণ-যৌবনে বদলায়, যৌবনের অনুভূতি প্রৌঢ়ত্বে, প্রৌঢ়ত্বের অনুভূতি বার্ধক্যে বদলায়। এই বিভিন্ন স্তরের অনুভূতির মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকিলেও, রূপ হয় বিভিন্ন। মহুয়ার প্রেমানুভূতি, মানসী-সোনার তরী-চিত্রা বা ক্ষণিকার অনুভূতি নয়, পূরবীর অনুভূতিও নয়। রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেম চিরকালই নরনারীর দেহ-মনের আকাঙ্ক্ষা-কামনার ঊর্ধ্বে একটা ভাবময় প্রেরণা—যৌনাকর্ষণ-বর্জিত, দেহমন-নিরপেক্ষ একটা ভাব-সাধনা মাত্র। তাঁহার প্রেম-কবিতায় উৎকৃষ্ট কাব্য, সংগীত ও ব্যঞ্জনার অপরূপ লীলা থাকিলেও, দেহসৌন্দর্যের যে-নিবিড় আকর্ষণ প্রাণের সমস্ত তন্ত্রীতে ঝংকার তুলিয়া উন্মত্ত রাগিণীর সৃষ্টি করে, প্রতি অঙ্গ তরে প্রতি অঙ্গ কাঁদে, যে-চরম কামনা দেহকেই স্বর্গ বলিয়া মনে করে ও এই জড় দেহকেই চিরন্তনত্ব দান করে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল' বলিয়া অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, যে আকাঙ্ক্ষা দেহ ও মনকে ঘিরিয়াই তাহার সার্থকতার স্বপ্ন রচনা করে, দেহ ও মনের সমস্ত লীলা ও অভিব্যক্তির মধ্যে পায় চরম আনন্দ ও রহস্যের সন্ধান, সেই নর-নারীর পরস্পর আকর্ষণ, কামনা-আকাঙ্ক্ষার সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত মনোহর

প্রকাশ তাহাতে নাই। ইহা ক্ষণিকা পর্যন্ত প্রেম-কবিতায় লক্ষ্য করা গিয়াছে।

বার্ধক্যে আধ্যাত্মিক ও নানা তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভাব-চিন্তার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া আসিয়া কবি আবার যে-প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে প্রেমের একটা ভিন্নরূপ আমরা দেখিতে পাই। এই প্রেমে কিছু বাস্তবতার স্পর্শ থাকিলেও ইহা দেহমনের উর্ধ্বস্তরের ; ইহা প্রেমের অন্তর্নিহিত স্বরূপ, মানবজীবনে প্রেমের প্রভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা—প্রেমের জয়ঘোষণা। ইহা জীবনাশ্রয়ী প্রেমের তত্ত্ব ও দর্শনের অপূর্ব কাব্যরূপ।

মহুয়ায় প্রেমের ভাব-কল্পনার নূতন রূপ হইতেছে—কবি প্রেমকে দেখিয়াছেন এক মহাশক্তিরূপে। এই প্রেম অমিতবীর্যশালী, বলিষ্ঠ পৌরুষের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এবং ত্যাগ ও তপস্যার হোমাগ্নিপূত। জীবনপথে এই প্রেম সমস্ত বাধা-বিপত্তিতে পদদলিত করে, প্রেমিক-প্রেমিকাকে নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হইবার শক্তি দান করে। এই যুগল-প্রেম বাস্তবজীবনের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধযুক্ত, রূঢ় জীবনবোধে উদ্দীপ্ত, সংগ্রামশীল এবং পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় আলোক-বর্তিকা। এই-প্রেম বন্ধন নয়, চলার পথের একমাত্র পাথেয়। নারী 'আত্মার সঙ্গিনী'—বিলাসের নর্মসহচরী নয়। মহুয়ার প্রেমিক প্রেমিকাকে বলিতেছে,—

পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে,...
উড়াব উর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্গম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই-তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।

এই প্রেম আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করিয়া বিশ্বচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। ইহা অধ্যাত্মদীপ্তিমণ্ডিত, বিশ্বের প্রাণধারার সঙ্গে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ যে চিরযৌবন, তাহারই উদাত্ত বাণী।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ-বেদনার দ্বারা পরিশুদ্ধ, ত্যাগ-তপস্যাকর্ষিত, কেবলমাত্র জৈব-প্রেরণার গণ্ডীতে অনাবদ্ধ, সংসারের নর-নারীর এই প্রেমকে অতি-উচ্চ স্থান

দিয়াছেন। তিনি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'র মধ্যে এই প্রেমের রূপ দেখিয়াছেন। ইহাই কালিদাসের প্রেমাদর্শ। প্রেম কেবল আদিম প্রবৃত্তির প্রেরণা নয়, দেহগত রূপের প্রতি আকর্ষণ নয়, ইহা দুঃখের তপস্যার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক, এক মঙ্গলময়, কল্যাণময় সত্যের অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই প্রেম-কল্পনায় ভোগতান্ত্রিকতাকে বর্জন করিয়াছেন, দেহকেই একান্তভাবে গ্রহণ করেন নাই, দেহ ও আত্মার, সীমা ও অসীমের, বাস্তব ও আদর্শের মিলন-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কবি নর-নারীর এই কল্যাণময় প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করিতে পারে, কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়, নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরে দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আর এক সুরও বাজতে পারে মদনধনুর জ্যায়ের টংকার—সে মুক্তির সুর না, বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)

রবীন্দ্রনাথ সুরুচি, সংযম ও শালীনতার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। দেহ-লালসা সাহিত্যে সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়া বীভৎস আকার ধারণ করিতে পারে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা ছিল। সেজন্যও কবি প্রেমে দেহ-সান্নিধ্য কামনা করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য,—

"সাহিত্যে লালসা জিনিসটা অত্যন্ত সস্তা—ধুলোর উপর শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার অতি অল্পেই হয়।···মানুষের শরীর-ঘেঁষা যে-সব সংস্কার, জীব-সৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরানো—প্রথম অধ্যায় থেকেই তাদের আরম্ভ। একটু ছুঁতে না ছুঁতেই তারা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে। মেঘনাদবধের নরক বর্ণনায় বীভৎস রসের অবতারণা উপলক্ষ্যে মাইকেল এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বমন করে উদ্গীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্ছে—এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘৃণা সঞ্চার করতে কবিশক্তির প্রয়োজন করে না,—কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যে-সব ঘৃণ্যতার মূল তার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে কল্পনাশক্তির দরকার। ঘৃণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে স্থান পাবে না, একথা বলবো না, কিন্তু সেটা যদি একান্তই একটা দৈহিক সস্তা জিনিস হয়, তাহলে তাকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই ভালো হয়।" (সাহিত্যের পথে)

কল্লোল যুগের লেখকেরা আধুনিক রিয়ালিজিমের নামে দেহ-ভোগের যে চূড়ান্ত অশ্লীল চিত্র আঁকিতেছিল, সে সম্বন্ধেও কবি সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন,—

"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রুতা আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমত্ত ডিমোক্রেসি তাল ঠুকে বল্ছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিকার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলীখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবীর নেই, গুলাল নেই, পিচকারী নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক করে তুলে তাই চীৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই বসন্ত-উৎসব বলে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্বে মেলে না এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকোএনালিসিসে এর কার্য-কারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এক্ষেত্রে অসঙ্গত বলেই আপত্তি করব, অসত্য বলে নয়।" (সাহিত্যের পথে)

রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই দেহ-বিতৃষ্ণা তাঁহার জীবদ্দশাতেই কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়াই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই দেহাতীত ও অতীন্দ্রিয় প্রেমের বিরুদ্ধে মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার কবি-কণ্ঠের স্পষ্ট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। মোহিতলাল বলিলেন, 'দেহ ছাড়া আত্মার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, দেহদ্বারেই আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়।' মোহিতলালের এই দেহাত্মবাদ কিন্তু নাস্তিকের অনাত্মবাদ নয়। কবির মতে আত্মা অমৃত, বটে, কিন্তু তাহা এই দেহভাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া এবং পূর্ণ করিয়া আছে।—

দেহের মাঝে আত্মা রাজে—ভুল সে কথা, হয় প্রমাণ;
আত্মা-দেহ ভিন্ন কেহ নয় যে কভু—এক সমান!
তাই ত তোমার দেহের সীমায় ধরতে পারি আলিঙ্গনে—
দুই-এর ক্ষুধা একের সুধা কেবল ত সেই পরম-ক্ষণে!

এই দেহাত্মবাদ প্রেমকে বাস্তব জীবনের মধ্যে, নর-নারীর দেহ-মিলনের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত করিয়াছে। জীবনের সমস্ত আনন্দ দেহকেই কেন্দ্র করিয়া বিকশিত এবং দেহ-মিলনের মধ্যেই প্রেম পৃথিবীকে অমৃতময় করিয়া তোলে, জীবনের বৃহত্তর সত্যের আভাস দেয়। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনেও মানুষের অবাধ আনন্দের অধিকার আছে। মানবজীবনের শত-সহস্র দুঃখজ্বালা সত্ত্বেও কবি মোক্ষ কামনা করেন না—পুনর্জন্ম নিরোধ করিতে চাহেন না ; বার বার সংসারে ঘুরিয়া আসিয়া এই জীবনের নব নব রূপ ও রস—নব নব আনন্দ-বেদনা উপভোগ করিতে চাহেন।

জীবনের সুখ দুঃখ বারবার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো।
যাতনার হাহারবে গান গাই,—তৃষার্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো'!
তাই আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো।

এই বলিষ্ঠ জীবনবাদ ও সুস্থ দেহকামনা মোহিতলালের কাব্যে ক্লাসিক্যাল প্রকাশভঙ্গীর সংযম ও ভাস্কর্যরীতির দৃঢ় সংহতির সঙ্গে প্রকাশলাভ করিয়াছে।

মোহিতলালের দেহবাদে যে-সংযম, যে-মননশীলতা ও সৌন্দর্যবোধ ছিল, পরবর্তীকালে কল্লোলযুগ-প্রভাবিত বুদ্ধদেব বসুর প্রেম-কবিতায় তাহার অভাব দেখা যায়। রোমাণ্টিক প্রেমকে উভয় কবিই প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতায় দেহ-কামনার উগ্রতা এবং রিরংসার আবেগময় রূপটি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ কবি ডি, এইচ, লরেন্সের প্রভাব বুদ্ধদেবের উপর বেশী। বুদ্ধদেবের অনেক প্রেম-কবিতায় লরেন্সের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তাঁহার কবিতায় দেহ-কামনার এই আবেগময় উচ্ছ্বাস লরেন্সের অনুপ্রেরণা বলিয়া মনে হয়।

বুদ্ধদেব প্রেমের দেহাতীত রূপ কল্পনা করিতে পারেন না। 'প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী' যে-মানুষ, দেহগত কামনার পীড়নে যে উদ্‌ভ্রান্ত, তাহার কাছে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-প্রেমের কোনো অর্থ নাই।

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি ;—

'আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশনে' কবি বিপর্যস্ত তাঁহার কাছে

'যৌবন আমার অভিশাপ'। যৌবন দেহকে অস্বীকার করিতে পারে না, দেহসঞ্জাত কামনা-বাসনাকেও লুপ্ত করিতে পারে না। কবি মানুষের এই সহজাত দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—'আসঙ্গ-বাসনা পঙ্গু আমি সেই নির্লজ্জ কামুক।' বুদ্ধদেবের মধ্যে যৌন-কামনার তাড়না, আদিম প্রবৃত্তির এই দুর্দমনীয় আবেগের সঙ্গে ডি, এইচ, লরেন্সের এই কবিতাটি তুলনীয়—

> But then came another hunger
> Very deep, and ravening;
> The very body's body crying out
> With a hunger more frightening, more profound
> Than stomach or throat or even the mind;
> Redder than death, more clamorous.
> The hunger for the woman. Alas!
> It is so deep a Moloch ruthless and strong,
> 'Tis like the unutterable name of the dread Lord,
> Not to be spoken aloud.
> Yet there it is, the hunger which comes upon us,
> Which we must learn to satisfy with pure, real satisfaction;
> Or perish, there is no alternative.

মোহিতলালের মতো বুদ্ধদেবও এই দেহের মধ্যেই অমৃতকে আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন, দেহকে অবলম্বন করিয়াই দেহাতীতের সন্ধান করিয়াছেন।

> ...এই দেহ-ধূপ দহি উঠিয়াছে কামনার ধূম,—
> তাহারি সুগন্ধে মোর স্নায়ুতন্ত্রী শিহরিত! সেই মোর কলঙ্ক-কুসুম।
> পবিত্র বলিয়া এই নরদেহে করেছি স্বীকার
> দেহস্পর্শে উচ্ছুসিছে অমৃত আত্মার;

লরেন্সের ঐ কবিতাটির মধ্যেও এইরূপ ভাবের প্রকাশ দেখা যায়।

> Immortality, the heaven, is only a projection of this strange
> but actual fulfilment
> here in the flesh.

(১) প্রিয়ার সহিত কবির নিবিড় মিলন হইয়াছিল। একদিন উভয়েরই দেহ ও মনে উভয়ের জন্য অসীম প্রেম ব্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের জগৎ ছিল সুন্দর, জীবন ছিল মধুর। কিন্তু সে প্রেম এখন বিস্মৃতপ্রায়—উভয়ের মধ্যে আজ একটা ব্যবধান রচিত হইয়াছে। তবুও সে প্রেমের স্মৃতি আজ মন হইতে লুপ্ত হয় নাই। তাঁহার

> শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি,
> লাজে বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
> মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
> নয়ন-কূলে। (ভুলে)

এই প্রিয়া-শূন্য জীবন বড় বেদনাদায়ক—সঙ্গীহীন জীবন দুর্বহ। তিনি ভাবিতেছেন,—

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি ?
দখিনে বাতাসে কেহ নেই পাশে
সাথের সাথী !

তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের প্রেম হইবে চিরস্থায়ী—জীবন চিরদিনের মতো অফুরন্ত সুধায় ভরিয়া উঠিবে। কিন্তু যে উন্মাদনা, যে আবেগ, যে মাদকতা জীবনকে গ্রাস করিয়াছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে—কেবল স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট আছে। তিনি বলিতেছেন,—

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর !
মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর। (ভুলভাঙা)

প্রেমের সর্বজয়ী আহ্বানে প্রিয়ার সহিত তিনি মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মিলনে তিনি যেই সুলভ ও সাধারণ হইয়া গেলেন, অমনি প্রেমের অনির্বচনীয়ত্ব ও মাধুর্য কর্পূরের মতো উবিয়া গেল, —

এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি !

য়াছে, এখন—

প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

কবি সেই লোক-দেখানো, প্রাণহীন আদরের দ্বারা নিজেকে ও তাঁহার প্রিয়াকে অপমান করিতে চাহেন না, তাই বিদায় লইলেন। কবি তাঁহার মানস-প্রিয়ার সহিত ক্ষণ-মিলনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সে প্রিয়া

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারিদিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া। (ক্ষণিক মিলন)

তারপর বিরহে কবি প্রিয়ার ধ্যানে আত্মহারা হইয়াছিলেন -

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে-ঢাকা ভবনে।

পাতার মরমর কলেবর হরষে,
তাহারি পদধ্বনি যেন গনি কাননে। (বিরহানন্দ)

তখন ছিল—'ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।' কবি বিরহের স্বপ্নলোকে প্রিয়ার মূর্তি রচনা করিয়া পূজা করিতেছিলেন। কিন্তু সংসারে বাস্তব-প্রিয়ার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার স্বপ্ন রূঢ় ভাবে ভাঙিয়া গেল।

বিরহ সুমধুর হ'লো দূর কেন রে?
মিলন দাবানলে গেল জ্ব'লে যেন রে।
কই সে দেবী কই, হেরো ওই একাকার,—
শ্মশান বিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।

হৃদয় হইতে প্রেম নিঃশেষ হইল। মানস-প্রিয়ার স্বপ্নমূর্তি ভাঙিয়া গেল। কবির হৃদয় বিরাগ-ভরা বিবেকে পূর্ণ। এই শূন্য হৃদয়ে আবার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। প্রেমই যে কবিচিত্তের সঞ্জীবনী শক্তি। কবি প্রেমের সেই মধুর উন্মাদনা আবার অনুভব করিতে চাহিতেছেন,

আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হ'তে উছল-স্রোতে
বহায় যদি।
আবার দুটি নয়নে লুটি'
হৃদয় হ'রে নিবে কে?
আবার মোরে পাগল ক'রে
দিবে কে? (শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা)

কবি জোর করিয়া প্রেম ও প্রিয়াকে হৃদয় হইতে নির্বাসন দিলেও, তিনি যে তাহাদের ভুলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মানস-প্রিয়া সারা বিশ্ব জুড়িয়া আছে। তিনি দূরে থাকুন বা যতই ভুলিতে চেষ্টা করুন, হৃদয়-অন্তঃপুরে তাঁহার মানসীর আসন চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া অকপটে তাঁহার হৃদয়ের দুর্বলতা স্বীকার করিতেছেন,—

তবে লুকাবো না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।
বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেল আজ,
আশা-নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শতবার। (আত্মসমর্পণ)

কবি আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রেম ব্যক্ত করিলেন বটে, কিন্তু যৌবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনার সিন্ধু মথিত করিয়া যে মানসী কবি-চিত্তে আবির্ভূতা হইয়াছে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কবি-হৃদয়ের উচ্ছল প্রেমধারা উৎসারিত হইতেছে, তাহাকে তিনি পরিপূর্ণরূপে পাইতেছেন না। প্রণয়িনীর দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্যক্ষুধা, প্রেম-ক্ষুধা কিছুতেই মিটিতেছে না। কবি প্রিয়ার মধ্যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য ও প্রেমের মূর্তিমতী মানসীকে পাইতেছেন না। তাই তাঁহার ব্যাকুল অন্বেষণ,—

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে-অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা। (নিষ্ফল কামনা)

কবি প্রণয়িনীর দেহের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না—তাই তাহার নয়নে বিচ্ছুরিত আত্মার রহস্য-শিখার আলোকে তাহাকে সম্পূর্ণ চিনিতে চাহিতেছেন। সৌন্দর্য ও প্রেম—উভয়েই অনন্ত, অসীম। খণ্ডিত করিয়া নিজের প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া পাইতে হইলে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। প্রেমিক অনন্ত প্রেমের নিকট জীবন উৎসর্গ করে ও প্রেমিকাকে অনন্ত বলিয়া অনুভব করে। প্রেমিকার অনন্ত সত্তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না,—

সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর
কী পারিবি দিতে!

সেই অনন্ত জীবনকে পাইতে হইলে অনন্ত প্রেম আবশ্যক—মানুষের অনন্ত অভাব মিটাইতে হইলে অনন্ত প্রেমের প্রয়োজন।

আছে কি অনন্ত প্রেম ?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব ?

কিন্তু মানুষ নিজেই বদ্ধ, দুর্বল, অন্ধ—নিজের দুঃখ-বেদনা-অভাবের ভাবে জর্জরিত,—

সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে।

মানুষের ভোগ-লালসা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। সৌন্দর্য ও প্রেমের ভোগতৃপ্তির জন্য নারী সৃষ্ট হয় নাই।

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সঙ্গোপনে,
সুখে, দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে,
বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাহ ছিঁড়ে নিতে ?
(নিষ্ফল কামনা)

যখন সমগ্রকে পাওয়া যাইতেছে না, তখন প্রেমাস্পদের মধ্যে যে অসীম সৌন্দর্য ও প্রেমের আভাসটুকু পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাহাদের একান্ত করিয়া উপভোগের যে আত্মসুখসর্ব্বস্ব বাসনা, তাহাকে বিসর্জন দেওয়া

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
... ...
নিবাও বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে।
(নিষ্ফল কামনা)

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। ইহার মধ্যে নর-নারীর প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাব-চিন্তার প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ

দেখা যায়। এমন করিয়া দেহের সমস্ত দাবী অগ্রাহ্য করিয়া আত্মার মহিমা ঘোষণা করা এবং প্রেমকে ব্যক্তি-সম্পর্কবিবর্জিত এক অনায়াত্ত আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া নির্বিশেষে আনন্দরসপানের সামগ্রীতে পরিণত করার দৃষ্টান্ত ও এই প্রেম-তত্ত্বের সদম্ভ ঘোষণা রবীন্দ্রকাব্যের আর কোথাও দেখা যায় না।

দেহের দাবী ও জীবনের বাস্তবক্ষুধাকে অস্বীকার করিয়া, মানুষের স্বাভাবিক রূপতৃষ্ণা ও প্রেমোৎকণ্ঠাকে উপেক্ষা করিয়া কবি প্রেমকে অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করায় এই প্রেম সূক্ষ্ম মানস-ক্রিয়া দ্বারা উপলব্ধির বস্তু হইয়া পড়িয়াছে এবং হৃদয়ের আবেগ-উদ্দীপনা, হর্ষ-বিষাদের উত্থান-পতনের অনুভূতির গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই কবিতাটিতে কবি প্রেমে দেহসম্বন্ধের ব্যর্থতা সম্বন্ধে যুক্তি ও তত্ত্বের অবতারণা করিয়া উপদেশছলে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

মানুষের আত্মা অনন্ত ও অসীম, দেহাবদ্ধ হইলেও দেহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। দেহের মধ্য হইতে সেই আত্মার জ্যোতি অপরূপ সৌন্দর্যরূপে বিকীর্ণ হয়। কামনা-বাসনা দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া সেই অনন্তের ধনকে ভোগ করিতে গেলে ব্যর্থতা অনিবার্য। শত অসম্পূর্ণতায় জর্জরিত মানবের পক্ষে দেহবিচ্ছুরিত সেই চিরন্তন সৌন্দর্যকে লালসার তাড়নায় নিজস্ব করিতে গেলে—দেহকে বাহুবন্ধনে বাঁধিতে গেলে, তাহার নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। দূর হইতে সেই সৌন্দর্যকে শান্ত-স্নিগ্ধ আনন্দের সঙ্গে অনুভব করিতে হইবে—তাহার রহস্যে বিস্ময়মুগ্ধ হইতে হইবে। দুর্বল মানুষের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। তাহা না হইলে কেবল কামনার অনলেই দগ্ধ হইতে হয়, কোনো সার্থকতাই লাভ হয় না। কবি রূপমোহ বা সৌন্দর্যতৃষ্ণাকে একান্তভাবে দেহকামনাবিচ্যুত করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন।—

রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।

(নিষ্ফল প্রয়াস)

শত অন্বেষণ করিলেও সৌন্দযকে দেহের মধ্যে পাওয়া যাইবে না।—

নাই নাই—কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।

(হৃদয়ের ধন)

কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য কবির একান্ত কামনা এই কবিতাটিতে এবং মানসীর অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

এই সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষা বা প্রেমকে কবি অতীন্দ্রিয়লোকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইহার মূলে আছে একটা Principle of Beauty-র উপলব্ধি। এই Intellectual Beauty-কে শেলী অসীম ও অনন্ত বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। বিহারীলালও সারদাকে চিরন্তনী বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। সকল রোমান্টিক কবিই একটা শাশ্বত ভাবগত ঐক্য কামনা করে। শেলী ও বিহারীলালের প্রেমের আদর্শ ও ভাব-কল্পনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর কিছু পড়িলেও, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস স্বতন্ত্র। শেলীর মতো রবীন্দ্রনাথ Dreamer of dreams নন—আকাশে স্বপ্নরাজ্য নির্মাণ করিতে সদা ব্যস্ত নন। রবীন্দ্রনাথ বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের মধ্যে একটা সজ্ঞান ব্যবধান রক্ষা করিয়া কবি-কর্মে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রেম-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে উঠিয়া এক নূতন ভাবজগৎ নির্মাণ করিয়াছেন এবং প্রেমকে নৈর্ব্যক্তিক, নির্বিশেষ ও চিবন্তন তত্ত্বের উপলব্ধিতে পরিণত করিয়াছেন।

দুইটি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যশিল্পীর সঙ্গে প্রেম-কল্পনায় রবীন্দ্রনাথেব অল্পবিস্তর সাদৃশ্য আছে। একটি নাট্যকার মেটারলিংক, অপরটি কবি ব্রাউনিং। ব্রাউনিং সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, পরেও করা হইবে। সুবিখ্যাত সাংকেতিক নাট্যকার মরিস মেটারলিংক প্রেমকে আত্মার সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষায় মিলনের কামনা বলিয়া মনে করিয়াছেন।

তাঁহার মতে মানবের আত্মা দেহের অতীত এক চিন্ময় সত্তা। প্রেম আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি। প্রেমের মধ্যে তাহার আনন্দের অভিব্যক্তি। প্রেমের অর্থ এক মানবাত্মার সঙ্গে অন্য মানবাত্মার মিলনাকাঙ্ক্ষা। একটি মানবাত্মার অপর মানবাত্মার প্রতি এই যে আকর্ষণ ইহার মূলে আছে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধ। আত্মার সহিত আত্মার সম্বন্ধই সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া। সৌন্দর্যই আত্মার কামনার বস্তু, সৌন্দর্যেই তাহার একমাত্র তৃপ্তি। অন্য কোনো দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। এই সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষাই প্রেমের ধারায় প্রবাহিত—উহাই একের প্রতি অন্যের আসক্তির মূল।

> "Certain it is that the natural and primitive relationship of soul to soul is a relationship of beauty. For beauty is the only language of our soul ; none other is known to it."
> (The Inner Beauty : *The Treasure of the Humble*).

'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির ভাববস্তু এইরূপ :

প্রেম দুইটি আত্মার মিলন। জড় দেহসংস্কারের পরিমণ্ডল হইতে ঊর্ধ্বগত, কামনা-বাসনার দ্বন্দ্বমুক্ত, দুইটি আত্মার নির্মল, পরম আত্মীয়তা উপলব্ধির মধ্যে যথার্থ প্রেমেব অবস্থিতি। সেই দুইটি আত্মার মিলনকে কেবল দেহসৌন্দর্যভোগের মধ্যে আবদ্ধ করিলে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। দেহ-সৌন্দর্যে আত্মারই অলৌকিক রহস্যময় দীপ্তি রূপায়িত। মানুষ মূলত ভূমার অংশ, সীমার মধ্যে আবদ্ধ

হইলেও তাহার প্রকৃত স্বরূপ সীমাহীন, বৃহৎ ব্যাপ্তির মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণতা —তাহার সমগ্রতা। কামনার কলুষলিপ্ত, শত-অসম্পূর্ণতায় জর্জরিত সংসারের মানুষের পক্ষে সমগ্র মানবকে, আত্মার দেহাশ্রয়ী স্বরূপকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা দুরাশামাত্র। সেই অনন্তের ধনকে পাইতে হইলে অনন্ত প্রেমের প্রয়োজন, তাহা ভীত, কাতর, দুর্বল, ভোগ-কামনায় অন্ধ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের দেহাশ্রিত সৌন্দর্য ব্যক্তিবিশেষের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, সে বিশ্বের আনন্দবর্ধনের জন্য, ভগবানের অভিপ্রায়ের মূর্ত প্রকাশরূপে পদ্মের মতো স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; দেহের এই সৌন্দর্য-বিকাশকে কামনা-বাসনা-তাড়িত হইয়া ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা মূর্খতা। সৌন্দর্যকে দূর হইতে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া ও তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া প্রেমের অপূর্ব আনন্দরস পান করা উচিত। এই কামনাকলুষ-বর্জিত প্রেম মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে। দেহাতীত, কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ সৌন্দয-রসের উপলব্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে।

সৌন্দর্য ও প্রেমের উপভোগের প্রতি কবি-হৃদয়ের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কিন্তু কবি বুঝিতেছেন যে, সৌন্দর্যকে নিতান্ত নিজের করিয়া ভোগ করিতে গেলে তাহার প্রকৃত স্বরূপের আস্বাদ পাওয়া যাইতেছে না—সত্যকার তৃপ্তিও মিলিতেছে না। প্রেমের প্রকৃত অমৃতময় আস্বাদ তিনি পাইতেছেন না—সংকীর্ণ লালসার গণ্ডীতে আবদ্ধ হওয়ায় প্রেম জ্বালাময় কামে পরিণত হইতেছে। যুবক কবির দুর্নিবার ভোগলালসার আবেগ ও সৌন্দয ও প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার প্রবল ইচ্ছার মধ্যে, এই বাস্তব ও আদর্শ প্রেমের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে—এই দ্বন্দ্বে কবি-হৃদয়ে যে আনন্দ-বেদনা-আশা-নিরাশা, যে ভাব-চিন্তা উত্থিত হইয়াছে, তাহাই মানসীর অনেক প্রেম-কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। 'নিষ্ফল কামনা'তে কবি এই ভোগ-প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া যথার্থ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছেন। 'মানসী'র প্রেম-কবিতার মধ্যে এই কবিতাটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

'কড়ি ও কোমল' হইতে সৌন্দয ও প্রেমের প্রতি কবির এই আদর্শমূলক, ভাবময়—রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যাইতেছে। সৌন্দর্য ও প্রেম অসীম ও অনন্ত। মানুষের দেহ-মনে তাহাদের খণ্ড প্রকাশ। এই খণ্ড প্রকাশকে একান্তভাবে ভোগ করিতে গেলে, তাহাদের অখণ্ডত্ব, সমগ্রতা ও অনন্তত্ব উপলব্ধি করা যায় না। খণ্ড ভোগে অতৃপ্তির জ্বালা—উহা কেবল মরীচিকা। প্রেমিক-প্রেমিকা অনন্ত প্রেমের সাধনা করিবে, এবং তাহাদের দেহ-মনে উদ্ভাসিত আংশিক

প্রকাশকে অনন্তের ধন বলিয়া পূজা করিবে, তাহার অনির্বচনীয়ত্ব উপভোগ করিবে মাত্র। উভয়ে উভয়কে একান্তভাবে কামনা করিয়া খণ্ড প্রেমের ভোগের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না। প্রেম মানবের দেহমনের ক্ষুধার ঊর্ধ্বে এক অনির্বচনীয় আনন্দরস। নর-নারীর প্রেমের প্রতি ইহাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রণয়িনী প্রকৃত প্রেমের প্রতিদান চায়; তাহার প্রেমাস্পদ তাহাকে প্রকৃতই ভালবাসে কিনা তাহাই জানিতে সে বিশেষ আগ্রহান্বিত—এই ভাব 'সংশয়ের আবেগ' কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভোগবাসনাবর্জিত গভীর, একনিষ্ঠ ও সত্যকার প্রেমস্পর্শে মানুষের হৃদয় কালিমাশূন্য হয়—পবিত্র হয়।

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান;
... ...
দিবানিশি অবিরল লয়ে শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে হাহুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের আলোকে জগৎকে নূতন করিয়া পায়—ব্যক্তিগত প্রেম বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হয়,—

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শতগুণ বলে;
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম
দিব তা সকলে।

প্রণয়িনী তাহার প্রেমাস্পদকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—যদি আমার প্রতি তোমার প্রকৃত প্রেম না থাকে, তবে সত্য করিয়া বল। আমি আর সন্দেহের মধ্যে থাকিতে পারি না। প্রকৃত প্রেম আমার চাই। ইহাতে দান-প্রতিদানের প্রশ্ন নাই। প্রকৃত প্রেমলাভ যে অনন্ত সম্পদ লাভ।

কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছো মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে,—প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

'বিচ্ছেদের শান্তি' কবিতায় কবি এই ভাব ব্যক্ত করিতেছেন যে, প্রেমের বন্ধন যদি ছিন্ন হইয়া যায়, তবে তাহাকে ছলনার দ্বারা না ঢাকিয়া রাখিয়া স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাই ভালো। তাহাতে অনেকটা শান্তি পাওয়া যাইতে পাবে। প্রেমের বিস্মৃতিতে জীবন নিষ্ফল হয় না। এইরূপ বিস্মৃতির উদাহরণ সংসারে বিরল নহে। তাই কবি তাঁহার প্রেমপাত্রীকে বিদায় দিতেছেন,—

মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও,—
নূতন আশ্রয়ঠাঁই, দেখি পাই কি না পাই,—
সেই ভালো তবে তুমি যাও।

যদিও কবি তাঁহার প্রেমপাত্রীকে বিদায় দিতেছেন,—তবুও বিদায়-কালে প্রাণের গোপন তন্ত্রী বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে। তিনি বলিতেছেন—'তবু মনে রেখো'। যাহাকে একবার হৃদয় দান করা হইয়াছিল, যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি প্রেমের অনির্বচনীয় আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন—তাহাকে একেবারে চিরদিনের মতো বিদায় দিবার ক্ষণে সারা অন্তর কাঁদিয়া বলে,—

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
(তবু)

'নিষ্ফল প্রয়াস' ও 'হৃদয়ের ধন' সনেট দুইটিতে সৌন্দর্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। নির্মল সৌন্দর্যবোধকে যতক্ষণ প্রবল ভোগপ্রবৃত্তি আছন্ন করিয়া রাখে, ততক্ষণ পূর্ণ সৌন্দর্যের উপলব্ধি হয় না। নারী দেহে বিকশিত অপরূপ সৌন্দর্যকে ভোগ-লালসায় তাড়িত হইয়া উপভোগ করিতে গেলে পাওয়া যায় না। নারীর রূপ মহাবিস্ময়কর, পরমরহস্যময় ও অনির্বচনীয়—পরমসুন্দরের অসীম ও চিরন্তন সৌন্দর্যের অংশ। উহা দেহের মধ্যে আবদ্ধ নয় ও দেহ-ভোগের দ্বারা উহাকে পাওয়া যায় না। 'নিষ্ফল প্রয়াস' ও 'হৃদযের ধন' কবিতা দুইটিতে কবি এই কথাই বলিয়াছেন। নারী রূপের অধিকারিণী হইয়াও নিজে সে রূপের আভাস পায় না এবং তদ্দ্বারা মুগ্ধ হয় না। দেহ-সৌন্দর্য দেহাবদ্ধ কোনো বাস্তব বস্তু নয়—ইহা দেহাতীত কোনো সত্তা। সুতরাং দেহের মধ্যে তাহাকে ধরিতে যাইয়া যদি না পাওয়া যায় তবে পুরুষেব পক্ষে তাহার জন্য হা-হুতাশ করা নিরর্থক। পুরুষ যতই মনে করুক,

অধরের হাসি লব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি লব নয়নে আঁকিয়া,

কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া।
(হৃদয়ের ধন)

কিন্তু

নাই নাই—কিছু নাই—শুধু অন্বেষণ !

কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
(হৃদয়ের ধন)

'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির সহিত ইহাদের ভাব-সাদৃশ্য আছে।

'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি' কবিতা দুইটিতে রবীন্দ্রনাথ নরনারীর প্রেমের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের একটি চিরন্তন রহস্য ব্যক্ত হইয়াছে। নর-নারীর গূঢ় মনস্তত্ত্বমূলক একটি সত্যকে কবি অপূর্ব কবিত্বময় ও রসময় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

পুরুষ যখন প্রথম নারীকে ভালোবাসে, তখন হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও আগ্রহ ঢালিয়া দেয় এবং প্রথম প্রেমের আলোকে প্রিয়াকে পরমমনোহর মনে করে। দেহ ও মনে তাহাকে নিবিড় করিয়া পাইবার জন্য তাহার ব্যাকুলতার অন্ত থাকে না। তাহাদের প্রেমের লীলা চলে শতমুখে—শতধারায়। কিন্তু পুরুষের এই মোহ, এই রঙীন নেশার ঘোর বেশিদিন থাকে না। নেশার অন্তে সে আর পূর্বেকার চোখে নারীকে দেখে না। তাহার মধ্যকার অসাধারণত্ব ও অনির্বচনীয়ত্ব যেন ধীরে ধীরে উবিয়া যায়। সংসারের শত ঘাত-প্রতিঘাতে, বাস্তবের সংকীর্ণ গণ্ডীতে, পুরুষের যৌবন-কামনার মূর্তিমতী দেবী এক অতি-সাধারণ নারীতে পরিণত হয়। তখন মোহ কাটিয়া যায়—প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয়। নারীর পক্ষে এই প্রেমের হ্রাস মর্মান্তিক। কার প্রেমই নারীজীবনের যথাসর্বস্ব—Byron-এর ভাষায়, 'woman's whole existence'. তখন নরনারীর বাইরের মিলনের বুকে চিরবিচ্ছেদ রচিত হয়—উভয়ের মধ্যে অনন্ত বিরহ গুমরিয়া মরে। ইহাই সংসারের নরনারীর প্রেমের চিরন্তন ট্র্যাজেডি।

পুরুষ চিরকাল আদর্শবাদী। বৃহৎ ভাব বা আদর্শের দ্বারা সে জীবনকে পরিচালিত করিতে চায়। তাহার হৃদয়ে তাহার প্রিয়তমার একটি চিরন্তন রূপ আছে। সেই মানস-বিহারিণী প্রিয়তমা অপূর্ব সুন্দরী, পরম রমণীয়া, অনির্বচনীয় মাধুর্যমণ্ডিতা ও লীলাময়ী তাহাকেই দেহ-মন দিয়া সে কামনা করে। জগতের মানবীর মধ্যে তাহার মানসীকে সে দেখিতে চায়। কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আবেষ্টনে

তাহার মানসসুন্দরীর অনুপম-চিত্র মসীচিহ্নিত হইয়া যায়—উচ্চ আদর্শ ভাঙিয়া পড়ে। তখন যে-নারীকে সে তাহার আদর্শের প্রতীক মনে করিয়াছিল, যাহার মধ্যে তাহার মানসীর অনির্বচনীয় মাধুর্য উপভোগ করিতে চাহিয়াছিল, সে নিতান্ত সাধারণ বলিয়া মনে হয়। যে নারীদেহকে সে তাহার মানস-সুন্দরীর অপরূপ সৌন্দর্যে ভূষিত করিয়াছিল, সে স্থূল, রক্তমাংসময় দেহতে পরিণত হয়। প্রেমের স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, ভালোবাসার মোহ কাটিয়া যায়। তখন নারীর প্রতি তাহার অনুরাগ লুপ্ত হইতে চলে। কেবল গৃহ-কর্তব্য-চক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনির তলে চলে উভয়ের আত্মবিস্মৃতির আয়োজন।

পুরুষ চায় আদর্শ—পূর্ণতা। আইডিয়ালকে উপলব্ধি করার সাধনাই তাহার জীবনের সাধনা। নারী তাহার নির্দিষ্ট আবেষ্টনী—তাহার ঘরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। পুরুষের দৃষ্টি আকাশ-পানে, নারীর দৃষ্টি তাহার নীড়ের দিকে। নারী চায় একনিষ্ঠা—পুরুষের দৃষ্টি বহির্মুখী। স্ত্রী-স্বভাব গঠনশীল—পুরুষ-স্বভাব ধ্বংসশীল। তাহার প্রাণ আদর্শ ও পূর্ণতার ব্যাপ্তি চায় বলিয়া পুরুষ কিছুতেই আবদ্ধ থাকে না —সর্বদাই সে চঞ্চল ও গতিশীল। কি প্রেমে, কি কার্যে, কি চিন্তায় সে চিরকাল চলিয়াছে পূর্ণতার অভিসারে। নরনারীর এই মানসিক গঠনের উপর প্রেমের এই আবির্ভাব, স্থিতি ও বিলয়ের তত্ত্ব অনেকখানি নির্ভর করে।

'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি' কবিতাদ্বয় নরনারীর প্রেম-সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া রচিত। একটির সঙ্গে অন্যটির বিশেষ ভাব-সম্বন্ধ রহিয়াছে—একটি অন্যটির পরিপূরক বলা যায়। দুইটি কবিতা একত্রে মিলিয়া নরনারীর প্রেমতত্ত্বের এবং বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বের একটি পরিপূর্ণ ভাবানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

'নারীর উক্তি'তে পুরুষের বহু-বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত প্রেম-প্রকাশের আবেগ স্তিমিত হইয়া গিয়াছে, নিবিড় প্রেমাকর্ষণ শিথিল হইয়াছে এবং তাহার স্থলে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় চলিতেছে বলিয়া নারী আক্ষেপ করিতেছে। তাহাদের আবেগ-উত্তেজনাময় প্রথম প্রেম আজ উত্তাপহীন শিষ্টাচারে পরিণত বলিয়া নারী ব্যথিত ও নৈরাশ্য-মথিত। 'পুরুষের উক্তি'তে পুরুষ এই অভিযোগের কৈফিয়ৎ দিয়াছে। যৌবনস্বপ্নাবেশময় রঙীন চোখে পুরুষ তাহার প্রণয়িনীকে অপার্থিব সৌন্দর্যময়ী ও লীলাময়ীরূপে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সেই যৌবন-কামনার মূর্তিমতী দেবীকে সে এখন সাধারণ নারীরূপে দেখিতে পাইতেছে, তাহার মধ্যকার অসাধারণত্ব ও অনির্বচনীয়ত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাই প্রথম প্রেমাকর্ষণের আবেগ-বিহ্বলতা আর নাই, তাহার হৃদয়-বিহারিণী মানসী আজ বাস্তব ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর সাধারণ মানবী।

'নারীর উক্তি'তে নারী-হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক ও বাস্তব অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম প্রেমের পুলক-কম্পন, প্রেমের স্বপ্নবিলাস অনেক নারীর জীবনে শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। প্রণয়ী যৌবনের মোহস্বপ্নে তাহার প্রেমপাত্রীকে জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনের ভাব ও কর্ম আবর্তিত হইয়াছিল—সে ছিল তাহার জীবনের পরমসম্পদ—সর্বস্ব, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুরুষের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, পূর্ব প্রণয়িনীর প্রতি আর তাহার আকর্ষণ নাই, নারী সেজন্য মর্মবেদনায় পীড়িত হইয়াছে, অভিযোগ করিয়াছে, অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে। নারীর এই মর্মবেদনার বাস্তবচিত্র আমরা কাব্যে, কথা-সাহিত্যে ও নানা কাহিনীতে দেখিতে পাই। 'নারীব উক্তি'তে নারীর মনোবেদনা বাস্তব-প্রতিষ্ঠিত ও নারী-মনস্তত্ত্বসম্মত। নারী তাহার প্রেমানুভূতিতে বাস্তবের একান্ত অনুরাগিণী। সে তাহার প্রিয়তমকে নিজস্বভাবে রক্তমাংসের সীমানায় পাইতে চায়, তাহার নিকট হইতে একনিষ্ঠ প্রেমের দাবী করে। প্রিয়তমের বিন্দুমাত্র তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্য নারীর নিকট মর্মান্তিক, প্রেমের অসম্মান নারীর পক্ষে মৃত্যুতুল্য।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"নারীর প্রেম যে-পুরুষকে চায়, তাকে নিরন্তর নানা আকারে বেষ্টন করবার জন্যে সে ব্যাকুল। মাঝখানের ব্যবধানের শূন্যতা সে সইতে পারে না......আপন পূর্ণতার জন্যে প্রেম ব্যক্তিবিশেষকে চায়। এই ব্যক্তিবিশেষ জিনিসটা অত্যন্ত বাস্তব জিনিস।...বাক্যের অপূর্ণতাকে সংগীত যেমন আপন রসে পূর্ণ করে তোলে, প্রেম তেমনি সুযোগ্যতার অপেক্ষা রাখে না, অযোগ্যতার ফাঁকের মধ্যে সে নিজেকে ঢেলে দেবার সুযোগ পায়।" (যাত্রী)

'পুরুষের উক্তি'তে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পুরুষের মনস্তত্ত্বসম্মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর রাগানুরঞ্জিত। পুরুষের প্রেম সাধারণতঃ একনিষ্ঠতার অলঙ্ঘ্য সীমা অনুসরণ করে না। ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করিয়া তাহার প্রেম ধাবিত হয় একটা আদর্শের দিকে—পরিপূর্ণতার দিকে। এই আদর্শকে জীবনে উপলব্ধি করিবার সাধনাই তাহার জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। কোনো সংকীর্ণ গণ্ডীতে, কোন ব্যক্তি-নারীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার সময় তাহার নাই, তাহার অভিযান পূর্ণতার দিকে, সমগ্রতার দিকে। নারী তাহার প্রেমাস্পদকে, তাহার ব্যক্তি-মানুষকে, তাহার সংসার পরিবেশকে একান্তভাবে পাইতে চায়। পুরুষের দৃষ্টি অনন্ত গগনপ্রসারিত, নারীর দৃষ্টি তাহার ঘরের পানে। পুরুষের প্রাণ একটা পরিপূর্ণতার সাধনা করে বলিয়া ক্ষুদ্র, সাধারণলভ্য বস্তুতে

সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না। সর্বদাই সে সুদূরের পিয়াসি। চিন্তা ও কর্মে পরিপূর্ণতার দিকে তাহার নিরন্তর অভিযান। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত—

"পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে গড়ে তোলে। We are the dreamers of dreams—একথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপপরিগ্রহ করছে এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় বলে অতিবাহুল্যকে বর্জন করে, যে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ, সেইগুলো সমগ্রতার পথে বাধার মতো জমে ওঠে। নারীর সৃষ্টি ঘরে, এই জন্যে সব-কিছুকেই সে যত্ন করে জমিয়ে রাখতে পারে;...... পুরুষের সৃষ্টি পথে পথে, এই জন্যে সব-কিছুর ভার লাঘব করে দিয়ে সমগ্রকে সে পেতে ও রাখতে চায়। এই সমগ্রের তৃষ্ণা, এই সমগ্রের দৃষ্টি পুরুষের শত শত কীর্তিকে বহুব্যয়, বহুত্যাগ, বহুপীড়নের উপর স্থাপিত করেছে।.... বাস্তবের মধ্যে যে-সব বিশেষের বাহুল্য আছে তাকে বাদ দিয়ে পুরুষ একের সম্পূর্ণতা খোঁজে। এই জন্যেই অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষেরই তপস্যা; এই জন্যে সন্ন্যাসের সাধনায় পুরুষের এত আগ্রহ।...পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায়। পুরুষের কাব্যে বার বার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলীর এপিসিকীডিয়ন্ পড়ে দেখো।" (যাত্রী)

'পুরুষের উক্তি'র মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্যের প্রকাশ হইলেও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবকল্পনা ইহাতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পুরুষ রূপকার—স্রষ্টা; আপনার ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে সে নারীকে গড়িয়া তোলে, আপনার কল্পনার রঙে তাহাকে বহুবর্ণে চিত্রিত করে। সেই ধ্যান-কল্পিতা নারীকে সে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করে। সেই মানস-বিহারিণী প্রিয়তমার প্রতি তাহার প্রেম শতধারে উৎসারিত হয়, তাহাকেই সে সর্বক্ষণ কামনা করে। কিন্তু বাস্তবের নারীর মধ্যে সেই মানস-সুন্দরীকে সে খুঁজিয়া পায় না। সেই অপার্থিব ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের আধার মানসীকে সে কামনা-বাসনা-মলিন সাধারণ মানবীরূপে দেখিতে পায়। তখন তাহার মানসীর অনুপম সৌন্দর্য-চিত্র মসীচিহ্নিত হইয়া যায়, অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণায় মন ভরিয়া ওঠে, প্রেমের স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়। এই মানস-সৌন্দর্য-পিপাসা সকল রোমান্টিক কবির মধ্যেই অল্প-বিস্তর দেখা যায়। শেলীর মধ্যে এই অপার্থিব, দেহোত্তর সৌন্দর্যের পিপাসা—এই Platonic love-এর মোহ পুরামাত্রায় ছিল। তাঁহার মানসী কোনো মর্তের নারী নয়, সে স্বপ্নলোকবিহারিণী এক চিরন্তন সত্তা—

An image of some bright eternity ;
A shadow of some golden dream ;...
..............................a tender
Reflection of the eternal Moon of Love···

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি মানবীর মধ্যে তাঁহার হৃদয়-বিহারিণী দেবীকে পান নাই, তাই তাঁহার জীবনে আগত দুইটি নারীর কোনটিই তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। তাঁহার স্বপ্নের অনন্তসৌন্দর্যময়ীকে তিনি বাস্তব নারীর মধ্যে পান নাই।

প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই রোমান্টিক ভাব-কল্পনা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার শেষ বয়সের পরিণত মনের কবিতায় সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী আরও গভীর ও রহস্যঘন হইয়াছে। সৌন্দর্যের যে অনির্বচনীয় প্রকাশ পুরুষ নারীদেহে লক্ষ্য করে, সে-সৌন্দর্য যে এক প্রকার পুরুষেরই মনের সৃষ্টি, তাহারই ধ্যান-কল্পনার মূর্ত প্রকাশ একথা কবি বলিয়াছেন বহুবার বহুভাবে।—

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী—
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।......
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

(মানসী, চৈতালি)

শেষবয়সের কাব্যে অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত করে এই ভাব রবীন্দ্রনাথ বহুবার প্রকাশ করিয়াছেন।

'শ্যামলী র 'দ্বৈত' কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন যে, প্রেমিকা প্রেমিকের মনের সৃষ্টি—তাহারই মনের ভাব ও রসে সে নূতন মূর্তিতে প্রতিভাত হয়।—

দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারিদিকে
কখনো ঝড়ের বেগে
কখনো মৃদু মৃদু দোলনে।......
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে,

আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁয়া
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্তে।

'আকাশ প্রদীপ'-এ কবি বলিতেছেন,—

পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্তলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্তই নারী,
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি। (নামকরণ)

আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়া,
তাহার তো বারো আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া। (তর্ক)

নবজাতক'-এ কবি এই প্রসঙ্গে তাঁহার কবিদৃষ্টির সত্য পরিচয় দিয়াছেন,—

যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধুলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই,
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে,
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ রস,
আনি তারি জাদুর পরশ।
জানি তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে—এরে কভু বলে বাস্তবিক?
আমি বলি—কখনো না, আমি রোমান্টিক।
(রোমান্টিক)

'সানাই'-এর 'নারী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, পুরুষ প্রত্যহের গ্লানিহীন, বাস্তবসংস্পর্শবর্জিত, দেবলোকের নিত্যালোক-উদ্ভাসিত নারীর আদি মূর্তিখানির ধ্যানে তন্ময়, সেই ধ্যান রূপায়িত হয় যুগে যুগে কাব্যে, গানে, শিল্পে; সেই চিরন্তনী স্বর্গনারীর বিরহ পুরুষ নিরন্তর বহন করিতেছে আর তাহাকেই অন্বেষণ করিতেছে,—

পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্তের মদিরা মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ।
তারি চিহ্ন যেখানে সেখানে
কাব্যে গানে
ছবিতে মূর্তিতে,
দেবালয়ে দেবীর স্তুতিতে।

কালে কালে দেশে দেশে শিল্পস্বপ্নে দেখে রূপখানি
নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি।
দুর্বলতা নাহি তাহে, নাহি ক্লান্তি,—
টানি লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি
আদি স্বর্গলোক হতে নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
উদ্ভাসিত ছিলে তুমি, অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণ লোকে
সেই ছবি আনিতেছে ধ্যান ভরি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্য সহচরী।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক চিরদিনই এই কল্পলোকবাসিনী অশরীরিণী দেবীকে কামনা করিয়াছে, তাহাকেই অন্বেষণ করিয়াছে, রক্তমাংসের দেহধারী ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর বাস্তব নারীকে সে উপেক্ষা করিয়াছে। তাই রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম দেহসম্পর্কবিচ্যুত, মানবিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বগত এক অনির্বচনীয়, রহস্যময় আনন্দরসানুভূতি। এই মানসী কাব্যগ্রন্থ হইতেই প্রেম ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে কবির এই বিশিষ্ট রোমান্টিক ভাব-কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। মানসীর 'নিষ্ফল কামনা', 'নিষ্ফল প্রয়াস 'হৃদয়ের ধন , 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'অনন্ত প্রেম' প্রভৃতি কবিতায় এই মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

'নারীর উক্ত কবিতাটির ভাববস্তু এইরূপ : প্রণয়িনী নারী অভিযোগ করিতেছে যে, তাহার প্রণয়ী পুরুষ তাহাকে পূর্বের মতো ভালোবাসে না। প্রথম প্রেমে সে তাহার প্রতি যে আবেগ-উত্তেজনা প্রকাশ করিয়াছিল, যে প্রবল আকর্ষণ দেখাইয়াছিল, তাহা হ্রাস পাইয়াছে। এখন পুরুষ কেবল ভালোবাসার অভিনয় করিয়া তাহার ক্ষয়িত প্রেমকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ছলনা নারী ধরিতে পারিয়াছে। পুরুষের প্রেমাবেগব্যঞ্জক দৃষ্টি, বারবার তাহাকে দেখিবার চেষ্টা, কারণে-অকারণে তাহার নিকটে আসা প্রভৃতিতে নারী পুরুষের প্রকৃত প্রেমের নিঃসংশয় পরিচয় পাইয়াছিল। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজ পুরুষ নারীকে দেখিয়াও দেখে না, তাহার কথা শুনিয়াও শোনে না। সারাদিন সে আশা করিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সে অন্যমনস্কভাবে পাশ দিয়া চলিয়া যায়। আজ পুরুষ বিচিত্রকর্মে লিপ্ত, সেই কর্মের চিন্তায় সে অন্যমনস্ক, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন নারী তাহার হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া অবস্থান করিয়াছে। এখন নারীর স্থান হইয়াছে হৃদয়ের প্রান্তদেশে, গৃহের সংকীর্ণ কোণে। আজ প্রেমিকের সেই হৃদয় আর নাই, সেই অকৃত্রিম আবেগ ও আকর্ষণের পালা শেষ হইয়াছে, তাই নারী যতই আদর-

সোহাগ পায় না কেন, সবই তাহার কাছে কৃত্রিম মনে হয়, সব-কিছুতেই জাগে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিষাদ। দাম্পত্যের সার্থকতাই প্রেমে। প্রেমহীন মিলন তো ব্যভিচারের নামান্তর। প্রেমহীন পুরুষস্পর্শ অপবিত্র—মর্মান্তিক অপমানজনক। পুরুষই তাহার অপর্যাপ্ত প্রেম-নিবেদনের দ্বারা প্রেমের যথার্থ স্বরূপ নারীকে বুঝাইয়াছে, তাহারই ভালোবাসার আলোকে আজ নারী বুঝিতে পারিয়াছে যে এই দৃষ্টি, এই হাসি এই প্রচুর সোহাগ-আদর, এই কাছে-আসা আবার দূরে চলিয়া-যাওয়ার মধ্যে সত্যকার ভালোবাসা নাই।

নারীর প্রতি পুরুষের অসীম ব্যাকুলতা ও প্রেম-জ্ঞাপনের লীলা-বৈচিত্র্য দেখিয়া নারী বুঝিয়াছিল যে, তাহার প্রণয়ী তাহাকে প্রকৃতই ভালোবাসে। আজ সেই মনোভাব ও ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিয়া সে বুঝিয়াছে যে, তাহাদের প্রেমবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। প্রেম যখন জীবন হইতে পলায়ন করিয়াছে, তখন প্রেমের ভান করা নারীকে অপমান করা। সুতরাং দাম্পত্য-জীবনের প্রধান অবলম্বন যে প্রেম তাহার অসম্মান নারী সহ্য করিতে পারে না। ছলনাময় প্রেম-সম্ভাষণে নারী বলিতেছে,—

আজি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষমানা প্রাণ!
এও কি বুঝাতে হয়, প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?

আজ পুরুষের প্রেমে নারী সন্দিহান,—

... ...

সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে।
দিয়েছিলে হৃদয় যখন,
পেয়েছিলে প্রাণ মন দেহ;
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।

প্রেমহীন পুরুষস্পর্শ নারীর পক্ষে অপমানজনক,—

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছো বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

(নারীর উক্তি)

'পুরুষের উক্তি' কবিতার ভাববস্তু এইরূপ : যৌবনস্বপ্নাবেশময় পুরুষ নারীকে অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী ও অপার রহস্যময়ী বলিয়া মনে করিয়াছিল। প্রকৃতির পুষ্পসম্ভারে, পাখীর কলকাকলীতে মনে হইয়াছিল এ ধরণী স্বর্গভূমি—এখানে চিরন্তন বাসরগৃহ যেন সজ্জিত করা হইয়াছে। এই বিচিত্রসৌন্দর্যমণ্ডিত পৃথিবীতে নারীর দেহে কোন্ অমর্ত্যলোকের অসীম সৌন্দর্য যেন উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই রহস্যময় বিশ্বে নারী ছিল সমস্ত রহস্যের কেন্দ্রস্থল—রহস্য-সমুদ্রের মধ্যে পূর্ণপ্রস্ফুটিত শতদল; পুরুষ তীরে দাঁড়াইয়া আকুল হইয়াছে সেই শতদলের সৌরভে। জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা রাত্রিতে চকোর যেমন ব্যাকুলচিত্তে আকাশের দিকে ছুটিয়া যায় জ্যোৎস্না আবরণ ছিন্ন করিয়া অমৃত পান করিতে, পুরুষও সেই রকম কতবার নারীর অসীম রহস্যময় সৌন্দর্যের সন্ধানে তাহার আশে-পাশে ঘুরিয়াছে। আজ পুরুষ দেখিতেছে—যৌবনের সেই মোহমায়া অর্থহীন, সৌন্দর্য মিথ্যা—আত্মহৃদয়ের প্রবঞ্চনা মাত্র। আজ সে বুঝিতে পারিয়াছে, এই সংসারের সংকীর্ণ কামনাবাসনাময় বাস্তব প্রেম আর স্বপ্নরাজ্যের সেই অপার্থিব আদর্শ প্রেমের মধ্যে কতো প্রভেদ! যাহাকে অবলম্বন করিয়া কল্পলোকের এক অপার্থিব দেবীমূর্তি রচনা করা হইয়া ছিল, যাহার মধ্যে সে অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের চরমতম প্রকাশ বলিয়া মনে করিয়াছিল, আজ সেই নারী কামনাবাসনাতাড়িত সাধারণ বাস্তব মানবীতে পরিণত হইয়াছে। পুরুষ তাহার ধ্যানলোক-বিহারিণী অশরীরিণী প্রিয়তমাকে চাহিয়াছিল, বাস্তবমূর্তিধারিণী মানবী-প্রিয়াকে চাহে না। নারীর মধ্যে সে তাহার অন্তরবাসিনী অসীম সৌন্দর্যময়ীকে পাইবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু সেই মানস-সুন্দরী যখন মর্ত্যের মানবী-মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে, তখন তাহাকে সাধারণ নারীর মতো কামনাবাসনার অধীন দেখিয়া তাহার প্রেমের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার ধারণা ছিল—তাহার মানবী-প্রিয়া তাহার 'মানস-স্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী স্বপ্নসঙ্গিনী'র প্রতিরূপিণী, জাগতিক সমস্ত কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বচারিণী, কিন্তু সাধারণ মর্ত্যনারীর কামনা-বাসনা-সংস্কার তাহার মধ্যে বর্তমান দেখিয়া তাহার পূর্বের প্রেম অবসিত হইয়াছে, পূর্বের হৃদয়-মন আর সেই মানবীকে অর্পণ করিতে পারে নাই। প্রথম প্রণয়ের আবেগ-বিহ্বলতায় পুরুষের হৃদয়ে তাহার মানবী-প্রিয়া ছাড়া বিশ্বের আর কোনো বিষয় স্থান পায় নাই, এখন স্বপ্নভঙ্গে সে বুঝিতে পারিয়াছে, বিশ্বজগতের, বহু কর্ম ও চিন্তা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। পুরুষের শেষ বক্তব্য এই যে, মানস-লোকের সেই অম্লান, শুভ্র, চিরন্তনী সৌন্দর্য-দেবীকে যখন জগতের বাস্তব নারীর মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়, তখন সংসারের গৃহসীমানায় মর্ত্য-মানব-মানবীর অসম্পূর্ণ প্রেমকে সম্বল করিয়া সুখেদুঃখে জীবন অতিবাহিত করাই যুক্তিযুক্ত।

পুরুষ বলিতেছে,—যৌবনের রঙীন উষায় যখন এ বিশ্ব অপূর্ব সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তখন মনে করিয়াছিলাম জীবন অনন্ত, প্রেমও অনন্ত। পত্র-পুষ্পে সুশোভিত এই ধরণী হইতে গ্রহ-তারা-ভরা অসীম নীলাকাশ পর্যন্ত যে সৌন্দর্য-সায়র বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তুমি তাহার মধ্যে ছিলে প্রস্ফুটিত শতদলের মতো—শোভায় ও গন্ধে টলমল। ঊর্ধ্বমুখ চকোর যেমন পূর্ণিমা-আকাশের জ্যোৎস্না-আবরণ ছিঁড়িয়া তাহার সুধা পান করিতে চায়, আমিও তোমার মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য সমস্ত হৃদয় দিয়া পান করিতে চাহিয়াছিলাম। তারপর, যে-সৌন্দর্যের পিছনে আমার লুব্ধচিত্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে-সৌন্দর্য তাহার সকল বৈশিষ্ট্য হারাইল এবং বৈচিত্র্যহীন, নিতান্ত সাধারণ হইয়া গেল।

মনে হয় একি সব ফাঁকি,—
এই বুঝি, আর কিছু নাই!
অথবা যে রত্ন তরে এসেছিনু আশা ক'রে
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

(পুরুষের উক্তি)

[illegible]ের সমস্ত আবেগ দিয়া ভালোবাসিয়াছিলাম, যাহার ক্ষণ-অদর্শনে প্রলয় [illegible]—তাহার দিকে এখন ফিরিয়া চাহিতেও ইচ্ছা হয় না।—

নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

(পুরুষের উক্তি)

বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের নির্যাসস্বরূপ তোমার যে পরিপূর্ণ মূর্তিখানি আমি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া ধ্যান করিয়াছি—সেই মূর্তি তোমার মূর্তির মধ্যে পাই না! তাই মনে হয়,—

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার।

তোমাকে এখন ঠিক আমারই মতো কাঙাল—আমারই মতো অসম্পূর্ণ দেখিতেছি। আমার আদর্শ-তুমি ও এই বাস্তব-তুমির মধ্যে কত প্রভেদ!

সৌন্দর্য-সম্পদ-মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা।
ভিক্ষা, ভিক্ষা, সব ঠাঁই, তবে আর কোথা যাই
ভিখারিনী হ'লো যদি কমল-আসনা।

উভয়েই এখন বাস্তব সংসারের অসম্পূর্ণ নরনারী। আমার আদর্শ প্রেমের [illegible]তমতী দেবী বলিয়া তোমাকে আর পূজা করা সাজে না—

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না, চেয়ো না তবে আর।
এসো থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্প-অর্ঘ্যভার।
(পুরুষের উক্তি)

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে, সৌন্দর্য ও প্রেম অনন্ত ও অখণ্ড। প্রেমপাত্রীকে অবলম্বন করিয়া এই সৌন্দর্য ও প্রেম বিকশিত হয় বলিয়া প্রেমপাত্রী প্রেমিকের চোখ অনন্ত বলিয়া বোধ হয়। এই অনন্ত সৌন্দর্য ও প্রেমের পরিপূর্ণ আদর্শকে প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে দেখিতে পায় ও সেই প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুভূতির সার্থকতার জন্য তাহাকে চির-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী মনে করে। এই প্রেমের, সৌন্দর্য, মাধুর্য ও রহস্যের উপলব্ধির জন্য সে সারা দেহ-মন লইয়া প্রেমিকার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রেমিকা হয় তাহার নিকট অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের মূর্তিমতী দেবী। তাহার এই মনোময়ী দেবীকে সে পূজা করে ও তাহার মধ্যে অনন্ত ও অখণ্ড প্রেমরসের আস্বাদ পাইবার জন্য তাহার দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন এই সংসারের রক্তমাংসের প্রেমিকার মধ্যে সেই অনন্ত প্রেম আস্বাদন করিতে যাওয়া যায়, তখন দেখা যায় যে, তাহার অনির্বচনীয়ত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার প্রেমিকা আর সেই প্রেম-সৌন্দর্যের দেবী নয়—নিতান্ত সামান্য সংসারের নারী। অনন্তকে, অখণ্ডকে সীমার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া, খণ্ডতার দ্বারা রুদ্ধ করিয়া ভোগ করিতে গেলে তাহার মনোহারিত্ব, অনির্বচনীয়ত্ব ও অনন্তত্ব মানুষকে আর নব নব আনন্দ ও সৌন্দর্য-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। কবির মানস-বিহারিণী সেই অনন্ত-সৌন্দর্যময়ী ও চিররহস্যময়ী নারীকে তিনি বাস্তব-পঙ্কলিপ্ত ধরার মানবীর মধ্যে দেখিতেছেন না বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদনা বোধ করিতেছেন।

'ব্যক্ত প্রেম' কবিতায় কোনো সরলা নারী কোনো পুরুষের প্রেমে পড়িয়া গৃহত্যাগ করিয়া তাহার পর সেই হৃদয়হীন পুরুষ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহার ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে কি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহারই করুণ বর্ণনা দিতেছে। প্রেমিকা তাহার প্রণয়ীকে বলিতেছে,—যেমন শত সহস্র নারী সংসারে গৃহকাজে ব্যস্ত থাকে, আমিও সেইরূপ ছিলাম। তুমিই আমার হৃদয়-দ্বারে আঘাত করিয়া, লাজ-আবরণ হরণ করিয়া আমাকে কুলত্যাগিণী করিলে। প্রেম যখন ব্যক্ত হয় না, তখন তাহা পবিত্র থাকে—কিন্তু ব্যক্ত হইলেই তাহা কলঙ্কে পরিণত হয়।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত ;
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

ভালোবাসার গোপন আশ্রয়টুকু তুমি নষ্ট করিয়াছ,—

ভাঙিয়া দেখিলে ছি ছি নারীর হৃদয়।
লাজে ভয়ে থরথর ভালোবাসা-সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে, নিদয়।

মনে করিয়াছিলাম,

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালোবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

তুমি এখন মুখ ফিরাইতেছ, কিন্তু

আমার যে ফিরিবার পথ রাখো নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল।

তারপর আবার,

শত লক্ষ আঁখিভরা কৌতুক কঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে।

'গুপ্ত প্রেম' কবিতাটিতে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, রূপহীন নারী কুরূপতার লজ্জায় তাহার হৃদয়ের প্রেম ব্যক্ত করিতে পারে না, এবং ব্যক্ত না হওয়ার জন্য, তাহার হৃদয়ের অপর্যাপ্ত প্রেম কেহ জানিতে পায় না। রূপহীনা নারীর এই অপ্রকাশিত প্রেমের বেদনা একটি করুণ মাধুর্যে এই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। কুরূপা প্রেম প্রকাশ করিতে পারিতেছে না বলিয়া দুঃখ করিতেছে,—

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে।
... ...
ভালো বাসিলে ভালো যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভালোবাসিতে।

কুরূপা প্রেম ব্যক্ত করিতে সর্বদা লজ্জিত,—

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালোবাসিতে মরি শরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার,

কিন্তু প্রেম স্বর্গের জিনিস—চির সুন্দর। দেহ তো নশ্বর—

আহা এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরিয়ে পড়ে যদি শুকায়ে
হৃদয়-মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

প্রেম হৃদয়কে অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত করে। রূপহীনার দেহের সৌন্দর্য নাই বটে, কিন্তু স্বর্গের ধন প্রেম যদি তাহার হৃদয়ে থাকে, তবে প্রেমের অপূর্ব সৌন্দর্যে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তখন রূপহীনাও হৃদয়ের ঐশ্বর্যে সুন্দরী হয়। কিন্তু সংসারে দেহই সকলের লক্ষ্যের বিষয় হয় বলিয়া লোকে হৃদয়ের গোপন প্রেমকে উপেক্ষা করে।

'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটি প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে মূল্যবান।

সুরদাস বিখ্যাত হিন্দী ভক্ত-কবি। তিনি ছিলেন 'অষ্টছাপ'-এর অন্যতম। রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক অনেক ভাবগভ কবিতা লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'ভক্তমাল', 'চৌরাশী বৈষ্ণবোকী বার্তা', 'রামরসিকাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে। তিনি অন্ধ ছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ আছে এবং কোনো কোনো গ্রন্থে তাহার উল্লেখও আছে। তিনি আদৌ অন্ধ ছিলেন কিনা, কি জন্মান্ধ ছিলেন বা পরে অন্ধ হইয়াছিলেন, কি রূপকার্থে অন্ধ কথাটি প্রচলিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁহার জীবনকাল আনুমানিক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী।

(কিংবদন্তী আছে যে, সুরদাস এক সুন্দরী নারীর রূপে আকৃষ্ট হন, শেষে একজন সাধক-ভক্তের পক্ষে পরস্ত্রীতে আসক্ত হওয়া ঘোরতর অপরাধ মনে করিয়া শলাকা দ্বারা চক্ষু বিদ্ধ করেন। বৈষ্ণবভক্তশ্রেষ্ঠ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সম্বন্ধে অনুরূপ কাহিনীই গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। তিনি এক সুন্দরী যুবতী বণিক-পত্নীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার দর্শন কামনা করেন। বণিক পরমসমাদরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া তাহার পত্নীকে দেখান। বিল্বমঙ্গল কিছুক্ষণ নারীকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার নিকট তীক্ষ্ণ সূচী চাহেন। সেই সূচী দ্বারা তিনি তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করেন। সুরদাস বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সম্বন্ধে এই প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটি লিখিয়াছেন।)

প্রথমে এই কবিতাটি 'সুরদাসের প্রার্থনা' নামে ছাপা হইয়াছিল, পরে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) ইহার নামকরণ হয় 'আঁখির অপরাধ'। চয়নিকার

প্রথম তিন সংস্করণের মধ্যেও কবিতাটি 'আঁখির অপরাধ' নামে ছাপা হইয়াছিল। তাহার পরবর্তী সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ও সংকলনে পূর্বের নাম 'সুরদাসের প্রার্থনা'ই ছাপা হইতেছে।

(এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সুরদাসের জবানীতে সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব ভাবানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতির ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে কবিতাটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সমস্ত সৌন্দর্যের অন্তরশায়ী সৌন্দর্যের যে আদি, অখণ্ড রূপ আছে, তাহারই প্রতি আকাঙ্ক্ষা এই কবিতায় প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতির বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য তিনি নারীদেহে কেন্দ্রীভূত দেখিয়াছেন—নারীই বিশ্বসৌন্দর্যের মূর্তিমতী প্রতীক। কিন্তু নারীদেহের সঙ্গে একটি আদিম ভোগসংস্কার চিরন্তনভাবে বিজড়িত। এই ভোগসংস্কারকে দূর করিয়া সৌন্দর্যের মালিন্যহীন, আদি, বিশুদ্ধ রূপকে উপলব্ধি করিবার জন্য যুবক-কবির মধ্যে যে চিত্তদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রকাশ হইয়াছে 'মানসী'র অনেক কবিতায়। নারীর সৌন্দর্য বাস্তব ভোগের অতীত, কামনা-বাসনা-কলঙ্কিত হৃদয়ে সে সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে গেলে বেদনাদায়ক ব্যর্থতা অনিবার্য একথা রবীন্দ্রনাথ 'মানসীর' অনেক কবিতায় বলিয়াছেন। 'নিষ্ফল কামনা'য় নারীর দেহ-সৌন্দর্যের মধ্যে কবি এক পরমরহস্যের প্রকাশ দেখিয়াছেন, তাহার নয়ন হইতে 'আত্মার রহস্যশিখা' বিচ্ছুরিত হইতেছে। নারীর সৌন্দর্য-বিকাশ কামনা-বাসনা-মুক্ত হইয়া মুগ্ধ শিল্পীর মতো নৈর্ব্যক্তিকভাবে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে হইবে, কারণ 'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের,' 'রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস'। 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় নারীদেহসৌন্দর্যের অভ্যন্তরে যে অমূর্ত সৌন্দর্যসত্তা আছে, যাহা রূপাতীত এক জ্যোতির্ময় অখণ্ড সত্তা, যাহা ইন্দ্রিয়জভোগের অতীত, সেই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যে স্থিতিলাভ করিবার জন্য কবি কামনা করিয়াছেন।)

(এই কবিতায় কবি সুরদাসের কিংবদন্তী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব একটি ভাব-সংকটের সংকেত ও তাহার সমাধানের ইংগিত দিয়াছেন। কবির প্রাণে সৌন্দর্য-ক্ষুধা চিরজাগ্রত। তিনি সৌন্দর্যস্রষ্টা, সৌন্দর্যের উপভোক্তা, সৌন্দর্যের পূজারী। সৌন্দর্য কোনো রূপকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং কবি মূলত রূপের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কবি রূপদ্রষ্টা—রূপস্রষ্টা, অসীমকে সীমায় বন্ধন করা কবির কাজ। কবির সমস্ত সৌন্দর্যানুভূতি—প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য কি মানবের দেহ-সৌন্দর্য—একটা রূপের মাধ্যমে অনুভূত হয়। বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্যের নানা মূর্তি কবিকে নিরন্তর উদ্‌ভ্রান্ত করে। রবীন্দ্রনাথ নারীর

রূপেই সৌন্দর্যের চরম প্রকাশ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু সেই সৌন্দর্য-উপভোগের পথে চরম বাধা নারী-রূপের সঙ্গে স্থূল কামনা-বাসনার মিশ্রণ। তাই সুরদাস রূপদর্শনকারী চক্ষুকে বিনষ্ট করিয়া মূর্তিতে অনাবদ্ধ সৌন্দর্যের নিরবচ্ছিন্ন, অখণ্ড আদি-সত্তা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।) তিনি অন্তরের ধ্যানেব দ্বারা সেই নির্দিষ্ট-আকারহীন রূপের শুভ্রজ্যোতি উপলব্ধি করিবেন। ইহার পূর্বে 'মানসী'র মধ্যে বার বার যুবক-কবি নারীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন, এবং প্রতিবারেই উহাকে ভোগকামনার ঊর্ধ্বে উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'পুরুষের উক্তি'তে কামগন্ধহীন সৌন্দর্য ও প্রেমের উপলব্ধির জন্য বাস্তব নারীব প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে আসক্তি, সে প্রেম তখনই অন্তর্হিত হইল, যখন দেখিলেন তাঁহার আদর্শেব বিগ্রহিণী পার্থিব কামনা-বাসনার অধীন। মানসীর অন্যান্য প্রেম-কবিতার মধ্যেও নারীদেহের সৌন্দর্য ও উহার প্রতি আসক্তি প্রেমকে ভোগবাসনামুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কবিতাটির মধ্যেই কেবল কবি নারীর মূর্তিকে বাদ দিয়া তাহার বিদেহী সৌন্দর্যসত্তাকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র কবি-জীবনে নাবীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য নানা দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, নানা রূপে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, মর্ত্যমানবীকে স্বর্গ-প্রেয়সীর সম্মান দিয়াছেন,—তাঁহাব কাব্যসৃষ্টির কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত নারী। নারীর মধ্যেই কবি দেখিয়াছেন ধরণী-গগনের—বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য রূপায়িত। কবির কর্ম রূপ-নির্মাণ —সৌন্দর্যের মূর্তি-রচনা, abstract-কে concrete করা, কিন্তু রূপের পথে বিঘ্ন থাকায় তাহাকে অরূপ বা অমূর্ত সৌন্দর্যের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় কবি সেই অমূর্ত সৌন্দর্য বা রূপহীন রূপের সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু কবির কর্ম কেবল ভাবসৃষ্টি নয়, ভাবের রূপসৃষ্টিই তাহার কর্ম। রূপহীন ভাবসৃষ্টিতে কাব্য হয় না, তাহা তত্ত্বকথার আওতায় পড়ে। কবি কি করিয়া রূপকে অস্বীকার করেন? কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলিয়াছেন,—

"কবি সুরদাস তাহার কবি-প্রাণের অসীম রূপপিপাসা (অপার ভুবন, উদার গগন ইত্যাদি) যে-ভাষায়, যে-ছন্দে ব্যক্ত করিতেছে—এবং সৌন্দর্যের যে স্তব রচনা করিয়াছে, তাহা নিখিল কবিকুলের গান; সে এখনও রূপরসপানে বিভোর, তবু তাহা হইতে মুক্তি চায়—নিজের হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়।"

রবীন্দ্রনাথ ভাবকে অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া রূপের অশুভ সম্ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ কাব্যরচনায় রূপের সঙ্গে ভাবের কি করিয়া মিলন করিবেন সেই সমস্যার সমাধান তাঁহাকেই খুঁজিতে হইবে। কারণ তাঁহার কবি-কর্ম তিনি বিসর্জন দিতে পারেন না—তাঁহার

'হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলিতে' পারেন না। পরবর্তী বাক্যরচনায় কবি এই ভাবদ্বন্দ্বের সমাধান করিয়াছেন।

'মানসী'র পরবর্তী গ্রন্থ 'সোনার তরী'র মানস-সুন্দরী কবিতায় কবি জগতের সমস্ত বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যরাশি একটি নারীরূপের মধ্যে সংহত করিয়াছেন। সর্বসৌন্দর্য-স্বরূপিণী, অনিন্দ্যসুন্দরী মানস-প্রিয়াকে তিনি বলিতেছেন,—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্তভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা, পূর্ণ তটিনীর জল
করিছ বিস্তার তলতল-ছলছলে
ললিত যৌবনখানি; বসন্তবাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমারাতে
নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্তহাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন।

কবির কামনা এই বস্তুনিরপেক্ষ, বহুরূপ অরূপকে, অখণ্ড ভাবময় সৌন্দর্য-সত্তাকে নির্দিষ্টরূপে লাভ করা,—

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্তভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সবঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?

কবি যেমন একটি নারীমূর্তির মধ্যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যকে সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত করিতে চাহিতেছেন, আবার তেমনই মনে করিতেছেন, হয়তো বা একদিন এই সমস্ত সৌন্দর্য একস্থানে এক মূর্তির মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল, সেখান হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—

মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে—
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।

ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।

তাহা হইলে সমস্ত সৌন্দর্য একস্থানে আহৃত, সংশ্লিষ্ট হইতেছে, আবার সেখান হইতে বাহির হইয়া বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইতেছে, খণ্ড অখণ্ড রূপ ধরিয়াছে, আবার অখণ্ড খণ্ডরূপে প্রকাশিত হইতেছে, রূপ ভাবে আত্মসংকোচন করিতেছে, আবার ভাব রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। তাই এই রহস্যময়ী

কখনো বা ভাবময়, কখনো মুরতি।

'চিত্রা'য় কবি এই ভাব ও রূপের, এই অন্তরের নিরপেক্ষ, অমূর্ত, অখণ্ড ভাবময় সৌন্দর্য ও বহির্জগতের বিচিত্র খণ্ডসৌন্দর্যের সমন্বয় করিয়া এই ভাব-দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়াছেন। 'মানস-সুন্দরী'তে যে অপ্রাকৃত সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে, যে অপ্রাপণীয়া মনোবিহারিণীকে ভাবে ও রূপে, খণ্ডে অখণ্ডে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, 'চিত্রা'য় তাহারই বন্দনা গান গাহিয়াছেন। 'চিত্রা' কবিতাটিতে কবি এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। নিখিল বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের মূলে রহিয়াছে এক অনন্ত [illegible] সেই আদি সৌন্দর্য বহির্জগতে প্রতিফলিত হইতেছে, জগতের যাহা-কিছু সুন্দর—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি, তাহা সেই আদি সৌন্দর্যের পরিণতি। সেই আদি সৌন্দর্যের কোনো বিশিষ্ট মূর্তি নাই, জগতের বিভিন্ন সৌন্দর্যরূপের মধ্যে তাহার প্রকাশ হইলেও তাহার কোনো নির্দিষ্ট অবয়ব নাই। সৌন্দর্যের আদি রূপ বস্তুনিরপেক্ষ ও রূপাতীত। বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের মূলে থাকিলেও সকলকে অতিক্রম করিয়া সে অরূপ। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের মূলাধার এই আদি সৌন্দর্যময়ীকে বহির্বিশ্বের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্য হইতে সরাইয়া লইয়া কবি আপন অন্তরের মধ্যে তাহাকে একাকিনী অনুভব করিয়াছেন। বাহিরে প্রকাশমান বহু হৃদয়ে একে পর্যবসিত হইয়াছে। একদিকে বিশ্বব্যাপিনী—অন্যদিকে কবির অন্তরের অন্তরশায়িনী—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অন্তরমাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

এই অন্তরব্যাপিনী বাস্তবনিরপেক্ষ, বস্তুনিরপেক্ষ, মানবসম্বন্ধবিকাররহিত বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের আদি ভাবকে অনন্তযৌবনা উর্বশীতে রূপায়িত করিয়াছেন তাঁহার 'উর্বশী' কবিতায় এবং এই অপার্থিব সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে পরম শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করিয়াছেন 'বিজয়িনী'তে।

এই অমূর্ত, নিরাকার, ভাবময় সৌন্দর্যের স্বরূপ কি? ইহা অন্তরের এক সমুন্নত বোধ, বিশুদ্ধ আনন্দের বিহ্বল অনুভূতি, ধ্যানের তন্ময়ত্ব, যোগের অখণ্ড একাগ্রতা, চিত্তের এক মহাভাব। দার্শনিকেরা তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন। Kant বলেন—Beauty is a state of the mind, a satisfaction, which is purely subjective. কিন্তু কবির পক্ষে এই আনন্দবোধকে অন্যের হৃদয়ে সংক্রামিত না করিলে তাঁহার কবি-ধর্ম বৃথা। তাই তাঁহাকে রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক হইয়াছে নারী। নারীর রূপকে বাদ দিয়া তাঁহার সৌন্দর্য-কামনা চরিতার্থ হয় নাই, কিন্তু সেই রূপকে মানবিক কামনা-বাসনার অতীত করিয়া একান্তভাবে মানস-লোকের সামগ্রী করিয়াছেন।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য ও প্রেমকে দেহকামনার ঊর্ধ্বস্তরে উঠাইয়া মানস-লোকে এক চিরন্তনী সৌন্দর্যময়ী নারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সারাজীবন কাব্যে তাহারই আরতি করিয়াছেন। এই রূপ ও ভাবের সমন্বয় হইয়াছে তাঁহারই কাব্য-মন্ত্রের অনুশীলন ও প্রবর্তনা হইতে,—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।।

বৃহত্তর পটভূমিকায় ইহাই তাঁহার 'সীমা-অসীমের মিলন-সাধনের পালা'। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কল্পলোক-বিহারিণীর সঙ্গে তাঁহার বিদেহী মিলনই তাঁহার সৌন্দর্য ও প্রেমতৃষ্ণার তৃপ্তিদান করিয়াছে। যাহাকে কোনো আকারে পাওয়া যাইবে না, যাহা বাস্তবের সমতলভূমিতে নাই, যাহা দ্বারা স্থূল কামনা-বাসনা মিটিবে না, সেই অপরিচিতা, অধরা, অপ্রাপণীয়ার জন্য অনিঃশেষ প্রেমানুভূতি এবং তাহারই বিরহ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকাই রবীন্দ্রনাথের মতো দুর্ধর্ষ রোমান্টিক কবি-মনের প্রধান লক্ষণ। সেই অমূর্ত, ভাবময়ী মানস-রঙ্গিণীর সঙ্গে নব-পরিচয়ের প্রথম আলাপন ধ্বনিত হইয়াছে 'সুরদাসের প্রার্থনা'য়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সুরদাস-কাহিনীর রূপকে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যসম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু রূপকে দুইটি আখ্যানভাগই সমান্তরাল অর্থগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকে—একটির অর্থের সঙ্গে অন্যটির অর্থের মিল সহজেই বোধগম্য হয়। রূপক-রচনার অদ্বিতীয় শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। তাহার পরবর্তী রচনা ইহার নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু সুরদাসের প্রার্থনায় দুইটি আখ্যান-ভাগের ভালো মিল হয় নাই। সুরদাস মাধুর্যরসের উপাসক বৈষ্ণব কবি। ইনি

অনেক কবিতায় রাধার ভূমিকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজের প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুরদাস একান্তভাবে মূর্তির উপাসক। তাঁহার ছবি দ্বিভুজমুরলীধর, বনমালাশোভিত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এই মূর্তিই 'শ্রীমূর্তি', 'শ্রীরূপ', 'অখিলসারমৃত মূর্তি'—সমস্ত রূপের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। এই মূর্তির ধ্যান—পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই মূর্তির অনির্বচনীয় রূপের সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপভোগ করা প্রেমিক-ভক্তের ধর্ম-সাধনা—তাহার জীবনের চরম সার্থকতা। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গম্ভীরায় রাধাভাব-বিহ্বল মহাপ্রভু স্বরূপ গোস্বামীর যে শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাই মধুর-রসের ভক্ত-প্রেমিকগণের মর্মকথা—

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেহহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥"

"শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিসেবন ব্যতীত অর্থাৎ তাঁহার রূপদর্শন, মুখের বাক্য-শ্রবণ, অঙ্গসৌরভ-আঘ্রাণ প্রভৃতি কার্য করা ব্যতীত আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই বৃথা। হায়, হায়, পাষাণকাষ্ঠসদৃশ দুর্বহ ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্লজ্জ হইয়া কিরূপেই বা বহন করি, আর কিরূপেই বা তাহাদিগকে লইয়া দিনযাপন করি?"

'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার এই ভাবকে বাংলা কবিতায় সম্প্রসারিত করিয়াছেন—

"বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদ-বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা কড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত,
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব মান।

হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ, যার নাই সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সেই যাউ ছারে খার,
সেই বপু লৌহ সম জানি ॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত)

এ ক্ষেত্রে সুরদাস তাঁহার হৃদয়ে দেবীর দেহহীন জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই অমূর্ত জ্যোতিকেই যে তাঁহার দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন—ইহা বৈষ্ণবোচিত বলিয়া মনে হয় না। তারপর বৈষ্ণব কবিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মোহিত হইতে গেলে যে তাঁহার দেবতাকে ভুলিতে হইবে, এরূপ স্বাভাবিক নয়, বরং প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যে, তাঁহার হরিকে বেশি উপলব্ধি করিবারই সম্ভাবনা, যথা, নবমেঘে তাঁহার রূপ, বিদ্যুৎ-বিকাশের মধ্যে তাঁহার পীতধটি ইত্যাদি। তবে এই কবিতায় কবি সুরদাসের ও কবি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের স্বাভাবিক সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য বা রূপকের সার্থকতা দেখিবার কোনই প্রয়োজন নাই। ইহা গৌন, পার্শ্ব-প্রসঙ্গ মাত্র। এখানে সৌন্দর্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীই কেবল বিচার্য।

এই কবিতাটির ভাববস্তু এইরূপ :

(কবি সুরদাসের জবানীতে কবি রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটিতে।

সুন্দরী নারীর নিকট কবি তাঁহার চিত্তবিকারের কথা নিবেদন করিতেছেন। নারীর অসামান্য রূপরাশি তাঁহার অন্তরে সম্ভোগবাসনা জাগ্রত করিয়াছিল, তিনি লালসালুব্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। তাই অনুশোচনার তীব্রজ্বালা-ক্লিষ্ট-চিত্তে তিনি তাঁহার অপরাধ অকপটে ব্যক্ত করিতেছেন।

নারীকে কবি একান্ত ভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বিগতমোহ এবং আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া দেখিতেছেন যে, নারী নিষ্কলঙ্ক, শুদ্ধ ও পবিত্র—কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বগত এক বিশুদ্ধ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। সে অনন্ত ঐশ্বর্য ও শক্তির প্রতীক। এই দেবীর কাছে কবির প্রার্থনা, তাঁহার পুণ্যজ্যোতির স্পর্শে যেন কবির পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। স্বর্গবাসিনী গঙ্গা যেমন পাপীর উদ্ধারের জন্য মর্ত্যে আসিয়াছিলেন, এই স্বর্গের দেবীও তেমনি করুণা-বিতরণের জন্য মানবী মূর্তি ধরিয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই দেবীর করুণায় যেন কবির পাপ চিরতরে ধৌত হইয়া যায়।

কবি তাঁহার দেবীর কাছে এই কলঙ্ককর, ঘৃণ্য কামনার কথা জানাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিতেছেন। কবির বিশ্বাস, দেবীর পুণ্যজ্যোতিস্পর্শে তাঁহার মলিন লজ্জা মুহূর্তে মিলাইয়া যাইবে। সুন্দরীর আর লজ্জায় মুখ ঢাকিবার প্রয়োজন নাই, সে তাহার পবিত্রতার দৃঢ়ধর্মে আচ্ছাদিতা। তাহার রূপের মধ্যে কবি এতদিন কেবল মাধুর্যের প্রকাশ দেখিয়াছিলেন, এখন সেই মাধুর্যের সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে ভীষণতার। কাছে থাকিলেও তাহাকে কাছের মানুষ বলিয়া পাওয়া যায় না, সে স্বাতন্ত্র্য ও পবিত্রতার একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়া দূরে আছে। সে দেবতার রোষবহ্নির মতো তীব্রজ্জ্বোল, উদ্যত-বজ্রের মতো ভীতিজনক।

কবি তাঁহার লজ্জাকাহিনী ব্যক্ত করিতেছেন। ভোগলালসায় তাড়িত হইয়া কবি নারীর দেহকে উপভোগ করিতে গিয়াছিলেন, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের প্রতি তাঁহার বাসনা-বিহ্বল দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। কবির আশঙ্কা, দেবী কি তাঁহার এই শোচনীয় দুর্বলতা, এই পঙ্কিল কামনার আবেগ জানিতে পারিয়াছিলেন? কবির উষ্ণনিঃশ্বাস কি দেবীর হৃদয়-দর্পণে ক্ষণেকের জন্য বাষ্পরেখা অঙ্কন করিয়াছিল? তাঁহার লুব্ধ দৃষ্টিপাতে লজ্জায় রাঙা হইয়া দেবী কি আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছিলেন?

যে পাপচক্ষু কবির এই অবাঞ্ছিত রূপমোহ উৎপাদন করিয়াছিল, তাহাকে তিনি ছুরিকাবিদ্ধ করিতে চাহেন। এই চক্ষু দুইটি তো কেবল তাঁহার দেহে নাই, এ তাঁহার মর্মস্থলে জন্মিয়া নিশিদিন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বালা সৃষ্টি করিতেছে। সেখান হইতে সেই মানস-নেত্র দুইটিকে উৎপাটন করিয়া তিনি দেবীকে উৎসর্গ করিতে চাহেন।

প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য অহরহ কবিকে আকর্ষণ করিতেছে। দেবীর কাছে কবির প্রার্থনা, এই অবারিত আকাশ, শ্যামলা ধরিত্রী, সন্ধ্যার বিচিত্রবর্ণ মেঘচ্ছটা, স্বর্ণরশ্মিবিচ্ছুরিত সূর্যোদয়, দিগন্ত প্রসারিত হরিৎ-শস্যক্ষেত্র, তারকাখচিত নীলাকাশ, বসন্তের মোহময় মুখশ্রী, বর্ষার বিদ্যুৎ-ঝলসিত মেঘমালা, শরতের জ্যোৎস্না—এই অপরূপ সৌন্দর্য-সম্ভার হইতে তাঁহার দৃষ্টি চিরতরে অপসৃত হোক এবং এই বিচিত্র রূপসমারোহের উপর কৃষ্ণযবনিকার আচ্ছাদন চিরকালের মতো টানিয়া দেওয়া হোক।)

কারণ, প্রকৃতির এই বিচিত্র সৌন্দর্যরূপ কবিকে মোহাবিষ্ট করিয়া আত্মকর্তৃত্ব-শক্তি হরণ করে, সৌন্দর্যমদিরা পান করিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়েন; এইসব সৌন্দর্যের রূপ-রস-রহস্য তাঁহার চিত্তকে একেবারে অধিকার করিয়া তাঁহার কাব্য

ও সংগীতে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি কেবল উন্মাদের মতো বিচিত্রসুরের সংগীত রচনা করেন। কুসুমগন্ধ, বসন্তসমীরণ, জ্যোৎস্নাপ্রবাহ তাহাদের সৌন্দর্য-মাধুর্য লইয়া কবির হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় ব্যাকুল ভাবাবেগের সৃষ্টি করে। বিচিত্র-সৌন্দর্যমণ্ডিত ধরণীর মধ্য হইতে যেন এক অপরূপ মায়াময়ী সুন্দরী বাহির হইয়া তাহার যৌবনলাবণ্যময় বাহুবেষ্টনে কবিকে আলিঙ্গন করে। তাঁহার চারিদিকে নানা মায়াময় কল্পমূর্তি ঘুরিয়া বেড়ায় এবং একটা বিহ্বল ভাবাবেগের মধ্য দিয়া তাঁহার দিন কাটে। এই খণ্ড, ক্ষণিক ভোগসর্বস্ব সৌন্দর্যের মোহ তাঁহাকে কাব্য ও সংগীত-রচনার উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করে। সমস্ত সৌন্দর্যের মূলে যে রূপাতীত, অপার্থিব এবং অখণ্ড সৌন্দর্য আছে, সেই চিরন্তন 'আনন্দরূপ'কে কবি ভুলিয়া যান এবং তাঁহার কাব্য ও সংগীতে সেই সৌন্দর্যের প্রসন্ন বহুবের পর বছর ধরিয়া প্রকাশ পায় না। সেই অপার্থিব ও অনন্ত সৌন্দর্যাভিমুখী না হওয়ায় তাহার মন খণ্ড, ক্ষণিক এবং পার্থিব সৌন্দর্যের মোহে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাতে কেবল তৃষ্ণাই বাড়ে, তৃষ্ণার শান্তি হয় না। এই তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া কবি নারীর রূপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। চোখ গেলে চোখের পিপাসারও শেষ হইবে।

(চোখের মাধ্যমে নারীর রূপ কবির অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং সে-দর্শনে দুয়ের ধ্বংস আবশ্যক। দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইলে তাঁহার কাছে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য চিরতরে তিমিরাচ্ছন্ন হইবে—নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্য সমারোহ উপভোগ হইতে চিরতরে তিনি বঞ্চিত হইবেন।

তবুও কবি চক্ষুহীনতাই কামনা করিতেছেন। মায়াময়, মোহময় বিচিত্র কল্পমূর্তিগুলি নিরন্তর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া আলেয়ার জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। এই ছায়ামূর্তি তাহাকে তো কোনো তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না, অধিকন্তু অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তির বেদনা ও নৈরাশ্য তাহাকে অস্থির ও ব্যাকুল করিতেছে। চক্ষুর কাজ রূপ গ্রহণ করা—অসীমকে সীমায় বদ্ধ করা। আঁখির অভাবে নিবিড় ছন্ন অন্ধকারের অসীম অনুভূতির মধ্যে জগতের অস্তিত্ব আর থাকিবে না। কবি তখন রূপজগতের চিহ্নহীন তিমিরাচ্ছন্ন অসীম হৃদয়ে একাকী আত্মকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন।

কেবল তাহাই নয়, সেই বিশ্ববিলোপী অন্ধকারের পটভূমিকায় কবির হৃদয়ে দেবীর একটি ইন্দ্রিয়াতীত, অপার্থিব সৌন্দর্যময় মূর্তি অগ্নিরেখায় ফুটিয়া উঠিবে, সেই অপূর্ব মূর্তিকে ঘিরিয়া পরমসৌন্দর্যময়, কালধারার চিরচঞ্চলতার ঊর্ধ্বগত, এক নূতন চিরন্তন জগতের সৃষ্টি হইবে। কবির প্রার্থনা তাঁহার হৃদয়-আকাশে দেবীর দেহহীন জ্যোতির্ময় মূর্তি সগৌরবে বিরাজ করুক। সেই বিশুদ্ধ অলৌকিক সৌন্দর্যকে কবি তাঁহার পরমসুন্দরের প্রকাশ বলিয়া মনে করিবেন।)

(সৌন্দর্য অসীম ও অনন্ত; উহা একটি নারীদেহের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় উহার প্রকৃত স্বরূপ ও পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করা যাইতেছে না। কবি তাই খণ্ড ও অসীম সৌন্দর্য ছাড়িয়া সৌন্দর্যের নিরবচ্ছিন্ন আদিরূপ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। কামনা-বাসনার উর্ধ্বে সে সৌন্দর্য অনন্ত, চির-নির্মল ও পবিত্র। রবীন্দ্রনাথ-সুরদাসের মারফতে, সমস্ত খণ্ড সৌন্দর্যের অন্তরশায়ী সৌন্দর্যের যে অখণ্ড রূপ আছে, সেই অনন্ত-সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন।

সুরদাস সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে বলিতেছেন,—

পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি
তুমি দেবী, তুমি সতী,
কুৎসিত দীন অধম পামর
পঙ্কিল আমি অতি।

লালসার পঙ্কিলতা তোমাকে স্পর্শ করে নাই—স্বর্গীয় পবিত্রতায় তুমি মহীয়সী। কামনার আবিলতায় আমি নিতান্ত হীন। আমার এ পাপ তোমার পুণ্য-জ্যোতিতে দূর কর। তোমার অনাবৃত সৌন্দর্য লইয়া আমার সম্মুখে প্রকটিত হও। তুমি পবিত্রতার সুদৃঢ় বর্মে আচ্ছাদিত। অপূর্ব সংযমে, শুচিতায় তোমার মূর্তি অপরূপ জ্যোতির্ময়ী—যেন বজ্রের মতো, দেবতার রোষবহ্নির মতো, সমস্ত লালসা-কামনাকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত। লালসা-মাখা, লুব্ধ দৃষ্টিতে তোমার দিকে চাহিয়া ছিলাম—কিন্তু তোমার চিত্তকে সে গ্লানি স্পর্শ করিতে পারে নাই। স্থূলদেহের দৃষ্টিশক্তি লোপ হইলে কি হইবে—

এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই,
ফুটেছে মর্মতলে,
নির্বাণহীন অঙ্গার সম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হ'তে তারে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটো চোখ।

তোমার সৌন্দর্য-সম্ভোগের জন্য যাহার এত তৃষ্ণা—হে অনন্ত সৌন্দর্যময়ী, সে আঁখি তোমারি হোক।)

রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে এই বিশ্বের সৌন্দর্য আমাকে মোহাবিষ্ট করিয়াছে,—

ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।

নব নব রূপে, নব নব সৌন্দর্যে, আমার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত। এই সৌন্দর্য-সম্ভোগে তৃষ্ণা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। অসীম ও অখণ্ড সৌন্দর্যের আস্বাদ ছাড়া এ পিপাসা তো মিটিবার নয়—সেই অসীম সুন্দর হরিকে না পাইলে এই দারুণ তৃষ্ণার তৃপ্তি নাই। সুরদাস মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ, খণ্ড-সৌন্দর্যের মায়া-পাশ হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছেন,—

লহো মোরে তুলি আলোক মগন মুরতি-ভুবন হতে।

চক্ষুর কার্য রূপ-গ্রহণ করা—অসীমকে সীমাবদ্ধ করা। তাই বলিতেছেন,

আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে,
একাকী অসীম-ভরা—
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
মিলাবে সকল ধরা।

সেই অন্ধকারে, মূর্তিতে অনাবদ্ধ, ইন্দ্রিয়জভোগের অতীত তোমার যে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্বিশেষ সৌন্দর্য আছে, তাহাই প্রকটিত হইবে। তোমার অনন্ত অমূর্ত সৌন্দর্য, দেহহীন জ্যোতি, আমার হৃদয়-আকাশে চিরদিনের মতো জাগিয়া থাকিবে, আর তোমার সেই অনন্ত সৌন্দর্য আমার চিরসুন্দর হরি-রূপে—পরম বিস্ময়করভাবে প্রতিভাত হইবে।

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা
হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

('সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটিতে সৌন্দয সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথের অনুভূতি একটা নির্দিষ্ট স্তরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ইহা 'উর্বশী', 'বিজয়িনী' প্রভৃতির অগ্রদূত।)

রবীন্দ্রনাথ মানস-প্রিয়ার ধ্যানে একেবারে তন্ময় হইতে চাহিতেছেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া গিয়া কেবল প্রিয়াময় হইতে চাহিতেছেন,—

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি।
তুমি আছ মোর জীবনমরণ
হরণ করি। [ধ্যান]

তাঁহার প্রিয়া অনন্ত সৌন্দর্যে চিরসুন্দর ও চিররহস্যময়ী, কবিও অনন্ত প্রেমময়।

সে যেন অসীম আকাশ—আর কবি তাহার তলায় দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। প্রিয়া অসীম, অনন্ত সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে আত্মসমাহিত, স্থির, আর কবির প্রেম অসীম ও অপর্যাপ্ত হইলেও সমুদ্রের মত সীমাবদ্ধ, আবেগ-চঞ্চল। তাই তাঁহাদের মিলনে স্থিরের সহিত চঞ্চলের—অসীমের সহিত সীমার নিরন্তর মিলন হইতেছে। বিশ্বের নিত্যলীলা তাঁহাদের জীবনের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইতেছে। প্রিয়ার এই লীলারহস্যের ধ্যানে কবি সমাহিত।

কবি তাঁহার প্রিয়ার সহিত জন্ম-জন্মান্তরের প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। প্রিয়া তাঁহার নিত্য প্রেমসিদ্ধা—অনন্ত প্রেমময়ী। সকল যুগের সকল প্রেমিক-প্রেমিকা তাহার প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কারণ

তোমা ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারিনে ভালো কি বাসিতে পারে।
[পূর্বকালে]

'অনন্ত প্রেম' কবিতাটিও মানসীর একটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা

প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্র-ভাব-কল্পনার একটি বিশিষ্ট রূপ এই 'অনন্ত প্রেম' কবিতাটিতে রূপায়িত হইয়াছে। রোমান্টিক কবি-মানস সৌন্দর্য ও প্রেমের বাস্তব, খণ্ড, ক্ষণিক প্রকাশের ঊর্ধ্বে উঠিয়া উহাদিগকে একটা চিরন্তন ও অখণ্ড প্রতিষ্ঠাভূমিতে স্থাপন করিতে চায়। যে-প্রেম দেহে কেন্দ্রীভূত, জীবনে সমাপ্ত, বিশেষে আশ্রয়ী, সেই বাস্তব, খণ্ডিত, ক্ষণিক প্রেমকে রোমান্টিক স্বীকার করে না। প্রেমের অনির্বচনীয়ত্ব ইহার বিশালত্বে, ব্যাপ্তিতে, পরিপূর্ণতায়। প্রেমের বিস্তৃতি ব্যক্তি হইতে বিশ্বে, জীবন হইতে জীবনান্তরে, ক্ষণিক হইতে চিরন্তনে। সেই অখণ্ড অনন্ত প্রেমের জন্য রোমান্টিক কবি-মানস সর্বদা ব্যাকুল। এই সংসারের ঊর্ধ্বচারী, বাস্তবাতীত প্রেমকে রোমান্টিক চিরকাল সন্ধান করে, উহার রহস্যের জন্য লালায়িত হয়, সেই প্রেমকে না পাইয়া তাহারই বিরহে সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তাই কবির প্রেয়সী সেই আদর্শ, অনন্ত প্রেমের বিগ্রহিণী।

এই জীবনের মানবী-প্রিয়া কবির দৃষ্টিতে বিশেষ হইতে নির্বিশেষে উপনীত হইয়াছে। এই ক্ষণস্থায়ী মর-জীবনকে তিনি অনন্ত জীবনের প্রতীকভাবে দেখিয়াছেন। কবির প্রেয়সীকে মনে হইয়াছে, সে তাঁহার সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধে আবদ্ধ। রূপরূপান্তর, জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া কবি তাহার প্রেম আস্বাদন করিতে করিতে বর্তমান জীবনে উপনীত হইয়াছেন। পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্যে যতো প্রেমিক-প্রেমিকার কাহিনী আছে, কবি ও তাঁহার প্রিয়া তাহার মধ্যে বর্তমান ছিলেন। সেই সব প্রেমের রূপ ও রসবৈচিত্র্য তাঁহাদের যুগল-জীবনকে

কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হইয়াছিল। সৃষ্টির পূর্বে তাঁহারা একস্থানে বাস করিতেন, তারপর দ্বৈতবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সৃষ্টিস্রোতে জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া প্রেমিক-প্রেমিকারূপে পরস্পরের প্রেম আস্বাদন করিতে করিতে বর্তমান জীবনে উপনীত হইয়াছেন। বিশ্বের সকল কালের সকল নরনারীর প্রেম, সকল কবিদের প্রেমসংগীত তাঁহাদের প্রেমে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ও অতীতকে একসূত্রে গাঁথিয়া প্রেমের অখণ্ডতা ও চিরন্তনত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন

কালিদাসের

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি॥

শ্লোকটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রাবলী'র একস্থানে বলিয়াছেন,—"সৌন্দর্য যে মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময় অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, যা মনকে জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, কালিদাসের কবিতার মধ্যে এই ভাবটি পড়ে আমার ভারী আনন্দ হল।" সৌন্দর্য ও প্রেম সম্বন্ধে এই যে 'নিগূঢ় রহস্যময় অসীম আকাঙ্ক্ষা' ইহাই রোমান্টিক মনোধর্ম এবং এই 'অসীম আকাঙ্ক্ষা'তেই কালিদাসের 'জননান্তরসৌহৃদানি' উক্তি কবিকে আনন্দ দিয়াছে।

পুরাণ-ইতিহাস-কাব্যকাহিনীতে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে বর্তমান কালের নায়ক-নায়িকার একাত্মতার কথা কবি পরবর্তী সময়ের একটি কবিতায় বলিয়াছেন,—

নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি; অমর বীণায়
উঠিয়াছে কী ঝংকার! নিত্য শুনা যায়
দূর-দুরান্তর হতে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগ-যুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান॥

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ নিশ্বসিত—
অরণ্যের বিষাদমর্মরে; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি,

করপল্লবতললীন ম্লান মুখশশী
ধ্যানরতা ; পুরূরবা ফিরে অহরহ—
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে ; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশমন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনাসিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী ; ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্বতীরে
অনন্তব্যগ্রতাপাশে ;

[প্রেমের অভিষেক, চিত্রা]

কবিতাটির ভাববস্তু এইরূপ : কবির প্রিয়ার সঙ্গে কবির প্রেমসম্বন্ধ যুগ-যুগান্তরের, জন্ম-জন্মান্তরের। এই প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে কবির মুগ্ধ হৃদয় যুগে যুগে কতো গান রচনা করিয়াছে ; কতো বিচিত্র পরিবেশে, কতো বিচিত্ররূপে, তাঁহার প্রিয়া সে-সব প্রেমের অর্ঘ গ্রহণ করিয়াছে।

পুরাণ, ইতিহাস ও সাহিত্যের যতো প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের প্রেমকথা কবি পড়িয়াছেন—শিবদুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, নলদময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, অর্জুন-সুভদ্রা, উদয়ন-বাসবদত্তা, যক্ষ-যক্ষপত্নী, চারুদত্ত-বসন্তসেনা, লয়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ, রোমিও-জুলিয়েট, দান্তে-বিয়াত্রিচ প্রভৃতি—তাহাদের সকলের মধ্যে কবি ও তাঁহার প্রিয়তমা বর্তমান ছিলেন। কবির প্রেয়সী সেই জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতিবিজড়িতা তাঁহার প্রেমময়ী নায়িকা।

অনাদিকালের নিত্যপ্রেমের হৃদয়-উৎস হইতে কবি ও তাঁহার প্রিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। তারপর অসংখ্য প্রেমিক-প্রেমিকার ভূমিকায় তাঁহারা কখনো বিরহের অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়াছেন, কখনো মিলনের মধুর লজ্জায় আরক্তিম হইয়াছেন। চিরপুরাতন প্রেমকে তাঁহারা নব নব পরিবেশে, নব নব রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

কবি তাঁহার সাম্প্রতিক কালের প্রণয়িনীর মধ্যে সেই সুচিরপ্রবাহিত প্রেমধারার—সেই বিরহমিলনময় প্রেমলীলার সার্থক পরিণতি দেখিতেছেন। বিশ্বের সকল নরনারীর সুখদুঃখময় প্রেম, সকল কালের প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেমের স্মৃতি,

সমস্ত কবিদের প্রেমলীলা-বর্ণনার সৌন্দর্য-মাধুর্য একালের একটি প্রেমিকার মধ্যে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিয়া কবি অনুভব করিতেছেন।

কবির সহিত তাঁহার প্রিয়ার মিলন হইয়াছে—কোন্ অনাদিকালে, সৃষ্টির কোন্ আদিম উষায়। তারপর জন্মে-জন্মে, শতরূপে, প্রিয়ার সহিত চলিয়াছে প্রেমলীলা—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার,
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধ'রে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার—
কত রূপ ধ'রে পরেছ গলায়
নিয়েছো সে উপহার।
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। [অনন্ত প্রেম]

'অনাদিকালের হৃদয়-উৎস' হইতে তাঁহারা যুগল-প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছেন। এ জগতে কাব্যে, উপন্যাসে, ইতিহাসে ও বাস্তবজীবনে যত প্রণয়ী-প্রণয়িনী আছে, তাহার কবি ও তাঁহার প্রিয়ার প্রতিচ্ছবি,—

আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে
মিলনমধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে। [অনন্ত প্রেম]

কবি বলিতে চাহেন যে, প্রত্যেক প্রণয়ী তাহার প্রণয়িনীকে অনাদিকাল হইতে ভালোবাসিয়া আসিতেছে এবং জন্ম-জন্মান্তরে সেই নিত্যকালের প্রেমের পুনরাভিনয় হইতেছে মাত্র।

মানসীতে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য যে ইন্দ্রিয়-ভোগের অতীত, অসীম ও অখণ্ড এবং প্রেম যে অনন্ত ও জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার সামগ্রী ইহাই বলিয়াছেন। 'সন্ধ্যাসংগীতে' কবিকে দেখি হৃদয়-গুহার অন্ধকারে আবদ্ধ—নিখিল বিশ্বের বিচিত্র লীলা ও নিরন্তর উত্থিত প্রাণ-তরঙ্গের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের সীমাবদ্ধ জীবনে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। 'প্রভাত-সংগীতে' কবি সেই হৃদয়-কারা হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সহিত মিলিত হইলেন—নিজেকে সারা বিশ্বে প্রসারিত করিয়া দিয়া বিরাট প্রাণ-তরঙ্গের সহিত যুক্ত হইলেন। 'ছবি ও গানে' কবি বিশ্বের—প্রকৃতি ও মানবের—সহজ সৌন্দর্য নিজের মনের আনন্দে, কল্পনার রঙে

রঙীন করিয়া উপভোগ করিয়াছেন। 'কড়ি ও কোমলে' কবি কল্পনার বর্ণচ্ছটার ব্যবধান মুছিয়া দিয়া মানবজীবনের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইলেন। কবি সৌন্দর্যের উপাসক। তরুণ কবির চোখে নারী এক অপরূপ সৌন্দর্যে প্রতিভাত হইল। বিশ্বসৌন্দর্য তিনি নারীদেহে কেন্দ্রীভূত দেখিলেন। সেই সৌন্দর্য-উপভোগের জন্য তাঁহার সারা-চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। কিন্তু ভোগলালসা নির্মল উপভোগে বাধা দিল। দেহকে ঘিরিয়াই যে উপভোগের আয়োজন, তাহা সীমাবদ্ধ ও ক্ষণিক, তাই কবি তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না। নারী-দেহে চিরন্তন সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিবার জন্য, খণ্ডকে, ক্ষণিককে অখণ্ড ও চিরন্তনের সহিত যুক্ত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে আকুল আগ্রহ উপস্থিত হইল। 'কড়ি ও কোমলে'র শেষে কবি ভোগ-প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া সৌন্দর্যকে নিত্যতা ও অখণ্ডতা দান করিয়াছেন। 'মানসী'তে কবি প্রেমের সমস্ত আবেগ, মাদকতা ও মাধুর্য উপভোগ করিয়া, ভোগ-প্রবৃত্তির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া প্রেম যে অনন্ত ও লোকাতীত রহস্যময়, তাহাই ব্যক্ত করিলেন। যে স্থূল রক্তমাংসময় নারীদেহের সৌন্দর্য, সৃষ্টির অনাদিকাল হইতে পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, অসংখ্য কবি কাব্যে যাহার বন্দনাগান করিয়াছেন, যুবক কবিও সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সৌন্দর্য স্থূল, ক্ষণস্থায়ী ও সীমাবদ্ধ বলিয়া দেহের মধ্যেই যে দেহাতীত, অপার্থিব সৌন্দর্যের প্রকাশ আছে, সেই নিত্যকালের সৌন্দর্যের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া দিয়া উহার অনির্বচনীয় ও অলৌকিক মাধুর্য আহরণ করিয়াছেন। একই দেহে পার্থিব-অপার্থিব, স্থূল-সূক্ষ্ম, ক্ষণিক-চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রকাশ তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে। আবার এই সৌন্দর্যময়ী নারীর প্রতি যে আসক্তি—যে প্রেম মানুষের সহজাত সংস্কার, তাহা যে জড় দেহমনের স্বাভাবিক বিকার মাত্র নয়, ইহার মধ্যে আছে, একটা অনন্তত্ব, অপার্থিবত্ব, তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং সৌন্দর্য ও প্রেমের পার্থিব রূপকে তিনি ভুলেন নাই—উহাকে বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ, মহান ও চিরন্তন করিয়াছেন।

"ভালোবাসা মাত্রেই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব—যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি।" ছিন্নপত্র পৃঃ ২৮২।

মানসীর এই কবিতাগুলিই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান প্রেমের কবিতা। 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'ক্ষণিকা'র মধ্যেও কতকগুলি চমৎকার রসোচ্ছল প্রেম-কবিতা আছে। 'মহুয়া'র প্রেম-কবিতায় একটি নূতন সুর ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ অর্থে আমরা যেগুলিকে প্রেম-কবিতা বলিয়া বুঝি, রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার সঙ্গে তাহার প্রভেদ আছে। প্রেমিক-প্রেমিকার আবেগ-উদ্দীপনা-মাদকতার বাস্তব অনুভূতি ইহাতে ব্যক্ত হয় নাই—ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার

তপ্ত স্পর্শ ইহাতে নাই। দেহ-মনকে অবলম্বন করিয়া উচ্ছ্বাস উৎসারিত হইলেও দেহভোগাকাঙ্ক্ষা একটা বাস্তব-নিরপেক্ষ, মহত্তর, আদর্শ সৌন্দর্যভোগের আকাঙ্ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং মনের আবেগ-উদ্দীপনা একটা অনির্বচনীয় সর্বজনীন আনন্দ-রসের মধ্যে বিলীন হইয়াছে। এই প্রেম ব্যক্তি-সীমার সংকীর্ণতামুক্ত, নরনারীর দেহ-আত্মার মিলন ও দ্বন্দ্বঘটিত সুতীব্র আর্তিশূন্য এক ভাবময় সত্তা, এক অপার্থিব আনন্দরস। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা মূলত ভাব-ধর্মী—তাঁহার রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহা বস্তুকে অবলম্বন করিলেও বস্তুনিরপেক্ষ, ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে। 'মহুয়া'তে এই প্রেম-কবিতার এক অভিনব সংস্করণ দেখিতে পাই বটে, তবে এই প্রেম কিছুটা বাস্তবের দ্বন্দ্বমুখর, কিন্তু উহাও ব্যক্তিগত অনুভূতির ঊর্ধ্বে। উহা প্রেমের ধ্যান ও পূজা—প্রেমের তত্ত্ব ও দর্শন কাব্যে রূপায়িত।

মানসীর প্রেম সম্বন্ধে একটি পত্রে কবি লিখিয়াছেন,—

"আমি ভালোবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা।" [প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত, সবুজপত্র, ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ]

(২) মানসীর দ্বিতীয় ধারার কবিতায় দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কবির মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। জীর্ণ কুসংস্কার ও গতানুগতিকতা বাঙালীর ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। দেশ ও সমাজ নূতন আলোকের দিকে চক্ষু মুদিত করিয়া অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। প্রকৃত সত্য ও মঙ্গলের পথে তাহাদের যাত্রা নাই।

কবি তীব্র-ব্যঙ্গে সেই স্থবির সমাজকে কশাঘাত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে নিজের প্রাণের বেদনাও প্রকাশ করিয়াছেন।

'বঙ্গবীর' কবিতায় কবি দুর্বল-দেহ, অধ্যয়ন-সর্বস্ব, কর্মহীন, অতীতের বৃথা গৌরবস্ফীত বাঙালীকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। 'নব-বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপে' কবি সমাজের বাল্য-বিবাহপ্রথার প্রতি তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন। কালিদাস-শেক্সপিয়ার-পড়া গ্র্যাজুয়েটের সহিত নোলক-মল-পরা আট বছরের মেয়ের বিবাহ যে কিরূপ বিসদৃশ ও করুণ তাহা কৌতুকের ছলে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'ধর্মপ্রচার' কবিতায় কবি অর্থহীন ধর্মোন্মত্ততা ও পরধর্মে অসহিষ্ণুতাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন ও ঐ সঙ্গে হিন্দুধর্মধ্বজীর অসারত্ব ও ভীরুতার পটভূমিতে খৃষ্টধর্ম-প্রচারকের মহত্ত্ব ও অপূর্ব সহিষ্ণুতা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

সাধারণ বাঙালী-ঘরের বধূজীবনের নবতর পারিপার্শ্বিকের সহিত খাপ খাওয়াইবার আয়োজনের মধ্যে যে বেদনা, যে চাপা-কান্নার করুণ সুর মিশ্রিত আছে, কবি 'বধূ' কবিতায় তাহাকে এক অপূর্ব রূপ দিয়াছেন। কবি-হৃদয়ের সমস্ত

দরদ ও সহানুভূতি এক নগর-কারাগার-বদ্ধা পল্লী-বালিকার অন্তর্গূঢ় মর্মবেদনার প্রতি উৎসারিত হইয়াছে। বধূ পিতৃগৃহে নগ্ন পল্লীপ্রকৃতির ক্রোড়ে, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত; বিবাহের পর সে শহরে শ্বশুর-ঘর করিতে আসিল। নূতন স্থানের পরিবেশ তাহার নিকট কৃত্রিমতাপূর্ণ, হৃদয়হীন ও বেদনা-দায়ক বোধ হইল। সমবেদনাহীন অনভ্যস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দিনী বালিকার নিরালা মন পুরাতন স্মৃতির দ্বার খুলিয়া দিল। বিকালে জল আনিবার দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল,—

কলসী ল'য়ে কাঁখে পথ সে-বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ ধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু-ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।

তার পর তাহার মনে হইল,

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।
শরতে ধরাতল শিশির ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।

আর,

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায়ে ঘেঁসে।

কিন্তু কলিকাতায় শ্বশুরগৃহ তাহার কাছে কারাগার,—

হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!

এখানে শত-সহস্র বাধা ও বিধি-নিষেধের জালে সে বিজড়িত—মমতাহীন কৌতূহল ও সমালোচনায় ব্যথিত তাহার অন্তর। এখানে,

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ,
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।

ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।
... ...
ইঁটের পরে ইঁট মাঝে মানুষ-কীট;
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা!

এখানে অন্তরের সৌন্দর্যের প্রতি কাহারো দৃষ্টি নাই, মানুষের মনকে বুঝিবার প্রয়াস নাই, দরদের সুকোমল স্নিগ্ধ-ধারা এখানে প্রবাহিত হয় না। এই মমতাহীন আবেষ্টনের বাষ্পে জীবনের সহজ ও সুনির্মল স্রোতোধারা বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে—জীবনের অবসান ব্যতীত ইহা হইতে আর মুক্তি নাই! কবির বীণায় পল্লীবালার এই বেদনা অপরূপ মূর্ছনায় আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে।

এই বিড়ম্বিতা বালিকা-বধূ বাংলার সংসারে একদিন বিরল ছিল না। গৃহকোণে যে নীরব ট্র্যাজেডির অভিনয় হইত, কবির স্পর্শকাতর মনের সূক্ষ্ম-তন্ত্রী তাহাতে স্পন্দিত হইয়াছে।

এইধারার কবিতার মধ্যে বাঙালীর ভীরুতা, কাপুরুষতা ও দুর্বলতার প্রতি যে পরিমাণে কবির ব্যঙ্গ আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক আছে তাঁহার বেদনা। এই বিদ্রূপের হুলের সহিত কবি-হৃদয়ের বেদনার মধুও মিশ্রিত আছে। 'দেশের উন্নতি' কবিতায় কবি বলিতেছেন,—

দূর হউক এ বিড়ম্বনা, বিদ্রূপের ভান।
সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনা-ভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়-তলে
সরম-তাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।

কবি বাঙালী-জীবনের এই স্থবিরতা, সংকীর্ণতা, গতানুগতিকতা ও ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ভাঙিয়া উদ্দাম, বৈচিত্র্যময় জীবন-যাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। 'দুরন্ত আশা' কবিতায় বলিতেছেন,—

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছে নিশিদিন,—

তাঁহার আকাঙ্ক্ষা,—

নিমেষ-তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন-উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি, রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।

কবির এই মনোভাব তাঁহার এক পত্রে ও পরে 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন,—

"এসব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না—আজকাল বসে বসে আওড়াই—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।' বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা। ইচ্ছা করে দিনরাত্রি বিচার-আচার বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর-মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না করে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ-লাভ করি। মনের সমস্ত বাসনা-ভাবনা ভালোই হোক, মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসংকোচ এবং প্রশস্ত যেন হয়—প্রথার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের কোনোরকম অহর্নিশি খিটিমিটি না ঘটে। একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলভাবে ছাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্‌বিদিকে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বাহিয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম!"—ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ৩১এ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯২। ১৩৭ পৃষ্ঠা

"নিশ্চেষ্টতায় মানুষ আপনার পরিচয় পায় না; সে বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। তখন যে সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইযাছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবা-বিমুখ যে স্বদেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আমার মন কোনো মতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত; আমার প্রাণ বলিত—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।'।"—জীবনস্মৃতি, ২১২ পৃষ্ঠা

ক্ষুদ্র, রুদ্ধ গণ্ডীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া সুখ-দুঃখময় পরিপূর্ণ জীবনের বিচিত্র আস্বাদের জন্য কবির চিত্ত ব্যাকুল।

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন,—

"আমাদের দেশের চারিদিকের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র পরিবেষ্টন, ক্ষুদ্র কাজকর্ম কবিকে তখন বড়োই আঘাত দিতেছিল। নিজেরও কেবল অনুভূতিময় জীবনের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া থাকিবার জন্য একটা আপনার সঙ্গে আপনার সংগ্রাম চলিতেছিল—খুব একটা বড়ো ক্ষেত্রে আপনার সুখদুঃখের বিরাট প্রকাশ দেখিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—'দুরন্ত আশা' কবিতাটি হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।"—রবীন্দ্রনাথ

হতাশার কুয়াসায় আচ্ছন্ন, জড়তার হিম-শীতল বন্ধনে জর্জরিত, অন্তঃসারহীন বাঙালী-সমাজের অচল অবস্থার কথা কবির কাব্যে বিদ্রূপ ও বেদনায় প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই নিরন্তর নৈরাশ্যের গান গাহিতে গাহিতে কবির চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কোনো আশার আলো দেখিতেছেন না; কোনো কর্মময় সবল জীবনের আহ্বান তাঁহার নিকট পৌঁছায় না। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ জীবনের নিশ্চেষ্টতা ও আরাম যেন তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। প্রেম-ধূপ-সুরভিত গৃহ-মন্দিরের মনোহর মোহে কবি অবশদেহ হইয়া পড়িয়াছেন। 'ভৈরবী গান' কবিতায় এই ভাবের আভাস পাওয়া যায়।

'ভৈরবী গান', কবিতাটি মানসীর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা। ইহার একটু বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা একান্তভাবে সংগীতপ্রাণ। তাঁহার কাব্যে ভাবের অন্তরালে যে এক অনির্বচনীয় সুরলোক সৃষ্টি হয়, তাহার সহযোগিতায় ভাবের চরম আবেদন পাঠকচিত্তে অব্যর্থভাবে সংক্রামিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কেবল উৎকৃষ্ট কথাকারই নন, উৎকৃষ্ট সুরবেত্তা ও সুরকারও। ভাব সুরে কি মূর্তি গ্রহণ করিবে, কবির মনে পূর্বেই তাহার রেখাপাত হয় এবং তাহার সংকেতও তাঁহার কাব্যে প্রকাশ লাভ করে। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে যে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, তাহার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে কবির জ্ঞান ছিল অসাধারণ। প্রকৃতির রাজ্যে যখন যে-ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, এই রাগ-রাগিণীগুলি তাহার বাণীবাহক—সংকেতদাতা। এইরূপে এই রাগ-রাগিণীগুলি প্রাচীন ভারতীয় মানসে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহাদের বিশিষ্ট রূপও পরিকল্পিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার যথার্থ মর্ম বুঝিতেন এবং তাঁহার কাব্যে এক-একটি ভাবপ্রকাশের জন্য এইসব রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দ্বারা ভাবেব বিশিষ্ট স্বরূপটি প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যে ইহার দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর—

"পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে।" [দিনশেষে, চিত্রা]

"ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।" [বর্ষামঙ্গল, কল্পনা]

"বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।"
[লীলাসঙ্গিনী, পূরবী]

"উৎসবের বাঁশিখানি কেন-যে কে জানে,.
ভরেছে দিনান্তবেলা ক্লান্ত মুলতানে।" [নববধূ, মহুয়া]

"এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।" [সুন্দর, পুনশ্চ]

মর্মগত ভাবকে সংকেতে প্রকাশ করিবার জন্য কবি এই কবিতাটির নামকরণই করিয়াছেন 'ভৈরবী গান'। এই কবিতাটি যেন ভৈরবী রাগিণীতে গাওয়া একটি গান। ভৈরবী রাগিণী নৈরাশ্য, বিষাদ, বেদনা, বৈরাগ্য প্রভৃতির ভাবব্যঞ্জক। ইহা সকালবেলাকার ধরণীর মর্মোচ্ছ্বাস। এই রাগিণীর মূর্ত প্রকাশরূপে রবীন্দ্রনাথ একটি বিষণ্ণ উদাসিনী নারীমূর্তির কল্পনা করিয়াছেন। সে যেন প্রভাতের অন্তরে বসিয়া করুণ রাগিণী আলাপ করিতেছে।

ভৈরবী রাগিণী মানুষের চিত্তে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন 'ছিন্নপত্রাবলী'র কয়েকটি পত্রে,—

"ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তা বোধ হয় জানিস—মনে হয় একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণবেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গভীর কাতর করুণরাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে—সকাল বেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালারা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—অর্থাৎ, দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছল্‌ছল্‌ করে চেয়ে আছে।" [ছিন্নপত্রাবলী, নং ৪]

"আজ সকালে একটা সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে সে আর কী বলব—আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তরনিরুদ্ধ আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল—বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর।" [ছিন্নপত্রাবলী, নং ৬৬]

"কানে যখন বারংবার ভৈরবীর অত্যন্ত করুণ মিনতির খোঁচ লাগতে থাকে, তখন আকাশের মধ্যে, রৌদ্রের মধ্যে, একটা প্রকাণ্ড বৈরাগ্য ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগ-শোক-কাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি—ভৈরব রাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে।" [ছিন্নপত্রাবলী, নং ১১৭]

এই কবিতাটিতে একটা কর্মহীন, অলস, আরামপ্রিয়, স্বপ্নালু জীবন হইতে কঠোর কর্মময় ও দুঃখসংকটময় জীবনে যাত্রার জন্য সংকল্পের ইঙ্গিত আছে। ইহার মূল বক্তব্য এই যে, কর্মকুণ্ঠা, আরামপ্রিয়তা ও স্বপ্নবিলাসের মোহময় নাগপাশজড়িত হইয়া এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া ক্রমাগত নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভৈরবী গান গাহিলে কোনো মহৎ কার্য সম্পাদন করা যায় না, জীবনকে কোনো মহৎ আদর্শের দিকে পরিচালিত করা যায় না। কবি-জীবনের এই স্তরে কবির এই মনোভাবের মূল উৎস কোথায় এবং কোন পরিবেশের প্রতিক্রিয়া সে সম্বন্ধে একটু ধারণার প্রয়োজন। অবশ্য বাহিরের ঘটনা কেবল তাঁহার আবেগকে স্পর্শ করে মাত্র, কবি অন্তরের প্রেরণাতেই তাঁহার নিজস্ব ভাবানুভূতির পথে অগ্রসর হন, উপলক্ষ্য পিছনে পড়িয়া থাকে, ইহা আমরা অনেক কবিতায় দেখিয়াছি। 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে', 'কল্পনা'র 'অশেষ' প্রভৃতি কবিতা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সমসাময়িককালে হিন্দু সমাজের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিন্দুর সমস্ত আচার-ব্যবহার-সংস্কার যে অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ মত প্রচার করেন। বাল্যবিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব, হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা ও উচ্চ আদর্শ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহারা প্রবন্ধ লেখেন ও বক্তৃতা করেন। এই দলের প্রধান নেতা ছিলেন সুলেখক চন্দ্রনাথ বসু। বঙ্কিমচন্দ্রও এই মতবাদ সমর্থন করিতেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এই সব প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দ্বারা সমস্ত প্রগতিমূলক কার্য বন্ধ হওয়ার আশংকায় রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ আঘাত লাগে। 'রবীন্দ্র-জীবনী'-কার বলেন—"ইঁহারা এককালে বাংলার যুবমনকে প্রগতির পথে পরিচালনা করিয়াছিলেন, বিপ্লবের বাণী তাঁহারাই শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু কালে ইঁহারাই প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া প্রগতির খরস্রোতোধারায় শাস্ত্রের আবর্জনা পুঞ্জীভূত করিয়া বাঙালীর সহজ গতিবেগকে প্রতিহত করিলেন, তাঁহাদের জীবনে আদর্শের এমন জীবন্ত সমাধি দেখিয়া কবি বড়ই দুঃখে বলিয়াছিলেন তাঁহার 'পরিত্যক্ত' কবিতায়,—

"মনে আছে, সেই প্রথম বয়স,
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।...
কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা!
আজিকে বন্ধু, তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা!...
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলিছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি?"

বাংলাদেশের সমস্ত প্রগতি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়া বাঙালী সমাজকে স্থবির ও নিরুদ্যম করিয়াছে। এই গোঁড়ামি ও শাস্ত্রাচারের বন্ধনে জর্জরিত বাঙালী-সমাজকে কবি এই যুগে বিদ্রূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য যেন তাঁহার চিত্তকে গ্রাস করিয়াছে। বাঙালীর চিরন্তন আলস্য, কর্মকুণ্ঠা ও স্বপ্নালুতা নিজের অনুভূতিশীল হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া তাহার

একটি জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন এই কবিতায়। আমরা বাঙালী গৃহসুখের জন্য একান্ত লালায়িত, শান্ত, নিভৃত ছায়ায়-ঢাকা কুটীরে বসিয়া বিচিত্র স্বপ্নজালরচনায় পটু, স্বল্পে সন্তুষ্ট এবং পারিবারিক স্নেহ-প্রেমের জন্য একান্ত তৃষাতুর। আঘাত-সংঘাতময় পথে, সংকটময় কর্মজীবনে আমরা অগ্রসর হইতে ভীত। আর যদিও বা আমরা কোনোমতে সে পথে অগ্রসর হই, শেষ পর্যন্ত আমরা জীবন-যৌবন ক্ষণস্থায়ী এবং এই অনিশ্চিত সংশয়াচ্ছন্ন পথে চলা অবিবেচকের কার্য মনে করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হই। এই নিরুপদ্রব, স্বপ্নময়, স্নেহশীতল, কীর্তিহীন, পৌরুষহীন, শান্তি-সুখের জীবন ত্যাগ করিয়া আঘাতময় বৃহত্তর জীবনকে বরণ করিয়া লইবার জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা,—

যাব আজীবন কাল পাষাণ কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে।

'ভৈরবী গান' কবিতায় কবি-প্রেরণার সর্বাঙ্গীণ ভারসাম্য নাই; ইহা একটি অখণ্ড রসপরিণতি লাভ করে নাই। প্রথম অংশে স্বপ্নময়, অলস জীবনের চমৎকার একটি কবিত্বময় চিত্র অতি দীর্ঘ করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভৈরবী রাগিণীর মোচড়গুলি এক অপূর্ব রস সৃষ্টি করিয়াছে সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় অংশে মহাজনের পন্থা অবলম্বন করিয়া কঠোর কর্মজগতে প্রবেশ করিবার সংকল্পটি অতি সংক্ষিপ্ত, আবেগ-উত্তাপহীন এবং নিষ্প্রভ। করুণ সংগীতের উপভোগ্য রসাবেশটুকু শেষে একটা সুস্পষ্ট নীতি-বাক্যের ধাক্কায় যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতারও প্রত্যাসন্ন উদ্দীপনার কারণ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসী মাটাবিলিদের উপর ইংরেজ বণিকদের যে অত্যাচার-উৎপীড়ন চলিতেছিল, তাহার কিছু কিছু বিবরণ ইংরেজী 'Truth' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহাই পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহারই প্রকাশ হইয়াছে এই কবিতাটিতে। এই কবিতাতেও নিজের দায়িত্বহীন, স্বপ্নময় কবি-জীবনের উপর প্রথমে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে, —

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।

তারপর কবি তাঁহার কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন,—

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
কবি তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।

ইহার পরবর্তী স্তরে কবি অত্যাচার-অবিচার প্রতিকারের জন্য বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া আদর্শ জগতে উপনীত হইয়াছেন এবং বিশ্বপ্রেম ও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই সমস্যার মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

কী গাহিবে, কী শুনাবে!। বলো, মিথ্যা আপনার সুখ
মিথ্যা আপনার দুঃখ।। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করিনা শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কল্পনার 'অশেষ' কবিতাতেও কবি নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যচর্চা ও রসসম্ভোগের জীবন ছাড়িয়া, ত্যাগ ও তপস্যার পথে, দুঃখবেদনাময় কর্মজীবনে নামিবার জন্য, তাঁহার জীবন-দেবতার আহ্বান হৃদয়ের অনিবার্য প্রেরণারূপে অনুভব করিতেছেন। তাঁহার শ্রান্ত, ক্লান্ত জীবনে তিনি বিশ্রামপ্রার্থী,—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল-খসা
হাতে দীপশিখা—
দিনের কল্লোল-'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর,
ঘন যবনিকা।

ও পারের কালো কূলে কালি ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমির তলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে—
নাহি পায় সীমা।
নয়ন পল্লব-'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে,
থেমে যায় গান,
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি সম—
এখনো আহ্বান ?…
'রহিল রহিল তবে— আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যা দীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে-গাঁথা মালা।
খেয়াতরী যাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে
ও পারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে পড়ে যাক খসি'
কুটিরের বামে।
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ—
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান॥

কিন্তু সেই আহ্বানে কবি সাড়া দিয়া দুঃখ-বেদনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে ত্যাগ ও তপস্যার পথে যাত্রা করিবেন এবং তাঁহার বিশ্বাস, এই নূতন কর্তব্য-সম্পাদনে তিনি সফলতা লাভ করিবেন।—

হবে, হবে, হবে জয়— হে দেবী, করিনে ভয়
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা—
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না।

'ভৈরবী গান'-এর মতো এই দুইটি কবিতাতেও কবির ভাবানুভূতি একটা আসন্ন প্রেরণার উদ্বেলিত হইয়া বর্তমান অবস্থা হইতে ভবিষ্যৎ আদর্শান্বিত কর্তব্যপথে

১৫

অগ্রসর হইয়াছে। তিনটি কবিতাতেই ভাবের কেন্দ্রসংহতি—যাহা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার সর্বপ্রধান লক্ষণ, তাহা সম্পন্ন হয় নাই; ভাবানুভূতি অসমানভাবে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সেজন্য সামগ্রিক রসপরিণাম ব্যাহত হইয়াছে।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'ভৈরবী গান'-এর উপর Tennyson-এর 'Lotos Eaters' কবিতার Choric Song-এর ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। 'ভৈরবী গান'-এর প্রথম অংশে এই প্রভাবের কিছু অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তবে সে-প্রভাব খুব সামান্য। স্থান-কাল-পাত্র পরিবেশের যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় সে-সাদৃশ্য মনে রেখাপাত করে না। এই স্বপ্নালুতা, এই দ্বন্দ্বসংঘাতোত্তীর্ণ শান্তিকামনা রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাব ও নিজস্ব মানসিকতার মধ্যেই লালিত। প্রকৃতির অন্তরালের বিষাদকরুণ রাগিণী ও তাহার স্বপ্নালস মাধুর্য কবিকে চিরকালই আকর্ষণ করিয়াছে। এই সময়ের কিছু পরের একটা পত্রে কবি বলিতেছেন,—

"আমি বসে বসে ভাবছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদদুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে? তার কারণ এই মনে হল, আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে—আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, এর মধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়—মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়া নৌকার মত পারাপার হচ্ছে, তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যাচ্ছে, এই সংসারের হাটে ছোটো-খাটো সুখদুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়—কিন্তু এই অনন্তপ্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু-আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল কাতরতাপূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্যপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারই তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সতত সচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে হয়ে যেতে হয়। 'ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান তরুমর্মর পবনে' ইত্যাদি।"

'ভৈরবী গান' এর এই অংশটিতে পল্লবিত ভাষণ, আনুপূর্বিক শৃঙ্খলাহীনতা ও সচেতন অলংকরণের প্রয়াস থাকিলেও কাব্যাংশে বিশেষ উপভোগ্য।

কবিতাটির ভাববস্তু এইরূপ: ভৈরবী-রাগিণীর মোহময় প্রভাবে কবি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মনে হইতেছে, প্রভাত-প্রকৃতির মধ্যে বসিয়া এক উদাসিনী যেন ভৈরবী-রাগিণী আলাপ করিতেছে। তাঁহার তরুণ হৃদয় ঘরছাড়া, বিবাগী। ঐ গানের ভাষাহীন সুর চিত্তে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে, জীবন বিকল করিয়া

দেয়; স্নেহপ্রেমের এক অনিবার্য আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া বাস্তব জীবনে কর্তব্যপথে চলিবার বাধা সৃষ্টি করে। জীবন মনে হয় আশাশূন্য ও বিফল।

জীবন-পথে চলিবার সময় গৃহের স্নেহ-প্রেমের স্মৃতি কবিকে ব্যাকুল করে। প্রিয়তমার সজল নয়ন ও বিপর্যস্ত কেশ-বাস স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে। এই সংকটময় কর্মজীবন সাহারা মরুভূমির মতো নীরস মনে হয়,—ইহা যেন এক দৈত্যের মায়াপুরীর মতো বিভীষিকাময়।

কবির ইচ্ছা হয়, সারাদিন তিনি ছায়ায় বসিয়া তরুর মর্মরধ্বনি এবং মুকুলিত বকুলকুঞ্জে বসিয়া কোকিলের বিরহ-জাগানো কুহুধ্বনি শ্রবণ করেন। চিরকল্লোলময়ী গঙ্গার তীরে বসিয়া বালক-বালিকার খেলা দেখিতে দেখিতে স্বপ্নের আবেশে তাঁহা সারা দেহমন আবিষ্ট হইয়া যায়!

'ভৈবরী গান' অতৃপ্ত বাসনার বেদনা ও জীবনের অসাফল্যই ব্যঞ্জনা করে। ইহা অশ্রুসজল করুণ সুরে কেবলই নিরাশার কথা ব্যক্ত করিয়া চলিবে—জীবন ব্যর্থ, অর্থহীন, সংসার অনিত্য ও মায়া-মরীচিকা মাত্র। জীবনের সমস্ত গুরুদায়িত্বপূর্ণ অসমাপ্ত কাজগুলি কেহই সম্পাদন করিতে আগ্রহভরে ছুটিয়া আসিবে না। কর্মই যে জীবনের সফলতার উপায় এবং কর্ম আমাদের করিতেই হইবে এ বিষয়ে কেহই নিঃসংশয় নয়। আর কোন্‌টি সত্য কর্ম আর কোন্‌টি নয়, সে সম্বন্ধে কেহই নির্দিষ্ট মত দিতে পারে না। কাজ যদি করিতেই হয়, তবে সংসারে তো অসংখ্য কাজ আছে, একা কি সব কাজ করা সম্ভব? একবিন্দু শিশির কি সমগ্র জগতের তৃষ্ণা দূর করিতে পারে? তবে কেন একাকী একখানা ভাঙা নৌকায় চড়িয়া অকূল সমুদ্র পার হইতে যাইয়া বিপদাপন্ন হওয়া? হয়তো কর্মের মধ্যে ব্যাপৃত থাকার পর একদিন দেখা যাইবে যে, যৌবন বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো কবে ঝরিয়া পড়িয়াছে, বসন্তবায়ু বৃথাই দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। জগতের কোনই পরিবর্তন হয় নাই, কেবল তাঁহার জীবন ও যৌবনই বৃথা নষ্ট হইয়াছে।

কবি এখন কঠোর কর্তব্যপালনের জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন। ভৈরবীর কুহক-রাগিণী আর তাঁহার যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। এই নূতন কর্মজীবন আরম্ভ করিবার সময় প্রথম একবার তিনি ভগবানের নাম স্মরণ করিবেন, তারপর সর্বমানবের গুরু, মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই নব জীবনপথে অগ্রসর হইবেন।

যাহারা এতদিন আরাম ও আলস্যে জীবন যাপন করিয়া কর্মময় জীবন অবহেলা করিয়াছে, সেই দুর্বল ও ভীরুদেরও কবি এই নবীন জীবনের বাণী শুনাইবেন। এই সব ব্যক্তি নিজেদের মঙ্গল বুঝে না, আলস্য ও আরামপ্রিয়তা কাটাইয়া উঠিতে পারে

না, দূরের আলোর দিকে চাহিয়া আবিষ্ট-চিত্তে কেবল করুণ-মধুর রাগিণী গাহিয়া দিন কাটায় এবং সেই রোদনে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা উপভোগ করে।

এই অলস-মধুর কর্মবিমুখ জীবন-যাপন অপেক্ষা কর্মজীবনেব উত্তাপ ও নিষ্ঠুর আঘাত-সংঘাত সহ্য করা বাঞ্ছনীয়। কবি কঠোর কর্তব্যময় জীবন-পথে অগ্রসর হইবার সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন, যদি তাহাতে মৃত্যুও বরণ করিতে হয়, তবুও সেই বীরোচিত মৃত্যুতে তৃপ্তি আছে, আনন্দ আছে।

ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাবো আজীবনকাল পাষাণ-কঠিন সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে। (ভৈরবী গান)

(৩) মানসীব তৃতীয় ধারার কবিতায়, কবির কাব্যের বিরুদ্ধ সমালোচনায় তাঁহার মনে যে বেদনাময় অনুভূতিব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন', 'কবির প্রতি নিবেদন, 'পরিত্যক্ত, 'গুরুগোবিন্দ', 'নিষ্ফল উপহার' প্রভৃতি কবিতা এই পযায়ের অন্তর্ভুক্ত। হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ 'রাহু' ছদ্মনামে 'মিঠে-কড়া নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের কয়েকটি কবিতাব প্যারডি করিয়া এক ব্যঙ্গকাব্য প্রকাশ করেন। এই তীব্র বিদ্রূপে কবির মনে যথেষ্ট বেদনার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি সমালোচককে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপ ত্যাগ করিয়া প্রেমের আলোকে এ বিশ্বসংসারকে দেখিতে বলিতেছেন। গভীব ক্ষমা ও বিনয়ের সহিত বলিতেছেন,—

হউক ধন্য তোমার যশ,
লেখনী ধন্য হোক,
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে
জাগাক্ সপ্তলোক।
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই,—
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রূপ কেন ভাই। (নিন্দুকের প্রতি নিবেদন)

কবিব কাব্য তাঁহার বেদনার প্রতীকরূপে মর্মস্থান হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া

উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা বা অতিরঞ্জন নাই। সত্য অনুভূতির ইহা অকপট প্রকাশ। তাই তিনি বলিতেছেন,—

কত প্রাণপণ, দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,—
জানো কি বন্ধু, উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি?
রাঙা ফুল হয়ে উঠিছে ফুটিয়া
হৃদয়-শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মতো
পোহাইয়ে দুখ-রাত। (নিন্দুকের প্রতি নিবেদন)

এ সংসারের বিদ্রূপ-বিদ্বেষ দুদিনের। ঘৃণা বা বিদ্বেষ কাহাকেও অমর করে না, অমর করে প্রেম,—

ঘৃণা হ'লে মরে আপনার বিষে,
রহে না সে চিরদিন।
অমর হইতে চাহো যদি, জেনো,
প্রেম সে মরণহীন।
তুমিও রবে না, আমিও রবো না,
দু-দিনের দেখা ভবে—
প্রাণ খুলে প্রেম দিতে পারো যদি
তাহা চিরদিন রবে। (নিন্দুকের প্রতি নিবেদন)

মানুষ অপূর্ণ—দুর্বল। সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সে কখনো লাভ করিতে পারে না। তবুও যাহার যতটুকু শক্তি, তাহা দান না করিলে এ মানবজীবন তো একেবারে নিষ্ফল হইয়া যায়,—

দুর্বল মোরা, কত ভুল করি,
অপূর্ণ সব কাজ।
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে যা পারি তাও করিব না?
নিষ্ফল হব ভবে?
প্রেম-ফুল ফোটে, ছোটো হলো ব'লে
দিব না কি তাহা সবে? (নিন্দুকের প্রতি নিবেদন)

বৃদ্ধ বয়সে, খ্যাতি ও গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠিয়াও কবি সমালোচকদের আঘাতের বেদনা ভুলিতে পারেন নাই,—

"এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি।" (আত্মপরিচয়, ৯১ পৃষ্ঠা)

কবির জগৎ বাস্তব জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এ কঠিন বাস্তব-জগতে কবির স্বপ্নের স্থান নাই, গান নাই—আনন্দ-মধু নাই। কবি এ বাস্তব জগতে সাধারণের তাগিদে, তাহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য গান গাহিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এটা তাঁহার নিজস্ব জগৎ নয়। তাঁহার জগৎ কল্পনার কনক-অচলে—যেখানে প্রভাতে-সন্ধ্যায় নব নব রূপে, নব নব সুরে আকাশ ভরিয়া যায় —যেখানে অনন্ত ভালোবাসা, নব নব গান, নব নব আশা—যেখানে যশ-অপযশের বাণী প্রবেশ করিতে পারে না। তাই কবি এই দ্বেষ-হিংসা-কলুষিত, বাস্তব জগৎকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

হেথা, কবি, তোমারে কি সাজে
ধূলি আর কলরোল মাঝে? (কবির প্রতি নিবেদন)

'পরিত্যক্ত' কবিতাতেও কবির অত্যাচারিত মনোভাবের ও প্রতারিত নিষ্ফলতার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী সাহিত্যসেবী ও স্বদেশপ্রেমিকগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কবি একদিন তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই প্রভাবে তাঁহার নবজন্ম লাভ হইয়াছিল। তাঁহার—

ধন্য হইল মানব-জনম, ধন্য তরুণ প্রাণ,
মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়, জাগিল হর্ষ গান।

তিনিও দেশ-সেবা ব্রত গ্রহণ করিলেন,—

স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে কহিলাম জোড় করে,—
"এই লহ মাতঃ, এ চির-জীবন সঁপিনু তোমারি তরে।"

তার পর, নিন্দা-ঘৃণার সহস্র কণ্টকাকীর্ণ পথে কবির যাত্রা হইল সুরু। যাঁহারা পথ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন ফিরিয়া নির্মম পরিহাসে তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছেন। যাঁহারা চিরাচরিত প্রথাকে ভাঙিয়া নূতন প্রাণের বন্যা বহাইয়াছিলেন, তাঁহারাই আজ নিতান্ত সাবধানী ও প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া, কবির কার্যে বাধা দিতেছেন। তবুও কবি তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। তিনি বলিতেছেন,—

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা, আর কি ফিরিতে পারি।
শিখর গুহায় আর ফিরে যায় নদীর প্রবল বারি?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন, চলেছি আপন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ মৃত বরষের মাঝে।

যদিও,

মাঝে মাঝে শুধু শুনিতে পাইব, হা হা হা অট্টহাসি,
শ্রান্ত হৃদয়ে আঘাত করিবে নিঠুর বচন আসি।

তবুও কবি নির্ভীক,—

ভয় নাই যার কী করিবে তার
এই প্রতিকূল স্রোতে।
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা
তোমারি বাক্য হ'তে।

কবি মন দৃঢ় করিয়াছেন—সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা, সমস্ত বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার অন্তর-প্রেরণার আলোকে আলোকিত পথে যাত্রা করিবেন। 'গুরুগোবিন্দ' ও 'নিষ্ফল উপহার' কবিতা দুইটিতে শিখ-গুরুর যে সংযম ও আত্মত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কবির পরিবর্তিত মনোভাবের ফল। তিনি সংসারের সমস্ত নিন্দা-গ্লানি-দ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠিয়া নির্বিকার-চিত্তে নিজের সাধনায় মগ্ন হইতে চাহেন।

'গুরু গোবিন্দ' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা। গুরু গোবিন্দ সিংহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ঔরঙজেবের অনুদার ধর্মনীতির ফলে যখন অ-মুসলমান সম্প্রদায়গুলি উত্তর-ভারতে চরম নির্যাতিত হইতেছিল, সেই দুর্দিনে গোবিন্দের পিতা তেগবাহাদুর সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ঔরঙজেব শিখদের ধর্মমন্দির ধ্বংস করিবার এবং শিখগুরুর প্রধান কর্মচারীদের সমস্ত নগর হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেন। তেগবাহাদুর এই আদেশের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের হিন্দুদের উত্তেজিত করিয়া মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু পরাজিত ও বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলে তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়। তেগবাহাদুর ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া অশেষ নির্যাতনের মধ্যে ঔরঙজেবের আদেশে নিহত হন (১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে)।

পিতার মৃত্যুর পর গোবিন্দ গুরুপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি দশম ও শেষ গুরু। অতি তরুণ বয়স হইতেই গোবিন্দ তাঁহার গুরু-দায়িত্ব ও কঠোর কর্তব্যের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শিখজাতির ধর্ম রক্ষা করিতে হইলে, তাহাদের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, তাঁহাকে ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে হইবে। সেজন্য তিনি শিখজাতিকে একটি প্রবল শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে সামরিক কৌশল ও সামরিক পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন ও একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিতে আদেশ করিলেন। যে-কোনো উপায়েই হোক, স্বীয় ধর্ম ও স্বীয় জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেকে গুরুর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ করিল। গুরু গোবিন্দ কর্তৃক সংগঠিত, সামরিকশিক্ষাপ্রাপ্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিখসম্প্রদায়

'খালসা' নামে পরিচিত। নিজের ধর্মরক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জন দেওয়া প্রকৃত খালসার কর্ম। গোবিন্দ ইহাদের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা এবং খাদ্যসম্বন্ধে সমস্ত বাধানিষেধ দূর করেন। তাঁহারই আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় খালসা সম্প্রদায় দৃঢ়ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ, গুরুর প্রতি অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং ধর্মের জন্য যে-কোনো বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইল।

উত্তর-পাঞ্জাবের পার্বত্যপ্রদেশে গুরু গোবিন্দ দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে পার্বত্য-রাজাদের এবং সেই অঞ্চলে উপদ্রবকারী মুসলমান প্রধানদের সঙ্গে তাঁহাকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হয়। পাঞ্জাবের সমতলভূমি হইতে বহুলোক দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে। পার্বত্য-অঞ্চলে আনন্দপুর নামক সুরক্ষিত স্থানে তিনি বাস করিতেন। এইস্থানে তিনি বিরাট মোগলবাহিনী কর্তৃক পাঁচবার আক্রান্ত হন, কিন্তু চারবারই মোগলবাহিনী তাঁহার হস্তে পরাজিত হয়। শেষবারে গোবিন্দ তাঁহার পার্বত্যদুর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং চল্লিশজন অনুচরের সঙ্গে পাঞ্জাবের সমতলভূমিতে উপনীত হন। মোগলসৈন্যগণ সর্বদা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে থাকে। এক জাঠ-কৃষকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণকালে তাঁহার দুই পুত্র নিহত হয়। তাঁহার আর দুইটি পুত্রও সিরহিন্দের শাসনকর্তা কর্তৃক নিহত হয়। তারপর গোবিন্দ কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে ঔরংজেবের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি উত্তর ভারতে আসেন। তিনি বাহাদুর শাহের পক্ষাবলম্বন করেন এবং কামবক্সের বিরুদ্ধে গোলকুণ্ডা-অভিযানে তিনি বাহাদুর শাহের সঙ্গে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যান। গোবিন্দ হায়দ্রাবাদের একশত-পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী গোদাবরী-তীরে নন্দার নামক স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। সেখানে তাঁহার এক পাঠান অনুচরের দ্বারা তিনি ছুরিকাঘাতে নিহত হন (১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে)। এই প্রসঙ্গে 'কথা' কাব্যগ্রন্থের 'শেষ শিক্ষা' কবিতাটি পঠিতব্য।

ইহাই গুরু গোবিন্দ সিংহের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক জীবন। 'বিচিত্র নাটক' নামে গুরুমুখী ভাষায় গুরু গোবিন্দের দ্বারা লিখিত গ্রন্থখানি তাঁহার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কার্যাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। পরে এই পুস্তক 'দশম পাদশাহকা গ্রন্থ' নামে সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। গুরু গোবিন্দ কাহাকেও তাঁহার গুরুপদের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন নাই। শিখগণের নেতৃত্ব করিবার ভার কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর না দিয়া সমগ্র জাতির উপর অর্পণ করেন। তিনি একনায়কত্বের পরিবর্তে সামরিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ

বাণী—"যেখানে পাঁচজন শিখ একত্র হইবে, আমি তাহার মধ্যেই বর্তমান থাকিব।"

গুরু গোবিন্দ জীবনের প্রথম ভাগে হিমাচল প্রদেশে দীর্ঘদিন বাস করেন। এই পার্বত্য অঞ্চলে বাস উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথের 'গুরু গোবিন্দ' কবিতার নির্জনবাস কল্পিত হইতে পারে। গুরু গোবিন্দ যে আত্মশক্তিসঞ্চয়ের জন্য নির্জন স্থানে সাধনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা ছিল বদ্ধমূল। এই কবিতা রচনার পরবর্তীকালে রচিত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গুরু গোবিন্দ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"শিখদের শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া, নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন, তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্য বেগে অন্ধভাবে যে-আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে, সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে।"

('ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'রাজাপ্রজা')

ভারতের ইতিহাস ও কিংবদন্তী-আশ্রয়ে উদ্ভূত গৌরবময় গাথাগুলি রবীন্দ্রনাথ 'কথা' গ্রন্থে অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া কাব্যরূপ দিয়াছেন। ক্ষীণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর রচিত 'গুরু গোবিন্দ' গাথা-কাব্যের (Ballad) পর্যায়ে পড়িলেও ইহা একটা সার্থক গীতিকবিতা (Lyric)। ইহার মধ্যে ঘটনার চিত্র অপেক্ষা হৃদয়ের গভীর আবেগই মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেই গভীর আবেগ, অপূর্ব ভাষা, ব্যঞ্জনা ও চিত্ররূপের সাহায্যে অত্যুজ্জ্বল কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে।

এই কবিতাটিতে একটি বিশাল কর্মময়, সংগ্রামমুখর জীবনের ভাবচিত্র এবং উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক মহান জননেতার চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রতিকূল ঘটনার উদ্দাম স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সমস্ত বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া, ঝঞ্ঝা-বজ্র-মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া, অগণিত জনতাকে জাতীয়তা ও মহত্ত্বের বিপৎসংকুল পথে পরিচালিত করিবার একটা অনিবার্য প্রেরণা, উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও কঠোর সংকল্প এই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সঙ্গে এই কর্তব্যভার গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি, নির্জন তপস্যা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ এবং আত্মোন্নতি একান্ত আবশ্যক এবং এই উদ্দেশ্যে গুরুর সাধনার কথারও উল্লেখ আছে। কেবল

একটা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া সফলতা লাভ করা গুরু গোবিন্দের উদ্দেশ্য নয়। ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা আপন অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বিকাশসাধনে তিনি এক বৃহত্তম ও মহোত্তম জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবেন, সেই আদর্শে সমগ্র শিখজাতি এক অননুভূতপূর্ব জীবন-চেতনা লাভ করিয়া নববলে বলীয়ান হইবে—ইহাই শিখগুরুর আকাঙ্ক্ষা। তখন গুরু আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিতে পারিবেন,—

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

আর সমগ্র শিখজাতিও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিবে,—

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ—
নাই তার কাছে জীবন মরণ
নাই নাই আর কিছু।

গুরু গোবিন্দের সংকল্পের মধ্যে জাতি-সংগঠনের এক মহান আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে। শিখ জনসাধারণকে উচ্চ আদর্শ অনুসারে স্বার্থত্যাগমণ্ডিত কঠোর কর্মের পথে তিনি পরিচালিত করিবেন। এই আদর্শের সংকল্প উদ্দীপনাময় ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতায়। এই কবিতাটির মধ্যে 'দুরন্ত আশা'র কেবল লক্ষ্যহীন অফুরন্ত কর্মের উদ্দীপনাই প্রকাশ পায় নাই, কিংবা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার স্বার্থত্যাগ ও বিশ্বপ্রেমের বাণী প্রচার দ্বারা বাস্তব-জীবন সমস্যাকে এড়াইয়া অসীম ভাবলোকে প্রয়াণের চেষ্টা নাই; ইহাতে একটি বাস্তব সংকল্পকে ধৈর্য, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ত্যাগের দ্বারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা এবং একটি শক্তিশালী নির্যাতিত জাতিকে যথার্থ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কথা আছে। বিদেশী শাসকের হস্তে পরাধীন ভারতবাসীর লাঞ্ছনা কবিচিত্তে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা সঞ্চার করা স্বাভাবিক এবং তিনি হয়তো নিজের দেশের মুক্তির জন্য গুরু গোবিন্দের মতো একজন ত্যাগী, আদর্শনিষ্ঠ মহান্ নেতার কল্পনা করিয়াছিলেন।

কবিতাটির ভাববস্তু এইরূপ: পার্বত্য প্রদেশে, নিবিড় অরণ্যমধ্যে, গুরু গোবিন্দ নির্জনে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তিসঞ্চয়ের জন্য আত্মপ্রস্তুতির তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সেই নিভৃত স্থান হইতে বাহির হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শিখজাতিকে নূতন করিয়া গঠন করিবার ভার লইবার জন্য তাঁহার অনুচরগণ

তাঁহাকে আহ্বান করিতে গিয়াছিল। কর্মভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সময় আসে নাই বলিয়া গোবিন্দ সেই অনুচরদিগকে ফিরাইয়া দিলেন।

কর্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রতিক্ষণ প্রাণের তলে গুরু গোবিন্দ যে কী অদম্য প্রেরণা অনুভব করিতেছেন, তাহাই অনুচরদের কাছে বিবৃত করিতেছেন।

অনুচরদের দেখিয়া গুরু গোবিন্দের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ; তাঁহার ধমনীতে উষ্ণরক্তধারা বেগে প্রবাহিত হইতেছে, কোষবদ্ধ তরবারি যেন অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য নিষ্কাশিত হইতে ব্যগ্র। এই নিভৃতবাস ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হইয়া অত্যাচারী রাজা ও তাহার রাজ্য ধ্বংস করিয়া ন্যায় ও সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার কী অপরিসীম আনন্দ !

অন্ধ, ক্রূর ভাগ্য এতদিন শিখজাতিকে দলিত-পিষ্ট করিয়াছে এবং তাহারাও ইহাকে বিবিধ অলঙ্ঘ্য বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু গুরু গোবিন্দ নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, সেই প্রতিকূল ভাগ্যকে বশীভূত করিয়া তাহার গতি ফিরাইতে চাহেন। তিনি কল্পনানেত্রে দেখিতেছেন—তাঁহার দুর্বার অগ্রগমনের বেগে সমস্ত বাধা-বিপত্তি ছিন্নভিন্ন হইতেছে, বাধাপ্রদানকারীরা কেহ ভয়ে তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিতেছে, কেহ পরাজয় স্বীকার করিতেছে, পৃথিবীর বুকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে প্রলয়ের আগুন, মৃত্যু তাহার শত শত লোল জিহ্বা প্রসারিত করিতেছে, কিন্তু গুরু গোবিন্দ এই বাধা-বিঘ্ন, প্রলয়-মৃত্যু অতিক্রম করিয়া তাঁহার গন্তব্যপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হইতেছেন। অগণিত জনসাধারণ তাঁহার আহ্বানে পথের দুইধারে ভিড় করিয়াছে, তিনি তাহাদের পরিচালিত করিয়া লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছেন।

নানা উত্থান-পতন, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে,—কখনো আসিবে উজ্জ্বল দিন, কখনো অমানিশার অন্ধকার, কখনো বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝটিকার নিষ্ঠুর আঘাত ; কিন্তু তিনি তাঁহার গন্তব্যপথে অটল, অচঞ্চলভাবে অগ্রসর হইবেন। তাঁহার আহ্বানে ক্ষুদ্র সুখশান্তির মোহ ত্যাগ করিয়া শত শত লোক ছুটিয়া আসিবে এবং সারা পাঞ্জাব নবজাগরণের কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিবে। তাঁহার আমোঘ আহ্বানে সকলে জাতিভেদ ও আভিজাত্য গর্ব ভুলিয়া, ব্রাহ্মণ ও জাঠ একত্র হইয়া, এক অমিততেজা খালসা-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিবে।

কিন্তু গুরু গোবিন্দের এই স্বপ্ন সফল করিবার সময় এখনো আসে নাই। এখনো অরুণোদয়-প্রত্যাশায় দীর্ঘ রাত্রি যাপন কবিতে হইবে, এখনো আত্মপ্রস্তুতির নীরব সাধনায় কাল কাটাইতে হইবে।

সাধনার শেষে গুরু যখন আত্মশক্তি উদ্বোধনের দ্বারা আপন জীবনের পূর্ণতা লাভ করিবেন, তখনই তিনি বাহির হইয়া আসিয়া ঘোষণা করিবেন যে, তাঁহার

সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি সত্য পথ লাভ করিয়াছেন, এখন গুরুর পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ গ্রহণ করিয়া শিখজাতি নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক।

গুরু গোবিন্দ তাঁহার অন্তরের মধ্যে যেন দৈববাণী শুনিতে পাইতেছেন,—'অন্তরের আলোকদীপ্ত পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হও, অগণ্য লোক তোমার নেতৃত্বে পরিচালিত হইবার জন্য দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে, নিষ্কম্প ও অনির্বাণ দীপের মতো তোমার অন্তর-প্রদীপ জ্বালাইয়া জাগিয়া থাক, তুমি অতন্দ্র থাকিয়া আলো না দেখাইলে এই লাঞ্ছিত, প্রতিকারকামী জনগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে।'

গুরু গোবিন্দ বুঝিতেছেন—দিগন্তে প্রলয়মেঘ জমিয়াছে, এখনই জীবনধ্বংসী ঝড় উঠিবে। তিনি সেই ঘোর দুর্দিনের জন্য তাঁহার মনোমন্দিরে এমন অনির্বাণ ও চির-ভাস্বর আলো জ্বালাইয়া রাখিবেন যাহা কোনো দুর্যোগের ঝটিকাই নিবাইতে পারিবে না।

সুতরাং তাঁহার অনুচরেরা গুরুর উচ্চ আদর্শ, জাতি-সংগঠনের আকাঙ্ক্ষা, নৈতিক ও আত্মিক শক্তির উপর আস্থা রাখিয়া বর্তমানে চলিয়া যাইতে পারে।

(৪) মানসীর চতুর্থ ধারার কবিতায় প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও সংগীত রবীন্দ্রনাথের প্রাণে যে ভাবাবেগ তরঙ্গায়িত করিয়াছে, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির চিরপ্রবাহিত প্রাণধারার বিচিত্র লীলা চিরদিনই কবির কাব্যপ্রেরণার বেগবান উৎস। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ, ষড়্ঋতুর লীলাবৈচিত্র্য চিরকালই কবি-হৃদয়কে নিবিড় রসমাধুর্যে আপ্লুত করিয়াছে। বর্ষা-ঋতুর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য, তাহার অন্তর্নিহিত নিবিড় ভাব-সম্পদ, তাহার মর্মের চিরন্তন বিরহবাণী কবির কাব্যে বিস্ময়কর রূপ পাইয়াছে। কবির কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট অংশই তাঁহার বর্ষা সম্বন্ধে গান ও কবিতা। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-কাব্যের উপর কালিদাস ও বৈষ্ণব-পদাবলীর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। Keats সম্বন্ধে Leigh Hunt একটি কথা বলিয়াছেন, "He never beheld the oak tree without seeing the Dryad." রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধেও এ-কথা বলা যায়, তাঁহার বর্ষা সম্বন্ধে এমন গান বা কবিতা কমই আছে, যেখানে কালিদাসের মেঘদূতের চিত্রাবলী বা রাধিকার বিরহ ও অভিসারের ছায়াপাত না হইয়াছে। বর্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত গান ও কবিতা মেঘদূতের যক্ষ-যক্ষিণীর ও রাধিকার বিরহের অমৃত-নির্যাসের মনোহর সৌরভে অনুবাসিত। সেই সৌরভ এমন সূক্ষ্মভাবে তাঁহার বর্ষা-কাব্য ঘিরিয়া আছে যে উহা কাব্যের রমণীয়তা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া রচনার নিজস্ব অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

'একাল ও সেকাল', 'বর্ষার দিনে', 'আকাঙ্ক্ষা', 'মেঘদূত' বর্ষা-ঋতুকে অবলম্বন

করিয়া লেখা; 'কুহুধ্বনি' বসন্তের ভাববাণী; 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'প্রকৃতির', 'প্রতি', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' প্রভৃতি প্রকৃতির রুদ্র ও রহস্যময় ভাবের প্রকাশক। 'অহল্যা' বিশ্বপ্রকৃতির কন্যা। এ সমস্ত কবিতাই প্রকৃতি-বিষয়ক। কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্যে যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার রুদ্র-মূর্তি, রহস্যময়তা ও নিষ্ঠুরতাও তাঁহার চিত্তকে সেইরূপ অলোড়িত করিয়াছে।

'একাল ও সেকাল' কবিতার কবি বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ ও সজল ছায়াচ্ছন্ন দিক্‌চক্রবাল নিরীক্ষণ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের বর্ষা-বিরহ-বিধুর প্রণয়িনীগণের অমর ছবি মানসনেত্রে দেখিয়াছেন। তপনহীন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা-দিনে রাধিকার প্রাণে অসহ্য বিরহ-বেদনা উথলিয়া উঠিয়াছে, তিনি দিবাভাগেই প্রিয়মিলনোদ্দেশ্যে অভিসারে চলিয়াছেন। বর্ষাসমাগমে যে সমস্ত প্রণয়ীরা প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিতেছে, তাহাদের বিরহ-কাতরা প্রণয়িনীগণ তাহাদের আগমন-পথের দিকে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় নির্নিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছে। মেঘমল্লার রাগে কোনো প্রতিবেশীর সংগীত-আলাপনে বর্ষার অন্তর্গূঢ় ঘনীভূত বিরহ যেন নির্দয় তীরের মতো তাহাদের বুকে বিঁধিতেছে। কবির কল্পনা-নেত্রে উদ্ভাসিত হইতেছে অলকাপুরে বিরহিণী যক্ষপত্নীর চিত্র। বিরহ-বিধুর যক্ষপত্নী সমস্ত প্রসাধন ত্যাগ করিয়া রুক্ষ-অলকে, মলিন বস্ত্রে, কোলের উপর বীণা লইয়া প্রিয়তমের নামাঙ্কিত সংগীত গাহিতেছে। কবির নিকট বৈষ্ণব-পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ ও কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষ ও যক্ষপত্নী প্রেম ও বিরহ-বেদনার চিরন্তন প্রতীক। সেই বৃন্দাবন ও অলকাপুরী মানুষের মনে চিরকালের জন্য বিরাজ করিতেছে। শরতের রাসপূর্ণিমা-রজনীতে ও শ্রাবণ-রাত্রির ঘনবর্ষণে এখনো মানব-হৃদয় বিরহ-বেদনায় মথিত হইয়া উঠে। এখনো মিলন-সংকেতরূপ বংশীধ্বনি বিরহী-চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করে এবং মন-বৃন্দাবনবাসী প্রেমিকা প্রিয়-মিলনের জন্য অধীর হয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা ও যক্ষ-দম্পতির বিরহ-ব্যথা পুরাতন হইলেও নিত্যনবীন,—এই বর্তমান যুগের প্রেমিক-প্রেমিকারাও তাহাদের মর্মবেদনা নিজেদের অন্তর দিয়া অনুভব করিয়া থাকে।

পৌরাণিক ও প্রাচীন যুগ হইতে একাল পর্যন্ত মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের বিশেষ কোনো রূপান্তর হয় নাই। দেশকালের পরিবর্তনে নরনারীর অন্তরতম সত্তার পরিবর্তন হয় না। মানুষের সুখ-দুঃখ, কাম-প্রেম, দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি সহজাত বৃত্তিগুলি চিরন্তন মানব-প্রকৃতির অঙ্গ। পূর্বের যুগে সেগুলি মূলত যেমন যেমন ছিল, বর্তমানেও তাহাই আছে এবং ভবিষ্যতেও লুপ্ত হইবে না। একালের প্রেমিকারাও সেকালের প্রেমিকাদের মতো বর্ষাসমাগমে ও শারদ-নিশিতে বিরহ-বেদনা অনুভব করে এবং প্রিয়-মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়।

বর্ষার বহু-বিচিত্র রূপ ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাব, এই ঋতুর বাহিরের মূর্তি-বৈভব ও অন্তরের রস-প্রাচুর্য, ইহার রোমান্টিক ভাবালুতা ও গূঢ় স্বপ্ন-ব্যঞ্জনা এমন করিয়া জগতের আর কোনো কবি সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত করেন নাই।

ভারতীয় কাব্যে আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণে আমরা সর্বপ্রথম বর্ষার চিত্র দেখি। তাহার মধ্যে বর্ষাপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য, বর্ষার ফুলফল, পশুপক্ষীর বর্ণনাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার মধ্যে আমরা যতটা পাই বর্ষার বহির্দৃশ্যে কবির পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও সৌন্দর্য-অনুভূতিতে কবি-প্রাণের উল্লাস-মুখরতা, ততটা পাই না বর্ষার অন্তরের বাণীকে, তাহার অন্তর্নিহিত রহস্যময় [illegible] বাল্মীকি বর্ষার আকাশ বর্ণনা করিতেছেন,—আকাশ কখনো পরিষ্কার, কখনো মেঘলিপ্ত, কখনো শান্ত সমুদ্রের মতো,—

> ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
> ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বতসন্নিরুদ্ধং রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য ॥

অবিরল বর্ষণে আকাশের রূপ, ধরণীর প্রাচুর্য, হস্তী, ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্যগীত প্রভৃতিই বর্ণনা করিয়াছেন কবি সাড়ম্বরে,—

> ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা ন ভাস্করোদর্শনমভ্যুপৈতি।
> নবৈর্জলৌঘৈর্ধরনী বিতৃপ্তা তমোবলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশঃ ॥
> মত্তা গজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রা বনেষু বিক্রান্ততরা মৃগেন্দ্রা।
> রম্যা নগেন্দ্রা নিভৃতা নরেন্দ্রা প্রক্রীড়িতো বারিধরৈঃ সুরেন্দ্রঃ।
> বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
> নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তা প্রিয়াবিহীনা শিখিনঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥

কালিদাসের কাব্য মেঘদূতেই প্রথম আমরা বর্ষার অন্তর্লোকে প্রবেশ করি, বর্ষার সঙ্গে যে মানুষের অন্তরের বন্ধন আছে, সেকথা জানিতে পারি, মানুষের জীবনে বর্ষার প্রভাব অনুভব করি। কালিদাস বর্ষা-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য যেমন বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি বর্ষা কেমন করিয়া আমাদের চিত্তকে নূতন ভাবাবেগে আকুল করিয়া তোলে তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাসের কাছে বর্ষা বা মেঘ কেবল ঋতু নয়, ঋতু-পুরুষ। রামগিরিতে নির্বাসিত যক্ষ কুটজ-কুসুমে মেঘের জন্য অর্ঘ রচনা করিয়াছে, তাহার গুণগান করিয়াছে, সন্তপ্তের শরণ মেঘকে দিয়া দূর অলকাপুরীতে প্রিয়ার নিকট বার্তা প্রেরণ করিয়াছে। প্রকৃতি-হৃদয় ও মানব-হৃদয়ের মধ্যে যে একটা গভীর সহানুভূতির বন্ধন আছে তাহা আমরা কালিদাসের কাব্য হইতেই জানিতে পারি।

কালিদাসের পর হইতে বর্ষায় যে নরনারীর বিরহ-বেদনা জাগে, স্ত্রী-পুরুষ

মিলনের জন্য একান্ত উৎসুক হয়, রাত্রির অন্ধকার ও দুর্যোগের আবহাওয়ার মধ্যে যে তাহারা অভিসারে গমন করে, এই ভাবটি বহু সংস্কৃত কবি তাঁহাদের রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে সংস্কৃত প্রকীর্ণ খণ্ড কবিতায় বর্ষায় বিরহী-বিরহিণীদের বিরহ-বেদনার অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়। কালিদাস ও এইসব কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বৈষ্ণব কবিগণ বর্ষায় রাধাকৃষ্ণের মিলনোৎকণ্ঠা, প্রবল বর্ষণ, বজ্রগর্জন ও মুহুর্মুহু বিদ্যুৎচমকের মধ্যে রাধিকার প্রিয়মিলনের জন্য ব্যাকুল অভিসার মর্মস্পর্শী ভাবাবেগের সঙ্গে পদাবলীর মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। পদাবলী-সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই রাধিকার বর্ষাভিসার।

একটি পদ—

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
হমারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥ (রায়শেখর)

আর একটি—

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর-ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব-সিন্ধু॥
অব জনি সজনী করহ বিচার।
শুভখণ ভেল পহিল অভিসার॥ (গোবিন্দদাস)

অন্য একটি—

কাজলে সাজলি রাতি ঘন ভৈ বরিষয়ে জলধর-পাঁতি।
বরিষ পয়োধরধার……
দূরপথ গমন কঠিন অভিসার॥
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।
(বিদ্যাপতি)

অপর একটি—

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ ব্যাপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥ (জ্ঞানদাস)

রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকাব্যকে অপরূপ সৌন্দর্য ও লোকত্তর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করিয়াছেন। বর্ষা-ঋতুর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য, তাহার অন্তর-নিহিত নিবিড় ভাব-সম্পদ তাহার মর্মের চিরন্তন বিরহ-বাণী কবির কাব্যে বিস্ময়কর রূপ লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রকাব্যের একটি উৎকৃষ্ট অংশই তাঁহার বর্ষা সম্বন্ধে গান ও কবিতা।

বর্ষা-প্রকৃতির বাহিরের বিচিত্র রূপে রবীন্দ্রনাথও আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন—এই রূপদর্শনে তাঁহার হৃদয় অপূর্ব পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে,—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো
নাচেরে হৃদয় নাচেরে।
শত বরণের ভাবউচ্ছ্বাস কলাপের মতো করিছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।

কখনো বর্ষাকে উদাত্ত সুরে আহ্বান করিয়াছেন,—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা!

কখনো আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদলের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের মুখপাত্র হিসাবে বর্ষাকে অভিনন্দিত করিতেছেন,—

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা
শত শত গীত মুখরিত বনবীথিকা।

বর্ষার অবিরল জলধারাচ্ছন্ন নির্জন নিভৃত অবসর প্রেমের গূঢ় অনুভূতি প্রকাশের—প্রেম নিবেদনের—চরম ক্ষণ বলিয়া কবি অনুভব করিয়াছেন,—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বর্ষাকাব্যে প্রেমের লৌকিক স্তরের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন। সেখানে পার্থিব ও অপার্থিবের একত্র মিলন হইয়াছে। কালিদাসের কাল হইতে

বর্ষাঋতুতে যে বিরহ-বেদনা জাগিয়াছে লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে সেই বিরহ-বেদনা জাগিয়াছে অন্তরের অন্তরতম প্রিয়ের জন্য।

বর্ষায় কবির চিত্ত তাঁহার হৃদয়বিহারীর জন্য অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে,—

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি॥

রবীন্দ্রনাথ বর্ষার পরিপূর্ণতম কবি। কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, মনে হয়, বিশ্বসাহিত্যেও বর্ষার বাহির ও অন্তরের সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য-রহস্য এমন করিয়া নিষ্কাসন করিয়া আর কেহ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে পরিবেষণ করেন নাই।

ইউরোপীয় সাহিত্যে বর্ষার মধ্যে ভাবলোকের কোন সংকেত নাই, তাহার স্নিগ্ধতা, কোমলতা ও মাধুর্যের কোনো প্রকাশ নাই। সে সাহিত্যে বর্ষা ভীষণতা ও প্রচণ্ডতার মূর্তিমান স্বরূপ। Thomson বর্ষার মূর্তি এইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন,—

Frist, joyless rains obscure
Dry through the ming'ing skies with vapour foul,
Dash on the mountain's brow, and shake the woods
That grumbling wave below. The unsightly playing
Lies a brown deluge.—as the low-bent clouds
Pour flood on flood, yet unexhausted still
Combine, and deepening into night shut up
The day's fair face. (*The Seasons*)

Burns-এর বর্ণনাও ভীষণতারই পরিচায়ক,—

When heavy, dark, continued, a'-day rains
Wi' deepening deluges o'erflow the plains,
When from the hills where springs the brawling Coil
Or stately Lugar's mossy fountains boil,......
Aroused by blustering winds and spotting thowes,
In many a torrent down the snaw-broo rowes.

রোমান্টিক কবিমানস সমস্ত অনুভূতিরই একটা নিত্যত্ব কামনা করে এবং ক্ষণিক ও অপূর্ণকে চিরন্তন ও পূর্ণের আলোকে গ্রহণ করে। মেঘদূত কবির কাছে নিত্যকালের বিরহ-গাথা। জগতের নর-নারীর বিরহও কবি সেই অলকার যক্ষ ও যক্ষপত্নীর বিরহের আলোকে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবপদাবলীর রাধাকৃষ্ণের লীলা দেবদেবীর লীলা নয়, কবির কাছে তাহা মর্তের নরনারীর প্রেমলীলারই

প্রতিচ্ছবি। মানব-মানবীর জীবনের প্রেমলীলাই সাহিত্য ও ধর্মের স্তরে উঠিয়া চিরন্তনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আধুনিক কালের প্রেমিক-প্রেমিকারাও পদাবলীর নায়ক-নায়িকারই মতো বর্ষা ও শরৎ-পূর্ণিমাতে মিলনোৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া পড়ে। কবি এই কবিতাটিতে অতীত ও বর্তমানকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া চিরন্তন সৌন্দর্যের অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন।

'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় দেখা যায়, ঘননীল মেঘে আকাশ ঢাকিয়া গিয়াছে, দম্‌কা পূবে হাওয়া বহিতেছে—বর্ষাঋতুব এই উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে কবি ভাবিতেছেন, 'আজি সে কোথায়?' এতদিন সে কাছে ছিল, তবুও 'হৃদয়ের বাণী' তাহাকে বলা হয় নাই তাঁহার

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।

আজিকার এই দিনে, 'হাস্যপরিহাস', 'খেলা-ধূলা,' 'কোলাহলের' বাহিরে 'আত্মার নির্জন আঁধারে' বসিয়া 'জীবনমরণময় সুগম্ভীর-কথা,' 'বর্ণনা অতীত যত অস্ফুট বচন' যদি তাহাকে বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে উপলব্ধি হইত,—

শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, বাধা নাই পথে,
জীবন ব্যাপিয়া যায় জগতে জগতে,
দুটি প্রাণতন্ত্রী হ'তে পূণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন পানে।

ধারাবর্ষণমুখর বর্ষাদিনে নরনারীর হৃদয় প্রেম-নিবেদনের জন্য ব্যাকুল হয়, দুইটি হৃদয় পরস্পব সন্নিহিত থাকিলেও যে-কথা প্রত্যহের জড়তা ও কর্ম-কোলাহলের মধ্যে বলা যায় না, ঝরঝর বাদলের নির্জন অবসরে, সে গূঢ় কথা ব্যক্ত করা যায়—'বর্ষার দিনে' কবিতায় এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

বর্ষায় মানুষের মনে বিরহ-বেদন গুমরিয়া উঠে ও সে প্রিয়-মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়। ঘনবর্ষার মোহময় আবেষ্টনের মধ্যে, নিভৃত মিলনে, নরনারীর প্রণয়-নিবেদন সার্থক হয়। বর্ষায় মানুষের মন অকারণ বেদনায় ভরিয়া উঠে, মনে হয় কে যেন নাই, কাহাকে যেন হারাইয়াছি, কাহার অভাবে যেন মনের নিশ্চিন্ততা নষ্ট হইয়াছে। একটা উদাস ও হতাশ ভাবে দেহ-মন আকুল হইয়া উঠে।

'একাল ও সেকাল' কবিতায় সর্বকালের বিরহিণীদের চিত্তে বর্ষার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। 'বষার দিনে' কবিতায় বর্ষার অন্তরের বিশিষ্ট মিলন-মন্ত্রটি কীভাবে নরনারীর চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া এক অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে, তাহার এক অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়, সংহত বাণীরূপ রচনা করিয়াছেন কবি।

বর্ষায় বিরহ সম্বন্ধে সমস্ত প্রেরণার মূল উৎস প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের 'মেঘদূত'। বর্ষায় যে বিরহ উদ্দীপিত হয়, তাহার স্বরূপটি কালিদাসই প্রথম আমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত করেন,—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ,
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।

নবীন মেঘ দেখিলে যাহারা সুখীজন অর্থাৎ যাহারা প্রিয়ার সঙ্গে মিলন-সুখে দিন অতিবাহিত করিতেছে, তাহাদের চিত্তও উৎকণ্ঠিত হয়, আর যাহারা প্রিয়ার নিয়ত কণ্ঠালিঙ্গন কামনা করে, তাহারা যদি প্রিয়া হইতে দূরে থাকে, তাহাদের অবস্থা অতীব দুঃখজনক।

নবমেঘ হেরি', সুখী যে, তাহারো
অকারণে করে মন-কেমন,
বিরহী কি বাঁচে, নিয়ত যে যাচে
প্রিয়ার কণ্ঠ-আলিঙ্গন।

[অনুবাদক—কৃষ্ণদয়াল বসু]

কালিদাস যে বিশেষভাবে বর্ষাকে বিরহদুঃখের উৎসারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কার ও প্রথা বর্তমান। প্রাচীন ভারতে বর্ষা ছিল কর্মবিরতির ঋতু। তখন সম্ভবত প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য, ভ্রমণ, যুদ্ধ, বাণিজ্য, পাঠ প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ থাকিত। বর্ষারম্ভে প্রবাসী স্বামীরা গৃহে ফিরিত, তাহাদের পত্নীরাও প্রিয়-মিলন-প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া থাকিত। যদি প্রত্যাগমন বিলম্বিত হইত, তবে বিরহ-বেদনা উভয়পক্ষেই দুর্বহ হইত। বর্ষাঋতুর সঙ্গে বিরহ-বেদনার ভাবটি ভারতীয় নরনারীর মনে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল।

বর্ষার সঙ্গে বিরহের সম্বন্ধের কথা ভারতীয় সাহিত্যে আমরা প্রথম পাই বাল্মীকির রামায়ণে। বিরহকাতর রামচন্দ্রের নিকট বর্ষা-প্রকৃতি নিদারুণ বিরহ-বেদনার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হইতেছে,—

সন্ধ্যারাগোত্থিতৈস্তাম্রৈরন্তেষপি চ পাণ্ডুভিঃ।
স্নিগ্ধৈরভ্রপটচ্ছেদৈর্বদ্ধব্রণমিবাম্বরম্‌॥
মন্দমারুতনিশ্বাসং সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিতম।
আপাণ্ডুজলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্‌॥

বর্ষার আকাশ তাম্রবর্ণের সন্ধ্যারাগ, তাহার ভিতরে পাণ্ডুছায়া ও চারিদিকে স্নিগ্ধমেঘের পটচ্ছেদে দুষ্টব্রণের বেদনা-বিহ্বলের মতো বিরহ-বেদনায় মুহ্যমান বলিয়া মনে হইতেছে। রামচন্দ্র দেখিতেছেন, মন্দমারুতের নিশ্বাসে, সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিত মেঘের ঈষৎ পাণ্ডুরতায় আকাশ যেন মিলন-কামনায় বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে।

কেবল আকাশই নয়, ধরণীও বর্ষাগমে ঘর্মপরিক্লিষ্টা ও নববারিপরিপ্লুতা হইয়া বিরহশোক-সন্তপ্তা সীতার মতোই উষ্ণ বাষ্প ত্যাগ করিতেছে,—

এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি ॥

কিন্তু বাল্মীকির মধ্যে বর্ষার বাহ্যরূপের বৈচিত্র্য, তাহার অবিরল ধারাবর্ষণের বেগ ও ধ্বনি, বজ্র-বিদ্যুতের প্রচণ্ডতা, ধরণী-গগনের আবিলতা, পশুপক্ষীদের আনন্দোন্মত্ততা প্রভৃতির অপূব বর্ণনা থাকিলেও বর্ষার সঙ্গে মানব-হৃদয়ের গভীর যোগ, নরনারীর অন্তর-লোকে তাহার বিরহবাণীব আবেদন প্রভৃতির উল্লেখ বিচ্ছিন্ন, অপরিণত এবং স্থূল। কালিদাসের পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমিত, সাতবাহনরাজ হাল কর্তৃক সংগৃহীত প্রাকৃত কবিগণেব রচিত প্রেম-কবিতার সংকলন 'গাহা-সত্তসঈ গ্রন্থে (গাথা-সপ্তপতী) কয়েকটি পদে বর্ষায় বিরহ-উদ্দীপন-বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাঋতু যে বসন্ত প্রভৃতি অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বিরহিণীর বিরহ-বেদনাকে তীব্রতর করে, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় একটি শ্লোকে,—

সহি দুম্মেতি কলম্বাইং জহ মং তহ ণ সেসকুসুমাইং।

"হে সখি, (এই বর্ষাকালের) কদম্বফুলগুলি আমাকে যেমন করিয়া বেদনা দেয়, অন্য (বসন্ত প্রভৃতিতে প্রস্ফুটিত) কোন ফুলই তেমন করিয়া ব্যথিত করে না।"

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, মেঘদূত-কাব্যের পরিকল্পনায় বাল্মীকির রামায়ণের প্রভাব আছে। মেঘদূতের নির্বাসিত যক্ষ ও নির্বাসিত সীতাবিরহী রাম, অলকাপুরীতে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া ও অশোকবনে পতিবিরহ-বিধুরা সীতা, আর দৌত্যকার্যে প্রেরিত আকাশগামী হনুমান ও আকাশচারী মেঘ—ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ সাদৃশ্য নিতান্ত বহিরঙ্গের। মেঘদূত বর্ষায় প্রেমোৎসারণ এবং নরনাবীর বিরহ-বেদনার অনুভূতি অবলম্বনে রচিত একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য। কথাবস্তুর কাঠামোটিই কাব্য নয়, কাব্য তাহার অন্তরের সম্পদ। এক নবতম ভাবরাজ্যসৃষ্টির মধ্যেই কাব্য নিহিত। বর্ষার সঙ্গে বিরহবেদনার গূঢ় সম্বন্ধ কালিদাসই প্রথম কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠিত করেন। কালিদাসের পব হইতে সংস্কৃত কাব্যে বর্ষায় নবনারীর বিরহ কবিপ্রসিদ্ধিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সংস্কৃত মহাকাব্যে বর্ষায় নায়ক-নায়িকার বিরহ-বর্ণনা দেখা দেয়।

নানা কবিদের রচিত খণ্ড খণ্ড কবিতার মধ্যেও বর্ষায় প্রেমানুভূতিমূলক বহু সুন্দর কবিতা আছে। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি দশম-দ্বাদশ শতকের সংকলন-গ্রন্থেও ঐরূপ কবিতার সাক্ষাৎ মেলে। বৈষ্ণব কবিগণ এই সব সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিগণের ভাবধারার ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া বর্ষায় বিরহ ও অভিসারের

পদগুলি রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কালিদাস ও বৈষ্ণবপদকর্তাদের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহার নিজস্ব ভাব-কল্পনার রঙ, রস ও রহস্যে বর্ষার বাহিরের রূপ ও অন্তরের গূঢ় আবেদন অপূর্ব কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। বর্ষাকাব্যে তিনি নবস্রষ্টা, তাঁহার পূর্বসূরিগণের ভাব-চিন্তাকে তিনি বিচিত্রমুখী ও দিগন্তপ্রসারী করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নবতর ইঙ্গিত ও রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

'বর্ষার দিনে' কবিতায় কবি ধারাবর্ষণমুখর, ছায়াচ্ছন্ন দিনের অবসরকে প্রেম-জ্ঞাপনের চরম ক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রতিদিনের বাস্তব জগতের রূঢ় পরিবেশে, নিরন্তর কর্মকোলাহলের মধ্যে দুইটি হৃদয়ের নিভৃত মিলনের পরম লগ্ন উপস্থিত হয় না। সংসার ও সমাজের প্রতিক্ষণের বিচিত্র আবেদন প্রেমিক-প্রেমিকার পক্ষে প্রবল বাধা। প্রতিদিনের সংসারে বাস করিয়াও প্রণয়ী-প্রণয়িনী প্রাণ খুলিয়া পরস্পরকে প্রেম-নিবেদন করিতে পারে না, হৃদয়ের চরম কথাটি বলিতে পারে না। সংসার-জীবনে তাহারা হাস্যপরিহাস বা বাদানুবাদও করিতে পারে, তাহাতে হৃদয়ের দ্বার খোলা হয় না, মনের প্রকৃত ভাব জ্ঞাপন করা যায় না, কেবল মেঘাচ্ছন্ন দিনের দুর্লভ অবসরেই তাহা সম্ভব হয়,—

> কত হাস্যপরিহাস, বাক্য-হানাহানি,
> তার মাঝে রয়ে গেছে হৃদয়ের বাণী।
> মনে হয়, আজ যদি পাইতাম কাছে
> বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে। [আকাঙ্ক্ষা]

এই অবসরেই 'জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা' আর 'অরণ্যমর্মরসম মর্মব্যাকুলতা' প্রকাশ করা যায়। প্রেম বাস্তব সংসারের ঊর্ধ্বে অবস্থিত—একটা আদর্শ পরিবেশেই উহার উপলব্ধি সম্ভব। সংসারের প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে একটা বিরহ-বেদনা চিরন্তন ভাবে বর্তমান থাকে। সেই বিরহমোচনের এক শুভমুহূর্তের জন্য উহারা ব্যাকুল হয়। তাই সমস্ত কবিতাটির মধ্যে বিরহের এক বেদনাময় ব্যাকুলতা অস্বচ্ছ রাগিণীর মতো ধ্বনিত হইয়াছে। কবিতাটি একটি উৎকৃষ্ট লিরিক। অবশ্য অনির্দেশ্য বিরহব্যাকুলতা রোমান্টিক কবি-মনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং 'মানসী'র এই স্তরে কবি তাঁহার মানস-প্রিয়ার উদ্দেশ্যেই সমস্ত প্রেম ও হৃদয়ের গূঢ় কথা নিবেদন করিতেছেন।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল এই ক্ষুদ্র কবিতাটির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"রবীন্দ্রনাথের বহু বর্ষা-সংগীতের ইহাই বোধহয় প্রথম সার্থক রচনা।...

কবিতা এবং গান, দুয়ের এমন মিলন এই প্রথম। ভাষার সরলতা, ভাবের অকপট অভিব্যক্তি এবং কল্পনার সহজ রসাবেশ—তাহার উপর উহার ঐ অচির-নিঃশেষিত লঘু গতি—কবিতাটিকে একটি উৎকৃষ্ট লিরিক করিয়া তুলিয়াছে। কবিতাটির ভাব বিশ্লেষণ করিলে এই কয়টি উপাদান পাওয়া যায়—রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল বর্ষা-সংগীতের উহাই নিত্য উপাদান। (১) বর্ষার নিবিড় গভীর মেঘান্ধকার যেন চতুর্দিক অন্তরাল করিয়া একটি অপূর্ব নির্জনতা সৃষ্টি করে, তাই মন বহির্মুখী না হইয়া অন্তর্মুখী হয়। (২) প্রাণে যে অপূর্ব পুলক সৃষ্টি হয় এবং তজ্জন্য যে একটি আকুতি জাগে তাহা এতই নিজস্ব বলিয়া মনে হয় যে, আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে তাহার রহস্য-গভীরতা নষ্ট হইবে, অথচ আপনাকে আপনি শুনাইলে তৃপ্তি হয় না—একজনকে বলাও চাই। (৩) সেই একজন পরম-প্রেমাস্পদ, প্রাণ তাহার জন্য বিধুর হইয়া উঠে। এখানে কবি যাহাব উদ্দেশ্যে ঐ গান গাহিতেছেন সে তাঁহার মানসী-প্রিয়া।"

কবিতাটির ভাববস্তু এইরূপ : বর্ষাদিনের অবিরাম ধারাবর্ষণ, মেঘের গুরুগুরুগর্জন ও সূর্যালোকহীন অন্ধকারময় পরিবেশই চিত্তের ব্যাকুলতাময় গূঢ় কথা প্রকাশের অনুকূল অবসর। কবি আর তাঁহার মানসী ব্যতীত এই একান্ত নিরালায় অন্য কেহ থাকিবে না ; নিগূঢ় বিরহ-বেদনার অসীম ব্যাকুলতা লইয়া তাঁহারা পরস্পরের মুখোমুখি বসিয়া প্রেমের চরম বাণীটি বলিতে উদ্যত হইবেন।

সংসার, সমাজ, জীবনেব কলকোলাহল—সবই প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে অর্থহীন। তাহারাই একমাত্র সত্যসত্তা। কেবল মুখোমুখি বসিয়া চারিচক্ষুর দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্য দিয়া পরস্পবের সৌন্দয-মাধুর্য উপলব্ধি ও হৃদয় দিয়া হৃদয়ের গূঢ় ভাব অনুভব করাই তাহাদের একমাত্র কামনা।

এই দিন কোনো কথাই নিজের কানে শ্রুতিকটু লাগিবে না, কোনো কথাই নিজের প্রাণে অস্বাভাবিক বোধ হইবে না ; প্রণয়ী-প্রণয়িনী স্বচ্ছন্দ ও বাধাহীন অবস্থায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিবে। সেই অকথিত বাণী—সেই চিরন্তন বিরহ-বেদনার ব্যাকুলতা কেবল নীরব অশ্রুপাতের মধ্য দিয়া উভয়েব হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইবে। ঘনধারা-বর্ষণের নিভৃত অবসরটুকুতে হৃদয়-ভার লাঘব করিতে গেলে সংসারের কর্মধারায় কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না। এই নিভৃত মিলন-মুহূর্তটির বাইবে তো নিরবচ্ছিন্ন সংসার-স্রোত বহিতেছে, সেখানে কতো হাস্য-পরিহাস, কতো দুঃখশোকের আবর্ত, তাহার মধ্যে অন্তরের 'দুকথা' কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাহার প্রকাশের কোন সম্ভাবনাই আব থাকিবে না। প্রতিদিনকার জীবনে প্রিয়াকে একান্তভাবে পাওয়া যায় না, কেবল বিরহ-বেদনাই অনুভূত

হয়, বর্ষার পরিবেশেই প্রেমের গূঢ় বাণী বলার চির-অভিলাষিত পরমক্ষণ লাভ করা যায়।

ষড়্‌ঋতুর আবর্তনের সহিত মানুষের মন তারে-তারে বাঁধা। এক এক ঋতুর আবির্ভাবে ধরণীর যে-রূপবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, তাহা মানুষের মনে বিভিন্ন ভাবের আন্দোলন জাগায়। মানুষের মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব অসীম। বর্ষা-ঋতুর অবিরল বারিধারা ও আকাশ-জোড়া কালো মেঘের আবির্ভাবে মনে হয়, প্রকৃতি যেন কোনো অন্তর্গূঢ় বেদনার কালিমা ও অশ্রুধারা দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। বর্ষা-ঋতু যেন প্রকৃতির বুকফাটা কান্নার প্রতীক। মানুষের মনেও এইরূপ অসীম রোদন উথলিয়া উঠে। কিন্তু এ কান্না কিসের জন্য? এ কান্না, যাহাকে একান্ত করিয়া আপনার জন বলিয়া পাইবার আশা করা যায়, তাহাকে না পাওয়ার কান্না—আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তির কান্না। বর্ষায় মানুষের মনে এই বিরহ-বেদনা জাগে ও প্রেমাস্পদকে পাইবার দুর্বার কামনায় চিত্ত অধীর হয়। প্রবল বাসনার আগুন জ্বলিয়া উঠে বলিয়া ঐদিনের মিলন সাধারণ দিনের মিলন অপেক্ষা গাঢ়তর ও গভীরতর হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তনে নরনারীর হৃদয়ে বিচিত্রভাবে প্রেমের জাগরণ হয়।

"নর-নারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জল-স্থল-আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহা পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্য-শীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে, এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক একটি ঋতু যখন আপন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ় স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশ-বিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো—ফুল-ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক।" কেকাধ্বনি, বিচিত্র প্রবন্ধ

প্রেমিক প্রেমপাত্রীকে আজ একান্ত নির্জনে কামনা করিতেছে,—

দু-জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

এ-দিনে সমাজ-সংসার তাহাদের নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে,—

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব ;
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

যে কথা জীবনে অব্যক্ত থাকিয়া গেল, যে কথা দৈনন্দিন কর্ম-কোলাহলের চক্রতলে পড়িয়া পিষিয়া কোথায় উড়িয়া গেল, ঘনবর্ষার নিভৃত ছায়ালোকে বসিয়া সে কথা বলা যায়,—

যে-কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

বর্ষায় যে প্রেম নিবেদনের পরমক্ষণ এই ভাবটি অপূর্ব কবিত্বময়তা ও ভাষাশিল্পের কী চমকপ্রদ নির্দশন স্বরূপ কবি 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্যের মনোভাব-বিশ্লেষণে বলিয়াছেন,—

"দুর্দান্ত বৃষ্টি……লাবণ্যের মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল,—যাক্ সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই-হাত চেপে ধরে বলে উঠি—জন্মে জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হু হু করে কী যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারি ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট জগৎ আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে।… ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এর পরে যখন কেউ আসবে, তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডব-নৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল, তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই 'বাণী আসে' সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে—শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপারগামী পাখীর মতো। কতদিন থেকে, কতদূর থেকে আসছে, সেই কথাটির জন্তেই আমার প্রাণে ইষ্টদেবতা এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি,—আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল।"

কালিদাসের অমর কাব্য 'মেঘদূত' রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। মেঘদূতের কাব্যসম্পদ, তাহার অনুপম চিত্রাবলী, শব্দের ঐশ্বর্য, মাধুর্য ও মোহ, কালিদাসের কালের পরিবেশ, তাহার গূঢ় ভাবরস, তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কবির সমস্ত চিত্তকে যেন গ্রাস করিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বহু রচনার মধ্যে মেঘদূতের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। মেঘদূত-প্রভাবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার অনবদ্য কবিতা 'মেঘদূত'। কালিদাসের মেঘদূতের চিত্র, ভাব ও ভাষা তাঁহার প্রতিভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের চুল্লীতে গলাইয়া এমন এক

অভিনব মূর্তি দিয়াছেন যে, উহা যেন রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' হইয়া গিয়াছে; এই কবিতার মধ্যে কালিদাসের কালের একটি মনোহর পরিবেশ রচিত হইয়াছে; কবি কালিদাসের ভাবে ভাবিত ও রসে আপ্লুত হইয়াছেন; বর্তমান যুগের প্রতিষ্ঠা-ভূমি হইতে বিক্রমাদিত্যের যুগে প্রবেশ করিয়া সেই কল্পলোকের সহিত বর্তমান মর্তলোকের যে বেদনাদায়ক ব্যবধান আছে তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান ও অতীতকে তিনি এক সূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং মেঘদূতের বিরহকে সর্বযুগের সর্বলোকের চিরন্তন বিরহ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসের মেঘ দেখিয়া কালিদাস তাঁহার মেঘদূত লিখিতে আরম্ভ করেন—তাই প্রথম আষাঢ়ের বর্ষণেব সহিত মেঘদূত চিবকালের মত বিজড়িত হইয়া আছে। ববীন্দ্রনাথেব মতে,—

"আষাঢ়ের মেঘ প্রতিবৎসর যখনই আসে, তখনই নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে।...মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়। কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-শিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন, আমরাও সেই মেঘ দেখিয়াছি, ইতিমধ্যে পরিবর্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই।...মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদন নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবাৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্ব-গাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।" নববর্ষা, বিচিত্র প্রবন্ধ

'মেঘদূত' রবীন্দ্রনাথেব রোমান্টিক মানসে প্রবেশ করিয়া সুদূরপ্রসারী ভাব-কল্পনার বিচিত্র লীলায় নব নব রূপে রূপায়িত হইয়াছে তাঁহার বিস্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে। কালিদাসের 'মেঘদূত' ববীন্দ্রনাথেব 'নব মেঘদূত' রূপে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ববীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যলোকে প্রবেশ করিয়া যে-ভাব-চিন্তার সম্মুখীন হইয়াছেন, যাহা তাঁহার মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে, সেগুলিকে তাঁহার ভাবধর্মী রোমান্টিক মনের বিশিষ্ট রঙে ও রসে রঞ্জিত করিয়া নূতনভাবে সম্প্রসারিত, তাৎপর্যমণ্ডিত ও ব্যঞ্জনাগর্ভ কবিয়াছেন। মানসীর এই 'মেঘদূত' কবিতাটি ছাড়া প্রায় সমসাময়িক কালে রচিত, 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর 'মেঘদূত' প্রবন্ধ, 'চৈতালি'র 'মেঘদূত কবিতা', 'বিচিত্র-প্রবন্ধ'-এর 'নববর্ষা' প্রবন্ধ, 'লিপিকা'র 'মেঘদূত' গদ্যকাব্য, 'পুনশ্চ'-এর 'বিচ্ছেদ' নামক গদ্যকবিতা, 'শেষসপ্তক'-এর আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতা ও 'যক্ষ' নামে কবিতা, 'নবজাতক'-এর 'সাড়ে ন'টা' কবিতা, 'সানাই'-এর 'যক্ষ' নামক কবিতা প্রভৃতিতে নানা দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে এবং নিজস্ব ভাব-কল্পনার বিচিত্র রঙে ও রসে কবি মেঘদূতের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন।

কালিদাসের মেঘদূত মূলত সম্ভোগের কাব্য। বর্ষা ও বিরহ শৃঙ্গাররসের উদ্দীপন

বিভাবমাত্র। বর্ষার সঙ্গে বিরহ ভারতীয় কাব্যে কবি-প্রসিদ্ধিতে পরিণত। ইহার সৃষ্টিতে বাল্মীকির আদর্শ কার্যকারী হইলেও এই সাহিত্যিক ঐতিহ্য গঠনের মূলে কালিদাসের মেঘদূতের প্রভাব নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু প্রেম ও বিরহ বলিতে বর্তমানে আমরা যাহা বুঝি, মেঘদূতের মধ্যে তাহার স্বাদ আমরা পাই না। ভোগবঞ্চিত নাগর যক্ষের পক্ষে প্রেমের অবধারণা শৃঙ্গার-কামনায় সীমাবদ্ধ। বিরহ তাহার পক্ষে অনেকখানি বিলাস, এই বিরহকে উপলক্ষ্য করিয়া একটা বিশাল সম্ভোগ-রস চেতন-অচেতনময় বিশ্বপ্রকৃতিব মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রেম যে দেহ-মনের মর্মান্তিক আকূতি এবং বিরহে যে অন্তর্ভেদী বেদনায় সমস্ত আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন হইয়া যায়, ইহা আমরা প্রথম বৈষ্ণব পদাবলীব মধ্যে দেখি। বিদ্যাপতির পদটি—

এ-ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর—

আমাদের মনে, প্রেম, বিরহ ও বর্ষা একত্র সম্মিলিত করে, সুদূরপ্রসারী এক অনির্বচনীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করে,—যাহা ইতিপূর্বে আমরা কোথাও অনুভব করি নাই।

বৈষ্ণব পদাবলীর কয়েক শতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথই প্রথম কালিদাসের মেঘদূতকে আধুনিক মনের সমস্ত প্রসাধন দ্বারা মণ্ডিত করেন এবং এক নূতন রস, রহস্য ও ব্যঞ্জনার সমাবেশে ইহাকে যথার্থ বিরহের কাব্যরূপে উপভোগ্য করিবার চেষ্টা করেন। রোমান্টিক আর্টের প্রধান লক্ষণ বিশ্বের মধ্যে নূতন তাৎপর্যেব আবিষ্কার, আশাতীত ও অভাবনীয়ের সন্ধান-দান এবং বুদ্ধির অতীত স্তরের এক সত্যের ব্যঞ্জনা-প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবি-মানস মেঘদূতের কাঠামোর মধ্যে বারে বারে নূতন নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াছে, নূতন রাগিণী ঝংকৃত করিয়াছে, এক অভিনব ভাবলোক সৃষ্টি করিয়াছে। মানব ও মানবী যক্ষ ও যক্ষপত্নীর বিরহকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের চিরন্তন বিরহেব প্রতীকরূপে দেখিয়াছেন, অলকাকে দেখিয়াছেন আদর্শ সৌন্দর্যের চিরকল্প-লোকরূপে—এক অদৃশ্য রহস্যময় রাজ্যরূপে। রোমান্টিক কবিমনে অপ্রাপনীয়ার জন্য যে-চিরন্তন বিরহবিধুরতা সর্বসময়ে বর্তমান, তাহারই রাগিণীর মূর্ছনায় মেঘদূতের বিরহকে কবি এক অভিনব ভাব-স্তরে উন্নীত করিয়াছেন।

মানসীর 'মেঘদূত' কবিতাতে কবি যক্ষ-যক্ষিণীর বিরহের উপর নূতন আলোক-সম্পাত করিয়াছেন—নিজের অনুভূতি ও কল্পনার মধ্যে উহাকে ভিন্নরূপে পাইয়াছেন। কালিদাস-বর্ণিত সৌন্দর্যময় অলকায় রক্তমাংসের বাস্তব যক্ষপত্নী বাস করে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট সেই বিরহিণী তাঁহার অশরীরিণী মানস-প্রিয়া, সে অনন্ত সৌন্দর্য

ও প্রেমের রাজ্য অলকায় একাকী তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিত্যকাল একাকিনী জাগিয়া আছে। কবির ভাগ্যে এ অভিশাপ আর ঘুচিবে না, মিলন আর সম্ভব হইবে না, কেবল চিরন্তন বিরহ-বেদনা, অপ্রাপ্তির বিষণ্ণতায় বিভোর হইয়া থাকিতে হইবে।—

কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য-মাঝে একাকী জাগিয়া।...
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান!
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ!
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ!
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে!

এই 'মানসী-সোনার তরী-চিত্রা'র যুগে কবি প্রেম ও সৌন্দর্যকে বাস্তবের সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে উঠাইয়া, মানবিক কামনা-বাসনার অতীত করিয়া এক অপার্থিব রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই পার্থিব রাজ্য হইতেই জগতের সমস্ত প্রেম ও সৌন্দর্য উৎসারিত হইতেছে। সেই অনন্ত সৌন্দর্য ও প্রেমের রাজ্যে কবির মানস-লক্ষ্মী অবস্থান করিতেছে; সে বিরহিণী, কবিও বিরহী, তাহাদের মিলন কোনোদিনই হইবে না,—কেবল বিরহের অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে উভয়ে উভয়ের কাছে অসীম হইয়া বিরাজ করিবে। এই অনন্ত সৌন্দর্যরাজ্য সম্বন্ধে কবি 'চিত্রা'র 'জ্যোৎস্নারাতে' কবিতায় বলিয়াছেন,—

নন্দন মনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসে আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।

কবির রোমান্টিক-মানসে প্রেম ও সৌন্দর্যের যে চিরন্তন বিরহ বর্তমান, কালিদাসের মেঘদূতের বিরহ তাহাকে নব নব পথে পরিচালিত করিয়াছে; পূর্বমেঘে মানব-

চিত্তের বন্দীদশামুক্ত বিশ্বভ্রমণ ও উত্তরমেঘে আদর্শ সৌন্দর্যপুরী অলকাতে উত্তরণের ইঙ্গিত কবি নানা ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

'প্রাচীন সাহিত্য'-এর 'মেঘদূত' প্রবন্ধে কবি মেঘদূতকে এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিয়াছেন, যক্ষের বিরহের মধ্যে মানবের চিরন্তন বিরহের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, কাব্যের সমতলভূমি হইতে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন। মেঘদূতের মধ্যে কবি অনুভব করিয়াছেন,—

"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে। আজ কেবল ভাষায়-ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে ভুল-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে-মনে জন্ম-মৃত্যুর দ্রুততর স্রোতাবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র।"

"আমরা যেন কোন-এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি।........ .... যাহারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়া ছিল তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না; বিরহবিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।"

আমাদের দৃষ্টি-জ্ঞান-বুদ্ধির পরিমণ্ডল হইতে বহুদূরে যে চিরন্তন পরমদয়িত অবস্থান করিতেছেন, তাহার জন্য নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান মানুষটির যে-বিরহ এবং মানুষে-মানুষে যে চিরন্তন নিগূঢ় কারণসঞ্জাত বিরহ, তাহার কোন ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা কালিদাসের মেঘদূতে নাই; এই নিত্যকালের আধ্যাত্মিক বিরহ-বেদনা রবীন্দ্রনাথেরই বিশিষ্ট অনুভূতি, তাঁহার 'নবমেঘদূত'—'অপূর্ব অদ্ভুত'।

মেঘদূতের যক্ষের বিরহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনা আর একটি নূতন সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। বিরহে বিশ্বজগতের সঙ্গে—বিশ্বমানবের সঙ্গে আমাদের গভীর যোগ সাধিত হয়। প্রিয়-মিলনে আমরা একটা গণ্ডীর ক্ষুদ্র আবেষ্টনে সংকুচিত হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়ি, বিরহ সেই গণ্ডীকে ভাঙিয়া আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়। অবশ্য অনুরূপ ভাব অন্যান্য কবিদের রচনাতেও পাওয়া যায়। একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ !
সঙ্গমে সৈব যদেকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং তদ্‌বিরহে ॥

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাকে নরনারীর পার্থিব মিলনের ঊর্ধ্বে উঠাইয়া পরমদয়িতের সঙ্গে—পূর্ণের সঙ্গে অপূর্ণ মানবের মিলনের তাৎপর্য দান করিয়াছেন। 'পুনশ্চ'-এর 'বিচ্ছেদ' কবিতায় কবি এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন।

যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,
পুবে হাওয়া বয়েছে শ্যামজম্বুবনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।...
মেঘদূত উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল-না তার 'পরে—
সেই বিরহের ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী।

মেঘদূতের দিনে সমস্ত পৃথিবীতে একটা বেগের আবেগ লক্ষ্য করা যায়,—গতির দ্রুত ধাববান রাগিণী বাজিয়া উঠে। পৃথিবীর এই চলার সঙ্গে আমাদের বিরহের চলার যোগ হয়, ব্যথার ভারকে দূব কবে চলার মুক্তি। মিলনে প্রেম বদ্ধ, আত্মকেন্দ্রিক, সে প্রেম আমাদের চিত্তের বন্ধনস্বরূপ, বিরহেই যথার্থ মুক্ত প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করা যায়।

একদা যখন মিলনে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে,
বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়ে থাকত
নিভৃত বাসরকক্ষের বাইরে।
যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরোল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।

তারপর কৈলাসের অলকাপুরীতে যখন যাত্রার শেষ হইল, তখন বেদনা নিশ্চল, স্থির রূপ ধারণ করিল। অলকার বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে যক্ষপত্নী একাকিনী বিরহিণী—প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনায় বিধুর। যক্ষের চলমান প্রেম অপূর্ণ, তাই অপূর্ণ চলিয়াছে পূর্ণের দিকে অভিসারিকার বেশে, নব নব আনন্দের মধ্য দিয়া, কিন্তু যে পূর্ণ, সে গতিশীল প্রেমের আনন্দ হইতে বঞ্চিত, সে একা, কেবল অনুক্ষণ কামনা করে অপরের জন্য।

অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে ;
নিত্যপুষ্প, নিত্যচন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা—সেই তো একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

কিন্তু ইহার সঙ্গে আর একটি কথা কবির মনে উদিত হইয়াছে। যে পরিপূর্ণ সেও তো নিশ্চল হইয়া বসিয়া নাই, সে প্রতীক্ষার মধ্যেই অপূর্ণকে অভিসার পথে আগাইয়া লইবার জন্য বাঁশী বাজাইতেছে। তাই বিরহী অপূর্ণের অভিসার আর কাকী পূর্ণের আহ্বান উভয়ে মিলিয়া সৃষ্টির সুর ও তাল বজায় রাখিয়াছে।

বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা,
পদে পদে মিলছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।

'শেষ সপ্তক'-এর আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতা ও ঐ গ্রন্থের সংযোজনের 'যক্ষ' নামক কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—যক্ষের প্রেম ছিল সীমাবদ্ধ, গন্ধ যেমন বদ্ধ থাকে পুষ্পকোরকের মধ্যে। সেদিন 'সংকীর্ণ সংসারে একান্তে ছিল' তাহার প্রেয়সী 'যুগলের নির্জন উৎসবে', তাহার নিবিড় আলিঙ্গনের আবরণে।

এমন সময় প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে।
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি,
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।

সেদিন যক্ষ তাহার পত্নীকে নূতন করিয়া লাভ করিল। বিরহে সে হইল কবি ; যে ছিল তাহার রক্তমাংসের বাস্তব প্রিয়া, তাহাকে আজ সে হৃদয়ের নিভৃত আঙিনায় 'স্বগায় গরিমায় কান্তিমতী' করিয়া অপূব নবমূর্তিতে গড়িয়া তুলিল ; এই মানসী প্রিয়া তাহার 'নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী মানবী-প্রিয়ারই রসরূপ, সে আসন পাইল 'অলকার অমর গৌরবে' 'অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে'।

আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,
আজ তুমি হয়েছ কবি,
ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ করা।

রক্তমাংসের নারী হইতে মানসলোকে ধ্যানোদ্ভবা চিরন্তনী নারীসৃষ্টি রোমান্টিক আর্টের একটি শ্রেষ্ঠ রূপ। জন্ম-রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনব্যাপী ইহাই প্রেরণা।

'নবজাতক-এর 'সাড়ে নটা' কবিতায় কবি মেঘদূত কাব্যকে দেশকালের অতীত একটি চিরন্তন রাগিণী বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। যখন আমরা রেডিয়োতে গান শুনি, তখন বহুদূর হইতে আগত বিদেশিনীর কণ্ঠ-সংগীত কেবল 'দেহহীন', 'পরিবেশহীন স্বরের প্রবাহ বলিয়া মনে হয়। সেই গান যেন 'একাকিনী', 'সর্বভারহীনা', 'অরূপা', 'অভিসারিকা', 'রাগিণীর দীপশিখা' বহন করিয়া, 'গিরিনদী-সমুদ্রের পার হইয়া, 'পথে পথে বিচিত্র ভাষায় কলরব', 'পদে পদে জন্মমৃত্যু-বিলাপ-উৎসব, 'রণক্ষেত্রে নিদারুণ হানাহানি', 'লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি' সমস্ত পরিহার করিয়া একান্ত নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত অবস্থায় আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছে।

যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত।
বাণীমূর্তি সেও একা।...... ..
তার পাশে চুপ
সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ।
সেদিনের যে প্রভাতে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল
জীবনে উচ্ছল
ওর মাঝে তার কোনো আলো পড়ে নাই।
রাজার প্রতাপ সেও ওর ছন্দে সম্পূর্ণ বৃথাই।
যুগ যুগ হয়ে এল পার
কালের বিপ্লব বেয়ে, কোনো চিহ্ন আনে নাই তার।

'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'যক্ষ' কবিতায় 'পুনশ্চ'-এর 'বিচ্ছেদ' কবিতার ভাবটি একটু নূতনভাবে প্রকাশ করিয়াছেন কবি। পূর্ণ ও অপূর্ণ, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একটা

নিবিড় বিরহের সম্বন্ধ বর্তমান। এই বিরহের ব্যাকুলতাই সৃষ্টিকে 'নব নব জীবন-মরণে'র মধ্য দিয়া 'ভবিষ্যের তোরণে তোরণে' পরিচালিত করিতেছে।—

এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তে তারি রচে টীকা
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুন-জ্বালা এই বিরহেই।

প্রভুর শাপ যক্ষের বর হইয়াছে। অপূর্ণতার বিরহ-বেদনা নিশ্চল পূর্ণের দ্বারে অহরহ আঘাত করিতেছে এবং সৃষ্টির প্রাণপ্রবাহে সেই স্তব্ধগতি চরমকে মুক্ত করিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছে।—

প্রভুবরে যক্ষের বিরহ
আঘাত করিছে ওই দ্বারে অহরহ।
স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হতে
ছায়ায়-বিচিত্র এই নানাবর্ণ মর্ত্যের আলোতে
উহারে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।

কালিদাসের মেঘদূত রবীন্দ্র-মানসের উপর যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং কবির ভাব-কল্পনাকে কতো বিচিত্র রূপে উৎসারিত করিয়াছে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে মিলিবে। এইভাবে কালিদাসের মেঘদূত রবীন্দ্রমানস হইতে 'নব মেঘদূত' রূপে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতাটির ভাববস্তু এইরূপ :

কবে কোন্ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে কালিদাস তাঁহার মেঘদূত কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাহা কেহ জানে না; কিন্তু এই কাব্যে বিশ্বের সমস্ত বিরহীদের বেদনা সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

সেদিন উজ্জয়িনীর আকাশে মেঘ-বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝার সমাবেশে বর্ষার বিপুল সমারোহ অনুমান করা যায়। মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে সেদিন বহুযুগের অবরুদ্ধ বিরহ-বেদনা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিরহীদের চিরসঞ্চিত অশ্রুজল যেন মন্দাক্রান্তা ছন্দের দীর্ঘায়ত শ্লোকগুলিকে আর্দ্র করিয়া দিয়াছিল।

মনে হয়, সেদিন জগতের সমস্ত প্রবাসী প্রিয়ার গৃহের দিকে তাকাইয়া সমবেত কণ্ঠে বিরহ-সংগীত গাহিয়াছিল এবং নবমেঘের দৌত্যে সুদূরের বিরহিণী প্রিয়ার কাছে অশ্রুসজল বার্তা পাঠাইতে চাহিয়াছিল।

বর্ষার গঙ্গানদী যেমন সমস্ত স্থানের জলধারা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে মিলাইয়া দেয়, তেমনি কালিদাসের মেঘদূত সকল বিরহীর বেদনা-সংগীত সর্বদেশের

সর্বকালের দূরবর্তিনী বিরহিণীদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। বন্দী বিরহী হিমালয় যেমন আষাঢ়ের নবমেঘ দেখিয়া প্রত্যেক গুহা হইতে কামনার উষ্ণশ্বাস ত্যাগ করে এবং সেই সমবেত কামনারূপী উষ্ণশ্বাস উর্ধ্বে উঠিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ মেঘদূতও বিশ্বের সকল বিরহীর মর্মবেদনা একত্রীভূত করিয়া বিরাট বেদনার ঐকতান সংগীতে সকলের চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। তারপর, বর্ষে বর্ষে নববর্ষার বৃষ্টিধারা ও মেঘগর্জন মেঘদূতের কাব্যস্রোতকে স্ফীত ও বেগবান করিয়াছে। বর্ষাসমাগমে কতো নিঃসঙ্গ বিরহী প্রিয়াহীন ঘরে মেঘদূত পাঠ করিয়া তাহার বেদনা উপশম করিয়াছে।

ভারতের একপ্রান্তে বাংলা দেশে বসিয়া এক ঝড়বৃষ্টিমুখর বর্ষাদিনে রবীন্দ্রনাথ রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া মেঘদূত পাঠ করেন। মন তাঁহার উড়িয়া চলে পূর্বমেঘবর্ণিত স্থানগুলিতে—সেই সানুমান আম্রকূট, বিন্ধ্যপদমূলে রেবানদী, দশার্ণগ্রাম, অবন্তীপুর, উজ্জয়িনী, কুরুক্ষেত্র, কনখল প্রভৃতি স্থানে। এইরূপ দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া কবি অবশেষে উপনীত হন উত্তরমেঘ-বর্ণিত অলকাপুরীতে। সেখানে নিত্যজ্যোৎস্না ও অনন্ত বসন্তের রাজ্যে সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি বিরহক্ষীণা যক্ষ-প্রেয়সী একাকিনী অশ্রুজল মোচন কবিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মেঘদূত পাঠ করিতে করিতে বিরহের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া বেদনার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি বিরহের চিরন্তন স্বর্গলোকে পৌঁছিয়াছেন, সেখানে অনন্তসৌন্দর্যলোকে তাঁহার চিরবিরহিণী প্রিয়া নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করিতেছে।

মেঘদূতপাঠ শেষ করিয়াও কবি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত নিদ্রাহীন চোখে ভাবিতে লাগিলেন—মানুষ যাহাকে কামনা করে তাহাকে পায় না, কেবল ব্যর্থতা ও অপ্রাপ্তির বেদনাতেই জর্জরিত হয়। কোনো লোকই বাস্তব জগতের উর্ধ্বে সেই রহস্যময় রাজ্যে সশরীরে তাহার চিরবিরহিণী মানস-প্রতিমার নিকট উপনীত হইতে পারে না।

রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে।

আমরা দেখিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে মেঘদূতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। পূর্বের উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে যে তত্ত্বের ইঙ্গিত আছে, সেগুলি একত্রে বিবেচনা করিলে আমরা মোটামুটি একটা তত্ত্ব উপস্থাপন করতে পারি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চিরবিরহ বিদ্যমান। মানুষ যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেই সুদুর্লভ, চির-আকাঙ্ক্ষিত ধন বহু দূরে। মাঝখানে

অনন্ত ব্যবধান। এই অন্তহীন ব্যবধানের পরপারে যে প্রিয়তম অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে কোনদিনই পাওয়া যায় না—বহু সৌভাগ্যে, কোনো শুভক্ষণে, তাঁহার কোনো আভাস-ইঙ্গিত মিলিতে পারে মাত্র।

মানবসৃষ্টির মূলে, 'এক এব বহু স্যামঃ' এই বাসনা। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের মতো, সমুদ্র হইতে বায়ুবাহিত শীকরকণার মতো, মানুষ সৃষ্টির আদিম প্রাতে, ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র মানবসৃষ্টি সেই বিশ্বব্যাপী মানসলোক হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সত্যিকার বাসস্থান অন্তহীন মানসলোকে। তাহার চিরদয়িত—যাঁহার সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল কোন্ বিস্মৃত দিবসে—তাহার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণিতেছেন। প্রেম উপলব্ধি করিবার জন্য ভগবানের এই মানবসৃজনলীলা। ইহা নিজেকেই নিজের আস্বাদন। মানুষের এই প্রেম-নিবেদনে তাঁহার পরমা তৃপ্তি—তাঁহার আনন্দের পূর্ণ উপলব্ধি। মানুষ জন্মজন্মান্তরেব মধ্য দিয়া প্রেমের রথে সেই মিলন-পথে মহাযাত্রা করিতেছে। মানুষ তাঁহাকে এখনো পায় নাই—তাই ব্যাকুল বাসনায় তাহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। সেই চির-বাঞ্ছিতের অভিসারে চলিয়াছে মানুষ সুদুঃসহ বিরহ-বেদনা বহন করিয়া যুগে যুগে।

আবার মানুষে-মানুষেও এই বিরহ। অতি নিকটে থাকিয়াও মানুষে-মানুষে বিরহের চিরন্তন মালা-জপ চলিতেছে। তাহারা সকলেই সেই সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়া ছিল—তাহার পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পরস্পরের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের ব্যবধান। তাহারা প্রত্যেকেই অনন্তের অংশ—একের অনন্তের সঙ্গে অন্যের অনন্তের দুস্তর ব্যবধান। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুইটি অংশ আছে, একটি অনন্ত, অপরটি সান্ত। একটি মানুষেব মধ্যে দুইটি মানুষ—একটি অনন্ত, যাহাকে লাভ করা সুকঠিন—সে চিরদিনই কামনার ধন—অপরটি সংসার-ধূলিলিপ্ত প্রতিদিনকার মানুষ। সুতরাং মানুষে-মানুষে সংসারে যে মিলন—তাহা আধখানা মিলন। সংসারের এই নিবিড় মিলনের মধ্যেও অনন্ত অংশের সহিত মিলিত হইবার জন্য মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষা তীব্র—সে এক চিরবিষাদময় বিরহ অনন্ত রাত্রি যাপন করিতেছে। দুই মানুষের মধ্যে চিরকাল ধরিয়া চিরন্তন বিরহ গুমরিয়া মরিতেছে। আত্মায় আত্মায় মিলন সহজ হইতেছে না। কেহ কাহারো সহিত মিলিত হইতে পারিতেছে না—অথচ মিলনাকাঙ্ক্ষাকে, এই চিরন্তন বিরহকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তাই একত্র থাকিলেও উভয়ের মধ্যে অনন্ত অশ্রুসাগর উচ্ছলিত হইয়া আছে—উভয়ের মধ্যে মিলনের বাঁশির করুণ সুর কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই 'মেঘদূত' কবিতাটি শান্তিনিকেতনে লিখিত। রচনার দুই দিন পরে (১১ই জ্যৈষ্ঠ) কবি প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্র লেখেন। তাহার মধ্যে এই 'মেঘদূত' কবিতাটি রচনার উল্লেখ আছে।

"এখানকার লাইব্রেরীতে একখানা মেঘদূত আছে; ঝড়বৃষ্টিদুর্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্ণে সেইটি সুর করে পড়া গেছে—কেবল পড়া নয়—সেটার উপর ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি। মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জানো? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে—কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে—অথচ সমস্ত ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ।

"বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কি না—এই জন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপগ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারই উপরে আরোপণ করে বিচিত্র নদী, পর্বত, বন, গ্রাম, নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করতে করতে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দী হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়—সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে—সেইখানে চরম বিশ্রাম।…বর্ষাকালে সকল লোকেরই কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়—এমন কি প্রণয়িনী কাছে থাকলেও হয়।…অতএব কবিকে বর্ষার দিনে এই জগদ্ব্যাপী বিরহীমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিতে হবে। এই বর্ষার অপরাহ্ণে ক্ষুদ্র আত্ম-কোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি দিতে হবে—আজকের সমস্ত সংসার দুর্যোগের মধ্যে বদ্ধ হয়ে, অন্ধকার হয়ে, বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে।" সবুজপত্র, শ্রাবণ, ১৩২৪

'কুহুধ্বনি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের গাজীপুর-প্রবাসকালে লিখিত। পশ্চিম-দেশের গ্রীষ্মকালের একটি চমৎকার পল্লী-চিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি;
বাঁধা কূপ, তরুতল; বালিকা তুলিছে জল,
খরতাপে ম্লান মুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর, বসিয়া মাচার 'পর
শস্যক্ষেত আগলিছে চাষি;
রাখালশিশুরা জুটে নাচে গায় খেলে ছুটে;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।

ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির বেশ-পরিবর্তন হয় ও রূপবৈচিত্র্য ঘটে। বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে বিভিন্ন ফুল, পাখী, বর্ণ ও গন্ধ এমনভাবে আমাদের মন ও কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা তাহাদিগকে ঋতুর সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ দেখি। এক অন্যকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং বিশিষ্ট ফুল বা পাখী বিশিষ্ট ঋতুর অন্তর ও বাহিরের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়। সংস্কৃত-সাহিত্য হইতেই এই ধারা

চলিয়া আসিতেছে। বর্ষার কদম্ব ও কেতকী ফুল, ময়ূরের কেকাধ্বনি, শরতের শুভ্র কাশকুসুম ও হংসরব, বসন্তে অশোক, কিংশুক, নবমল্লিকা প্রভৃতি ফুল, কোকিলের কুহুরব ও ভ্রমর-গুঞ্জন আমাদের মনে যেন চিরকালের মতো জড়িত হইয়া আছে। এই সব ঋতুর অন্তর্নিহিত ভাব, ব্যঞ্জনা ও বাণী যেন ফুলের বিকাশে ও পাখীর গানে বাহিরে মূর্ত হয় এবং উহারা মানুষের মনের নিভৃত তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া এক অভিনব সুরের মূর্ছনা তোলে। এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের একটা চিরন্তন লাগা চলিয়া আসিতেছে।

কুহুধ্বনি যেন বসন্তের যৌবন-শিহরণের বাণী। যে রঙের মেলা বনে-বনে, যে চাঞ্চল্য মানুষের মনে-মনে, কুহুধ্বনি যেন তাহারই সংগীতময় প্রকাশ। ইহা যেন বসন্ত-প্রকৃতির 'মর্মগান'। কুহুধ্বনি শুনিয়া কবির মনে হয়,—

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে,
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী ;
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি।
সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে ;
জটিল সে ঝঞ্চনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সংগীতে।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কবি কুহুধ্বনি শুনিয়া অতীতের মাঝে প্রবেশ করিয়াছেন, স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠিয়াছে কত যুগযুগান্তরের কাহিনী—কুহুধ্বনি অতীত যুগ হইতে নরনারীর চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে—

প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশ-লব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে ;
ঘন সহকারশাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে
কুহুতানে করুণা বরিষে।
লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্ত-সনে
শকুন্তলা লাজে থরথর ;
তখনো সে কুহু-ভাষা রমণীর ভালোবাসা
করেছিল সুমধুরতর'।

প্রকৃতির রুদ্র-মূর্তির তাণ্ডব নৃত্যের আলোড়ন পাওয়া যায় 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটিতে। নিষ্ঠুর জড়প্রকৃতির উদ্দাম মত্ততা—সমুদ্রবক্ষে ঝড়বৃষ্টির ক্ষিপ্ত মাতামাতির একখানি অত্যাশ্চর্য চিত্র পাওয়া যায় এই কবিতায়।

এই কবিতাটি একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে রচিত। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৪ সাল) 'রিট্রিভার' ও 'সার জন লরেন্স' নামে পুরীর তীর্থযাত্রীবাহী দুইখানি স্টীমার বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। তাহাতে প্রায় আটশত যাত্রীর প্রাণহানি হয়। এই দুর্ঘটনার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে সারা বাংলায় একটা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কবির লেখনী হইতে এই কবিতাটির জন্ম। 'মগ্নতরী' নামে এই কবিতাটি প্রথম 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। (১২৯৪, শ্রাবণ)

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকৃতির ললিত-মধুর মূর্তির চিত্র, তাহার সৌন্দর্য-মাধুর্যের, তাহার অন্তর্নিহিত রহস্য ও লোকোত্তর ব্যঞ্জনার রূপায়ণের সঙ্গে পাঠক বিশেষ পরিচিত। কিন্তু বাহিরের সৌন্দর্য-মাধুর্যের অন্তরালে যে তাহার একটি রুদ্র ও ভীষণ মূর্তি আছে, জড়শক্তির যে একটা নির্মম অংশ বাস্তবে বিরাজমান, এই ভাবানুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া মানসীর এই দুই-একটি কবিতা ব্যতীত তাঁহার বিপুল সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আর কোনো কবিতা লক্ষ্য করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ জড় ও চেতনে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছেন; বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে সৃষ্টি ও ধ্বংসের রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, সৃষ্টিস্রোতের গতিবেগে প্রকৃতির যে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার মূর্তি প্রকাশিত, তাহা রুদ্রদেবের বাম মুখের অভিব্যক্তি, অন্যদিকে সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দয-সুষমার মধ্যে প্রকাশিত তাঁহার দক্ষিণ মুখ—প্রসন্ন মুখ; সৃষ্টি-সাম্যের নিগূঢ় প্রয়োজনে একই শক্তির দুইটি বিরুদ্ধ রূপ সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত। বিশ্বের অন্তর্নিহিত একটা বিরাট সত্যের অঙ্গীভূত হইয়াই প্রকৃতির এই নির্মম ধ্বংসমূর্তির অস্তিত্ব—ইহাই কবির পরবর্তী সময়ের ভাব-সত্য। এই ভাঙা-গড়া জীবন-মৃত্যু একই সত্যের দুইটি অংশ—একই দেবতার লীলা,—

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও
বাম হাত হ'তে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কেবা জানে।...
খুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে,
মোরা কেঁদে ভাবি আমারি কী ধন
কে লইল বুঝি হ'রে?
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে কথাটি কেবা জানে।
ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও
বাম হাত হ'তে ডানে। [উৎসর্গ]

এই ভাব বিচিত্রপ্রকারে তাঁহার সাহিত্য-রচনায় মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু এই কবিতাটিতে জড়বস্তুপুঞ্জের ধ্বংসলীলার উপরেই কবির দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। জড়শক্তির নিষ্ঠুর হৃদয়হীন আঘাতে মানুষের নিরুপায় সান্ত্বনাহীন আর্তনাদ একটি চমৎকার ট্র্যাজিকরসের সৃষ্টি করিয়াছে।

কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মানবহৃদয়ের একটি চিরন্তন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবির সঙ্গে চিরদিনই একজন দার্শনিক, শিল্পীর সঙ্গে একজন সমালোচক যুক্ত হইয়া আছেন। কবি অনুভব করিতেছেন একদিকে জড়শক্তির প্রচণ্ড নির্মমতা, অন্যদিকে মানুষের স্নেহ-প্রেমের অতি কোমল ক্ষীণ শক্তি; এই অ-সম দ্বন্দ্বে মানুষ চিরদিনই পরাভূত হইতেছে। এই জড়শক্তির হাতে মানুষ খেলনামাত্র; জননীর স্নেহ, পত্নীর প্রেম, ভায়ের ভালোবাসা, মানুষের সমস্ত সুখ-আশা মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে। কবির প্রশ্ন এই—সংসারের এই যে নিরন্তর ভাঙাগড়া, প্রেম ও নিষ্ঠুরতার যুগপৎ অবস্থিতি একি দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তির চিরন্তন দ্বন্দ্ব—দুই দেবতার পাশাখেলার জয়পরাজয়? কবি এখন পযন্ত এই প্রশ্নের সন্দেহাতীত সমাধান করিতে পারেন নাই। অবশ্য পরবর্তী সময়ে দুইটিই যে একই দেবতার রুদ্র ও মধুর রূপের লীলা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ইহার পরবর্তী 'সোনার তরী'র যুগে যখন জগৎ ও জীবনপ্রীতি কবির মধ্যে প্রবল হইয়াছে, তখন কবির এই জিজ্ঞাসা একটা বিশ্বাসের আবেগোচ্ছলতায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। তিনি জড়শক্তির উপর প্রেমের জয়ঘোষণা করিয়াছেন। বিশ্বের এই চলমান ধ্বংসের মধ্যে প্রেম অবিনাশী, চিরজাগ্রত।

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন—'যেতে নাহি দিব'। হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।
প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত-ব্যগ্র-বাহু জ্বলন্ত-আঁখিতে
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্তকলরবে।...
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,

তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব'। যত বার পরাজয়
ততবার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।'

[সোনার তরী]

কিন্তু মানসীতে কবি প্রেমকে জয়ী করেন নাই, একটা নির্দ্বন্দ্ব ভাবসত্যে উপনীত হইতে পারেন নাই।

প্রকৃতির ভীষণতার বর্ণনা, জড-প্রকৃতির বাস্তব রুদ্ররসের উৎসারণে কবিতাটি অনবদ্য এবং সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে একক। বাস্তব চিত্রধর্মিতা এই কবিতাটির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ, বজ্রের ধ্বনি, বিদ্যুতের মুহুর্মুহু দীপ্তি, বন্ধনমুক্ত অগণিত দৈত্যের মতো উত্তাল তরঙ্গের গতি, তরঙ্গশীর্ষের ফেণপুঞ্জের উপর বিদ্যুৎ-রশ্মিপাতে জড় প্রকৃতির 'তীক্ষ্ণ, শ্বেত, রুদ্র হাসি' প্রভৃতির বর্ণনা উপযুক্ত শব্দযোজনা ও অতি-সার্থক উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাদি অলংকার প্রয়োগে প্রকৃতির হিংস্র, ভয়াল মূর্তির একখানি অপূর্ব জীবন্ত চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে। এই কবিতাটি কবির উচ্চাঙ্গের বর্ণনাশক্তি ও উৎকৃষ্ট কবিদৃষ্টির সাক্ষর বহন করিতেছে। তাঁহার শক্তির পরিণতির প্রথম সোপানেই এইরূপ একটি সৃষ্টি বিস্ময়কর।

নিষ্ঠুর জড়-প্রকৃতির উদ্দাম মত্ততা—ঝড়বৃষ্টির ক্ষিপ্ত মাতামাতির একখানি অপরূপ চিত্র এই কবিতাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি, হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন।
... ...
নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?

এই অন্ধ, মূক, বধির, হৃদয়হীন বস্তুপুঞ্জের উন্মত্ত প্রলয়-নৃত্যের পট-ভূমিকায় ভয়-ব্যাকুল মাতা দারুণ উৎকণ্ঠায় শিশু-পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেছে—করাল, নিশ্চিত

মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বার সম্মুখে তাহার বুকের ধনকে ছাড়িয়া দিতে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে—আর শঙ্কিত, ব্যাকুল মায়ের বুকে বিপুল উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিয়াছে স্নেহ-সিন্ধু। একদিকে নিষ্ঠুর জড়-প্রকৃতি, অন্যদিকে বিপুল স্নেহ। একদিকে ধ্বংস, মৃত্যু—অন্যদিকে মৃত্যুজয়ী স্নেহ। পৃথিবীর বুকে দুটি বিরুদ্ধ শক্তির লীলা চলিয়াছে বিস্ময়কর রূপে। মানব-হৃদয়ের এই স্নেহ-প্রেম ও জড়-প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার সংগ্রাম লক্ষ্য করিয়া কবি দারুণ সংশয়াকুল হইয়াছেন,—

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই,
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা-আশা একত্র বেঁধেছে বাসা,
এক সাথে রয়।
কেবা সত্য, কেবা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে,
কভু ঊর্ধ্বে, কভু নিচে টানিছে হৃদয়।
জড়দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিকো মানে;
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
একি দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময়।
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয় ?

এই ভাঙা-গড়া খেলা যে দুই দেবতার নয়—একই দেবতার রুদ্র ও মধুর রূপের খেলা—কবি পরবর্তী কালে তাহা বুঝিয়াছেন।

'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতায় কবি বলিতেছেন,—

সারা বিশ্ব প্লাবিত করিয়া সৃষ্টির বন্যা ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার ঘূর্ণ্যমান আবর্ত ও বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে শত শত সৃষ্টি ও ধ্বংস মুহূর্তে মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে গর্জন-মুখর স্রোতোধারায়—মুহূর্তের তরে থামিবার তাহার অবসর নাই—একবার ভাসিতেছে, আর একবার ডুবিতেছে—আজ যে প্রিয়জনকে সে বুকে জড়াইয়া ধরিতেছে, কাল ফেনিল আবর্তে তাহাকে হারাইতেছে। তাহার বিলাপধ্বনি, এই প্লাবনের গর্জন-কোলাহলে কোথায় মিশিয়া যাইতেছে! এমনি করিয়া এক অন্ধ, নিষ্ঠুর সৃষ্টির স্রোত আকাশ-বাতাস প্লাবিত করিয়া সারা বিশ্বের উপরে বহিয়া চলিয়াছে—আর অসহায় মানুষ, তাহার প্রেম, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি লইয়া তৃণখণ্ডের মত তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে ভাসিতেছে ও ডুবিতেছে। তাহার কোনো শক্তি নাই যে এই স্রোতোধারার বিন্দুমাত্র গতি সে ফিরাইতে পারে। কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'নন্দনের তটতরু' হইতে খসিয়া-পড়া এই যে মানবহৃদয়

কে তোরে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে।

কিন্তু বিধাতার দরবারে তাহার কোন উত্তর নাই—

সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহককল্পনা।

'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, প্রকৃতি বর্ণ, গন্ধ ও গানের বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইয়া মায়াবিনীর ন্যায় মানুষের সরল প্রাণ ভুলাইতে ব্যস্ত। মানুষ তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হৃদয় দান করে ও প্রেমের আনন্দ-বেদনা অনুভব করে। কিন্তু 'প্রকৃতি মানুষকে ভালোবাসে না—তাহার হৃদয়ে কোনো প্রেম নাই—কোনো মায়া-দয়া নাই। সে কেবল মানুষের হৃদয় লইয়া নিশিদিন ছিনিমিনি খেলিতেছে। তবুও মানুষ তাহার বিচিত্র সৌন্দর্যের মোহে আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতির মধ্যে অতলস্পর্শ রহস্য বিদ্যমান—নিশীথ-রাতে সে নক্ষত্রের শত প্রদীপ জ্বালিয়া উজ্জ্বল বেশে আবির্ভূত হয়—কোথাও নির্জনতার মধ্যে সে চির-মৌনব্রতা, কোথাও বালিকার মতো ক্রীড়াময়ী—কলহাস্যমুখরা, কখনো সে ক্রোধে উন্মাদিনী—চোখের হিংস্র জ্বালায় পৃথিবী শ্মশান করিতে উদ্যত—কখনো সূর্যাস্তের ম্লান ছায়ায় বিষাদিনী—অশ্রুমুখী। প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইবার কারণ—মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রকৃতির এই রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই—তাই তাহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছে—তাহাকে এত ভালোবাসিয়াছে—

যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহারূপরাশি ;
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালোবাসি।

মানসীর 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটি নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা। যে-অনন্যসাধারণ প্রকৃতিপ্রীতি, যে-বিশ্বাত্মবোধ—পৃথিবীর জলস্থল-তরুলতাপশুপক্ষীর মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া উহার সৌন্দর্য-পানের জন্য যে-সুতীব্র বাসনা রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই 'অহল্যার প্রতি' কবিতার মধ্যে তাহার প্রথম প্রকাশ দেখা যায়।

গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যা ইন্দ্রের সঙ্গে ব্যভিচারদোষে অপরাধী হওয়ায় স্বামী

গৌতমের অভিশাপে সে পাষাণে পরিণত হইয়া দীর্ঘদিন নির্জন আশ্রমের একাংশে মাটির সঙ্গে মিশিয়া ছিল। তারপর রামচন্দ্র সেই আশ্রমে আসিলে তাঁহার পাদস্পর্শে অহল্যা শাপমুক্ত হইয়া পূর্বজীবন প্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যায়িকাকে নিজস্ব ভাব-কল্পনা-প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অহল্যার মধ্যস্থতায় কবি প্রথম বসুন্ধরার অপরিসীম সৌন্দর্য ও রহস্যপানের ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছেন এবং ধরিত্রীর অন্তরের গোপন প্রাণরসকেন্দ্রের সন্ধান পাইয়াছেন।

ইহার পর নিজ হৃদয়ের এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির চরম প্রকাশ হইয়াছে 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়। অতি সূক্ষ্ম ও সুতীব্র কল্পনাশক্তির বলে কবি বসুন্ধরাকে একটি জীবন্ত সত্তারূপে গ্রহণ করিয়া তাহার চেতন-অচেতন সমস্ত বস্তুর সঙ্গে তাঁহার আত্মার গভীর সংযোগ ও 'জননান্তর সৌহৃদানি' স্থাপন করিয়াছেন। নিজেকে বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া অন্তহীন রসপিপাসা-শান্তির দুরন্ত বাসনায় আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র অনুভূতি, এমন দিগন্তপ্রসারী কল্পনার লীলা, এমন এক অপূর্ব ভাবস্বপ্ন বিশ্বসাহিত্যে আর দেখা যায় না। এমন অভিনব ভাবকল্পনা পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের কথায়, 'The Triumph of Romantic Imagination' বলিয়া অভিহিত করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিয়াছেন, বসুন্ধরার সঙ্গে তাঁহার নাড়ীর যোগ, তাঁহার নিবিড় পরিচয় জন্মজন্মান্তরের; একদিন তিনি তাহার সহিত এক-আত্মা, এক-দেহ হইয়া ছিলেন,—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

[বসুন্ধরা, সোনার তরী]

যে ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যের প্রাণরসধারা ধরিত্রীর বক্ষ হইতে নিঃসারিত হইয়া ফলপুষ্প, তরুলতা, নদনদী, পর্বত-অরণ্যকে নিগূঢ় আনন্দরসে অভিসিক্ত করিতেছে, কবি সেই প্রাণশক্তিকে সারা দেহ-মন দিয়া অনুভব করিতেছেন। তাঁহার মনে পড়িতেছে, একদিন তিনি জলেস্থলে আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া ছিলেন।

তাই এই রূপরসময় বিচিত্র ধরণী তাঁহাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে,—তিনিও তাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। সেই সৌন্দর্য, প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের ধারা বসুন্ধরার বক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইতেছে, কবি তাহার সহিত যুক্ত হইতে চাহিতেছেন,—

আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু।

[বসুন্ধরা, সোনার তরী]

রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মতার অনুভূতি। এক চেতনা প্রথম বাষ্প-নীহারিকা, তরুলতা-সরীসৃপ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি বিচিত্র অভিব্যক্তির স্তরের মধ্য দিয়া বর্তমান মানবজীবনে উদ্ভিন্ন হইয়াছে। একই প্রাণ জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগতের মধ্যে বিকাশের স্তরে স্তরে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। মানুষ একদিন তৃণলতা-ফল-পুষ্প-পশু-পক্ষীর সহিত এক হইয়া একত্র জীবন কাটাইয়াছে, তাহাদের সহিত মানুষের একটা অন্তরের যোগ, একটা নাড়ীর টান বিদ্যমান, তাই বসুন্ধরার বুকের সমস্ত জিনিস তাহার অতো ভালো লাগে—তৃণলতা-গুল্ম-ফল-পুষ্পের আনন্দ-চাঞ্চল্য, নদনদী-গিরি-সমুদ্র-আকাশের সৌন্দর্য ও সংগীত মনকে অতো উতলা করে। কবি এই আবেগময় অনুভূতিকে কাব্যের ঐশ্বর্য দান করিয়াছেন। এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের মূল প্রেরণা। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য ও আনন্দকে যে তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে ধরিতে পারেন, তাহার কারণ, বিশ্বের সহিত তাঁহার একাত্মতা ও একদেহত্বের অনুভূতি প্রবল।

মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটী বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,

গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—আর্ত ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

[সমুদ্রের প্রতি, সোনার তরী]

কেবল 'সোনার তরী' নয় 'চৈতালি' পর্যন্তও কবির ধরণীর সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি প্রবল আছে। পদ্মাতীরের পল্লীপ্রকৃতির একটি বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,—

প্রবাসবিরহদুঃখ মনে নাহি বাজে,
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে,
ফিরিয়া এসেছি যেন আদিজন্মকালে
বহুকাল পরে ; ধরণীর বক্ষতলে
পশু-পাখি-পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

[মধ্যাহ্ন, চৈতালি]

এই জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি 'ছিন্নপত্র'-এর কয়েকটি পত্রে চমৎকার ভাবে লিপিবদ্ধ আছে,—

"ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্ ক্রুশো পৌলভর্জিনি প্রভৃতি বইয়ে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেত—এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারী জেগে ওঠে। এর যে কী মানে আমি ঠিক ধরতে পারিনে, এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে আমি ঠিক বুঝতে পারিনে—এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান—এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জলস্থল-পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন-শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গ যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে—আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত

অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথ। আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে, কিন্তু ওটা বোধহয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না—কী একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে।”

[ছিন্নপত্রাবলী, নং ৭০]

“এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন ‘একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল’ পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছি—অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না—তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশ-প্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না; আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্ছি।”

[ছিন্নপত্রাবলী, নং ৭৪]

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মহারা প্রকৃতিপ্রেমের প্রথম প্রকাশ এই কবিতায় অহল্যার ভূমিকায়। পাষাণীভূতা অহল্যার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে কবির নিজেরই ধরিত্রী-জননীর বিপুল স্নেহরস আস্বাদনের আকাজ্ক্ষাই প্রকাশ পায়।

মানসীতে কবি যে তাঁহার কাব্যশিল্পে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই কবিতাটিতে আছে। আবেগ ও কল্পনার সুষ্ঠু সামঞ্জস্য হইয়াছে, উপমার চিত্রধর্মিতা ও সার্থকতা বিশেষ লক্ষণীয় এবং ভাষা হইয়াছে অপূর্ব ব্যঞ্জনাধর্মী। ইহা মানসীর একটি উত্তম কবিতা।

অভিশাপগ্রস্ত অহল্যার পাষাণ-জীবন হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তির পর অহল্যাকে উদ্দেশ করিয়া 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটি লিখিত। অহল্যা পাষাণী হইয়া ধরিত্রীর বুকে মিশিয়া ছিল। এই বসুন্ধরা আপাতদৃষ্টিতে চেতনাহীন, জড়বস্তুপুঞ্জ মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রাণময়ী ও চেতনাময়ী—স্নেহময়ী জননীর মতো বিপুল মমতায় সমস্ত জীবকে তাহার বক্ষে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে। কবি অহল্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তুমি যে বসুন্ধরার দেহে এতকাল লীন হইয়া ছিলে, তোমার পাষাণ-দেহে কি চেতনা ছিল—তুমি কি তাহার বিপুল মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়াছিলে? এই কোটি কোটি প্রাণীর আনন্দ-বেদনার কলরব, পান্থের পদধ্বনি কি তোমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তোমার বিস্মৃতিময় নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত করে নাই? বসন্ত-সমীরে যখন ধরণীর সর্বাঙ্গে পুলক-প্রবাহ ছুটিত—উহা কি তোমাকে স্পর্শ করিত না? জীব-জগতের প্রবল জীবন-উৎসাহ যখন সহস্রপথে উদ্দাম হইয়া ছুটিত, সে বেগ কি তোমার পাষাণ-দেহ কম্পিত করে নাই? রাত্রিতে যখন সুষুপ্ত জীবগণ জননী বসুন্ধরার বুকে ঘুমাইয়া পড়িত, তখন সেই সন্তান-স্পর্শসুখে সে বিভোর হইয়া থাকিত, সে সুখের আস্বাদ কি তুমি পাইয়াছ? এই বিচিত্র বাহ্য জগতের অন্তরালে থাকিয়া জীবধাত্রী জননী বসুন্ধরা তাহার সন্তানদের আহার্য ও বিলাসের উপকরণ দিতেছে,—সেই নিভৃত মাতৃকক্ষে তুমি দীর্ঘদিন ঘুমাইয়া ছিলে। শত শত জীব, ক্লান্তি-গ্লানি-দগ্ধ জীবনের অবসানের পর, বসুন্ধরার সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া সকল তাপ দূর করিতেছে; তুমি তাহারই ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছ বলিয়া স্নেহময়ী মাতা নিজের হাতে তোমার সকল পাপতাপ-গ্লানি মুছিয়া দিয়াছে। তুমি

দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর সরল শুভ্র;......

অহল্যা অভিশাপ-অন্তে এক কলুষলেশশূন্য নবজীবন লাভ করিয়া, নব নব

সম্ভাবনায় রহস্যময়ী ও অপার বিস্ময়ের বস্তুরূপে শোভা পাইতেছে। এ তো সে পূর্বের অহল্যা নয়! নবজন্মে সে এক নতুন মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে। সে নগ্নমূর্তি এক রহস্যময়ী নারী। সে পূর্বেকার সেই পূর্ণ যুবতীই আছে বটে, কিন্তু শৈশবের কমনীয়তা ও সরলতা দ্বারা সে বিশেষভাবে পরিবেষ্টিত ও অনুরঞ্জিত। পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্প যেমন শ্যামপত্রপুটে বিন্যস্ত—শৈশব ও যৌবনের সমন্বয়ে সে যেন একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত। বিস্মৃতিসাগর হইতে নবীন উষার মতো সে উত্থিতা। এই নবজন্মে বিশ্বকে দেখিয়া অহল্যা বিস্ময়মগ্নচিত্ত—একবার ক্ষীণ পূর্বস্মৃতির উন্মেষে বিশ্বকে পরিচিত মনে হয়, আবার মনে হয়, ঠিক সেই বিশ্ব নয়; বিশ্বও অহল্যার নবরূপদর্শনে বিস্ময়ে নির্বাক। অহল্যার সঙ্গে বিশ্বের পূর্বজন্মের পরিচয় ছিল, এই নবজন্মে আবার নূতন করিয়া পরিচয় হইল। তাই চিরপরিচিতের সঙ্গে নূতন পরিবেশে আবার নূতন করিয়া পরিচয়-স্থাপন। কবি বলিতেছেন,—

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতি-সাগর-নীলনীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছে ধীরে।
তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্যতীরে
চির-পরিচয়-মাঝে নব-পরিচয়।

মানসীর শেষ কয়টি কবিতার মধ্যে 'গোধূলি', 'উচ্ছৃঙ্খল' ও 'আগন্তুক' কবির একটি বিশিষ্ট মনোভাবের পরিচায়ক।

তিনি পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেন না, অন্তরের সহিত বাহিরের, আদর্শের সহিত বাস্তবের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। কবি তাঁহার অশান্ত, চঞ্চল জীবনের বেগ ধারণ করিতে পারিতেছেন না। একটা অশান্তি, বিষাদ ও দুশ্চিন্তা যেন তাঁহাকে ঘেরিয়া আছে। গত তিন বৎসরের মধ্যে তিনি কলিকাতা, বন্দোরা, শাহজাদপুর, শিলাইদহ, পুণা, খিরকি, দার্জিলিঙ, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। এবার চলিলেন বিলাতে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। চঞ্চল মন কোথাও শান্তি পাইতেছে না। সাংসারিক জীবনের ব্যর্থতাই বোধহয় এই চঞ্চলতার কারণ। সংসারের সাধারণ লোকদের

মত পদসম্মান লাভ ও অর্থোপার্জন করিয়া কবি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন না, এইটাই তাঁহাকে বোধহয় ঐরূপ চঞ্চল করিয়াছিল। এই তিনটি কবিতা বিলাতযাত্রার (৭ই ভাদ্র, ১২৯০) অব্যবহিত পূর্বে রচিত।

'গোধূলি'তে কবি তাঁহার শ্রান্ত, ক্লান্ত, আশাহত জীবনের কথা বলিতেছেন,—

নিষ্ফল দিবস অবসান,—
কোথা আশা, কোথা গীত গান।
শুয়ে আছে সঙ্গীহীন প্রাণ
জীবনের তট বালুকায়।
দূরে শুধু ধ্বনিছে সতত
অবিশ্রাম মর্মরের মতো,—
হৃদয়ের হত আশা যত
অন্ধকারে কাঁদিয়া বেড়ায়।

কবির চারিপাশে প্রত্যহের যে জীবনস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কবি তাহার সহিত মিশিয়া ভাসিয়া যাইতে পারিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন,—

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ
অনিয়ম শুধু আমি! [উচ্ছৃঙ্খল]

তিনি যেন বিধাতার এক অর্থবিহীন প্রলাপ—দুরন্ত ঝড়ের মত নিজের বেগ সামলাইতে না পারিয়া কেবল দিনরাত ছুটিতেছেন। হৃদয়ে তাঁহার বেদনা, প্রাণে দুরন্ত সাধ—এই বেদনা ও আশার ভার বহন করিয়া তিনি কক্ষচ্যুত উল্কার মতো উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ছুটিয়া চলিয়াছেন—তাঁহার কেবল মনে হইতেছে,—

শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,
তারি তরে বহি চিরদিবসের
চিরমনোব্যাকুলতা। [উচ্ছৃঙ্খল]

'আগন্তুক' কবিতাটিতেও কবি যে সাধারণের অপেক্ষা পৃথক, তিনি ক্ষণকালের জন্য এই সংসারের উৎসব-মন্দিরে আসিয়াছেন, পরক্ষণেই কোন্ অজানা গৃহহীন দেশে চলিয়া যাইবেন—এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—

ওগো সুখী প্রাণ, তোমাদের এই
ভব-উৎসব ঘরে
অচেনা অজানা পাগল অতিথি
এসেছিলো ক্ষণতরে।

তারপর অপরিচিত, অনাদৃত অবস্থাতেই পাগল-অতিথি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল।

মানসীর শেষ দিকের 'আশঙ্কা', 'বিদায়', 'সন্ধ্যায়', 'শেষ উপহার', 'আমার সুখ' কবিতা কয়টি প্রেম-সম্বন্ধে।

কবির মানস-প্রিয়া এক অনন্ত সৌন্দর্যময়ী, অসীম প্রেমময়ী নারী। তাহার সহিত কবির জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ। সকল কালের সকল কবিরা তাহারই উদ্দেশে প্রেম-সংগীত রচনা করিয়াছে। সে সর্বকালের সকল প্রিয়ার চিরন্তন প্রতীক। কবি তাঁহার প্রিয়ার ধ্যানে বিশ্বকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মচেতনায় প্রিয়ার বিরাট সত্তা সকলকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কবি আশঙ্কা করিতেছেন —আজ সমস্ত বিশ্ব যে প্রিয়ার আড়ালে লুকাইল, ইহা কি ভালো হইল?

কে জানে এ কি ভালো?
আকাশভরা কিরণধারা
আছিল মোর তপন তারা
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো,
কে জানে একি ভালো? [আশঙ্কা]

প্রিয়া ছাড়া কবির আর বিপুল বিশ্বে কোনো আশ্রয় নাই—

সকল গান, সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান,
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাই ঠাঁই। [ঐ]

কবির মানসী ক্রমে কবিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার বিশ্বব্যাপিনী মূর্তিই কবির চিন্তা ও কর্মের একমাত্র কেন্দ্রীয় শক্তি। তাহারই আকর্ষণে সুরু হইয়াছে কবির জীবনযাত্রা।

অকূল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন-তরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস…
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার-মাঝে অস্তাচল-কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ-মাঝে। [বিদায়]

চিরন্তন সৌন্দর্য ও প্রেমের মূর্ত প্রকাশ কবির মানস-প্রিয়া। প্রথমে কল্পলোকের সেই অনন্ত সৌন্দর্যময়ী ও প্রেমময়ী নারীকে কবি মানবীর মধ্যে খুঁজিতে যাইয়া

মানবীর শত অসম্পূর্ণতায় ব্যথিত হইয়াছেন। ভোগকামনা শান্ত হইলে, অসংযত প্রবৃত্তি দমিত হইলে, তাঁহার প্রশান্ত দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে মানবীর মধ্য হইতেই তাঁহার মানসীর চিরন্তন মূর্তি। সান্ত হইতে উঠিয়াছে অনন্ত, ক্ষণিক হইতে চিরন্তন, মানবী হইতে মানসী। 'মানসী'র প্রথম দিকের প্রেম-কবিতার মধ্যে আমরা ইহা দেখিতে পাই। কবির সেই মানসপ্রিয়া তাঁহার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিলেও—সে যে সংসারের বস্তুজালের ঊর্ধ্বে অপার্থিব রাজ্যের ধন—সমস্ত দুঃখ-সুখের, প্রয়োজনের বাহিরের।

তাঁহার মানসী সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীকরূপে নিত্য সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, এ-কথা কবি বুঝিতে পারিতেছেন,—প্রেয়সীর সহিত তাঁহার মিলন-মেলা ভাঙিয়া আসিতেছে। এই মিলন-লগ্নের শেষে সন্ধ্যার মত শান্তি, সৌন্দর্য ও করুণা লইয়া কবিকে সান্ত্বনা দিয়া শেষ বিদায় লইবার জন্য কবি তাহাকে অনুরোধ করিতেছেন,—

ওগো তুমি অমনি সন্ধ্যার মতো হও।
... ...
অমনি সুন্দর শান্ত, অমনি করুণ কান্ত,
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মতো ধীরে ধীরে আমার জীবন-তীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।
... ...
রাখো এ কপোলে মম নিদ্রার আবেশসম
হিমস্নিগ্ধ করতালখানি।
বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের 'পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি।
তারপর পলে পলে করুণার অশ্রুজলে
ভরে যাক নয়ন-পল্লব।
সেই স্তব্ধ আকুলতা, গভীর বিদায়-ব্যথা
কায়মনে করি অনুভব। [সন্ধ্যায়]

কবি বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহার মানসী আর তাঁহার নয়। সে মানুষের বাসনা-কামনার বহু ঊর্ধ্বে,—চিরসৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানলোকে তাহার বাস। ধরার সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আদিরূপ সে। মানুষ তাহাকে কামনা করিয়া একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। সে কোনো ব্যক্তিগত মানুষের নয়, সারা বিশ্বের। কবির কল্পনালোকে মানসী আজ সমস্ত বিশ্বের চিরন্তনী প্রেয়সী। এই ভাবটি কবিবন্ধু লোকেন পালিতের একটি ইংরেজী কবিতার ছায়াবলম্বনে রচিত

'শেষ উপহার' নামক কবিতায় কবি রাত্রি ও ফুলের উপমার মধ্য দিয়া সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতেছেন।

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি'
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে ;
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এলো ; ফুরালো আমার কাল,
আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি ;··· [শেষ উপহার]

স্বরচিত কল্পলোকের নীরবতা ও নিভৃত রস-মাধুর্যের মধ্যে কবি তাঁহার প্রিয়াকে একান্ত করিয়া উপভোগ করিতেছিলেন। এখন সে বিশ্বের ধন। তাঁহার গণ্ডী দেওয়া উপভোগের প্রাচীর ভাঙিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে—এখন সে প্রখর দিবালোকে, উন্মুক্ত আকাশ-বাতাসের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সৌন্দর্যের আদি-রূপের কল্পনার ইহাই সূচনা।

৬

সোনার তরী

(১৩০০)

'সোনার তরী'র যুগে কবি-মানস একটা বিশিষ্ট অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। 'মানসী'র পর 'সোনার তরী'তে আসিয়া কবি এক অভিনব চেতনা ও প্রেরণা অনুভব করিলেন। প্রকৃতি ও মানুষের উপর তাঁহার পূর্বেকার দৃষ্টিভঙ্গী পরিণত ও পরিবর্তিত হইল। কল্পলোকের আলোকচ্ছটার পটভূমি হইতে উহাদিগকে সরাইয়া আনিয়া উদার আকাশ-বাতাসের মধ্যে স্থাপন করিয়া কবি উহাদের সহজ, সরল ও স্বাভাবিক রসমূর্তির সাক্ষাৎ পাইলেন। কবির কাব্য প্রকৃতি ও মানুষের স্বকীয় স্পর্শে নবীন মূর্তি ধরিয়া যেন সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

বাহিরের একটি ঘটনা তাঁহাকে প্রকৃতি ও মানুষের সহিত এমন নিবিড়ভাবে মিলনের সুযোগ করিয়া দিল। রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁহাদের জমিদারী তদারকের ভার পড়িয়াছিল। তাঁহাকে কাজের তাগিদে শিলাইদহ, শাহজাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে হইত। বাংলার নগ্ন পল্লী-প্রকৃতির সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য সারা প্রাণ দিয়া অনুভব করিবার সুযোগ তাঁহার মিলিল ; এবং

ইহার সঙ্গে পল্লীর নরনারীর ঘরকন্নার খুঁটিনাটি, তাহাদের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমানের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল নিবিড়।

প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যায় পদ্মার নির্জন চরে বোটে বসিয়া তিনি প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। প্রকৃতির নিজস্ব নগ্ন সৌন্দর্য ও তাহার অনির্বচনীয় মাধুর্য কবির নিকট এই সময় প্রথম ধরা দিল। তিনি প্রকৃতিকে প্রথম প্রাণ দিয়া ভালোবাসিলেন, তাহার রূপ-রস-ছন্দ-গানে বিস্মিত, পুলকিত ও সচকিত হইয়া উঠিলেন। প্রকৃতির নিজস্ব অন্তঃপুরে কবির সহিত চিরজীবনের তরে তাহার মালা-বদল হইয়া গেল।

এই নিবিড় পরিচয়ের তন্ময়তায় প্রকৃতির সহিত কবি একাত্মত্ব অনুভব করিলেন। মনে হইল, তিনি সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে মাটির সহিত মিশিয়া আছেন এবং বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ নিজের জীবনধারার মধ্যে অনুভব করিতেছেন। তরুলতা, আকাশ, মাঠ, বালুচর, নদী, সন্ধ্যাতারাকে তাঁহার কতদিনের পরমাত্মীয় বলিয়া মনে হইল। সেগুলি তাঁহার অন্তরঙ্গ জীবনের পক্ষে গভীর তাৎপর্যময় হইয়া উঠিল। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-গান, তাহার অন্তর্গূঢ় রহস্য তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া দিল। এই সময়কার কবির অপরিসীম প্রকৃতি-প্রেম ও প্রকৃতির রূপ-রস আস্বাদনের অদম্য আগ্রহ 'ছিন্নপত্রে'র বহু পত্রে পাওয়া যায়।

"পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎসংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।" [ছিন্নপত্র, ৩১-৩২ পৃঃ]

"ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি! ওর এই গাছপালা, নদী, মাঠ, কোলাহল, নিস্তব্ধতা, প্রভাত, সন্ধ্যা, সমস্তটাশুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম?" [ঐ, ৫৪ পৃঃ]

"পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশান্তপ্রাণে এবং গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ • এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি! কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ। এই লোকনিলয়, শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে; আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি..." [ঐ, ১০১-১০২ পৃঃ]

"এমন সুন্দর শরতের সকালবেলা! চোখের উপরে যে কী সুধাবর্ষণ করছে সে আর কী বলব! তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে, এবং গাভী ডাকচে। এই ভরা নদীর ধারে বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপরে শরতের সোনালী আলো দেখে মনে হয় আমাদের এই নবযৌবনা ধরণী সুন্দরীর সঙ্গে কোন্ এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা চলেছে—তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ উদাস, অর্ধ সুখের ভাব গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন,—জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা।" [ঐ, ১৪৭ পৃঃ]

"এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরীরে আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত—আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশদেশান্তরের জলস্থলপর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হয়ে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত, মুকুলিত, পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে একটি আন্তরিক আত্মীয়-বৎসলতার ভাব আছে, ইচ্ছা করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে…" [ঐ, ১৬৩-১৬৪ পৃঃ]

"এই পৃথিবীটা আমার অনেকদিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নূতন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্রভূমিকে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত, তখন তার ঘন-শ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব-যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।" [ঐ, ১৭০-৭১ পৃঃ]

"আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব? আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলা দেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পারব? হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর কখনো ফিরে পাবো না। তখন চোখের দৃশ্য পরিবর্তন হবে—আর, কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাবো? এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে

সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপর এতো সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না।" [ঐ, ২০৬ পৃঃ]

"মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধ্যাবেলায় নৌকা করে নদী পার হতুম, এবং বোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারি একটা সান্ত্বনা বোধ হত। ঠিক মনে হত—আমার নদীটি যেন আমার ঘরসংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী—আমি কখন কাছারি থেকে ফিরে আসব এ জন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি স্নেহের স্পর্শ পেতুম!—ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্য সহচরী না মনে করে থাকতে পারিনে—সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।" [ঐ, ২৪৫ পৃঃ]

"সন্ধ্যাবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন মানুষটির মতো নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে তার পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীররেখা পর্যন্ত সমস্তটি একটি গোপন গৃহের মত ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়—আমার মধ্যে যে দুটি প্রাণী আছে, বাইরের আমি এবং আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকি—এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশুপক্ষী প্রাণী আমাদের অন্তর্গত হয়ে যায়—কানে জলের কলশব্দ আসতে থাকে, মুখের উপর জ্যোৎস্নার শুভ্র হস্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, আকাশে চকোর পাখী ডেকে চলে যায়, জেলের নৌকা পদ্মার মাঝখানে খরস্রোতের উপর দিয়ে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে পিছলে বহে যেতে থাকে, আকাশব্যাপী স্নিগ্ধরাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়—চোখ বুজে কান পেতে দেহ প্রসারিত করে প্রকৃতির একমাত্র যত্নের জিনিসের মতো পড়ে থাকি, তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে।" [ঐ, ২৮৫ পৃঃ]

বাঙালার পল্লীপ্রকৃতির সমস্ত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের সহিত কবি নিজেকে একেবারে মিশাইয়া দিয়াছেন—ইহার বিচিত্র সৌন্দর্য, মাধুর্য ও মায়ায় তিনি মুগ্ধ, বিস্মিত। ইহার অন্তরের নিজস্ব রাগিণী তাঁহার প্রাণের অতি গোপন তারে অপরূপ ঝংকার তুলিয়াছে। এতদিন প্রকৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল কল্পনার কুয়াশার মধ্য দিয়া, প্রকৃতির বাহিরের দরজায়, কলরব ও ভিড়ের মধ্যে—এবার পরিচয় হইল অন্তর্লোকে সুনিবিড়ভাবে।

এ-যুগে কেবল প্রকৃতিই নয়, মানুষের সহিতও তাঁহার পরিচয় হইল গভীর, পূর্ব হইতে অধিক গাঢ় ও অধিক অন্তরঙ্গ। পল্লীবাসীদের সুখদুঃখের ছায়ারৌদ্রখচিত জীবন, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মহত্ত্ব ও দুর্বলতা, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের প্রতিক্রিয়ার আনন্দ-বেদনাময় আবেগ কবির অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করিল। তিনি এবার প্রকৃত মানবলোকে প্রবেশ করিলেন। এ মানুষ তাঁহার কল্পনার রঙীন কাচের মধ্য দিয়া দেখা মানুষ নয়, নিজের বিশিষ্ট মনোভাব দ্বারা রঞ্জিত বিশেষ শ্রেণীর মানুষ নয়, কবি-মনের কোনো ভাবের প্রতীক নয়, এ মানুষ সংসারের সাধারণ মানুষ। এই মানুষের উষ্ণস্পর্শ এ-যুগে কবির সাহিত্যসৃষ্টিতে নূতন-

ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই যুগ তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'গল্পগুচ্ছে'র যুগ।

এই সময় কবি গভীর মনোযোগ ও আনন্দের সহিত তাঁহার চারিদিকের নরনারীর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন—অতি ক্ষুদ্র একটা শিশু বা নারী—এমন কি গো-মহিষ পর্যন্ত চক্ষু এড়ায় নাই। এ সময়কার কয়েকখানি চিঠিতেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি দেখিতেছেন,—

"খেয়া-নৌকো পারাপার করছে, পান্থরা ছাতা হাতে করে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট মাথায় করে হাটে আসছে—দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক ঠক শব্দে কাঠ চেলা করছে, একট ছুতোর অশথগাছের তলায় জেলেডিঙি উল্‌টে ফেলে বাটালি হাতে মেরামত করছে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্চে, গুটিকতক গোরু বর্ষার ঘাস অপর্যাপ্তপরিমাণে আহারপূর্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটির উপর পড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্চে···—" [ছিন্নপত্র, ২২০ পৃঃ]

"—···অন্ধকারের আবরণের মধ্য দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নিচে, নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালো-মন্দ, সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ, সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল—" [ছিন্নপত্র, ২৬৮ পৃঃ]

প্রকৃতি ও মানুষের এই নূতন পরিচয় কবির কাব্যে এক নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। 'সোনার তরী'তে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই প্রকৃতি ও মানুষের জীবন্ত স্পর্শ সম্বন্ধে কবি বহুকাল পরেও বলিয়াছেন,—

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, ওপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জনসজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচেছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্যে চিন্তা করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি—সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ ও কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা ও ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এবং সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল 'সোনার তরী'তে।" সূচনা, রবীন্দ্ররচনাবলী, বৈশাখ, ১৩৪৭।

এই প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নূতন পরিচয়ের ফল—এই নূতন অন্তর্দৃষ্টির অনবদ্য দান 'সোনার তরী'।

রবীন্দ্র-প্রতিভার যে মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, তাহার অন্তর্নিহিত যে-রহস্য তাঁহার বিপুল সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা দেখি এই 'সোনার তরী' কাব্যে। 'সোনার তরী'র প্রথম কবিতা রচনার দশ মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রথম চৌধুরীকে যে পত্রখানি (২১ মে, ১৮৯০) লেখেন, তাহার মধ্যে কবি প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কবি-মানসের একটি বিশেষ প্রবণতা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেটি প্রণিধানযোগ্য।

> "আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা অধ্যাত্মিকজাতীয়, উদাসীন, গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিক জাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে Shelley-র Skylark আর একটা হচ্ছে Wordsworth-এর Skylark। একজন অনন্তসুধা প্রার্থনা করচে, আর একজন অনন্তসুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালোবাসে সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ—যে যেটা অধিক করে অনুভব করে।............কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাকলেই ভাল হয়, কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না—ভালো কবিমাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে—নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal-এর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার Centrifugal force Ideal-এর দিকে Real-কে নিয়ে যায় এবং অনুরাগের Centripetal force Real-এর দিকে Ideal-কে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।"

দুইটি বিপর্যতমুখী প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে সর্বদা ক্রিয়াশীল,—একটি বাস্তব ধরণীর প্রতি আকর্ষণ, অপরটি ধরণীর ঊর্ধ্বগত আকাশ-বিহারের আকাঙ্ক্ষা। লক্ষ্য করা যায়—কবি-মানসে যেন একটা নাগরদোলার ঊর্ধ্ব-অধ-সঞ্চারী নৃত্য চলিতেছে। ধরা যাক্, জল তরলাকারে চারিদিক প্লাবিত করে তাহার নিজসত্তার পরিচয় দিল, তারপর বাষ্প হইয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়া মেঘাকারে পরিণত হইল, আবার বাষ্পগঠিত মেঘ জল হইয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিল। আবার জল বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া গেল, তারপর আবার জলাকারে পৃথিবীতে নামিয়া আসিল।

কবির মধ্যে দেখা যায়, যখনই ধরণীর সৌন্দর্য-মাধুর্যের আকর্ষণ—জীবনের বাস্তব সুখদুঃখ-স্নেহ-প্রেমের অনুভূতি প্রবল হইয়াছে, তখনই সেগুলির ঊর্ধ্বে উঠিয়া উদার ভাবলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। আবার কেবল ভাবময় ও জগৎ-জীবনসম্বন্ধ-বিচ্যুত পরিস্থিতিতে বেশিদিন অবস্থান করিতে না পারিয়া ধরণীর ধুলোমাটির মধ্যে বাস্তবজীবনের আস্বাদ গ্রহণের জন্য নামিয়া আসিয়াছেন। এই চক্রাকারে আবর্তন তাঁহার কবি-মানসের একটি বৈশিষ্ট্য। এইটিকে তত্ত্বাকারে সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব বলা যায়। কবি বার বার সীমাকে ত্যাগ করিয়া অসীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন, আবার অসীম হইতে সীমায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুইটি বিপরীত কোটির মিলনের চেষ্টার মধ্যে তাঁহার দীর্ঘ সাহিত্য-জীবন ব্যয়িত হইয়াছে। তিনি এই বাস্তব সুখদুঃখের সংসারের মধ্যেই অনির্বচনীয়ত্বের, অপার্থিবত্বের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, অনিত্যের খেলাঘরে নিত্যের চরণচিহ্ন দেখিয়াছেন। ইহাই তো তাঁহার কবি-মানসের পরিচয় ও তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাস।

'সোনার তরী'র কবিতাগুলির মধ্যে কবি-কথিত দুই ধারার কবিতাই লক্ষ্য করা যায়। এক ধারায় জগৎ ও জীবনপ্রীতি, সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা, অন্যধারায় সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা। এই আদর্শ সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষার দ্বারা কবি প্রভাবান্বিত হইলেও, তাহাকে জগৎ ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কতকগুলি কবিতায় জগৎ ও জীবনবিচ্যুত এই আদর্শ অনুসরণের ব্যর্থতার কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার সকল সাহিত্যসৃষ্টিতে জগৎ ও জগদুত্তরণ, বাস্তব ও আদর্শ, দেহ ও আত্মা, ইন্দ্রিয়জ ও অতীন্দ্রিয়ের সম্মেলন করিতে চাহিয়াছেন কবি। সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রশ্নে বাস্তবদৃষ্টির সঙ্গে ভাববাদী ও রোমান্টিক দৃষ্টি ত্যাগ করিতে পারেন নাই, জীবনের বিচিত্র জিজ্ঞাসায়, নানা সমস্যায় তিনি বৃহত্তর ভাবাদর্শ ও সর্বজনীন সত্যের পটভূমিকাতেই সমাধান খুঁজিয়াছেন।

প্রকৃতি ও মানবসংবলিত এই বিশ্ব কবির মনে গভীরভাবে প্রবেশ করায়, ইহার অন্তর্নিহিত সমস্ত সৌন্দর্য তাঁহার অনুভূতির সূক্ষ্ম তারে সুতীব্র ঝংকার তুলিয়াছে। প্রকৃতির বিচিত্র লীলা, মানবজীবনের যে শত-সহস্র প্রকাশ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এই বৈচিত্র্যময় লীলাকে ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যে অখণ্ডভাবে অনুভব করিয়াছেন। বিশ্বের রূপজগতে যে তরঙ্গ অহরহ উত্থিত হইতেছে, তাহার প্রবাহ তাঁহার মনকে নিরন্তর প্লাবিত করিয়াছে। বিশ্বকে সমগ্রভাবে অনুভব করা এবং উহার সৌন্দর্যে ও রহস্যে আত্মহারা হওয়া এ-যুগে কবি-মানসের একটি বিশিষ্ট্য অবস্থা। এই বিশ্ববোধ এবং বিশ্বের সৌন্দর্য ও রহস্যের

সুতীব্র অখণ্ড অনুভূতি 'সোনার তরী'র মূল সুর এবং 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত সমস্ত রচনার মধ্যে প্রবলভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই যে বিশ্বসৌন্দর্যচেতনা—এই আকাশ, মাটি, তরু-লতা-পশু-পক্ষীর বিচিত্র রূপের প্রাণময় লীলা—এইসকল সৌন্দর্যের একটা সংগীতময় নৃত্য অনুক্ষণ তাঁহার কবি-চিত্তের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া দিতেছিল। এই সৌন্দর্যের সংগীত আর নৃত্যই এক অভিনব কাব্যরূপে আমরা 'সোনার তরী'তে প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। মূলত এই বিশ্বসৌন্দর্যের সংগীত আর নৃত্যই নানারূপে আজীবন তাঁহার সাহিত্যকলার প্রধান প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং এই বিরাট আনন্দ-নৃত্যই শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে সমস্ত বন্ধনমুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব, চরম আদর্শের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

ইহার পূর্বে কবি কল্পনার নিরালা কাননতলে বসিয়া ছায়ারৌদ্রের জাল বুনিতেছিলেন—সামনের জগৎ ছিল তাঁহার মানসদৃষ্টিতে প্রতিভাত এক আদর্শ জগৎ। এই মনোজগৎ ও বাহর্জগৎ, এই কল্পনা ও বাস্তবের, এই মায়া ও সত্যের কোনো সমন্বয় এতদিন সাধিত হয় নাই। এখন কবি সে সমন্বয়-রহস্যের সন্ধান পাইলেন। বাস্তব বিশ্বের সত্য ও সুন্দর রূপ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল। এই বাস্তব সত্য ও সুন্দরের প্রকাশবিহীন কল্পনার জগতে বাস করায় জীবনের যে ব্যর্থতা উপলব্ধি হইয়াছে— কবি তাহা সোনার তরীতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাল্পনিক জীবনের ব্যর্থতা ও প্রকৃত বিশ্বসৌন্দর্যের অনুভূতি সোনার তরীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সমগ্র সোনার তরী বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাবধারার কবিতা দেখা যায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোনো ধরা-বাঁধা লেবেল-আঁটা বিভাগ অসম্ভব, তবুও এই বিভাগ সাধারণ পাঠকের সহজবোধকে কিছু সাহায্য করিবে মনে করি।

(ক) প্রকৃতি-মানবের অন্তর্নিহিত যে সৌন্দর্য, সেই বিশ্বসৌন্দর্য কোনো কল্পনারাজ্যে অধিষ্ঠিত নয়। প্রকৃতির সহস্র প্রকাশ ও মানবজীবনের অসংখ্য বাস্তব বিকাশের মধ্য দিয়াই সেই সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত আমাদের মনকে স্পর্শ করিতেছে। ইহাকে উপেক্ষা করিয়া কোনো কাল্পনিক ভাববিলাসের মধ্যে, বাস্তব-বর্জিত কোনো আদর্শলোকে, সেই বিশ্বসৌন্দর্যকে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত করিয়া অন্বেষণ ও উপভোগ করিতে গেলে তাহাকে পাওয়া যায় না। আমাদের চেষ্টা ও শ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ভাবকে রূপকের সাহায্যে বলা হইয়াছে কয়েকটি কবিতায়,—'সোনার তরী', 'পরশ পাথর', 'আকাশের চাঁদ', 'দেউল', 'দুই পাখী' প্রভৃতি।

(খ) সংসারকে সত্যভাব গ্রহণ ও ধরণীর প্রতি ভালোবাসা,—'মায়াবাদ', 'খেলা', 'গতি', 'মুক্তি', 'অক্ষমা', 'দরিদ্রা', 'আত্মসমর্পণ', 'বৈষ্ণব কবিতা' প্রভৃতি।

(গ) বিশ্বের সহিত একাত্মবোধ এবং বিশ্বসৌন্দর্য ও রহস্যের সুতীব্র অনুভূতি—'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'বিশ্বনৃত্য', 'মানসসুন্দরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'।

(ঘ) মানুষের প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি সুকুমারভাবব্যঞ্জক,—'ভরা ভাদরে', 'প্রত্যাখ্যান', 'লজ্জা', 'ব্যর্থ-যৌবন', 'হৃদয়-যমুনা', 'দুর্বোধ', 'যেতে নাহি দিব' ইত্যাদি।

(ঙ) মৃত্যুবিষয়ক,—'প্রতীক্ষা', 'ঝুলন'।

(চ) রূপকথা,—'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা'।

(ছ) হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি বিদ্রূপ,—'হিং টিং ছট্'।

(ক) 'সন্ধ্যা-সংগীতে'র রুদ্ধ জীবন হইতে মুক্ত হইয়া 'প্রভাত-সংগীতে' কবি প্রথম বিশ্বকে লাভ করিলেন। এই অননুভূতপূর্ব চেতনার বিপুল উচ্ছ্বাস কবিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। প্রভাত-সংগীতের বিশ্ববোধ একটা মুক্তির অকারণ আবরণ আনন্দ,—একটা অনির্দিষ্ট আবেগের প্লাবন-বেগের নিকট আত্মসমর্পণ করা। কবির চোখ অন্ধ হইয়া ছিল, হঠাৎ দৃষ্টিলাভ করিয়া সম্মুখে উদ্ভাসিত দেখিলেন বিশ্বের অপূর্ব সৌন্দর্যময়, আনন্দময় রূপ। এক অপূর্ব বস্তুলাভ ও নূতন জগতে প্রবেশ করার উত্তেজনা ও আহ্লাদ প্রাপ্তবস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিবার অবাধ অবসর কবিকে দিল না। কেবল প্রাপ্তিরই আনন্দ, কেবল নবলব্ধ চেতনারই উচ্ছ্বাস কবি প্রভাত-সংগীতে অনুভব করিলেন। তার পর 'ছবি ও গানে' কবি বিশ্বসৌন্দর্যকে উপভোগ করিয়াছেন কল্পনার রঙীন কাচের মধ্য দিয়া, কল্পনার রস বস্তুতে সংক্রামিত করিয়া। 'কড়ি ও কোমলে'র কবি বিশ্বকে দেখিয়াছেন স্বপ্নাবেশের চোখে, যৌবনের রঙে রঞ্জিত করিয়া, কেবল ভালো-লাগার অকারণ মোহে। যদিও কবি বলিয়াছেন যে, এ-যুগে প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন-স্নেহ-প্রেম লইয়া তাঁহাকে "মুগ্ধ করিয়াছে", তবুও প্রকৃতি ও মানবের অন্তর্লোকে তাঁহার প্রবেশ অবারিত হয় নাই। কেবল "মানুষের জীবন-নিকেতনের সম্মুখের রাস্তায়" তিনি দাঁড়াইয়াছেন মাত্র। প্রকৃতি মানবজীবন হইতে পৃথক্ হইয়া পিছনে পড়িয়া আছে। নারীদেহে যে এক পরমাশ্চর্য সৌন্দর্য আছে, প্রেমে যে এক অনির্বচনীয় মাধুর্য আছে, যৌবন-স্বপ্ন-মুগ্ধ তরুণ কবির জীবনে এই অনুভূতি জাগিয়াছে বিপুল আবেগের সহিত। 'মানুষের জীবন-নিকেতনের প্রথম প্রবেশের পথেই কবি যে সৌন্দর্য ও প্রেমের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, তাহারই অপরূপ গতি, প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যের প্রকাশে

'মানসী'র কলেবর হইয়াছে বিশেষভাবে পূর্ণ। মানবীয় প্রেম তাহার ক্ষুদ্রতা, খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতা ত্যাগ করিয়া এক অখণ্ড, অনন্ত ও চিরন্তন ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে। প্রেমের মধ্যে যে লোকোত্তর-চমৎকার রস আছে, যে অপার্থিবত্ব, অনন্তত্ব আছে, তাহাকে ভুলিয়া, উহার চিরনির্মল, অখণ্ড ও পরিপূর্ণ রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া, মানুষ উহাকে একান্ত ভোগের সামগ্রী করে, বাসনার 'সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা' দিয়া উহাকে কাটিয়া কাটিয়া নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার আয়োজন করে। মানুষের স্বভাবজ মনোধর্মগত ও আত্মকেন্দ্রিক এই ভোগস্পৃহার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য 'মানসী'তে কবি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াছেন এবং প্রেমকে অনন্ত, অপার্থিব ও জন্ম-জন্মান্তরের বলিয়া দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'মানসী'তে কবি মানবীয় সৌন্দর্য ও প্রেমকে যে এক আদর্শলোকে উন্নীত করিলেন, তাহাতে সৌন্দর্য ও প্রেম এই জগতে সাধারণ মানুষের গণ্ডীর বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই দুর্লভ আদর্শ প্রেম সংসারের মধ্যে পাওয়া যায় না। তার পর প্রকৃতি ও মানবের সহিত যখন তাঁহার পরিচয় হইল গভীর ও নিবিড়, তখন দেখিলেন, সেই সৌন্দর্য ও প্রেম আদর্শরাজ্যে নাই, মানুষের মধ্যে অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার মানস-প্রিয়াকে তিনি সাধারণ মানবীর মধ্যে দেখিতে যাইয়া ব্যথিত হইয়া তাহার জন্য যে আদর্শলোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেন আমাদেরই 'কুটির-প্রাঙ্গণে',—'ধরার সঙ্গিনী'র মধ্যেই তিনি তাঁহার মানসীকে প্রত্যক্ষ করিলেন। সৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি 'বিশ্ববিহীন বিজনে' উপভোগ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বের অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন উহারা বিশ্বের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া আছে। এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রথম ফল 'সোনার তরী'র রূপকবেশী কবিতাগুলি।

'সোনার তরী'র নাম-ভূমিকায় যে কবিতাটি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার অর্থ লইয়া বাংলা-সাহিত্যে যত হট্টগোল হইয়াছে, এত আর কোনো কবিতা লইয়া হয় নাই। বহু পণ্ডিত ও সমালোচক এই কবিতা হইতে বহু প্রকারের অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই কবিতায় যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি পরিপূর্ণকায়া পদ্মাতীরে, এক মেঘগর্জনমুখর বর্ষা-প্রভাতে বন্যাপ্লাবিত ক্ষেত্রে শিলাইদহের কোনো কৃষকের ধান-কাটা ও পারগামী কোনো নৌকায় সেই ধান উঠাইবার অসামর্থ্যের চিত্র হয়, তবে কোনো প্রশ্নই উঠে না। কবি এ সময় পল্লীপ্রকৃতির বিচিত্র পরিবর্তনশীল আবেষ্টনের মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন। শিলাইদহের গ্রামপ্রান্তে, পদ্মার চরে,

শ্রাবণ মাসে, বর্ষার থৈ থৈ জলের মধ্যে এইরূপ ধান-কাটা কবি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহারই একটি স্মৃতি এই অনুপম বর্ণনাত্মক কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—এরূপ বলিলে রসোপলব্ধিতে কোনো বিঘ্ন হয় না। এইভাবের কথা রবীন্দ্রনাথও চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"—ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষায় পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাটাধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙ্গি নৌকা হুহু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। এই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলিধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত।—ভরা পদ্মার উপরকার ঐ বাদল-দিনের ছবি 'সোনার তরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ও তার ছন্দে প্রকাশিত।" [রবি-রশ্মি, ২২৯ পৃঃ]

কিন্তু কবিতাটি রূপকধর্মী বলিয়া মনে হয়। মনে হয় কোনো ভাব, কৃষকটির ধান-কাটা ও নদীপথবাহিত কোনো নৌকায় তাহা উঠাইবার জন্য অনুরোধ এবং নাবিকের উপেক্ষা প্রভৃতির দেহ অবলম্বন করিয়া আত্মরূপে বিরাজ করিতেছে। এই সময় হইতেই কবি রূপকের সাহায্যে অনেক ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

রূপকের সাহায্যে ভাব অনেকটা তত্ত্বের রূপ প্রাপ্ত হয়; অনুভূতির স্পর্শ না থাকায় প্রকৃত কাব্যরসের সঞ্চার হয় না। কাঠামো বা বহিরঙ্গে হয়তো স্বতন্ত্র রসসঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু বহিরাবরণ ও প্রাণবস্তুর স্বাভাবিক সম্মেলন না হওয়ায় সমগ্র প্রাণ-সঞ্চার হয় না, এবং উহাতে প্রকৃত কাব্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রূপক-রচনা, অনেক ক্ষেত্রেই, মনোজগৎ ও বহির্জগতের—ভাব ও রূপের একটা সামঞ্জস্য হওয়ায়, রসময় কাব্যকলায় পর্যবসিত হইয়াছে। রূপক ও সংকেত-রচনা রবীন্দ্র-কবিমানসের একটি নিজস্ব প্রবণতা। ইহার দ্বারাই তিনি তাঁহার ভাব-সত্যকে রূপদান করিয়া সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

এই কবিতাটির রূপক অর্থ সম্বন্ধে কবি তাঁহার মত সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন একখানি ব্যক্তিগত পত্রে,—[বীরেশ্বর গোস্বামীকে লিখিত—৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১৩]

"সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে আমারও ঐ সঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদিগকে দুই দিনেই ভুলিয়া যায়। একবার ভাবিয়া দেখো, কত লক্ষ কোটি বিস্মৃত মানবের জীবনপাতের উপর আমাদের প্রত্যেকের জীবন গঠিত। আমাদের আহার-বিহার, বসন-ভূষণ, ধর্ম-কর্ম, ভাষা-ভাব সমস্তই পূর্ববর্তী অসংখ্য মানবের বিস্মৃত কর্ম—বিস্মৃত চেষ্টার দ্বারাই বিধৃত। আমরা আগুন জ্বালাইয়া রাঁধি, যাহারা আগুন আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাদিগকে কে জানে।

যাহারা চাষ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের নামই বা কোথায়। যাহারা যুগে যুগে নানারূপে মানুষকেই গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নাম-ধাম সুখ-দুঃখ লইয়া কোন বিস্মৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে; অথচ প্রত্যেকেই সংসারকে বলিয়াছিল, "আমার সমস্ত লও, তোমার জন্যই আমি খাটিতেছি; তোমাকে দিয়াই আমার সুখ, আমার সমস্তই লও, কিন্তু আমাকেও ঠেলিয়ো না, আমাকেও ভুলিয়ো না—আমার কাজের মধ্যে আমার চিহ্নটুকু যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়ো।" কিন্তু এত স্থান কোথায়। আমাদের জীবনের ফসল কোনো না কোনো আকারে থাকিয়া যায়, কিন্তু আমরা থাকি না।

"মানুষের এই একটা ব্যাকুলতা, এই বেদনা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও এই ব্যথা আছে; আমাদের সেবা, আমাদের প্রেম আমরা দিতে পারি, সেই সঙ্গে নিজেকে দিতে গেলেই সেটা বোঝা হইয়া পড়ে। আমরা প্রীতিদান করিব, কর্মদান করিব, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকেও চালাইতে যাইব না, ইহাই জীবনের শিক্ষা। কারণ, আমাকে চালাইতে গেলেই সেটা নিতান্ত অনাবশ্যক হয়, তাহাতে স্থান কুলায় না। সুতরাং, যাহা দিলাম তাহার মূল্য কমিয়া যায়।

"এ পারেতে ছোট খেত, আমি একেলা"—একলা নয় তো কী। আমরা প্রত্যেকেই যে একলা—আমাদের প্রত্যেকের চারিদিকে যে অতলস্পর্শ স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান আছে তাহা কে অতিক্রম করিবে; এই ব্যবধানের মধ্যে, প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের অন্তরালে আপনার জীবনের ক্ষেত্রটুকু লইয়া কাজ করিয়া যাইতেছি—কাজ করিতে করিতে, ফসল জমা হইতে হইতে এমন দিন আসিয়া পড়ে যখন বুঝিতে পারি, এ ফসল আমি কোথাও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। এ সমস্তই আমাকে দিয়া যাইতে হইবে। কাহাকে দিয়া যাইব। তাহাকে চিনি এবং চিনি না, সে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে কিন্তু ধরা দেয় নাই। আমি তাহাকে বলি, "ওগো, তুমি আমার সব লও, এবং আমাকেও লও।" সে আমার সব লয়, কিন্তু আমাকে লয় না। আমাদের সকলের কুড়াইয়া লইয়া সে কোথায় চলিয়াছে তাহা কি আমরা জানি! সে যে-অনির্দিষ্টের দিকে অহরহ যাইতেছে তাহার কূল কি আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তবু এই নিরুদ্দেশযাত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অপরিচিত অথচ পরিচিত মানবসংসারকেই আমাদের যাহা কিছু সমস্ত দিয়া যাইতে হইবে; নিজে তো কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না; নিজেকেও দিয়া যাইতে পারিব না।"

তারপর কবি ইহার প্রকাশ্যভাবে ব্যাখ্যা করেন,—

'সোনার তরী' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম। এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে। মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে, তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো—চারিদিকে অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—এই একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে—সেইজন্য গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হলো—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য-ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ, তখন সংসার বলে—তোমার জন্য জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার কি হবে? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

"প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা মানুষকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না,—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনো মতেই জমাবার জিনিস নয়।"

[শান্তিনিকেতন, ৪ঠা চৈত্র, ১৩১৫]

এই মহাকাল ও সোনার তরীর দৃষ্টান্ত কবি তাঁহার লেখার আর এক স্থানেও দিয়াছেন,—

"গ্রীস ও রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব হইয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।" [সংকলন, পূর্ব ও পশ্চিম, ১৯০ পৃষ্ঠা]

এই ভাবের কথা কবি চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মৌখিক আলাপেও বলিয়াছেন বলিয়া চারুবাবু জানাইয়াছেন,—

"মহাকাল প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, মানুষ তাহার কাছে নিজের সমস্ত কৃত-কর্ম, কীর্তি সমর্পণ করিতেছে এবং মহাকাল সেই সমস্তই গ্রহণ করিয়া এক কাল হইতে অন্যকালে, এক দেশ হইতে অন্যদেশে, বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যখন মানুষ মহাকালকে অনুরোধ করিল যে 'এখন আমারে লহ করুণা ক'রে' তখন মানুষ নিজেই দেখিল যে—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'!

মহাকাল মানুষের কর্ম-কীর্তি বহন করিয়া লইয়া যায়, রক্ষা করে, কিন্তু স্বয়ং কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করিতে চায় না। হোমার, বাল্মীকি, কালিদাস, শেক্‌সপীয়ার, নেপোলিয়ন, আলেকজাণ্ডার, প্রতাপসিংহ প্রভৃতির কীর্তিকথা মহাকাল বহন করিয়া লইয়া চলিতেছে, কিন্তু সে সেইসব কীর্তিমানদের রক্ষা করে নাই। যিনি প্রথম অগ্নি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বস্ত্রবয়নের তাঁত ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইতিহাস রক্ষা করে নাই, কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অমর হইয়া আছে।" [রবি-রশ্মি, ২২৮ পৃষ্ঠা]

কবির ব্যাখ্যার সমস্ত তুলনার অংশগুলি মিলাইয়া এইরূপ একটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা খাড়া করা যাইতে পারে,—

এ সংসারের প্রত্যেক মানুষ কৃষক। তাহার ক্ষেতটি আয়ুর দ্বারা সীমাবদ্ধ জীবন। অনন্ত কালস্রোত পদ্মার স্রোতের মতো ক্ষুরধারে ছুটিয়া চলিয়াছে। সোনার ধান কৃষকের সারাজীবনের কাজ। সে ক্ষেতে বসিয়া তাহার কর্মরূপ সোনার ধান কাটিয়া স্তূপীকৃত করিতেছে। এমন সময় কালের দূত মৃত্যু বন্যার ন্যায় তাহার আয়ুর চারি আলি-ঘেরা জীবনকে গ্রাস করিতে আসিল। তাহার পশ্চাতেই মহাকাল নাবিকের বেশে ইতিহাসরূপ সোনার তরী লইয়া সোনার

ধানরূপ জীবনের কার্যকে তাহার নৌকায় তুলিয়া লইলেন। কিন্তু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি মানুষকে লইলেন না। সে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া রহিল।

কাল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যুগে যুগে মানুষের সমস্ত কর্ম সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার জ্ঞানের সাধনা, বিজ্ঞানের সাধনা, অসংখ্য প্রচেষ্টার ফল সযত্নে রক্ষিত আছে, কিন্তু তাহাতে তাহার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের স্পর্শমাত্র নাই। কিন্তু মানুষ চায়, তাহার কর্ম, তাহার ধ্যান-ধারণার ফল, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপকার যেমন জগৎ ভোগ করিতেছে, সেই সঙ্গে তাহার ব্যক্তি-জীবনকেও যেন লোকে স্মরণ করে। কিন্তু জগৎ ব্যক্তিকে চায় না, কর্মকেই চায়। মানবজীবনের ইহাই একটা বড় ট্র্যাজেডি।

এই কবিতা-রচনার ১৫ বৎসর পরে কবি ইহার পরিচয় জানাইতেছেন। ইহার মধ্যে এই কবিতার অর্থ সম্বন্ধে কলরব, বাদানুবাদ ও বিতণ্ডায় বাংলার সাহিত্যাকাশ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কবি তাঁহার এই কবিতার 'মানে' বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীর সংকলয়িতা মোহিতচন্দ্র সেনও ভূমিকায় কোনো সুস্পষ্ট অর্থের উল্লেখ করেন নাই,—

"সোনার তরী কবিতার যদি কোনো অর্থ বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা এই যে—ঘন বর্ষা, ভরা নদী, সঞ্চিত ধন, দ্রুত বহমান তরী প্রাণে যে আকুলতা সঞ্চার করে, তাহার সহিত মানব-হৃদয়ের একটি অতি চিরন্তন ও গভীর বেদনা মিশ্রিত হইয়া একটি অপূর্ব রাগিণী সৃজন করিয়াছে, যে রাগিণীকে একটি চিত্রে অথবা অবস্থা-বিন্যাসে পরিণত করা হইয়াছে।'

অধিকাংশ উৎকৃষ্ট লিরিক কবিতাতেই পারিপার্শ্বিকের প্রভাব কবি-মনের উপর পড়িয়া তাঁহার ব্যক্তিগত ভাব-চিন্তা-বেদনা-কামনাকে মথিত করিয়া সার্বজনীন রসরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং ইহা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বলিয়া মনে হয় না। ইহা শ্রেষ্ঠ লিরিকের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনা মাত্র। 'অতি চিরন্তন ও গভীর বেদনা টি বলিতে লেখক ব্যক্তি-সত্তার ও ব্যক্তিস্বার্থের পরিহার ও মাত্র কর্মকেই গ্রহণের মধ্যে যে বেদনা আছে, তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন কি? তাহা হইলে এই ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথেরই অনুগামী।

কবির নিজের অর্থের একটা মূল্য বা মর্যাদা আছে বটে, তবে উহাই সব সময় তাঁহার বিশিষ্ট তাৎকালিক মানসিক অবস্থা (mood)-এর নিছক প্রতিরূপ বলিতে পারিত না। বিরাট প্রতিভার প্রকাশ সর্বদা চলমান (dynamic)। ঐ বিশিষ্ট মানসিক অবস্থাটি বা পূর্ববর্তী কোন্ অবস্থার ফলে তৎকালে ঐ অবস্থাটির উদ্ভব হইয়াছিল, বহু পরবর্তী কালে কবির না মনে থাকাই সম্ভব। তিনি তখন অপর সাধারণের মতো ভাষ্যকার—লেখক নন; দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক—কবি নন।

আমরা অন্যভাবেও এই কবিতাটিকে বুঝিতে পারি। কবির ভাব ও রস-জীবনের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সোনার তরী লিখিবার সময় তাঁহার মনে একটা আন্দোলন চলিতেছিল। সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে কবি যেন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। মানসীতে কবি সংকীর্ণ, ভোগ-ক্লেদবর্জিত আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তারপর 'রাজারানী', 'বিসজন', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি অব্যবহিত পরবর্তী কালের নাট্যকাব্যেও ঐ একই সুর ধ্বনিত হইতেছে।

'রাজা ও রানী'তে কবির বক্তব্য এই যে, প্রেম যখন নিজের ভোগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তখন তাহা বৈশিষ্ট্যবিহীন, সংকীর্ণ ও আত্মঘাতী। এই আত্মকেন্দ্রিক ভোগপ্রধান প্রেম মানুষকে সমস্ত অকল্যাণ ও পাপের মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া যায়। এই অন্ধ প্রেমের পাশ ছিন্ন না হইলে মানুষ বৃহৎ আদর্শ ও প্রকৃত কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

'বিসর্জন নাটকের বক্তব্যও এইরূপ। প্রেম সমস্ত স্বার্থপরতা, আচার-বিধি ও মিথ্যাকে জয় করে। প্রেম সর্বজয়ী—ইহা সমস্ত অকল্যাণ, বিদ্বেষ ও পাপ দূর করে।

'চিত্রাঙ্গদা'র বক্তব্যও ইহার অনুরূপ। দেহ-সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী; রূপযৌবন-সম্ভোগ কোনো চরম সার্থকতা দিতে পারে না। দেহাতীত যে সৌন্দর্য, তাহাই নিত্য, তাহাই চিরকল্যাণময়। ভোগাতীত যে প্রেম, তাহাই সত্য,—তাহাই চিরন্তন।

এখন, এই যে সৌন্দর্য, এই যে প্রেম, ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি? কিভাবে মানুষ এই সৌন্দর্য ও প্রেম লাভ করিতে পারে? জীবনের সমস্ত উপভোগ তো দেহগত ক্ষণিক, খণ্ডিত, রক্তমাংসের সেবাপর—আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমের জন্য কবির যে আকূতি, এ সংসারে তাহার সার্থকতা কোথায়? এই প্রশ্নের সমাধান কবির ভাব-জীবনের এই স্তরে মিলিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন, আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেম কোনো কল্পনার জগতে নাই, এই সংসারের প্রতি তুচ্ছ কার্যে তাহার প্রকাশ—প্রতিক্ষণ তাহার স্পর্শ আমরা পাইতেছি। সেই সৌন্দর্য ও প্রেমকে আমরা আমাদের নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, একান্ত করিয়া উপভোগ করিতে গেলে, তাহার বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য অন্তর্হিত হয়, সে মুহূর্তে সংসারের সাধারণ সৌন্দর্য ও প্রেমের পর্যায়ে নামিয়া গিয়া একটা অশান্তি ও অতৃপ্তিতে পর্যবসিত হয়। কায়া লুকাইয়া যায়, কেবল ছায়ার লুকোচুরি খেলায় জীবনকে ভুলাইতে হয়। যে সৌন্দর্য, যে প্রেমের জন্য এত অন্বেষণ, সে অলক্ষ্যে অন্তর্হিত হয়।

এই যুগে কবি, প্রকৃতি ও মানুষ, এই জগৎ ও জীবনের যে সত্যের সন্ধান পাইলেন, তাহাই তাঁহার কবি-দৃষ্টি ও কবি-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সহজবোধ, এই অনুভূতি, যাহা কবি-জীবনের প্রধানতম নিয়ামক, তাহার প্রথম স্পষ্ট বিকাশ হয় এই 'সোনার তরী'তেই। এই বাস্তব জগৎ ও জীবনের মধ্যেই চির-সৌন্দর্য ও অনন্ত প্রেমের স্পর্শ আমরা প্রতিক্ষণ পাইতেছি, আমাদের খণ্ড, অপূর্ণ, বাস্তব সৌন্দর্য ও প্রেম—যাহাতে কবির কোনো তৃপ্তি না হওয়ায় 'মানসী' হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত হা-হুতাশ করিতেছিলেন, তাহারই মধ্যে সেই পূর্ণ, আদর্শ প্রেম ও সৌন্দর্য আছে, ইহাদের ছাড়া আর কোথাও নাই। বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের ভোগের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাহাদের উপভোগ করিতে গেলেই, সেই চিরন্তনত্ব ও অভিনবত্ব মিলাইয়া যায়। এই বাস্তব জগৎ ও জীবনের মধ্যে সেই অনন্তের, সেই চিরন্তনের প্রকাশ,—ইহাদের প্রতি খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তিকে চিরন্তনের আলোক-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া গ্রহণ করিলে ইহাদের ক্ষুদ্রত্ব, খণ্ডত্ব, ক্ষণিকত্ব দূর হয় এবং ইহারাই চিরন্তন ও আদর্শের রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং এই খণ্ড, ক্ষণিক সৌন্দর্য ও প্রেমই সেই চিরন্তন ও আদর্শ প্রেমের ক্ষুদ্র রূপ। কোনো কাল্পনিক জগতে ইহাদের বাস নির্দিষ্ট হয় নাই। এই আমাদের প্রতিদিনকার বাস্তব জগৎ ও জীবনের সহিত ইহারা মিশিয়া আছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীই রবীন্দ্রনাথের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এই রিয়াল ও আইডিয়াল, অপূর্ণ ও পূর্ণ, খণ্ড ও অখণ্ড এই জীবনের মধ্যে গাঁথা রহিয়াছে। জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র, খণ্ড কর্ম অপার্থিবত্বের আলোকে উজ্জ্বল—অপূর্ব সার্থকতায় গরীয়ান্। এই জগতের মধ্যেই জগদতীতের স্পর্শ, এই জীবনের মধ্যেই জীবনাতীতের সন্ধান, এই সীমার মধ্যে অসীমের লীলা, রবীন্দ্র-প্রতিভায় এক অপূর্ব কাব্য-সৌধ-রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। কবি মৃত্তিকা ও আকাশের যে সংযোগ সাধন করিয়াছেন, তাহাতে ঊর্ধ্ব নিম্নকে কোনো সময়ই ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। ধরণীর ধূলিতে দাঁড়াইয়া অসীম নক্ষত্রলোকের যে গান গাহিয়াছেন, তাহার সুর এই শস্যশ্যামল মাঠের সুর। তাঁহার কাব্যে অরূপের যে রূপসাধনা করা হইয়াছে, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বোধহয় আর পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে নাই।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এই মূল সূত্রটি প্রথমে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে সোনার তরীতে। তাই আমার মনে হয়, সোনার তরীর রূপকবেণী কবিতাগুলির মধ্য দিয়া কবি তাঁহার এতদিনের ভুলের স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৎকালীন সম্ভাবনীয় মনোভাবকে লক্ষ্য করিলে 'সোনার তরী' কবিতার একটা অন্যরূপ অর্থও আমরা করিতে পারি। 'সোনার তরী' কবিতাটি মূলত আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমের

কবিতাও বলা যায়। 'মানসী' হইতেই সৌন্দর্য ও প্রেমের একটা বাস্তবোধ্বর্ স্বরূপের কল্পনা তাঁহার কবি-মানসকে অভিভূত করিয়াছে।

বিশ্বের পরিপূর্ণ ও চিরন্তন সৌন্দর্য কালপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। মানুষ তাঁহার জীবনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া ক্ষণিক ভোগের উপাদান সঞ্চয় করিতেছে। বিশ্ব-সৌন্দর্য জীবনের মধ্য দিয়া সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নিরন্তন প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু মানুষ ইহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া ভোগবহুল, ক্ষণিক, খণ্ড সৌন্দর্যের কুহকে ভুলিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে মানুষ কোনো তৃপ্তি বা শান্তি পাইতেছে না। তাহার ভোগের সঞ্চয়গুলি সে ঐ সৌন্দর্য-তরণীতে উঠাইয়া লইয়া এবং উহার সহিত যুক্ত করিয়া, তাহার ভোগের আয়োজন সে অতি ব্যাপক ও সমারোহসম্পন্ন করিতে চায়। কিন্তু সে এবং তাহার সঞ্চয়—ভোক্তা ও খণ্ড সৌন্দর্যের অংশগুলি—কখনো একত্র যাইয়া চিরন্তন বিশ্ব-সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না। সৌন্দর্য-তরণী তাহার ভোগের খণ্ড সৌন্দর্যগুলি লইয়া গেল, কারণ তাহারা অখণ্ড ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্যেরই অংশ, কিন্তু তাহাকে লইল না, কারণ তাহারই ভোগলোলুপ চক্ষে ও আত্মসর্বস্ব অনুভূতিতে এই সৌন্দর্যের অখণ্ড ও চিরন্তন রূপটি ঢাকা পড়িয়া যায়। সে অনন্তের ধনকে তাহার নিজের ভোগের কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিতে চায়। তাই সে আদর্শ ও পূর্ণ সৌন্দর্যলাভে বঞ্চিত হইল।

সৃষ্টির প্রবহমাণ নদীতে এই সৌন্দর্য-তরণী চিরকাল ভাসিয়া চলিয়াছে। জীবনের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, শত শত অভিব্যক্তির ঘাটে ঘাটে এই তরণী অনুক্ষণ ভিড়িতে ভিড়িতে চলিয়াছে। আত্মসর্বস্ব ভোগ ত্যাগ করিলে, পূর্ণ সৌন্দর্যকে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড না করিলে এবং অখণ্ড সৌন্দর্যের উপাসক হইলে, সোনার তরীতে হয়তো স্থানলাভ হইতে পারে।

এই অর্থের আলোকে আমরা তুলনার অংশগুলি এইভাবে বিবেচনা করিতে পারি,—

সোনার তরী—বিশ্বের চিরন্তন, অখণ্ড ও আদর্শ সৌন্দর্য

মাঝি—	ঐ সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
নদী—	কালপ্রবাহ
কৃষক—	মানুষ
ক্ষেত্র—	জীবনের ভোগবহুল কর্মক্ষেত্র
ধান—	খণ্ড সৌন্দর্যের সঞ্চয়

অজিতকুমার চক্রবর্তীই প্রথম রবীন্দ্র-কাব্যে কবি-মানসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা

অনুসরণ করিয়া আলোচনা করেন। বিশেষজ্ঞগণ জানেন, অজিতকুমারের এই আলোচনা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। তিনিও 'সোনার তরী' কবিতাটি এই ভাবেই বুঝিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"বিচ্ছিন্ন কোনো ভাবের মধ্যে, আপনার মন-গড়া কল্পনার মধ্যে জীবনকে খণ্ডিত করিবার মিথ্যাকে এবং ব্যর্থতাকে "সোনার তরী"র প্রায় সকল কবিতায় প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রথম কবিতা "সোনার তরী"র ভিতরের কথাটিই তাই। সৌন্দর্যের যে সম্পদ জীবনের নানা শুভ মুহূর্তে একটি চিরপরিচিত অথচ অজানা সত্তার স্পর্শের ভিতর দিয়া ক্রমাগতই জীবনের ভিতরে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাকে নিজের ভোগের গণ্ডী দিয়া রাখিতে গেলেই সে পলায়ন করে—সে যে বিশ্বের, সে যে সকলের…" [রবীন্দ্রনাথ, ৩৪ পৃঃ]

রবীন্দ্র-কাব্যের ধারাবাহিক আলোচনায় কবি-মানসের যে ক্রমোদ্ভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাতে এই প্রকার ব্যাখ্যা অস্বাভাবিক মনে হয় না। 'মানসী' হইতে কবি সংসারের ভোগসর্বস্ব, ক্ষণিক, খণ্ড সৌন্দর্যে ও প্রেমে অতৃপ্ত হইয়া উহাদের একটা স্থায়ী ও অখণ্ড রূপের অন্বেষণ করিতেছিলেন। কবি চিরদিনই ভোগ বিলাসী—সৌন্দর্য ও প্রেমের জন্য অনুক্ষণ লালায়িত। সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা বিপুল আসক্তি বর্তমান। চিরকাল তিনি জগৎ ও জীবনের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, গানের জন্য লালায়িত—ইহার শেষ বিন্দু পর্যন্ত তিনি নিঙ্‌ড়াইয়া পান করিতে চাহেন। একথা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার কাব্য সাক্ষ্য দিতেছে। অথচ ইহার ক্ষণিকতায়, সীমাবদ্ধতায় ও ক্ষুদ্রতায় তাঁহার প্রাণে একটা চরম তৃপ্তির ভাব কোনোদিনই আসে নাই। এটাকে ত্যাগ করাও তাঁহার পক্ষে অসাধ্য—কারণ তাঁহার অন্তরবাসী কবি বিপুল বীর্যশালী ও ভোগলিপ্সু। এই সময় এই সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার মর্মস্থলে উদ্ভাসিত হইল এবং তাঁহার ভাব-জীবনের একটা সমস্যার সমাধান হইল। তখন বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের একটা সামঞ্জস্যবিধান হইল। ক্ষণিক চিরন্তনের সহিত যুক্ত হইল, খণ্ড অখণ্ডের অসীমতায় সীমা হারাইল। সীমার মধ্যে অসীমের লীলাতত্ত্বে কবি-মানস দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল এই পর্যায়ে।

সৌন্দর্যের স্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। একটা অতি প্রবল সৌন্দর্যানুভূতি তাঁহার কবি-চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। সমস্ত জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ক্রমে একটা মূর্তি ধরিয়া তাঁহার কবি-সত্তাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং বিশ্ব-সৌন্দর্যের এই অতি প্রবল অনুভূতিই শেষে তাঁহার কবি-জীবনের একমাত্র নিয়ামক হইল। এই বিশ্ব-সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রমে জীবন-দেবতায় পরিণত হইল এবং কবির গত জীবন,

ইহজীবন ও পরজীবন ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ইহাই রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তের পরিণতির ইতিহাস। 'সোনার তরী'র মাঝি সেই কবি-কথিত নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার কল্পনায় বিধৃত বিশ্ব-সৌন্দর্য লক্ষ্মী, সে-ই তাঁহার নিরুদ্দেশ যাত্রার রহস্যময়ী সুন্দরী, তাঁহার 'মানস সুন্দরী'। এই সৌন্দর্যের অনুভূতিই ক্রমে সুতীব্র ও গভীর হইয়া জীবন-দেবতার অনুভূতিতে পরিণত হইল। মনে রাখিতে হইবে, এই সৌন্দর্যকল্পনাই জীবন-দেবতার প্রাথমিক স্তর।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল এই কবিতার নাবিককে কবির অন্তরপুরুষ জীবন-দেবতার অস্পষ্ট আভাস বলিয়া বুঝিয়াছেন।

"এই কবিতা রচিত হইয়াছিল কবিজীবনের একটি বিশেষ লগ্নে—তখন কবির মনে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব জাগিয়াছে। সে অবস্থা এইরূপ: জীবনের রঙ্গভূমি হইতে দূরে বাস করিয়া, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নির্জনে তিনি এতদিন ধরিয়া কবিতার যে-ফসল উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই ফসল এক্ষণে পাকিয়াছে, এবং একটা কবিজীবনের পক্ষে তাহা অল্প নহে। এই 'সোনার তরী' কাব্যেই একাধিক কবিতায় কবির কাব্যকল্পনার অসীমতা এবং তজ্জন্য ক্লান্তিবোধ ও সমাপ্তি-বাসনা আছে। এখন সেই মানবসংসারে ফিরিয়া সেইখানে বাস করিবার কামনা বড়ই বলবতী হইয়াছে,—কিন্তু ওই সোনার ধানগুলির কি হইবে? কে-বা তাঁহাকে সে 'বাঁকা-জল'-বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষেতখানি হইতে ওপারের গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবে? এই যে মনোভাব, এবং তাহার ফলে ওই আকাঙ্ক্ষা, ইহার খুব সহজ ব্যাখ্যা কবির সেইকালের অন্তর-ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' হইতে 'এবার ফিরাও মোরে' পর্যন্ত কবির ওই কামনা যে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্তত মাঝে মাঝে তাঁহাকে উন্মনা করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তারপর 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী' এবং এই 'সোনার তরী'র কাব্যধারায় একটা ক্রম-পরিণতি ও পূর্ণতার লক্ষণ আছে,—সে-বিষয়ে কবিও আত্মমানসে আশ্বস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার অপর দিকও আছে। কবি সেই কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে কিরূপ নিঃসঙ্গ, ইহার পরেও কতকাল তাঁহার সেই অবস্থায় কাটিয়াছে, তাহা আমরা জানি। তাই মাঝে মাঝে বড় অবসাদ বোধ হয়। একদিকে যেমন নিজের সেই কবিধর্ম ও কবিকর্ম সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যয় হইয়াছে—কালস্রোতে তাহা ডুবিয়া যাইবে না, 'সোনার তরী'-তে অর্থাৎ কালজয়ী যশের তরণীতে তাঁহার কবিতাও স্থান পাইবে—এ ভরসাও যেমন আছে, তেমনি অপর দিকে 'গগনে গরজে মেঘ' এবং 'চারদিকে বাঁকা-জল' কবিকে বড়ই নিরুৎসাহ করিয়াছে। 'মেঘগর্জন' অর্থে ঋতুর প্রতিকূলতা—অর্থাৎ ওই কাব্য ওই কালের ওই সমাজে অচল; অথচ—'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে

দুইজনে' এবং 'যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা সেখানে গান নাহি জাগে।' 'বাঁকা-জল' অর্থেও তাহাই অর্থাৎ 'বক্র-কুটিল সমালোচনা'। এই অবস্থাই কবির পক্ষে দুর্বহ হইয়াছে। বস্তুতঃ যাঁহারাই অনন্যব্রত হইয়া শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক সাধনার দ্বারা এ সাহিত্যে কোনো স্থায়ী সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারো ভাগ্যে এ সমাজে কোনো সমাদর বা পুরস্কার-লাভ ঘটে নাই। এ কবিতার প্রথম অংশে কবি-রবীন্দ্রের কবিজীবনে একটা সংকটলগ্ন ও তজ্জনিত মনোভাব ঐরূপ একটি চিত্রের সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

এ পর্যন্ত কবিতার যে ব্যাখ্যা, তাহা কবির বাহিরের জীবন হইতেই আমরা নির্ণয় করিতে পারি। ইহার পরে যে-ঘটনা উহাতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা কবির নিজ-অন্তরের ইতিহাস। তাহারও ব্যাখ্যা দুরূহ নহে। সেই অবস্থায় কবি স্বপ্ন দেখিতেছেন—ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'Reverie'—'সোনার তরী' বাহিয়া ওই যে পুরুষটিকে আসিতে দেখিতেছেন এবং 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে—' উনি তাঁহার অন্তরের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—যিনি কখনো নারী কখনো পুরুষের রূপে কবির হৃদয়াসনে বসিয়া তাঁহার সমগ্র কবিচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ ও কাব্যরচনায় প্রেরিত করেন। এই দেবতাকেই কবি তাঁহার কবিজীবনের আদি হইতে কখনো ভিতরে কখনো বাহিরে বরণ ও বন্দনা করিয়াছেন। আজ তাঁহাকেই তিনি ওই নূতন-রূপে—যাহা তাঁহারই দান তাহারই গ্রহীতারূপে—দেখিতে পাইলেন। ওই অকালবৈরাগ্য ও অবসাদের অবস্থায় তিনি যখন তাঁহার সেই কর্ম হইতে অবসর লইতে, এবং সেই বহুযত্ন ও বহুসাধনার পরিপক্ব কাব্য-ফলগুলিকে কাহারো জিম্মায় রাখিয়া যাইতে ব্যাকুল হইয়াছেন, তখন স্বপ্নে সেই বাসনা যতটুকু যেভাবে পূর্ণ হইতে দেখিলেন, তাহা একটি চমৎকার নাটকীয় ভঙ্গী ধারণ করিয়াছে। নাটকীয় ভঙ্গী বলিলাম আরো এইজন্য যে, উহাতে কবির যেন কোনো অভিপ্রায় বা সজ্ঞান প্রেরণা নাই—তাহার অর্থ তিনি নিজেও সবটা বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ় ও নিরাশ্বস্ত হইয়াছেন। কবিতাটির ওই অংশ এই কারণেই হেঁয়ালির মতো হইতে বাধ্য। তাহাতে যে-গৌরবময় সিদ্ধিলাভের ইঙ্গিত আছে, তাহা যেন কবিরও অজ্ঞাতসারে এক অপূর্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাও নূতন নহে; নিজ কবিজীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার যে আশ্চর্য foreknowledge বা পূর্বজ্ঞানের পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে একাধিক কবিতায় পাইয়াছি—সেই 'সোনার তরী'তেও আর একটি তেমন কবিতা আছে—এখানে ওই রূপটির ব্যাখ্যায় তাহাই পাইতেছি। সে ব্যাখ্যা এই:

কবির কাব্যকীর্তির ওই সাফল্যবোধ সত্য। যিনি সেই কাব্যের প্রেরয়িতা

তিনি 'সোনার তরী'তে তাহা তুলিয়া লইলেন। স্বপ্নের এই অংশে কবির আত্মাভিমান চরিতার্থ হইয়াছে। তারপর, সেই তরণীর কর্ণধাররূপী—কবিরই সেই অন্তর-পুরুষ তাঁহার অপর কামনা পূর্ণ করিলেন না—সেই তরীতে তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে সেই ফসলের ক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিলেন না। সেই পুরুষ কবিকে, যে অজুহাতেই হোক, ওই যে উদ্ধার করিলেন না, তাহার অর্থ, তিনি তাঁহাকে ছুটি দিলেন না; প্রকারান্তরে জানাইয়া গেলেন যে, এখনো ওই ক্ষেত্রখানিতে তাঁহাকে বহুতর ও মহার্ঘতর ফসল ফলাইতে হইবে—এখনি ছুটি কোথায়?···কবিকে সেই পুরুষ যেন বলিয়া গেলেন:

'Say not now thy task is ended,
Sing the lovely, pure and true,
Sing until thy song is blended
With the song for ever new'.

কবি তখন বুঝিতে না পারিয়া ওই যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন—

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

—ওই মোহ, ভবিষ্যৎ গৌরবের এতবড় ইঙ্গিত সত্ত্বেও, সাময়িক হৃদয়-বৈকল্যের ওই বিমূঢ়তা—কী সুন্দর হইয়াছে! এই কবিতায় যাহার গূঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, কবি যেন তাহা নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্যই কবিতাটি হেঁয়ালির আকার ধারণ করিয়াছে··· ।"

বিশ্ব-সৌন্দর্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং তাহা যে এই জগৎ ও জীবনের সঙ্গেই জড়িত আছে তাহাই 'সোনার তরী'র রূপকবেশী কবিতাগুচ্ছের অভিপ্রায়। 'পরশ-পাথরে' একটা অনির্দেশ্য সৌন্দর্য-আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার সুরই ধ্বনিত হইতেছে। ক্ষেপা সোনা-করা পরশ-পাথরের সন্ধানে তাহার সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টাকে নিয়োগ করিয়াছে। পরশ-পাথরই তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-সাধনার ধন—চরমপ্রাপ্তির চিরন্তন সম্পদ। কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। নিরন্তর চলিয়াছে ক্ষেপার অনুসন্ধান। জগৎ ও জীবনের সহজ ও পরিচিত অভিব্যক্তির দিকে ক্ষেপার একবারও ফিরিয়া তাকাইবার অবসর নাই। সে কোনো আদর্শ আবেষ্টনের মধ্যে, অপ্রত্যাশিত দুর্লভ মুহূর্তের অবসরে, তাহার কামনার ধনকে পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু একদিন অকস্মাৎ সে দেখিতে পাইল, তাহার কটি-বন্ধ লোহার শিকল সোনা হইয়া গিয়াছে। কোন্ মুহূর্তে যে পরশ-পাথর তাহার লোহার শিকলকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা সে ধরিতে পারে নাই। সে ছিল

অসাধারণ একটা মুহূর্তের অপেক্ষায়—কোনো সুনির্দিষ্ট পরম ক্ষণের আশায়। কিন্তু তাহার অজ্ঞাতসারেই, অতি সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই—তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত পরশ-পাথর তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে কিন্তু সে তাহা জানিতে পারে নাই। তাহার অনুসন্ধানে অনায়াসলব্ধ ক্ষুদ্রকে সে উপেক্ষা করিয়াছে; সে—

কেবল অভ্যাসমতো নুড়ি কুড়াইত কত,
ঠন্ করে ঠেকাইত শিকলের 'পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি,
কখন্ ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ-পাথর।

তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল বৃহতের দিকে, অসাধারণের দিকে, আদর্শের দিকে, তাই সাধারণ, ক্ষুদ্র ও বাস্তবের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু সেই আদর্শ ও অ-সাধারণ মণি আসিয়াছিল এই বাস্তব, সাধারণের মধ্য দিয়াই। এই চিরপরিচিত, সহজ ও বাস্তবের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কোনো আদর্শলোকে, কাল্পনিক অসাধারণত্বের মধ্যে তাহার চরম সম্পদকে খুঁজিতে গিয়া ক্ষেপার জীবন ব্যর্থ হইল। সারা জীবনই তাহার মণি-খোঁজার সাধনা চলিল—সিদ্ধি মিলিল না,—

অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার একপলভর।
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর॥

যে সৌন্দর্য ও প্রেম অখণ্ড, অবিনশ্বর, চিরন্তন, সেই অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যবস্তু আদর্শ আবেষ্টনের মধ্যে একটা অসাধারণত্বের বিজয়-তোরণপথে কোনো বহু-আকাঙ্ক্ষিত শুভ-অবসরে আত্মপ্রকাশ করিবে না—পৃথিবীর শত শত সাধারণ সৌন্দর্য, মানব-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে সেই আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের দর্শন মিলিবে, ইহাই এই কবিতায় কবির বক্তব্য। কাল্পনিক আদর্শের মায়ামৃগকে বাস্তব সংসারে পাওয়ার অসাধ্য সাধনা করিলে জীবনে আসিবে মর্মান্তিক ব্যর্থতা। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, প্রকৃতির সহজ আনন্দচ্ছবি, জীবনের সাধারণ সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার মধ্যেই আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভবস্তু ধরা দেয়। তাহার জন্য ঘটা করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনা ও নিরন্তর অন্বেষণের প্রয়োজন নাই।

খ্যাতনামা রবীন্দ্র-সমালোচক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কবিতার ক্ষেপাকে ভূমানন্দের ক্ষেপা বলিতে চাহিয়াছেন—যথা বুদ্ধদেব, ক্রাইষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি। "ক্ষেপা চায় শ্রেষ্ঠ আনন্দ, তাহার সাধনা—ভূমাকে সে পাইবে। কারণ ভূমানন্দের মধ্যে সকল আনন্দই পাওয়া যায়। সেই ভূমানন্দের

সন্ধানে ক্ষেপার যাত্রা। সেই ভূমাকে পাইবার উপায়স্বরূপ কেহ প্রেম বিতরণ করে, কেহ তত্ত্ব আলোচনা করে, কেহ-বা কৃচ্ছ্র সাধন করে।" আবার এই ক্ষেপাকে তিনি জ্ঞানযোগী, জ্ঞানতপস্বীও বলিয়াছেন,—

"প্রত্যেক জ্ঞানতপস্বীই ক্ষেপা। জ্ঞানসমুদ্রের অন্তহীন বেলাভূমি হইল ইহার সাধনার স্থল। ক্ষেপা চায় পরশ-পাথর। বিশ্বের আর কোনো সুখ-মান-যশ-ঐশ্বর্য তাহার কাম্য নয়। আত্মতৃপ্তি অথবা দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জাগতিক বস্তুরাশি ক্ষেপাকে প্রলুব্ধ করে না, সে সবই হেলাভরে পদদলিত করিয়া তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিতের উদ্দেশে ছুটিয়াছে—বিরাম-বিশ্রামবিহীন তাহার নিরন্তর যাত্রা।···ক্ষেপা চায় জগতের সেই মূল সত্যকে। সেই মহানিয়মকে, যাহাকে ধরিতে পারিলে এই বিশ্বের সকল দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, সকল বিভিন্নতা লুপ্ত হইয়া একটি একত্ববোধের আনন্দ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। এই বিশাল বিশ্বের সকল সৃষ্টির মূলে যে একটি সুরের মূর্ছনা বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইতেছে তাহাই শুনিয়া শিখিয়া লইবার জন্য এই জ্ঞান-যোগীর সাধনা। সে জগতের মূলতত্ত্বের জ্ঞানান্বেষণে ব্যাকুল। বহু দিনের কঠোর সাধনার পরে যখন সে জানিতে পারে তাহার ঈপ্সিত তত্ত্ব তাহার অজ্ঞাতে মুহূর্তের জন্য তাহার কাছে ধরা দিয়াছিল এবং তাহার অসাবধানতায় তাহা আবার হারাইয়া গিয়াছে, তখনো তাহার সন্ধানের বিরাম হয় না। জীবনের অবশিষ্ট যে-অংশ এখনো পড়িয়া আছে তাহাই সে ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হয় হারানিধিকে ধরিবার আশায়।"

বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলালও ক্ষ্যাপা বলিতে বিজ্ঞান-সাধককেই মুখ্যত বুঝিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"এ কবিতার কল্পনা-গৌরব এই যে, ইহাতে মানুষের মহতী আকাঙ্ক্ষা ও তাহার নিত্যনিষ্ফলতার সেই তত্ত্বই একটি অপূর্ব কাহিনীর আকারে আমাদের হৃদয়গোচর হইয়াছে; নিয়তি-নির্জিত ঐ পরাজয়ই তাহার পিপাসাকে মহিমান্বিত করে। এক কথায়, ঐ 'ক্ষ্যাপা'—'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্'—এই বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া জ্ঞানের 'ভূমা'কে পাইতে চায়,—খণ্ডের পরিবর্তে সে এক অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করিবে। ইহারই সাধনায় কত জ্ঞানযোগী, কত বিজ্ঞানী তাহাদের সারাজীবন উৎসর্গ করিয়াছে, বারংবার নিষ্ফল হইয়াও সেই মহারহস্য-ভেদের প্রয়াস ত্যাগ করে নাই। তাহাদের সেই মহান আত্মোৎসর্গ—সেই, martyrdom-ই—যুগে যুগে মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকার ক্রমশ দূর করিতেছে।

"কবিতার ভাবার্থ এই : পৃথিবীতে সকল কালেই এমন দুই-একজন মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মনের ক্ষুধা অসীম—কোনো ক্ষুদ্র খণ্ড জ্ঞান তাহাদের সেই পিপাসা তৃপ্ত করে না। উহাদের মধ্যে এমনও আছে, যাহারা অধ্যাত্মপন্থায় যোগাসনে না বসিয়া, এই জগৎদৃশ্যের মধ্যেই সেই পরম-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চায় ; যে মহা-নিয়মটি লাভ করিলে কোনো ভেদজ্ঞান আর থাকে না, সকলই এক পরম সত্যের স্বর্ণদ্যুতি ধারণ করে—জ্ঞানের সেই পরশ-পাথরের সন্ধানে সারাজীবন কাটাইয়া দেয়। সাধারণ মানুষের চক্ষে ইহারা পাগল। এই কবিতার ঐ 'ক্ষ্যাপা'-ও তেমনই একজন। সে এই অতল অপার সৃষ্টিরহস্যের সমুদ্রতীরে সেই 'পরশ-পাথর' খুঁজিতেছে। তাহার শত ইঙ্গিতময় কল্লোলধ্বনি সে যতই শোনে ততই প্রাণের আকুলতা বৃদ্ধি পায়,—তরঙ্গ-তাড়িত বেলাভূমিতে যে উপলরাশি আদিকাল হইতে ঐ সমুদ্রের ক্রীড়নক হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যেই সে সেই মহাতত্ত্বের সন্ধান করে। তাহার বিশ্বাস, ঐ অতিক্ষুদ্র ও সামান্যের মধ্যেই বিপুল বিরাটের রহস্য নিহিত আছে, তাহারই স্পর্শে সর্বপদার্থ একই পরম পদার্থ হইয়া উঠিবে।

"কিন্তু মানুষের দেহ দুর্বল, আয়ুষ্কাল পরিমিত ; তাহার কামনা যত বড়, শক্তি সেই অনুপাতে বড়ই কম। এইখানে নিয়তির সহিত তাহাকে যুদ্ধ করিতে হয়, সে-যুদ্ধে সে হারিয়াও হার মানিবে না। ক্ষ্যাপার সেই সন্ধান দীর্ঘকালব্যাপী হইবারই কথা ; কিন্তু দেহের ও মনের শক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসে ; ক্রমাগত নিষ্ফল সন্ধানের শেষে এমন অবস্থা হয় যে, অভ্যাসটাই থাকিয়া যায়, মন আর সজাগ থাকে না। এই অবস্থায় সেই ট্র্যাজেডি ঘটিল ; সে একবার সেই অবস্থায় দৈবক্রমে সেই তত্ত্ব—সেই ফরমুলাটি পাইয়াছিল, কিন্তু তাহা তখন লক্ষ্য করে নাই। আজ হঠাৎ সেই পাওয়ার একটা প্রমাণ চোখে পড়িতেই সে ভাঙিয়া পড়িয়াছে—মানবভাগ্যের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি হইতে পারে? ঐ যে—'ধরা দিয়ে পলাইল সকল বাঞ্ছনা'—কবি যে কোথা হইতে এইরূপ ট্র্যাজেডির তথ্য আহরণ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-সাধকদের জীবনেতিহাস হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহারাই জ্ঞান-বারিধিকূলে সারাজীবন ধরিয়া উপলখণ্ড আহরণ করেন ; সেই সব সর্বত্যাগী মহাভিক্ষুর জীবনসায়াহ্ন অনেকের পক্ষে যেমন করুণ, তেমনই, নিষ্ফলতা সত্ত্বেও তাঁহাদের সেই নিষ্ঠা—নৈরাশ্যের অন্ধকারেও সংকল্পের সেই দৃঢ়তা—মানুষ মাত্রেরই নমস্য।

অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার একপলভর।
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর॥

—কবি এমনই দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা 'সেই হতাশের নিষ্ফলের দলে' যাহারা তাহাদিগকে নিজ হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।"

কিন্তু উভয় সমালোচকের দৃষ্টিই একদেশদর্শী। যে অবাস্তব আদর্শ, যে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য ও প্রেমের সন্ধানে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায়, সে-ই ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসী এবং তার মনঃকল্পিত আদর্শটি হইল পরশ-পাথর—ইহাই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়।

'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতে পৃথিবীর বাহিরে আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমের অন্বেষণের নিষ্ফলতা চমৎকার ফুটিয়াছে। স্নেহ-প্রেম-হিল্লোলিত এই মানব-জীবন, এই সুজলা, সুফলা ধরণীর শ্যামল মুখশ্রীকে উপেক্ষা করিয়া যে-মূর্খ আকাশের চাঁদ হাতে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়—গভীর নৈরাশ্য ও ব্যর্থতায় তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি হয়।

'দেউল' কবিতাটিতেও কবি বাস্তববিমুখ হইয়া কাল্পনিক আদর্শের সাধনার ব্যর্থতার ইঙ্গিত করিয়াছেন। পূজারী সংসারের কল-কোলাহল ও প্রাত্যহিক চিত্তবিক্ষেপ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া দেবতার আরাধনার জন্য এক মন্দির গড়িলেন। সে পাষাণ-মন্দিরে জগতের আলো-বাতাস প্রবেশের পথ রুদ্ধ। কারুকলা-খচিত সিংহাসনে দেবতাকে বসাইয়া, সমস্ত বিশ্ব ভুলিয়া দিনরাত ধূপ-দীপে ও বিবিধ মন্ত্রে তাঁহাকে পূজা করিতেছেন। তারপর, একদিন বজ্রপাতে সে-পাষাণগৃহ ভাঙিয়া গেলে, বাহিরের আলো-বাতাস ও সংসারের অসংখ্য কলরোল যখন সে-ঘরে প্রবেশ-পথ পাইল, তখন পূজারীর এক অননুভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ হইল। এক অপরূপ মহিমায় দেবতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—অধরে জাগিল এক অনুপম প্রসাদ-হাসি। এতকাল রুদ্ধগৃহে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-মন্ত্রে দেবতার যে আরাধনা চলিতেছিল, তাহাতে দেবতা যথার্থ সন্তুষ্ট হন নাই, আজি চন্দ্র-সূর্যের অপর্যাপ্ত আলোকে ও নরনারীর কল-কোলাহলের মধ্যে যে আরাধনার আয়োজন, তাহাতেই দেবতার প্রকৃত পূজা—তাহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত। পূজারী বুঝিলেন,—

যে গান আমি নারিনু রচিবারে,
সে গান আজি উঠিল চারিধারে!
আমার দীপ জ্বালিল রবি,
প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,

গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দহারে,
কী গান আজি উঠিল চারিধারে ॥
... ...
দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি—
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি।

বিশ্বকে দূরে রাখিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা নিষ্ফল; পাষাণ-মন্দিরে মানুষের নিজের হাতে-গড়া মূর্তিতে জগন্নাথের আবির্ভাব হয় না—জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত হন জগৎ-মন্দিরে। মানুষ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য ও প্রেমকে উপেক্ষা করিলে সেই পরমসুন্দর—পরমপ্রেমময়ের উপাসনা হয় না।

'দুই পাখী' কবিতাতেও কবি আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়-প্রশ্ন তুলিয়াছেন। 'খাঁচার পাখী' আমাদের মধ্যকার সংসার-শৃঙ্খল-বদ্ধ, সংস্কার-প্রথা-অভ্যাসের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য, বাস্তব-রাগ-রঞ্জিত এই ধরণীর মানুষটি; আর 'বনের পাখী' আমাদের মুক্ত, স্বাধীন, সুদূর-প্রসারিত-দৃষ্টি, সদানন্দময় অংশটি। মানুষের মধ্যে এই দুইটি সত্তার দ্বন্দ্ব চিরকাল চলিয়াছে—এই দ্বন্দ্বের সমাধান হইলে জীবনে পরিপূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায়। একটি বাস্তব, অপরটি আদর্শ; একটি মৃত্তিকা, অপরটি অনন্ত আকাশ; একটি মানুষ, অপরটি দেবতা; একটি মানবীয় প্রেম, অপরটি বিশ্বপ্রেম। এ যেন সেই মণ্ডুকোপনিষদের একই বৃক্ষে দুইটি পক্ষী। মানুষের মধ্যে এই দুইটি বিভিন্ন সত্তার মিলনই কাম্য—ইহাই তাহার সার্থকতার রূপ—সান্তের মধ্যে অনন্তের অভিব্যক্তি। এই দুইটি রূপ পরস্পর আপেক্ষিক। আমাদের মধ্যকার যে মুক্ত, স্বাধীন অংশ, তাহার সার্থকতাই হয় এই বদ্ধ অংশের সহিত মিলনে; না হইলে উহা একটা বায়বীয় ভাব বা আদর্শমাত্র—সংসারের বহু ঊর্ধ্বে অন্তরীক্ষচারী একটি অবস্থা। আবার আমাদের বদ্ধ অংশ কেবল জড়, কদর্য বস্তুপিণ্ডে পর্যবসিত হয়, যদি মুক্ত হাওয়ার দ্বারা, বৃহৎ ভাবের দ্বারা, এই বৃহত্তর অংশের দ্বারা, ইহার শুদ্ধি-ক্রিয়া সম্পন্ন না হয়। ইহা যেন অনেকটা সেই সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ। পুরুষ নিত্যশুদ্ধ, মুক্ত, অনাসক্ত, প্রকৃতি জড়ময়ী; কিন্তু এই পুরুষকে উপলক্ষ করিয়াই তাঁহার সৃষ্টিলীলা। এই নির্বাক, উদাসীন, সাক্ষীটা না থাকিলে তাহার সমস্ত সৃষ্টিকার্য রুদ্ধ—সে বন্ধ্যা। এই বদ্ধ ও মুক্ত, এই দুই পাখীর মিলনেই মানব-সত্তার পরিচয়। তাই রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনে ইহাদের মিলনের ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।

একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।

মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার এই দুই প্রকাশ তত্ত্বের দিক দিয়া সত্য হইলেও, কবির তৎকালীন মনোভাবের দিকে দৃষ্টি দিলে সাধারণভাবে ইহার তাৎপর্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক পাখী নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আদর্শের দিকে ধাবমান, আর পাখী সংসারের স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, সংসারের বাস্তব আকর্ষণে আবদ্ধ। এই ঘরের পাখী ও বাহিরের পাখীর, এই আকাশ ও মাটির মিলনই রবীন্দ্রনাথের কাম্য।

মানবমনের এই দুইটি সত্তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন,—

"আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং গৃহবাসিনী অবরুদ্ধা রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন সমস্ত জগতের নূতন নূতন দেশ ঘটনা অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর একজন শত সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখী, আর একজন খাঁচার পাখী। এই খাঁচার পাখীটাই বেশী গান গাহিয়া থাকে, কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধভাবে ও বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

[আধুনিক সাহিত্য]

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাহিরে বদ্ধ অবস্থা ও অন্তরে মুক্ত অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"বাড়ীর বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন-কি বাড়ীর ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশী যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব-প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকোর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডী মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডী তবু ঘোচে নাই; দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড় হইয়া যে কবিতাটা লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।"

(খ) সোনার তরীর এই রূপকবেশী কবিতাগুচ্ছের মধ্যে দেখিতে পাই, কবির চির-আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমের পীঠস্থান যে হাসি-অশ্রুর মেলা এই

বাস্তব ধরণী, এই অনুভূতি কবির মধ্যে প্রবলভাবে জাগিয়াছে। আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমের অবস্থান কোনো অতি-জাগতিক বা অতিপ্রাকৃত পরিস্থিতিতে নাই, এই ধরণী ও ইহার নরনারীর মধ্যেই যে তাহার বিকাশ, এই বোধ ও অনুভূতি কবির ভাব-জীবনের মূলে এখন দৃঢ়ভাবে বাসা বাঁধিয়াছে। ইহার পরবর্তী অবস্থায় ধরণীর প্রতি কবির একটা অসাধারণ অনুরাগ দেখিতে পাই। এই ধরণীর মধ্যেই তো তাঁহার কামনার ধন সৌন্দর্য ও প্রেমের অবস্থান, তাই, ইহার প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি, মমত্ববোধ ও বেদনা যেন শতধারে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে 'মায়াবাদ', 'অক্ষমা', 'দরিদ্রা', 'গতি', 'মুক্তি', 'খেলা', 'আত্মসমর্পণ' প্রভৃতি স্থান পাইতে পারে। 'বৈষ্ণব কবিতা'কেও এই শ্রেণীর কবিতার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মর্ত্যের নরনারীর স্নেহ-প্রেম স্বর্গের দেব-দেবীর স্নেহ-প্রেম অপেক্ষা অধিক মধুর ও আকর্ষণশীল। এই বাস্তব ধরণীর নরনারীর প্রেমের মধ্যেই দেবত্ব বিরাজ করিতেছে; এই পার্থিব মানবীয় প্রেম এক অপার্থিব ও অতিপ্রাকৃত আলোকে উজ্জ্বল; আদর্শ প্রেমের জন্য আমাদের কুটির-বাসিনীকে অবহেলা করিয়া স্বর্গবাসিনীর দিকে ঊর্ধ্বমুখে তাকাইয়া থাকিবার কোনো প্রয়োজন নাই। জগৎকে সত্যভাবে গ্রহণ ও সমস্ত সৌন্দর্য ও প্রেমের আধার বলিয়া উহার প্রতি অসীম অনুরাগ, এই ধারার কবিতাগুচ্ছের অন্তর্নিহিত ভাব।

ভারতীয় দার্শনিকগণ এই কলকোলাহলময়, সহস্রকর্ম-উদ্বেলিত, বিচিত্র-সৌন্দর্যময় বিশ্ব-বসুন্ধরাকে মায়া বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু কবির নিকট ইহা সত্য, অপূর্ব সার্থকতায় ভরা—আনন্দময়ের আনন্দ-অভিব্যক্তি। 'মায়াবাদ' কবিতায় কবি মায়াবাদ-সমর্থনকারীকে বলিতেছেন,—

> যুগযুগান্তর ধরে পশুপক্ষী প্রাণী
> অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
> বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি :
> তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস।
> লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা,
> তুমি জানিতেছ মনে, সব ছেলেখেলা।

এই ধরণী অসম্পূর্ণ, ইহার সুখ-ঐশ্বর্য ক্ষণস্থায়ী, তবুও কবি এই 'শ্যামলা, সর্বংসহা, মৃণ্ময়ী জননীর তপ্ত বুক' ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না—'অক্ষমা' কবিতায় এই কথ বলিতেছেন।

'দরিদ্রা'য় ধরিত্রীর প্রতি কবির প্রেম ও সহানুভূতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে

নিজের বক্ষরক্ত নিঙড়াইয়া ধরণী তাহার কোলের সন্তানকে প্রাণদান করিয়াছে, এবং জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের ভয়ে তাহার মুখের দিকে অহর্নিশি সকরুণনেত্রে তাকাইয়া আছে ; বর্ণগন্ধ-গীতে এই পৃথিবীতে আনন্দধাম রচনা করিলেও জননীর মুখ বিষাদ-কোমল ও অশ্রু-ছলছল। কবি তাই বলিতেছেন,—

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি.
হে ধরিত্রী—স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে,
বেদনা-কাতর মুখে সকরুণ হাসি
দেখে মোর মর্মমাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।

'আত্ম-সমর্পণে' কবি পৃথিবীর সুখদুঃখের সহিত একান্তভাবে নিজেকে মিশাইয়া দিতে চাহিতেছেন। তাঁহার চিত্ত-বীণা ইহার আনন্দ-বেদনায় সমানভাবে ঝংকার তুলিবে। কবি বলিতেছেন,—

ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে॥

ধরণীর 'ধূলিমাটি'-প্রেমিক কবি হিন্দু-দর্শনের বহু-নিন্দিত সংসার-বন্ধনকে সমর্থন করিতেছেন, এবং বহুপ্রশংশিত মুক্তির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। সংসার-বন্ধন কাটাইয়া নির্বাণ মুক্তি লাভ করা শাস্ত্রসম্মত কাম্য, কিন্তু কবি বলিতেছেন, এই বন্ধনই তাঁহাকে নব নব জীবনে নব নব আস্বাদ দান করিবে—

সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসস্রোত পূর্ণ করি মন
সদা করাইছে পান······
... ...
স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস কোন্ মুক্তিভ্রমে॥

[বন্ধন]

আর, চোখ, কান, মন, বুদ্ধি সব রুদ্ধ করিয়া সংসারের আলো-আঁধার, হাসি-কান্না হইতে দূরে থাকিতে কবির অনিচ্ছা,—

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমিই কি একা রব মুক্তি-সমাধিতে ? [মুক্তি]

'বৈষ্ণব-কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথের এই নবজাগ্রত জগৎ-প্রীতি ও মানবতা-প্রীতি পূর্ণমাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব-কবিতায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অপূর্ব কাব্যে,

ভাবে ও সংগীতে বর্ণিত আছে; বৈষ্ণব কবির এই অনবদ্য প্রণয়চিত্র মানব-মানবীর প্রণয়লীলার প্রতিচ্ছবি। পূর্বরাগ, মান-অভিমান, অভিসার, বিরহ, মিলন, এই ধরণীর নর-নারীর প্রেমের অবস্থাভেদ মাত্র; রবীন্দ্রনাথের মতে বৈষ্ণব কবিগণ এই মর্ত্যের প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্র দেখিয়াই স্বর্গের প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন। মানবীয় প্রেম এক অপার্থিব সামগ্রী। প্রেম মাত্রেই অনন্ত প্রেমময়ের আংশিক ও ক্ষণিক উপলব্ধি। মানুষ তাহার প্রেমাস্পদকে ভালোবাসিয়া তাহার মধ্য দিয়াই ভগবানের প্রেমের আস্বাদ পায়। মানুষ এই প্রেমের মধ্য দিয়াই স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান দূর করে। কবি বলিতেছেন,—

আমাদেরি কুটির-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জনতরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম-গীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা॥

এই মানুষের প্রেমের মধ্যেই দেবত্ব বিরাজিত, ভগবৎ-প্রেমের জন্য বৃন্দাবন-লীলার মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নাই। এক অনন্ত প্রেম-উৎস হইতে এই প্রেমধারা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে,—ঊর্ধ্বমুখ যে ধারা দেবতার চরণোদ্দেশে চলিয়াছে, আর অধোমুখ যে ধারা মানুষের উদ্দেশে নামিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। এই মানবীয় প্রেমের পথেই ভগবৎ-প্রেমের তীর্থে উপনীত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।" [—পঞ্চভূত, মনুষ্য]

একখানা চিঠিতেও কবি এইরূপ কথাই বলিয়াছেন,—

"আমার বিশ্বাস আমাদের প্রীতিমাত্রই রহস্যময়ের পূজা—কেবল সেটা আমরা অচেতন ভাবে করি। ভালোবাসামাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি।" —ছিন্নপত্র

(গ) বাস্তব জগৎ ও জীবনের মধ্যেই কবি যখন তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের সন্ধান পাইলেন, তখন এই জগৎ ও জীবনের একটা অতি-প্রবল সৌন্দর্যানুভূতি তাঁহাকে গ্রাস করিল। তিনি বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবের সহিত তাঁহার একাত্মতা অনুভব করিয়া উহাদের সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করিতে চাহিলেন। বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবের প্রবল সৌন্দর্য-পিপাসায় কবি জল-স্থল-অন্তরীক্ষে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া সৌন্দর্য-উপভোগের জন্য ব্যাকুল হইলেন। এই প্রবল সৌন্দর্যানুভূতি ও সৌন্দর্য-পিপাসা সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি' 'বিশ্বনৃত্য' প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে, এবং 'মানস-সুন্দরী' ও 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা'র মধ্যে একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

এই বিশ্ব-সৌন্দর্যের প্রতি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা ও গভীরতর পিপাসা—এই বিপুল প্রকৃতিপ্রেমই কবি-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপে তাঁহার কবি-কর্মের মূল উৎসরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি সারা-বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত ও মিশ্রিত করিয়া দিয়া জল-স্থল-অন্তরীক্ষের প্রত্যেক অবস্থার সৌন্দর্য ও রস পান করিবার জন্য আকুল হইয়াছেন। সৌন্দর্যপিপাসার এ এক অদ্ভুত প্রকাশ। তৃণ-গুল্ম, গাছ-পালা, নদী-পর্বত, মেঘবৃষ্টির সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া দিয়া তিনি নিবিড় বৈচিত্র্যময় আনন্দ উপভোগ করিতে চাহেন—বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করিতে একান্ত উৎসুক। তাঁহার

ইচ্ছা করে, বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরা-ধারা নব নব স্রোতে॥

কবি বলিতেছেন, বসুন্ধরার সহিত তাঁহার নাড়ীর যোগ, তাঁহার নিবিড় পরিচয় জন্মজন্মান্তরের,—একদিন তিনি তাহার সহিত এক-আত্মা, এক-দেহ হইয়া ছিলেন,—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে

অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

যে ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যের প্রাণরসধারা ধরিত্রীর বক্ষ হইতে নিঃসারিত হইয়া ফুল-পুষ্প, তরু-লতা, নদ-নদী, পর্বত-অরণ্যকে নিগূঢ় আনন্দরসে অভিষিক্ত করিতেছে, কবি এই প্রাণ-শক্তিকে সারা দেহ-মন দিয়া অনুভব করিতেছেন। তাঁহার মনে পড়িতেছে, একদিন তিনি-জলে-স্থলে আকাশে পরিব্যপ্ত হইয়া ছিলেন। তাই এই রূপরসময় বিচিত্র ধরণী তাঁহাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে,—তিনিও তাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। সেই সৌন্দর্য, প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের ধারা বসুন্ধরার বক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইতেছে, কবি তাহার সহিত যুক্ত হইতে চাহিতেছেন,—

আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে, মুকুলিছে, মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে,—গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষসুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু;
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরানি যত, আনন্দের রস
কতরূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ
ধ্বনিছে কল্লোলগীতে।

নিখিলের বিচিত্র আনন্দ কবি সকলের সঙ্গে এক হইয়া আস্বাদন করিতে চাহিতেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এক-আত্মা, এক-দেহ হইয়া জীবনের অন্তহীন রসোপলব্ধির পিপাসা মিটাইতে তিনি উৎসুক। তিনি কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, তরু-লতা হইয়া যুগে যুগে জন্মে জন্মে ধরিত্রীর স্তন্যরসসুধা পান করিবার জন্য ব্যাকুল; নবনব রূপে জীবনের নবনব আস্বাদ তিনি পাইতে চাহেন—জ্যোতিষ্ক-

লোকে তারায় তারায় নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিচরণ করিয়া তাহাদিগকে দেখিবার ও জানিবার আনন্দও তিনি লাভ করিবেন। নব নব রসাস্বাদনের জন্য কবি-চিত্তের ইহাই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত একাত্মতার অনুভূতি। এক চেতনা প্রথম বাষ্প-নীহারিকা, তরুলতা-সরীসৃপ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি বিচিত্র অভিব্যক্তির স্তরের মধ্য দিয়া বর্তমান মানবজীবনে উদ্ভিন্ন হইয়াছে। একই প্রাণ জড়জগৎ, উদ্ভিদ্‌জগৎ ও প্রাণী-জগতের মধ্যে বিকাশের স্তরে স্তরে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। মানুষ একদিন তৃণ-লতা-ফল-পুষ্প-পশু-পক্ষীর সাহত এক হইয়া একত্র জাবন কাটাইয়াছে, তাহাদের সহিত মানুষের একটা অন্তরের যোগ, একটা নাড়ীর টান বিদ্যমান, তাই বসুন্ধরার বুকের সমস্ত জিনিস তাহার অতো ভালো লাগে—তৃণ-লতা-গুল্ম-ফল-পুষ্পের আনন্দ-চাঞ্চল্য, নদ-নদী-গিরি-সমুদ্র-আকাশের সৌন্দর্য ও সংগীত মনকে অতো উতলা করে। কবি এই আবেগময় অনুভূতিকে কাব্যের ঐশ্বর্য দান করিয়াছেন। এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের মূল প্রেরণা। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য ও আনন্দকে তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে ধরিতে পারেন, তাহার কারণ, বিশ্বের সহিত তাঁহার একাত্মতা ও একদেহত্বের অনুভূতি প্রবল। জল-স্থল-আকাশের সহিত একাত্মতার অনুভূতি কবির 'ছিন্নপত্রে'র অনেক স্থলে পাওয়া যায়। (পূর্বের উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য)

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিতেও কবি সমুদ্রের সহিত তাঁহার নিগূঢ় নাড়ীর টান, তাঁহার বহু পূর্বজন্মের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। সমুদ্র সৃষ্টির আদি বস্তু। তাহার অশ্রান্ত, অনন্ত কল্লোলধ্বনির অর্থ কবির নিকট অনেকখানি প্রকাশিত। তিনি যখন সমুদ্রের বিরাট জঠরে ভ্রূণ-রূপী পৃথিবীর দেহের সহিত লীন হইয়া ছিলেন, তখন এই অবিশ্রাম কলধ্বনি কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া তাঁহার অন্তরে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। উপকূলে বসিয়া সমুদ্রের জল-কল্লোলধ্বনি শুনিতে শুনিতে কবির মনে হইতেছে,—

মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে-রক্ত বহে, সে-ও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ-মাঝে,—লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে,
মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,—

গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় কবির বক্তব্য এই যে, চিররহস্যময়, মহান ইতিহাস-বিধাতা, চিন্ময়পুরুষ, মহাকাল ঊর্ধ্ব-আকাশে বসিয়া চিরকাল বিষাণ বাজাইতেছেন। তাহার উদাত্ত ধ্বনিতে সারা বিশ্ব আনন্দ-আবেগে নৃত্য করিতেছে। গ্রহমণ্ডল আনন্দে পাগল হইয়া নৃত্য করিতেছে, নদী-সাগর-পর্বত-অরণ্য সেই আনন্দ-নৃত্যে আত্মহারা হইয়া যোগদান করিয়াছে, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ নব নব রূপে নব নব চেতনা লাভ করিতেছে। কিন্তু সংসার-সমাচ্ছন্ন মানব-মন ইহার যথার্থ অর্থ ধরিতে পারিতেছে না। কবিও তাঁহার চারিদিকে পাষাণ-প্রাচীর বোধ করিতেছেন,—তাঁহার পরিবেশের মধ্যে কেবল বালুকাধূসর মরু,—সেখানে কোনো প্রাণের স্পন্দন নাই। তিনি তাঁহার এই বদ্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন মনের প্রাচীন প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিয়া, নিজের স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া, কবি-কল্পনার অলস বিলাস হইতে মুক্ত হইয়া, বিশ্বের এই আনন্দ-নৃত্যে যোগদান করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। কবি কেবল বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে নহে, বিশ্ব-মানবের সহিতও মিলিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতির ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া মুক্ত-হৃদয়ে বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার, বিশ্বের প্রাণরসধারা পান করিবার জন্য ব্যাকুল। কবি বলিতেছেন,—

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে।
নিখিলের সাথে মহা-রাজপথে
চলিতে দিবসনিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে॥
জগৎ-মাতানো সংগীততানে
কে দিবে এদের নাচায়ে।
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে।

ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত-হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ ॥

দেশ, জাতি ও নানা সংস্কার ত্যাগ করিয়া বিশ্ব-মানবের সহিত মিলিত হইবার আকুল আগ্রহ এই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে।

'মানস-সুন্দরী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতি একটা বিশিষ্ট স্তর বা সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সোনার তরীর মাঝিরূপে কবি কালপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, যে সংসারের ক্ষুধিত কামনা ও আত্মসর্বস্ব ভোগের ঊর্ধ্বে, বাসনা-কামনার অতীত বস্তুরূপে মানুষের প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন ছিল, সেই বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীকে তিনি জগৎ ও জীবনের, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের মধ্যে অতি সহজভাবে মিশিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। তাহার পরবর্তী অবস্থায় সেই বিশ্বসৌন্দর্যের অতি-প্রবল অনুভূতি কবিকে একেবারে আত্মহারা করিয়া দিল। 'মানস-সুন্দরী'তে সেই সৌন্দর্যদেবী 'উদার সমুদ্রের মাঝখানে কর্ণধার' হইয়া 'সুন্দর তরণী' ভাসাইয়াছেন, সে সমুদ্রের কোনো কূল কবি পাইতেছেন না। 'দশদিশি হইতে চিরদিবানিশি অস্ফুট কল্লোলধ্বনি'র অর্থও কবির নিকট অবোধ্য। জগতের এই অসীম সৌন্দর্য-পাথারে কবি একেবারে দিশেহারা—শঙ্কাকুল; কেবল সৌন্দর্যলক্ষ্মীর 'অভয় আশ্বাসভরা বিশাল নয়ন' দেখিয়া ভরসা পাইতেছেন। এখন এই দেবীই তাঁহার একমাত্র ভরসার স্থল—জীবনের একমাত্র পরিচালক।

সম্মোহিত অবস্থায় কবি বিশ্বসৌন্দর্যকে একটি নারীমূর্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রকৃতি ও মানবের দেহ-মনের সমস্ত সৌন্দর্য যেন একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া একটি নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বিপুল সৌন্দর্যসম্ভোগের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় কবি বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া তাহার অসংখ্য প্রকাশের মধ্য হইতে সৌন্দর্য আহরণ করিতে চাহিয়াছেন—তাহার সহিত জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার অণুপরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমরা 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় দেখিয়াছি; 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় বিশ্বমানবের সহিত এক হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। 'মানস-সুন্দরী'তে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সৌন্দর্যের বস্তুনিরপেক্ষ আদর্শকে (Abstract Ideal) কবি নারীমূর্তির মধ্যে রূপায়িত করিয়া সেই বিশ্বসৌন্দর্যকে ব্যক্তিগত জীবনে একেবারে অনুভব করিতেছেন। বাল্য হইতে যৌবন পর্যন্ত

কবি-জীবনের বিভিন্ন সৌন্দর্যানুভূতি এক নারীমূর্তির মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে।

সমস্ত সৌন্দর্যের যে-মূলগত ভাব, যে-আদর্শ কবির মনে মুদ্রিত আছে, যাহার প্রবল অনুভূতি কবির কল্পনার লীলাবিলাস ও কবিত্ব-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, বিশ্বসৌন্দর্যের সেই পরমরহস্যময়, অনির্বচনীয় ভাব বা আদর্শ কবির মানস-সুন্দরী। বিশ্বসৌন্দর্যের প্রবল ও আবেগময় অনুভূতি কবির আশৈশব কাব্য-প্রেরণার মূল উৎস; সেই সৌন্দর্যময়ী রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার রসকল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিরূপে—তাঁহার কবিতারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই সেই সৌন্দর্যস্বরূপিণী মানস-সুন্দরীকে কবি তাঁহার কল্পনা-সম্ভবা কবিতা-সুন্দরী বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন।

কবি মানস-সুন্দরীর সহিত নিবিড় মিলন কামনা করিতেছেন। প্রণয়লীলার বিচিত্র আস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল। আলিঙ্গনে, চুম্বনে, হাসি, গল্পে, গানে তাঁহার জীবনে এক নবতম রস সঞ্চার করিবার জন্য তিনি তাঁহার প্রিয়তমাকে আহ্বান করিতেছেন। সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রবল অনুভূতি কবিকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

তাঁহার প্রণয়িনী মানস-সুন্দরী আশৈশব কবির অনুরাগিণী। বাল্যকালে সে ছিল চঞ্চলা বালিকা, কিশোর কবিকে সে পাঠ ভুলাইয়া, কর্তব্য ভুলাইয়া বার বার নির্জন ছাদে, গৃহকোণে, আকাশের তলে ডাকিয়া লইয়া বিচিত্র আলাপনে মুগ্ধ করিত। যৌবনে সে কবির অন্তর-লক্ষ্মী, মর্মের গেহিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অপূর্ব বিস্ময়কর তাঁহার মানস-পুর-লক্ষ্মীর লীলা।

কবি তাঁহার মানস-সুন্দরীকে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে উপলব্ধি করিতেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যমালার মধ্যে কবির মানস-সুন্দরীর প্রকাশ। কবি অনুভব করিতেছেন—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; ঊষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল-ছলছলে
ললিত যৌবনখানি; বসন্ত-বাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমারাতে

নির্জন গগনে একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহ-শয়ন…

মানস-সুন্দরী বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া বিশ্ববিমোহিনীরূপে আত্ম-পরিচয় দান করিতেছে।

বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে অনুভূত হইলেও মানস-সুন্দরীকে একটি নির্দিষ্ট মূর্তিতে দেখিবার জন্য কবির অসীম আগ্রহ হইতেছে,—

সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা। এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি।

সর্বসৌন্দর্যস্বরূপিণী, অনবদ্য নারীরূপিণী মানস-সুন্দরীর সহিত যদি কবির পরজন্মপথে দেখা হয়, তখনো তাঁহার ধ্রুবতারা-সম চির-পরিচয়-ভরা কালো চোখ মনে পড়িবে। সে যে কবির জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়া; দেহ, মন, চিন্তা ও কর্মে, সর্বক্ষণ সর্বসৌন্দর্যময়ী প্রিয়তমাকে লাভ করিবার জন্য কবির আকুল আগ্রহ,—

কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে। পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময় মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে? জীবনের প্রতি দিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্যে তোমার, বাজিবে তোমার সুর
সর্বদেহে মনে; জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল; প্রতি কাজে
রবে তব শুভহস্ত দুটি; গৃহমাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।

কবির বিশ্বাস, তাঁহার মানস-সুন্দরী নারীরূপ ধরিয়া পূর্বজন্মে তাঁহার জীবন-বনে অম্লান সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে—তাঁহার সংসারকে, গৃহকে, জীবনকে

প্রিয়তমারূপে ধন্য করিয়াছে। অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী তাঁহার সেই প্রেয়সী পূর্বজন্মে কেবল তাঁহার জীবনেই আবদ্ধ ছিল, এ-জন্মে সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।

বিশ্বের সমস্ত বিচ্ছিন্ন, খণ্ড সৌন্দর্যকে কবি এক নারীমূর্তির মধ্যে সঞ্চিত দেখিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহার মনে হইতেছে, হয়তো বা এইসব বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যরাশি একদিন একস্থানে একত্রীভূত ছিল, পরে ইহারা বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজ চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।

মানস-সুন্দরী বিশ্বের সমস্ত প্রিয়ার প্রতীক—অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী প্রণয়িনীর মূল রূপ। ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবন ব্যাপিয়া নিরন্তর যে সৌন্দর্য ও প্রেমের লীলা চলিতেছে, তাহার মূর্ত প্রকাশ কবির মানস-সুন্দরী।

রবীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব চিন্তা ও অনুভূতির ধারা আমরা এখানে লক্ষ্য করিতে পারি। বিচ্ছিন্ন, খণ্ড, সীমাবদ্ধ সৌন্দর্যের শত শত অভিব্যক্তি, যাহা আমরা জগৎ ও জীবনের, প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অনুভব করিতেছি, তাহার মূল যে এক অখণ্ড, আদি সৌন্দর্যরূপ, এই নির্দেশ কবি যেমন দিয়াছেন, তেমনি এক আদি ও মূলরূপ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া শত শত সৌন্দর্যকণা যে জগৎ ও জীবনের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, এই অনুভূতিও তাঁহার কবি-মানসে সমানভাবে বর্তমান আছে। বস্তুত বিষয়টি একই—একই জিনিসের প্রতি দুই দিক হইতে দুই প্রকারের দৃষ্টি। ইহাই তাঁহার 'ধূপ' ও 'গন্ধের, 'ভাব' ও 'রূপের পর্যায়ক্রমে আবর্তন।

বিশ্বের সহিত একাত্মবোধ এবং বিশ্বসৌন্দর্য ও রহস্যের সুতীব্র অনুভূতি এখন কবির সমস্ত হৃদয়, জীবন, এমন কি জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়া বিরাট শক্তির সমস্ত ঐশ্বর্য লইয়া বিরাজ করিতেছে। বিশ্বসৌন্দর্যবোধ এখন তাঁহার কবি-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে। এই অত্যুগ্র সৌন্দর্য-অনুভূতি কবিজীবনকে এমনভাবে গ্রাস করিয়াছে যে, কবি তাঁহার নিজের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই অনুভূতি যেন একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লইয়া তাঁহার ইহকাল

পরকাল ব্যাপিয়া তাঁহাকে খেলার পুতুলের মত চালিত করিতেছে। তাঁহার জীবন, তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-চিন্তা-কর্ম কিছুই যেন তাঁহার নয়, সমস্তই তাঁহার সমগ্র জীবনের অধীশ্বরী এই অনুভূতির আত্ম-প্রকাশ। এই সৌন্দর্যানুভূতিই রবীন্দ্রনাথের কবি-সৃষ্টি বা কবি-প্রেরণার মূল উৎস। কবির সৃষ্টি—কবির সৃজনী প্রতিভা এই অনুভূতিরই অভিব্যক্তি। এই বিশ্বসৌন্দর্যানুভূতিই কবির জীবন-দেবতা—যিনি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া কবিকে নব নব রূপ ও রসের আস্বাদন দিতেছেন। এই জীবন-দেবতা কখনো অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী প্রেয়সীরূপে কবির জীবন বিচিত্র লীলারসে আপ্লুত করিতেছেন, আবার কখনো জীবনের অধীশ্বররূপে তাঁহার সমগ্র জীবন, তাঁহার ভাব ও চিন্তা, তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই জীবন-দেবতা কখনো নারীরূপে, কখনো পুরুষরূপে, কবির জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, এই সৌন্দর্যচেতনাই ক্রমে জীবন-দেবতার অনুভূতিতে কবিকে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

'মানস-সুন্দরী'র এই বিশ্বসৌন্দর্যদেবী 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা'য় কবির নিকট অপূর্ব রহস্যময়ী এক নারী। বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবী এবার কবিকে তাঁহার 'সোনার তরণী'তে উঠাইয়া লইয়াছেন। সেই অপরিচিতা নারীর নৌকায় কবি একাকী নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়াছেন। এই রহস্যময়ী নারী এক প্রবল আকর্ষণে কবিকে অজানা ভবিষ্যতের দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবিকে নব নব রূপ উপভোগ করাইতে করাইতে, নব নব রস পান করাইতে করাইতে, জীবনের অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করিয়াছে,—এ যাত্রার পরিসমাপ্তি কোথায়—এ অভিযানের সাফল্য কোথায়, কবি তাহা জানেন না—তবুও সম্মোহিত অবস্থায় নীরবহাসিনী অপরিচিতার আহ্বানে তাহার নিকট ধরা দিয়াছেন। সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সেবা বা উপাসনায় জীবনে কোনো বস্তুগত লোভের বাসনা বা কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষার সাফল্য কামনা নিরর্থক—কবির এ প্রশ্নের উত্তর কেবল সৌন্দর্যদেবীর নীরব হাসি; সৌন্দর্যের আহ্বান নিরন্তর জীবনে আসিতেছে—সে আহ্বান জীবনে বরণ করিয়া লইতে হইলে, তাহার নিকট সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে,—জীবনে মেঘ ও রৌদ্র, মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া লাভালাভ ত্যাগ করিয়া সেই বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্য-সেবাকেই একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে—'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় ইহাই যেন কবির একটা ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। এই সৌন্দর্যময়ী কবির 'সোনার তরী'র মাঝি, তাঁহার 'মানস-সুন্দরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় রহস্যময়ী অপরিচিতা নারী—পরবর্তী কবি-জীবনে তাঁহার জীবনদেবতা।

'সোনার তরী'র অন্তর্গত 'পুরস্কার' কবিতাটি একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এই দীর্ঘ কবিতাটি ভাব, চিত্র, আবেগ, ভাষা, ছন্দ-সঙ্গীত প্রভৃতিতে রবীন্দ্র-কাব্যকলার একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম ও কাব্যাদর্শের একটা পরিচয় ইহাতে প্রকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। ধরণী ও মানবজীবনের প্রতি কবির অসীম প্রীতিও এই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে।

এই আখ্যায়িকা-কাব্যের কবি রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিচ্ছবি। কাব্যের সৌন্দর্য ও রসের চমৎকারিত্ব দ্বারা গুণী ও রসিকজনের স্বীকৃতি ও সমাদরলাভই কবির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। উহা ছাড়া কোন অর্থসম্পদ, পদমর্যাদা বা খ্যাতি-প্রতিপত্তি তাঁহার কাম্য নয়। রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের আদর্শ হইতেছে বিশুদ্ধ আর্ট বা সৌন্দর্য-তন্ত্র। এই আর্ট প্রয়োজনের গণ্ডীর উর্ধ্বে, সাংসারিক ক্ষয়-ক্ষতি, লাভালাভ, নীতি বা তত্ত্বের সম্বন্ধবিচ্যুত। কেবল সৌন্দর্য ও রস সৃষ্টিই উহার একমাত্র কাজ। কবি ভালোবাসেন শ্যামসমারোহমণ্ডিত এই বিশাল ধরণীকে, মানবজীবনের যুগযুগবাহিত হাসি-অশ্রু, বিরহ-মিলনকে,—

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে ;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখিজল—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা, সৃষ্টির অন্তরালে সৌন্দর্যের যে অনাদি সংগীত অহরহ উৎসারিত হইতেছে, তাঁহার কাব্যরচনায় সেই সংগীতের প্রতিফলনের দ্বারা তিনি ধরণীর বিচিত্র সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করিয়া যাইবেন এবং মানুষের স্নেহপ্রেমের মধ্যে এক অপার্থিব সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সৃষ্টি করিবেন,—

ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি দিব আমি সেই গীত-আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর-অর্থ-ভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাস-পরা।

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়—
রঙিন করিয়া দিব।
... ...
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটুকু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
শিশিরের মতো রবে।

এই কবিতাটির সরস্বতী-বন্দনায় কবির আকৈশোর একটি উপলব্ধির স্ফুটতর রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। সৃষ্টির মূলে আছে এক নিরন্তর-উৎসারিত সংগীত। বিশ্বচরাচর সেই মহাসংগীতে ভাসমান। সেই মহাসংগীত সৌন্দর্যরূপে জগৎ ও জীবনে প্রকাশমান। 'প্রভাতসংগীত'-এর 'প্রতিধ্বনি', 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' প্রভৃতি কবিতায় এই ভাবটি অস্ফুট আকারে ছিল, এই কবিতায় তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সমস্ত বিশ্বব্যাপী এক মহাসৌন্দর্যের নৃত্য চলিতেছে। 'প্রভাতসংগীত'-এর এই অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করিয়া কবি 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন,—"দেখিলাম, এক অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।... এই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম।" এই সৌন্দর্যনৃত্যের সংগীতই রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্ত্র—তাঁহার কাব্য-প্রেরণার প্রধান উৎস। মানব-সম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা তাহার মধ্যেও পরম আনন্দ, পরম সৌন্দর্য, তাহার মধ্য দিয়াও অনন্তরাগিণী প্রতিধ্বনিত। এই জগতের সমস্ত খণ্ড সৌন্দর্য, জীবনের সমস্ত ক্ষণিক স্নেহ-প্রেম, হাসি-অশ্রু, সুখদুঃখ যে এত মনোহর, এমন অনির্বচনীয়, তাহার কারণ ইহাদের মধ্য দিয়া সেই 'বৃহৎ, বিপুল, গভীর মধুর' অনাদি সুর ঝংকৃত হইতেছে।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের জগৎ-দর্শন ও জীবন-দর্শন। বিশ্বের সমগ্র রূপ-প্রবাহের অন্তরালে এক শাশ্বত সত্তার লীলা বর্তমান। এই রূপ-প্রবাহ ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল হইলেও ইহার মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্য বিলসিত। সেই সৌন্দর্যের আবেদন একটি সংগীতের মতো—একটি রাগিণীর মতো অন্তরে উপলব্ধি করা যায়। এই উপলব্ধিতে ধ্বংস-সৃষ্টি, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না সেই বিশ্বরাগিণীর ছন্দে আবর্তিত হইয়া এক অপূর্ব মনোহর রূপ ধারণ করে এবং মানুষকে সর্ববন্ধনমুক্ত করিয়া আনন্দলোকে, অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে।

মোহিতলাল এই বিশ্বরাগিণী সম্বন্ধে বলেন,—"সেই সৌন্দর্যের সংগীত-সুষমাই সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা, তাহাই ব্রহ্মাস্বাদ; উহাতে যাহা কিছু ক্ষণিক, খণ্ড ও পৃথক, তাহা এক মহাসৌন্দর্য-নৃত্যে লয় হইয়া যায়, সেই সংগীতরসেই—

বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত্য-মাঝে বহমান
নিয়ত আত্মহারা।

এই বহমান সংগীতই সৃষ্টিধারা, তাহারই ছন্দে

সকালে ফুটিছে সুখদুখলাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর—
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর
মগন গগনতল।"

কবি-সমালোচক মোহিতলাল 'সোনার তরী', 'মানসসুন্দরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র মধ্যে যোগসূত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন,—

"নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় কবি তাঁহার মানসসুন্দরীকে আর এক রূপে দেখিতেছেন··· কবির কবি-জীবনের প্রভাতকালে ঐ 'বিদেশিনী' তাঁহাকে ডাকিয়াছিল, সেই আহ্বানে তিনি সংগীত-কল্লোলিত সৌন্দর্য-পাথারে কোন্ দূর কল্পলোকের উদ্দেশ্যে, তাঁহারই তরণীতে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু যতই সেই বারিরাশি অতিক্রম করিতেছেন, ততই গন্তব্যের ঠিকানা হারাইয়া যাইতেছে—

বেলা বহে যায় পালে লাগে বায়
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
পশ্চিমে হের নামিছে তপন অস্তাচলে।

দেহ-মনে যতই অবসাদ ও ক্লান্তি নামিতেছে, ততই সেই বিদেশিনীর ভাবভঙ্গী আরও রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। প্রথম কবিতার সেই 'সোনার তরী' এখানে আরেক অর্থ বহন করিতেছে, এ তরী কল্পনার তরী এবং তাহাতে কবি নিজেই ভাসিয়া চলিয়াছেন; তথাপি তাহার সহিত একটা ভাবসাদৃশ্য আছে। সেখানে কাব্য শেষ হইয়াছে, কবি বিশ্রাম চান, এখানে কাব্য শেষ হয় নাই, বরং অসীম সৌন্দর্যসাগর পার হইবার দুশ্চিন্তা আছে—আশা ও আকাঙ্ক্ষা দুই-ই আছে। অতএব, এই কবিতায় কবির যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, প্রথম কবিতাটিতেও তাহারই একটি ভিন্নতর রূপ আছে, অর্থাৎ সেই কবিতাও কবির ভাব-জীবনের একটি ভাবনা-কামনার রূপক—তাহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

এ কবিতার ঐ রূপকটির মূলে দুইটি তত্ত্ব আছে ; এক—কবি-মানসের সেই ভাবগ্রন্থি আরও দৃঢ় হইয়াছে, তিনি বিশ্বাস করেন—কোন এক অন্তর্যামী-শক্তি তাঁহার কবি-জীবনের নিয়ন্ত্রী ; পূর্ব কবিতার সেই কর্ণধারই এখানে আরও সুস্পষ্টভাবে কবির 'জীবন-দেবতা'র রূপ ধারণ করিয়াছে ; ইহাকেই পরবর্তী কাব্যে ('চিত্রা') তিনি ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন। দুই—ঐক্ষণে কবির কবি-জীবনে একটা ক্লান্তি আসিয়াছে ; যে সৌন্দর্য-জগৎ তাঁহার মানসে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, তাহা এমনই অসীম যে ভয় হয়, তাহা পার হইয়া শেষ তীর্থে পৌছানো অসম্ভব। কবি আশা করিয়াছিলেন, ঐ সৌন্দর্য-সাধনায় হৃদয়ের সকল উৎকণ্ঠা দূর হইবে, উহাতেই একটি পরমা নিবৃতি লাভ হইবে, যথা—

"এ বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে, আছে এক মহা-উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

['মানসসুন্দরী']

কিন্তু এখন বোধ হইতেছে এ পথের শেষ নাই,—শেষ হইবার পূর্বেই শক্তি নির্বাপিত হইবে, জীবনের দিবালোক দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই আকুল হইয়া সেই বহিত্র-বাহিনীকে তাঁহার ঐ আশঙ্কা নিবারণ করিতে বলিতেছেন, সে কোন এক রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিতেছে। এ হাসির অর্থ—অন্ধকারে নামিলেও কোন ভয় নাই ; এখনও কত প্রভাত আছে। হোক না ঐ সৌন্দর্য-সাগর অসীম অকূল—উহার ঐ অসীম বক্ষেই সৌন্দর্যের আলোক নানা বর্ণে বিলসিত হইবে। কবি হয়তো তাহা বুঝিতেছেন—ঐ হাসিতে সেই আশা জাগিতেছে, তবু নিঃসংশয় হইতে পারিতেছেন না।"

(ঘ) 'সোনার তরী'র এই ভাবধারার কবিতায় কবি মানুষের প্রেম ও স্নেহের জয়গান করিয়াছেন। এই ধ্বংসশীল পৃথিবীর বুকে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষুদ্র-স্নেহ-প্রেমের মধ্যে এক পরমাশ্চর্য বস্তু নিহিত আছে—কবি তাই অপূর্ব বিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছেন। কবি চিরদিনই মানবের স্নেহ-প্রেমকে সৃষ্টির মূলে যে নিত্য আনন্দ বিরাজমান, তাহারই ক্ষণিক ও খণ্ড প্রকাশ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। নরনারীর প্রেমের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য ও বিলাস তিনি অতিশয় নিপুণতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন, কিন্তু এই পার্থিব প্রেমের মধ্যে অপার্থিবত্বের ইঙ্গিত থাকায়, তাহা স্বর্গীয় মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত প্রেম-কবিতাতেই এই পৃথিবী ও আকাশ, স্বর্গ ও মর্ত্য, পার্থিব ও অপার্থিবের মিলন হইয়াছে।

'ভরা ভাদরে' কবিতায় দেখা যায়, প্রাকৃতিক আবেষ্টনী কবি-মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের একটা, গূঢ় সম্বন্ধ আছে। তাহার বৈচিত্র্যে কবির মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হয়।

বর্ষাকাল উচ্ছল পরিপূর্ণতার প্রতীক। বকুল, কদম্ব, কেতকী ফুলের মহাসমারোহে ধরণী আনন্দ-বিহ্বল। বর্ষার পরিপূর্ণতায় মনে একটা প্রেমের আবেগ উপস্থিত হয়। কবির হৃদয়ও এ সময় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছে। পরিপূর্ণ বর্ষায় একটা অনির্দিষ্ট প্রেম-বেদনার কুয়াশায় কবির চিত্ত-গগন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। কবি কোনো অনামী প্রণয়-পাত্রীর কালো চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। বৃষ্টি-বিধৌত আকাশে শুভ্র মেঘদলের অভিযানের সঙ্গে কবির চিত্ত ক্ষুদ্র পরিধি চূর্ণ করিয়া শত-সহস্র অংশে নিজেকে বিভক্ত করিতে চাহিতেছে। তরুশাখে ফুলের মেলা, পাখীর গান, নিভৃত পাতার আড়ালে কপোত-কূজন কবিকে একেবারে বিহ্বল করিয়া দিতেছে। দিনরাত্রি প্রাণে তাঁহার বিচিত্র-রাগিণীর বাঁশি বাজিতেছে।

'প্রত্যাখ্যান' কবিতায় প্রেমিকা প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিতে পারিতেছে না। অথচ প্রেমাস্পদের প্রণয়-আকুতি তাহার প্রাণে বেদনা জাগাইতেছে। প্রেমিকা তাহার মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিতেছে না—সে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। তাহার প্রেম বাসনাকলঙ্কহীন নির্মল হয় নাই। প্রেমাস্পদের প্রেম গ্রহণ করিতে হইলে যে দেহ-মনের প্রয়োজন, তাহা তাহার নাই ; সেই মহোত্তম প্রেমের দান সে গ্রহণ করিতে অক্ষম বলিয়া অন্তরবেদনায় অধীর হইতেছে। প্রেমিক প্রেমের মহান গৌরব লইয়া তাহার সহিত মহাসমারোহে মিলিত হইতে আসিতেছে, কিন্তু প্রেমিকা নিজের মালিন্যের অন্ধকারে পড়িয়া আছে—তাহাদের মিলন-বাসর রচনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তাই সে বলিতেছে,—

ভুলিয়া পথ এসেছ সখা, এ ঘরে।
অন্ধকারে মালা-বদল কে করে।
　　সন্ধ্যা হতে কঠিন ভুঁয়ে
　　একাকী আমি রয়েছি শুয়ে
　　নিবায়ে দীপ জীবন-নিশি
　　　　যাপনা।

'লজ্জা' কবিতাটি প্রেম-মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ। নরনারীর প্রেমলীলায় লজ্জার ক্ষীণ আবরণটুকু মনোরম মাধুর্যের সৃষ্টি করে। এই অতি ক্ষীণ ভিত্তির

উপর একটা ঐন্দ্রজালিকের প্রাসাদ নির্মিত হয়;—কল্পনার শতবর্ণময় ঐশ্বর্যের বিচিত্র খনি এই লজ্জা, এই সংকোচ; শিথিল-ভিত্তি আবরণটুকু নরনারীর প্রেমের মধ্যে অভিনবত্ব দান করে। এই ক্ষুদ্র লজ্জা-বৃন্তে নারীর সমস্ত সৌন্দর্যপুষ্প বিকশিত হইয়া আছে,—

শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো।
… … …
সেটুকুতে ভর করি
এমন মাধুরী ধরি
তোমাপানে আছি আমি ফুটিয়া,
এমন মোহন ভঙ্গে
আমার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য যায় লুটিয়া॥

'হৃদয়-যমুনা'য় কবি প্রেমের সর্বগ্রাসী, সর্বব্যাপক শক্তির মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। কবি বিশ্ববাসীকে তাহাদের বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্ন ধারার প্রেম-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তাঁহার হৃদয়-যমুনায় আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার বাসনা—ভোগ, আত্মবিস্মৃতি, পরিপূর্ণ মিলন প্রভৃতি প্রেমের সবপ্রকার প্রয়োজন তাঁহার অপরিসীম প্রেম দ্বারা মিটাইবেন। অকৃত্রিম প্রেম সকল অবস্থাকে বরণ করিতে পারে—সকল দাবী মিটাইতে পারে।

'ব্যর্থ-যৌবন' কবিতাটি ব্যর্থ অভিসারিণীর হতাশার আক্ষেপ। বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের প্রভাব এই কবিতাটির উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছে।

'যেতে নাহি দিব' কবিতায় কবি পৃথিবীর ধ্বংস-মৃত্যুর উপর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের আসন নির্দেশ করিয়াছেন। বিশ্ব-প্রকৃতি ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, মানুষে-মানুষে সমস্ত সম্বন্ধ প্রতিনিয়ত মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন হইতেছে, কিন্তু মানুষের স্নেহপ্রেম ধ্বংস-মৃত্যুর দ্বারা পরাভূত হইতে চাহে না। এই কবিতাটি জীবনপ্রেমিক কবির একটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। বাস্তবজীবনের একটা সামান্য ঘটনায় কবির অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় অপূর্ব কল্পনার সাহায্যে একটি বিশ্বব্যাপী অলঙ্ঘ্য নিষ্ঠুর নিয়মের অস্তিত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছে। কবি Particular হইতে Universalএ উঠিয়াছেন। বিশ্ববিধান মানিয়া লইলেও অতি-দুর্বল মানুষের অন্তরের প্রেম নিয়তি-নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করিবার অত্যাশ্চর্য শক্তি ধারণ করে।

সৃষ্টি চলিয়াছে ক্রমাগত মৃত্যু-অভিমুখে,—কিন্তু এই নিখিল বিশ্ব প্রত্যেক বস্তুকেই প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র;—

ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
"যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।" সবে
কহে "যেতে নাহি দিব।"………

মানুষের প্রেমও প্রেমাস্পদকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সযত্নে চিরস্থায়ী করিতে চায়। বারবার বিফলমনোরথ হইলেও বিশ্বাস তাহার অটল।

ম্লান মুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব;
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়,
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে, "আমি ভালোবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।"

একদিকে মানুষের স্নেহ-প্রেম, অন্যদিকে নিষ্ঠুর মৃত্যু—সৃষ্টির অপরিবর্তনীয় বিধান। এই দুয়ের দ্বন্দ্বে আমাদের জীবনের একটা চিরন্তন ট্র্যাজেডি লুক্কায়িত আছে। এই চিরন্তন মানব-বেদনার ইঙ্গিত করিয়াছেন কবি এই বিদায়-দৃশ্যে।

(ঙ) 'প্রতীক্ষা' কবিতাটি মৃত্যু-সম্বন্ধে কবির প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা। মৃত্যু সম্বন্ধে কবি বহু কবিতা লিখিয়াছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়েও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি মৃত্যুকে বহুভাবে দেখিয়াছেন,—মৃত্যুর নির্মমতা, অনিবার্যতা, রহস্য, দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি অপরূপ বৈশিষ্ট্যে তাঁহার কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

মানুষের স্নেহ-প্রেমের লীলায়, প্রকৃতির নিত্য-নূতন বৈচিত্র্যে, শোভা ও সংগীতে, এই সংসার নন্দন-কানন; কিন্তু ইহার এক কোণে মৃত্যু সংগোপনে বসিয়া আছে সুযোগের প্রতীক্ষায়। মৃত্যু অনন্ত রহস্যময় রাজ্যের অধিবাসী। আমাদের এই সংসারের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অলক্ষ্যে ছায়ার মতো মৃত্যুর প্রভাব পড়িয়া ইহাদিগকে অপূর্ব রহস্যে মণ্ডিত করে। কবির বক্ষোবাসী প্রাণ-পক্ষী কবির প্রিয়া। তাহার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া মৃত্যু নীরবে স্তব্ধ-আসনে ধ্যানমগ্ন। তাঁহার প্রাণ-পক্ষী নব নব বসন্তে নব নব তরুশাখে চঞ্চল নৃত্য-গীতে আত্মহারা। ক্রমে সে মৃত্যুর হাতে ধরা দিবে এবং সৃষ্টির পরপ্রান্তে অনাদি রাত্রির কোলে দুজনে মৌন বাসর-আলাপন সম্পন্ন করিবে। কবি বলিতেছেন, এখনো তাঁহার প্রাণ-পক্ষীকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করিতে তিনি অনিচ্ছুক; এখনো তাহার সংগীত শেষ হয় নাই—নিত্য-নূতন আনন্দ-স্বাদের সম্ভাবনা তাহার বর্তমান।

কবির সম্মুখে এমন অপূর্ব রূপ ও রসের প্রস্রবিণী পৃথিবী উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে ভোগ করা হয় নাই। যদিও এই রূপ ও রসভোগ ক্ষণিকের মেলা, মুহূর্তের খেলা, তবুও কবি এই মিথ্যার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কিছুকাল এই পৃথিবীকে ভোগ করিতে চাহেন। মৃত্যু যেন তাঁহার খেলার পুরী সত্বরই ভাঙিয়া না দেয়। তারপর, যখন পরিণত বয়সে, জীবনের শেষে ভোগ-সামর্থ্য স্তিমিত হইয়া আসিবে, সেই সময়েই কবি মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছেন,—

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে,
আমার পরাণবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু ; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো :
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।

'ঝুলন' কবিতাটিতে আত্মশক্তির অসাড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান আছে। এখানে দুইটি বিপরীত শক্তির মধ্যে সংগ্রামের ইঙ্গিত আছে, একদিকে কবির প্রাণ—অপর দিকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ; একদিকে কোমল ভাবরাজি, বিচিত্র অনুভূতি—অন্যদিকে কবির প্রখর সত্তাবোধ। কবির প্রাণ রূপ ও রসের আস্বাদনে বিহ্বল, নিবিড় সুখভোগের আবেশে আত্মহারা, স্বপ্নপুরীর অধিবাসী তিনি। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব ন্যায় ও কর্তব্যনিষ্ঠ, কর্মপ্রবণ ও সত্যাশ্রয়ী। এই সুখ-মোহাবিষ্ট প্রাণের সত্য পরিচয় তিনি পাইতেছেন না—তাহার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তাই, প্রবল আঘাতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার ভোগসুখের আবেশ ভাঙিয়া, স্বপ্নমায়াজাল ছিন্ন করিয়া, তাহাকে নূতনভাবে উপলব্ধি করিতে চাহেন। তাই প্রাণের সঙ্গে তাঁহার মরণ-খেলার আয়োজন—কঠিন আঘাতে তাহাকে আত্ম-সচেতন করিবার তাঁহার প্রয়াস। তাই ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুঃখ-বিপদকে আহ্বান করিয়া তাঁহার অন্তরতম সত্তা বধূকে উদ্বোধন করিবার জন্য কবি বলিতেছেন,—

আয় রে ঝঞ্ঝা পরাণবধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-
বসন খোল্।
দে দোল্ দোল্।

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ,
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল দোল্॥
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরিছে আজ
দুটো পাগোল।
দে দোল দোল॥

এই কবিতায় কবির এই মনোভাব সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে, বিপদে, বিদ্রোহে, বিপ্লবে, অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো এক কবিতায় লিখেছিলাম, বলেছিলাম, আমার অন্তরের আমি আলস্যে, আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আসল আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

[সাহিত্যতত্ত্ব—প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪১, সাহিত্যের পথে, পৃ-১৩৫-১৩৬]

ভাষায়, ভাবে ও ছন্দে রবীন্দ্রকাব্যের এটি একটি শ্রেষ্ঠ লিরিক। একটি কেন্দ্রগত ভাব ক্রমে ক্রমে ফুলের মতো পাপড়ি মেলিয়া আবেগের তীব্রতায় পর্যায় পর্যায় উঠিয়া একটি অখণ্ড ফুলের মূর্তি ধারণ করিয়াছে এবং চরম আবেগের স্ফুরণের পরে নিঃশেষ হইয়াছে।

৭

চিত্রা

(১৩০২)

'চিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের অতি প্রবল ও পরিপূর্ণ বিশ্বসৌন্দর্য-অনুভূতি অপূর্ব ভাবৈশ্বর্যমণ্ডিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'সোনার তরী'তে যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তাহারই পূজা, তাহারই বন্দনা-গান, অপরূপ গরিমায় 'চিত্রা'য় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'মানস-সুন্দরী'তে বিশ্বসৌন্দর্যের যে মূলগত ভাবকে তিনি এক নারীমূর্তির মধ্যে আবদ্ধ দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই নিখিল সৌন্দর্যের আদি ভাবকে তিনি বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া দেখিয়াছেন —তাঁহার অন্তরশায়িনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সেই আদি রূপকে তিনি পূজা করিয়াছেন— তাহার জয়গান করিয়াছেন। সৌন্দর্যের আদি রূপ বস্তুনিরপেক্ষ (Abstract),

ইন্দ্রিয়জ ভোগের অতীত ভাবময় একটা অনুপ্রেরণা। সৌন্দর্যের পূজারী কবি সেই মূল সৌন্দর্যকে নানা রূপ ও রসে 'চিত্রা'য় অনুভব করিয়াছেন।

'চিত্রা' কাব্যের প্রথম কবিতা 'চিত্রা' এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাবের অবতরণিকা। 'চিত্রা' কবিতাটিতে কবি বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। নিখিল বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের মূলে রহিয়াছে এক চিরন্তন সৌন্দর্যময়ী। সেই আদি সৌন্দর্য বহির্জগতে প্রতিফলিত হইতেছে—জগতের যাহা-কিছু সুন্দর, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি, তাহা সেই আদি সৌন্দর্যের পরিণতি। সেই আদি সৌন্দর্যের কোনো বিশিষ্ট মূর্তি নাই, জগতের বিভিন্ন সৌন্দর্যরূপের মধ্যে তাহার প্রকাশ হইলেও তাহার কোনো নির্দিষ্ট অবয়ব বা মূর্তি নাই। সৌন্দর্যের আদি রূপ বস্তুনিরপেক্ষ ও রূপাতীত। বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের মূলে থাকিলেও সকলকে অতিক্রম করিয়া সে অরূপ। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের মূলাধার এই আদি সৌন্দর্যময়ীকে বহির্জগতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্য হইতে সরাইয়া লইয়া কবি আপন অন্তরের মধ্যে তাহাকে একাকিনী অবস্থায় অনুভব করিতেছেন। বাহিরে সেই সৌন্দর্য বহু ধারায় বিচ্ছুরিত হওয়ায় স্থিররূপহীন ও চঞ্চল, কিন্তু কবির অন্তরে সে অচপল ও অচঞ্চল। কবির সমস্ত চিত্ত ব্যাপিয়া সেই মহিমময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছে, আর কবি মুগ্ধচিত্তে সেই অন্তরবাসিনীর পূজায় মগ্ন হইয়াছেন। বাহিরের প্রকাশমান বহু হৃদয়ে একে পর্যবসিত হইয়াছে। অন্তরের এই সৌন্দর্য-অনুভূতি কোনো বিশিষ্ট রূপে বা চিত্রে রূপান্বিত হয় নাই, ইহা কেবল বিশুদ্ধ আনন্দের বিহ্বল অনুভূতি, ধ্যানের তন্ময়ত্ব, যোগের অখণ্ড একাগ্রতা, মানব-মনের একটা মহাভাব। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের প্রাণ সেই মহিমময়ী সৌন্দর্যদেবীর পূজায় কবির সমস্ত কাব্য-প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

এই 'চিত্রা' কবিতাটি সমগ্র চিত্রা কাব্যগ্রন্থের মূল সুরের প্রথম আলাপন। 'কড়ি ও কোমল'-এ কবি সৌন্দর্য ও প্রেমকে লালসাময় ভোগের ঊর্ধ্বে উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। 'মানসী'তে পার্থিব কামনাজড়িত প্রেম ও সৌন্দর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উহাদের ঊর্ধ্বে অখণ্ড ও অপার্থিব প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছেন। 'সোনার তরী'তে কবি সেই মনের বাসনা-কলঙ্কিত সৌন্দর্যের সীমা অতিক্রম করিয়া সকল সৌন্দর্যের আদি অখণ্ডরূপের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। 'চিত্রা'তে চলিয়াছে সেই বিশুদ্ধ, অখণ্ড, আদি-বিশ্ব সৌন্দর্যের উপাসনা। সৌন্দর্যবোধের বিশাল ও পরিপূর্ণ অনুভূতিতে কবি একেবারে আত্মহারা হইয়াছেন। সমস্ত সৌন্দর্যের মূল প্রাণকে যেন তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রবল সৌন্দর্য-পিপাসাকাতর কবি জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও অনুভূতির মধ্য দিয়া এমন একটা স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছেন, যেখানে তাঁহার অদম্য সৌন্দর্যতৃষ্ণার তৃপ্তি ঘটিয়াছে, জীবন সত্যকার সৌন্দর্য ও প্রেমের অমৃতস্বাদে ধন্য হইয়াছে—সাধনার পরিপূর্ণ সার্থকতায় জীবন গৌরবদৃপ্ত হইয়াছে। 'চিত্রা' কবির সৌন্দর্য-সাধনার বিজয়-বৈজয়ন্তী।

'চিত্রা'য় সৌন্দর্য-সম্বন্ধে কবির চরম অনুভূতির বিষয় বিশেষভাবে থাকিলেও উহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কয়েকটি ভাবধারার কবিতা আছে। কবিতাগুলি বিচার করিলে এইসব ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়,—

(ক) কবির সৌন্দর্য-অনুভূতি—'চিত্রা', 'উর্বশী', 'বিজয়িনী', 'আবেদন', 'জ্যোৎস্নারাত্রে', 'পূর্ণিমা', 'দিনশেষে' প্রভৃতি,

(খ) প্রেম প্রভৃতি মানবিক চিত্ত-রসের উপলব্ধি,—'স্বর্গ হইতে বিদায', 'সান্ত্বনা', 'প্রেমের অভিষেক, 'রাত্রে ও প্রভাতে' ইত্যাদি.

(গ) জীবনদেবতা-ভাবমূলক,—'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা', 'সাধনা, 'সিন্ধু-পারে ইত্যাদি;

(ঘ) নিরবচ্ছিন্ন শিল্পীর সৌন্দর্যভোগের জীবন হইতে কর্ম ও কর্তব্যের আহ্বান—'এব ৷ ফিরাও মোরে', 'নগর-সংগীত' ইত্যাদি,

(ঙ) মৃত্যু বা শেষ পরিণতি সম্বন্ধে—'মৃত্যুব পরে, '১৪০০ সাল, 'প্রৌঢ' প্রভৃতি।

(ক) 'চিত্রা' কবিতাটিতে যে ইন্দ্রিয়ভোগাতীত, সাংসারিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বগত, অনবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড সৌন্দর্য, বাহিরে রূপে, রসে, শব্দে, স্পর্শে, গন্ধে বিচিত্ররূপিণী হইলেও কবি-হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে একাকিনী অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, 'উর্বশী কবিতায় কবি তাহার অপূর্ব স্তুতিপাঠ ও অনুপম বন্দনা-গান গাহিয়াছেন। সেই অখণ্ড ও বস্তুনিরপেক্ষ বিশ্বসৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপ ও পূর্ণ বিকাশ প্রকটিত হইয়াছে, 'উর্বশী' কবিতায়।

ভারতীয় পুরাণ-বর্ণিত স্বর্গের বিলাসিনী, অনন্তযৌবনা, চির-প্রণয়িনী নর্তকী উর্বশীকে কবি এই বিশুদ্ধ বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নারী-রূপিণী হইলেও উর্বশীর জন্ম সাধারণ নর-নারীর মত নয়। সমুদ্রের তলদেশ হইতে তাহার উদ্ভব। যে সমস্ত সম্বন্ধের মধ্য দিয়া এ সংসারে আমরা নারীকে পাই, উর্বশী সে সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে নাই—সে তাহার অতীত—সে কন্যা নহে, বধূ নহে, মাতা নহে। সে সমস্ত মানবীয় সম্বন্ধের গণ্ডীর বাহিরে। সে অকুণ্ঠিতা—অনবগুণ্ঠিতা—আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, মানবসম্বন্ধবিকাররহিত একটি চিরভাস্বর

সত্তা। রূপধারিণী হইয়াও সে অরূপ—অমূর্ত। সে বাস্তবনিরপেক্ষ, বস্তুনিরপেক্ষ, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ নির্যাস। সমুদ্রমন্থনে উর্বশী উঠিয়াছিল—এক হাতে অমৃত-পাত্র, অপর হাতে বিষভাণ্ড লইয়া। নির্মল সৌন্দর্য-অনুভূতি অমৃত, বাসনা-কলঙ্কিত সৌন্দর্যভোগের অপূর্ণতার বেদনাই বিষ। সৌন্দর্যের স্পর্শ পাইয়া জল-স্থল-অন্তরীক্ষ শিহরিয়া উঠিল,—তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র স্তম্ভিত হইয়া বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় কুন্দশুভ্র নগ্ন সুন্দরীর চরণে মস্তক অবনত করিল। উর্বশী বিশ্বে চির যৌবনের মূর্ত প্রকাশ—তাহার শৈশব নাই,—বার্ধক্য নাই—তাহার অনন্ত যৌবনশ্রীর কোনোই হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। সেই সৌন্দর্যময়ী সারা বিশ্বের চিরন্তন প্রণয়িনী—সকল কালের, সকল লোকের আকাঙ্ক্ষার ধন, একটা প্রলয়ঙ্করী শক্তি বা প্রেরণা।

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল,
তোমারি মদিরগন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্তভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সংগীতে।

উর্বশীর নৃত্যে সমুদ্র-তরঙ্গের লীলায়িত নৃত্য, ধরণীর বুকে শস্যের ঐশ্বর্য ও আনন্দ-শিহরণ, নৃত্যান্দোলিত স্তনহারের স্থানচ্যুতিতে আকাশের উল্কাপাত, নৃত্যরাগরঞ্জিত পুরুষের চিত্তে উন্মাদনার প্রকাশ,—

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।

কবি দেখিয়াছেন—সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য ও প্রেমের মূলে এই উর্বশীর অনুপ্রেরণা। ত্রিভুবনের যৌবনচাঞ্চল্য, মুনিগণের হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাবে তপস্যাভঙ্গ, বিশ্বের সুরভিসম্ভার, কবির কাব্য ও সংগীতের উন্মাদনা, সমুদ্রের তরঙ্গ-নৃত্য, ধরণীর শস্যের ঐশ্বর্য, মানবের চিত্তবিকার ও প্রেমাকাঙ্ক্ষা—এই সমস্তেরই মূলে উর্বশীর প্রভাব ও প্রেরণা। ইহাদের সহিত তাহার কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও—ইহাদের মধ্যে তাহার ইন্দ্রজাল, তাহার অঙ্গদ্যুতি, তাহার নৃত্যের আভাস আমরা পাইতেছি। সে এই সকলের জীবন-রূপিণী হইলেও ইহাদের ঊর্ধ্বে, ইহাদের অতীত। বিশ্বের অন্তরশায়িনী এই সৌন্দর্যময়ী আমাদের চিত্তলোকে, আমাদের কল্পনায় রাজরাজেশ্বরীরূপে বিরাজিত। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য, তারুণ্য ও

প্রেমের মধ্যে আমরা তাহাকে উপলব্ধি করিতেছি। মানুষ যুগে যুগে এই অনন্তযৌবনা ভুবনমোহিনীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে—আরাধনা করিতেছে,—

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী॥

কবি মনে করেন, বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতি সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে আর পূর্বের মতো অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না—নিখিল চরাচর যেন এই বিচ্ছেদ-বেদনায় অশ্রু বিসর্জন করিতেছে।

ফিরিবে না, ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।

এ জগতে বসন্ত ও পূর্ণিমা-রাত্রির উচ্ছল ও পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে কেমন যেন একটা অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ব্যাকুল বিচ্ছেদন-বেদনার অশ্রু আমাদের নয়নে দেখা যায়।

এ সংসারে মানুষের সৌন্দর্যভোগের মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও বেদনার রেশ লাগিয়া আছে। জগতের এইসব সৌন্দর্য খণ্ড ও সীমাবদ্ধ। ইহারা যে এক অসীম ও চিরন্তন মূল সৌন্দর্যের অংশ—সৌন্দর্য-গঙ্গোত্রীর মূলধারার সহিত ইহাদের যে যোগ আছে, একথা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে, তাই তাহার সৌন্দর্য-উপভোগের সমস্ত দিকচক্রবাল একটা সূক্ষ্ম বেদনা ও অতৃপ্তির কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কবি মনে করেন, এই অতৃপ্তি ও বেদনার ক্রন্দনের মধ্যেও এই আশা হৃদয়ে জাগে যে, একদিন সেই অনন্তযৌবনা সৌন্দর্যময়ীর পূর্ণ দর্শন মিলিবে—তাহার সহিত পূর্ণ সংযোগ-সাধন ঘটিবে—জগতের সমস্ত সৌন্দর্য তাহারই পুণ্যধারায় স্নাত হইয়া অতৃপ্তি বেদনার উর্ধ্বে উঠিয়া চিরনবীনত্ব লাভ করিবে। তাই কবি চিরযৌবন ও চিরসৌন্দর্যের প্রতীক উর্বশীর নিকট আবেদন জানাইতেছেন, সে যেন পুরাকালের মত আবার আবির্ভূত হয়—আবার নিখিল বিশ্ব সৌন্দর্য ও তারুণ্যের স্পর্শে সচকিত হইয়া উঠে।

আদি যুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার?

প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
বারিবিন্দুপাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব সংগীতে
রবে তরঙ্গিতে॥

ঔপন্যাসিক ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে (৬ই চৈত্র, ১৩০২) রবীন্দ্রনাথ 'উর্বশী' কবিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"গোটে যাহাকে বলেন: The Eternal Woman: Ewige Weibliche, আমি তাহাকে উর্বশীমূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি। সে আমাদের সহিত কোনোরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে; বধূ নহে, মাতা নহে, কন্যা নহে, সে রমণী, সে আমাদের হৃদয় হরণ করে, সে দিব্যরূপে আমাদের স্বর্গে বিরাজ করে, সে আমাদের ভুলায়, সে আমাদের পৌত্রদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিবে; অর্জুন তাহার সহিত পূর্বপুরুষগত সম্পর্ক পাতাইতে গিয়াছিলেন সেটা অর্জুনের ভ্রম, তাহার সহিত কাহারো কোনো বন্ধন নাই, যে আদিম রহস্যসমুদ্র হইতে দেবতারা সংসারের সমস্ত সুধা ও বিষ উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন অতল হইতে এই চিরযৌবনা অপ্সরী উঠিয়া আজ পর্যন্ত মুনিদের ধ্যানভঙ্গ, কবিদের কবিত্ব উদ্রেক এবং দেবতাদের চিত্তবিনোদন করিয়া আসিতেছে। সে নৃত্য করে, গান করে, আনন্দ দান করে এবং আমাদের বাসনার চরমতীর্থ স্বর্গলোকে বাস করে। আর একটি Woman পৃথিবীতে থাকেন, তিনি আমাদের সেবা করেন, কাজ করেন, কল্যাণ-বিধান করেন, তিনি আমাদিগকে ভালোবাসেন। তাঁহাকে আমরা কাঁদাই, দুঃখ দিই, তিনি তাঁহার অশ্রুধারাধৌত প্রফুল্লতার কিরণে আমাদের এই মাটির ঘরটুকু উজ্জ্বল করিয়া রাখেন। আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিয়া দেখিলে এক ভাগে The Beautiful, এক ভাগে The Good পড়ে। উর্বশী কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে, 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় দ্বিতীয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।" [চিত্রা, গ্রন্থপরিচয়]

উর্বশী কবিতাটির কবি আর একবার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে [২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩],—

"উর্বশী যে কী, কোনো ইংরেজি তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা-নির্দেশ করতে চাই নে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। এক হিসাবে সৌন্দর্যমাত্রই অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্‌—সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ উর্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য—সেইজন্য কোনো কর্তব্য যদি তার এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্‌ সৌন্দর্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য, সেইজন্য তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলি যাকে ইন্‌টলেক্‌চুয়াল বিউটি বলেছেন, উর্বশীর সঙ্গে অবিকল তাকেই মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধাঁ লাগে, তবে সেজন্য আমি দায়ী নই। গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণা করেছি সে ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়, চাঁদও নয়, গানের সুরও নয়—সে নিছক নারী—মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়—নারীর সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই।

মনে রাখতে হবে উর্বশী কে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রানী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃতপানসভার সখী।

দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। হোক-না সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপসৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্বশীতে সেই দেহসৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েছে। সে যেন চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত; তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।

কামনার সঙ্গে লালসার পার্থক্য আছে। কামনায় দেহকে আশ্রয় করেও ভাবের প্রাধান্য, লালসায় বস্তুর প্রাধান্য। রসবোধের সঙ্গে পেটুকতার যে তফাত এতেও সেই তফাত। ভোজনরসিক যে, ভোজ্যকে অবলম্বন ক'রে এমন কিছু সে আস্বাদন করে যাতে তার রুচির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করে। পেটুক যে, তার ভোগের আদর্শ পরিমাণগত, রসগত নয়। সৌন্দর্যে যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তবুও তা অনির্বচনীয়। উর্বশীতে সেই অনির্বচনীয়তা দেহ ধারণ করেছে, সুতরাং তা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্ নয়।

মানুষ সত্য যুগ ও স্বর্গ কল্পনা করেছে। প্রতিদিনের সংসারে অসমাপ্তভাবে খণ্ডভাবে যে পূর্ণতার সে আভাস পায়, সে যে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্ ভাবে কেবলমাত্র তার ধ্যানেই আছে, কোনোখানেই তা বিষয়ীকৃত হয় নি, এ কথা মানতে তার ভাল লাগে না। তাই তার পুরাণে স্বর্গলোকের অবতারণা। যা আমাদের ভাবে রয়েছে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্ স্বর্গে তাই পেয়েছে রূপ। যেমন, যে কল্যাণের পূর্ণ আদর্শ সংসারে প্রত্যহ দেখতে পাই নে, অথচ যা আছে আমাদের ভাবে, সত্যযুগের মানুষের মধ্যে তাই ছিল বাস্তবরূপে এই কথা মনে করে তৃপ্তি পাই। তেমনি এই কথা মনে করে আমাদের তৃপ্তি যে, নারীরূপের যে অনিন্দনীয় পূর্ণতা আমাদের মন খোঁজে তা অবাস্তব নয়, স্বর্গে তার প্রকাশ উর্বশী—মেনকা—তিলোত্তমায়। সেই বিগ্রহিণী নারীমূর্তির বিস্ময় ও আনন্দ উর্বশী কবিতায় বলা হয়েছে।

অন্তত পৌরাণিক কল্পনায় এই উর্বশী একদিন সত্য ছিল, যেমন সত্য তুমি আমি। তখন মর্তলোকেও তার আনাগোনা ঘটত, মানুষের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্ নয়, বাস্তব। যথা পুরুরবার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কিন্তু কোথায় গেল সেদিনকার সেই উর্বশী। আজ তার ভাঙাচোরা পরিচয় ছড়িয়ে আছে অনেক মোহিনীর মধ্যে, কিন্তু সেই পূর্ণতার প্রতিমা কোথায় গেল।

'ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী।' একটা কথা মনে রেখো। উর্বশীকে মনে করে যে সৌন্দর্যের কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্যরকম হত; হয়তো তাতে শ্রেয়স্তত্ত্বের উচ্চস্বর লাগত। কিন্তু রসিক লোকে কাব্যের বিচার ক'রে করে না। উর্বশী উর্বশীই, তাকে যদি নীতি-উপদেশের খাতিরে লক্ষ্মী করে গড়তুম তা হলে ধিক্কারের যোগ্য হতুম।"

'বিজয়িনী' কবিতাতে কবি চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যের মর্মকথাকে নব রূপ দান করিয়াছেন। সৌন্দর্যকে পুষ্ট করে আবেষ্টনী—স্থান, কাল ও পাত্রের সমন্বয়। বসন্তকালের সমস্ত শোভা ও মায়ার মধ্যে, নির্জন সরোবর-তীরে, অপূর্ব রূপযৌবনসম্পন্না এক নারী স্নান-লীলা-রসে মগ্ন। সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি এই স্থানে—প্রেমের অভিনব আবির্ভাবের উপযুক্ত ক্ষেত্র এই। তাই কামনার দেবতা মদন এই নারী-হৃদয়ে বাসনার উদ্রেক করিবার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল। কিন্তু মদনের পুষ্পশরে নারী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না; মদন নতজানু হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। নারী হইল বিজয়িনী—মদন পরাজিত।

বহির্জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শে বহুবিচ্ছুরিত, চঞ্চল ও বিচিত্ররূপিণী হইলেও বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের প্রাণস্বরূপিণী চিরন্তন সৌন্দর্যময়ীকে কবি নিজের অন্তরে পরিপূর্ণা ও অচপলরূপিণীরূপে পূজা করিয়াছেন 'চিত্রা' কবিতায়। সেই বিশ্ব-সৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্তব পাঠ করিয়াছেন স্বর্গের অপ্সরা চিরপ্রণয়িনী উর্বশীকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া 'উর্বশী'তে। আর সেই পরিপূর্ণা শাশ্বত-সৌন্দর্যদেবীর প্রভাব ও শক্তির অপরাজেয়তার ইঙ্গিত করিয়াছেন 'বিজয়িনী' কবিতায়। নিখিল বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের প্রাণস্বরূপিণী এই বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মী—এই পরিপূর্ণা সৌন্দর্যদেবী মানবের কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে, ভোগের অতীত, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি পরিপূর্ণ সত্তা। মদন ভোগময় প্রেমের দেবতা; নর-নারী, দেব-দেবীর হৃদয়ে কামনা ও ভোগস্পৃহা জাগানোই তাহার কাজ, কিন্তু সমস্ত কামনা-বাসনার অতীত, পরিপূর্ণা সৌন্দর্যদেবীর সম্মুখে মদন নূতন সত্যের সন্ধান পাইল—তাহার প্রথম ব্যর্থতা উপলব্ধি করিল। দেবীর চরণে তাহার কামনা-বাসনার প্রতীক পুষ্পশর উপহার দিয়া চরণবন্দনা করিল। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের নিকট সমস্ত কামনা-বাসনা অন্তর্হিত হয়, পূজার আবেগে চিত্ত উদ্বেল হয়, ও ভক্তির নির্মল শান্তরসে হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়।

রবীন্দ্রনাথ নারীদেহের সৌন্দর্যকে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। তাঁহার 'মানস-সুন্দরী'কে তিনি নারীরূপে দেখিতে চাহিয়াছেন, বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মী অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীরূপে তাঁহাকে নিরুদ্দেশের পথে কোথায় লইয়া চলিয়াছে, নিখিল সৌন্দর্যের আদি ভাবকে তিনি 'বিচিত্ররূপিণী' বলিয়া 'অন্তরবাসিনী' করিয়া লইয়াছেন, অনন্তযৌবনা নারী উর্বশীকে তিনি বস্তু-নিরপেক্ষ বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 'বিজয়িনী'তে সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে তিনি অপূর্ব রূপযৌবনসম্পন্না, লীলাময়ী নারীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালেও অনেক কবিতায় বিশ্বসৌন্দর্যকে তিনি অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী নারী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

নারীদেহে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ, তাহা উপভোগের জন্য পুরুষের প্রাণে কামনার বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু সেই দৈহিক সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত যে চিরন্তন, নিত্য সৌন্দর্য আছে, যে অপার্থিব রূপ আছে, তাহার আভাস একবার পাইলে সমস্ত কামনা-বাসনা, সমস্ত ভোগস্পৃহা শান্ত হইয়া যায় ও সেই শাশ্বত সৌন্দর্য—সেই পবিত্র, স্বর্গীয় রূপকে পূজা করিবার জন্য চিত্তে আকুল আগ্রহ উপস্থিত হয়। এই অপার্থিব সৌন্দর্যময়ী মূর্তিই নারীর চিরন্তন কল্যাণী মূর্তি, দেবীমূর্তি। ইহারই

নিকট হইল মদনের পরাজয়। এই মূর্তির সন্ধান যখন সে পাইল—তখন আর তাহার পুষ্পশর নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা রহিল না—তখন

থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকালতরে। পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি।

তারপর,

নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রশান্ত বয়ানে॥

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন,

" 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী' যে দুইটি কবিতা চিত্রায় আছে, তাহার মধ্যে সৌন্দর্যকে সমস্ত মানবাসক্তির বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার বিশুদ্ধতায়, অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব আছে।"

'আবেদন' কবিতায় কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সমস্ত লৌকিক প্রয়োজনের বাহিরে শুধু সেবার আনন্দেই পরিপূর্ণভাবে সেবা করিতে চাহেন। বিশ্বসৌন্দর্যের সহিত কবির সম্বন্ধ এই কবিতায় রূপক আকারে ব্যক্ত হইয়াছে। কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর দাস। সমগ্র জীবনব্যাপী তাহার একমাত্র সাধনা—তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সেবা। বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মী মহামাহময়ী মহারানী—রূপ-যৌবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ। আর কবি তাঁহার দীন ভৃত্য। দেবীর বহু ভৃত্য আছে, তাহারা কাজের খাতিরে, স্বার্থের প্রেরণায়, এই দেবীকে সেবা করে, কিন্তু কবির কাজ এই বিশ্বের অফুরন্ত সৌন্দর্য-সম্ভার লইয়া মালা রচনা করা—কবিতায় এই অনবদ্য রূপ-সুষমাকে ব্যক্ত করিয়া এই দেবীকেই পূজা করা। লৌকিক প্রয়োজনের দিক হইতে ইহার কোনো মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু কবির নিকট ইহা অর্থপূর্ণ; কারণ তাঁহার কাজই তো,

অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন।

আর এ কাজের পুরস্কার শুধু সেবার আনন্দ,—

প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি কমলের পাতে

আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
... ...
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল, চরণ-অঙ্গুলি প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু—চুম্বিয়া মুছিয়া লব
এই পুরস্কার।

রাজরাজেশ্বরী ভক্তভৃত্যের আবেদন মঞ্জুর করিলেন,—

ভৃত্য, আবেদন তব
করিনু গ্রহণ। আছে মোর বহু মন্ত্রী,
বহু সৈন্য, বহু সেনাপতি —বহু যন্ত্রী
কর্মযন্ত্রে রত,—তুই থাক চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন, কর্মহীন।
রাজসভাবহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর—
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।

'জ্যোৎস্না রাত্রে' কবিতায় কবি জ্যোৎস্না-হসিত রজনীর অন্তরালবর্তিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। পূর্ণিমা রাত্রিতে চরাচর প্লাবিত করিয়া জ্যোৎস্নার বান বহিয়া যায়। এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি অপার রহস্যময়ী। অনন্ত আকাশের দূর অন্তরালে তাহার সৌন্দর্যসভা ও আনন্দ-সম্ভোগের আয়োজন। মর্ত্যের কবি উদ্‌ভ্রান্ত বাসনায় কাতর, উৎকণ্ঠিত। তিনি জ্যোৎস্নারাত্রিতে তাহার দিব্য মূর্তিতে, তরুণী লক্ষ্মীর মতো তাঁহার হৃদয়ের তীরে, আঁখির সম্মুখে আহ্বান করিতেছেন। সে আসিয়া কবির সমস্ত চঞ্চলতা, গ্লানি ও আবিলতাকে দূর করিয়া দিবে, অপার আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া অমরত্বের আস্বাদন দিবে। জ্যোৎস্নারাত্রি এক অসীম সৌন্দর্যময়ীর অভিব্যক্তি—তাহারই অঙ্গদ্যুতি। কবি জ্যোৎস্নারাশির সৌন্দর্যসভায় যাইয়া সেই বিশ্বসোহাগিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী নারীকে বরণমাল্যে অভিনন্দিত করিতে চাহেন। জ্যোৎস্নারাত্রির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া কবি সে সৌন্দর্যের আদি কারণ চিরন্তন সৌন্দর্যময়ীকে সন্ধান করিতে উৎসুক,—

খোলো দ্বার, খোলো দ্বার।
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্যসভায়। নন্দনবনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি,—সেথায় বিরাজে

একটি কুসুমশয্যা রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা :
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।

'পূর্ণিমা' কবিতায় কবি অনুভব করিতেছেন যে, সংসার অনেক সময় সৌন্দর্যকে আড়াল করিয়া রাখে। সংসারের কর্মপ্রবাহ, দ্বন্দ্ব, আবিলতা আমাদিগকে এমন করিয়া ঘিরিয়া রাখে যে, ইহাদের বাহিরে যে অসীম সৌন্দর্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহার কোনো সন্ধানই আমরা পাই না। এই সংসারের আবরণ হঠাৎ ভাঙিয়া গেলে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সন্ধান পাই। বাহিরের কোলাহল সেই সৌন্দর্যময়ীর নীরব বাণী ডুবাইয়া দেয়, তাহার সুধাহাসির জ্যোতিকে আবৃত করে।

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইয়াছিল,—

"সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরিজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা, সৌন্দর্য, আর্ট প্রভৃতি মাথামুণ্ড নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল।...এদিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ্ ক'রে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশ্যে এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিলুম। দেবামাত্রই হঠাৎ চারিদিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার চমক ভেঙে গেল। আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরব হাসি হাসছিল, অথচ সেই ক্ষুদ্র বিদ্রূপহাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল। নীরস গ্রন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কী খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। সে কতক্ষণ থেকে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নিঃশব্দে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।"

[ছিন্নপত্র, শিলাইদা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫]

"পূর্ণিমা কবিতাটা সত্যঘটনামূলক। একদিন বোটে বসিয়া বাতি জ্বালাইয়া সন্ধ্যাবেলা ডাউডেন সাহেবের সমালোচনা পড়িতে পড়িতে রাত অনেক হইল এবং হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল—অবশেষে দিক্ হইয়া বইটা ধপ্ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম অমনি চারিদিকের মুক্ত জানালা দিয়া একমুহূর্তে অনন্ত আকাশ-ভরা পূর্ণিমা আমার বোট পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দে উচ্চহাস্যে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। যখন সমস্ত আকাশে সৌন্দর্য আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তখন বাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাউডেনের পুঁথি হইতে সৌন্দর্যতত্ত্ব খুঁটিয়া খুঁটিয়া উদ্ধার করার দুশ্চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যজনক—পৃথিবীর প্রান্তে একটা বোটের ভিতরে একটি ক্ষুদ্র মানবের এই অদ্ভুত আচরণে অনন্ত আকাশ হইতে এতবড়ো একটা সুমিষ্ট পরিহাস অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে আমার পৃষ্ঠে আসিয়া সস্নেহ আঘাত করিল, ইহাতে আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। চন্দ্রলোক হইতে পৃথ্বীলোক পর্যন্ত কতখানি জোৎস্না, অথচ টেবিলের উপরে একটি বাতির শিখা সমস্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল—অনন্ত নক্ষত্রলোক হইতে এই নিস্তরঙ্গ নদীতল পর্যন্ত কী পরিপূর্ণ অসীম নিঃশব্দতা, অথচ কানের কাছে ডাউডেন সাহেবের এই অকিঞ্চিৎকর বিতর্কে অন্তহীন আকাশের বিশ্বস্তব্ধ নীরবতা একেবারে অগোচর হইয়া

গিয়াছিল। সেই পূর্ণিমা-সন্ধ্যার এই মহৎ ঘটনাটি প্রথমে একটুখানি সাজাইয়া লিখিয়াছিলাম, তাহাতে মূল কথাটা মাটি হইয়াছিল—তাহার পর, বই ছাপাইবার সময় যথাযথ যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই লিখিয়া দিলাম,-এখন কেহ বুঝুন বা না-বুঝুন আমার দায় কাটিয়া গেল।" [ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত, ৬ই চৈত্র, ১৩০২]

'দিনশেষে' কবিতায় দেখি, কবি সংসার ছাড়িয়া চিরসুন্দরের রাজ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। বিশ্ববিলাসিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর চিরতারুণ্যময়ী মূর্তি কবির নিকট আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয় মাত্র। সেই তরুণীর নব নব ভঙ্গী, নব নব রূপসজ্জা কবির মনকে মুগ্ধ করে; তিনি তাহার সম্যক পরিচয় পাইতে চাহেন, কিন্তু সে সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে জুটে না। যে আবেষ্টনীর মধ্যে এই তরুণীর রূপের স্ফুরণ কবিচিত্তকে স্পর্শ করে, কবির নিকট তাহা পরমরমণীয়—সৌন্দর্য ও মাধুর্যের নন্দন-কানন। কবি সমস্ত সাংসারিক কর্মপ্রচেষ্টা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় আর না দুলিয়া, চিরজীবনের মতো সেই স্থানেই বাসা বাঁধিতে চাহেন—সংসার ছাড়িয়া চিরসুন্দরের রাজ্যে বাস করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহার বাসনা—

যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই,
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি—
যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি নত-আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী॥

(খ) 'চিত্রা'র দ্বিতীয় ধারার কবিতায় দেখি, কবি অখণ্ড বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্য-পূজায় আর যেন তৃপ্তি পাইতেছেন না—ব্যক্তিনিরপেক্ষ অবিচ্ছিন্ন আদর্শলোকের প্রেমও তাঁহার তৃষ্ণা মিটাইতেছে না। তাঁহার মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে। এই অখণ্ড বিশ্ব-সৌন্দর্যকে তিনি আবার খণ্ড রূপ ও রসে অনুভব করিতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে বহুবার বলা হইয়াছে। তাঁহার কাব্যের সসীম ও অসীম, বাস্তব ও আদর্শ, ভাব ও রূপ, স্বর্গ ও মর্ত্যের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভার ইহাই স্বরূপ। যতই তিনি আদর্শলোকে উঠিয়া অতি বৃহৎ ভাব ও চিন্তার পক্ষ বিস্তার করিয়া উড্ডীন হন না কেন, অতি সূক্ষ্ম অথচ কঠিন লৌহতারে ধরণীর দুর্বল মানবের সহিত তাঁহার পা বাঁধা আছে; দেবীকে পূজা করিতে গিয়া তিনি মানবীকে ভুলেন নাই। মানবীর মধ্যেই তিনি দেবীকে দেখিয়াছেন। ইহাই খণ্ড-অখণ্ডের লীলা—ভাব-রূপের অবিরাম

আবর্তন। এই অনুভূতিই কবি-প্রতিভার মূল উৎস। ইহাই তাঁহার অসাধারণ রোমাণ্টিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

Abstract ও Absolute সৌন্দর্যের স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া কবি মানবী প্রিয়ার মর্ত্যে অবতরণ করিতেছেন—তাহারই কথা বলা হইয়াছে 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায়। এই ধারার সমস্ত কবিতাতেই কবি মানবী প্রিয়ার সৌন্দর্য ও প্রেমের জয়গান করিয়াছেন।

স্বর্গে চির-আনন্দ, চিরসুখ ও চির-শান্তি বিরাজিত। সেখানে দুঃখশোক নাই, বেদনা নাই, হতাশার চিত্ত-গ্লানি নাই। সেখানে বৈচিত্র্যহীন, হ্রাসবৃদ্ধিহীন সুখভোগের অফুরন্ত আয়োজন। কিন্তু কবি বলেন, মর্ত্যের মানবের নিকট স্বর্গসুখের কোনো সার্থকতা নাই। যেখানে দুঃখ নাই, সুখ সেখানে প্রকৃত আনন্দ দিতে পারে না। দুঃখ আছে বলিয়াই আমরা সুখের বৈশিষ্ট্য, সুখের মাধুর্যকে উপলব্ধি করি। পৃথিবীতে দুঃখের সহিত সুখ বিজড়িত আছে বলিয়াই সুখের এত মূল্য। যেমন অন্ধকার ছাড়া আলোর কোনো অর্থ হয় না, দুঃখ ছাড়াও সুখের কোনো অর্থ হয় না। স্বর্গে দুঃখ না থাকায়, কোনো সান্ত্বনা বা সমবেদনা নাই। স্বর্গ তাহার কোনো অধিবাসীকে বিদায় দিতে বিন্দুমাত্র বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করে না। সে হৃদয়হীন, প্রেমহীন। কিন্তু মানবের মাতৃভূমি -এই মর্ত্যভূমি তাহার যে কোন অধিবাসীকে বিদায় দিতে ব্যথা অনুভব করে,—

তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তাকে ছেড়ে দেয় দুদণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমলবক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর।

বিচ্ছেদের বেদনা না থাকিলে প্রেমের কোনোই মাধুর্য নাই। স্বর্গের অপ্সরা কোনোদিন প্রেমের বেদনা অনুভব করে না, কেবল মানবের বুকে প্রেমহীন লালসার অগ্নি প্রজ্বালিত করে। কিন্তু এই ধরণীর নারী তাহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেমের অর্ঘ্য দিয়া তাহার প্রেমাস্পদকে বরণ করিয়া লয়, তাহার জন্য অকাতরে সমস্ত দুঃখ-গ্লানি সহ্য করে, তাহার মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট বর প্রার্থনা করে।

ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে

কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থচ্ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চিত ভালে রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরীসংগীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র-শিয়রে।

কবি মনে করেন, বৈচিত্র্যহীন হৃদয়হীন, স্থিতিশীল স্বর্গ অপেক্ষা সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-ভরা, এই গতিশীল বৈচিত্র্যময়ী ধরণী অধিকতর কাম্য। স্বর্গ অচেনা, অজানা, সমবেদনাহীন ও প্রবাসতুল্য, আর এই পৃথিবী আমাদের চিরদিনকার, আমাদের স্নেহময় মাতৃক্রোড়। শত দুর্বলতাময় হইলেও এই ধরণীকে কবি প্রাণ দিয়া ভালোবাসেন—ইহারই বক্ষ আঁকড়িয়া ধরিতে চাহেন।

এই মৃত্তিকার পৃথিবীকে ভালোবাসার কথা কবি অনেক কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। 'চিত্রা'র অনেক পরবর্তী যুগের কবিতাটিতেও এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কবির এই মনোভাব তাঁহার ছিন্নপত্রের অনেক স্থলে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে।

'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রেমের অপরিসীম শক্তি এবং অসাধারণ গৌরব ও মহিমার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রেম নিতান্ত হীন ও নগণ্য ব্যক্তিকেও অসামান্য গৌরব দান করে। মানুষ সমাজে পতিত ও লাঞ্ছিত হইতে পারে, কর্মস্থলে উৎপীড়িত হইতে পারে, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হইতে পারে, কুৎসিত কদাকার হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রিয়পাত্রীর নিকট সে পরম গৌরবে গৌরবান্বিত। প্রেমিকা তাহার দৈন্য, লজ্জা, ক্ষুদ্রতা, অক্ষমতা ঢাকিয়া

তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসিয়া, আদর করিয়া, সম্মান দিয়া জগতের মধ্যে তাহাকে রাজরাজেশ্বরের আসনে অভিষেক করে। প্রেমে সে অতি ক্ষুদ্র হইলেও অতিবৃহৎ হইয়া যায়, নিতান্ত সামান্য হইলেও অসামান্যতা লাভ করে। সংসারের লোকের কাছে সে শতবার উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত হইলেও, প্রিয়ার হৃদয়-সিংহাসনে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজাধিরাজ। প্রেমিক প্রেমিকা তাহাদের প্রেমলীলার মধ্যে জগতের সর্বযুগের, সর্বকালের ইতিহাস-পুরাণের প্রণয়ী-প্রণয়িনীর প্রেমলীলা উপলব্ধি করে। প্রেমিকা মানুষকে তাহার মধুর স্পর্শ, সুধাময় বাণী, আঁখির স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়া তাহার দেহমন, অন্তর-বাহির পরিপূর্ণ করিয়া রাখে—স্বর্গবাসী দেবতার অমরত্ব তাহাকে দান করে।

এই কবিতাটি যখন প্রথম 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন কবিতার সমস্ত উক্তিটি আপিসের সাহেব-লাঞ্ছিত এক দরিদ্র কেরানীর মুখের উক্তি বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরে 'চিত্রা' পুস্তকে কেরানীর কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়।

'সান্ত্বনা' কবিতায় কবির বক্তব্য এই যে, প্রেমিকা প্রেমাস্পদের জন্য যে-কোনো স্বার্থত্যাগ করিতে পারে। প্রেমিকা প্রেমিকের অপেক্ষায় তাহার নিভৃত, নির্জন গৃহকোণে মিলন-শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইবার আশায় বসিয়া ছিল। আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই রাত্রি সে নিবিড় মিলনানন্দে যাপন করিবে। কিন্তু প্রেমিক যখন আসিল, তখন সে কোনো কারণে গভীর মর্মাহত, দুঃখে অশান্ত ও অশ্রুভারে আপ্লুতনয়ন। প্রেমিকা তখন তাহার মিলন-রজনীর সমস্ত সুখ আশা ভুলিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া, তাহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিল। সে স্থির করিল, প্রেমাস্পদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিবে না, তাহাতে হয়তো তাহার দুঃখ আবার নূতন হইতে পারে, হয়তো বা লজ্জা বা আত্মগ্লানিতে সে আরো মর্মপীড় অনুভব করিতে পারে, কেবল সে প্রেমের নীরব সহানুভূতিতে, মমতার বাক্যহীন অভিব্যক্তিতে তাহার দুঃখ দূর করিবে। তাহার মিলন-রজনী, তাহার বাসরশয্যা যদি ব্যর্থ হয় হোক্—তাহাতে তাহার কোন দুঃখ নাই, যদি তাহার প্রেমিকের আহত চিত্তের বেদনার কিছু উপশম হয়, তবেই সে পরম আনন্দ ও চরম সার্থকতা লাভ করিবে।

নারীর প্রেমের সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত আছে, প্রণয়িনীর মধ্যে জগদ্ধাত্রীরূপা জননী আছে—রবীন্দ্রনাথ এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায়। নারীর এই কল্যাণী মূর্তি চিরদিনই কবিকে আকর্ষণ করিয়াছে। নারী যেমন ভোগের সামগ্রী, রূপ-যৌবনের ইন্ধনে সারা বিশ্বের কামনার অগ্নিপ্রজ্বালনকারী মহাশক্তি, সেইরূপ সে সারা বিশ্বের চিরকল্যাণেরও প্রস্রবণ;—সেবায়, শুভকামনায়,

মঙ্গলচিন্তায় মাতৃহৃদয়ের স্নেহধারায় সে স্বর্গের দেবী—পরম শ্রদ্ধার পাত্রী, মানবের পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাইবার যোগ্যা।

রাত্রে নারীর প্রেয়সী মূর্তি ও প্রাতে মঙ্গলময়ী দেবীমূর্তি কবির তুলিকায় অপূর্ব সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—কবির প্রাণের অসীম-শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছে নারী,—

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী—
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে।

নারীর মধ্যে এই ভাবের বিকাশকে কবি অন্যত্র লক্ষ্য করিয়াছেন,—

একজনা—উর্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা—লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।
(দুই নারী ; বলাকা)

(গ) 'চিত্রা'র জীবনদেবতামূলক কবিতাগুচ্ছের আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের একটা অনন্যসাধারণ ও স্বতন্ত্র রূপের সম্মুখীন হই। সমগ্র সাহিত্য-প্রচেষ্টার মূল শক্তি-উৎস রূপে, সমস্ত ভাব, চিন্তা ও কর্মের নিয়ামকরূপে, জন্মজন্মান্তর, রূপ-রূপান্তরের পরিচালকরূপে, জীবনদেবতার এই বিচিত্র রহস্যময় অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব ; পৃথিবীর অন্য কোনো কবির মধ্যে এই বিশিষ্ট প্রকারের অনুভূতি, ও কাব্যে এইরূপ সুস্পষ্ট প্রকাশ বোধহয় আর দেখা যায় নাই।

কবির কবিত্ব-শক্তি যে অলৌকিক অনুপ্রেরণার ফল, একথা হয়তো অনেকেই বলিয়াছেন। কিন্তু একটি বৃহত্তর সত্তা যে সুখ-দুঃখ, ভাব-চিন্তা, কর্ম, সমস্ত কাব্য-প্রচেষ্টা, ইহকাল, পরকাল, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া জীবন-চেতনাকে পরিচালনা করিতেছে, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি কোনো দেশের কোনো কবির দ্বারা কাব্যাকারে গ্রথিত হয় নাই—বা কোনো কবি-প্রতিভাকে অনুপ্রেরণা জোগায় নাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে কবিদের দু'একটি অলৌকিক

অনুপ্রেরণার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। 'রামায়ণ'-রচয়িতা কবি কৃত্তিবাস রাজসভায় গিয়া বলিয়াছেন,

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে।

তারপর, স্বপ্নে কোনো দেবতা আসিয়া কবিকে সেই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কাব্যরচনা করিতে আদেশ দিয়াছেন ও কবিত্বশক্তি দান করিয়াছেন—এরূপ করা আমরা বাংলার মঙ্গল-কাব্যগুলিতে অনেক পাই। কিন্তু এই অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইহা নিতান্ত সাধারণ, সাময়িক কাব্যপ্রচেষ্টার উৎসাহ বা কবিত্বশক্তির স্ফুরণের সহায়ক মাত্র। ইহা কবির জীবনের মূলদেশ হইতে উত্থিত একটা প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা নয়, জীবন-মরণ, জন্মজন্মান্তরব্যাপী কোনো শক্তিব লীলারহস্য নয়। ববীন্দ্রনাথের এই অনুভূতির সঙ্গে কৃত্তিবাস ও অন্যান্য কবিদেব অনুভূতির আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বিশ্ব-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাব অনুভূতি অভিনব ও অদ্বিতীয়।

রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদেবতাবাদ লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। সমালোচকদের মধ্যে অনেক সময়ে মতের ঐক্য হয় নাই। কবি স্বয়ং একাধিকবার ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবি-কথিত এই ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা বা অলৌকিক শক্তির দাবীকে আত্মপ্রশংসাব ছদ্মবেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়া কলহে মাতিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোনো সর্বসম্মতসিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয় নাই। অবশ্য কাব্যেব উপভোগ ব্যক্তিগত, সুতরাং বিভিন্ন অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গী লইযা দেখার ফলে সমালোচকদের উপলব্ধির মধ্যে অনৈক্য থাকা অস্বাভাবিক নয। কিন্তু ববীন্দ্রসাহিত্যেব সাধাবণ পাঠকের কাছে জীবনদেবতার বহস্য-আবরণ এখনো সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

জীবনদেবতার স্বরূপ আলোচনা করিবার পূর্বে, কবির সহিত জীবনদেবতার কি সম্বন্ধ, তাঁহার উপর জীবনদেবতার কি প্রভাব ও জীবনদেবতাব প্রতি কবির মনোভাব বিবেচনা করা আবশ্যক। অবশ্য কবির জীবনদেবতাভাবমূলক কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে এ বিষয়ে সমস্তই জানা যায় এবং উহার উপরেই আমাদের নির্ভর করা সমীচীন।

'অন্তর্যামী' কবিতাতেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে নিজের জীবনে এই মহাশক্তির লীলার কথা প্রকাশ করেন। কবির অন্তরবাসিনী মহাশক্তি কবিকে লইয়া এক অপূর্ব কৌতুক করিতেছেন। কবি যখন তাঁহার সাহিত্য-রচনা করেন,

তখন মনে করেন, তিনিই তাঁহার রচিত সাহিত্যের স্রষ্টা, রচনায় তাঁহারই ব্যক্তিগত ভাব-চিন্তা-অনুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু পরে দেখেন, তাঁহার লেখার মধ্যে এমন একটা সুর ধ্বনিত হইতেছে, যাহা তাঁহার আত্মগত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের হইয়া পড়িয়াছে, সাময়িককে, ক্ষণিককে ছাড়াইয়া চিরন্তনের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। কবির কাব্য-রচনায় তাঁহার কোনো আত্মকর্তৃত্ব নাই। তাই তাঁহার কবি-চিত্তের নিয়ামক অন্তর্যামীকে বলিতেছেন,—

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত ;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

তাঁহার কাব্যের প্রকৃত অর্থ—যথার্থ তাৎপর্য কবি নিজেই জানেন না, বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন অর্থ বাহির করিয়া কোনো মীমাংসায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া অবশেষে কবির নিকট তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করে। কবিও কোনো সন্তোষজনক অর্থ করিতে পারেন না। কবির এই অক্ষমতায় তাঁহার অন্তর্যামী জীবনদেবতা হাসেন, কারণ কবির কাব্যের প্রকৃত অর্থ এক অন্তর্যামী ছাড়া কবিও নিজে জানেন না।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার,—
দেখে তুমি হাস বুঝি।

কবির ব্যক্তিগত জীবনও এই অন্তর্যামী জীবনদেবতার অসীম প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। সংসারে সাধারণ মানুষ যেমন জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, কবিও সেইরূপই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর্যামী তাঁহাকে অ-সাধারণ ও অসামান্য পথে চালিত করিয়াছেন। এই নূতন পথে কবি ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া

লোকসমাজ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ক্ষ্যাপার মত জীবন-যাপন করিতেছেন। তাঁহার পথে শত শত বাধা-বিঘ্ন, দুঃখ-শোক বর্তমান বটে, কিন্তু জীবনের পরিপূর্ণতার বাণী, সার্থকতার আহ্বান তিনি পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার হৃদয় অননুভূতপূর্ব আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে ও মৃত্যুকেও মধুময়, অমৃতময় বোধ হইয়াছে। কবি তাঁহার জীবনধারার পরিচালক, পরমপ্রিয় অন্তর্যামীকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন।

কে তুমি গোপনে চালাচ্ছ মোরে,
আমি যে তোমারে খুঁজি।
... ...
রাখ কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি!

অন্তর্যামী জীবনদেবতা কবিকে গভীর দুঃখ দিয়া তাঁহার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে পৃথিবীতে প্রকাশ করিতে চাহেন। কবির হৃদয় পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবার জন্য আকুল আগ্রহান্বিত; এই অপ্রাপ্ত ও অনায়ত্ত আদর্শকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের বেদনায় তাঁহার হৃদয় কাতর। তাঁহার হৃদয়-বেদনার মধ্যে তিনি বিশ্বের বেদনা অনুভব করিতেছেন—বিশ্বজনীন সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। কবির মধ্য দিয়াই জীবনদেবতা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন—কবির প্রেমের মধ্যে চিরন্তন, বিশ্বজনীন প্রেমের ঝংকার বাজিতেছে আর নব নব সৃষ্টির আগ্রহের বেদনায় তাঁহার চিত্ত প্রজ্বলিত হইতেছে।

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে।
নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান,
যেন সচেতন বহ্নিসমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে।

কবি বলিতেছেন, মৃত্যুর পরেই কি তিনি জীবনদেবতা অন্তর্যামীর অভিপ্রা[য়] বুঝিতে পারিবেন—বুঝিবেন কেন তিনি কবির প্রাণে নবসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার আগু[ন] জ্বালাইয়াছিলেন, আর কেনই বা তাঁহাকে এই সাধারণ জগতে অ-সাধারণ করি[য়া]

সৃষ্টি করিলেন। যে নবসৃষ্টির তীব্র আকাঙ্ক্ষানল কবির চিত্তে জ্বলিতেছে, সেই আগুন জ্বালাইয়া কবি জীবনদেবতার হোম করিতেছেন; মৃত্যুর পরে আশা করেন, সেই জীবন-পোড়ানো আগুন হইতে নবতর সম্ভাবনা ও সার্থকতা লাভ করিবেন—সারা জীবনের সাধনার সফলতা ও পুরস্কার তাঁহার লাভ হইবে।

জীবনদেবতাব সহিত মিলনে কবির প্রাণে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা জাগিয়াছে। এই বেদনার মধ্যেই কবির দুঃসহ আনন্দ। কবির প্রাণে সৃষ্টির আনন্দ-বেদনা জাগানোই জীবনদেবতার বৈশিষ্ট্য। নব সৃষ্টির মধ্যেই কবির সার্থকতা। সৃষ্টির অনুপ্রেরণা আসিতেছে জীবনদেবতার স্পর্শে, সুতরাং জীবনদেবতাই কবির সমস্ত সৃষ্টির মূলে। তাই অন্তর্যামী জীবনদেবতাকে কবি সম্বোধন করিতেছেন,—

চিরদিবসের মর্মের ব্যথা,
শতজনমের চিরসফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,

কবি এই নব-জন্মের পরে জীবনদেবতার সহিত কোনো সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন না এবং উভয়ে পার্থিব, প্রাকৃতিক আবর্তন-পরিবর্তনের বাহিরে চির-জ্যোতির্মণ্ডলে মিলিত হইতে চাহেন। অন্তর্যামী জীবনদেবতা তখন কবিকে আবার নূতন রূপে, বিচিত্র ভঙ্গীতে, নবতর সম্ভাবনীয়তার মধ্যে গঠন করিবেন।

কবি তখন অপূর্ব আনন্দে মুগ্ধ হইবেন, জীবনের সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ রসানুভূতিতে নয়নে আনন্দাশ্রু দেখা দিবে। জীবনদেবতার স্পর্শ কবির সমস্ত রসানুভূতির উৎস। কবি তখন তাঁহার সৃষ্টিতে একেবারে তন্ময় হইয়া থাকিবেন—সৃষ্টির উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তাঁহার থাকিবে না, কেবল আত্ম-ভোলা হইয়া চলিবে তাঁহার সৃষ্টি-সাধনা। কবি যে সৃষ্টি করিবেন—তাহার মধ্যে হইবে জীবনদেবতার আত্মপ্রকাশ। তাঁহার ব্যক্তিগত কবি-সৃষ্টির কোনো তাৎপর্য না থাকিলেও, উহা তাঁহার অন্তর্যামী জীবনদেবতার অভিব্যক্তি বলিয়া উহার অর্থ, উহার তাৎপর্য হইবে গভীর ও পূর্ণ। কবির কাব্যে জীবনদেবতা নিজেকে উপলব্ধি করিবেন। তাই কবির কাব্য-সৃষ্টির মধ্যেই জীবনদেবতার সহিত তাঁহার চির-মিলন হইবে—অন্য কোথাও নয়।

নাহিকো অর্থ, নাহিকো তত্ত্ব,
নাহিকো মিথ্যা, নাহিকো সত্য,
আপনার মাঝে আপনি মত্ত—
দেখিয়া হাসিবে বুঝি।

আমি হতে তুমি বাহিরে আসিবে,
ফিরিতে হবে না খুঁজি ॥

কবি জন্মে জন্মে জীবনের মধ্যে জীবনদেবতার লীলা দেখিতে চাহেন। জীবন-দেবতার লীলা অর্থে কবির প্রাণে নব নব সৃষ্টি-প্রেরণার উপলব্ধি। এক জীবনের একপ্রকার সৃষ্টিতেই কবি সন্তুষ্ট নহেন—তিনি আরো পাইতে চাহেন, আরো বৃহত্তর ও মহত্তর সৃজনলীলা দেখিতে চাহেন—আরো নব নব রূপ ও ভাবের অভিব্যক্তিতে জীবনদেবতা তাঁহার জীবন পূর্ণ করুন, ইহাই প্রার্থনা করেন,—

তবে তাই হোক, দেবি, অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ,
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
নব নব রূপে ওগো রূপময়,
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে ওগো নির্দয়
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।

কবি এজন্মে নবতম, বৃহত্তম ও সুন্দরতম রূপ ও ভাবসৃষ্টির জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষায় পুড়িয়া মরিতেছেন, পরজন্মেও তিনি নূতন সৃষ্টির বেদনার মধ্যে তাঁহার অন্তরে জীবনদেবতাকে উপলব্ধি করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন,

এবারের মতো পুরিয়া পরান
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান,—
সে-সুরা তরল অগ্নিসমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি।

এই সৃষ্টির বেদনার মাঝে কবির অসীম আনন্দ, পরম সার্থকতা ও চরম সফলতা।

কবির ব্যক্তিজীবনের মধ্যে জীবনদেবতার যে লীলা চলিয়াছে, সেই লীলায় ব্যক্তিজীবনের শত সংকীর্ণতা, অসম্পূর্ণতা, স্খলন-পতন-ত্রুটি কিভাবে দূর করিয়া জীবনদেবতা উহাকে পরিপূর্ণ বিশ্বজীবনের প্রতীক বানাইয়া লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই গোপন ইতিহাস কবির প্রশ্নে ব্যক্ত হইয়াছে, 'জীবনদেবতা' কবিতায়। এই কবিতায় কবির অন্তর-জীবনের পরিচালককে কবি পুরুষরূপে সম্বোধন করিয়াছেন। কবির অন্তর-জীবনের মধ্যে এই মহাশক্তির যে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা নব নব রূপসৌন্দর্য ও ভাবমাধুর্যের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল—

অপূর্ব সংগীত ও কাব্যে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এই মহাশক্তিকেই কবি বিশ্বজীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রাণ বলিয়া অনুভব করায় অসীম রহস্যময়ী নারী-মূর্তিতে উহা কবির হৃদয় ও কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাই কখনো বা অনন্ত মাধুর্যময়ী প্রেয়সীরূপে, কখনো বা দেবীরূপে এই মহাশক্তিকে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই একটিমাত্র কবিতায় কবি জীবনদেবতাকে পুরুষরূপে অনুভব করিয়াছেন। হয়তো এই শক্তির নিকট ক্রমেই কবি পূর্ণ আত্মবিসর্জন করায় ও এই শক্তির মাধুর্যরূপ অপসারিত হইয়া ঐশ্বর্যরূপই বেশি প্রকটিত হওয়ায় কবির অনুভূতি ও কল্পনায় উহা পুরুষের রূপ ধারণ করিয়াছে। এবার কবির জীবনই মহাশক্তির প্রেয়সী।

কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার সমস্ত হৃদয় দলিত মথিত করিয়া অনিবার্য বেদনার মধ্যে যে নব নব সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা জীবনদেবতাকে তিনি অর্ঘ্যরূপে উপহার দিয়াছেন। কবির জীবনের সঙ্গে জীবনদেবতার যে মিলন, সেই মিলনের লীলামাধুর্যই অভিনব ছন্দ ও সুরে কবির কাব্যরূপে রূপায়িত হইয়াছে, এবং এই বিচিত্র কাব্য—এই বিভিন্নমুখী নব নব সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে জীবনদেবতার নূতন নূতন লীলার খেয়ালে। কবির ক্ষুদ্র ব্যক্তি-জীবনকে অবলম্বন করিয়া জীবনদেবতা যে বৃহত্তর সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হইয়াছে, ইহাই কবির জিজ্ঞাস্য।

কবির জীবনে জীবনদেবতার আবির্ভাব অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতরূপে হইয়াছে। তাঁহার জীবনকে জীবনদেবতা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই অবলম্বন করিয়াছেন। জীবনদেবতার উদ্দেশ্য কবির নিকট অপরিজ্ঞাত। কবির ক্ষুদ্র জীবনের নিরালা হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জীবনদেবতার সিংহাসন। এখানে আর কেহ নাই, কেবল কবির হৃদয়ের অধীশ্বর রূপে জীবনদেবতা একাকী বিরাজ করিতেছেন। কবির সমস্ত কর্মের একমাত্র দ্রষ্টা এই জীবনদেবতা; ভাব, অনুভূতি, চিন্তার একমাত্র বোদ্ধা এই জীবনদেবতা; তাই কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জীবনদেবতা কি তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের অন্তর ও বাহিরের সমস্ত পূজার অর্ঘ্য সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন? কবির জীবন শত-দুর্বলতায় ভরা—শত ব্যর্থতায় পূর্ণ; জীবনদেবতা কি সমস্ত দুর্বলতা ক্ষমা করিয়া ব্যর্থতাকে সার্থকতা দান করিয়াছেন? জীবনদেবতা মহাকবি, নব নব সৃষ্টিকর্তা তিনি; কবির জীবন-বীণায় তিনি বিচিত্র সুরের আলাপন করিতে চাহেন—কবিকে দিয়া নব নব সৃষ্টি করাইতে চাহেন। কিন্তু কবি জীবনদেবতার সেই মহান পরিপূর্ণ বিশ্ব-সংগীত গাহিবার অনুপযুক্ত। তাই বলিতেছেন,—

যে-সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার—
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি।

কবি মনে করিতেছেন, তাঁহার মধ্যে যে শক্তি ছিল, যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার বিকাশ চরমে পৌঁছিয়াছে, তাঁহার দ্বারা বৃহত্তর, মহত্তর ও উৎকৃষ্টতর কোনো সৃষ্টি আর সম্ভব নয়। তাই এ জীবন শেষ করিয়া, নূতন জন্ম দিয়া তাঁহাকে নবতম ও বৃহত্তম সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত করিবার জন্য জীবনদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা;
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চিরপুরাতন মোরে—
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

এই 'অন্তর্যামী' ও 'জীবনদেবতা' কবিতাতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার অনুভূতি একটা বিশেষ রূপ ও রসে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটি কবিতা আলোচনা করিলে কবির জীবনে জীবনদেবতার আবির্ভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে এইভাবে একটা মোটামুটি ধারণা হইতে পারে।—

(ক) ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টিতে কবি এক মহাশক্তি বা জীবনদেবতার লীলা অনুভব করেন।

(খ) কবির সাহিত্য-সৃষ্টির মূলপ্রেরণা জোগাইতেছেন এই জীবনদেবতা। নব নব সৃষ্টির বেদনার মধ্যে কবি নিজের জীবনে জীবনদেবতার প্রভাব উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহার রচনার মধ্যে আত্মকর্তৃত্ব নাই, উহা জীবনদেবতারই লীলা।

(গ) কবির সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়া জীবনদেবতা নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন—নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন।

(ঘ) কবি জন্ম জন্ম ধরিয়া জীবনে জীবনদেবতার লীলা অনুভব করিতে চাহেন—নবতর ও বৃহত্তর সৃষ্টির প্রেরণা উপলব্ধি করিতে চাহেন।

কবিতা দুইটির বিশ্লেষণ হইতে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, কবির জীবনে এই মহাশক্তির লীলা, এই জীবনদেবতার অনুভূতির স্বরূপই হইতেছে—কবিচিত্তে নব নব সাহিত্যসৃষ্টি, নব নব রূপ ও রসসৃষ্টির আবেগ। এই দেবতা তাঁহার অন্তরে বসিয়া তাঁহার মধ্য দিয়া বিচিত্র রূপময়

ও রসোচ্ছল সৃষ্টিলীলা প্রকাশ করে কবিকে বিস্মিত, মুগ্ধ ও বিহ্বল করিয়া দিতেছেন।

এখন দেখা যাক সমালোচকগণ ও কবি স্বয়ং জীবনদেবতা সম্বন্ধে কি ধারণা করিয়াছেন।

এই কবিতা দুইটি লেখার কিছুকাল পরে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে কবি এক পত্রে (৬ই চৈত্র, ১৩০২) জীবনদেবতা সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"জীবনদেবতা মেটাফিজিক্যাল জীবনদেবতা। আমার জীবনটিকে ধারণ করে যে অন্তর্যামী শক্তি আপনাকে অভিব্যক্ত করে তুলেছেন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছি, আমাকে আশ্রয় করে হে স্বামিন্, তুমি কি চরিতার্থতা লাভ করেছ। যা হতে চেয়েছিলে, যা করতে চেয়েছিলে, তা কি সব সম্পন্ন হয়েছে। আমার দ্বারা যা কিছু হওয়া সম্ভব সব যদি শেষ করে থাক, এখন যদি তোমার আঘাতে আমার এ বীণা আর না বেজে ওঠে, তোমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার মনোঅশ্ব আর ছুটতে না পারে, তবে এই জীর্ণতা অসাড়তা ভেঙেচুরে ফেলে আবার আমাকে নূতন রূপ নূতন প্রাণ দাও; নূতন লোকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদের অনাদিকালের চিরপুরাতন বিবাহবন্ধন নবীকৃত করে দাও।" [চিত্রা, গ্রন্থপরিচয়]

মোহিতচন্দ্র সেনই রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম সমালোচক। তাঁহার সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' তিনি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া কতকগুলি কবিতাকে শ্রেণীবদ্ধ করেন ও ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় জীবনদেবতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, —

"এই জীবনদেবতা কে? কাহাকে লইয়া তিনি মিলন-উৎসবে মগ্ন এবং কে তাঁহার মুখের ভাষা কাড়িয়া কথা কহিয়াছেন, 'মিলায়ে আপন সুরে?' ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই জীবনদেবতার সহিত বিশ্বদেবতার সৌসাদৃশ্য কল্পনা করিবেন। কিন্তু ইহাকে বিশ্বদেব বলিলে কবির আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপর্য বুঝা যায় না। আমার মনে হয় ফুলফলভারে অবনত কোনো তরু নিজের অন্তর্যামী প্রাণকে সম্বোধন করিয়া কবির ন্যায় প্রশ্ন করিতে পারে, "আমাতে কি এখন তুমি সার্থক হইয়াছ?" এই প্রাণ অনন্ত প্রাণ নহে, ইহা শুধু এই বৃক্ষটিতেই আবদ্ধ। কিন্তু প্রথম হইতেই ইহাই বৃক্ষকে অধিকার করিয়া আছে এবং ক্রমশ পত্র-পুষ্প-পর্যায়ের ভিতর দিয়া তাহাকে নৈপুণ্যসহকারে গঠিত করিয়া সার্থকতা দিয়াছে। মানবজীবন তো এইরূপে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। রবীন্দ্রবাবু একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া একটি বৃদ্ধি অনুভব করিতে থাকে। আমাদের ক্ষণিকজীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে।"

"এই যে দুইটি জীবন ইহার ভিতর কবি প্রণয় কল্পনা করিয়াছেন। একজন সুনিপুণা গৃহিণীর ন্যায় অন্তঃপুরবাসিনী, আর একজন তাঁহার যতকিছু দৈনিক সুখদুঃখ, সত্যমিথ্যা, ধারণা, চিন্তা, ও ভাব জড় করিয়া আনিতেছেন। অন্তর্যামী প্রকৃতি তাহার ভিতর হইতে উৎকৃষ্ট এবং অনির্বচনীয় আনন্দের উপাদান সকল গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু যদিও ইনি গৃহিণী তবু ইঁহার সহিত কবির যথেষ্ট পরিচয় এখনো হয়

নাই। তিনি কতকটা মূঢ় ভাবে ইহার অধীন। তাই যখন ইঁহার রাগিণী তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত হয়, তিনি অবাক্ হইয়া শুনিতে থাকেন। সে পরিচয় যে আছে তাহা কি করিয়া বলা যায়? ইনি কত সুন্দর তাহা কি কবি জানেন? ইঁহার বাণীর গভীর অর্থ তিনি কি পরিমাণ করিয়াছেন? ইঁহার আনন্দের উচ্চশিখরে তিনি কি আরোহণ করিয়াছেন? কত যুগ-যুগান্তর লোক-লোকান্তর হইতে ইনি কত বর্ণ ও শব্দ, ভাব ও ভাষা, সংগীত ও সৌন্দর্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, এবং কত বস্তুর সহিত কি প্রগাঢ় আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন, কবি তাহা তো বলিতে পারেন না। তিনি শুধু জানেন যে, সময়ে সময়ে আশাতীত সৌভাগ্যের ন্যায় তাঁহার চিত্ত তাঁহার জীবনদেবতার সৌন্দর্যে প্লাবিত হয় এবং তিনি বিচিত্ররূপিণী হইয়া তাঁহাকে 'সুখের ব্যথায়' উদ্‌ভ্রান্ত করেন। তাঁহাকে তিনি শতজনমের চিরসফলতা বলিয়াছেন এবং তাঁহারই সহিত অচ্ছেদ্য মিলন কামনা করিয়াছেন।" [কাব্যগ্রন্থ, ১৩১০, ভূমিকা]

ইহার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জীবনদেবতা ও তাঁহার জীবনে জীবন-দেবতার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১২) নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-জীবনের একটা ক্রমবিকাশের ধারা-আলোচনা উপলক্ষে জীবনদেবতা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। 'অন্তর্যামী' কবিতা হইতে কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"আমার সুদীর্ঘকালের কবিতালেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কি, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি; তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।...

"বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা 'আসন্ন, সেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না।... যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটিকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। ...আমিই যে তাহা লিখিতেছি এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ বুঝিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষমাত্র;—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।

"আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে যাহাতে তাহা বড় হইয়া উঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া উঠে।

"......শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ,—তাহার সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময় আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কিনা জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধাবিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া-জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়,—আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে,

তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন ; তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন।

"......এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন ; সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ-স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি—সেইজন্য এতবড় রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।"

"...যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপান্তর—জন্ম-জন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছিলাম।

"...নিজের জীবনের মধ্যে এই আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে—যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপর প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে মহাকালনদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা আমি বলিলাম।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেনও রবীন্দ্রনাথের মতই একপ্রকার সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জীবনদেবতার ভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উদ্ভূত হওয়া খুব স্বাভাবিক। কারণ, রবীন্দ্রনাথের বর্তমান ব্যক্তিত্ব বহু জন্মের বিচিত্র ব্যক্তিত্বের সমষ্টি এবং বর্তমান দেহের জীবকোষসমূহের মধ্যে সেই বহু বহু প্রাচীনযুগের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া নানা জীব-জীবনযাত্রার সংস্কারসকল সুপ্তস্মৃতিরূপে আজও বিদ্যমান। সেইজন্যই বিশ্বজগতের সঙ্গে একটা অন্তরতম যোগ ক্ষণে ক্ষণে অনুভূত হয়,—তরু-লতা-পশু-পক্ষীর সহিত ঐক্যানুভূতি সহজ হয়। যুগযুগান্তর হইতে প্রবাহিত এই জীবনধারার অন্তর্নিহিত সত্তাই জীবনদেবতা। এই সত্তা অখণ্ড বিশ্ব-চৈতন্যলাভ-প্রয়াসী। তিনি কবির মধ্যে থাকিয়া চিরকাল ধরিয়া কেবলই কবির জীবনকে গড়িতেছেন এবং বিশ্বের সঙ্গে নানা সম্বন্ধসূত্রে বাঁধিয়া সকল ভেদসীমা দূর করিতেছেন, এবং তাঁহাকে বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছেন। [জীবনদেবতা, কাব্যপরিক্রমা]

জীবনদেবতা কবিতাটি লেখার দশ বৎসর পরে, রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে এই ভাবের প্রথম ব্যাখ্যা করেন, তারপর প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে, আবার প্রসঙ্গক্রমে এই 'জীবনদেবতা' ভাবের ব্যাখ্যা করেন,—

"...আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি, আর তারি সঙ্গে জড়িয়ে

মিশিয়ে আছে যা কিছু। যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন-জন-মান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু পরমপুরুষ আছেন এই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে—নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে।...সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারিনে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখেদুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখিনে। কোনো এক সময়ে দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে জীবনদেবতা-শ্রেণীর কাব্যে।

'ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ—
আসি অন্তরে মম?'

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমিন, সেই পরিমাণে আপন করেছি তাকে, ঐক্য হয়েছে তার সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলাম, তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে যাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ।" [মানব সত্য, প্রবাসী, ১৩৪০, জ্যৈষ্ঠ; মানুষের ধর্ম, পৃ ৯০-৯১]

দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি জীবনদেবতাকে একটি পৃথক আধ্যাত্মিক সত্তা বা মেটাফিজিক্যাল সত্তা বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই সত্তা রবীন্দ্রনাথের জীবনের বৃহত্তম ও গভীরতম সত্তা। সেই সত্তাই মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে, কবি-রবীন্দ্রনাথকে, দার্শনিক-রবীন্দ্রনাথকে পরিচালিত করিতেছেন। কিন্তু কেহই এই শক্তিকে ভগবান বা বিশ্বদেবতা বলিতে চাহেন নাই। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় আলোচনায় এই সত্তাকে 'বিরাট', 'পরমপুরুষ', 'সত্য' প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিলেও ইহাকে বিশ্বদেবতা বলিতে চাহেন নাই। বাউলের 'মনের মানুষ' যে ভগবান নয়, ইহা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথেরই ব্যাখ্যা। কারণ 'মনের মানুষ' যে ভগবানের নামান্তর, এবং উহাই যে অদ্বয় পরমতত্ত্ব ইহা যাঁহারা বাউলের গান আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, যে-শক্তি জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার কাব্যপ্রচেষ্টাকে পরিচালনা করিতেছেন, যাহা তাঁহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিচেতনার মধ্যে বিশ্ব-চেতনার মিলন ঘটাইতেছেন ও চিরন্তন পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করাইতেছেন, তাহা তাঁহার জীবনেরই দেবতা, বিশ্বের নয়, এবং এই দেবতার সঙ্গে তাঁহার গভীর প্রেমের রহস্যময় বিচিত্র সম্বন্ধ। কবি মনে করেন সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য দিয়া যে মহাশক্তি, যে বিরাট পুরুষ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তিনি হইতেছেন বিশ্বদেবতা; এই বিশ্ব-দেবতা যখন কবির ব্যক্তি-জীবনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তখনই তিনি হইতেছেন, জীবন-

দেবতা। ব্যক্তিসত্তায় অধিষ্ঠিত বিশ্ব-দেবতার রূপই জীবনদেবতা। এই জীবনদেবতা তাঁহার অতীত, বর্তমান ও অনাগতকে জুড়িয়া, তাঁহার সমস্ত সুখদুঃখ, ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন-চেতনাকে পূর্ণ প্রকাশের পথে চালিত করিতেছেন। অবশ্য ভারতীয় অধ্যাত্ম-দর্শন অনুসারে যে শক্তি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলে, তাহাই মানবমনে ক্রিয়াশীল। ইহাদের মধ্যে সত্যকার কোনো প্রভেদ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অভিনব রূপদ্রষ্টা, রূপস্রষ্টা ও শিল্পী হিসাবে তাঁহার অনুভূতি ও কল্পনার বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই সত্তাকে পৃথকভাবে উপভোগ করিয়াছেন।

পরবর্তী সমালোচকদের মধ্যেও অনেকে ইঁহাদের ব্যাখ্যাকেই অল্পবিস্তর মানিয়া লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বলেন,—"Jibandebata is personal—the presiding deity of thc poet's life—not quite that even—the Inner-self of the poet who is more than this earthly incarnation."

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ও বোধ হয় এইরূপ একটা ভাবই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন,—

"কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ যে অবস্থাকে বলিয়াছেন Serene and Blessed Mood, সক্রেটিস যাহাকে বলিয়াছেন Daemon, প্লেটো যাহাকে বলিয়াছেন আইডিয়া, কৃশ্চানদের কোয়েকার সম্প্রদায় যাহাকে বলেন অন্তরের আলোক, দার্শনিক ফেক্‌নার যাহাকে বলিয়াছেন ব্যক্তি-চেতন্যাতীত মহাচৈতন্য, যাহা জীবনের পরিচালনী শক্তি, তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন অন্তর্যামী বা জীবনদেবতা। ইহাকেই H. G Wells বলিয়াছেন The living reality in our lives (God the invisible king), The Driver of the machine-man." [রবি-রশ্মি, পৃ ৩৪৮]

আবার কোনো কোনো সমালোচক যুক্তিমূলে জীবনদেবতা অর্থে বিশ্বদেবতা বুঝিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন,

"...জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যগগনে ধূমকেতুর মত উদিত হইয়া বিলীন হয় নাই। জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার নামান্তর বা রূপান্তর মাত্র।" [রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১২৬]

টম্‌প্‌সন্‌ সাহেব তাঁহার পুস্তকে জীবনদেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ টম্‌প্‌সন্‌ সাহেবকে বলিয়াছিলেন,—"The idea has a double strand. There is the Vaishnava dualism—always keeping the separateness of the self and there is the Upanishadic monism. God is wooing each individual ; and God is also the ground-reality of all as in the Vedantist unification. When the Jibandevata came to me, I felt an overwhelming joy—it seemed a discovery, new with me—in this deepest selfseeking expression. I wished to sink into it—to give myself up wholly

to it. To-day, I am on the same plane as my readers, I am trying to find what the Jibandevata was"

টম্‌প্‌সন্‌ সাহেব দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার সম্বন্ধে হয়তো মতদ্বৈধ থাকিতে পারে কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় যে উদ্ধৃত অংশ রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যাহা কোনো দিন বলেন নাই, এরূপ কোনো উক্তি রবীন্দ্রনাথের মুখে বসাইয়া দিয়া তাহা প্রচার করিবার দুঃসাহস সাহেবের হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই এ পুস্তক প্রকাশিত হয়, এবং এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠে নাই। কবির এই স্বীকারোক্তিটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। জীবন-দেবতার অনুভূতি যখন সর্বপ্রথম কবি-চিত্তে উদ্ভূত হয়, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। এই অনুভূতি ছিল তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন, এই অনুভূতির কাছে তিনি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। জীবনদেবতার অনুভূতি আর তাঁহার মধ্যে বর্তমান নাই,—তিনি এখন সাধারণ পাঠকের মতো জীবনদেবতা কি তাহাই জানিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এ উক্তি অবিশ্বাস্য নয়। কবি-মানসের ধারাবাহিক ইতিহাসে জীবনদেবতার অনুভূতি একটা বিশেষ স্তর। হয়তো প্রথম জীবন হইতেই এই অনুভূতি কিছুমাত্রায় কবির অন্তরে ক্রিয়াশীল ছিল—শেষে একটা স্তরে পৌঁছিয়া প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। তারপর মাঝে মাঝে এই ভাবের বিকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু বহুভাবের অনুভূতিতে ইহার একমুখী বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়াছে ও পৌর্বাপর্যসূত্র ছিন্ন হইয়াছে,—শেষে মনের অবচেতন-স্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন, জীবনদেবতা যে কি ও কে তাহা তিনি এখন আর বলিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস নিরন্তর পরিবর্তনপ্রয়াসী ও বহু-বৈচিত্র্যকামী। যখন কোনো একটি ভাব কবির মনে উদিত হইয়াছে, তখন উহা এত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে যে কবি তাহার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন—এবং ঐ ভাবের আবেষ্টনকে একান্ত করিয়া দেখিয়াছেন। তারপর, ঐ চক্রের মধ্য হইতে বাহির হইবার জন্য কবির মনে জাগিয়াছে অস্থিরতা—শেষে ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া আবার অবস্থান্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। আবার সেখান হইতে চলিয়াছে যাত্রা ভিন্ন অবস্থার দিকে। তাঁহার রচিত বিরাট সাহিত্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই। বিচিত্র সমারোহে এ সাহিত্য একটা অতি-বিস্ময়কর প্রদর্শনীতে পরিণত হইয়াছে।

কবি-মানসের কতকগুলি বিশিষ্ট ধারা সম্বন্ধে হয়তো কবি চিরকালই সচেতন আছেন কিন্তু সেই বিশিষ্ট ধারার কোনো সাময়িক অভিব্যক্তি ও তাহার কার্য-কারণত্ব, বিরাট সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে কবির মনে না থাকাই সম্ভব। তাই কবিকে

যখন তাঁহার কাব্য ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, তখন সচেতন কোনো প্রধান বৈশিষ্ট্যের তত্ত্বের আওতায় ফেলিয়া কাব্যগত সেই ক্ষণিক ভাবকে চিরন্তনের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন ও তাঁহার কবি-মানসের বিশেষ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাই কবি-প্রতিভা-উন্মেষের প্রথম যুগের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিও কবি বহুকাল পরে 'অহং-মুক্ত আত্মার প্রকাশ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবি তখন ঐ বিশিষ্ট অনুভূতির জগতে নাই—কেবল তাঁহার কবি-মানসের একটা সাধারণ ধারণাকে তত্ত্বরূপে উপলব্ধি করিয়া উহাকে তাহার পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। সুতরাং কবি যে জীবনদেবতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ঐ ভাব বৈষ্ণবের দ্বৈত ও উপনিষদের অদ্বৈতেব সমন্বয়, তাহা তাঁহার পরবর্তীকালে তত্ত্বরূপে উপলব্ধি, কিন্তু উহা জীবনদেবতার মূল স্বরূপের অনুভূতি নয়। সে অনুভূতি তাঁহার চেতনা-ক্ষেত্র হইতে বহুদিন অপসারিত। তাই তিনি পাঠকের সঙ্গে বর্তমানে সমপর্যায়ভুক্ত। এ কথা তিনি অন্যত্রও বলিয়াছেন,—"· এই কাব্য বোঝাবার কাজে কেউ কেউ কবির সাহায্য চেয়ে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে, যে কবি কাব্য লেখেন তিনি এক মানুষ, আর যিনি ব্যাখ্যা করেন, তিনি আর একজন। এই ব্যাখ্যাকর্তা পাঠকদেরই সমশ্রেণীর। তাঁর মুখে· ভুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়।" [কবি-পরিচিতি, কবির অভিভাষণ, পৃঃ ২-৩]

একটি কথা এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে—যাহা কবির জীবনদেবতা ভাবের কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে বিরাজ করিতেছে। পূর্বে উল্লিখিত 'অন্তর্যামী' ও 'জীবনদেবতা' কবিতার বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইবে যে জীবনদেবতার অনুভূতি কবির সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা। এই অনুভূতি অর্থে নব নব রূপ ও ভাব-সৃষ্টির বেদনার আনন্দ। জীবনদেবতার সহিত মিলনের লীলামাধুর্যই বিচিত্র ছন্দ ও সুরে কবির কাব্যরূপে রূপায়িত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই জীবনদেবতা কে? কবির ব্যাখ্যা যাহাই বলুক, কবির কাব্য যাহা সাক্ষ্য দেয় তাহাই প্রকৃত নির্ভরযোগ্য। আমার মনে হয়, এই জীবন-দেবতা রবীন্দ্রনাথের অন্তরবাসী শিল্পীর সত্তা—তাঁহার কবি-পুরুষ। ইহাই তাঁহার সৃজনী প্রতিভা—সমগ্র কাব্যপ্রেরণার মূল শক্তি এবং বিশ্বসৌন্দর্যের অতিপ্রবল অনুভূতির দ্বারা এই কবি-শিল্পীসত্তা গঠিত। এই বৃহত্তর শিল্পী-জীবন কেবলই নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে আর কবি আত্মকর্তৃত্বহীন হইয়া এই প্রেরণার স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছেন। প্রবল সৃষ্টির প্রেরণায় কবি যখন অভিভূত, তখন মনে করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের মধ্যে একটি বৃহত্তম জীবন—একটি বিপুল শক্তিশালী সত্তা—একটি অন্তরতম দেবতা তাঁহার সমস্ত ভাব, চিন্তা,

কাব্য ও সংগীতকে পরিচালনা করিতেছেন। তিনি সেই শক্তির সম্পূর্ণ অধীন, উহার হাতের খেলনা মাত্র। কবি অনুভব করিতেছেন যে এই দেবতা তাঁহার মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া লইতেছেন, এবং তাঁহাকে যাহা বলাইতেছেন তিনি তাহাই বলিতেছেন। কবির এই অন্তরবাসী শিল্পদেবতা নব নব মূর্তি গড়িতেছেন, নূতন ছন্দ ছুটাইতেছেন ও নূতন রাগিণী গাহিতেছেন। তাঁহার সমগ্র জীবন যেন এই দেবতার বীণা, এবং এই বীণা হইতে অপূর্ব সংগীতের মূর্ছনা ধ্বনিত হইতেছে। এই দেবতার দীন সেবকরূপে কবি নিজের অক্ষমতা ও স্খলন-পতন-ত্রুটিতে সর্বদা শঙ্কিত। সৃষ্টির প্রেরণা ও আবেগ কবির চিত্তে এতই প্রবল যে তিনি উহাকে তাঁহার চিত্তের অধীশ্বর ও চালক বলিয়া মনে করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরবাসীর শিল্পী-জীবনের এই যে প্রকাশক্ষুধা, এই যে সৃষ্টির প্রেরণা, ইহার মূল উৎস তাঁহার কবিমানসের একটা অনুভূতির মধ্যে রহিয়াছে। এই অনুভূতি হইতে সৃষ্টির প্রেরণা ও আবেগের উদ্ভব হইয়াছে, এই প্রেরণা ও আবেগ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে, তখনই কবি উহাকে দেবতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। এই অনুভূতি বিশ্বসৌন্দর্যের অখণ্ড অনুভূতি। এই বিশ্বসৌন্দর্যের অখণ্ড অনুভূতিই কবির সৃষ্টি-প্রেরণার মূল কারণ—তাঁহার সৃজনী প্রতিভার পটভূমিকা—তাঁহার রসলক্ষ্মী। আসলে বিশ্বসৌন্দর্যের অনুভূতি ও জীবনদেবতাদের অনুভূতি এক—কেবল অনুভূতির চরম মুহূর্তে ইহাকে একটা স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। যাহা কবির 'মানসসুন্দরী' বা বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী, বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মী বা সৌন্দর্যদেবী, তাহাই জীবনদেবতায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। অনুভূতির আতিশয্যে কবি ইহাকে জীবন-মরণ ও জন্মজন্মান্তরব্যাপী একটা শক্তিরূপে বুঝিয়াছেন। বিশ্বসৌন্দর্যের অনুভূতি emotion-এর plane হইতে intellect-এর plane-এ উন্নীত হইয়াছে—অনুভূতি উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে। তাই জীবনদেবতাবাদ কতকটা তত্ত্বের আকারে উপস্থিত হইয়াছে এবং কবিও ইহাকে তত্ত্বরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলে ইহা বিশ্বসৌন্দর্য-চেতনার অখণ্ড অনুভূতি।

প্রকৃতি ও মানব লইয়া এই বিশ্ব গঠিত। এই প্রকৃতির রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ গন্ধের শত শত বিচিত্র প্রকাশ ও মানবের দেহ-মনের অগণিত রূপ ও রসের অভিব্যক্তি একটি অখণ্ড সৌন্দর্যরূপে কবি তাঁহার অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। প্রকৃতি ও মানবের পরস্পরের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান, এবং এই সম্বন্ধ নানা রূপে ও রসে জন্মজন্মান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আর এই প্রকৃতিজীবন ও মানব-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ সম্মিলিত রূপের অখণ্ড সৌন্দর্যানুভূতি কবির চিত্তে এক অলৌকিক চেতনায় বিরাজ করিতেছে। এই যে বিশ্বসৌন্দর্যচেতনা—ইহাই কবির

সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা। ইহাই তাঁহার সোনার তরীর মাঝি, বাল্যের সখী, যৌবনের প্রেয়সী মানসসুন্দরী, নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গিনী, হৃদয়বাসিনী চিত্রা তাঁহার অন্তর্যামী—জীবনদেবতা। যে সৌন্দর্যচেতনা একটা বস্তুনিরপেক্ষ বোধমাত্র শুধুমাত্র অন্তরের একটা অতি-প্রবল আনন্দ-অনুভূতি, কবি উহাতে সজীব সত্ত আরোপ করিয়া উহাকে এক অনন্তরহস্যময়ী, অপার সৌন্দর্যময়ী প্রণয়িনী নারীতে পর্যবসিত করিয়াছেন এবং শেষে দেবতায় উন্নীত করিয়াছেন। কবি অনুভব করিয়াছেন, শৈশব হইতে এই রহস্যময়ী নারী তাঁহার জীবনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিতেছে, স্বর্গমর্ত্যের সমস্ত আনন্দ অন্বেষণে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয় চলিয়াছে ও জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনসূত্রটি ধাবিত আছে।

ইহা পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, এই খণ্ডে ও অখণ্ডে বিশ্বসৌন্দর্যের অনুভূতি কবিকে অভিভূত করিয়াছে। বিশ্ব-জীবনের যে অখণ্ড সৌন্দর্য কবিকে কাব্যপ্রেরণা জোগাইয়াছে, তাহা যেমন তিনি বস্তুনিরপেক্ষভাবে অন্তরে অনুভব করিয়াছেন আবার বিশ্বজীবনের বিচিত্র খণ্ডপ্রকাশের মধ্যে তেমনি তাহাকে প্রতিফলিত করিয়া দেখিয়াছেন। এই বিশ্বসৌন্দর্যচেতনা তিনি অখণ্ডে ও খণ্ডে, অসীমে ও সসীমে অন্তরে ও বাহিরে উপলব্ধি করিয়াছেন। যাহা অসীম ও অনন্ত,—যাহা কেবল ভাবের মধ্যে, একটা চেতনার মধ্যে আবদ্ধ, তাহাকে সীমার মধ্যে, রূপের মধ্যে ধরিতে না পারিলে তাহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। আবার যাহা সীমা বা রূপবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ, তাহাকে অসীম ও অরূপের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া না দেখিলে তাহার সার্থকতা পাওয়া যায় না। একবার কবি ব্যক্তি-চেতনার সীমা-বদ্ধতার মধ্যে বিশ্বচেতনাকে যেমন উপলব্ধি করিয়াছেন, তেমনিই ব্যক্তি-চেতনার সীমা ভাঙিয়া উহা বিশ্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাই সসীম ও অসীম, খণ্ড ও অখণ্ড, রূপ ও অরূপ, অংশ ও পরিপূর্ণ উভয় উভয়কে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কবি-মানসের এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য-প্রচেষ্টার নিয়ামক।

বিশ্বসৌন্দর্যের অনুভূতি মূলত সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতি। সৌন্দর্য ও প্রেমের তীব্র অনুভূতিই কবির জীবনদেবতার অনুভূতি। ইহা একটা অখণ্ড ভাবের অনুভূতি। এই ভাবের রঞ্জনী রশ্মিতে তিনি প্রকৃতি ও মানবের খণ্ড ও ক্ষণিক সৌন্দর্য ও প্রেমকে দেখিয়াছেন, তাই দেহসর্বস্ব সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যে একটা অপার্থিবত্ব আসিয়াছে। অন্যপক্ষে কেবল বস্তুহীন, ভাবমূলক প্রেম ও সৌন্দর্যে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, উহাকে মর্ত্যের মাটিতে রূপের মধ্যে নামাইয়াছেন বলিয়া উহার একটা সার্থকতা আসিয়াছে।

কবিত্ব-উন্মেষের আলো-আঁধারি প্রত্যূষ হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্রার যুগ পর্যন্ত তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি ও মানবে পূর্ণ এই বিশ্বের অনুভূতির বিবর্তন-ধারা অনুসরণ করিলে জীবনদেবতা-ভাবের তাৎপর্য অনেকটা স্পষ্ট হইবে।

রবীন্দ্রনাথের তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে লেখা 'বনফুল' নামে কাব্য-আখ্যায়িকার মধ্যে কিশোর কবি প্রকৃতির সহিত মানবের নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন। বিজন প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ সহজ, সরল ও সর্বপ্রকার আবিলতাশূন্য। কিন্তু লোকালয়ের সংস্পর্শে মানুষের মনে কৃত্রিমতা জন্মে ও হৃদয়ের সাবলীলা ঐশ্বর্য ও মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়, তাই, সংসারের মলিন-স্পর্শ কলঙ্কিত মানুষের সহিত প্রকৃতির সহজ ও স্বাভাবিক মিলন সূত্র ছিন্ন হয়। তারপর ষোল বৎসর বয়সে লেখা 'কবি-কাহিনী' নামক কাব্যের নায়ক কবি প্রকৃতির বিচিত্ররূপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতেছেন। কবির নিজের বাল্যজীবন ভৃত্য ও কর্মচারীদের অভিভাবকত্বের কারাগারের মধ্যে কাটিয়াছে। এই অবরুদ্ধ জীবনে প্রকৃতির সহিত কবির কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। তাই কল্পনায় কবি-প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছেন। যদিও এই সময়ে প্রকৃতির সহিত কবির প্রকৃত পরিচয় হয় নাই, কাব্যসৃষ্টি একটা উচ্ছ্বাস ও কল্পনার বায়বীয় আকারের মধ্যেই আবদ্ধ আছে, তবুও প্রকৃতির প্রতি টান ও তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা কবির মধ্যে যে জাগিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ক্রমে প্রকৃতি ও মানব-সমন্বিত এই বিশ্বের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হইবার জন্য কবির প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। বিশ্বের সহিত পূর্ণভাবে মিলিত হইতে না পারার বেদনা ও অবরুদ্ধ অবস্থার অস্থিরতা 'সন্ধ্যাসংগীতে' ব্যক্ত হইয়াছে। তারপর 'প্রভাত-সংগীতে' কবি বিশ্বকে প্রথম লাভ করিলেন। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রথম যোগ স্থাপিত হইল। দেখিলেন, সমগ্র বিশ্ব আনন্দ, সৌন্দর্য ও মহিমায় পরিব্যাপ্ত। প্রথম বিশ্বকে পাইবার উল্লাস ও আবেগ 'প্রভাত সংগীতে'র কবিতায় প্রবলবেগে উৎসারিত হইয়াছে। 'ছবি ও গানে' চলিয়াছে এই বিশ্বের বিচিত্র দৃশ্যের ছবি আঁকা। কবি আনন্দে বিভোর হইয়া কল্পনার শত বর্ণচ্ছটার সাহায্যে অপূর্ব ছন্দোময় ও শব্দময় সৌন্দর্য-চিত্র আঁকিয়াছেন। 'কড়ি ও কোমলে' দেখি মানব-জীবনই কবিকে বেশি আকর্ষণ করিয়াছে। মানবজীবনের বিচিত্র রহস্যের মধ্যে কবি প্রবেশ করিতেছেন। যৌবন-স্বপ্ন-বিহ্বল কবি বিশ্বের সর্বত্র অসীম সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ দেখিতেছেন, তবুও বিশেষ করিয়া এই 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে নারীর দেহের সৌন্দর্য কবিকে বেশি আকৃষ্ট করিয়াছে। 'মানসী'তে বিশ্বের স্পর্শ কবির চিত্তে তাঁহার মানসী প্রতিমায় রূপায়িত হইয়াছে। প্রাতমুহূর্তে বিশ্ব-জীবনের

বিচিত্র তরঙ্গ কবির চিত্তে আঘাত করিতেছে ; ঐ আঘাতে তাঁহার মনে যে অনুভূতি জাগিতেছে, সেই অনুভূতির ভাবময়ী বাণী-রূপই কবির মানসী। অনন্তকাল ও অসীম বিশ্বজীবন খণ্ড কাল ও খণ্ড জীবনের রূপে কবির চিত্তকে স্পর্শ করিতেছে। কবির কোনো বিশিষ্ট ক্ষণের বা নির্দিষ্ট জীবনের যে অনুভূতি কবির কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে অনন্ত কাল ও অসীম বিশ্বজীবনের ব্যঞ্জনা বিরাজ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ 'চির-জীবন' ধরিয়া তাঁহার কবি-কর্মে শুধু 'অসীমের সীমা' রচনা করিয়া গিয়াছেন। মানসীতে এই বিশ্বের প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে, মানবের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হইয়াছে। 'কড়ি ও কোমলে'র মানব-সৌন্দর্যভোগের ধারাটা 'মানসী'তেও চলিয়া আসিয়াছে। দেহ হইতে এখানে মনে উঠিয়াছে—প্রেমের মাধুর্য-লীলা-রহস্যেই কবি বিশেষ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর 'সোনার তরী'তে প্রকৃতিও মানব-সংবলিত এই বিশ্বের অনুভূতি কবিকে নূতন আবেগ, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নবতর প্রেরণা দান করিয়াছে। এই সময় প্রকৃতির অবারিত সমারোহের মধ্যে কবিকে বহু সময় কাটাইতে হইয়াছে। নগ্ন প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-গানের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্য কবি আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। মানুষকেও তিনি এ সময়ে নূতনভাবে চিনিয়াছেন। মানুষের শান্ত সহজ জীবন, তাহার সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আশা-নৈরাশ্য, প্রেম-বিরহ প্রভৃতি তাঁহার চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে। সুতরাং, সারা বিশ্বকে তিনি পরিপূর্ণভাবে দেখিয়াছেন—তাহার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মধ্যে একটা নূতন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন।

প্রকৃতভাবে 'সোনার তরী'তেই কবি প্রকৃতিজীবন ও মানবজীবনের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। নিখিল বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য একেবারে তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। এই বিশ্বসৌন্দর্যের প্রবল অনুভূতির আবেগে কবি সমস্ত সৌন্দর্যের প্রাণকে, তাহার মর্মগত ভাবকে একটা নারীমূর্তির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া উপভোগ করিয়াছেন। সে মূর্তি তাঁহার 'মানসসুন্দরী' ; সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্যের মূলগত অখণ্ড ভাব অপার রহস্যময়ী নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কবির অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই মানসসুন্দরী এই বিশ্বের শত-সহস্র খণ্ড রূপ ও রসের আস্বাদনে তাঁহাকে আজীবন পরিচালিত করিতেছে বলিয়া কবি অনুভব করিয়াছেন। তাই বিশ্বসৌন্দর্যের এই ভাব-মূর্তিই কবির 'সোনার তরী'র মাঝি, তাঁহার 'মানস-সুন্দরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র রহস্যময়ী সঙ্গিনী, তাঁহার 'চিত্রা', তাঁহার অন্তর্যামী—'জীবনদেবতা'। নিখিল বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচ্ছুরিত যে সৌন্দর্য, তাহার মূলগত ঐক্য একটি পরিপূর্ণ মূর্তি ধরিয়া তাঁহার কবি-কর্মকে পরিচালিত

করিয়াছে, এই স্বতন্ত্র সত্তার অনুভূতি - এই বিশ্বজীবনের অখণ্ড সৌন্দর্যের অনুভূতি —তাঁহাকে নিরন্তর নব নব রূপ ও রসসৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। বিশ্ব-সৌন্দর্যের অনুভূতির এক অভিনব রূপায়ণ কবির জীবনদেবতা। এই অনুভূতিই তাঁহার সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মূল উৎস—তাঁহার রসলক্ষ্মী—তাঁহার অন্তরবিহারী কবি-পুরুষ—তাঁহার শিল্পী-সত্তার জন্মদাতা, পোষণকর্তা ও একপ্রকার রূপান্তর মাত্র। এই জাবনদেবতার অনুভূতিতে কবির সৌন্দর্য-সাধনা ও রস-সাধনা চরম স্তরে পৌঁছিয়াছে, এই অনুভূতিই তাঁহার বস-জীবনের—শিল্প-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

কবি-জীবনের এই স্তরে, এই চিত্রার যুগেই কেবল জীবনদেবতা কবির নিকট একটি স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সত্তারূপে অনুভূত হয় নাই। ইহার পরেও দীর্ঘদিন ধরিয়া কবি জীবনদেবতাকে জাগতিক সৌন্দর্য-প্রেম ও মানবীয় রসের অনুপ্রেরণাদাত্রী বলিয়া অনুভব করিয়াছেন দেখা যায়। গূঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও গভীর তত্ত্ব-চিন্তায় কবির মন আচ্ছন্ন থাকিলেও, যখনই ’ই ধরণীর রূপ-রসেব অনুভূতি জাগিয়াছে, তখনই জীবনদেবতাকে অনুভব করিয়াছেন। জীবনদেবতা-ভাবের সহিত জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-প্রেম ও বিচিত্র রসমাধুর্যের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ যে কবির অবচেতন মনে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বেশ লক্ষ্য করা যায়।

এ যুগের পরবর্তী কবি-জীবনে যখনই কবি প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখনই এই রহস্যময়ী জীবনদেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। ‘মানসী’ হইতে ‘ক্ষণিকা’ পর্যন্ত চলিয়াছে সৌন্দর্য-প্রেমের, রস-মাধুর্যের জীবন; তাহার পর হইতেই কবি ক্রমে বিশ্বদেবতার গভীর অনুভূতিব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বিশ্বকে ছাড়িয়া বিশ্বের অধীশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া চলিয়াছে কবির কাব্য-সাধনা ‘গীতাঞ্জলি’ পর্যন্ত। তারপর ‘বলাকা’য় কবি-জীবনের একটা মোড় ফিরিয়াছে। চিব-তারুণ্যের গতিবেগই যে মানুষের জীবনকে ক্রমে চরম বিকাশের দিকে অগ্রসর করায়, এই অনুভূতি কবির মধ্যে জাগিয়াছে, এবং এই সৃষ্টিধারাকে, এই জগৎ ও জীবনেব স্বরূপকে, কবি দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অনুভব করিয়াছেন। ‘পূরবী’তে পৌঁছিয়া সেই অধ্যাত্ম-রসিক ও দার্শনিকের অনুভূতি ক্ষণকালেব জন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। জগৎ ও জীবনের চিরকালের রূপরসভোগী কবি জীবন-অপরাহ্ণে প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।

বিগতদিনের এই প্রকৃতি-মানব-রস-যুগকে ভুলিয়া থাকায় কবি অনুশোচনা করিতেছেন,—

কী ভুল ভুলেছিলাম, আহা, সবচেয়ে যা নিকট তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন ;
কাছেকে আজ পেলাম কাছে—চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।

'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল' দিনগুলির কথা তাঁহার মনে পড়িল। বার্ধক্যেও আবার যৌবনের আনন্দ-উল্লাসে প্রাণ ভরিয়া গেল, হৃদয়-আকাশ আবার সৌন্দর্য ও প্রেমের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—

আলোকে তোর দিক না ভ'রে ভোরের নব রবি,
বাজ্ রে বীণা বাজ্।
গগনকোণে হাওয়ার দোলে ওঠ্ রে দুলে কবি,
ফুরালো তোর কাজ।

যেমনি কবি এতোদিনের ভুলিয়া-যাওয়া সৌন্দর্য-মাধুর্যের জীবনে ফিরিলেন, অমনি তাঁহার মানসসুন্দরী লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতার আবির্ভাব !—

দুয়ারবাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী।
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি। [লীলাসঙ্গিনী]

কৃতজ্ঞ-চিত্তে কবি সেই প্রিয়তমার ঋণ স্বীকার করিতেছেন,—

...একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজো নাই শেষ ; রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীণ

তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। [কৃতজ্ঞ]

রবীন্দ্র-কাব্যে জীবনদেবতা ভাবের উৎপত্তি ও শেষ পরিণতির ইতিহাস লক্ষ্য করিলে কবি-জীবনে ইহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাইবে। 'পূরবী'র পরে বিশ্ব-রহস্যচিন্তা ও আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসার চাপে এই জীবনদেবতা—এই দ্বিতীয় জীবন বা কবি-শিল্পীজীবনকে কবি আর অনুভব করিতে পারেন নাই। এই শিল্পী-সত্তা আর জগৎ ও জীবনের রূপরসভোগে তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দেয় নাই। এই সত্তা আর এক গভীরতর তাৎপর্য ও বিস্ময়ের সঙ্গে কবির মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই কাব্যরসোৎসারিণী জীবনদেবতাকে কবি আর একবার স্মরণ করিয়াছেন 'পরিশেষ' গ্রন্থে। 'তুমি' নামক কবিতায় জীবনদেবতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের একটা পরিণতির ইতিহাস সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন,—

প্রেমের দিয়ালী দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি।
মোর সংগীতে তুমিই স'পিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি
তব আলিপন-লিপ্তি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এলো যে রাতি।

কবির হৃদয়ের সেই মহাকবি তাঁহার জীবন-সন্ধ্যায় এখন মূক, অসীম রহস্যের আবরণে সে ঘেরা—মহানীরব,—

চেনা মুখখানি আর নাহি জানি
আঁধারে হতেছে গুপ্ত,
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ
কোথায় সে হায় সুপ্ত।

অবগুণ্ঠিত তব চারি ধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গগনে হল যে লুপ্ত।

এখানেই কি কবির সহিত জীবনব্যাপী পরিচয়ের শেষ, তাই কবির ব্যাকুল প্রশ্ন,—

এ জীবনময় তব পরিচয়
এখানে কি হবে শূন্য ?
তুমি যে-বীণার বেঁধেছিলে তার
এখন কি হবে ক্ষুণ্ণ ?

কবি-জীবনের এই স্তর হইতেই তাঁহার অন্তরবাসী জীবনদেবতা জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য, প্রেম এবং বিচিত্র রসমাধুর্যের সত্তা ত্যাগ করিয়া তাঁহার মধ্যকার বৃহত্তর আধ্যাত্মিক জীবনে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার কবি-শিল্পী-সত্তা নিত্য-আমিতে পর্যবসিত হইয়াছে। জীবনদেবতা ঔপনিষদিক আত্মায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। শেষ জীবনের কাব্যে কবি এই আত্মার রহস্য ও গভীরতার উপলব্ধির বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই আত্মতত্ত্বনির্ণয় ও আত্মার রহস্যোদ্ঘাটনের মধ্যেও যখনই জগৎ ও জীবনের রসমাধুর্যের অনুভূতি কবি-চিত্তে জাগিয়াছে, তখনই তাহার জীবনদেবতার দর্শন মিলিয়াছে।

একেবারে জীবনের শেষপ্রান্তে, মৃত্যুর পূর্ব বৎসরে, তাঁহার বহুদিনবিস্মৃত সেই লীলাসঙ্গিনী, হৃদয়লক্ষ্মী ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়াছে। তাঁহার 'সানাই' কাব্য-গ্রন্থখানি দীপশিখার অন্তিম নিঃশ্বাসের মতো রসমাধুর্যের দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়া পূর্বেকার রবীন্দ্রনাথের—সোনারতরী-চিত্রা-ক্ষণিকার কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিক আভাস দিয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থে বহুকাল পরে পূর্বের মতো রসোচ্ছল কতকগুলি সুন্দর লিরিকের দেখা পাওয়া যায়,—কবির অপূর্ব রসদৃষ্টিপাতে জগতের আপাত-দৃষ্টিতে-কুৎসিৎ বস্তুও স্বর্ণ-আভায় মণ্ডিত হইয়াছে। আশী-বছরের কবির মানস দেহে আবার যেন বাসন্তীস্পর্শ লাগিয়াছে।

কবি তাঁহার মর্মের গেহিনীকে দেখিতেছেন,—কিন্তু এ কি ? তাহার তো সেই পূর্বের বেশ-বাস নাই, সে রূপ নাই, সে লাবণ্যের দীপ্তি নাই !

মহাকালের তাণ্ডবনৃত্যে সেই অপূর্বলাস্যবিলাসিনী নর্তিনীর হাতের কঙ্কণ কোথায় ছুটিয়া গিয়াছে, বাতাসের বেগে মাথার সুসংবদ্ধ বেণী উচ্ছৃঙ্খল কেশস্তূপে বিপর্যস্ত হইয়াছে, নানা আভরণ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, পুষ্পমালা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, নৃত্যগীতোজ্জ্বল আনন্দরাত্রির লীলা-বিলাস শেষ !

" ?মরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল
ছিন্ন করে দিল তার ছন্দ তব ঝংকৃত কিঙ্কিণী
হে নর্তিনী,
বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজাল
ঝঞ্ঝার বাতাসে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম উচ্ছ্বাসে,
বিদীর্ণ বিদ্যুৎঘাতে তোমার বিহ্বল বিভাবরী
হে সুন্দরী।
সীমন্তের সীঁথি তব প্রবালে খচিত কণ্ঠহার
অন্ধকারে মগ্ন তোলো চৌদিকে বিক্ষিপ্ত অলংকার।

নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে, মুগ্ধ হস্তে গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা।
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হোতো রসের প্লাবন,
মত্ততার শেষ পালা আজি সে করিল উদ্‌যাপন।
[বিপ্লব]

তাহার আভরণশূন্য রিক্তরূপ আজ সকলের অবজ্ঞার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। 'মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণে' সে কবিকেই দোষী করিয়া তীক্ষ্ণ তলবারির মতো ক্রুদ্ধ দৃষ্টি কবির উপরেই নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু কবি আর এখন সেই ক্রুদ্ধ, নিষ্ঠুর কটাক্ষে বিচলিত হইবেন না। তাহার হৃদয়-বিহারিণীর এই আভরণহীন, রিক্ত রূপ আজ নূতন এক সংকেত জানাইতেছে।

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথ গগনে,
হে নির্দয়া কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে।

এ নূতন জীবনের সংকেত—নূতন রূপান্তরের সংকেত। 'পূরবী'তে যে কিঙ্কিণী বাজাইয়া লীলাসঙ্গিনী তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল আজ কোথায় তাহা চূর্ণ হইয়া ছুটিয়া পড়িয়াছে।

তারপর এ জীবনের মতো কবির শেষ দেখা তাঁহার এই হৃদয়-লক্ষ্মীর সঙ্গে মৃত্যুর দুর্যোগের আশঙ্কার মধ্যে।

ঈশানকোণে মেঘ জমিয়াছে, আসন্ন ঝড়ের ভয়ে চরাচর উদ্বিগ্ন,—এমন দিনে পূর্বের রূপ, রস, গন্ধে উজ্জ্বল হইয়া ক্ষণিকের জন্য প্রিয়তমার আগমন!

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভ প্রান্তে আর একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা
অনির্বচনীয় তুমি।
মর্মতলে উঠিলে কুসুমি
অসীম বিস্ময় মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে
অদৃশ্য আলোক হতে দৃষ্টির আলোতে।
তেমনি রহস্যপথে, হে অভিসারিকা
আজ আসিয়াছ তুমি, ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের শিখা
কী ইঙ্গিত মেলিতেছে মুখে তব,
কী তাহার ভাষা অভিনব।

[শেষ অভিসার]

আজ যে-পথ বাহিয়া তাঁহার হৃদয়-লক্ষ্মী আসিয়াছে, সে পথের চিহ্ন প্রায় লুপ্ত, তাহার আহৃত ফুলের নাম ও গন্ধ কবির অপরিচিত। কবি আজ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া;—তাহার হাতের মালাখানি আজ মৃত্যুর বরমাল্যস্বরূপ কবির গলায় অর্পিত হোক; হৃদয়েশ্বরী শেষ অভিসারে আসিয়া মৃত্যুর সঙ্গে কবির মিলন করাইয়া দিক—ইহাই কবির অন্তিম প্রার্থনা।

আসিছ যে পথ বেয়ে সেদিনের চেনা পথ এ কী।
এযে দেখি
কোথাও বা ক্ষীণ তার রেখা,
কোথাও চিহ্নের সূত্র লেশমাত্র নাহি যায় দেখা।
ডালিতে এনেছ ফুল স্মৃত বিস্মৃত,
কিছু বা অপরিচিত।
হে দূতী এনেছ আজ গন্ধে তব যে ঋতুর বাণী
নাম তার নাহি জানি।
মৃত্যু অন্ধকারময়
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয়।
তারি বরমাল্যখানি পরাইয়া দাও মোর গলে
স্তিমিতনক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গনতলে;
এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে

মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অ হীন রাতে।

[শেষ অভিসার]

এই কবি-সত্তা, এই শিল্পিসত্ত', এই কাব্যপ্রেরণাদাত্রী জীবনদেবতা চিরকাল জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাঁহার অন্তরে বিহার করিয়া শেষে মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহাব মিলন করাইয়া দিলেন। ইহাই মোটামুটি জীবনদেবত-ভাবেব উৎপাত্ত ও পরিণতির ইতিহাস।

ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয় যে, জীবনদেবতা প্রকৃতপক্ষে কবি-জীবনের মধ্যে পৃথক আধ্যাত্মিক সত্তাবিশিষ্ট কোনো দেবতা নহেন। এই সত্তা তাঁহার কবি-সত্তা—যাহা নিখিল বিশ্বের খণ্ড ও অখণ্ড সৌন্দর্যচেতনা দ্বারা গঠিত হইয়াছে। আর যদি দেবতা বলিতেই হয়, তবে বলা যাইতে পারে—ইহা কবিচিত্তের রস-দেবতা। এই সৌন্দর্যচেতনা, এই রস-চেতনা যখন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও প্রবল হইয়াছে, তখনই কবি ইহাকে তাঁহার অন্তরবিহারী এক অলৌকিক সত্তা বলিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্মজন্মান্তরের নিয়ামক বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

জীবনদেবতা-ধারার আর একটি কবিতা 'সাধনা'। কবির কাব্যপ্রেরণাদায়িনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী জীবনদেবতার চরণে কবি তাঁহার জীবনের সমস্ত 'ব্যর্থ সাধনা, অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফল বাসনা উৎসর্গ করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়-বিহারিণী জীবনদেবতা তাঁহাব সমস্ত বিফলতাকে সফল করিয়া তুলিবেন। মানুষের জীবনের কোনো ব্যর্থ চেষ্টাই নিষ্ফল হয় না। ব্যর্থতাই সফলতার সোপান—ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই সার্থকতার জয়-যাত্রা। খণ্ডের মধ্যেই অখণ্ড আছে, অপূর্ণের মাঝেই পূর্ণ, শেষের মধ্যেই অশেষ। কবির সমস্ত ব্যর্থতা, অপূর্ণতাকে জীবনদেবতা সার্থকতায় রূপান্তরিত করিবেন, এবং জীবন ও কাব্য-প্রচেষ্টাকে সুন্দর ও সার্থক পরিণামের দিকে লইয়া যাইবেন।

'চিত্রা'য় জীবনদেবতা-ধারার শেষ কবিতা 'সিন্ধুপারে'। একটা রহস্যময় ও অপ্রাকৃতিক আবহাওয়া কবিতাটিকে উপভোগ্য করিয়াছে। কবিতার মূল উদ্দেশ্য মনে হয় একটা তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতাকে শুধু কেবল তাঁহার কাব্য-প্রচেষ্টারই নিয়ামক বলিয়া মনে করেন না, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীবনদেবতা তাঁহার জীবন-সূত্রটি ধরিয়া আছেন এবং বিচিত্র সুখ-দুঃখ, ভাঙ-গড়ার মধ্য দিয়া তাঁহাকে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করাইতেছেন—ইহাও তাঁহার বিশ্বাস। সুতরাং জীবনদেবতাই জন্মে জন্মে কবির ব্যক্তি-চেতনার অধীশ্বর। তিনিই পূর্বজীবনে কবির

অস্তিত্বধারা বা প্রাণকে ধারণ করিয়া ছিলেন, এ জীবনেও আছেন এবং পরজীবনেও থাকিবেন। মৃত্যু আসিয়া যখন উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় বুঝি এই বর্তমান জীবন-চেতনা বা প্রাণের অধীশ্বরের নিকট হইতে অন্য কেহ উহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল ; ইহার সহিত সকল সম্বন্ধ বুঝি এই জীবনেই শেষ হইল। কিন্তু এই জীবনের অধীশ্বর জীবনদেবতাই মৃত্যুর ছদ্মরূপে আমাদের প্রাণধারাকে অন্য জীবনে লইয়া যান। মৃত্যুর পরে দেখি সেই পূর্বজীবনের অধীশ্বর চিরপরিচিত জীবন-দেবতাই এ জীবনেও চেতনা-ধারাকে অবলম্বন করিয়া আছেন। এই ভাবটাই রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছে। মৃত্যু-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব নানা কবিতায় নানারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু জীবনেরই অপরদিক—ইহার বিরোধী নয়। মৃত্যু অর্থে জীবনের অবসান নহে,—মৃত্যু চেতনা-ধারাকে নূতন অস্তিত্বের মধ্যে—নবতর জীবনে বহন করিয়া লইয়া যায়।

এক গভীর রাত্রিতে শয্যা হইতে এক অবগুণ্ঠনমুখী অশ্বারোহিণী নারী কবিকে উঠাইয়া লইয়া সিন্ধুপুলিনের এক গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। কবির নিকট সেই স্থান নূতন ও রহস্যময়। সেখানে এই অজ্ঞাত অবগুণ্ঠনবতী নারীর সহিত কবির বিবাহ হইল। কিন্তু চারিচক্ষের মিলন হইল না। নারী বিবাহের সময় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল না। বাসরশয্যায় কৌতূহলী কবি কহিলেন,—

"……সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু।"

… … …

সুধীরে রমণী দুবাহু তুলিয়া,—অবগুণ্ঠনখানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণতলে—
"এখানেও তুমি জীবনদেবতা", কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি,—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছ নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুঃখে,
এ অজানা পুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।

মৃত্যুতে মনে হয় জীবনদেবতার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। তিনিই ইহজীবনে ও পরজীবনে সমানভাবে জীবনের সহিত যুক্ত আছেন।

ঔপন্যাসিক ব্যারিস্টার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে (৬ই চৈত্র, ১৩০২) কবি 'সিন্ধুপারে' কবিতাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"মৃত্যুর পরে 'সিন্ধুপারে' এই জীবনদেবতাই আমাকে চিরপরিচিত প্রিয়মূর্তিতে দেখা দিয়াছিলেন

—আমি মিথ্যা ভয় করিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, যিনি আমাদের এই জীবনলীলাভূমির মাঝখানে আনিয়া আমাদের সহিত খেলা করিয়াছিলেন তিনি বুঝি চিরকালের মতো ছুটি লইলেন, আর একজন অচেনা লোক আমাদের পূর্বাপরের মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে। কিন্তু সে লোকটি যেমনি ঘোমটা তুলিয়া ফেলিল অমনি দেখিলাম, আমাদের সেই চিরকালের সঙ্গীটি একটুখানি ভয় দেখাইয়া আরো যেন অধিকতর ভালোবাসার সঙ্গে কাছে টানিয়া লইল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'রবি-রশ্মি'তে কবির লেখা একটা ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন,—

"যে প্রাণলক্ষ্মীর সঙ্গে ইহজীবনে আমাদের বিচিত্র সুখদুঃখের সম্বন্ধ, মৃত্যুতে আশঙ্কা হয় সেই সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন করে বুঝি আর কেউ নিয়ে গেল। যে নিয়ে যায়, মৃত্যুর ছদ্মবেশে, সেও সেই প্রাণলক্ষ্মী। পরজীবনে সে যখন কালো ঘোমটা খুলবে তখন দেখতে পাবো চিরপরিচিত মুখশ্রী। কোনো পৌরাণিক পরলোকের কথা বলছিনে, সে কথা বলা বাহুল্য, এবং কাব্যরসিকদের কাছে এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, বিবাহের অনুষ্ঠানটা রূপক। পরলোকে আমাদের প্রাণসঙ্গিনীর সঙ্গে ঠিক এই রকম মন্ত্র পড়ে মিলন ঘটবে সে আশা নেই। আসল কথা পুরাতনের সঙ্গে মিলন হবে নূতন আনন্দে।"

(ঘ) 'চিত্রা'র এই ধারার কবিতায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পনার স্বর্গ হইতে, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যচর্চার জীবন হইতে, বাস্তবের মধ্যে, কর্ম ও কর্তব্যের মধ্যে অবতরণ করিতে চাহিতেছেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বৈচিত্র্যের আস্বাদের জন্য কবি চির-লালায়িত। নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে একটি প্রধান ভাবকে চূড়ান্তভাবে উপভোগ করিয়া সেই আবেষ্টনীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া তিনি আবার নূতন ভাবের গণ্ডী গড়িয়াছেন। আবার সেখান হইতে যাত্রা অভিনব ভাব-চক্রের মধ্যে। কোনো ভাবই দীর্ঘদিন তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। 'চিত্রা'র পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও প্রেম-সম্ভোগের পর কবি মনে করিতেছেন যে নিরন্তর এই রসমাধুর্য-সম্ভোগে তাঁহার জীবনের প্রকৃত সার্থকতা পাওয়া যাইতেছে না। বাস্তবের মধ্যে, সংগ্রামের পথে, দুঃখের পথে, সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া জীবনকে উপলব্ধি করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে কবির মধ্যে।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা। বৃহত্তম জীবনের জন্য, পরম সত্যের আদর্শের জন্য কবি-চিত্তে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহারই তীব্রতম প্রকাশ হইয়াছে এই কবিতায়। কল্পনার মোহিনীমায়া-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া, আত্মকেন্দ্রিক ভাববিলাসিতা ত্যাগ করিয়া, কঠিন বাস্তব সংসারে, কঠোর কর্তব্যের মধ্যে অগ্রসর হইবার জন্য কবি নিজেকে উদ্বোধিত করিতেছেন। পৃথিবী দুঃখ-দৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, দুর্বল সবলের হাতে উৎপীড়িত হইতেছে, অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনায় দেশবাসী জর্জরিত। এই সব

ব্যথিত, লাঞ্ছিত, প্রতিকারের উপায়হীন, অসহায় মানুষের জন্য কবি জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন। তাঁহার কাজ হইবে,—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
"মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখন জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।

এই কার্য-সাধনে কবির একমাত্র সহায় তাঁহার বাঁশি—তাঁহার কাব্য-রচনা-শক্তি। তাহার দ্বারাই তিনি এই অসাধ্যসাধন করিবেন। তিনি যদি এই অবসাদগ্রস্ত, দুর্বল, দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষের অন্তরে নূতন আশার সঞ্চার করিতে পারেন, মানবজীবনে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট, মহত্তম ও চিরন্তন—তাহাকে পাইবার জন্য যদি তাহার অন্তরে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারেন, তবেই তাঁহার কাব্য-রচনা সার্থক হইবে—ধন্য হইবে। মানব-জীবনের মহত্তম, বৃহত্তম বস্তুলাভের জন্য কি করিতে হইবে—কবি তাহার নির্দেশ দিতেছেন। ইহাই তাঁহার মহাগীত—কাব্য-রচনার বিষয়বস্তু।

নিজের স্বার্থ, নিজের ভোগ বিসর্জন দিয়া, স্বাদেশিকতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও আত্মীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যদি আমাদের কর্ম, চিন্তা, ত্যাগ ও প্রয়াসকে সুদূর দেশ ও কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেই, তখন একটি সত্তাকে আমরা অপ্রবৃত্তস্বরূপে অনুভব করি—যাহা আমাদের মধ্যে থাকিয়াও, আমাদের ব্যক্তিগত পরিধিকে অতিক্রম করিয়া পরিব্যাপ্ত। সেই সত্তা মহামানবের। তখন এই মহামানবের জন্য আমরা আমাদের প্রাণ ও আত্মসুখকে সানন্দে বিসর্জন দিতে পারি। এই মহামানবকে আমরা উপলব্ধি করি মানুষের পূর্ণতার প্রকাশে—বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে—মানুষের চিরন্তন সম্পদে। এই সব সম্পদ আয়ুর দ্বারা পরিমিত পশু-মানুষের নয়—চির-মানবের বা মহা-মানবের ;—ইতিহাস যাঁহার মধ্য দিয়া সমস্ত সংকীর্ণ গণ্ডী কাটাইয়া সার্বজনীন সত্যরূপকে উদ্ঘাটিত করিতেছে। ভগবানের মধ্যে এই মানবধর্মের চরম পূর্ণতা—এ সংসারের সমস্ত মানব-কল্যাণের, মহৎ আদর্শের উৎসই তিনি। তিনিই নিত্য-মানব, তিনিই মহামানব। তাঁহারই মহান স্বরূপ ও আদর্শকে উপলব্ধি করিয়া যে-

সব মহাত্মা নিজেদের ব্যক্তিগত সীমা উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বমানবের হিতের জন্য সতত প্রয়াসশীল, যাঁহারা এ জগতে এক অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই বৃহত্তম আদর্শবাদী, জনকল্যাণ-নিরত মহাপুরুষরাও এই মহামানবের পর্যায়ভুক্ত।

নিজের স্বার্থ, সুখভোগাকাঙ্ক্ষা ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করিলে সুদূর দেশে ও কালে আমাদিগকে প্রসারিত করিয়া আমরা সর্বমানবীয় ভাব ও কর্মধারার সহিত যুক্ত হইতে পারি। এই আত্মস্বার্থ-বলিদান ও বিশ্বমানবের সেবার পথে আমরা মানব-ধর্মের চরম বিকাশ যাঁহার মধ্যে, সমস্ত মানব-কল্যাণের চিরন্তন উৎস যিনি—সেই ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারিব। তিনিই পরম সত্য আদর্শ—তিনিই মহত্তম জীবনের আদর্শ। এই চরম সত্য উপলব্ধির জন্য—এই মহত্তম জীবনাদর্শ লাভের জন্য, যুগে যুগে মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, জীবন বিসর্জন দিয়াছে, আনন্দের সঙ্গে শত শত অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করিয়াছে ও চরম দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে।

তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তরপানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন—
......................শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।.........

রবীন্দ্র-কাব্যে এই কবিতাটির বৈশিষ্ট্য এই যে, যে-বিশ্বমানবতা তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে বহুরূপে ও বহুভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার একটি চমৎকার প্রকাশ হইয়াছে এই কবিতায়। এই বিশ্বমানবতার পথেই কবি, মানবধর্মের চরম পূর্ণতা যাঁহার মধ্যে, সেই মহামানব ভগবানকে উপলব্ধি করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

কবির মতে এই ত্যাগের পথে, আত্মবিলোপের পথে, কঠিন দুঃখভোগের পথেই

আমরা আমাদের পরম প্রিয়কে লাভ করি। এই দুঃখ-দ্বন্দ্বকেই তিনি মানুষের শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—

"সে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পাথ অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে, সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি চিনা'য় এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই যে কবিতার আরম্ভ।...মাধুর্যের যে শান্তি, এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়। বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়।...এ আহ্বান তো শক্তিকেই আহ্বান, কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়। [আমার ধর্ম, সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪, আত্মপরিচয়—পৃঃ ৫২]

এই কবিতায় কবি-মানসের যে আলোড়ন, তাহার পশ্চাৎ-ভূমিতে সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব আছে বলিয়া 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"দক্ষিণ আফ্রিকায় মাটাবিলিদের উপর ইংরেজ বণিকদের যে অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতেছিল, তাহার কিছু কিছু কাহিনী বিলাতী কাগজ হইতে কবি জানিতে পারেন। মাটাবিলিদের রাজা লবেঙ্গুলা ইংরেজ মিশনারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কি ভাবে সর্বস্ব হারাইয়া অজ্ঞাত, অখ্যাতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল তাহার একমাত্র তুলনা হয় মীর কাশেমের সঙ্গে। দুঃখের এই কাহিনী পাঠ করিয়া কবির মনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহাই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় প্রকাশ হইয়া পড়ে।"

পৃথিবীর দূরপ্রান্তবাসী সম্পূর্ণ অপরিচিত এক অসভ্য জাতির প্রতি অত্যাচারে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় যে ব্যথিত হইল, তাহার কারণ সমগ্র মানবজাতির সহিত আত্মীয়তাবোধ—তাঁহার বিশ্বমানবতা।

অবশ্য বাস্তব জগতে এই আদর্শের দ্বারা, এই মহামানবতাবোধের দ্বারা সর্ব-প্রকার দুর্গতি দূর করিবার আশা কম লোকেই করিয়া থাকে। কবিতাটির প্রথমে কবির যে একটা উদ্দীপনা-পূর্ণ কার্য-তালিকা দেওয়া আছে, তাহাতে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব-সমস্যা সম্বন্ধে কিছু একটা সমাধানের ইঙ্গিত করিবেন, কিন্তু শেষের দিকে যে সমাধানের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে কবিতাটি মানবসম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া অতি ঊর্ধ্বে ভাবলোকে উঠিয়া গিয়াছে। ইহাই ভাববাদী রোমান্টিক কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহাতে কবিতাটি সর্বাঙ্গীণ রস-পরিণতি লাভ করে নাই।

কল্পনা ও ভাববিলাসের জীবন হইতে, শান্তি ও নির্লিপ্ততার জীবন হইতে কবি উত্তেজনাময় কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন 'নগর-সংগীত' কবিতায়। কর্মের ফেনিল মদ্য পান করিয়া তিনি আত্মহারা হইবেন ও সাধারণ বিষয়াসক্ত লোকের ন্যায় তাঁহার কল্পনাকে সংসারের সুখ-দুঃখ উত্থানপতনের মধ্য দিয়া অবাধ গতিতে ছুটাইয়া দিবেন। এই কর্মের উন্মাদনায়

জীবনের এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইবে ও তিনি নব নব আকাঙ্ক্ষা ও কামনার স্বাদ গ্রহণ করিবেন। কবি অসাধ্যসাধন করিতে চাহিতেছেন,—

ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ,
বাহু বাড়াইব তপনে।

তিনি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া পৃথিবীর উপর নিজ আধিপত্য স্থাপন করিবেন,—

ধনসম্পদ করিব নস্য,
লুণ্ঠন করি আনিব শস্য,
অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব
ছুটাব বিশ্বে অভয়ে।

এমন কি, চপলা লক্ষ্মীকেও তিনি বন্দিনী করিবেন,—

শুধু সম্মুখ চলেছি লক্ষ্যি
আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী
তুমিও ছুটিছ চপলা লক্ষ্মী
আলেয়া হাস্যে ধাঁধিয়া;
পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা,
বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা,
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা,
আনিব তোমারে বাঁধিয়া।

মানব-জীবন অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, কালস্রোতে সংসারের সমস্তই ভাসিয়া যাইতেছে; তবুও ক্ষণকালের জন্য কবি এই জীবনকে উপভোগ করিতে চাহেন।

তবে দাও ঢালি—কেবলমাত্র
দু-চারি দিবস, দু-চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র
জন-সংঘাত-মদিরা।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় নানা বিষয়-কর্মে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি কুষ্টিয়াতে একটা বড় রকমের পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কর্মের জন্য তাঁহার মনে যেন প্রবল আবেগ ও আনন্দ সঞ্চারিত হইয়াছিল—তাহারই উচ্ছ্বাসপূর্ণ অভিব্যক্তি এই কবিতাটি। এই কাজের মধ্যে কবি জীবনের একটা সার্থকতা লাভ করিতেছিলেন। এই সময়কার এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্ছি ততই কাজ জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়চে। কর্ম

যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশবাক্যেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করছি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা ; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিস চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে। দেশদেশান্তরের লোক যেখানে বহুদূরে থেকেও মিলেছে, সেইখানে আজ আমি নেমেছি ; মানুষের পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ এই একটা প্রয়োজনের চিরসম্বদ্ধ কর্মের এই সুদূর-প্রসারিত ঔদার্য আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে।" [ছিন্নপত্র, ১৪ই আগস্ট, ১৮৯৫]

(ঙ) 'চিত্রা'র এই ধারার কবিতায় মানবজীবনের অনিবার্য পরিণাম সম্বন্ধে কবির মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। মৃত্যু সম্বন্ধে কবির ধারণা নানা কবিতায় নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই কবিতাতে মৃত্যু যে জীবনের পরিপূর্ণতা সাধন করে এই ভাবটি প্রধানত ব্যক্ত হইয়াছে।

দেহের ক্ষুদ্র আকারের মধ্যে, দেশ-কাল-পাত্রের নির্দিষ্টতার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া যে মানবাত্মা বাস করে, মৃত্যুর পরে উহা অনন্ত জীবনের মধ্যে মিশিয়া গিয়া অনন্ত কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। এই জগতের খণ্ড, ক্ষণিক জীবনে কোনো পরিপূর্ণতা, কোনো সার্থকতা নাই। মৃত্যু খণ্ড জীবনকে অখণ্ড করে, ক্ষণিক জীবনকে অনন্ত করে এবং প্রকৃত সার্থকতা দান করে।

বসিয়া আপন দ্বারে ভালোমন্দ বলো যারে যাহা ইচ্ছা তাই।
অনন্ত জনম মাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে, সে আর সে নাই।

এ জীবনে যাহা অসম্পূর্ণ, নিষ্ফল, ব্যর্থ, মৃত্যুর পরে হয়তো দেখা যাইবে, তাহা অপূর্ব পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করিয়াছে। মৃত্যুই জীবনের পূর্ণ সফলতার সহায়ক।

হেথায় যে অসম্পূর্ণ, সহস্র আঘাতে চূর্ণ, বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার জীবিত কি মৃত।
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন ছিন্ন ছড়াছড়ি,
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি অর্থপূর্ণ করি।
হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময় অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতনরূপে হয় সে সফল।
সে হয়তো দেখিয়াছে পড়ে যাহা ছিল পাছে আজি তাহা আগে,
ছোটো যাহা চিরদিন ছিল অন্ধকারে লীন বড়ো হয়ে জাগে।
যেথায় ঘৃণার সাথে মানুষ আপন হাতে লেপিয়াছে কালি
নূতন নিয়মে সেথা জ্যোতির্ময় উজ্জ্বলতা কে দিয়াছে জ্বালি।

এ জীবনের ব্যর্থতা, অসম্পূর্ণতা পরজীবনে পূর্ণতা লাভ করিবে—ইহা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস,—

জীবনে যত পূজা হলো না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে
হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও
হয়নি হারা।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।...
[গীতাঞ্জলি]

মানুষের এই জীবন অনন্তজীবনের অংশমাত্র। এই সংসারের ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক জীবনকে সংসারের মাপকাঠি দিয়া মাপা বৃথা, ইহা পূর্ণজীবনের—মহাজীবনেরই খণ্ডপ্রকাশ। মৃত্যুই গণ্ডী ভাঙিয়া ক্ষুদ্রকে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করে, এই জীবনকে চিরন্তন জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেয়, জীবনের সত্য পরিচয় জ্ঞাপন করে।

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে বৃহৎ করিয়া
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখো তারে দূরে থুয়ে সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে মাপিয়ো না তারে।
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ, সংসারের পারে॥

খণ্ড কাল ও স্থান যে কবির কাব্যকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না, উহা যে যুগোত্তর ও অবিনাশী, যতদিন মানুষ এই পৃথিবীর বুকে বাস করিবে, ততদিন যুগ-নিরপেক্ষ হইয়া কবির কাব্যের রসাস্বাদন করিবে—রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা '১৪০০ সাল' কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। একশত বৎসর পরেও এই ধরণীতে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্য সমানভাবেই বর্তমান থাকিবে—তাহার ঋতু-পর্যায়ের বিচিত্র রূপ ও রসের কোনো পরিবর্তন ঘটিবে না। পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন হইলেও মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি লোপ পাইবে না।

নববসন্তের যে আনন্দ-উন্মাদনা কবি আজ অনুভব করিতেছেন, একশত বৎসর পরের কবিও তাঁহার নিজের কালের বসন্তদিনের আনন্দ-অনুভূতি দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিবেন এবং নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের রসাস্বাদন করিবেন। ১৪০০ সালের নূতন কবিকে বর্তমান কবি আনন্দ-অভিবাদন প্রেরণ করিতেছেন—

আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।

আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে,
আজি হতে শত বর্ষ পরে॥

'পূরবী'র 'ভাবী কাল' কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিয়াছেন যে দূর ভাবী শতাব্দীর এক সপ্তদশী সুন্দরী তাঁহার কাব্য পাঠ করিতেছে, আর—

হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে,
হয়তো ভাবিছ, "যদি থাকিত সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।"
হয়তো বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়ন-তলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।

৮

চৈতালি

(১৩০৩—পুস্তকাকারে ১৩১৯)

সৌন্দর্য ও প্রেমের যে নিবিড় অনুভূতি আমরা 'চিত্রা'য় দেখিতে পাই, 'চৈতালি'তে তাহা পরিণতির শেষ স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইয়া যে সৌন্দর্যস্রোত প্রবাহিত, মানব-জীবনের শত শত বৈচিত্র্যময় প্রকাশে প্রেমের যে অমৃত-প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে—কবি মনের আনন্দে এতদিন সেই পুণ্য-সলিলে ক্রীড়া করিয়াছেন। এই বিশ্বসৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি জগতের মধ্য হইতে ও জগদতীত করিয়া, খণ্ডে ও অখণ্ডে, রূপে ও ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন, প্রকৃতিজীবন ও মানবজীবন সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এক বিরাট ঐক্যে নিয়ন্ত্রিত—ইহাদের বিচিত্র খণ্ডপ্রকাশের মূলে অখণ্ডতা বিরাজমান—কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়—স্বতন্ত্র নয়। তিনি বুঝিয়াছেন, এই ধরণীর ধূলিকণা পর্যন্তও অপূর্ব গৌরবে গৌরবান্বিত; কিছুই নিরর্থক নয়—ব্যর্থ নয়। সবই সৌন্দর্যময়, মধুময়, অমৃতময়। সৌন্দর্য-সাধনা,

প্রেম-সাধনা ও সমস্ত রস-সাধনা তাঁহার সার্থক হইয়াছে। সুনিবিড় আত্মতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার স্নিগ্ধোজ্জ্বল শান্তিতে তাঁহার চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে। এই পরমতৃপ্তি ও পূর্ণতার সুর 'চৈতালি'তে ধ্বনিত হইয়াছে। 'সোনারতরী-চিত্রা'-যুগের সুতীব্র রসানুভূতি 'চৈতালি'তে একটা সংহত মূর্তি ধারণ করিয়াছে, যেন সমস্ত রসজীবনের মূল সূত্রটি আবিষ্কারের আনন্দে কবি-চিত্ত ভরপুর। শান্ত পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নে কবি জগৎ ও জীবনকে আবার যেন একটু নূতন করিয়া দেখিতেছেন।

এই পরিবর্তিত দৃষ্টিতে কবি দেখিতেছেন—জগতের কিছু তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়; ক্ষুদ্র, নগণ্য মানুষের সুখ-দুঃখও বৃহৎ তাৎপর্যে ও সার্থকতার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবি-মানসের দৃষ্টিভঙ্গীই এই, তবুও প্রকৃতি ও মানবকে, জগৎ ও জীবনকে 'চৈতালি'র পূর্বযুগে যে আবেগ, কল্পনা ও সংগীতে অনুভব করিয়াছিলেন, 'চৈতালি'তে যেন তাহার একটু পরিবর্তন হইয়াছে। তীব্র অনুভূতি যেন গভীর উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে। শান্ত, সমাহিত চিত্তে যেন কবি জগৎ ও জীবনের সত্য-দর্শন করিতেছেন, আর ধীরে ধীরে তাহা ব্যক্ত করিতেছেন। 'চৈতালির কবিতাগুলির মধ্যে ইহা অনেকটা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কবিতার আকার সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, ভাষায় সেই অজস্র অলঙ্কারের ঐশ্বর্য ও চমৎকারিত্ব নাই, সেই বিপুল আবেগ, সমুন্নত কল্পনা ও সংগীতময় বিচিত্র ছন্দ-নৃত্যের প্রকাশ নাই। ইহারা যেন উপলব্ধ সত্যের অনাড়ম্বর প্রকাশ—কবির জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে বিশিষ্ট দর্শনের মূল্যবান দলিল।

কবির কাব্য-সৃষ্টি যে একটা মোড় ঘুরিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। বিশ্বজীবনের সকল সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য কবির চিরকালের উপভোগের সামগ্রী, কিন্তু 'চৈতালি'তে দেখি, প্রকৃতিজীবন অপেক্ষা মানবজীবনের উপর কবির দৃষ্টি বেশী পড়িয়াছে। সোনার তরীর 'বৈষ্ণব কবিতা', চিত্রার 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতায় কবি মানবকে গৌরব ও মহিমা দান করিয়াছেন। 'চৈতালি'তে অতি সাধারণ মানুষের জীবন ও তাহার তুচ্ছতম ঘটনার মধ্যে তিনি অসীম গৌরব ও মহত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। পল্লীর দরিদ্র ও সামান্য নরনারীর জীবনযাত্রা তাঁহার সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে ও তাহাদের মনুষ্যত্বে কবি মুগ্ধ হইয়াছেন। 'চৈতালি'তে কবি মানবকে এক নূতন গরিমা ও মহিমায় দেখিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব-জীবন যাহারা এই ধরণীর বুকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া দুঃখ-সুখে, হাসি-কান্নার মধ্য দিয়া সংসার করিতেছে, তাহাদের কর্ম, চিন্তা, প্রয়াস কিছুই নিরর্থক নয়, গভীর তাৎপর্যে মহিমান্বিত। এই ধরণী সত্য ও সুন্দর, এবং ইহার বক্ষোবিহারী মানবও সত্য ও সুন্দর—নিখিল সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ,

ইহারা তাহারই ব্যক্ত রূপ। ক্ষুদ্র 'চৈতালি' কাব্যখানি ধরণীকে সত্য ও সুন্দর ভাবে গ্রহণের তৃপ্তি ও চরিতার্থতা ও মানব-মহিমার জয় ঘোষণা করিতেছে।

মানবের বৃহৎভাব ও আদর্শের দিকে কবি যেন একটু ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন বলিয়া মনে হয়। মানুষের সত্য ও ন্যায়ের জন্য যে স্বার্থত্যাগ, যে দেশপ্রেম, ধর্মবিশ্বাসের জন্য যে আত্মদান, কর্তব্যপালনের জন্য যে দুঃখবরণ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রমাণ করে, মানবত্বের সেই বৃহৎভাব ও আদর্শের দিকে কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য কবির পরবর্তী কাব্যসৃষ্টি 'কথা' এবং 'কাহিনী'তে আমরা ইহার পূর্ণ পরিচয় পাই, কিন্তু এই গ্রন্থ হইতেই তাহার সূচনার আভাস পাওয়া যায়। কবির মতে এই মনুষ্যত্বের, এই বৃহৎ ভাব ও আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইয়াছে প্রাচীন ভারতের সাধনা ও ঐতিহ্যের মধ্যে। মহৎ জীবনের মহিমা, পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শে কবি দেখিয়াছেন প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে—তাহার ভাব, চিন্তা, কর্ম, তপস্যা ও জীবনযাপন-প্রণালীতে। পরিপূর্ণ মানবতার উদ্বোধনে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আদর্শ যে বিশেষ উপযোগী—ইহাই কবির স্থির বিশ্বাস। প্রাচীন ভারতের সাধনার মূলে আছে—নিখিল বিশ্বকে অখণ্ডরূপে, সমগ্ররূপে, সর্ববিষয়ে উপলব্ধি করা। পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শকেই প্রাচীন ভারত জীবনে অনুসরণ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে ও কাব্যে এই পরিপূর্ণতার, সমগ্রতার, অখণ্ডতার উপাসক। ইহাই শান্তিনিকেতনে, বিশ্বভারতীতে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে এবং দীর্ঘকালের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও বোধ বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ইহার অখণ্ড বিশ্ববোধ, ইহার পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ যে রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে, তাহার প্রথম আভাস আমরা 'চৈতালি'তে পাই এবং ইহার পরিপূর্ণরূপ দেখি 'নৈবেদ্যে'। রবীন্দ্র-কাব্য-সৃষ্টি-প্রবাহে 'চৈতালি' এমন একটি স্থান, যেখান হইতে স্রোত পূর্বনির্দিষ্ট ধারা হইতে একটু বাঁকিয়া ভিন্নমুখী হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত 'কাব্য-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় কবি লিখিয়াছিলেন,—

"চৈতালি শীর্ষ কবিতাগুলি লেখকের সর্বশেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্রমাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন,—

"কবি তাঁহার কাব্য-জীবনের এক এক পর্যায়ের প্রান্তে আসিয়া প্রায়ই মনে করিয়াছেন ইহাই তাঁহার সর্বশেষ লেখা, তাঁহার কবি-জীবনের শেষ ফসল। এই কবিতাগুলিকে কবি তাঁহার প্রতিভার শেষ দান

মনে করিয়া ইহার নাম চৈতালি রাখিয়াছিলেন, যেমন পরে কবি বারংবার নিজের কাব্যের সমাপ্তিসূচক নাম রাখিয়াছেন—খেয়া, পূরবী, পরিশেষ, শেষের কবিতা। কিন্তু তাঁহার জীবনদেবতা তাঁহাকে দিয়া 'পুনশ্চ' লেখাইয়া ছাড়িয়াছেন।"

তবে একথা ঠিক বলিয়া মনে হয় যে, একটা দীর্ঘজীবনব্যাপী বিশিষ্ট ধারার কাব্যপ্রচেষ্টার ইহাই শেষ উৎপন্ন শস্য। 'চিত্রা' পর্যন্ত কবির কাব্য-মন্দিরে সৌন্দর্য, প্রেম, মাধুর্য ও বিচিত্ররসের মহামহোৎসব চলিয়াছে। 'মানসী-সোনারতরী-চিত্রা'র যুগেই রবীন্দ্রনাথের রস-জীবনের পরম প্রকাশ হইয়াছে। 'চৈতালি' হইতে কবির কাব্যে এক নবযুগের অরুণোদয়ের আভাস পাওয়া যায়।

'চৈতালি'র প্রথম কবিতা একটি শেষ পরিণতির চিত্র। মৃত্তিকা-জল-বায়ু হইতে গাছ তাহার জীবনী-শক্তি সংগ্রহ করিয়া পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হয়, শেষে ফলপ্রসবে সে সার্থকতা লাভ করে। ফল যখন পরিপক্ক হয়, তখন পুষ্পের, ফলের চরম পরিণতি উপস্থিত হয়। তখন ফলকে হয় ঝরিয়া যাইতে হইবে, না হয় কেহ তুলিয়া লইবে। বৃক্ষের ক্রমবিকাশের পথে এক পর্যায়ের ইহাই শেষ পরিণতি। কবির হৃদয়-কুঞ্জবনের দ্রাক্ষাফলগুলি আজ সুপরিপক্ক—রসের উচ্ছ্বাসে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। দ্রাক্ষালতার জীবনে একটা পরিপূর্ণতা আসিয়াছে, কিন্তু সে পরিপূর্ণতার কোনো সার্থকতা নাই যদি তাহা কেহ উপভোগ না করে। তাই কবি তাঁহার কাব্য-প্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী জীবনদেবতাকে আহ্বান করিয়া কবি-চিত্তের সকল ফল-সম্ভার, সমস্ত সম্পদ ও ঐশ্বর্য উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন।—

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে;
... ...
তুমি এসো নিকুঞ্জ নিবাসে
এসো মোর সার্থক-সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল;

কবির এই পূর্ণতার বোধ জগৎ ও জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া চৈতালির কবিতাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য রচনা করিয়াছে। 'চৈতালি'র মধ্যে কবি-চিত্তের নিম্নলিখিত ভাব-ধারাগুলি লক্ষ্য করা যায়,—

(ক) সুখদুঃখপূর্ণ এই ধরণী ও মানবজীবনকে ভালোবাসা ও ইহাদের মহিমা

উপলব্ধি,—'ধরাতল', 'প্রভাত', 'দুর্লভ জন্ম', 'দেবতার বিদায়', 'পুণ্যের হিসাব', 'বৈরাগ্য', 'শেষকথা', 'বর্ষশেষ', 'অভয়' ইত্যাদি কবিতা।

(খ) তুচ্ছতম মানবজীবন ও তাহার ক্ষুদ্র কর্ম ও হৃদয়বৃত্তির মধ্যে অসামান্যতা দর্শন,—'দিদি', 'পরিচয়', 'পুঁটু', 'দুই বন্ধু', 'সঙ্গী', 'স্নেহদৃশ্য', 'অনন্ত পথে', 'ক্ষণমিলন', 'সতী' ইত্যাদি।

(গ) ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতি অনুরাগ,—'সভ্যতার প্রতি', 'তপোবন', 'প্রাচীন ভারত', 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'কালিদাসের প্রতি' ইত্যাদি।

(ঘ) পরিপূর্ণ মানবভাব আদর্শের সহিত বাঙালীজীবনের তুলনা ও সেজন্য বেদনাবোধ,—'স্নেহগ্রাস', 'বঙ্গমাতা'।

(ঙ) নারী ও প্রেমের স্বরূপ-নিরূপণ—'মানসী', 'নারী', 'প্রিয়া', 'ধ্যান' ইত্যাদি।

(ক) এই ধরাতল কবির চোখে অপূর্বসৌন্দর্যমণ্ডিত বোধ হইতেছে এবং কবি ইহাকে সকল অবস্থায় গভীরভাবে ভালোবাসিতেছেন,—

ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো। [প্রভাত]
ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো। [ধরাতল]

এই সুন্দর ধরাতলে জন্মলাভ দুর্লভ - বহুভাগ্যসাপেক্ষ,—

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজ মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ। [দুর্লভ জন্ম]

এই ক্ষুদ্র, সুখদুঃখপূর্ণ, ক্ষণিক মানব-জীবন মহান্ গৌরব ও মহিমায় সমৃদ্ধ। 'দেবতার বিদায়' কবিতায় দেখা যায়, দরিদ্র ভিখারীরূপে ভগবান দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন, গৃহহীন, বস্ত্রহীন, অন্নহীন ভিখারীকে ভালোবাসিলে ভগবানকে পাওয়া যায়। মালাজপ-নিরত প্রবীণ ভক্ত ভিখারীকে অপবিত্রজ্ঞানে মন্দির হইতে তাড়াইয়া দিল। তারপর—

সে কহিল, "চলিলাম"—চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কী ছল ছলিলে।"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

কবি মনে করেন, এই সংসারকে আঁকড়িয়া ধরা, ইহাকে ভালোবাসাতেই পুণ্য। 'পুণ্যের হিসাব' কবিতায় দেখি যে এক সাধু স্বর্গে গিয়া দেখেন যে যতদিন তিনি সংসারকে ভালোবাসিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার হিসাবে অনেক পুণ্য জমা আছে, আর যখন সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার হিসাবে কোনো পুণ্যই জমা নাই। ইহাতে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

চিত্রগুপ্ত হেসে বলে—বড় কঠিন বুঝা,
যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।

'বৈরাগ্য' কবিতায় কবি মনে করিয়াছেন, এই সংসারের স্ত্রী পুত্র পরিজনের মধ্যেই ভগবানের আসন পাতা, ইহাদিগকে ত্যাগ করিলে ভগবানকেই ত্যাগ করা হয়। স্ত্রী পুত্র পরিজন ত্যাগ করিয়া সংসারবিরাগী ব্যক্তি ইষ্টদেবের সন্ধানে গৃহত্যাগ করিলে

দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন—হায়
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।

কবি ক্ষুদ্র বৃহৎ-ভালো মন্দ সমস্ত লইয়া এই ধরার মধ্যেই চিরসুন্দরের প্রকাশ দেখিয়াছেন এবং এই সংসারের মধ্যে থাকিয়া আনন্দ অনুভব করাই সেই চিরানন্দময় ভগবানের উপাসনা বলিয়া মনে করিয়াছেন।

ত[illegible] বুক মেটে শু[illegible] আমি —
হে চিরসুন্দর আমি তোরে ভালোবাসি।
[শেষ কথা]

মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি
আপনারে ভাগ করে শত ভাগ করি।
[বর্ষশেষ]

আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।
[অন্তর]

(খ) পশ্চিমী মজুরের ছোট মেয়েটির কর্মব্যস্ততা ও তাহার দায়িত্বগ্রহণ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে,—

ভরা ঘট লয়ে মাথে
বামকক্ষে থালি, যায় বালা ডানহাতে
ধরি শিশুকর, জননীর প্রতিনিধি
কর্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি।
[দিদি]

একটি অপরিচিতা ছোটমেয়ের জীবন-সূত্র যে কোথায় যাইয়া শেষ হইবে কবি তাহাই ভাবিতেছেন,—

কোন্ অজানিত গ্রামে কোন্ দূর দেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ,—তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়।

[অনন্ত পথে]

ইতর প্রাণীর প্রতি মানুষের স্নেহও কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। বৃহৎকায় মহিষ পুটুরাণীর প্রতি স্নেহ মানুষের হৃদয়-ধর্মেরই জয়-ঘোষণা করে,—

যে পশুরে জন্ম হতে আপনার জানি,
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুঁটুরাণী।
বুদ্ধি শুনে হেসে উঠে, বলে, কী মূঢ়তা।
হৃদয় লজ্জায় ঢাকে হৃদয়েরি কথা।

[হৃদয়ধর্ম]

অস্থিচর্মসার কুড়ি বছরের ছেলের শীর্ণ, রোগজীর্ণ দেহখানি শিশুর মতো কোলে করিয়া মাতা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে প্রতিদিন রাস্তার ধারে লইয়া আসেন। রুগ্ণ ছেলে সংসারের কোনো সুখগ্রহণ করিতে পারে না—উদাসীন, হাসিহীন তাহার মুখ। সংসারের সর্বসুখবঞ্চিত পুত্রের প্রতি গভীর স্নেহ ও সমবেদনায় মায়ের মন পূর্ণ। একটু ক্ষীণ আশা তাঁহার এই,—

আসে যায় রেলগাড়ি, ধায় লোকজন,—
যে চাঞ্চল্যে মুমূর্ষুর অনাসক্ত মন
যদি কিছু ফিরে চায় জগতের পানে,
এইটুকু আশা ধরি মা তাহারে আনে।

[স্নেহদৃশ্য]

মাতার এই মূঢ় ভালোবাসার মধ্যে যে অনির্বচনীয়ত্ব আছে, কবিকে তাহাই আকৃষ্ট করিয়াছে।

এক দোকানীর ছেলে গাড়িচাপা পড়ায় এক বেশ্যা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। নারী যে অবস্থার মধ্যেই থাকুক না কেন, তার চিরন্তন মাতৃহৃদয় কখনো নষ্ট হয় না। নিন্দিত জীবন মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহনির্ঝরকে শুষ্ক করিতে পারে না। তাই

সহসা উঠিল শূন্যে বিলাপ কাহার,
স্বর্গে যেন মায়াদেবী করে হাহাকার।
ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখি স্খলিতবসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা। [করুণা]

এই বারাঙ্গনাকে কবি অসীম সহানুভূতির দৃষ্টি লইয়া দেখিয়াছেন। তাহার নিন্দিত জীবনের পিছনে যে কতো সত্য-মিথ্যার ইতিহাস লুকানো আছে, তাহা ভগবানই জানেন,—তাঁহার মনের সত্য পরিচয়ও তিনিই কেবল জানেন।

সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা।
... ...
তারি মাঝে বসি আছে পতিতা রমণী
মর্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতীশিরোমণি।
হেরি তারে সতীগর্বে গরবিনী যত
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত।
তুমি কী জানিবে বার্তা, অন্তর্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্বকাহিনী।

[সতী]

এই ধরাতলে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরিচয় অল্পকালের—অসীম কালের মধ্যে অনন্ত যাত্রাপথে দু'দণ্ডের জন্য মাত্র। তবুও এই ক্ষণিক মিলনে আত্মীয়স্বজনকে মনে হয় চিরকালের।

এ ক্ষণ-মিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর!
মুহূর্ত-আলোকে কেন, হে অন্তরতম
তোমারে চিনিনু চিরপরিচিত মম?

[ক্ষণ মিলন]

মানবের স্নেহ-প্রেম যে অনন্তত্বের উপলব্ধি, তাই তাহার স্নেহ-প্রেমের পাত্র-পাত্রীকে নিত্যকালের বলিয়া মনে হয়।

(গ) ভারতের সাধনা, তাহার আনুষঙ্গিক জীবনযাত্রা, তাহার কাব্য-পুরাণ-ধর্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য, ত্যাগ ও ভোগের অপূর্ব সামঞ্জস্যের আদর্শের দিকে কবি যে ক্রমাগত গভীরভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন, 'চৈতালি'র মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। বর্তমানের বস্তুভার-পীড়িত মনুষ্যত্বনাশী নাগরিক সভ্যতার কবল হইতে মুক্ত হইয়া কবি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও জীবনধারার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন,—

হে নব-সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,

নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি।

[সভ্যতার প্রতি]

প্রাচীন ভারতের 'তপোবন' কবির চিত্তে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ও গরিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের রাজশক্তি তপোবনের নিকট হইতেই তাহার ভোগ ও ত্যাগের সম্মিলিত আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে—ঋষিগণকে গুরু-স্বরূপ মানিয়া তাঁহাদের নিকট হইতেই ঐহিক ও পারত্রিক উপদেশ লইয়াছে; শেষ বয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপোবনেই আশ্রয় লইয়াছে।

রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি.........

শেষে

প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্বকেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

[তপোবন]

প্রাচীন ভারতের সমস্ত প্রদেশব্যাপী শক্তির ঐশ্বর্য প্রকট হইলেও

ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা। [প্রাচীন ভারত]

প্রাচীন ভারতের কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে কবি কালিদাসের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের প্রভাব খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার', 'শকুন্তলা' রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও ভাবাবেগকে যে অনেকখানি অনুরঞ্জিত করিয়াছে, ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। কালিদাসের কাব্য যে তাঁহার নিজেরই জীবনের রূপান্তর বা প্রতিচ্ছবি, এই ধারণা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের। 'ঋতুসংহারে' কালিদাস তাঁহার প্রিয়ার নিকট ষড়্‌ঋতুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন, আর 'মেঘদূতে' নির্বাসিত যক্ষের বেদনায় নিজের প্রিয়া-বিরহ-বেদনা ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেছেন, কালিদাস তাঁহার কল্পনার কুঞ্জবনে—যৌবনের রাজসিংহাসনে প্রিয়ার সহিত বসিয়া আছেন; ষড়্‌ঋতুরা ছয় সেবাদাসীর মতো, তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে ও তাঁহাদের

যৌবন-তৃষ্ণাকাতর মুখে নানাবর্ণময়ী মদিরা তুলিয়া দিতেছে। এই সংসার যেন তাঁহাদের বাসরঘর—সেখানে

নাই দুঃখ নাই দৈন্য নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী।

[ঋতুসংহার]

তারপর, অকস্মাৎ দেবতার অভিশাপে কবির সে সুখরাজ্য ছারখার হইয়া গেল, প্রিয়ার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিল; ষড়্‌ঋতু সভা ভঙ্গ করিয়া চামরমছত্র, পানপাত্র প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া দূরে পলাইয়া গেল। যৌবন-বসন্তের রঙীন ধরার পরিবর্তে আষাঢ়ের অশ্রুমুখী ধরণীর আবির্ভাব হইল। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূতে'র দুইটি বিভিন্নমুখী চিত্রের মতো। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিয়াছেন যে কালিদাস তাঁহার কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন। কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরের সেবক ও তাঁহার কল্পিত অলকার অধিবাসী ছিলেন এবং শিবের নৃত্যের তালে তালে বন্দনাগান গাহিতেন। গানের শেষে পার্বতী তুষ্ট হইয়া

কণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়াপরে।

'কুমারসম্ভব কাব্য কালিদাসের প্রথম বয়সের লেখা। সপ্তম সর্গ পর্যন্ত কালিদাসের লেখা ও উহার পরবর্তী সর্গগুলি অন্য কোনো কবির রচনার পরবর্তী সংযোজন, ইহাই কাব্য রসিকদের মত। কারণ হর-পার্বতী কালিদাসের উপাস্য হওয়ায় কবির পক্ষে সাধারণ নায়ক নায়িকার ন্যায় তাঁহাদের বিহার-বর্ণনা করা অস্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, কালিদাস বিহার-বর্ণনা আরম্ভ করিলে দেব-দম্পতীর লজ্জা দেখিয়া সপ্তম সর্গের পরে আর অগ্রসর হন নাই,—

কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

[কুমারসম্ভব গান]

রবীন্দ্রনাথের ধারণা যে, ব্যক্তিগত জীবনে কবি অনেক দুঃখ-দুর্ভাগ্যের আঘাত সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু নীলকণ্ঠের মতো সে বিষ পান করিয়া জগৎকে অপূর্ব কাব্যামৃত দান করিয়াছেন,—

জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান। [কাব্য]

(ঘ) বাঙালী-জীবনের খণ্ডতা, পঙ্গুতা, ও ক্ষুদ্রতা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আঘাত করিয়াছে। পরিপূর্ণতার, সমগ্রতার আদর্শ হইতে বিচ্যুত কুসংস্কারাপন্ন, গৃহকোণ-

প্রিয় বাঙালীকে তাহার পঙ্গু জীবনযাত্রা হইতে উদ্ধার করিয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র ও বিরাট জীবনের মধ্যে পরিচালনা করিবার জন্য কবির প্রাণে জাগিয়াছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা। চির-স্নেহময়ী বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন,—

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি।
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহ-কারাগারে,
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
... ...
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার,
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।

[স্নেহগ্রাস]

আবার বলিতেছেন,—

পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ, শান্ত, সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি।

[বঙ্গমাতা]

(ঙ) নারী পুরুষের মনের সৃষ্টি। পুরুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ নারীতে রূপায়িত হইয়া তাহাকে অতো সুন্দর ও মধুর করিয়াছে। কেবলমাত্র বিধাতাই নারীকে সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, পুরুষের কামনা-বাসনা-কল্পনা তাহাকে অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্য দান করিয়াছে। কবি ও শিল্পী নিজের 'মনের মাধুরী' দিয়াই নারীকে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন,

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।
... ...
পড়েছে তোমারে 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা। [মানসী]

পুরুষের চিত্তেই সৌন্দর্যময়ী নারীর জন্ম, তাই জগতের সমস্ত সৌন্দর্যে পুরুষ নারীকেই প্রত্যক্ষ করে। কবি বলিতেছেন,—

যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে,
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।
যখন তোমারে দেখি মনোমাঝখানে,
মনে হয় জন্ম জন্ম আছ এ পরানে।
মানসরূপিণী তুমি তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্যসাথে যাও মিলে মিশে।

[নারী]

কবি তাঁহার প্রিয়াকে আর ক্ষুদ্র, খণ্ড করিয়া দেখিতে চাহেন না। প্রিয়ার অপরূপ সৌন্দর্যের মায়ারশ্মিতে সারা বিশ্ব কবির নিকট আলোকিত হইয়াছে,—প্রিয়াই বিশ্বের পথ-প্রদর্শক,—

যখন তোমার পরে পড়েনি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।
... ...
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

[প্রিয়া]

কবি তাঁহার প্রিয়াকে যতো ভালবাসিতেছেন, যতো বড় করিয়া দেখিতেছেন, ততই তাহার সত্য-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতেছেন। অনন্ত প্রেমের প্রতীক সে। কবি কল্পনা করিতেছেন,—

নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ড পল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল।
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমা-মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

[ধ্যান]

৯

কণিকা

(১৩০৬)

জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে দেখার ফলে রবীন্দ্র-প্রতিভা 'কণিকায় এক অভিনব সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করিয়াছে। জগতের প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুকে অ-সাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও সত্যকে কবি অতি অল্প কথায় অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের তলদেশে গভীর জ্ঞান, নিপুণ শ্লেষ ও প্রচ্ছন্ন নীতির একটা ধারা প্রবাহিত হওয়ায় এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি বাংলা-সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদে পরিণত হইয়াছে। অতি ক্ষুদ্রাবয়ব এক একটি কবিতার মধ্যে এক একটি ভাব চমৎকার উপমা, শ্লেষ ও আপাত-বৈষম্যের সাহায্যে পাঠকের চিত্তে অপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, এবং উহার সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য ও সর্বশেষে উহার ইঙ্গিত, মুগ্ধ পাঠকের চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। ইহা একপ্রকার কবিত্বের মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া জ্ঞান পরিবেষণের রূপ। ইহার পরবর্তী সংগ্রহ 'লেখন' ও 'স্ফুলিঙ্গ' গ্রন্থে এই প্রকার রচনার পূর্ণরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই প্রকার রচনাকে সাধারণত এপিগ্রাম বলে। সমাধি-স্তম্ভের উপর খোদিত করিবার জন্য সংক্ষিপ্ত, সরল অথচ অর্থগৌরবে মূল্যবান্ এক শ্রেণীর কবিতার সৃষ্টি হয়। উহাই এপিগ্রাম। তারপর সমাধিস্তম্ভের উদ্দেশ্যের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া এইপ্রকার এপিগ্রাম কবিতা একটি বিশিষ্ট শ্রেণী-মর্যাদা লাভ করিয়া সাধারণ পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিতে থাকে। অতি অল্পকথায়, সমস্ত বাহুল্য বর্জন করিয়া সত্যের কবিত্বময় রূপপ্রদর্শন ও তাহার সহিত প্রচ্ছন্ন জ্ঞান ও শিক্ষার একটা ইঙ্গিত এই-জাতীয় কবিতাকে জনপ্রিয় করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই-জাতীয় কবিতার প্রথম প্রচলন হয়, ও পরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ইহা ছড়াইয়া পড়ে। ইংরেজী সাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনা-কৌশলের জন্য পোপ বিখ্যাত। সংস্কৃত-সাহিত্যে অনেক 'উদ্ভটশ্লোক' এই প্রকার রচনার নিদর্শন। হিন্দী-সাহিত্যে 'কুণ্ডলিয়া' ছন্দে রচিত কবি গিরিধরের অনেক কবিতা কতকটা এই প্রকার রচনার অনুরূপ। অতি সূক্ষ্মদর্শন, তত্ত্বের ইঙ্গিত ও প্রকাশভঙ্গীর শিল্প-গরিমায় রবীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

অতি সাধারণ বস্তু ও ব্যাপারের মধ্যে কবি কেমন গভীর তত্ত্ব ও সত্যের

ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা 'কণিকা'র কয়েকটি কবিতা পড়িলেই বেশ বুঝা যায় :—

গৃহভেদ

আম্র কহে, একদিন হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই।
মানুষ লইয়া এলো আপনার রুচি,
মূল্যভেদ সুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি॥

একই পথ

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি॥

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী॥

অকৃতজ্ঞ

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে॥

মাঝারির সতর্কতা

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে॥

অসম্ভব ভালো

যথাসাধ্য-ভালো বলে, ওগো আরো-ভালো,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাকো আলো।
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়॥

মোহ

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,—
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।

বিরাম

বিরাম কাজেরই অঙ্গ, একসাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।

চালক

অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি'
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি॥

সৌন্দর্যের সংযম

নর কহে, 'বীর মোরা যাহা ইচ্ছা করি।'
নারী কহে জিহ্বা কাটি' 'শুনে লাজে মরি।'
'পদে পদে বাধা তব' কহে তারে নর।
কবি কহে, 'তাই নারী হয়েছে সুন্দর'॥

১০

কথা

(১৩০৬)

'চৈতালি'তে দেখা গিয়াছে যে, রবীন্দ্র-কবি-মানস 'মানসী-সোনারতরী-চিত্রা'র পথ হইতে ভিন্নপথে মোড় ফিরিয়াছে। কবি এতদিন প্রকৃতি ও মানুষের সৌন্দর্য ও প্রেমে তন্ময় হইয়া ছিলেন। এখন আর সে সৌন্দর্য-প্রেম সাধনায় কবি-চিত্ত তৃপ্তি পাইতেছে না। বৃহৎ ভাব, মহৎ আদর্শ, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশের প্রতি কবি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেছেন। কেবল রসসম্ভোগ—কেবল শিল্পীর জীবনই তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। তিনি জীবনকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে চাহেন—নূতন সাধনার পথে অগ্রসর হইতে চাহেন। যে বৃহৎ জীবনের জন্য তাঁহার চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশ তিনি দেখিতেছেন ভারতের ইতিহাসের মধ্যে, তাহার কাব্য-পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থের মধ্যে। সত্যের জন্য, ধর্মবিশ্বাসের জন্য প্রাণদান, অপূর্ব স্বার্থত্যাগ, শত্রুকে ক্ষমা, বীরের ধর্মপালন, স্বদেশের জন্য ত্যাগ ও নির্ভীকতা প্রভৃতি যাহা মানব-মহত্ত্বের নিদর্শন, কবি সেগুলি ভারতের ইতিহাস ও পুরাণের আখ্যায়িকার মধ্যে পাইয়াছেন, এবং অসাধারণ কবিত্বের মায়ারশ্মি নিক্ষেপে সেই আখ্যায়িকাগুলিকে অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য দান করিয়াছেন। 'চৈতালি'তে দেখা গিয়াছে যে কবি প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, তাহার তপোবন-আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। কারণ, এই আদর্শের মধ্যে মানবত্বের চরম বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা। ভারতের সাহিত্য ও পুরাণের মধ্যে, উপনিষদের উপাখ্যানে, শিখ-রাজপুত-মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাসে এই ভারত-আদর্শের—এই মানব-মহত্ত্বের—অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এই দৃষ্টান্তগুলিকে কবি অপরূপ কবিত্বমণ্ডিত গাথায় প্রকাশ করিয়া ভারতের ত্যাগ ও মহত্ত্বের আদর্শকে রূপদান করিয়াছেন। এই গাথাগুলিই 'কথা' কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু।

'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতায় এক দীন-দরিদ্র-নারী উলঙ্গ হইয়া অরণ্যের আড়ালে লজ্জা গোপন করিয়া তাহার একমাত্র পরিধেয় বস্ত্রখানি বুদ্ধদেবের জন্য দান করিল। এই দান নারীর স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার উর্ধ্বে উঠিয়া আত্মবিলোপী মহান্ ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে পরিণত হইয়াছে। ইহা ধনীর অপরিসীম ঐশ্বর্যের কিঞ্চিন্মাত্র দান নহে—ইহা ভিখারিনী নারীর বস্তুগত ও হৃদয়গত সর্বস্ব দান।

ধনীর রাশি রাশি স্বর্ণ উপেক্ষা করিয়া, বুদ্ধশিষ্য অনাথপিণ্ডদ ইহাকেই মহাভিক্ষুক বুদ্ধের জন্য উপযুক্ত দান বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

'প্রতিনিধি' কবিতায় দেখি শিবাজী নিজ রাজ্য-রাজধানী তাঁহার গুরু রামদাস স্বামীকে দান করিয়া গুরুর সহিত ভিক্ষায় বাহির হইলেন। শেষে গুরুর আদেশে তাঁহারই প্রতিনিধি হইয়া পুনর্বার রাজ্য গ্রহণ করিলেন। রাজার অভিমান, দর্প চূর্ণ হইল, ঐশ্বর্য-তৃষ্ণা ও ভোগলিপ্সা দূর হইল,—সমস্ত বিষয়ভোগতৃষ্ণা হইতে মুক্ত শিবাজী রাজ্যহীন রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ত্যাগের চরম নিদর্শন ইহাই। সমস্ত ঐশ্বর্যে পরিবেষ্টিত হইয়াও, নিষ্কাম ও উদাসীনের মতো কেবল প্রজাবর্গের সুখশান্তি বিধানের জন্য, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে রাজ-ধর্ম পালন প্রাচীন ভারতের রাজার আদর্শ। শিবাজীকে কবি সেই আদর্শের প্রতীকরূপে দেখিতে চাহিতেছেন। ইহাই ভোগের আবরণে বিরাট ত্যাগ।

লৌকিক ধর্ম, চিরাচরিত প্রথা ও সামাজিক সংস্কার বর্জন করিয়া সত্য-ধর্মকে গ্রহণ করার সৎসাহস দেখাইয়াছেন ঋষি গৌতম 'ব্রাহ্মণ' কবিতায়। বিদ্যার জন্য আকুল আগ্রহই ছাত্রের পরিচয়—কোনো জাতি, বংশ বা কুলই কেবলমাত্র সে অধিকার তাহাকে দিতে পারে না—এই মূল সত্য উপলব্ধি ক'রিয়া ব্রাহ্মণ-শিক্ষক গৌতম কুলগোত্রহীন জারজ সত্যকামকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিত্য-ধর্ম লৌকিক ধর্মের উপরে স্থানলাভ করিয়াছে।

রাজশক্তির দম্ভ পরাজয় মানিয়াছে মহত্ত্বের কাছে 'মস্তক-বিক্রয়' কবিতায়।

ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য আত্মদান করিয়াছে বুদ্ধের সেবিকা শ্রীমতী 'পূজারিণী' কবিতায়।

'অভিসারে' সন্ন্যাসী উপগুপ্ত নিদারুণ বসন্ত-রোগ-গ্রস্ত, পুরপরিখার বাহিরে পরিত্যক্ত বারনারী বাসবদত্তাকে স্বহস্তে সেবা-শুশ্রূষা করিলেন। সুন্দরী নটী বাসবদত্তার সাদর আমন্ত্রণে সন্ন্যাসী তাহার বাড়ি যাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কারণ বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তি তাঁহার উদ্দেশ্য নয়; তারপর একদিন অনাহূত হইয়া সর্বজন-পরিত্যক্ত বাসবদত্তার চরম বিপদের দিনে তাহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলেন। আর্ত, বিপন্নের সেবাই সন্ন্যাসী-জীবনের কাম্য, কোনো ভোগ-বিলাস নয়।

'পরিশোধ' কবিতাটি কাব্য-গৌরবে ও মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনুপম। ধর্মচেতনা ও ন্যায়-বোধের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব অতি সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়াছে বজ্রসেনের চরিত্রে। সরল, নিরপরাধ যথার্থ প্রেমিক উত্তীয়ের জীবন গ্রহণ করিয়াছে শ্যামা বজ্রসেনের জন্য। বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার প্রেমের মধ্যে রহিয়াছে

যথার্থ প্রেমের অপ্রতিদানরূপ হৃদয়হীনতা, স্বীয় প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার জন্য নিতান্ত সরল, শুভ্র, আবেগ-বিহ্বল একটি জীবনকে হত্যার মহাপাপ। বজ্রসেন বুঝিল, মহাপাপ-মূল্যে-কেনা তাহার জীবন একটা বর্বরোচিত চরম পাপের জীবন্ত নিদর্শন আর বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার প্রেম এক পাষাণ-হৃদয়া দানবী নারীর যে-কোনো-উপায়ে জঘন্য দেহ-লিপ্সা-চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষা মাত্র। তাই বজ্রসেন নিজের জীবনকে শতবার ধিক্কার দিল ও শ্যামার প্রেমকে ঘৃণিত বোধ করিল। দারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় শ্যামার সঙ্গ সে বিষবৎ ত্যাগ করিল। কিন্তু হৃদয়ের দিক দিয়া সে শ্যামাকে ভালোবাসিয়াছিল। শ্যামার সঙ্গ তাহার বহুবাঞ্ছিত। তাই শ্যামাকে ত্যাগ করিয়াও সে আবার বহ্নিমুখ-পতঙ্গের মতো শ্যামার জন্য নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত অন্তর দিয়া শ্যামাকে কামনা কবিতে লাগিল। কিন্তু শ্যামার আবির্ভাবে আবাব তাহাব বিবেক ও ধর্মবুদ্ধি মাথা উঁচু করিয়া হৃদয়কে ঢাকিয়া ফেলিল। সে শ্যামাকে আবার তাড়াইয়া দিল। বুদ্ধির সঙ্গে হৃদযের,—বিবেকের সঙ্গে প্রেমের যুদ্ধই বজ্রসেন-শ্যামা-আখ্যায়িকার মূল বস্তু, এবং এই যুদ্ধে কবি ধর্মবুদ্ধি ও বিবেককেই জয়ী করিয়াছেন।

'সামান্য ক্ষতি' কবিতায় দেখি রাজার অসামান্য ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ। প্রমোদ বিহ্বল রাণী রঙ্গ-কৌতুকচ্ছলে সখীগণ সঙ্গে দরিদ্র প্রজাদের জীর্ণ কুটিরে আগুন লাগাইয়া যে আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন, রাজাব বিচারে তাহার ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল,—

রাজার আদেশে কিঙ্করী আসি
 ভূষণ ফেলিল খুলিয়া ;
অরুণবরণ অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি,
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি
 দিল রানী-দেহে তুলিয়া ॥
পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,—
 "মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে ;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে কটি কুটীর হোলো ছারখার
যতদিনে পারো সে কটি আবার
 গড়ি দিতে হবে তোমারে।"

'মূল্য-প্রাপ্তি' কবিতায় দরিদ্র সুদাস মালী বিশ মাষা স্বর্ণ উপেক্ষা করিয়া

অকালের পদ্মটি বুদ্ধদেবের চরণে উপহার দিয়া কেবল তাঁহার চরণের এক কণা ধূলি গ্রহণ করিল। দরিদ্রের পক্ষে ত্যাগ ও নির্লোভতার ইহা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'অপমান-বরে' কবীর সমস্ত অপমান-বিদ্রূপ সহ্য করিয়া ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণদল প্রেরিত দুষ্টা নারীকে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিলেন,—

> ………রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে—
> কহিল,—"পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে'।
> কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান।"
> কহিল কবীর—"জননী, তুমি যে আমার প্রভুর দান।"

প্রকৃত সাধুর পক্ষে নিন্দা-অপমান, যশ-প্রশংসা সবই সমান—সবই ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণীয়।

'স্পর্শমণি'তে সনাতনের বিপুল ত্যাগে ব্রাহ্মণের জ্ঞানচক্ষু ফুটিল। স্পর্শমণিকে তাচ্ছিল্য করিয়া দূরে ফেলিয়া সনাতন নিরন্তর ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন; স্পর্শমণি ব্রাহ্মণকে দান করিলে ব্রাহ্মণ

> ………সাধুর চরণে লুটে'
> কহে অশ্রুজলে,—
> "যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানো না মণি
> তাহারি খানিক
> মাগি আমি নতশিরে।"—এত বলি নদী-নীরে
> ফেলিল মাণিক।

'বন্দীবীরে' শিখ-বীর বন্দা স্বদেশের জন্য নির্ভীকচিত্তে অশেষ যন্ত্রণাময় মৃত্যু বরণ করিল।

'রাজবিচার' কবিতায় রাজা রতন রাও নারীর প্রতি অত্যাচার-উদ্যত স্বীয় পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়া ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

'শেষ-শিক্ষা'য় শিখগুরু গোবিন্দ ক্ষণিক উত্তেজনার বশে এক পাঠানকে হত্যা করিয়া, সেই পাঠানের পুত্রের দ্বারা নিজেকে বধ করাইয়া, নিরর্থক রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন-দান করিলেন।

'পণরক্ষা'য় প্রভুর আদেশে বীরের ধর্ম ত্যাগ না করিতে পারিয়া দুর্গেশ দুমরাজ প্রাণত্যাগ করিলেন।

'দেবতার গ্রাস' কবিতায় মৈত্র মহাশয় সাগর-সঙ্গম হইতে দুরন্ত ছেলে রাখালকে তাহার মাসীর কোলে ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন; শেষে যাত্রীদের ব্যাকুলতায় রাখাল সাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে, মৈত্র তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া আর উঠিলেন না। অঙ্গীকার রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন।

এইরূপ 'কথা'র প্রায় সব কবিতাতেই মানব-মহত্ত্বের বাণী প্রচার করা হইয়াছে। ইহা চরম ত্যাগ ও ন্যায় এবং সত্যনিষ্ঠার বাণী। 'কাহিনী' গ্রন্থেও সমস্ত লৌকিক ধর্মের উপরে মানবের চিরন্তন ধর্মের জয়-ঘোষণা করা হইয়াছে।

১১

কল্পনা

(১৩০৭)

'চৈতালি হইতে আরম্ভ করিয়া 'কথা' ও 'কাহিনী'র মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-কবি-মানসের একটা পরিণতির ধারা লক্ষ্য করা যায়। নিরবচ্ছিন্ন শিল্পীর মাধুর্যময় জীবন হইতে, সৌন্দর্য, প্রেম ও জীবনের বিচিত্র রসসম্ভোগ হইতে কবি একটু সরিয়া আসিয়া জীবনের গভীরতম অংশের দিকে—মানবের শাশ্বত সত্য-স্বরূপের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। ত্যাগ, সত্য, ন্যায় ও ধর্মনিষ্ঠা, যাহা মানবের বৃহত্তর জীবনের অঙ্গ, তাহার প্রতি কবির চিত্ত গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই মহাজীবনকে লাভ করিতে হইলে ত্যাগের সাধনা প্রয়োজন, সুদুঃসহ বেদনার তোরণ-পথে এ জীবনের আবাহন, ব্যক্তিগত ভোগের মায়া-সৌধ চূর্ণ করিয়া জীবনকে উপলব্ধির কঠোরতম তপস্যায় ইহার উদ্বোধন। কবি সেই কঠিন সাধনায় অগ্রসর হইতেছেন। 'কল্পনা'তে একদিকে রসসম্ভোগের জীবন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, আবার অন্যদিকে পূর্বজীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অনুভূতি পূর্বস্মৃতির পথ বাহিয়া একটি মনোরম কল্পলোকের ঐশ্বর্য ও বর্ণচ্ছটা বহন করিয়া অপরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দুইটি বিভিন্নমুখী ধারা মিশিয়াছে একত্রে এই গ্রন্থে। তবে 'কল্পনা'র সৌন্দর্য-প্রেমানুভূতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা কতক পরিমাণে প্রাচীন ভারতীয় অবদান-ঐশ্বর্য অবলম্বন করিয়া উৎসারিত হইয়াছে।

'কল্পনা'য় বিভিন্নভাবের কতকগুলি গান আছে, তাহা ছাড়া অন্যান্য কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই ধারা দুইটি বেশ লক্ষ্য করা যায়। 'বর্ষামঙ্গল', 'চৌর-পঞ্চাশিকা', 'স্বপ্ন', 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পর', 'মার্জনা', 'স্পর্ধা', 'পিয়াসী', 'পসারিনী, 'শরৎ', 'বসন্ত', 'প্রণয়-প্রশ্ন', 'প্রকাশ' প্রভৃতি কবিতায় মানব ও প্রকৃতির সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রেমের রসোদ্বেল অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। ইহারা 'সোনারতরী-চিত্রা' যুগের কাব্যের সমগোত্র হইলেও প্রাচীন ভারতীয় কাব্য ও পুরাণের পরিবেশ ও ভাবচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে কবির নবতম দৃষ্টি-গৌরবে ইহারা অপরূপ

সমৃদ্ধ। অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য-মাধুর্যের জীবনের আবহাওয়া ও শিল্পীর ভোগের জীবনের গণ্ডী কাটাইয়া ত্যাগ ও ভোগাকাঙ্ক্ষা বর্জনের কঠোর সাধন-পথে বৃহত্তর জীবনকে উপলব্ধি করিবার কামনা কবির অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। কবি-প্রকৃতি সৌন্দর্য-মাধুর্যের চিরকাঙাল—রূপ ও রসের ক্ষুধায় সে নিত্য-লালায়িত। সেই নব নব রূপ-রসভোগের মহোল্লাস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে কবিচিত্ত যে বেদনায় বিদীর্ণ হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বৃহত্তর ও গভীরতর জীবনের আহ্বানে তাঁহার সাড়া না দিয়া উপায় নাই; জীবনের এই রূপান্তর অন্তরতম জীবনের প্রবল তাগিদে—আত্মোপলব্ধির ক্রম-পরিণতির প্রবল প্রবাহ-বেগে। তাই এই ভোগ ও ত্যাগের প্রবল দ্বন্দ্ব তাঁহার অন্তর-জীবনে দেখা দিয়াছে। এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ হইয়াছে 'দুঃসময়', 'অসময়', 'অশেষ', 'বিদায়', 'বৈশাখ', 'বর্ষশেষ', 'রাত্রি' প্রভৃতি কবিতায়। এই দ্বন্দ্ব 'চৈতালি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক্ষণিকা'র কৌতুকহাস্যের ছলনার মধ্যে শেষ হইয়াছে। সৌন্দর্য-মাধুর্য-ভোগের জীবন ক্রমে পরাজিত হইল—তাহার সমাধির উপর নূতন গভীরতম জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন জন্মলাভ করিল।

প্রকৃতির বহু বিচিত্র সৌন্দর্য ও অনির্বচনীয় রহস্যের গভীর অনুভূতি রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যতম প্রধান উৎস। প্রকৃতির এই রূপ ও রহস্যের অদ্বিতীয় বাণীমূর্তি নির্মাতা রবীন্দ্রনাথ। প্রথম জীবন হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত এই প্রকৃতি নানা রসে, নানা সৌন্দর্য-চেতনায়, নানা উপলব্ধির চমৎকারিত্বে কবি-প্রতিভার অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। 'সোনারতরী-চিত্রা'য় দেখা গিয়াছে কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যের নিবিড় অনুভূতিতে আত্মহারা,—প্রকৃতি এযুগে প্রত্যক্ষভাবে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য লইয়া কবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কবি তাহাকে উপভোগ করিয়াছেন সম্মুখস্থিত প্রত্যক্ষ সত্তার মতো। কিন্তু 'কল্পনা'য় কবির প্রকৃতি-উপভোগের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকৃতির এই প্রত্যক্ষ রূপ-মূর্তিকে ছাড়িয়া, কল্পনার দূরবিসর্পিত দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে পারিপার্শ্বিকের বন্ধনচ্যুত করিয়া একটা সার্বজনীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাহার বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য ধ্যান করিয়াছেন। কবির এই ধ্যানদৃষ্টির কাছে প্রকৃতির এক একটি মূর্তি কল্পলোকের অপার্থিব আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া নিত্যকালের প্রতীকে পর্যবসিত হইয়াছে। তাই বর্ষা তাঁহার কাছে সংস্কৃত কাব্যের অভিনন্দিত বর্ষা, শরৎ বাংলার ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যময়ী জগদ্ধাত্রী মূর্তির প্রতীক। বসন্তের পুষ্প-সৌন্দর্যের মধ্যে লোক-লোকান্তরের চিরন্তন মাধুর্য, বৈশাখ তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের মূর্তি, রাত্রি জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তদের জ্ঞান ও তত্ত্বোপলব্ধির উদ্বোধক।

মানবের প্রেমকেও কবি এই গ্রন্থে উর্ধ্বে উঠাইয়া লইয়া অতীতের মধ্যে বিসর্পিত করিয়া দিয়া সকল কালের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। কবি অনুভব করিয়াছেন, অতীতের পুরাণে, কাব্যে, কিংবদন্তীতে প্রেমের যে রূপ, যে তাৎপর্য প্রকাশিত, বর্তমানের সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে, একই প্রেম নানা কালে, নানা পরিবেশে, নানা রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।—সকলের মধ্যে একটা সার্বজনীন ঐক্য আছে।

'কল্পনা'র 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটি, ধ্বনি-গাম্ভীর্যে, শব্দযোজনায়, ছন্দের লীলায়িত নৃত্যে অনুপম। ভারতবর্ষের সকল কবির অভিনন্দিত নববর্ষার এক অভিনব রূপ ও ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহার মধ্যে। ভারতীয় বর্ষা-কাব্যের মধুর নির্যাসটুকু রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের স্বর্ণময় পাত্রে পরিবেষিত হইয়াছে। কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতুসংহার, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণবপদাবলীর বর্ষাভিসার ও অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণের বর্ষাবর্ণনার পরমসুন্দর মায়া কবির এই কবিতায় আবদ্ধ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে আমরা স্থান কাল ও পাত্রের গণ্ডী এড়াইয়া সেই মায়াপুরীর মধ্যে প্রবেশ করি। নবযৌবনমত্তা বর্ষার অন্তরের যে সংগীত কবির কাব্যবীণায় ঝংকৃত হইয়াছে, তাহা বহু যুগের বহু কবির সংগীতের সমবায়,—

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।

'স্বপ্ন' কবিতাটিও কালিদাসের কাব্যলোকে কবির প্রয়াণ। কালিদাসের কালের একটি অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে এই কবিতায়। কবি মনে করেন তিনি জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বর্তমান আছেন। কালিদাসের কালেও তিনি ছিলেন ও তাঁহার প্রিয়তমার প্রেমে ধন্য হইয়াছিলেন। এই যুগে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বপ্নে তিনি সিপ্রানদীতীরে উজ্জয়িনীপুরে তাঁহার পূর্বজন্মের প্রিয়ার সন্ধানে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়া সে যুগের বেশ-বাস ও প্রসাধনে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল বটে, কিন্তু সে ভাষা ভুলিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের বাক্যালাপ হইল না—কেবল চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব ও দেহের স্পর্শে পরস্পরের প্রণয় ব্যক্ত হইল।

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে,—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধাল শুধু, সকরুণ আঁখি,
"হে বন্ধু, আছ তো ভালো ?" মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু—কথা আর নাহি।

সে ভাষা ভুলিয়া গেছি,…
… … …
দুজনে ভাবিনু, কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে,—কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো ; মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নামিয়া পড়িল ধীরে ;—ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

কবির কল্পনার একটি অপূর্ব রূপ—একটা মধুর প্রেমের স্বপ্ন। সুদূর অতীতের কাব্যকল্পলোকে প্রিয়ার উদ্দেশে কবির মানসিক অভিসার।

'মদন-ভস্মের পূর্বে' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, প্রেমের দেবতা মদন যখন মহাদেবের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হন নাই, তখন তাঁহার দৈহিক আবির্ভাব সকলের কাম্য ছিল। মদন-ভস্মের পূর্বে লোকে তাঁহাকে দৈহিক ও ইন্দ্রিয়জ ভোগের জন্য কামনা করিয়াছে। তরুণ-তরুণী মদনের সঙ্গে লীলারসে মত্ত হইয়াছে। কুমারীগণ তাঁহাকে আরাধনা করিয়াছে ; কবি প্রণয়রসের সাধনা করিয়াছে, এমন কি পশু-পক্ষী পযন্তও তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। এই স্থূল দেহগত প্রেমসাধনাতেও মানুষ অপূর্ব আনন্দ লাভ করিয়াছে ; সারা পৃথিবী অপূর্ব কাব্য ও মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। কবি সেই দেহধারী, ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত মদনকে আহ্বান করিতেছেন,—

এস গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে,
এস গোপনে মৃদুচরণে বাসর-গৃহ-দুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।
এস চতুর মধুরহাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে,
নবীন করো মানব-ঘর ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ-সরস পরশে!

কিন্তু মহাদেব মদনকে ভস্ম করায় তিনি অতনু বা অনঙ্গ হইয়া, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের গণ্ডী চূর্ণ করিয়া সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন—ইহাই কবি 'মদনভস্মের পর' কবিতায় বলিয়াছেন। পূর্বে মদনের প্রভাবের গণ্ডী ছিল বিশিষ্ট স্থানে—কতকগুলি স্থূল, প্রত্যক্ষ ঘটনায় তাহা অনুভূত হইত। এখন তাহার প্রভাব সারা বিশ্বে

ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এখন স্থূল, প্রত্যক্ষ প্রভাব হইতে সংকেত, ইঙ্গিত ও ক্ষণ-ব্যঞ্জনায় পর্যবসিত হইয়াছে। মদন ইন্দ্রিয়রাজ্য হইতে মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে—রূপ হইতে অরূপ-লোকে, ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশে-বাতাসে আজ প্রণয়-সংকেত। প্রেমলিপ্সা পূরণে অসমর্থ প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের বেদনা আজ সূক্ষ্ম বিরহ-বেদনায় রূপান্তরিত হইয়া সারা-বিশ্বকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে। পৃথিবীর তরুলতা, পশুপক্ষী প্রভৃতির প্রিয়-মিলনের ঔৎসুক্য ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইতেছে ও অতৃপ্তির ক্ষীণ বেদনায় সারা বিশ্ব ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়তমাকে না-পাওয়ার বেদনার মধ্যেই তো প্রেমের সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য। কবি দেখিতেছেন,—

ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সংগীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুনমাসে নিমেষমাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি' মূরছি পড়ে অবনী।
আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়-বীণাযন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।

'মার্জনা' কবিতাটি একটি সুন্দর প্রেমের কবিতা। প্রেমের মধ্যে একটা মূঢ় আবেগ, বুদ্ধিহীন আত্মবিসর্জন, পাত্রাপাত্রবিচারশূন্যতা ও ভাবাতিশয্যে আত্ম-সংবরণহীনতা আছে। প্রণয়িনী প্রেমাবেগে তাহার প্রিয়তমের নিকট যে রূপ প্রকাশ করে, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের নিকট তাহা পাগলামি ও ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাহার নিকট প্রেম সত্য—তাহার যথাসর্বস্ব। যদি প্রেমাস্পদের নিকটে সে ভালোবাসা প্রাপ্তির আশা নাও করে, তবুও তাহার জীবন-আলোড়নকারী প্রেমকে তাহার ছাড়িবার উপায় নাই। প্রেমাস্পদ তাহাকে ভালোবাসুক বা না বাসুক, সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রেমের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি তাহার সমানই থাকিবে। এই কবিতায় প্রণয়িনী তাহার প্রেমাস্পদকে বলিতেছে যে, যদি প্রিয়তম তাহাকে ভালো না বাসে, তাহা হইলে তাহার অস্থিরতাকে সে যেন ক্ষমা করে—তাহাকে বিদ্রূপ-হাসিতে যেন উপহাস না করে।

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালোবাসিতে,
তবু ভালোবাসা ক'রো মার্জনা, ক'রো মার্জনা।
তবু দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়াপানে চেয়ো না বন্ধু চেয়ো না।

আর যদি প্রিয়তম তাহাকে ভালোবাসে, তখন তাহার আনন্দের আতিশয্যকে, প্রেমের আবেগময় অভিব্যক্তিকে, তাহার সৌভাগ্যের গর্বকে সে যেন ক্ষমা করে।

যবে রাণীর মতন বসিব রতন-আসনে,
যবে বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়শাসনে,
যবে দেবীর মতন পূরাব তোমার বাসনা,
ওগো, তখন হে নাথ, গরবীরে ক'রো মার্জনা, ক'রো মার্জনা।

হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব নারীকে নিতান্ত অসহায় ও অনুকম্পার পাত্র করে।

'স্পর্ধা' কবিতাটি প্রণয়িনীর মনস্তত্বের একটা সুন্দর আলেখ্য। প্রিয়তমের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার মধ্যে তাহার গোপন আনন্দ ; কিন্তু, বাহিরের সংকোচ ও লজ্জা তাহাকে কুণ্ঠিত করে। এই বাহিরের কুণ্ঠার আবরণের তলে প্রিয়-মিলনের একটা আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে বর্তমান থাকে। অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রেমজ্ঞাপন করিয়া প্রতিদান না পাইয়া যখন প্রিয়তম চলিয়া গেল, তখন সে বলিতেছে—

সখী, ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁখিনীরে,
কেন সে এলো না ফিরে।

'পিয়াসী' কবিতায় প্রভাতবেলায় দুগ্ধদোহনরত এক সুন্দরী তরুণী এক পুরুষকে তাহার অশোভন-ভাব-ভঙ্গীর জন্য তিরস্কার করাতে সেই পুরুষ তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছে। পুরুষের এই বক্তব্যই কবিতাটির বিষয়বস্তু। সে তরুণীর সহিত কোনো বাক্যালাপ করে নাই, কেবল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দুগ্ধদোহন দেখিতেছিল। প্রভাতে বকুলশাখায় পাখী ডাকিয়া উঠিল, আম্রকাননে ভ্রমর গুঞ্জন করিতে লাগিল, দেবদেউলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং প্রভাত-আলোতে গ্রামের পথে গোরু চরিতে বাহির হইল। প্রকৃতির এই সজীব আবেষ্টনীর মধ্যে সুন্দরী তরুণীর ঘন ঘন কঙ্কণ-ঝংকারের সঙ্গে লীলায়িত দুগ্ধদোহন সে তৃষ্ণার্ত নয়নে দেখিতেছিল মাত্র। পুরুষের মুগ্ধ ও তৃষিত দৃষ্টিতে রমণীর মনে হয়তো অকস্মাৎ একটা প্রেমের অনুভূতি জাগিয়াছে, সে সেটা ঢাকিবার জন্য পুরুষকে তিরস্কার করিতেছে ; আবার পুরুষের কৈফিয়তের মধ্যেও তরুণীর প্রতি অপ্রকাশিত, গোপন প্রেমের আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই উভয় পক্ষের অস্বীকৃতির মধ্যে স্বীকৃতির আভাসই কবিতাটির বৈশিষ্ট্য।

প্রেমাকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির জন্য কোনো উচ্চ বা অসাধারণ আদর্শের দিকে ধাবিত হইলে, বা কোনো অতিদূর, অনির্দিষ্ট সম্ভাবনার আকর্ষণের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, প্রেমের প্রকৃত তৃপ্তি ও শান্তি পাওয়া যায় না। প্রেমের প্রকৃত তৃপ্তি ও শান্তি মিলে আমাদের চিরপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে, নিকট-জনের অকৃত্রিম

ভালোবাসা প্রাপ্তিতে—তাহার আন্তরিক সেবা ও যত্নে। ইহাই 'পসারিনী' কবিতাটির মর্মার্থ বলিয়া মনে হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধিকার পসারিনী-বেশে মথুরার হাটে যাইবার অনেক চিত্র আছে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবকবি বংশীবদন দাসের এই কবিতাটি পড়িয়া বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের 'পসারিনী' কবিতা লিখিবার কথা মনে হয়,—

হেদে লো বিনোদিনী এ পথে কেমনে যাবে তুমি !
শীতল কদম্ব-তলে বৈসহ আমার বোলে,
সকলি কিনিয়া নিব আমি।
এ ভর দুপুর-বেলা তাতিল পথের ধুলা
কমল জিনিয়া পদে তোরি॥
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ, দেখি লাগে বড় দুখ,
শ্রম-ভরে আউল্যাল কবরী।
অমূল্য রতন সাথে গোঙারের ভয় পথে,
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমারে লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী,
তিল আধ না যাও ছাড়িয়া॥

'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটি একটি চমৎকার ব্যর্থ-প্রেমের কবিতা। প্রেম নারীহৃদয়ের অতি গোপন ধন। নারীর স্বাভাবিক দ্বিধা, সংকোচ, শরম ও সামাজিক রীতি-নীতির শাসনে এই প্রেমের প্রকাশ সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ভাবে হয় না। নারীর বুক ফাটে, তবু মুখ ফুটে না। তাই প্রেম প্রকাশের কতো শুভ-মুহূর্ত বৃথা চলিয়া যায়; হৃদয়ের গোপন-প্রেম ব্যক্ত হয় না; কত মিলন-লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়া যায়; স্বীয় স্বভাবের দুর্বলতার জন্য হতাশ-প্রেমের বেদনায় জীবন জর্জরিত হইতে থাকে।

'ভ্রষ্টলগ্নে' তরুণ পথিক যখন প্রভাতে রাজরথে আসিয়া

শুধাল কাতরে, "সে কোথায়, সে কোথায়।"
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি,—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।"

তারপর, সন্ধ্যাবেলায় যখন আবার আসিয়া

শুধাল কাতরে, "সে কোথায়, সে কোথায়।"
ক্লান্ত চরণে আমারি দুয়ারে নামি,—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।"

একবারও নারী আপন অন্তরের লজ্জায় পুরুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে

পারিল না—তাহার প্রেম স্বীকার করিয়া প্রিয়তমকে আবাহন করিতে পারিল না। তারপর, রাত্রিবেলায় সে যখন আত্মদান করিতে প্রস্তুত হইল, তখন সময় চলিয়া গিয়াছে, লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়াছে, প্রিয়তম তাহারই অন্বেষণে কোন্ দূরদূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে। বাসর-রাত্রি যাপনের সাজ-সজ্জা ও বেশ-বিন্যাস তাহার মর্মান্তিক ব্যর্থতায় পরিণত! চির-প্রতীক্ষার বেদনাই তাহার জীবনের সম্বল হইল।

রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি'—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি
"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।"

'প্রণয়-প্রশ্ন' রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশিষ্ট প্রেম-কবিতা। প্রেমের গভীরতা ও তন্ময়তায় প্রেমপাত্রী প্রেমিকের নিকট যে রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রেমিকের চিত্ত যে রূপান্তর লাভ করে, তাহার একটি পরিপূর্ণ চিত্র দেওয়া হইয়াছে এই কবিতায়। এখানে প্রেমপাত্রী প্রেমিককে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে তাহার জন্য প্রেমিকের চিত্তে যে যুগান্তরকারী পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা কি সত্য। প্রেমিকের এইরূপ গভীর আবেগময় প্রেম সংসারে বিরল। প্রেমপাত্রী নিজেকে ধন্য মনে করিলেও তাহার বিশ্বাস হইতেছে না। তাই তাহার প্রশ্ন প্রেমিকের পরিবর্তনগুলির বর্ণনায় কবি প্রেমের তন্ময়ত্বের চরম চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রেমপাত্রীর চকিত চাহনীতে প্রেমিকের হৃদয়ে ঝড় উঠে; তাহার মধ্যে চির-বসন্ত-পুষ্পশ্রী বিকশিত হয়; চরণক্ষেপে শত বীণা ঝংকৃত হইয়া উঠে; প্রকৃতি তাহাকে ঘিরিয়া প্রভাতে ও নিশায় তাহারই সৌন্দর্য প্রকাশ করে; বাতাস তাহার তপ্ত-গণ্ড স্পর্শ করিয়াই মত্ত হইয়া ছুটে; অন্ধকারের নির্ঝরের মতো তাহার কেশরাশি দিনের সমস্ত আলো-কে আড়াল করিয়া রাখে, তাহার আলিঙ্গনে মরণের মতো জীবন-বিস্মৃতি আনিয়া দেয়; প্রিয়তমার অঞ্চল-ছায়ায় প্রেমিক বিশ্বদর্শন করে, তাহার কণ্ঠের বাণীই বিশ্বের সমস্ত কলকোলাহলকে ডুবাইয়া প্রেমিকের কর্ণে ঝংকৃত হইতে থাকে এবং প্রিয়তমার সত্তা তাহার নিকট ত্রিভুবনব্যাপ্ত বলিয়া বোধহয়। ইহাই বোধহয় প্রেমের চরম অনুভূতি—পরম তন্ময়ত্ব। বৈষ্ণব-পদাবলীতে এইরূপ প্রেমের দর্শন মিলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব ভাবদৃষ্টিতে আরো ঊর্ধ্বে উঠিয়া ইহাকে জন্ম-জন্মান্তরের সামগ্রী করিয়াছেন। প্রিয়তমার জন্য প্রেমিক কতো কতো জন্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া আজ তাহাকে পাইয়া চিরজন্মের অন্বেষণের ক্লান্তি হইতে মুক্ত হইল।

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া।
একি সত্য।
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে
একি সত্য।

এই যে প্রিয়তমার জন্য আকাঙ্ক্ষা, ইহা তাহার দেহোত্তর অসীমত্বের জন্য, অনির্বচনীয়ত্বের জন্য। প্রেমের আকর্ষণের মূল রহস্যই প্রেমপাত্রীর মধ্যে এই অসীমত্বের উপলব্ধি—ইহাই রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি।

মোর সুকুমার ললাট-ফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত
একি সত্য।

'চৌর-পঞ্চাশিকা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্যা-সুন্দর উপাখ্যানের মধ্যে বিশ্বের প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য যে চিরন্তন প্রেমের বাণী আছে, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'চৌর-পঞ্চাশিকা' পঞ্চাশটি শ্লোকের সমষ্টি। বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের গোপন প্রেম ধরা পড়িলে সুন্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তখন সুন্দর পঞ্চাশটি শ্লোকের দ্বারা তাঁহার ইষ্টদেবী কালীকে স্তব করেন। এই শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থবোধক—ইহার এক অর্থ কালী-পক্ষে, অন্য অর্থ বিদ্যা-পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিয়াছেন যে এই পঞ্চাশটি শ্লোক বিদ্যার প্রতি সুন্দরের প্রেমের চিরস্থায়ী দলীল, এবং বিশ্বের সমস্ত প্রণয়ী-প্রণয়িনীর প্রেম-নিবেদনের ইহা চিরন্তন প্রতীক হইয়া রহিয়াছে।

'প্রকাশ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে গোপন প্রণয়-লীলা চলিতেছে কবিই তাহা প্রথম উদ্ঘাটন করিয়া জগতের নরনারীর নিকটে প্রচার করেন।

চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে;
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি;
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে,
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে।

এই মনের মিলন-রহস্য কবিই প্রথম উদ্ঘাটন করিয়া দেখান।

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল—নরনারী শুন সবে,
কত কাল ধরে কী যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে।

এ-কথা কে কবে স্বপনে জানিত—আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারারাত নিদ নাহি।
উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
এতকাল ধরে তাহার তত্ত্ব চাপা ছিল কোন ছলে।

এই মানবীয় প্রেম-মাধুর্য উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যও উপভোগ করিতেছেন। বর্ষা-মঙ্গলের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'শরৎ' কবিতায় বাংলার শরৎ-ঋতুর একটি পরিপূর্ণ চিত্র কবি আঁকিয়াছেন, 'বসন্ত' কবিতায় বসন্তের চির-যৌবনের বাণীকে কবির যৌবন-বেদনার মধ্য দিয়া মূর্ত করা হইয়াছে। 'শরৎ' কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। শরতে বঙ্গপল্লীর যে সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যময়ী, কল্যাণী মাতৃমূর্তি ফুটিয়া উঠে, তাহার অপূর্ব প্রকাশ হইয়াছে এই কবিতায়।

'বসন্ত' কবিতাটি কবি-কল্পনার মনোরম দান। বসন্তকালের জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, তাহার পুষ্পসম্ভারের মধ্যে, মানবের যৌবনের বিচিত্র কামনা, অশ্রু-পুলক-গান চিরন্তন রূপায়িত হইয়া আছে। ধরায় যেদিন প্রথম বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেদিন অপূর্ব পুষ্প-সমারোহ ও দক্ষিণ-পবনের কুহকময় আবেষ্টনীর মধ্যে, নরনারী বিচিত্র আনন্দে, নৃত্য-গানে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর বর্ষে বর্ষে সেই চিরন্তন পুষ্পসম্ভারেই বসন্ত তাহার ডালি সাজাইয়া ধরণীতে অবতীর্ণ হইতেছে। শত শত বৎসরের নরনারীর বিচিত্র যৌবন-বেদনা, তাহাদের অশ্রু-গান-হাসি, তাহাদের প্রণয়-আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস এই পুষ্পদলে লেখা আছে,—

তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত-লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা।

আজ এই বসন্তদিনের পুষ্পগন্ধে নরনারী কতো বিস্মৃত দিনের নামহারা নায়ক-নায়িকার যৌবন-আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, কত প্রেমের হাসি-অশ্রু-গান, কতো চুম্বন-আলিঙ্গনের স্মৃতি তাহাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য আনিয়া দেয়! বসন্তের মধ্যে নিত্যকালের যৌবন-আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে, তাই নরনারী বসন্তের আবহাওয়ার মধ্যে চিরদিন এইরূপ উন্মাদনা অনুভব করে। কবির যৌবনকালে ধরণীতে বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছিল; সে-বসন্তের চম্পক, বকুল, চামেলী, রজনীগন্ধায় কবির যৌবন-কাব্যগাথা মুদ্রিত হইয়া আছে, তাঁহার ব্যাকুল বাসনা-বাঁশির সংগীতে সে কুসুমমালা ঝংকৃত হইয়াছে। কবি মনে করেন, তাঁহার জীবনের পরম গৌরবময় এই যৌবন-অধ্যায়টি বসন্তের কুসুমের মধ্যে চিরস্থায়ী হইয়া রহিল। তাঁহার পূর্বের শত শত যুবক-যুবতীর যৌবন-কামনা যেমন বসন্তের

পুষ্পগন্ধের মধ্যে যুগযুগান্তরের জন্য সঞ্চিত আছে, তাঁহার যৌবন-বাসনাও সেইরূপ চিরদিনের মতো বসন্তের পুষ্পগন্ধের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল এবং যুগযুগান্তর পর্যন্ত প্রতি-বসন্তে কুসুম-গন্ধের সহিত তাহা জলে-স্থলে-শূন্যে প্রকাশ পাইবে। কবি বলিতেছেন,

বকুলে চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহুকলস্বরে।
অমর বেদনা মোর, হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মর নিশ্বাসে ;
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।

'কল্পনা'র অন্য ধারার কবিতার মধ্যে কবির অন্তর্জীবনের প্রবল দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিরপরিচিত ও এতদিনকার সাধের প্রেম ও সৌন্দর্যের রাজ্য ছাড়িয়া অনির্দিষ্ট নূতন জীবনের পথে যাত্রা করিতেছেন কবি, তাই নূতন জীবন-যাত্রার শঙ্কা, সংকোচ ও চিরাভ্যস্ত পুরাতন জীবনযাত্রার আকর্ষণ তাঁহার অন্তরে দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে।

'দুঃখময়' কবিতায় তাঁহার এতদিনের পরমপ্রিয় রসজীবনের—শিল্পজীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে—তাঁহার চিত্ত-বিহঙ্গকে তাহার চিরপরিচিত নীড় ছাড়িয়া একাকী অজানা পথে নূতন জীবনের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইবে। তাহাতে বহু ভয়, বহু সংকোচ, বহু সন্দেহ ; তবুও নির্ভয়ে তাহাকে এই দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হইতে হইবে। কবির অন্তরের অনিবার্য প্রেরণা ইহা—বৃহত্তর জীবনের ইহা আহ্বান। এই নূতন জীবন যে এতদিনকার জীবন অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, কবি তাহা বুঝিতেছেন,—

এ নহে মুখর বন-মর্মর গুঞ্জিত
এ যে অজগর-গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে ;
কোথা রে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা।

অজিতকুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

"সত্যই সন্ধ্যা আসিয়াছে—'চিত্রা', 'সোনার তরী'র জীবনের কাছে বিদায়! এখন নূতন জীবনের

যাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু হায়, কোন্ পথে কোন্ ভাব-লোকে যে নূতন করিয়া উড়িতে হইবে তাহার কোনো ঠিকানা নাই।…বাস্তবিক বড় একটি সকরুণ বিষাদের সঙ্গে 'কল্পনা'য় বার বার পিছন ফিরিয়া গত জীবনের সমস্ত প্রিয় জিনিসগুলির দিকে কবিকে তাকাইতে হইতেছে।"

'অসময়' কবিতাটিও এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। অজানা নূতনপথের ও গন্তব্যস্থানের ভয়-সংশয়, তাহার গোপন কঠিন আকর্ষণ এবং মানব ও প্রকৃতির সৌন্দর্য-মাধুর্যপূর্ণ এই পরিচিত পৃথিবীর মনোহর মায়া কবির চিত্তে প্রবল সংগ্রামের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তীর্থের পথে অবশেষে বাহির হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার গভীর সন্দেহ হইতেছে—তীর্থ-দেবতার মন্দিরে পৌঁছিতে পারিবেন কি না, হয়তো পুরীর সিংহদ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে, কারণ এতদিন

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

পশ্চাতের আকর্ষণে তীর্থ-দেবতার দর্শনে বিলম্ব হইলেও তাঁহার বিশ্বাস,

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে,
শান্তি-সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।

এই নবজীবনের সমস্ত সন্দেহ, সংকোচ, ভয় একদিন অকস্মাৎ শেষ হইয়া গেল। কবির সমস্ত জীবনের নিয়ন্ত্রণকারিণী রহস্যময়ী জীবন-দেবতার আহ্বান কবির কর্ণে ধ্বনিত হইল। জীবন-দেবতা তো কবির সমস্ত কাব্য-প্রেরণার উৎস; কবির জীবনকেও জীবন-দেবতা ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে চালিত করিতেছেন, বিলাস ও আরাম হইতে ত্যাগ ও দুঃখের পরম সম্পদের অভিমুখে অগ্রসর করাইতেছেন আর সমস্ত ব্যর্থতা ও বিফলতার মধ্য দিয়া চরম সার্থকতার সন্ধান দিতেছেন। কবির কাব্যে ও জীবনে এই জীবন-দেবতার পরমাশ্চর্য সৃজনলীলা তো চিরকাল অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবির কাব্য-সৃষ্টি যে মোড় ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, রসসম্ভোগের কুঞ্জকানন হইতে কঠোর সংগ্রামের মধ্যে অবতীর্ণ হইবার জন্য যে অনিবার্য প্রেরণা কবি অনুভব করিতেছেন, তাহা তো জীবন-দেবতারই লীলা। তাই 'অশেষ' কবিতায় কবি জীবন-দেবতার অর্পিত সুদুঃসহ কর্মভার গ্রহণ করিয়া এই দুরূহ সৌভাগ্যের গর্বে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্য-রস-সাধনায় তাঁহার কবি-মানসের বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে। এক এক পর্যায়ে এক এক ভাব ও কল্পনার চক্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাহার প্রকাশের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন; তারপর সেই চক্র হইতে

বাহির হইবার জন্ত একটা অস্থিরতা জাগিয়াছে ও শেষে তাহা হইতে বহির্গত হইয়া অপর ভাব ও কল্পনার চক্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বার বার এইভাবে তাঁহার কবি-সৃষ্টিতে ঋতু-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবের অগণিত প্রকাশের সহিত মানবমনের যে সম্বন্ধ বা সংযোগ, কবি তীক্ষ্ণ ও গভীর অনুভূতির মধ্য দিয়া তাহাকে বিচিত্র রসরূপে উপভোগ করেন। কবির চিত্তে এই বিচিত্র রসভোগের ক্ষুধা প্রবল। এই অনুভূতির আবেগ—এই অন্তরের আনন্দবোধকে প্রকাশ করিবার তীব্র ব্যাকুলতাই সমস্ত শিল্প-সৃষ্টির মূলে। রবীন্দ্রনাথ এই বিচিত্র নব নব রসভোগের ক্ষুধায় চির-বুভুক্ষিত। এক প্রকার রসচক্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অন্যপ্রকার গণ্ডীতে প্রবেশ করিবার প্রয়াস তাঁহার মধ্যে চিরদিন বর্তমান। তাই তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে এত বৈচিত্র্য—এত রূপ ও রসের সম্মেলন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য-প্রেম এতদিন ভোগ করিয়াছেন। মনে করিয়াছিলেন, এই প্রকার রসসাধনাতেই তাঁহার পরম তৃপ্তি মিলিবে ও তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি এই রসের চরম নিদর্শনরূপে বিরাজ করিবে। কিন্তু তাহা হইল না। নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য-চর্চায় কবির কোনো চরম সার্থকতা মিলিল না, তাই নূতনতর ও গভীরতর রসের সন্ধানে তাঁহাকে ভিন্নপথে যাত্রা করিতে হইল। এক যুগের কাব্য-সাধনা শেষ হইল—আর এক যুগ আরম্ভ হইল।

'অশেষ' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার জীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহমন বিশ্রাম কামনা করিতেছে, এমন সময় নূতন কর্তব্যভার লইয়া নূতন পথে যাত্রা করিবার জন্য জীবন-দেবতা তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। এই আহ্বান নিতান্ত অসময়ে—

পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে,
আবার আহ্বান ?
নয়ন-পল্লব 'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে
থেমে যায় গান ;
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতিসম,
এখনো আহ্বান ?

এ আহ্বানে সাড়া দিতে হইলে তো কবির রসমাধুর্যের জীবন ছাড়িতে হইবে, কঠোর কর্মের পথে দুঃখবেদনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিতে হইবে, এ আহ্বান তো সুখের আহ্বান নয়—এ যে আঘাত-সংঘাতময় যুদ্ধের তূর্যধ্বনি। তাই কবি বলিতেছেন,—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা,
কঠোর স্বামিনী,

দিন মোর দিনু তোরে শেষ নিতে চাস হরে
আমার যামিনী ?

কিন্তু এ আহ্বানে কবি সাড়া না দিয়া পারেন না—

রহিল রহিল তবে 'আমার আপন সবে
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।
... ...
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান।

কবির বিশ্বাস, এই নূতন জীবনে বিঘ্নবিপদসংকুল, নূতন কর্তব্য তিনি সম্পাদন করিতে পারিবেন,—

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্তকর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি র'ব জাগি,
দীপ নিবিবে না।

মানব-জীবন ক্রমাগত এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাত্রা করিতেছে। যেখানেই আমরা যে অবস্থাকে শেষ বলিয়া মনে করি, সেখানেই সেই শেষের মধ্যে অশেষের আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হয়, মহৎ হইতে মহত্তর কর্মের দিকে, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সত্যের দিকে ক্রমাগতই আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইতেছে। কবির জীবনেও এই ঘটনা বারংবার ঘটিয়াছে। এক অদৃশ্য-শক্তির অমোঘ আহ্বানে তাঁহাকে অচিন্ত্যপূর্ব পথে যাত্রা করিতে হইয়াছে।

সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া বীরের মতো কবি নবজীবনের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। এখন তাঁহার পূর্বেকার কাব্য-জীবন হইতে, ভাব ও কল্পনা-বিলাস হইতে, শিল্পীর নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যচর্চার জীবন হইতে বিদায় লইতে হইবে। 'বিদায়' কবিতায় কবি শান্ত, গভীর বিষাদের সঙ্গে পূর্বজীবনের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন। এই বিদায় 'মৃত্যু নয়', 'ধ্বংস নয়', —

জীবনপর্বের 'সমাপন' ; এ কেবল—'খেলা হতে খেলাশ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি'। তিনি আর হাসি-অশ্রুর দোলায় আন্দোলিত হইতে চাহেন না—তিনি চাহেন—'উদার বৈরাগ্যময় বিশাল বিশ্রাম'—অসীম নক্ষত্রলোকের পরম নিস্তব্ধতা।

'অশেষ', 'বিদায়' প্রভৃতি কবিতায় গতজীবনের জন্য যে একটা ক্ষীণ বেদনা ও নবজীবনের প্রতি সন্দেহ, ভয় ও সংকোচের যাহা-কিছু সামান্য অবশিষ্ট ছিল 'বর্ষশেষ' কবিতায় কালবৈশাখীর উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে তাহা কোথায় শূন্যে উড়িয়া গেল। পুরাতন জীর্ণ, ক্লান্ত বৎসরের বিদায়ের সঙ্গে কবি তাঁহার পুরাতন কাব্য-জীবনকে বিদায় দিলেন ও উন্মত্ত কালবৈশাখীকে নবজীবনের প্রতীক বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। এই বর্ষশেষের ঝড় তো কবির অন্তর্জীবনের ঝড়। কবির জীবনের এক পর্যায়ের শেষটুকু এই ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, আর এক নূতন পর্যায় উদ্‌ঘাটিত হইল।

গভীর আবেগের প্রকাশে, অর্থগৌরবদীপ্ত ও ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দের প্রয়োগে, ছন্দের সাবলীল নৃত্যে, অপূর্ব সংগীতের চলমান প্রবাহে 'বর্ষশেষ' কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। ঝড়ের পূর্বাভাস, উন্মত্ততা ও বিরতি ভাষা ও ছন্দের মহিমায় যেন রূপ ধরিয়া চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে! এই কবিতাটির রচনা-ইতিহাস ও অর্থ-সংকেত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিতেছেন,—

"১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি।.........এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনি ভাবে, চিরনবীন যিনি, তিনি প্রলয়কে পাঠিয়ে-ছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থাম্‌ল। বললুম—অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই যে এতদিন কাটালুম, এতে চিত্ত তো প্রসন্ন হলো না। যে আশ্রম জীর্ণ হয়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙ্‌তে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আস্‌তে হবে।"

[শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩২, বৈশাখ]

কবি বর্ষশেষের উন্মত্ত কালবৈশাখী ঝড়কে তাঁহার জীবনে আহ্বান করিতেছেন তিনি কামনা করিতেছেন কবির কাব্যবীণাও ঝড়ের উদ্দাম সুরে ঝংকৃত হইয়া উঠিয়া প্রবলবেগে সংগীত বর্ষণ করুক। ঝড় যেমন ঘূর্ণাবেগে বিবর্ণ, বিশীর্ণ বৃক্ষপত্র, ধূলি ও তৃণদল অনন্ত আকাশে উড়াইয়া লইয়া যায়, কবির সংগীতও সেইরূপ ছন্দে ছন্দে তালে তালে পুরাতন বৎসরের সমস্ত নিষ্ফল সঞ্চয় চারিদিকে উড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিক। ঝড় যেন তাঁহার হৃদয়শঙ্খে বিজয়-গর্জনে মঙ্গলনাদ করে। সেই শঙ্খধ্বনি মূর্তিমান সামগাথার সরল, গম্ভীর উদাত্তধ্বনির মতো কবির অন্তর হইতে

বাহির হইয়া সবল, শুভ্র, মুক্তজীবনের জয়ঘোষণা করুক। বর্ষশেষের এই ঝড় নবজীবনের প্রতীক। ঝড় যেমন তাহার অগ্রগতির পথে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘভারে সমস্ত গগন অবলুপ্ত করিয়া দেয়, নবীনও সেইরূপ অতর্কিতে, মুহূর্তের মধ্যে, প্রলয়-অন্ধকারে পুরাতনের দিক্‌চক্রবাল লুপ্ত করিয়া দেয়। কবি ইচ্ছা করেন,—কালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎ-চমকের মতো নবজীবনের ইঙ্গিত যেন অন্ধ কুসংস্কারের আবরণের মধ্য হইতে তাঁহাকে নূতন নির্দেশ দেয়; ঝড়ের গর্জনের মধ্য দিয়া চিরনবীনের সংগীত যেন তাঁহাকে উদ্বোধিত করে; ঝড়ের সহগামী বর্ষণধারা যেন বৃহৎ ও মহৎ জীবনলাভের পিপাসাকে তীব্রভাবে বর্ধিত করে, ঝড়ের পরের শান্তি ও গাম্ভীর্য যেন তাঁহাকে বৃহৎ জীবন উপলব্ধি করিবার ধৈর্য ও চিন্তাশীলতা দান করে। কবির জীবনে এই নূতনের, নবীনের, এই মহাজীবনের আবির্ভাব ঘোর রাজকীয় সমারোহে,—বিস্ময়ে-ভয়ে কবি তাহাকে পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন,—

রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্বিত নির্ভয়,—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,—
জয় তব জয়।
হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।

ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, নীচতা, ক্লেদ-গ্লানিতে জীবন বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে; ঝড়ের বেশে, এই নবীন, এই রুদ্র-দেবতা, এই ধ্বংসের মহাশক্তি দ্বারে আজ উপস্থিত; কবি কোনো দিকে না তাকাইয়া এই মৃত্যু-দেবতাকে আজ জীবনে বরণ করিয়া লইবেন, কারণ তিনিই তো নবজীবনের সৃষ্টি করিবেন—তিনিই তো পরম মঙ্গলের সন্ধান দিবেন।

চাব না পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি,—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্‌কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।
শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

কবি জীবনের সমস্ত ভোগতৃষ্ণা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ধুইয়া মুছিয়া দিয়া মহাজীবনের উপলব্ধির জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,—

"এমনি ক'রে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছিল। যতই এটা এগিয়ে চলল, ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি-রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, সেই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।

—আমার ধর্ম—সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২২, আত্মপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের এই 'বর্ষশেষ' কবিতার সহিত শেলীর West Wind কবিতাকে তুলনা করিয়া কয়েকজন সমালোচক শেলীর কবিতা অপেক্ষা এই কবিতাটি নিকৃষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য সাহিত্যের বিচার নির্ভর করে ব্যক্তিগত রসবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার-বুদ্ধির উপর, সুতরাং সে বিচার যে সর্বজন-গ্রাহ্য হইবে, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের মন্তব্যে বুঝা যায় যে 'বর্ষশেষে'র বৈশিষ্ট্যের দিকে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই, এবং এক মাপকাঠিতে উভয় কবিতা বিচার করিয়া সংস্কারমুক্ত, নিরপেক্ষ বিচারের পরিচয় দেন নাই।

কবিতার সাধারণ বিচারে তিনটি জিনিসের উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন,—কবিতার প্রকৃতি, কবির দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাব-পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' ও শেলীর West Wind-এর প্রকৃতি বিভিন্ন। West Wind বাস্তবধর্মী বা চিত্রধর্মী কবিতা, 'বর্ষশেষ' ভাবধর্মী কবিতা। উহার প্রথমে

ঝড় দিয়া আরম্ভ, মধ্যে ঝড় বর্তমান এবং শেষের দিকে একরকম ঝড়েই শেষ। কেবল শেষে কবি ঝড়ের পরে নবযুগের আবির্ভাব হইবে বলিয়া একটি সংশয়ান্বিত আশা প্রকাশ করিতেছেন। ঝড়ের যে একটা ক্রম-পরিণত বাস্তবরূপ তাহা কবি-কল্পনার বিস্তারের মধ্যে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে এবং পূর্বাপর একটা ঐক্যের সুর বেশ বজায় আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে আগুন্ত ঝড়ের বর্ণনা নাই, তৃতীয় স্তবক হইতেই ঝড়ের বস্তুসত্তা বিলীন হইয়া গিয়াছে। ঝড়কে তিনি অন্তর্লোকে আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং ঝড় তাঁহার কাছে একটা উপলক্ষ মাত্র। অন্তর্জীবনে এই ঝড়কে তিনি 'নূতন'রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই ঝড়ই তাঁহার 'সদ্যোজাত মহাবীর', 'বিজয়ী রাজসম', 'কুমার'। অন্তর্জীবনে প্রবেশ করার পর হইতে ঝড়ের আর পৃথক অস্তিত্ব নাই। 'উন্মাদিনী কালবৈশাখী' ঐ নূতনরূপে একেবারে পবিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের বর্ণনা এই কবিতার উদ্দেশ্য নয়। তাই এই কবিতার নাম কোনো 'ঝড' নয়, ইহা 'বর্ষশেষ'। কালবৈশাখীর ঝঞ্চা তাঁহাকে কি সংকেত, কি ইঙ্গিত দিল, মনোজগতে কি পরিবর্তন করিল, তাহারই আবেগ-সংক্ষুব্ধ ইতিহাসই ইহার বিষয়বস্তু।

ঝড়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতেও উভয় কবির মধ্যে পার্থক্য আছে। সমাজবিধির ধ্বংসসাধনে ও মানুষের সর্বাঙ্গীণ বন্ধনমুক্তিতে যে এই পৃথিবীর বুকে এক স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিবে, এই স্বপ্নেই শেলী বিভোর ছিলেন। সেই আদর্শরাজ্য যে বাস্তবে সম্ভব হইতেছে না, সেইজন্যই তাঁহার হৃদয়ের প্রচণ্ড বিক্ষোভ, সমাজের বিরুদ্ধে, জগতের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহ। এই আদর্শের অসফলতার জন্যই তিনি 'জীবনকণ্টকে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত'। তাই প্রকৃতির বুকে এই প্রবল আলোড়নকারী ঝড়কে তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত নবযুগের দৈববাণীর ভেরীবাদক বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। ঝড় যেন তাঁহাকে তাহার বীণা করিয়া তোলে এবং কবির নবযুগ প্রবর্তনের বাণীকে জগতে প্রচার করিয়া নবযুগ প্রবর্তন করে। ঝড় সংহারক ও সংরক্ষক—সে পুরাতনকে ধ্বংস করিবে, নূতনের প্রবর্তন করিবে। শীতের পরে যেমন বসন্ত আসে, ঝড়ের দ্বারাও সেইরূপ এই ব্যথাহত, নৈরাশ্যমথিত, নিপীড়িত জগতে স্বাধীনতা, প্রেম ও শান্তির নূতন রাজ্য আনীত হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঝড়কে দেখিয়াছেন রুদ্রের প্রতীক হিসাবে। রুদ্র কঠিন আঘাতে ভোগাকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, লোভের বিলোপ সাধন করিয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পত্তন এবং বৃহত্তর জীবনের সৃষ্টি করেন। তিনি ধ্বংসের দেবতা, আবার তিনিই কল্যাণের দেবতা। তিনি কল্যাণের জন্যই ধ্বংস করেন—প্রেয়কে নাশ করিয়া শ্রেয়ঃকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রুদ্রই কবির কাছে ঝড়ের বেশে আসিয়াছিলেন। আঘাতের দ্বারা কবির

বৃহত্তর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহার আগমন। তাই ঝড়কে কবি আহ্বান করিয়াছেন তাঁহার 'ছোট-আমি'কে নাশ করিয়া 'বড-আমি'র প্রতিষ্ঠার জন্য—তাঁহার আত্মপোলব্ধির জন্য—তাঁহার অধ্যাত্ম-পিপাসার শান্তির জন্য। একজন ঝড়কে আহ্বান করিয়াছেন, অবাস্তব, কল্পিত অপ্রাপ্য এক আদর্শরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আর একজন গভীর অধ্যাত্মজীবনের জন্য—আত্মোপলব্ধির জন্য।

ভাবেব পরিণতিও দুই কবিতায় দুই প্রকারের হইয়াছে। শেলীর কবিতায় ঝড়ের একটা বস্তুনিষ্ঠ রূপ ধীরে ধীবে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং শেষে এই ঝড বিদ্রোহী কবির নববাণীর প্রচারকে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র মিলিয়া ভাবের একটা সুবিন্যস্ত সংগীতময় রূপমূর্তি গড়িয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথেব কবিতাতেও ভাবেব ঐক্য সমানভাবে বজায় আছে। কাল-বৈশাখীর ঝড়ই তো 'নূতন', 'কুমার', 'সদ্যোজাত মহাবীর',—সেই তো রুদ্র। রুদ্রই তো শিব—পরমকল্যাণময়—সৃষ্টির দেবতা—নতুনেব দেবতা। সুতরাং ভাবের ঐক্যের কোনো হানি হয় নাই। দুইটি কবিতায় দুই প্রকার ভাবের পরিণতি সাধিত হইলেও উভয় কবিব আদর্শ ও অনুভূতির রূপ স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথেব কবিতায় যুগযুগান্তবের বিরাট স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা, আত্মস্বরূপের উপলব্ধির জন্য ব্যাকুলতা ও অখণ্ড জীবনের আস্বাদ গ্রহণের একাগ্রতা অপূর্ব কাব্যে রূপায়িত হইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার পিছনে আছে বিরাট ভারতীয় অধ্যাত্ম-সংস্কৃতি।

শেলীর কবিতায় এক অপ্রাপণীয়, বায়বীয় আদর্শ রাজ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা, অপূর্ব আবেগ ও মনোহর সংগীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পিছনে আছে, সমাজদ্রোহিতা, নাস্তিকতা, বিচলিত বিশ্বাস ও নিষ্ফল ক্রন্দন।

সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় দুইটি কবিতা এক নয় এবং এক মাপকাঠিতে তাহাদের বিচার হইতে পারে না।

'বৈশাখ' কবিতায় কবি সর্বত্যাগী, বৈরাগ্যব্রতী, রুদ্রদেবতাকে আহ্বান করিতেছেন। ভাষা, ছন্দ, ভাব ও গাম্ভীর্যে এই কবিতাটি 'বর্ষশেষ'-এর পরিপূরক। সুখ-দুঃখ-আশা-নৈরাশ্যক্লিষ্ট, খণ্ডিত, ক্ষুদ্র জীবন নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাক এবং তাহারই উপর ত্যাগের, বৈরাগ্যের গৈরিক পতাকা উড্ডীন হোক, ধ্বংসের উপর নবসৃষ্টির উদ্ভব হোক—ইহাই কবির কামনা। ধ্বংসের অর্থ শূন্যতা নয়, নবসৃষ্টি—পুরাতনের পরিবর্তনে নূতন যুগের আবির্ভাব—নবতম, মহত্তম সত্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশ। ধ্বংস-দেবতাকে জীবনে আহ্বান অর্থে ত্যাগ, বৈরাগ্য, অনাসক্তি, সংযম ও শুচিতাকে বরণ করা, কারণ এইগুলিই তাঁহার স্বরূপ। কবি গ্লানিহীন,

ক্লেদহীন, নির্মল ও শান্ত চিত্তে নবতম ও মহোত্তম সত্যকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ধ্বংস-যজ্ঞের পর রুদ্রদেবতা শান্তির অমৃত-বাণীতে নবযুগ ঘোষণা করিবেন।

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।
… … …
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন,—

"দুঃখসুখ, আশা ও নৈরাশ্যের দ্বারা ক্রমাগত জীবনকে খণ্ডিত করিয়া আপনার দিকে তাহাকে টানিয়া রাখিবার যে বেদনা কবিকে পীড়ন করিতেছিল, সেই আপনার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সমস্ত 'কল্পনা'র কবিতাগুলির মধ্যে কি কান্না! সেই আপনার সমস্ত সুখদুঃখের উপরে বৈশাখের রুদ্র-রৌদ্র-বিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যের গেরুয়া অঞ্চল পাতিয়া দিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষাই 'হে রুদ্র বৈশাখে'র গম্ভীর ছন্দে পাইয়াছে।"

কবি এই নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়া, জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে একবার নীরবে চিন্তা করিয়া লইবার জন্য আত্মস্থ হইতে চাহিতেছেন। এই আত্মস্থ হইবার—এই আত্ম-বিচারেব উপযুক্ত সময় রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা। তাই 'রাত্রি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রাত্রির সভাকবি হইতে চাহিতেছেন। দিনের কর্ম-কোলাহলের শেষে, যখন চরাচর সুপ্তি-মগ্ন, তখন রাত্রির জাগরণ। এই রাত্রির জাগরণের মধ্যে কবিও পূর্ণ-সচেতন অবস্থায় আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে চাহিতেছেন। জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, যাঁহারা নব নব সত্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা রাত্রির নির্জনতা ও নিঃশব্দতার মধ্যেই ধ্যান করিয়াছেন।

কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর।
তোমার নির্বাক মুখে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল বসি
কত ভক্ত জুড়ি দুই কর।

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যঃস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা-কাতর,
চকিত বিদ্যুৎ-রেখাবৎ
তোমার নিখিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।

কবিও রাত্রির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যেন সেই সব মুনি, ঋষি ও ভক্তদের সঙ্গে তাঁহারও স্থান নির্দিষ্ট হয়,—রাত্রির ধ্যানমৌন সভায় কবিরূপে যেন তাঁহার আসন মিলে।

হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি।

১২

ক্ষণিকা

(১৩০৭)

কবি পূর্বজীবনের নিকট, প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম উপভোগের জীবনের নিকট, শিল্পীর নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য-রস-পানের জীবনের নিকট বিদায় লইয়া মহাজীবনের পথে, আত্মোপলব্ধির পথে, নিগূঢ় অধ্যাত্ম-জীবনের পথে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম সত্তা তো কবির সত্তা ; তিনি আর যাহা কিছুই হন, তিনি সর্বাগ্রে কবি, কবির হৃদয়, কবির কল্পনাই তাঁহাকে তাঁহার জীবনের সমস্ত ভাবে ও কর্মে প্রবর্তিত করিয়াছে। নিজেই তিনি সে কথা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন,—"জীবনের দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ যখন সেই চক্রকে সমগ্ররূপে দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই।" [সপ্ততিতম জন্মোৎসবে কবির অভিভাষণ]

কবি-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে উহা বিশেষরূপে ভোগপ্রবণ। কবির কার্যই ভোগ—বিচিত্র রসভোগ। রবীন্দ্রনাথ এতদিন প্রকৃতি ও মানবের বহু-

বিচিত্র রস, বহু-প্রকারে উপভোগ করিয়াছেন। অবশ্য এই ধরণী ও মানুষ, এই জগৎ ও জীবনই—কবিপ্রেরণার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উৎস। রবীন্দ্রনাথও ইহাদের গান সারাজীবন ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন। তবুও ভিন্ন প্রকার রসের সন্ধানে আজ তিনি নূতন পথে যাত্রা করিতেছেন। কবি-জীবনের প্রথম হইতেই তিনি প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম উপভোগ করিয়াছেন। চিরসৌন্দর্য-মাধুর্যময়ের রস এতদিন কবি এই বিশ্বের মধ্য দিয়া—প্রকৃতি ও মানবের মধ্য দিয়া—পান করিয়াছেন। এ রসের হয়তো চরম উপভোগ হইয়া গিয়াছে। এখন সেই সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের চিরন্তন উৎসের ধারে গিয়া সেই পরম সৌন্দর্যময় ও রসময়ের নব নব প্রত্যক্ষসম্বন্ধের মধ্য দিয়া এক অভিনব রস পান করিতে চাহেন। অবশ্য ইহাও একপ্রকার ভোগ। ইহাও তাঁহার কবি-প্রকৃতিরই একটি অংশ। তবে এই ভোগের পথ ও পাথেয় ভিন্ন ধরনের। এই পথে প্রকৃতি ও মানব পিছনে পড়িয়া রহিল—কবি চলিলেন তাহাদের স্রষ্টার সন্ধানে—পূর্ণজীবনের জয়ধ্বনিময় গম্ভীর সংগীতে আকৃষ্ট হইয়া ধূসর রহস্যময় দিগন্তের পানে। এ পথের পাথেয় ত্যাগ ও বৈরাগ্য, তাহার জন্য কবি 'চৈতালি' হইতেই 'কথা', 'কাহিনী' ও 'কল্পনা'র মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন—তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিতেছিলেন। 'কল্পনা'র পর হইতে কবির নূতনপথে যাত্রা আরম্ভ হইল।

তবে কবি এই ধরণীর মানুষ—এই প্রকৃতি ও মানবের সহিতই তাঁহার চিরকালের সম্বন্ধ; এবং একথা নিঃসন্দেহ যে, এই প্রকৃতি ও মানবের রসই তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা উপাদেয় ও লোভনীয় রস। সুতরাং ইহাকে যে ছাড়িলেও অনায়াসে ছাড়া যায় না এবং ছাড়িতেও দারুণ বেদনাবোধ হয়, ইহা স্বাভাবিক। এই বেদনা কিছু ভুলিয়া থাকা বা লঘু করার উদ্দেশ্যে কবি 'ক্ষণিকা'য় নিতান্ত আবেগহীনভাবে, সহজ দৃষ্টিতে এই রসের ক্ষেত্রকে একবার দেখিয়া লইতেছেন ও কৌতুকের আবরণে চোখের জল মুছিতেছেন। কোনো বিতর্ক, বিচার না করিয়া, কোনো চিন্তা-ভাবনায় আন্দোলিত না হইয়া, কোনো সামাজিক নিয়ম বা চিরপ্রচলিত প্রথাকে না মানিয়া, কোনো সুখে-দুঃখে উদ্বেলিত না হইয়া, সহজ, সরল ও সত্য দৃষ্টি দিয়া কবি এই জগৎ ও জীবনকে একবার ক্ষণকালের জন্য দেখিয়া আনন্দ আহরণ করিতেছেন। আর সেই সঙ্গে পরমপ্রিয়বস্তু-ত্যাগের অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথাকে চটুল পরিহাসের প্রলেপে ঢাকিতে চেষ্টা করিতেছেন।

বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।

[লীলা, উৎসর্গ]

এই আবেগহীন, সত্য, সহজ দৃষ্টি এবং অর্থপূর্ণ কৌতুকহাস্যের উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ দীপ্তি 'ক্ষণিকা'কে অভিনবত্ব দান করিয়াছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এমন সহজ ও সরল সত্য, এমন সহজ ভাষা ও স্বচ্ছন্দগতি লঘু ছন্দ আশ্রয় করিয়া ইহার পূর্বে কবির আর কোনো কাব্যে প্রকাশলাভ করে নাই।

এই 'ক্ষণিকা'তেই কবি প্রথমে কথ্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন ও ইহার ভাবপ্রকাশের আশ্চর্যজনক ক্ষমতা প্রমাণ করেন। এই ভাষা যেন তীরের মতো বুকে বিদ্ধ হয়, তাই লঘু কৌতুক ও সহজ ভাব প্রকাশের ইহা উপযুক্ত বাহন। বাংলা হসন্ত শব্দের প্রচুর ব্যবহারে ছন্দে লাগিয়াছে একটা অপূর্ব লঘুনৃত্যের দোলা। কথ্য ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা, সৌন্দর্য ও ধ্বনিমাধুর্য কবি 'ক্ষণিকা'তেই প্রথম বুঝিতে পারেন এবং বহু গ্রন্থে এইরূপ রচনাভঙ্গীই অবলম্বন করিয়াছেন। নৃত্যদোদুল ছন্দ, সরল কথ্য ভাষা, সহজ সত্য প্রকাশ এবং অনায়াস অলংকার-প্রয়োগে 'ক্ষণিকা, বাংলা-গীতিকাব্যে এক অভিনব স্থান অধিকার করিয়াছে। 'ক্ষণিকা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

'ক্ষণিকা'র কবিতা বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাবধারাগুলি লক্ষ্য করা যায়,—

(ক) গত জীবনের জন্য অনুতাপ বা আনন্দ প্রকাশ না করিয়া, বর্তমানের সুখ-দুঃখ ভুলিয়া, ভবিষ্যতের চিন্তা না করিয়া এবং মানবসমাজের প্রচলিত রীতিনীতি না মানিয়া কেবল ক্ষণকালের জন্য সহজ ও সরল সত্যে জগৎ ও জীবনকে দর্শন এবং উহাদের মধ্য হইতে আনন্দ আহরণের চেষ্টা,—'উদ্বোধন', 'মাতাল', 'বোঝাপড়া', 'অচেনা', 'অনবসর', 'উদাসীন', 'শেষ', 'সেকালে', 'জন্মান্তর', 'মেঘমুক্ত', 'কৃষ্ণকলি', 'দুইতীরে', 'কূলে', 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ', 'পথে', 'নববর্ষা', 'যুগল', 'যথাস্থান', 'ক্ষতিপূরণ', 'অতিবাদ', 'কল্যাণী' প্রভৃতি।

(খ) কবির চিরাভ্যস্ত ও সংস্কারগত ভোগময় জীবনের বিরুদ্ধ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জীবনকে লইয়া কৌতুক করা,—'প্রতিজ্ঞা', 'শাস্ত্র', 'কবির বয়স', 'ভীরুতা'।

(গ) এতদিনের ভোগের জীবনের নিকট হইতে শান্ত, সংযত ভাবে বিদায় লইয়া গভীরতম আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ,—'বিদায়', 'পরামর্শ, 'শেষ হিসাব', 'অতিথি', 'আবির্ভাব', 'অন্তরতম', 'সমাপ্তি'।

(ক) 'ক্ষণিকা'র প্রথম ভাবধারার কবিতাগুচ্ছের মধ্যে 'উদ্বোধন' কবিতাটি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ফলত ইহাই একরূপ 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের মর্মকথা। রবীন্দ্রনাথ সংসারের দুঃখ-বেদনা, আশা-নৈরাশ্য, ভাবনা-চিন্তার অতীত শুভ্র, মুক্ত,

এক পরমানন্দময় নবজীবন কামনা করিতেছেন। অতীতের চিন্তা ও বিতর্ক, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বর্তমানের সুখ-দুঃখের আন্দোলনই মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত করে—আনন্দ-স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে। কবি এমন এক বর্তমান মুহূর্ত আবাহন করিতেছেন, যে-মুহূর্তে অতীত-ভবিষ্যতের চিন্তা বা আশা থাকিবে না এবং বর্তমানের সুখ-দুঃখেরও কোনো উত্তেজনাময় অনুভূতি থাকিবে না। এই সমস্ত-বন্ধনমুক্ত, কাল-প্রবাহে সুন্দর শতদলের মত ভাসমান, আনন্দঘন, ক্ষণিক-বর্তমানকে কবি বরণ করিয়া লইতে চাহিতেছেন—কেবল অকারণ পুলকে সেই ক্ষণিক-দিনের উৎসব-মেলায় ক্ষণিক-জীবনের আনন্দ-সংগীত গাহিতে চাহিতেছেন—কেবল ক্ষণিকের জন্য প্রভাতের রৌদ্ররঞ্জিত শিশির-বিন্দুর মতো উজ্জ্বল জীবন যাপন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন,—

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ,
ক্ষণিক দিনের আলোকে॥

"ব্যথা, বিবেচনা, সমস্যা, সন্ধান—সব সরাইয়া ফেলিয়া ক্ষণ-প্রকাশের বুকে মুহূর্তে মুহূর্তে যে অমৃতরূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, কবি তাহাই চোখ ভরিয়া দেখিতেছেন এবং প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছেন।"

—অজিতকুমার চক্রবর্তী

'মাতাল' কবিতায় কবি সমস্ত বাধা-বন্ধন উপেক্ষা করিয়া বিচার-বিতর্ক ছাড়িয়া, চিরাচরিত প্রথা ও চিরদিনের অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন জীবনের আনন্দ উপভোগে একেবারে আত্মহারা হইতে চাহিতেছেন। সংসারের অত্যন্ত সাবধানী ও বিবেচক লোকদের গতিহীন পঙ্গু জীবনযাত্রাকে উপেক্ষা করিয়া কবি যৌবনের উদ্দাম আবেগ ও চিন্তাহীন মত্ততা লইয়া, দুরূহ, বিপৎসংকুল পথে অগ্রসর হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন,—

অশ্লেষাতে যাত্রা করে শুরু
পাঁজিপুঁথি করিস পরিহাস,
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস,

হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের 'পরে লাগাস ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও, তাই, তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া॥

'বোঝাপড়া'য় কবি বলিতেছেন, সংসারে পরিপূর্ণতা বা সর্বাঙ্গসুন্দরতা আশা করা যায় না। এখানে জীবন ভালো-মন্দে মিশ্রিত ও সুখ-দুঃখে জড়িত। তাহা লইয়া খুঁতখুঁত করিলে আমাদের দুঃখ বাড়ে বই কমে না। অকারণ অসন্তুষ্টির দ্বারা নিজের জীবনকে দুঃখময় করা বা বিধির বিধানকে নিন্দা করা বৃথা। সুতরাং এই সুখদুঃখময়, অপূর্ণ জীবনকেই আমাদের সহজ সত্যে গ্রহণ করা উচিত। তাই কবি বলিতেছেন,—

মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

'অচেনা' কবিতাটিতেও প্রায় অনুরূপ ভাবের কথাই আছে। সংসারে মানুষের ব্যবহারে আমরা বাহিরে যাহা পাই, তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত, তাহার মনে কি আছে, তাহা আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের মন বিশ্লেষণ করিয়া উদ্দেশ্য নিরূপণ করিতে গেলে অনেক সময় প্রকৃত সত্য পাওয়া যায় না— কেবল বিড়ম্বনাই সার হয়, কারণ মন দুর্জ্ঞেয়। সংসারে দেনা-পাওনার পশ্চাতে মনের প্রশ্ন না তোলাই ভালো, কেবল বাহিরে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেই জীবনকে আনন্দময় করা যায়। তাই কবি বলিতেছেন,—

চাই নে রে, মন, চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে, মন, তাই নে।

'অনবসর' কবিতায় কবি বলিতেছেন, যে-প্রেম জীবনের বর্তমান অভিজ্ঞতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাহার সোনার স্মৃতিকে চিত্তমন্দিরে বসাইয়া অশ্রুজলের মালা গাঁথিয়া পূজা করা বৃথা। বর্তমান লইয়াই মানুষের জীবন—বর্তমানের বহু আকর্ষণ, বহু আনন্দ, বহু বৈচিত্র্য আমাদের দ্বারে উপস্থিত। তাহাদেরই দাবি মিটাইয়া পুরাতনের জন্য বিলাপ করিবার অবসর খুব কম। তাই কবির কথা,—

যে যায় চলে বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে কাটাই, এমন
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

অনাসক্ত অবস্থায়, সহজ জীবনের সহজ আনন্দটুকু কবি উপভোগ করিতে চাহেন 'উদাসীন' কবিতায়। তিনি জীবনে সুযোগ-সুবিধার অপেক্ষায় বসিয়া নাই; দুরাকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটিও তিনি করেন না; নিজের অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট; পরের জিনিস তিনি চাহেন না; নিজের বস্তুনাশেও তাঁহার দুঃখ নাই, বা কাহারো উপর অসন্তুষ্টিপ্রকাশ নাই। জীবনের সমস্ত আসক্তি-কামনা ত্যাগ করিয়া কবি এক সহজ জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন,—এ জীবনে কেবল মুক্তি ও খেলার আনন্দ।

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মণি ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি করে খেলাঘরে এসে
জুটেছি।
বুক-ভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া,
যাঁর বেড়ী তাঁরে ভাঙা বেড়ীগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি।

এই কিছু-না-চাওয়ার ও কিছুতে-জড়াইয়া-না-পড়ার জীবনই তাঁহাকে অপ্রত্যাশিত সার্থকতা দিয়াছে—

দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে—
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি
পিছুতে।
সবলে কারেও ধরিনি বাসনা-মুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে;
যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে
নিচুতে।

'শেষ' কবিতাটিতে জীবনের ক্ষণিকতাবাদের আনন্দ ব্যক্ত হইয়াছে। সৃষ্টি ক্রমাগত ধ্বংসের মধ্য দিয়া চলিতেছে। জীবনও শীঘ্রই শেষ হইবে। এই ক্ষণস্থায়ী

জীবনের আরো ক্ষণস্থায়ী আনন্দটুকু নিঃশেষে নিংড়াইয়া লইবার জন্ত দ্রুত প্রবাহমাণ কালের পিছনে আমাদের ছুটা প্রয়োজন।

থাক্‌ব না থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না, ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে
কালের পিছু পিছু।

এই সহজ, ভারমুক্ত জীবনের আনন্দে কবি আজ বাংলা-পল্লীব ঘাটে, মাঠে, বাটে, নদীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—অন্তরে তাঁহার পরিপূর্ণ তৃপ্তি। ছায়া-ছবির মতো এক একটি দৃশ্য তাঁহার চোখেব উপর ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে, আর তিনি শান্তচিত্তে কেবল তাহাদের সৌন্দর্যের উপর প্রীতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া যাইতেছেন। তিনি অকারণে গাঁয়ের পথে বেড়াইতেছেন,—

গাঁয়ের পথে চলেছিলাম
অকারণে,
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে।
... ...
দিঘির জলে ঝলক ঝলে
মাণিক-হীরা,
সর্ষে ক্ষেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে,
কত গাছের ছায়ে ছায়ে,
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে॥ [পথে]

কবি ভাঙন-ধরা নদীর কূলে, আঘাটায় বিনা প্রয়োজনে বসিয়া আছেন ; সেখানে

ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।
সকাল বেলা অরুণ আলো
পড়ে জলের 'পরে,

নৌকা চলে দু-একখানি
অলস বায়ুভরে।

... ...

জলের 'পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর শাখা হতে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে। [কূলে]

মেঘমুক্ত বর্ষা-প্রাতে পুকুর ঘাটে কবি সকলকে আহ্বান করিতেছেন,—

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয়।
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায়।
ঝিকি ঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট,
পথের দুধারে শাখে শাখে আজি
পাখিরা গায়। [মেঘমুক্ত]

বাংলার নদীর দুই পারের দুইটি চমৎকার ছবি কবির চোখে ভাসিতেছে—নদীর এক তীরে বালুচর, আরেক দিকে ঘনছায়া-ঢাকা গ্রাম।—

নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর!
যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশী সব
হাঁসের বসবাস।
কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সন্ধ্যেবেলায় ভিড়ে।

ওই ওপারের বন
যেথায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।
যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুইধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।
সকাল-সন্ধ্যে-বেলা
ঘাটে বধুর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে, ভাসায় ভেলা। [দুই তীরে]

কখনো কবি 'মেঘলা দিনে' 'ময়নপাড়ার মাঠে' কালো মেয়ে কৃষ্ণকলির 'কালো হরিণ-চোখ' দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। কখনো অজানা সাগরে পাড়ি দিয়া, কোন্ সুদূর অচেনা দেশে বাণিজ্য-যাত্রা করিতেছেন,—সেখানে অজস্র সৌন্দর্যের বেসাতি—

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে,
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।...

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নদ-নদী।
সোনার রেণু আনব ভরি
সেথায় নামি যদি।

(বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ)

রবীন্দ্রনাথ সুদূরপ্রসারী কল্পনায় একেবারে কালিদাসের কালে উপস্থিত হইয়া সেকালের একজন কবি হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। 'সেকাল' কবিতায় কবি কালিদাসের কালের সমস্ত সৌন্দর্যময় পরিবেশ ও আবহাওয়াকে অনুপম চিত্রাবলীতে রূপায়িত করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যের ঘনীভূত নির্যাস যেন তার সেই স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ লইয়া এ যুগের বিস্ময়মূঢ় পাঠকদের লোলুপ জিহ্বার কাছে উপস্থিত হইয়াছে—এমনই শব্দযোজনা ও আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার কৌশল। রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের কাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব প্রবল ছিল, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার বহু কবিতায়, বিশেষত বর্ষার কবিতায় এই প্রভাব সুস্পষ্ট।

বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের মালিকায় দশমরত্ন হইয়া কালিদাসের মতো সেকালের কবিত্বময় জীবনযাত্রা উপভোগ করিবার ইচ্ছা কবির। একটি শ্লোকে রাজার স্তুতিগান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া উজ্জয়িনীর প্রান্তে কবি কানন-ঘেরা বাড়ি চাহিয়া লইতেন। আর সেখানে

রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বসত সন্ধ্যা হলে,
ক্রীড়া-শৈলে আপন-মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।

তিনিও কালিদাসের মতো ঋতুসংহার কাব্য রচনা করিতেন,—

ছ'টা ঋতু পূর্ণ ক'রে
ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছ'টা সর্গে বার্তা তাহার
রৈত কাব্যে গাঁথা।

কালিদাসের কাব্যের নায়িকারা, তাহাদের সখাবৃন্দ, তাহাদের বেশ-বাস, হাব-ভাব, চিত্তবিনোদনের রীতি-নীতি, বিরহ-মিলন-লীলা, কবির কল্পনাকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার প্রিয়াও

কুরুবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রৈত হাতে
কী জানি কোন্ কাজে।

অলক সাজত কুন্দফুলে,
শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নব-নীপের মালা।

ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্ররেণু
মাখত মুখে বালা।

রবীন্দ্রনাথ শেষে এই সান্ত্বনা লাভ করিতেছেন যে কালিদাসের কাব্যের নায়িকাদের সঙ্গে তাঁহার দেখা না হইলেও, আধুনিক কালের নারীরা বর্তমান আছে। যদিও আধুনিকাদের বেশভূষায় ও চালচলনের বিস্ময় পার্থক্য, তবুও হাবভাবে বুঝা যায় যে নারী চিরন্তনী,—

তবু, দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।
মরব না, ভাই, নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে—
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্যলোকে।

রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা সান্ত্বনা ও আনন্দ এই যে কালিদাসের কাব্য পাঠ

করিয়া তিনি সে-যুগের আভাস পাইতেছেন, কিন্তু কালিদাস তো রবীন্দ্রনাথের যুগের কোনো আভাসই পাইতেছেন না,—

আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে—
কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে।

তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান নি মহাকবি।

বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তার ছবি।

কবির কল্পনা আজ অবারিত—উদ্দাম। তিনি সুসভ্য নব্যবঙ্গ ছাড়িয়া পরজন্মে ব্রজের রাখাল-বালক হইয়া গোপলীলার আনন্দ উপভোগ করিবার কামনা করিতেছেন। 'জন্মান্তর' কবিতাটি বৈষ্ণবপদাবলীর গোষ্ঠলীলার মাধুর্য ও পরিবেশে অপরূপ সমৃদ্ধ। তিনি তাহাদের দলের একজন হইবেন,

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে;
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে—
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে।

কবির হৃদয় আজ অনাস্বাদিতপূর্ণ আনন্দে ভরপুর। বর্ষা-প্রকৃতির বিচিত্ররূপ তাঁহার চক্ষে সৌন্দর্যের এক নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে—তাঁহার চিত্ত-ময়ূর আনন্দ-নৃত্যে মাতোয়ারা। 'নববর্ষা' কবিতায় কবির এই আনন্দ ছন্দের লীলায়িত গতিতে, শব্দের মনোহর সংগীতে, চিত্রের পর চিত্রযোজনার পারিপাট্যে যে অপূর্ব সুন্দর রূপ গ্রহণ করিয়াছে, বাংলা গীতি-কাব্যের জগতে তাহার জুড়ি মেলা ভার। এই কাবতাটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনার শ্রেণীভুক্ত ও কবির গীতিকাব্য-প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

বর্ষার সজল স্নিগ্ধ-নীল মেঘ গুরু গুরু গর্জনে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে;

বায়ুচালিত বাদলের ধারা ছুটিয়া চলিয়াছে; বাতাসের বেগে নবীন আউশ ধানের মাথাগুলি ক্রমাগত দুলিতেছে; ভিজা পায়রাগুলি আশ্রয়-কোটরে কাঁপিতেছে ভেকের একটানা ডাকে চারিদিক আচ্ছন্ন। কবি দেখিতেছেন, এই নবীন বর্ষা-প্রকৃতির মধ্যে উজ্জ্বল আনন্দের এক অপরূপ লীলা চলিতেছে; কবির হৃদয় এই আনন্দের তীব্র স্পর্শ লাগিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। কবি মনে করিতেছেন, নববর্ষার সজল মেঘে, নবীন তৃণদলে, প্রস্ফুটিত কদম্ব-কুঞ্জে যে আনন্দ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা তাঁহার প্রাণের আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতির আনন্দের সহিত তাঁহার মনের আনন্দের একটা নিবিড় সংযোগ ঘটিয়াছে।

সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে এক সুন্দরী তরুণীর লীলা কবি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দূর আকাশে বিদ্যুৎ-চমকিত নবীন মেঘপুঞ্জ দেখিয়া কবির মনে হইতেছে যেন এক সুন্দরী তরুণী উচ্চ প্রাসাদ-শিখরে নীলাম্বরী পরিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। পদক্ষেপের তালে তালে তাহার অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণের তীব্র দীপ্তি শিথিলিত নীল-বসনের ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। কখনো বর্ষাধৌত-প্রকৃতির নির্মলতা, নদীতীরের শ্যামল তৃণদল, স্রোতোবাহিত আবর্জনা ও ফেনপুঞ্জের অপসরণ ও মালতীফুলের শীঘ্র ঝরিয়া পড়া দেখিয়া কবি মনে করিতেছেন, যেন সেই সুন্দরী নদীতীরে অমল-শ্যামল আসনে বসিয়া জল-ভরণে আগতা বিরহ-বিধুরা গ্রাম্যবধূর ন্যায় দূর আকাশের দিকে তাকাইয়া অন্যমনস্কভাবে নদীপাড়ের মালতীফুলগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দাঁতে চিবাইতেছে; কখনো বনফুলের অজস্র ফোটা ও বাদল-বাতাসে ঝরিয়া পড়া দেখিয়া কবি মনে করিতেছেন, সেই সুন্দরী যেন বকুলশাখায় দোলা বাঁধিয়া দোদুল দোল খাইতেছে, তাহার আঁচল উড়িতেছে, কবরী খসিয়া পড়িতেছে, আর সেই গতিবেগে বকুল ফুলগুলি ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। আবার বাদল-হাওয়ায় প্রস্ফুটিত কেয়াফুলের পাপড়িগুলি ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়া কবি মনে করিতেছেন, সেই সুন্দরী তাহার নূতন তরণী লইয়া আসিয়া কেতকী-নদীর ঘাটে লাগাইয়া তাহার শৈবালদল তুলিয়া আঁচল ভরিয়া লইয়া যাইতেছে।

এই সুন্দরী বর্ষারাণী। এই বর্ষারাণীর অপরূপ সৌন্দর্য ও লীলায় কবি আনন্দোদ্বেল হইয়া উঠিয়াছেন,—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ;

আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মত নাচে রে।

ক্ষণিক জীবনের সহজ আনন্দ-উপভোগের মেলায় নামিয়া কবি মানব ও প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে তাঁহার নিজস্ব কবি-জীবনের আনন্দও একবার সহজ, সরলভাবে উপভোগ করিতে চাহেন। প্রেম ও সৌন্দর্য কবির পরম কাম্য। আজ তাহা হইতে বিদায় লইবার কালে, সরল সত্যভাবে উহা স্বীকার করিয়া কবির চিরন্তন মর্মকথাকে প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন। তীব্র সত্য অনুভূতি ও অসংকোচ প্রকাশের ঔজ্জ্বল্যে 'যথাস্থান' কবিতাটি অপরূপ দীপ্ত। কবির বক্তব্য এই যে, প্রেমই কবির গানের উৎস। কবির গানের প্রকৃত স্থান তরুণ-তরুণীর প্রেমের মধ্যে। পণ্ডিতের মধ্যে তাহার স্থান নাই—ধনী বৈষয়িক লোকের দিকে তাহার টান নাই, পরীক্ষাভারপীড়িত বিদ্যার্থীমহলেও তাহার সম্মান নাই,—অর্ধশিক্ষিত বঙ্গবধূদের মধ্যেও তাহার পূর্ণ আশ্রয় মিলিবে না। কেবল প্রকৃতির সহজ আবেষ্টনীতে তরুণ-তরুণীর নিভৃত, সরল প্রেম-মিলনের মধ্যেই কবির কাব্যের প্রশস্ত স্থান। নরনারীর প্রেমই কবির কাব্যের চিরন্তন বিষয়বস্তু।

যেথায় সুখে তরুণ যুগল
পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে
সবার আঁখি এড়ায়,
পাখি তাদের শোনায় গীতি,
নদী শোনায় গাথা,
কতরকম ছন্দ শোনায়,
পুষ্প লতা পাতা—

সেইখানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
বিশ্ব-বাঁশির ধ্বনির মাঝে
যেতে কি সাধ আছে?
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া
কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান।

'ক্ষতিপূরণ'-এ কবি বলিতেছেন, পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাঁহাকে নিন্দা করিতেছে যে তিনি প্রেমের কবিতা লিখিতেছেন—তাঁহার কাব্য কেবল তাঁহার প্রিয়ার সৌন্দর্যের ছবি ও প্রিয়ার প্রতি প্রেম-নিবেদনে পূর্ণ, উহাতে কোনো গভীর বিষয় নাই। কবি তাঁহার প্রিয়াকে বলিতেছেন,—

তোমার তরে সবাই মোরে
করছে দোষী
হে প্রেয়সী।

বলছে—কবি তোমার ছবি
আঁকছে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্ছে নিতি
তোমার কানে ;

নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাকছে শেষে বাংলাদেশে
উচ্চ কথা।

কিন্তু কবি তাহাতে বিচলিত নন, সেই নিন্দায় তিনি পরম গৌরব অনুভব করেন। প্রিয়ার নয়নের প্রেমদৃষ্টি ও তাহার নিবিড় আলিঙ্গন যদি তিনি পান, তবে বিশ্বসুদ্ধ লোকের ক্রুদ্ধ সমালোচনাকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, আট সর্গে বীররসপূর্ণ এক মহাকাব্য রচনা করিয়া লোকের প্রশংসা ও খ্যাতি লাভ করিবেন, কিন্তু প্রিয়ার কংকণ-ঝংকারে মহাকাব্যের সে কল্পনা ভাঙিয়া গিয়া শত শত প্রেম-সংগীতে পরিণত হইয়াছে। এখন দেখিতেছেন যে প্রিয়ার পায়ের তলায় শত শত মহাকাব্য গড়াগড়ি যাইতেছে। প্রিয়ার প্রেমের জন্য তিনি ভবিষ্যতের কীর্তির আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু সে খ্যাতির ক্ষতি তাঁহার পূরণ হইয়াছে, কারণ প্রিয়ার হৃদয় তিনি লাভ করিয়াছেন,—

লোকের মনে সিংহাসনে
নাইকো দাবি,
তোমার মনো-গৃহের কোনো
দাও তো চাবি।
মরার পরে চাইনি ওরে
অমর হতে।
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে।

'যুগল' কবিতায় কবি বলিতেছেন, প্রেমের ক্ষণিক অনুভূতি প্রেমিক-প্রেমিকার নিকট নিত্যকালস্থায়ী বলিয়া বোধ হয়—মিলনেব ক্ষণিক আনন্দ যুগযুগান্তরব্যাপী স্থায়ী মনে হয়। তাই তাহাদের নিভৃত মিলন-মুহূর্ত এই সংসারের বহু ঊর্ধ্বে এক অত্যাশ্চর্য, অনির্বচনীয় মুহূর্ত। শাস্ত্রশাসন, রাজ্যশাসন, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের শাসনের কোনো প্রভাব সেখানে নাই। তাই প্রেমিকের মিনতি—

ঠাকুর, তবে পায়ে নমোনমঃ,
পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম,
আজ বসন্তে বিনয় রাখ মম,
বন্ধ করো শ্রীমদ্ভাগবত।

শাস্ত্র যদি নেহাৎ পড়তে হবে
গীতগোবিন্দ খোলা হোক না তবে,
শপথ মম, বোলো না এই ভবে
জীবনখানা শুধুই স্বপ্নবৎ।
একটা দিনের সন্ধি করিয়াছি,
বন্ধ আছে যমরাজের সমর,
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।
... ...
ক্ষুদ্র মেদের এই অমরাবতী
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।

বসন্তের উন্মাদনায় কবির চিত্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে—'চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা'। অতিরঞ্জনের দিকে ঝোঁক হইয়াছে প্রবল। সর্বজনসম্মত সত্য কথা তিনি আজ নাও বলিতে পারেন—কিন্তু তাঁহার প্রাণের সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িবে। সে-কথা এই, তাঁহার প্রিয়ার সৌন্দর্য ও প্রেমেই তিনি মহিমান্বিত। সেই সৌন্দর্য ও প্রেমের জয়গানই তাঁহার কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। এই ভাবটি 'অতিবাদ কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন,—

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকল প্রকার অজগ্রহ।......
হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী,
আমার যত কাব্যপুঁথি
তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি,
তোমারি নাম বেড়ায় রটি;

থাকো হৃদয়-পদ্মটিতে
এক দেবতা আমার চিত্তে—
চাইনে তোমায় খবর দিতে
আরো আছেন তিরিশ কোটি।...
ওগো সত্য বেঁটে-খাটো
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো
কণ্ঠ আমার যতই আঁটো,
বলব তবু উচ্চস্বরে—

আমার প্রিয়ার মুগ্ধদৃষ্টি
করছে ভুবন নূতন সৃষ্টি
মুচকি হাসির সুধার বৃষ্টি
চলছে আজি জগৎ জুড়ে।

'কল্যাণী' কবিতাটিতে কবির এই মনোভাবের, এই সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির চরম প্রকাশ হইয়াছে। ইহার পরিপূর্ণতা ও গভীরতা উচ্চ স্তরের। রবীন্দ্রকাব্যের ইহা একটি সমুজ্জ্বল রত্ন।

এই কবিতায় নারীর চিরকল্যাণময়ী মূর্তিকে রবীন্দ্রনাথ পরমশ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছেন। নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের বিকাশই তাহার কল্যাণী মূর্তিতে। 'রাত্রে ও প্রভাতে', 'দুই নারী' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীর সমস্ত ভোগের ঊর্ধ্ব-বিহারিণী যৌবন-চাঞ্চল্যহীনা, স্নিগ্ধ-শান্ত-শ্রীমণ্ডিতা, মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তিকে নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া পূজা করিতেছেন। বিশ্বের যৌবন-কামনার মূর্তিমতী প্রকাশ, দীপ্ত অগ্নিশিখারূপিণী উর্বশীজাতীয়া নারী অপেক্ষা স্নিগ্ধ-শান্ত-সৌন্দর্যশালিনী, কল্যাণী, লক্ষ্মী-রূপিণী নারীকে কবি তাঁহার কাব্যে উচ্চতর আসন দিয়াছেন।

নারী পুরুষের ভোগবাসনাতৃপ্তির উপকরণ নয়, মাতৃত্বেই নারীত্বের চরম পরিণতি। শিশুর কলরবমুখর গৃহ স্বর্গতুল্য। এই গৃহে নারী সর্বদা সকলের সেবা ও যত্নে নিরন্তর কল্যাণব্রত পালন করিতেছে ও সংসার-শ্রান্ত পুরুষকে নিজ হৃদয়ের সুধা পরিবেষণ করিতেছে। এই পরিবর্তনশীল সংসারে যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব-বার্ধক্যের পরিবর্তনে এই কল্যাণীর কোনো পরিবর্তন হয় না। তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার হৃদয়ে এই সেবাময়ী কল্যাণী চিরন্তন জাগরূক থাকে ও চিরদিন সকলকে কল্যাণ বিতরণ করে,—

নিভে নাকো প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে।

এই কল্যাণী আছে বলিয়াই গৃহে শান্তির আশা; এই কল্যাণীর সহানুভূতি ও প্রেমেই সংসার-ঝড়ে ছিন্নভিন্ন-জীবন পুরুষ কোনো রকমে বাঁচিয়া থাকে। কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য-অর্ঘ্য এই কল্যাণীর জন্য নিবেদিত হইয়াছে,—

তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে;
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল
মুকুল খসে পড়ে।
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে।

(খ) ক্ষণিকার এই ধারার কবিতায় কবি ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে লইয়া কৌতুক করিয়াছেন। ত্যাগের পথে, তপস্যার পথে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে—জীবনের সমস্ত দিক্‌চক্রবাল ব্যাপ্ত হইয়া একটা উদার বৈরাগ্যের গেরুয়া আসন পাতা হইয়াছে। পিছন ছাড়িয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য সুকঠোর, অনিবার্য আহ্বান আসিয়াছে। কিন্তু এতদিনের বিচিত্র রসময় জীবন, সৌন্দর্য-প্রেম-মাধুর্যের বহু সমারোহ ছাড়িয়া যাইতে বেদনায় তাঁহার বুক ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, তাই বেদনাকে লঘু করিবার জন্য, উদ্গত অশ্রু লুকাইবার জন্য, কবি ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে লইয়া কৌতুক করিতেছেন। তাঁহার মনে এই দুঃখ কোনো রেখাপাতই করে নাই, এই ভাব দেখাইয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বৈরাগ্যের জীবন ভোগের বিপরীত। তাপস-জীবন নারী-প্রেমের সংস্রবশূন্য। কিন্তু নারী না হইলে রবীন্দ্রনাথের তাপস-জীবন গ্রহণ করা হইবে না। তপস্যার বলে তিনি নারী-হৃদয় লাভ করিতে চাহেন। তিনি ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইতে পারেন—যদি ঘরের বাহিরে কোনো সুন্দরী তাঁহার জন্য ভুবন-ভুলানো হাসি লইয়া অপেক্ষা করে।

কবি বলিতেছেন,—

আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
যেমনি বলুন যিনি।
আমি হব না তাপস নিশ্চয়, যদি
না মেলে তপস্বিনী।

(প্রতিজ্ঞা)

'শাস্ত্র' কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন, যৌবনগতে তপস্যার জন্য বনে যাইবার বিধান আছে। কিন্তু বনে প্রকৃতির অজস্র সৌন্দর্যের লীলা—অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার ছড়াছড়ি। ভোগত্যাগী, সন্ন্যাসব্রতী বৃদ্ধের পক্ষে তাহা উপভোগ করা অসম্ভব। সে-সমস্ত উপভোগের জন্য যুবকদের প্রয়োজন। সংসারের বকাবকি, ঝঞ্ঝাট ও হট্টগোলের মধ্যে যুবক সৌন্দর্যভোগের মুক্তক্ষেত্র পায় না। নিরালা সৌন্দর্যভোগের জন্য যুবকদেরই বনগমন কর্তব্য। বৃদ্ধদেরই ঘরে থাকিয়া অর্থসঞ্চয় করা ও মামলা-মোকদ্দমার তদ্‌বির করা উচিত। যুবকেরাই বনে যাইয়া রাত্রি জাগিয়া সৌন্দর্যভোগের কঠিন তপস্যা করুক। তাই 'মনুর বিধান শুধ্‌রে দিয়ে' কবি বিধান দিতেছেন,—

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে
আমরা বলি, বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

বনে এত বকুল ফোটে
গেয়ে মরে কোকিল পাখী,
লতাপাতার অন্তরালে
বড়ো সরস ঢাকাঢাকি।

চাঁপার শাখে চাঁদের আলো
সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে?
এ-সব যারা বোঝে তারা
পঞ্চাশতের অনেক নিচে।

'কবির বয়স' কবিতায় কবির সমালোচকেরা বলিতেছে যে, কবির বয়স হইয়াছে, কেশে পাক ধরিয়াছে, জীবন-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, এখন ভবনদীর ঘাটে বসিয়া তাঁহার পরকালের চিন্তা করা উচিত। কবি তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, কবি যদি পরকালের চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন ও মুক্তির সন্ধানে গৃহকোণে আবদ্ধ হন, তবে তরুণ-তরুণীর প্রেমলীলা ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা কে প্রকাশ করিবে? কেশে তাঁহার পাক ধরিয়াছে বটে, কিন্তু পাড়ার সমস্ত ছেলে-বুড়োর তিনি সমবয়সী। তাহাদের হাসি-অশ্রু, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রয়োজন। তিনি যদি পরকাল লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তবে এসব কাজ কে করিবে?

এই ঠাট্টার ছলে কবি যাহা বলিতেছেন, ইহাই তো কবির প্রকৃত স্বরূপের পরিচয়। জগৎ ও জীবনের, প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র রসভোগেই তাঁহার সত্তা—তাঁহার মুক্তি ও তৃপ্তির স্থান—তাঁহার আজীবন মজ্জাগত সংস্কার। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া জগৎ ও জীবনকে ছাড়িয়া, ত্যাগ ও তপস্যার পথে তিনি ভগবানের উদ্দেশে চলিলেন। এসব কবিতায় তাঁহার জীবনের সত্য পরিচয়ই তিনি দিতেছেন, কিন্তু সেটা কৌতুকচ্ছলে। বেদনাকে হালকা করিবার জন্য কবি কৌতুকপূর্ণ বাক্যভঙ্গীর আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, লোকে যেন মনে করে ইহা মনের কথা নয়—এ কেবল পরিহাস-বিজল্পিত।

এই রসজীবন-ত্যাগের এবং ত্যাগ-তপস্যার জীবনকে গ্রহণের মধ্যে একটা বিরাট দুঃখ আছে, এই দুঃখ এই কৌতুকের আড়ালে ঢাকিয়া কবি তাহাকে অনেকটা লাঘব করিতেছেন। এই কৌতুক একটা উল্টা বাক্যভঙ্গীতে ব্যক্ত হইতেছে। তাপস তিনি হইবেন না, বা পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাইবেন না, বা কেশে পাক ধরিলেও পরকালের চিন্তা করিবেন না—ইহা সত্য নয়—দুঃখের সঙ্গে তাহাই করিতে অগ্রসর হইতেছেন; এইরূপ কবি-জীবন তিনি সমর্থন করিলেও তাহা

বর্তমানে গ্রহণীয় নয়। এই সমর্থনের মধ্যে তাঁহার অস্বীকৃতি রহিয়াছে। তাই, 'ভীরুতা' কবিতায় কবি তাঁহার মানস-সুন্দরীকে বলিতেছেন,—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কিনা
বুঝব কেমন করে?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই;
ঠাট্টা করে ওড়াই, সখী,
নিজের কথাটাই।
হালকা তুমি কর পাছে
হালকা করি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই।
সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাসবি কিনা
বুঝব কেমন করে?
মিথ্যাছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই;
উল্টা করে বলি আমি
সহজ কথাটাই।

"ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সংগতকে নহে অসংগতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভৎর্সনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালোবাসার ধনকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সত্যকে সত্য কথা দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়; তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক-পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে।" (মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা)

(গ) 'ক্ষণিকা'র এই ভাবধারার কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, কবি ধীরে ধীরে এই সৌন্দর্য-মাধুর্য-ভোগ-প্রধান জীবন ছাড়িয়া গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। জগৎ ও জীবনের রঙ ও রেখা যেন মুছিয়া যাইতেছে, কোলাহল থামিয়া আসিতেছে, গম্ভীর ও শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে কবি তাঁহার বাস্থিতের নিভৃত-নির্জন মিলন কামনা করিতেছেন।

'বিদায়' কবিতায় কবি প্রকৃতি ও মানবরসের জীবন হইতে বিদায় চাহিতেছেন। তাঁহার হৃদয়-বীণা এতদিন সুসংগতভাবে বাজিতেছিল, আজ একটু বেসুরা বাজিতেছে। আর এ আসরে তাঁহার গান করা মানাইতেছে না, তাই শান্তির অজুহাতে সরিয়া পড়িতে চাহিতেছেন।

তোমরা নিশি যাপন কর,
এখনো রাত রয়েছে, ভাই,
আমায় কিন্তু বিদায় দেহো—
ঘুমোতে যাই—ঘুমোতে যাই।

আমার যন্ত্রে একটি তন্ত্রী
একটু যেন বিকল বাজে,
মনের মধ্যে শুনছি যেটা
হাতে সেটা আসছে না যে।

'পরামর্শ' কবিতায় কবি অসময়ে অনির্দিষ্ট পথে যাইতে আশঙ্কিত হইতেছেন। জীবনের এক পর্যায় শেষ করিয়া বহু-বাত্যা-আহত, জীর্ণ জীবন-তরী সন্ধ্যায় ঘাটে ভিড়িয়াছে, এখন আবার ঝড-ঝঞ্ঝাময় অন্য পথে যাত্রা করিলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা আছে। জীবনে তো এইরূপ বিপর্যয় অনেক হইয়াছে—

অনেকবার তো হাল ভেঙেছে,
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে,
ওরে দুঃসাহসী।
সিন্ধুপানে গেছিস ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন রশারশি।

কিন্তু এখন আর সে শক্তি নাই—সে দৃঢ় হৃদয় বল নাই; তবুও এ বিপর্যয় এড়াইবার উপায় নাই। তাঁহার সর্বনাশা স্বভাব তাঁহাকে স্থির থাকিতে দিবে না। নূতন পথের নেশা তাঁহার সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে,—

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধ'রে বসেছে তার
যমদূতের মতো
স্বভাব সর্বনেশে।

'শেষ হিসাবে' কবি জীবনের এক পর্বের শেষ হিসাব করিতেছেন। যে-সব বস্তুকে তিনি এতদিন দেবতার মতো সেবা ও পূজা করিয়াছিলেন, তাহাদের কতখানি মূল্য আছে, তাহা এই জীবনের সন্ধ্যায় আর নির্ধারণ করিতে চাহেন না। এখন এ জীবনের দোকান-পাট তুলিয়া পার হইতে হইবে। তাঁহার তো লাভের খাতা নয়; সুতরাং লোকসানের দুঃখ ভুলিয়া যাওয়াই বিবেচনার কাজ। অন্ধকার ছাইয়া আসিতেছে, এই অন্ধকারের স্নিগ্ধ হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া সঙ্গীহীন অবস্থায় বিশাল ধরণীতে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু তাহাতে ভয় নাই। —সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার প্রাণের দেবতাই তাঁহার সঙ্গী হইবেন। সুতরাং গত জীবনের কথা চিন্তা বৃথা—উহার পরিণতিই তো বর্তমান জীবন,—

আঁধার রাতে নির্নিমেষে
দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে দেখা
তুমি একা জগৎ-মাঝে
প্রাণের মাঝে আরেক একা।

ফুলের দিনে যে মঞ্জরী
ফলের দিনে যাক সে ঝরি।
মরিস নে আর মিথ্যে ভেবে,
বসন্তেরি অন্ত এবে
যারা যারা বিদায় নেবে
একে একে যাক রে সরি।

'অতিথি' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে ভরা-সাঁঝে গৃহদ্বারে আসিয়া অতিথি শিকল নাড়িতেছে। বধূ একাকী গৃহে আছে। অতিথিকে অভ্যর্থনা করা তাহার কর্তব্য। তাহার সন্ধ্যাকালীন গৃহকাজ ও সাজসজ্জা বোধহয় শেষ হয় নাই। তবুও সমস্ত কাজ ফেলিয়া রাখিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করা দরকার। ভয় বা লজ্জার কোনো কারণ নাই। ঘোমটা টানিয়া প্রদীপখানি হাতে লইয়া নীরবে অতিথিকে পথ দেখাইয়া আনিলেই হইবে। বিলম্বে অনাদরে যেন অতিথি-দেবতা বিমুখ হইয়া চলিয়া না যান।

ঐ শোনো গো অতিথি বুঝি আজ,
এল আজ।
ওগো বধূ রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ!
শুনছ নাকি তোমার গৃহদ্বারে
ঠিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা-সাঁঝ।

কবির পরান-বধূর দ্বারে নবজীবনের দেবতার আগমনসংকেত!

দেবতা আজ আসিয়াছেন বর্ষারাণীরূপে। 'আবির্ভাব' কবিতায় কবি তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেছেন। বর্ষার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের মূর্তিমতী দেবীরূপে দেবতার এই সময়ে আগমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এখন সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য উপভোগের জীবন শেষ; কবির জীবনে যখন বসন্ত ছিল, তখন তিনি তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। সে সময়ে বসন্তের সৌন্দর্যলক্ষ্মীরূপে দূর হইতে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার স্বর্ণাঞ্চল ও বসন্তপুষ্পাভরণ কবি চকিতে দেখিতে পাইতেন; বসন্তের পুষ্পের উপর তাঁহার স্পর্শের চিহ্ন পাওয়া যাইত; কিঙ্কিণীর মৃদু-ঝংকার যেন বাতাসে ভাসিয়া

আসিত; বসন্তের বনে তাঁহার সুগন্ধি-নিঃশ্বাস পাওয়া যাইত। কিন্তু আজ বর্ষার সৌন্দর্যলক্ষ্মীরূপে তিনি একেবারে ভিন্ন মূর্তিতে কবিকে দেখা দিয়াছেন। গগনে তাঁহার এলোচুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ঘননীল গুণ্ঠনে মুখ ঢাকা। এই নবরূপের অপরূপ মায়ায় কবি আচ্ছন্ন—হৃদয় উদ্বেল,—

ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছে শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল।

কিন্তু এ বেশে দেবীকে বরণ করিয়া লইবার শক্তি এখন আর কবির নাই বসন্তে যে বরণ-মালা কবি তাঁহার জন্য গাঁথিয়াছিলেন, এখন আর তাহা দেবীর যোগ্য নয়। কবির আর সে দিন নাই—সেরূপ শক্তি নাই—সে প্রাণ নাই। এই বর্ষালক্ষ্মীর আগমনী-সংগীত যে সুরে গান করা প্রয়োজন, কবির ক্ষুদ্র বীণার ক্ষীণ তার তাহা বাজাইতে পারে না। কবি ভাবিতে পারেন নাই, বসন্তে যাহাকে ক্ষণিকের জন্য দেখিয়াছিলেন আজ তিনি এই বেশে বর্ষায় দর্শন দিবেন। কবি আজ বড় লজ্জিত। এই দেবীর অভ্যর্থনার জন্য উপযুক্ত বেশে তিনি সজ্জিত হইতে পারেন নাই। পূর্বে তাঁহার সহিত নিভৃত মিলনের আয়োজন আবশ্যক ছিল—এখন তাঁহার পূজার আয়োজন কর্তব্য। আজ যেন দেবী কবির সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া লইয়া ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে তাঁহার পর্ণ-কুটিরে আসিয়া, তাঁহার জীর্ণ কাব্য-বীণাকে আশীর্বাদ করেন।

এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ—
ক্ষমা কর যত অপরাধ।

কবির প্রার্থনা, যেন দেবী কবির চিত্ত-বীণাকে নূতন ভাবে সংস্কার করিয়া দেন। গুরু-গম্ভীর মেঘধ্বনিতে বর্ষারানী যে উদাত্ত সংগীত গাহেন, কবির চিত্ত-বীণা যেন সে গানের সুর বাজাইতে পারে—তিনি বারবার গাহিয়া কবিকে যেন শিক্ষা দেন,—

আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন বিপুল-মন্দ্রে
আমার পরানে যে-গান বাজাবে
সে-গান তোমায় কর সায়।

কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে পরমসুন্দরের বিচিত্র বেশে প্রকাশ দেখিয়াছেন। প্রকৃতি ও মানুষের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়াই কবি এতদিন ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু এখন প্রকৃতি ও মানব ছাড়িয়া কবি ভগবানকে একাকী অনুভব করিতে চাহিতেছেন। এতদিন কবি বসন্তের সৌন্দর্যের মধ্যে চিরসুন্দরকে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিতেন, তাঁহাকে কামনা করিতেন। কিন্তু এখন সে জীবন হইতে সরিয়া প্রকৃতি ও মানব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভগবানকে একাকী অনুভব করিতে বসিয়াছেন। এখন বর্ষার সৌন্দর্যরূপে দেবতাকে আর তাঁহার গ্রহণ করিবার দিন নাই। তাই তাঁহার বিনয় প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা।

ভাবে, রূপে ও সংগীতে 'আবির্ভাব' কবিতাটি অনবদ্য। একাধারে ভাব-রূপ-সংগীতোচ্ছল যে কয়টি শ্রেষ্ঠ লিরিক রবীন্দ্র-কাব্যে আছে, এটি তাহাদের অন্যতম। ইহার সংগীত-গৌরব ও ভাব সম্বন্ধে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে-মায়া শরৎঋতুতে সূর্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে। মনকে রাঙিয়ে তোলে; এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

'ক্ষণিকা'র 'আবির্ভাব' কবিতায় একটা কোনো অন্তর্গূঢ় মানে থাকতে পারে, কিন্তু সেটা গৌণ সমগ্রভাবে কবিতার একটা স্বরূপ আছে; সেটা যদি মনোহর হয়ে থাকে তা হ'লে আর কিছু বলবার নেই। তবু 'আবির্ভাব' কবিতায় কেবল সুর নয়, একটা কোনো কথা বলা হয়েছে; সেটা হচ্ছে এই যে—এক সময়ে মনপ্রাণ ছিল ফাল্গুন মাসের জগতে, তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি রূপ দেখা দিয়েছে আপন বর্ণগন্ধগান নিয়ে; সে বসন্তের রূপ, যৌবনের আবির্ভাব—তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় একটা বিশেষ বাণী ছিল। তার পরে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ততর হয়ে এল; তখন সেই প্রথম যৌবনের বাসন্তী রঙের আকাশে ঘনিয়ে এল বর্ষার সজল শ্যাম সমারোহ—জীবনে বাণীর বদল হলো, বীণায় আর-এক সুর বাঁধতে হবে; সেদিন যাকে দেখেছিলুম এক বেশে এক ভাবে, আজ তাকে দেখ্‌ছি আর এক মূর্তিতে, খুঁজে বেড়াচ্ছি তারি অভ্যর্থনার নূতন আয়োজন। জীবনের ঋতুতে ঋতুতে যার নূতন প্রকাশ, সে এক হ'লেও তার জন্য একই আসন মানায় না।" (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র)

'আবির্ভাব' কবিতাটি কবির প্রকৃতি-মানব-রস-শিল্পের শেষ-বর্ষণ। তারপরেই শরতের নির্মল আকাশে একটিমাত্র সন্ধ্যা-তারা। হঠাৎ 'সে' আসিয়াছিল প্রকৃতিকে সঙ্গে করিয়া, তাই কবি তাহাকে যোগ্য অভ্যর্থনা দিতে পারেন নাই। না পারারই কথা—কারণ পূর্বের প্রাণমন নাই—সে দৃষ্টিভঙ্গী নাই। এখন দেবতাকে কবি চাহেন প্রকৃতি ও মানবের মধ্য দিয়া নয়, একাকী—অন্তরের মধ্যে।

'অন্তরতম' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে সংসারকে নানা গানে ভুলাইয়া কৌশলে তিনি তাঁহার অন্তরতমের গান গাহিতেছেন। সকল নয়নের আড়ালে, নিশীথরাতের স্বপনের মধ্যে তাঁহার অন্তরতমের সহিত সাক্ষাৎ,—

তোমার যে পথ তুমি চিনায়েছ
　　সে-কথা বলিনে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
　　একা আসি তব দুয়ারে।
…　　…　　…
বলি নে তো কারে, সকালে বিকালে
　　তোমার পথের মাঝেতে
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
　　বেড়াই ছদ্ম-বেশেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান,
　　এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখ পানে আঁখি মেলি চাই,
　　তোমা পানে চাই স্বপনে।

সুখ-দুঃখ-পুলক-বেদনাময় কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কতো লোকের মেলা-মেশার মধ্য দিয়া কবি দীর্ঘ জীবনপথ অতিক্রম করিয়াছেন; সে পথ শেষ হইয়া আসিল; এখন

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
　　অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায়
　　তুমি আর আমি একা। (সমাপ্তি)

এখন নির্জন, রুদ্ধঘরে সন্ধ্যাদীপালোকে, 'তুমি' ও 'আমি'র মিলনের নবজীবন আরম্ভ হইল। প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের জীবন, যৌবনের বিপুল আবেগ ও সংগীতের জীবন, শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রসসম্ভোগের জীবন সমাপ্ত হইল।

পরবর্তী দীর্ঘকালের সাহিত্যসাধনায় কবির এই শ্রেষ্ঠ রসজীবন মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এই জীবনপর্বের বর্ণ-গন্ধ-গান তাহাতে নাই। সে এক নূতন রূপে নূতন বাণী লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের এই শিল্পজীবন হইতে বিদায় লইবার কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—

"…শিল্প-প্রাণ জীবন কখনই আধ্যাত্মিক জীবনের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় না—শিল্প মানুষের চরম আশ্রয় নহে। আত্মার যাত্রাপথে সমস্ত খণ্ড আশ্রয় একে একে খসিয়া পড়িতে বাধ্য।…আমার বিশ্বাস "সোনার তরী" ও "চিত্রা"র জীবন হইতে বিদায় লইবার প্রধান কারণ কেবলমাত্র শিল্পময় জীবনের অসম্পূর্ণতা কবিকে ভিতরে ভিতরে বেদনা দিতেছিল।"

১৩

নৈবেদ্য

(১৩০৮)

সর্বোচ্চ মানব-আদর্শের জন্য, পূর্ণতম জীবনের জন্য 'চৈতালি' হইতে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত কবি-মানসের যে একটা ক্রমবর্ধমান আকুতি দেখা যায়, 'নৈবেদ্য'-এ তাহা চরম রূপ ধারণ করিয়াছে। কবি একটা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য সভ্যতার অবদানের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা, আখ্যান মানব-মহত্ত্বের পরিচায়ক, কবি সেগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া অপরূপ কাব্যে চিত্রিত করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বের গ্রন্থগুলিতে দেখিয়াছি। এই বৃহত্তম মানব-আদর্শের যে চরম পরিণতি আধ্যাত্মিক জীবনে, শাশ্বত সত্যের উপলব্ধিতে, কবি ইহা 'নৈবেদ্য'-এ ভালোরূপ অনুভব করিলেন। ত্যাগ, ক্ষমা, বৈরাগ্য, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি মানব-মহত্ত্বের নিদর্শনের উপর তাঁহার অনুরাগ ক্রম-পরিণতির পথে তাঁহাকে মহান্ আধ্যাত্মিক জীবনে পৌঁছাইয়া দিল। কবির এই নূতন আধ্যাত্মিক জীবনের যে রূপ ফুটিয়া উঠিল, তাহা মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ—অনেক পরিমাণে প্রাচীন ভারতের গৃহস্থাশ্রমী ব্রহ্মজ্ঞানীর আদর্শ। পূর্বে যে তপোবন-আদর্শের মধ্যে তিনি মানব-মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখিয়াছিলেন, সেই আদর্শের ছায়াপথ ধরিয়াই তিনি নবজীবনে অগ্রসর হইলেন। কবির এই নব-জীবনের চেতনা, এই অধ্যাত্ম-বোধ, এই তপোবন-আদর্শের উপলব্ধি উপনিষদের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উপনিষদের শিক্ষার সহিত বৈষ্ণবের লীলাবাদ মিশিয়া যে নূতন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার প্রকাশ হইয়াছে 'খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'তে। এই 'নৈবেদ্য' কাব্যখানি একদিক দিয়া রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার ভাষ্য বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের উপর উপনিষদ, কালিদাস ও বৈষ্ণব-দর্শনের প্রভাব সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। নিছক কাব্যরসের উপভোগ ছাড়া কালিদাসের যে আদর্শ ও নীতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা তপোবন-আদর্শ—ত্যাগ দ্বারা বিশুদ্ধ ভোগ,—মূলত ইহাই উপনিষদের আদর্শ। কেবলমাত্র দেহভোগলালসার অপরাধ ও পাপে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিচ্ছেদ হইল। তারপর লজ্জা, দুঃখ ও অনুতাপের আগুনে সে পাপ ক্ষয় হইলে উন্নততর প্রীতি ও শান্তির

রাজ্যে তাঁহাদের মিলন হইয়াছে। কাম পুড়িয়া প্রেম হইল। ত্যাগের দ্বারাই বিশুদ্ধ ভোগের সম্ভব হইল। তাই শকুন্তলা নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন Paradise Lost এবং Paradise Regained. মেঘদূতের যক্ষপত্নীর বিরহে তাঁহার মনে হইয়াছে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা অতলস্পর্শ বিরহ আছে। 'অনন্তের কেন্দ্রবর্তী প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটি'র জন্যই আমাদের বিরহ। তাহার সহিত আমরা মিলিত হইতে পারিতেছি না। 'মেঘদূত'কে দেখিয়াছেন কবি মানুষের চিরন্তন বেদনার বেদ-গাথারূপে। 'কুমারসম্ভব'-এর মধ্যেও কবি মনে করিয়াছেন, কেবল ভোগলিপ্সার পথে পার্বতী মদনের সাহায্যে মহাদেবকে লাভ করিতে গিয়াছিল বলিয়াই দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে উপেক্ষিতা হইয়াছে। তারপর যখন সন্ন্যাসিনী হইয়া ত্যাগ-তপস্যার পথে অগ্রসর হইল তখনই মহাদেবকে লাভ করিতে পারিল। বৈষ্ণবপদাবলীর কাব্যাংশ তাঁহাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব বা উপাস্য দেবতার প্রতীক তিনি গ্রহণ করেন নাই; কেবল লীলাবাদের অংশটুকু লইয়াছেন। এইসব আদর্শের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির ধারা যে প্রাথমিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই 'নৈবেদ্য'-এ ব্যক্ত হইয়াছে।

'নৈবেদ্য'-এর কবিতাগুলির মধ্যে মোটামুটি এই কয়টি ভাবধারার কবিতা লক্ষ্য করা যায়,—

(১) ভগবানের নিকট কবির ব্যক্তিগত মনোভাবমূলক প্রার্থনা—তাঁহার সমস্ত দুর্বলতা দূর করিয়া, অমিতবীর্যশালী সুমহান মনুষ্যত্বদানে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষের জন্য প্রার্থনা।

(২) সর্বসংস্কারমুক্ত সত্যধর্ম ও মানব-মহত্ত্বকে গ্রহণ না করায় ভারতের যে দুর্দশা, সত্যধর্ম ও মানব-মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা দিয়া স্বদেশবাসীকে সেই দুর্দশা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

(৩) বুয়রযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঔদ্ধত্যে কবির ক্ষোভ।

(১) 'নৈবেদ্য'-এর প্রথম ধারার কবিতায় পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধির জন্য—মহান্ অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য কবির একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, দুঃখে-দৈন্যে অবিচলিত, ন্যায়ে-কর্তব্যে কঠোর করিবার জন্য ভগবানের নিকট কবি তাঁহার নিবেদন জানাইয়াছেন। ভাষার অপূর্ব সংযমে, ভাবের গভীরতায়, শান্ত-স্নিগ্ধ-সৌন্দর্যে, দৃঢ়চিত্তের সংহত-আবেগে এই কবিতাগুলি বাংলাসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

'নৈবেদ্য'-এর প্রায় সমস্ত কবিতাই প্রার্থনা। প্রথম দিকের সমস্তগুলিই গান।

প্রতিদিনের সংসারের বিচিত্র কর্ম ও বহুজনের কোলাহলের মধ্যে কবি জীবনস্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইবেন—

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে,
করি যোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে। (১নং)

প্রতিক্ষণ কবি দেহ-মনে জীবনস্বামীকে কামনা করিতেছেন,—

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো।
... ...
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো। (৪নং)

চির-বিচিত্র-আনন্দরূপে কবি জীবননাথকে জীবনে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছেন,—

কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা
ছন্দের বাঁধনে,
পরানে তোমায় ধরিয়া রাখিব
সেই মতো সাধনে।
... ...
আমার তুচ্ছ দিনের কর্মে
তুমি দিবে গরিমা,
আমার তনুর অণুতে অণুতে
রবে তব প্রতিমা। (৮নং)

কবি ভগবানের চরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া দেহ-মনে তাঁহাকে অনুভব করিতেছেন। ভক্ত বলিয়া তাঁহার একটা গর্ব আসা স্বাভাবিক, কিন্তু পৃথিবীর 'ধনজন-খ্যাতি'র গর্ব ছাড়িয়া প্রভুর ভক্ত হইবার গর্বই তাঁহার সর্বোচ্চ গর্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সকল গর্ব দূর করি দিব
তোমার গর্ব ছাড়িব না। (১৩নং)

শুধু গর্ব করিলে হইবে না, প্রভুর সেবা করিবার অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করা বড় সুকঠিন। তাহার উপযুক্ত হইতে হইবে, তাই কবি শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন,—

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে

তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি। (২০নং)

সহজ ভক্তি দ্বারা লব্ধ শক্তিতে বলশালী কবি ক্রমে উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই উপলব্ধি উপনিষদের ব্রহ্মোপলব্ধি—সমস্ত সৃষ্টিব্যাপী বিরাট, অসীম সত্তার উপলব্ধি। বিশ্বের চলার পথে প্রতিনিয়ত যে কলরোল, অগ্রগতির যে নৃত্য, তাহা ভগবানকে কেন্দ্র করিয়াই উত্থিত হইতেছে,—

শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে, তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল,—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল। (২৩নং)

যে বিরাট প্রাণের তরঙ্গে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব অনাদিকাল হইতে তরঙ্গায়িত, সেই সমস্ত প্রাণের স্পন্দন কবি নিজের দেহে অনুভব করিতেছেন,—

করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান।
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন। (২৬নং)

নিজের দেহমনে সেই অনন্ত প্রাণকে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এক অপূর্ব জ্যোতি, অসীম সৌন্দর্য ও বিশাল বৈচিত্র্য দেখিয়া কবি বিস্মিত হইতেছেন। কবির জীবন সেই সৃষ্টির অঙ্গ। কবির জীবনে ও নিখিল বিশ্বের মধ্যে একসঙ্গে অসীম জ্যোতি, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের লীলা দেখিয়া কবি বিস্ময়-বিমূঢ়। এক একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যে অসীম জগৎ। সার্থক তাঁহার জীবন।

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।
তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ! (২৭নং)

সেই অনন্ত প্রাণ, সেই বিরাট আত্মার উপলব্ধি কবি জীবনের মধ্য দিয়াই করিবেন। সাধনার জন্য লোকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, কেউ বা বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে আশ্রয় লয়, কিন্তু কবি সংসার-বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াই, ভগবদুপলব্ধির সাধনা করিতে চাহেন। ইহাই প্রাচীন ভারতের তপোবন-আদর্শ, আশ্রমবাসী ব্রহ্মবিদের জীবনযাত্রা। ইহাই উপনিষদের—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'

—ব্রহ্মকে সম্মুখে রাখিয়া ত্যাগ-বিদ্ধ সংসারভোগ—প্রকৃতির সৌন্দর্য ও স্ত্রীপুত্র-পরিজনের স্নেহ-প্রেম-দয়ার সহিত যুক্ত থাকিয়া ব্রহ্মকে অনুভব করা, আস্বাদন করা। তাই কবি প্রার্থনা করিতেছেন,—

শান্তিরস দাও
আমার অশ্রুর 'পরে প্রেয়সীর প্রেমে
মধুর মঙ্গলরূপে তুমি এস নেমে।
সকল সংসারবন্ধে বন্ধন-বিহীন
তোমার মহান মুক্তি থাক্ রাত্রিদিন। (২৮নং)

ভগবানও নির্জন রাত্রে তাঁহার কানে কানে বলিয়াছেন,—

দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম। (৩২নং)

এই মনোভাবের সুন্দর প্রকাশ হইয়াছে কবির বহুপরিচিত কবিতায়, ('বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' (৩০ নং)। সমস্ত বিশ্বই যখন ভগবানের প্রকাশক্ষেত্র, লীলাক্ষেত্র, তখন তিনি তো জগতের বৈচিত্র্য ও জীবনের নানা সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য—মুক্তির জন্য, ইহসংসার-ত্যাগের কোনো প্রয়োজন নাই। সংসারের মধ্যেও তিনি, মানুষের মধ্যেও তিনি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তিনি-ময়। তাঁহাকে ছাড়িবার উপায় নাই। জগৎ ও জীবনের যত কিছু সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য, প্রেম-প্রীতি তাহার মধ্য দিয়াই মানুষ তাঁহাকে উপলব্ধি করে—আপাতদৃষ্ট বন্ধনের মধ্যেই প্রকৃত মুক্তির আস্বাদ পায়। তাই জগৎকে সত্য বলিয়া, সুন্দর বলিয়া ভালোবাসাই প্রকৃত মুক্তির পথ, আর জীবনকে ভালোবাসাই তাঁহাকে ভক্তি-নিবেদন।) তাই কবি বলিতেছেন,—

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া (৩০নং)

তাঁহার কবি-জীবনের ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে বিবৃতিতে, এই ভাবটি কবি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"প্রকৃতি তাহার রূপরসবর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন, তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে

বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুন নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতি সম্বন্ধে সচেতন, কেহ বা মন্দগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে বুঝি বা সে এক জায়গায় বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে হইতেছে,—সকলই এই জগৎ-সংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই; যে-জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে;—প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। [জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর-কাহারো টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।"] (বঙ্গভাষার লেখক ; আত্মপরিচয়, পৃ ২২-২৩)

এই অধ্যাত্ম-অনুভূতির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের আর একটি বৈশিষ্ট্যকে নৈবেদ্য-এ লক্ষ্য করা যায়। এই জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমে যেমন তিনি ভগবানকে অনুভব করিতে চাহেন, আবার সৃষ্টির বাহিরে তাঁহার অসীম, অনন্ত মহামহিমান্বিত জ্যোতির্ময় স্বরূপকেও সেইরূপই অনুভব করিতে চাহেন। তিনি সীমার মধ্যে ভগবানকে রূপে, প্রতীকে অনুভব করিয়াই সন্তুষ্ট নন, তাঁহার অরূপ, অসীম, বিরাট সত্তার অনুভূতিও কামনা করেন।

কবির ইচ্ছা

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত,
... ...
যুগে যুগান্তরে—চিত্তবাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন
রাখিব উন্মুখ করি, হে অন্তবিহীন। (৮০নং)

একাধারে ভগবানের দুই রূপ—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত—সসীম ও অসীম—মাধুর্যময় এবং ঐশ্বর্যময়,—

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমিই নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে-গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারিভিতে।
... ...
তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সংসারক্ষেত্র,— সেথা শুভ্র ভাস ;

দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী। (৮১নং)

কবির অন্তরের আকর্ষণ সেই অনন্তের ঐশ্বর্যময় রূপের দিকে,—

আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অন্তরের টানে
সকল বন্ধনমাঝে—যেথায় উদার
অন্তহীন শান্তি আর মুক্তির বিস্তার।
তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে। (৮২নং)

যেথা দূর তুমি
সেথা আত্মা হারাইয়া সর্বতটভূমি
তোমার নিঃসীমমাঝে পূর্ণানন্দভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে। (৮৩নং)

বিরাট মহামহিমান্বিত ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধি করিতে হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রয়োজন। ভাব-মত্ততার সেখানে কোনো স্থান নাই, কঠোর সংযমে নিয়ন্ত্রিত, বীর্যশালী প্রাণের পক্ষেই সে ভক্তি সম্ভব। সে ভক্তি হইবে 'পরিপূর্ণ, অমত্ত, গম্ভীর' চিত্তের আত্ম-নিবেদন। এই ভক্তির উপযুক্ত হইতে হইলে সত্য, ন্যায় ও মহত্ত্বের কঠোর সাধনা প্রয়োজন। ক্ষীণ, দীন, দুর্বল আত্মার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। সেই সাধনার জন্য কবি শক্তি কামনা করিতেছেন,

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে
যে উর্ধ্বে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে
লহ ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে,—······ (৫১নং)

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা।
দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।······ (৬১নং)

আঘাতসংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে। (৬৭নং)

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। (৭০নং)

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে,
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখের সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিতমুখে
পারে উপেক্ষিতে।...... (৯৯নং)

(২) 'নৈবেদ্য'-এর দ্বিতীয় ভাবধারার কবিতায় দেখা যায়, স্বদেশবাসী মানব-মহত্ত্বের পূর্ণ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় এবং সর্বসংস্কারমুক্ত সত্যধর্মকে গ্রহণ না করায় যে সর্বপ্রকার অধঃপতনের শেষ তলায় ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য কবি গভীর দুঃখবোধ করিতেছেন ও স্বদেশবাসীর উদ্ধারের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা ও স্বদেশ-সাধনা একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, সমস্ত খণ্ডতাকে, বিচ্ছিন্নতাকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সমস্ত নীচতা, সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা ত্যাগ করিয়া মানব-মহত্ত্বের সার্বজনীন নীতি ও আদর্শের উপর দণ্ডায়মান হইবে—ইহাই রবীন্দ্রনাথের মত।

ভারতই সেই পূর্ণতার—সেই ঐক্যের সন্ধান দিতে পারে। ইহাই কবির মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা।

"অন্তের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সাম্রাজ্যব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি ; গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব, তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।" (ভারতবর্ষের ইতিহাস ; সংকলন, ৬২-৬৩ পৃঃ)

ভারতবর্ষকে কবি বিশ্বমানবের মিলনভূমি বলিয়া মনে করিতেছেন। সেই মহা-মিলনের মূল মন্ত্র সর্বসংস্কারমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে, এই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, সমস্ত সম্প্রদায়, জাতি, ভাষাভাষী মিলিত হইতে পারে—সমস্ত বৈচিত্র্য এক ঐক্যে নিমজ্জিত হইতে পারে। এই দেবতা কোনো জাতির বা সম্প্রদায়ের নহেন—ইনি সকলের দেবতা—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের দেবতা। এই ভারতবর্ষের দেবতার কথাই গোরা পরেশবাবুকে বলিয়াছিল, "আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

কবি জাতীয় জীবনে অসংখ্য গলদ, ভেদবুদ্ধি, অন্তঃসারশূন্যতা, শুষ্ক আচারনিষ্ঠা প্রভৃতি সহস্র প্রকার মনুষ্যত্বহীনতার চিহ্ন দেখিয়া বিষম ব্যথিত হইয়াছেন। ভারতের যে বাণী তাহা চিরন্তন ঐক্যের বাণী—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বাণী। এই বাণীকে গ্রহণ করিলেই দেশের সর্বপ্রকার কল্যাণ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সর্বজাতির মহামিলন।

ভারতের ভোগ ও ত্যাগের সম্মিলিত আদর্শকে কবি একটি চমৎকার কবিতায় রূপ দিয়াছেন,—

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,

ধরিতে দরিদ্রবেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে। (৯৪নং)

কবি সর্বধর্মসমন্বয়ের ক্ষেত্র, মানব-মহত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশের ভূমি, সর্বজন-মহামিলনের পুণ্যস্থানকে স্বর্গ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন,—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি,
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা—নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত। (৭২নং)

(৩) 'নৈবেদ্য'-এর তৃতীয় ধারার কবিতার মধ্যে দেখা যায়, এই ভারতের আদর্শে অনুপ্রাণিত কবি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচার ও নিপীড়ন দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহার আদর্শ পরিপূর্ণ মানবতা, এই পরিপূর্ণ মানবতার অপমানে তাঁহার কবিচিত্তে বেদনা সঞ্চারিত হইয়াছে। দুর্বল দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসীদের উপর পীড়নে কবির কণ্ঠে প্রতিবাদ উচ্চারিত হইয়াছে,—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে
অস্ত গেল,— হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদরাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে। (৬৪নং)

কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার বিধানে বলীয়ানের বলদর্প, এই পরপীড়নের স্পর্ধা বেশিদিন টিকিতে পারে না,—

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ-আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল-ঝঞ্ঝা ঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান। (৬৫নং)

কবি মনে করিতেছেন, ইয়োরোপের এই রক্ত-বন্যা, শক্তি-মদমত্তের এই স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে কোনো বৃহৎ আদর্শ নাই,—

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্‌গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা। (৬৬নং)

১৪

স্মরণ

(১৩১০, গ্রন্থাকারে ১৩২১)

রবীন্দ্রনাথ পত্নীর মৃত্যুতে হৃদয়ে যে বেদনা পান, সেই বেদনার প্রকাশ হইয়াছে 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে। স্মরণের এই কয়টি কবিতা ছাড়া স্ত্রীবিয়োগের শোক তাঁহার আর কোনো সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্যক্ত হয় নাই।

বিশ্ব-সাহিত্যে শোক-কাব্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'স্মরণ'কে সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। শোক-কাব্যে বিচ্ছিন্ন ও বিলাপীর যে ব্যক্তিগত অংশ থাকে,

তাহাকেই সার্বজনীন অনুভূতির মধ্য দিয়া একটা রসরূপ দেওয়াতেই উহার প্রধান সৌন্দর্য। কিন্তু এই কাব্যে ব্যক্তিগত অংশ অতি সামান্য, তিন চারিটি কবিতার বেশি নয় (৪নং, ১০নং, ১৪নং, ২৩নং)। সেই কয়টি কবিতাতেই আমরা দেখিতে পারি যে ব্যক্তিগত বেদনার মাধুর্য মনোরম রূপ ধারণ করিয়া কি অপূর্ব কাব্যে পরিণত হইতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর জীবনে উভয়কে আশ্রয় করিয়া পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে সুখ, দুঃখ, প্রেম, মান, অভিমানের ছায়াছবির পট উদ্ঘাটিত হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত যায়, তাহারই স্মৃতির যে কোনো কণাকে অপরূপ কাব্যে রূপায়িত করিলে বিয়োগবিধুর নরনারীর বেদনার মধ্যে নিত্যকালের সৌন্দর্যে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এখানেই ব্যক্তিগত জিনিস বিশ্বের হইয়া পড়ে—এখানেই একজনের প্রিয়া ও গৃহলক্ষ্মী পুরুষের চিরন্তন প্রিয়া ও গৃহলক্ষ্মীতে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যে শোকের প্রকাশ অপেক্ষা সান্ত্বনার অংশই বেশি। অবশ্য অধিকাংশ শোককাব্যে সান্ত্বনার অংশ সর্বশেষে আসে, কিন্তু এই কাব্যে শোককে উপলক্ষ্য করিয়া কবি মৃত্যুর দানকে গ্রহণ করিয়া বৃহত্তর সান্ত্বনার আনন্দ লাভ করিতেছেন। যে বৃহত্তর লাভের আনন্দে কবি শোক ভুলিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা একান্তই কবির মনোমত লাভ, উহা বিশ্বের সাধারণ নরনারীচিত্তে বেশি প্রতিধ্বনি জাগাইতে পারে না। মানুষ-কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে দার্শনিক ও অধ্যাত্ম-রসিক রবীন্দ্রনাথের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছেন।

অবশ্য অন্যান্য কবিদের নিকট শোক কাব্যের উত্তম বিষয়বস্তু হইলেও রবীন্দ্রনাথের মতো কবির নিকট আমরা শোকের কোনো কাব্য-বিলাস আশা করিতে পারি না। প্রথম কারণ, তাঁহার ব্যক্তিগত শোককে তিনি নিভৃত অন্তরে চাপিয়া রাখিতে ভালোবাসেন, কোনো দিন প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার নিকট দুঃখ-শোকের কোনো স্থায়ী অস্তিত্ব নাই, এর জন্ম-মৃত্যু একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। সমস্ত মানব সেই অসীম, অনন্ত ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত আছে। সেই ব্রহ্মই আনন্দ-অমৃত। সেই অমৃতলোকে মানুষের মৃত্যু নাই। মৃত্যু কেবল জীবনের অবস্থান্তরমাত্র—পরিপূর্ণতা লাভের সহায় ও উপায় মাত্র। অনাদি অমৃত আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, আমরাও তাহার জন্য অভিসার-যাত্রা করিয়াছি। মৃত্যু সেই মহামিলনের অগ্রদূত, আমাদের পরমপ্রিয়ের সকাশে লইয়া যাইবার আনন্দদূত। মৃত্যুই জীবনের সার্থকতা, পরিপূর্ণতা; মৃত্যুর মধ্য দিয়াই নবজীবনলাভ হয়। মৃত্যু অসম্পূর্ণকে পূর্ণ করে, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তকে এক করে, ক্ষণিককে চিরন্তন করে। এই ভাব তাঁহার সুদীর্ঘ কবি-জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কবিতা, গান, নাটকে বহু-বহু রূপে ও রসে প্রকাশ পাইয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নৈমিত্তিক পাঠকও তাহা জানেন ; উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তৃতীয় কারণ, নৈবেদ্য-যুগের পরিবর্তিত মানসিক অবস্থা। জগৎ ও জীবনের রূপলোক ও রসলোক হইতে বিদায় লইয়া, এবং চিত্তকে শান্ত, সংযত ও ত্যাগমুখী করিয়া কবি অধ্যাত্ম-সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাই শোকের চাঞ্চল্য তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর চিত্তকে বেশি উদ্বেলিত করিতে পারে নাই। যে-সত্য তাঁহার কাব্যানুভূতিতে এতকাল প্রকাশ পাইয়াছে, ব্যক্তিগত দুঃখকেও তিনি সেই ভাবের বৃহৎ ভূমিকায় অনেকখানি বিসর্জন দিয়াছেন। ব্যক্তি-চিত্তের যে অনিবার্য বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বৃহৎ ভাবের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া পূর্ণ সান্ত্বনার তটে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পত্নীর মৃত্যু যেন তাঁহাকে সত্যানুভূতিতে আরো অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

এই মৃত্যুর আলোকে কবি তাঁহার মৃত পত্নীকে নূতন করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নূতনরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা ছিল ক্ষণিক, তাহা হইয়াছে চিরন্তন। মৃত্যুর মধ্য দিয়া কবি তাঁহার প্রিয়ার সহিত নিত্য-মিলন অনুভব করিতেছেন, প্রিয়ার প্রেম কবির জীবনে অক্ষয় হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর দুঃখ-বিচ্ছেদের বেদনা পরমপ্রাপ্তির আনন্দের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহাই 'স্মরণ' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

সাধারণত দেখা যায়, শোককাব্যের চারিটি অংশ থাকে। প্রথম—একটা দুঃখ বা বিষাদের বেদনা-অনুভব ; দ্বিতীয়, সেই দুঃখকে প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিসর্পিত করিয়া অনুভব ; তৃতীয়, পূর্ব ও বর্তমানের মধ্যে পার্থক্য অনুভব ও স্মৃতির কণাগুলির মধ্যে শান্ত, সংহত অথচ গম্ভীর ভাবে বিয়োগ-বেদনাকে উপলব্ধি ; চতুর্থ, বিযুক্তের চিরস্থায়িত্বে সান্ত্বনা-গ্রহণ। ইংরেজী সাহিত্যের দুইখানা উল্লেখযোগ্য শোককাব্য—শেলীর Adonais ও টেনিসনের In Memoriam. সংস্কৃত-সাহিত্যের অমর কাব্য মেঘদূত মৃত্যুশোক প্রকাশ না করিলেও বিচ্ছেদের বেদনাকে তীব্র ও গভীর আবেগের মধ্য দিয়া প্রকাশ করায় এই পর্যায়ে পড়ে।

নববর্ষার প্রকৃতির মধ্যে যে চিরন্তন বিরহের সুর আছে, সেই সুর মেঘদূতের বিরহী যক্ষের বিরহ-বেদনাকে উদ্দীপিত করিয়াছে। এখানে প্রকৃতির বিরহের বৃহৎ ব্যাপ্তির মধ্যে মানুষের বিরহ মিশিয়া গিয়া সমস্ত-কাব্যের মধ্যে একটা বিরহ-লোক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারই ছায়াপথে বিরহী বিচ্ছিন্ন প্রিয়াকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। বেদনার আবহাওয়া তাহাকে নিজে সৃষ্টি করিতে হয় নাই, নিজের বেদনাকে প্রকৃতির মুকুরে নূতন মাধুর্যে দেখিবার অবকাশ হয় নাই। তাই মনে হয়, পূর্বমেঘের মধ্যে রস ভালো জমে নাই। মেঘদূতের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে

সেইখানে, যেখানে বিরহী ও বিরহিণী পূর্বস্মৃতির বেদনায় বিধুর হইয়াছে। পূর্বের জীবনযাত্রার সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য যখন উপলব্ধি হইয়াছে, তখনই ছুটিয়াছে বেদনার নির্ঝর। এই অশ্রুমুখী, বিপর্যস্তবসনা, বিরহতপঃক্লিষ্টা যক্ষ-পত্নীর চিত্র কয়খানিই বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কালিদাসও শেষের দিকে বিয়োগ-বেদনার একটা সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন। তিনি একান্তভাবে এই সংসারের সৌন্দর্যের কবি, কীট্‌স ও শেক্সপীয়রের সমগোত্রীয়। তাই প্রকৃতি ও পশুপক্ষীর বাহ্যিক সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁহার নায়িকার ছায়া দেখিয়া তাহার অমরত্ব সম্বন্ধে সান্ত্বনা পাইয়াছেন, কোনো অতি-জাগতিক অমরত্ব কল্পনা করেন নাই। সেজন্য বিরহী যক্ষ বলিতেছে যে, একস্থানে তাহার প্রিয়াকে না দেখিতে পারিলেও প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্নরূপে তাহাকে কতকটা দেখিতে পাইবে, যদিও তাহা পর্যাপ্ত নয়,—

> শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং,
> বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি, শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
> উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্,
> হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি।

রঘুবংশের অজবিলাপে দেখা যায় পূর্ব ও বর্তমান অবস্থার পার্থক্যবোধই অজকে বেশি করিয়া পীড়ন করিতেছে,—

> ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা, বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
> গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে॥
> গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ
> করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা, হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥

অজও প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে প্রিয়াকে নিরন্তর দেখিয়া সান্ত্বনা গ্রহণ করিয়াছেন,—

> কলম্ অন্যভৃতাসু ভাষিতম্, কলহংসীষু মদালসং গতম্
> পৃষতীষু বিলোলম্ ঈক্ষিতম্, পবনাধূতলতাসু বিভ্রমঃ।

শেলী Adonais-এ মানুষকে এক অনন্ত শক্তির অংশ বলিয়া মনে করিয়া আত্মার অমরত্বের বিশ্বাসে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। জীবন সেই অবিনাশী অংশকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। মৃত্যুই তাহাকে অনন্ত একের সহিত যুক্ত করে। দুঃখবাদী কবি জীবনকে দুঃস্বপ্ন মনে করিয়াছেন, অবিনশ্বর অনন্তের অংশকে জীবনের দুঃখ কষ্ট-নৈরাশ্যের মধ্যে ফেলিয়া তাহার নির্মল জ্যোতিকে নিষ্প্রভ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাই Adonais-এর মৃত্যু মৃত্যু নয়, শেষ নয়, কেবল স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠা।

Peace, peace! he is not dead, he doth not sleep,
He hath awakened from the dream of life.
'Tis we, who, lost in stormy visions, keep
With phantoms an unprofitable strife,
And in mad trance, strike with our spirit's knife
Invulnerable nothings.—*We* decay
Like corpses in a charnel; fear and grief
Convulse us and consume us day by day
And cold hopes swarm like worms within our
living clay.

সেই শক্তিই একমাত্র সত্য, অবিনাশী,—পৃথিবীর জীবন ছায়াবাজির মতো চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী,—

The One remains, the many change and pass;
Heaven's light for ever shines, Earth's shadow fly;
Life, like a dome of many coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity,
Until Death tramples it to fragments.

মৃত্যুতে এই জীবন একটা রূপান্তর লাভ করিয়া, এই শক্তির প্রকাশ যে প্রকৃতির মধ্যে হইয়াছে, সেই প্রকৃতির সহিত মিশিয়া চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া যাইবে,—

He is made one with Nature; there is heard
His voice in all her music, from the moan
Of thunder to the song of night's sweet bird.
He is a presence to be felt and known
In darkness and in light, from herb and stone;
Spreading itself where'er that power may move
Which has withdrawn his being to its own,...

শেলীর Adonais-এ ব্যক্তিগত অনুভূতির কোনো তীব্রতা বা গভীরতা নাই, তাহার প্রধান কারণ কীট্সের সহিত কবির ব্যক্তিগত সম্পর্ক সামান্য ছিল। সান্ত্বনার দিক দিয়া কালিদাসের সহিত অমরত্বের পরিকল্পনায় এই স্থানে শেলীর প্রভেদ—কালিদাসের মাত্র ইহজীবনব্যাপী জাগতিক অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা, শেলীর কল্পনা অতি-জাগতিক, চিরন্তন অমরত্বের। সান্ত্বনার দিক হইতে শেলীর সহিত রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির কিছুটা সাদৃশ্য আছে; সাদৃশ্যের অংশটুকু এই যে, উভয়েই-

ধারণা করিয়াছেন, এই বিশ্বের পশ্চাতে এক অনন্ত শক্তি আছে, মানুষ সেই শক্তির অংশ, মৃত্যুতে তাহার বিনাশ নাই। মৃত্যুতে দেহ ধ্বংস হইলে সে পুনরায় সেই অসীম অনন্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কিন্তু এই শক্তি-অনুভূতি ও মৃত্যুর ধারণা সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। শেলী বিশ্বে যে শক্তির অভিব্যক্তি দেখিয়াছেন, তাহা প্রেম, সৌন্দর্য ও স্বাধীনতার শক্তি—একটা নিরালম্ব ভাবময় শক্তিমাত্র।

এই শক্তি-অনুভূতি, দুঃখবাদী, নাস্তিক কবির জীবনের মর্মমূল হইতে উত্থিত সত্যিকার অনুভূতি নয়—কাব্যিক অনুপ্রেরণার মুহূর্তে নিজের মনঃকল্পিত কোনো তত্ত্বের আশ্রয়ে অমরত্ব কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা গ্রহণ করা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের এই শক্তি-অনুভূতি জীবনে ও কাব্যে সত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক অনন্ত, আনন্দময় ভগবানের অভিব্যক্তি দেখিয়াছেন। জগৎ ও জীবন একই সত্যে নিয়ন্ত্রিত—ভগবানেরই অংশ। এই সৃষ্টির মধ্য দিয়া তিনি নিজেকে আনন্দোপলব্ধি করিতেছেন। ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন মানুষ জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া ক্রমাগত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সৃষ্টির অর্থ আছে—মানবজীবনের অর্থ আছে। প্রকৃতি ও মানবজীবন সত্য, সুন্দর ও সার্থক। মানবজীবন স্বপ্ন নয়—গলিতশবের রক্ষাধার নয়। মৃত্যু জীবনকে বৃহত্তর সার্থকতার দিকে লইয়া চলিতেছে, ইহা একটা রূপান্তরের অবস্থা মাত্র। মৃত্যু ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া অংশ সমগ্রের দিকে চলিয়াছে—অপূর্ণ পূর্ণের মুখে ছুটিয়াছে। অসম্পূর্ণ জীবনের পূর্ণতালাভের সোপান মৃত্যু। মৃত্যুই মানবের পরম বন্ধু। ইহাই মৃত্যু ও জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি। সুতরাং এখানে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। 'স্মরণ' কাব্যে মৃত্যুর দানকে কবি দুই হাতে অঞ্জলি ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যু তাঁহার স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধকে অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

টেনিসনের In Memoriam সব দিক দিয়াই পূর্ণ শোককাব্য। ব্যক্তিগত বন্ধু-প্রেমের গভীর অনুভূতিতে, শোকের গভীর ও সংযতপ্রকাশে, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সহিত কবিহৃদয়ের ভাববৈচিত্র্যের মিলনে, ব্যক্তিগত প্রেমকে চিরন্তন প্রেমের সহিত যুক্ত করিবার পথে হৃদয়ের বিচিত্র দ্বন্দ্বের প্রকাশে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রমবিকাশের আস্থায়, আত্মার অমরত্ব ও ভগবানে বিশ্বাসে এবং সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ পূর্ণ-পরিণতির আশ্বাসে, কাব্যখানি সুন্দর ও সার্থক। শোকের মধ্য দিয়া,—বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্য দিয়াই প্রেমের মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্যকে ভালোরূপ অনুভব করা যায়,—টেনিসনেরই কথা—

'Tis better to have loved and lost,
Than never to have loved at all.

শোকাচ্ছন্ন-হৃদয়ে কবি প্রকৃতিকে দেখিতেছেন, শান্ত, স্তম্ভিত, বিষাদে মৌন—প্রকৃতির গাম্ভীর্য তাঁহার বেদনাস্তব্ধ, হতাশ মনের প্রতিবিম্ব বলিয়া মনে হইতেছে,—

Calm is the morn without a sound,
    Calm as to suit a calmer grief,
    And only thro' the faded leaf
The chestnut pattering to the ground;
Calm and deep peace on this high wold,
    And on these dews that drench the furze,
    And all the silvery gossamers
That twinkle into green and gold:

... ...

Calm and deep peace in this wide air,
    These leaves that redden to the fall;
    And in my heart, if clam at all,
If any clam, a clam despair:

প্রকৃতির বাৎসরিক পরিবর্তনের মধ্যে নূতন বৎসর উপস্থিত [illegible] কবি ব্যক্তিগত, স্বার্থপর শোক লঘু করিয়া সমস্ত মানব জাতির দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের কথা মনে ভাবিতেছেন। ক্ষুদ্র দুঃখকে বৃহত্তর দুঃখের মধ্যে বিলীন করিয়া হৃদয়ে বল আনিতে চেষ্টা করিতেছেন,—

Ring out the old, ring in the new,
    Ring happy bells, across the snow:
    The year is going, let him go;
Ring out the false, ring in the true,
Ring out the grief that saps the mind,
    For those that here, we see no more;
    Ring out the feud of rich and poor,
Ring in redress to all mankind,

বসন্ত-প্রকৃতির আনন্দ-অভিব্যক্তির মধ্যে কবি তাঁহার প্রেমকে নূতন আলোকে, নূতন করিয়া অনুভব করিলেন, বন্ধুকে চিরদিনের মত ফিরিয়া পাইলেন, চিরন্তন প্রেমের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেম যুক্ত হইল,—

Now rings the woodland loud and long,
The distance takes a lovelier hue
And drown'd in yonder living blue
The lark becomes a sightless song.
Now dance the lights on lawn and lea,
The flocks are whiter down the vale,
And milkier every milky sail
On winding stream or distant sea ;
.........and in my breast
Spring wakens too ; and my regret
Becomes an April violet
And buds and blossoms like the rest.
.........the songs, the stirring air,
The life re orient out of dust,
Cry through the sense to hearten trust
In that which made the world so fair.
Not all regret : the face will shine
Upon me, while I muse alone ;
And that dear voice, I once have known,
Still speak to me of me and mine :

কবি শেষ সান্ত্বনায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু প্রকৃতির সঙ্গে, ও প্রেমময় ভগবানের যে-অনন্তপ্রেম প্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া আছে, তাহার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কবির বন্ধু সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়া গেলেও প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-গানের মধ্যে কবি তাহাকে নূতনভাবে অনুভব করিতেছেন, তাঁহার প্রেম বহুগুণে বলশালী হইয়াছে।

Thy voice is on the rolling air ;
I hear thee where the waters run ;
Thou standest in the rising sun,
And in the setting thou art fair.
What art thou then ? I cannot guess ;
But tho' I seem in star and flower
To fell thee some diffusive power.
I do not therefore love thee less :
My love involves the love before ;

My love is vaster passion now
Tho' mixed with God and Nature thou,
I seem to love thee more and more.

এই সান্ত্বনার অংশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টেনিসনের অনেকটা মিল আছে। ভগবান, প্রকৃতি ও মানুষের প্রকৃত সত্তা ও তাহাদের পরস্পরসম্বন্ধ বিষয়ে In Memoriam ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে টেনিসন যে ধারণা ও অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার—না হইলে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে উভয় কবির অনুভূতির সাদৃশ্য ও পার্থক্যের একটা ধারণা পাওয়া যাইবে না।

টেনিসনের মতে ভগবান এক এবং জগতের আদি কারণ। তিনি অনন্ত প্রেমময়। তিনি এই জগৎকে—প্রকৃতি ও মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ ভগবানের নিকট হইতে আসিয়াছে, আবার ভগবানের নিকট চলিয়া যাইবে। মানুষের আত্মা অমর। প্রেমময় ভগবান যখন মানবের আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন, তখন উহা কখনোই ধ্বংসশীল হইতে পারে না। ভগবানের অমর অংশ প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রত্যেক মানুষের আত্মা-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের স্বরূপ, ভগবানের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ ও আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এই ধারণার পশ্চাতে কোনো যুক্তিতর্ক বা দর্শন বা নির্দিষ্ট ধর্মমত নাই। ইহা তাঁহার প্রাণের অন্তস্থল হইতে উত্থিত বিশ্বাস মাত্র। তিনি বলিয়াছেন,

We have but faith ; we cannot know ;
For knowledge is of things we see.
... ...
By faith, and faith alone, embrace
Believing where we cannot prove.
(Prologue to *In Memoriam*)

The Two Voices, The Ancient Sage, Far, far away প্রভৃতি কবিতায় ও বিশেষ করিয়া In Memoriam কাব্যে তাঁহার বিশ্বাসের ধারণা ও আত্মার বিভিন্ন অবস্থার কল্পনার একটা মোটামুটি ভাব পাওয়া যায়। প্রথমে, মানবাত্মা বৃহৎ আত্মার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জড় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহ ধারণ করে, শেষে চৈতন্য বা ব্যক্তিত্ব লাভ করে। পৃথিবীতেই আত্মার প্রথম জীবন। এই চৈতন্য বা ব্যক্তিত্বের গভীর অংশ মানবের স্বাধীন ইচ্ছা। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে একটা মহা রহস্য আছে। এই স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে ক্ষুদ্রভাবে,

খণ্ডভাবে অসীমের আত্মপ্রকাশ। দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর মানবাত্মা অসীম আত্মায় মিশিয়া যায় না। সে পুনর্বার দেহ ধারণ করে এবং কোনো নক্ষত্রলোকে বাস করে। যদি পৃথিবীতে সেই আত্মা সৎভাবে জীবনযাপন করে, তবে সেখানে পৃথিবীর অনেক অসম্পূর্ণতা এড়াইয়া, চিন্তায় ও কাজে সাধারণের উপকার করিতে চেষ্টা করে, এবং এই ভাবে ক্রমিক আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই অবস্থায় আত্মা গত জীবনের সমস্ত কথা স্মরণ করিতে পারে এবং সূক্ষ্মদেহে প্রিয়জনকে স্পর্শও করিতে পারে। প্রিয়জনও মৃত্যুর পর সেই আত্মার সহিত পরজন্মে মিলিত হইতে পারে ও পরস্পর মেলামেশা করিতে পারে। আত্মার দ্বিতীয় জন্মের পর আবার তৃতীয় জন্মও আছে, সেখানে আত্মা আরো উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে চরম উন্নতি প্রাপ্ত হইলে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া যায়। প্রেমময় ভগবান এইরূপে প্রত্যেক মানুষকেই নিজের কাছে লইয়া যান। সমস্ত সৃষ্টিরই গতি এই দিকে—

One far off divine event
To which the whole creation moves,

(Epilogue to *In Memoriam*)

The Two Voice, The Ancient Sage, Far, far away প্রভৃতি কবিতায় দেখা যায়, এই পৃথিবীতে জন্মের পূর্বে আত্মার আর একটি জন্ম ছিল বলিয়া টেনিসনের ধারণা। ছেলেবেলায় সেই পূর্ব জন্মের ক্ষীণ স্মৃতি ও অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা আমরা মাঝে মাঝে অনুভব করি। আত্মার এই অবস্থা ও উহার সহিত ভগবানের এই সম্বন্ধ মানুষ গভীর মুহূর্তে অর্ধচেতন অবস্থায় জানিতে পারে, এবং কবির এই অনুভূতিই ঐরূপ বিশ্বাসের মূল।

টেনিসনের এই ধারণার মূলে আছে প্রধানত খৃষ্টীয় ধর্মমত। ভগবান এই পৃথিবী ও মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তাঁহার সৃষ্ট পদার্থকে ভালোবাসেন, ইহা প্রকৃতপক্ষে বাইবেলেরই প্রতিধ্বনি। তারপর আত্মার পুনর্জন্ম তাঁহার নিজের কল্পনা। এই কল্পনার উপরে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতি বা বিবর্তনবাদের প্রভাব আছে। তাই মানবাত্মার ক্রমোন্নতিতে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। জড়জগতের এই নীতি আধ্যাত্মিক জগতেও সমান প্রযোজ্য বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে। তারপর, Wordsworth-এর Ode on the Intimations of Immortality ও অন্যান্য কবিগণের আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসপূর্ণ কবিতার প্রভাব তাঁহার উপর পড়ায় আত্মার পুনর্জন্ম ও হয়তো পৃথিবীর পূর্বেও আর একটা জন্ম থাকিতে পারে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস আসিয়াছে। মোটকথা, খৃষ্টধর্ম, বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও ব্যক্তিগত

কল্পনা মিলিয়া ভগবান ও মানুষ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাকে গঠিত করিয়াছে। ভগবান, মানবজীবন ও মানবাত্মা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার পশ্চাতে ভারতবর্ষের একটা বিরাট অধ্যাত্মসম্পদ ও বহু দর্শনশাস্ত্রের সুচিন্তিত, সুকল্পিত ও পূর্ণাঙ্গ মতবাদ আছে। উপনিষদ, বৈষ্ণবদর্শন প্রভৃতি তাঁহার চিন্তাধারার সহিত মিলিয়া তাঁহার মনের ছাঁচে ঢালাই হইয়া যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাঁহার ভগবান ও মানব সম্বন্ধে অনুভূতির ভিত্তি।

In Memoriam-এ ব্যক্তিগত শোককেই মূল করিয়া, সেই শোকাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী দেখিয়া, ধীরে ধীরে সেই শোককে দূর করিয়া, একটা বৃহত্তর সান্ত্বনা আনিবার চেষ্টা আছে। এখানে শোকের অনুভূতিকেই কেন্দ্র করা হইয়াছে ও ইহার বিভিন্ন প্রকাশ দেখানো হইয়াছে; ব্যক্তিগত শোক সর্বমানবীয় শোকের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু 'স্মরণ'-এ শোককে ক্ষীণভাবে অবলম্বন করা হইয়াছে মাত্র। এই বিশিষ্ট অনুভূতির কোনো একান্ত কাব্যপ্রকাশ ইহাতে নাই। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া মৃত্যুর বৈশিষ্ট্য, মৃত্যুর নিকট হইতে কবির লাভের পরিমাণ, তাঁহার প্রিয়া ও প্রেমকে জীবনে চিরস্থায়ী ভাবে পাওয়ার সান্ত্বনার কথা আছে। তবুও এই কবিতাগুলির অন্তরালে এমন একটা চাপা শোকের ক্ষীণ রাগিণী বাজিতেছে যে কবির সান্ত্বনা অনেকখানি উজ্জ্বলতা হারাইয়াছে। এই মানবীয় অংশ ভাবের উজ্জ্বল দেহের উপর কালো ছায়াপাত করিয়া আলো-ছায়ার যে মায়া রচনা করিয়াছে, তাহাই 'স্মরণ'কে একটা অপরূপ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

মৃত্যুর পূর্ব ও পরের অবস্থার পার্থক্যের যে রূপ কবির অনুভূতিতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্বমানবীয় স্পর্শ যেখানে পড়িয়াছে, সেখানে একটা অপূর্ব মাধুর্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ক্ষুদ্র 'স্মরণ' কাব্যখানি বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই ভাবধারাগুলি দেখিতে পাই,—(১) সাধারণ মানবের শোকানুভূতির সহিত মিলাইয়া ব্যক্তিগত শোকানুভূতি—৪, ১০, ১৫, ২৩নং (২) শোকাচ্ছন্ন মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য-গ্রহণের অক্ষমতা প্রকাশ—১, ২০নং (৩) পত্নীর অসমাপ্ত কামনা-বাসনা ও প্রেমকে প্রকৃতির মধ্য দিয়া ও নিজের জীবনের মধ্য দিয়া অনুভব করিয়া পত্নীর জীবনের সাধ পূর্ণ করা,—১৬, ১৭, ১৯, ২৭নং (৪) মৃত্যুতে পত্নীকে নূতন করিয়া অনন্তকালের জন্য লাভ—৮, ৯, ১১, ১২নং (৫) শেষ সান্ত্বনা-লাভ—ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া দেখা—২, ৫, ১৩, ২২, ২৪নং।

(১) পত্নী সমস্ত সংসার জুড়িয়া বসিয়া থাকিলেও, মৃত্যুর ডাকে তাহাকে অসমাপ্ত কাজ ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হয়। স্বামীর সহিত সুখেদুঃখে যে সংসার

আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহার ক্ষতি-লাভ, সুবিধা-অসুবিধার কোনোরূপ হিসাব-নিকাশ করার সুযোগ পাওয়া যায় না। জীবিত স্বামীর জীবনে আসে এক অসহায়, বিপর্যস্ত ভাব ও শূন্যতা।

তখন নিশীথ রাত্রি ; গেলে ঘর হতে
যে পথে চলনি কভু সে-অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায়-বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব-মাঝে বাহিরিলে একা,
অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলাম দেখা।
... ...
গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে ?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে ?
বিশ-বৎসরের তব সুখদুঃখভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার।
প্রতিদিবসের প্রেমে কতদিন ধরে
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল করে,
পরিপূর্ণ করি তারে স্নেহের সঞ্চয়ে
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে ?
তোমার সংসার মাঝে, হায়, তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন দুর্দিন,—
তখন এ শূন্যঘরে চিরাভ্যাস টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে ?

শান্তমূর্তি নারী গৃহলক্ষ্মীরূপে সমস্ত সংসার পরিচালনা করিয়াও সকলের পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া থাকে। তাহার গোপন মনের আশা আকাঙ্ক্ষা সে বাহিরে প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করে। তাহার অন্তর্জীবনের এই নীরব ট্র্যাজেডির কেবল একজন আভাস পায়—সে সহৃদয় স্বামী। মৃত্যুতে সেই নীরবতার বেদনা বাজে স্বামীর বুকেই বেশি। সেই অকথিত গোপন কথা কবি আজ শুনিতে চাহিতেছেন,—

তোমার সকল কথা বলো নাই, পারোনি বলিতে
আপনারে খর্ব করি রেখেছিলে, তুমি হে লজ্জিতে,
যতদিন ছিলে হেথা। হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি
যখন চাহিত তা'রা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি
তর্জনী-ইঙ্গিতে তুমি গোপনে করিতে সাবধান

ব্যাকুল সংকোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান!
আপনার অধিকার নীরবে নির্মম নিজ করে
রেখেছিলে সংসারের সবার পশ্চাতে হেলাভরে।
লজ্জার অতীত আজি মৃত্যুতে হয়েছো মহীয়সী,—
মোর হৃদি-পদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি
নতনেত্রে বলো তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবাধাহীন বাক্যে!

বিবাহিত জীবনের প্রথমে স্বামীর লিখিত চিঠিগুলি স্ত্রীর নিকট মহামূল্য সম্পত্তি বলিয়া মনে হয়। সে গোপনে সেগুলিকে রক্ষা করে। মৃত্যুতে সে গোপনতা ব্যক্ত —আর তাহারা আশ্রয়হীন।

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি
স্মৃতির খেলেনা-কটি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।
... ...
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে?
জগতের কারো নয় তবু তারা আছে।

সারাদিনের কর্মসংগ্রামের পর সন্ধ্যায় পত্নী-প্রেম-রচিত শান্তিনীড়ের যে কি অনিবার্য মোহ ও সার্থকতা কবি তাহা বুঝিয়াছেন; তাই অশরীরিণী স্ত্রীকে সন্ধ্যার অন্ধকারে হৃদয়ে প্রেমের আলো জ্বালিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন। কবির হৃদয়ের নিভৃত অন্ধকার-কোণে এই প্রেমের আলোকটুকুই তাঁহার দিনের কর্মে শক্তি জোগাইবে। রাত্রে গৃহে ফিরিয়া এই প্রেমের ভাব-রূপের মধ্যে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন,—

জ্বালো ওগো জ্বালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জ্বালো!
হৃদয়ের একপ্রান্তে ওইটুকু আলো
স্বহস্তে জাগায়ে রাখো। তাহারি পশ্চাতে
আপনি বসিয়া থাকো আসন্ন এ রাতে
যতনে বাঁধিয়া বেণী সাজি রক্তাম্বরে
আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাড়িবার তরে
জীবনের জাল হতে। বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্মকীর্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তুপাকার উদ্যোগের পিছে

না থাকে একটি হাসি ; নানা দিক হতে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যায় আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির।

এইটি 'স্মরণ'-এর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। সর্বমানবীয় ভাবের আবেদনে ইহা সমৃদ্ধ।

(২) কবি নিজের শোকাচ্ছন্ন মনের সহিত প্রকৃতির সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছেন না,—

আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
করো গো আড়াল করো।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হেথা হতে হরো।
প্রভাত-জগৎ হতে মোরে ছিঁড়ি
করুণ আঁধারে লহো মোরে ঘিরি
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক
তব স্নেহবাহুডোর।

তাঁহার মনের এই অবস্থা স্বাভাবিক, তাঁহার বেদনাকে ধ্বনিত করিয়া উৎসব করিবার জন্য তিনি বসন্তকে আহ্বান করিতেছেন,—

এসো বসন্ত, এসো আজি তুমি
আমারো দুয়ারে এসো।
ফুল তোলা নাই, ভাঙা আয়োজন,
নিবে গেছে দীপ, শূন্য আসন,
আমার ঘরের শ্রীহীন মলিন
দীনতা দেখিযা হেসো.
তবু বসন্ত, তবু আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এসো।

(৩) কবির গৃহলক্ষ্মীর স্বল্পায়ু জীবনের আনন্দিত দিনের স্মৃতি ও তাঁহার কামনা-বাসনা কবিকে অনুক্ষণ ঘিরিয়া আছে,—

সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে,—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে-জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী।
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্মর-রাগিণী
তোমার সে কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার।
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার
কত শীত-মধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা।

পাগল-করা বসন্তদিন যখন উভয়ের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল, তখন কবির কর্মব্যস্ততার জন্য কবি-পত্নী তাহাতে সাড়া দিবার সুযোগ পান নাই। আজ পত্নীর অনুপস্থিতিতে বসন্ত যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন কবি তাহার স্পর্শের মধ্যে প্রিয়ার নীরব ব্যাকুল অন্তরখানি অনুভব করিতেছেন,—

আজি তুমি চলে গেছো, সে এলো দক্ষিণ-বায়ু বাহি,
আজ তারে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি।
আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি,
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি।

কবি আশ্বস্ত হইয়াছেন যে পত্নীর সাধ-আশা কামনা-বাসনা পূর্ণ না হইলেও তাঁহার নিজের জীবনের মধ্য দিয়াই পত্নীর সব আশা পূর্ণ হইবে, কারণ

মৃত্যু-মাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছো জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি নাই মোর শোক!

কবির জীবনই তাঁহার প্রিয়ার জীবন হোক—

আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো!
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো।
যেন-আমি বুঝি মনে
অতিশয় সংগোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো!

(৪) কবি তাঁহার মৃত পত্নীকে সর্বত্র অনুভব করিতেছেন, তাঁহার জীবনে নূতনরূপে ও নবভাবে ফিরিয়া পাইয়া চির-সার্থকতা লাভ করিয়াছেন,—

তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।
তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে,
তোমারি কামনা মোর কামনার মাঝে।

পত্নীর হৃদয়-সৌন্দর্যকে কবি বিশ্বের মধ্যে অনুভব করিতেছেন,—

চিত্তের সৌন্দর্য তব বাধা নাহি পায়—
সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে

সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল সাথে। তোমার কঙ্কণ
তোমার কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে লাগিয়া।

মৃত্যুর মধ্য দিয়া নূতন বেশে আসিয়াছেন কবির প্রিয়া,—

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নব রূপখানি
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হতে।
স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধমুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে
নির্বাক দাঁড়ালে আসি। মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।

নবীন, নির্মল মূর্তিতে কবি তাঁহাকে আজ ফিরিয়া পাইয়াছেন—

উঠেছো আমার শোকযজ্ঞহুতাশনে
নবীন নির্মলমূর্তি,—আজি তুমি সতী
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,—
নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা,—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা
নিঃশেষে মিশিয়া গেছো মোর চিত্ত সনে।

(৫) মৃত্যুর পরম দানকে কবি গ্রহণ করিতেছেন,—

জীবনের দিক্‌চক্রসীমা
লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা,
অশ্রু-ধৌত হৃদয়-আকাশে
দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।
তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী

মৃত্যু আসিয়াছে অপূর্ব মধুর রূপে তাঁহার কাছে, তাহারই মঙ্গল-আলোকে কবি চিরন্তন অমৃতের সঙ্গে তাঁহার পত্নীকে যুক্ত করিয়া চির-মিলন লাভের আশা করিতেছেন। বিশ্বদেবতার পূজাতেই তাঁহার পত্নীকে চির-প্রেম নিবেদন করা হইবে এবং বিশ্বদেবতার আশ্রয়ে তাঁহাদের মিলন হইবে অনন্ত।

রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত
তুমি তারে আজি লয়েছ, হে নাথ,
তোমারি চরণে দিলাম স'পিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার।
... ...
তারে যাহা কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা কিছু স'পিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে-প্রেমের হার।

তাঁহার শেষ ইচ্ছা—

অতীত অতৃপ্তি পানে যেন নাহি চাই ফিরে ফিরে—
যাহা কিছু গেছে যাক, আমি চলে যাই ধীরে ধীরে
তোমার মিলনদীপ অকম্পিত যেথায় বিরাজে
ত্রিভুবনদেবতার ক্লান্তিহীন আনন্দের মাঝে।

প্রিয়া তাঁহাকে সৃষ্টির চরম রহস্য বুঝাইয়া দিয়া গেল। ভগবান নিজেরই আনন্দ-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য দ্বিধাবিভক্ত হইয়া নিজেকে উপভোগ করিতেছেন। এই স্ত্রীশক্তি তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। এই চিদানন্দদায়িনী শক্তিরূপা স্ত্রীর মধ্য দিয়া কবিও তাঁহার নিজেরই আনন্দকে উপলব্ধি করিয়াছেন—

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
... ...
যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ-গন্ধ-গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের প্রতিধ্বনি,—

আপন মাধুর্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

মৃত্যু কবির চক্ষে ভিন্ন রূপ লইয়া আসিয়াছে—অপূর্ব সান্ত্বনায় কবি শোক জয় করিয়াছেন।

In Memoriam সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "……much of *In Memoriam* is nearer to ordinary life than most elegies can be, and many such readers have found in it an expression of their own feelings, or have looked to the experience which it embodies as a guide to a possible conquest over their own loss. 'This', they say to themselves as they read, 'is what I dumbly feel.' This man, so much greater than I, has suffered like me and has told me how he won his way to peace. Like me, he has been forced by his own disaster to meditate on "the riddle of the painful death", and to ask whether the world can really be governed by a law of love, and is not rather the work of blind forces, indifferent to the value of all that they produce and destory" (Bradley).

" 'I' is not always the author speaking of himself, but the voice of the human race speaking through him." (*Memoir* I, p. 305)

সাধারণ মানুষের ভিত্তিভূমি হইতে In Memoriamকে দেখিলে ইহার মধ্যে সর্বমানবীয় চিত্তের স্পর্শ আমাদিগকে মুগ্ধ করে, কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে, এইরূপ শোকের একান্ত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উপজীব্য নয়। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস আনিয়া কি করিয়া ধীরে ধীরে শোক জয় করিতে হয়, তাহার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের নিকট খুব একটা বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় বর্ধিত, উপনিষদের রসপুষ্ট কবির নিকট আত্মার অমরত্ব তো স্বতঃসিদ্ধ, ইহাকে বিশ্বাস করিয়া লইয়াই যে কি ভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করিয়াছেন ও সান্ত্বনা পাইয়াছেন, তাহাই এখানে দেখিবার বিষয়। 'স্মরণ'-এর এই অংশে অপূর্ব কাব্য ও সান্ত্বনার সমন্বয় হইয়াছে।

১৫

শিশু

(১৩১০, গ্রন্থাকারে ১৩১৬)

স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য তাহাকে আলমোড়া রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ পীড়িতা কন্যার শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য কয়েকমাস সেখানে বাস করেন। সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ শিশুপুত্রটি ছিল। কন্যার বিবাহ হইলেও তাহার বয়স তখন তেরো বছরের

নীচে। তাই পীড়িতা কন্যা ও শিশুপুত্রের মনোরঞ্জনের জন্য 'শিশু'র অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। এইটি বাহিরের কারণ হইলেও, এইরূপ কবিতা রচনার জন্য তাঁহার অন্তরের একটা তাগিদ ছিল। তাঁহার অন্তর-জগতে একটা প্রবল আলোড়ন চলিতেছিল। সম্মোমৃতা পত্নীর শোক, মাতৃহারা কন্যার আসন্ন মৃত্যু, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় সম্বন্ধে জটিল পরিস্থিতি তাঁহার মনকে গভীর বেদনা ও দুশ্চিন্তায় ভরিয়া রাখিয়াছিল। সেই বেদনা ও দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য তিনি শিশুজীবনের সরল সর্বভোলা আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন। শিশুর মনোজগতের এই লীলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিত্তকে সমস্ত দুঃখবেদনার অতীত করিবেন ও শান্তিলাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। মনের ভার হইতে মুক্তিলাভের এক উপায়স্বরূপ তিনি একাধিকবার শিশুচিত্তের অনাবিল লীলার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 'শিশু-ভোলানাথ'ও 'আমেরিকার বস্তুগ্রাস' ও 'প্রবীণতার কেল্লা'র মধ্যে পড়িয়া মনে যে ভার বোধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার আশাতেই রচিত।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' বিশ্ব-সাহিত্যের অতুলনীয় রত্ন। শিশু-মনের লীলারহস্যের এইরূপ অপূর্ব প্রকাশ আর কোনো সাহিত্যে দেখা যায় না। অন্যান্য সাহিত্যের নাটক, উপন্যাস ও গল্প প্রভৃতিতে দুই চারিটি শিশুচরিত্রের অবতারণা দেখা যায়; তাহাতে শিশুমনের সামান্য একটা বৈশিষ্ট্যের চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। 'শকুন্তলা' নাটকে সর্বদমন সিংহকে ধরিয়া তাহার দাঁত গনিতে যাইতেছে। অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া বালকসুলভ পরিণাম-চিন্তাহীনতার চিত্রের পশ্চাতে কবির আরো একটি ইঙ্গিত ছিল যে সর্বদমন নিরীহ আশ্রমবাসীদের পুত্র নয়, সাহসী ক্ষত্রিয়পুত্র। রোমাঁ রলাঁর 'জন ক্রিস্টোফার'-এ (জাঁ ক্রিস্তফ) ক্রিস্টোফারের শৈশবজীবনের কৌতূহল, কল্পনা-প্রিয়তা প্রভৃতির সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শিশুমনের সর্বদিক দিয়া একটা পরিপূর্ণ চিত্র—এমন শিশুর দিক হইতে জগৎকে দেখা, আবার শিশুর পিতামাতার দিক হইতে শিশুকে দেখার চিত্র ও কাব্য তাহাতে নাই। ফ্র্যানসিস টমসন্, ভগ্যান, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কবিরা শিশুর মধ্যে ভগবানের শক্তি ও তাহারা যে দেবলোক হইতে সদ্য আগত, এইরূপ অনুভব করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা শুষ্ক তত্ত্বের আভাস মাত্র। শিশুর মনকে কোনো ভাবে বা রূপে ইহারা রূপায়িত করেন নাই। মেটারলিঙ্কের "দি ব্লু বার্ড"-এর শিশু দুইটি নাট্যকারের কোনো তত্ত্বের সংকেতবাহক মাত্র। ব্যারির 'পিটার প্যান'-এর শিশুও তাহাই। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অমলও এইরূপই শিশু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো শিশুহৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব-

চিন্তা, কল্পনা, বিশ্বাসকে এমন অপূর্বভাবে আর কেহ রূপায়িত করেন নাই। তারপর পিতামাতার স্নেহের মধ্য দিয়া শিশু যে কি পরম বিস্ময়কর রূপ ধারণ করে তাহাও রবীন্দ্রনাথ অপরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শিশুকে এই দুইভাবে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, বিশ্বসাহিত্যে তাহার কোনো জুড়ি মিলে না।

'শিশু'র মধ্যে প্রধানত আমরা এই দুই ধারার কবিতা দেখিতে পাই। প্রথম, শিশু-মনের চিত্র—তাহার বিচিত্র ভাব, চিন্তা, কল্পনা ও ধারণার প্রকাশে সেগুলি শিশু-মনের চিরন্তন ইতিহাসের গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এখানে শিশুর মনস্তত্ত্বের রূপ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়, শিশুর পিতামাতা ও শিশুকে যাহারা ভালোবাসে তাহাদের মনের চিত্র,—শিশু তাহাদের নিকট কি রূপে প্রতিভাত হয়, কি ভাবের সঞ্চার করে, তাহার চিত্র। এখানে শিশুসম্বন্ধে পিতামাতার মনস্তত্ত্বের রূপ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম ধারার কবিতার মধ্যে দেখা যায় যে, শিশু এই জগতের প্রাণী নয়, এই বাস্তব সংসারে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, এই সংসারের কার্যকারণসম্বন্ধ, উত্থান-পতন, ভাবনা-চিন্তা, হিসাব-নিকাশের সঙ্গে তাহার কোনো যোগ নাই। এই সংসারে বাস করিয়াও সে নিজের জগতের মধ্যে আছে। শিশুর জগৎ ও পূর্ণবয়স্কের বাস্তবজগৎ বিভিন্ন। শিশুর জগতে যাহা পরম সত্য—এখানে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ, অকারণ। শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক—বিচারের মাপকাঠি স্বতন্ত্র।

'শিশু'র প্রবেশক কবিতাটিতেই কবি শিশুর স্বাতন্ত্র্যের মূলসুর ধ্বনিত করিয়াছেন। সংসাররূপ সমুদ্র প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। কতো তাহার তরঙ্গ, কতো উত্তাল কলরোল। শিশুরা জলে নামে না, কেবল তীরে বসিয়া আপনমনে নিজেদের খেলায় মত্ত আছে। সমুদ্রের গর্জন তাহাদের কানে হাল্কা গানের সুরের মতো বোধ হইতেছে। চঞ্চল সাগর তাহার খেলার সঙ্গে মিশিয়া খেলারই একটা উপকরণে পরিণত হইয়াছে। তাই বাস্তবজগৎ ও শিশুর জগৎ ভিন্নমুখী। বাস্তবজগতের লাভালাভ, হিসাব-নিকাশের কোনো ধার সে ধারে না, নুড়ি কুড়াইতে আর বালুর ঘরে ঝিনুক লইয়া খেলাতেই সে মত্ত,—

জানে না সাঁতার দেওয়া,
জানে না জাল-ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে ;
বণিক ধায় তরণী বেয়ে ;
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে

সাজায় বসি ঢেলা।
রতন-ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল-ফেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

'ভিতরে ও বাহিরে' কবিতায় আরো স্পষ্ট করিয়া এই ভাবটি ব্যক্ত করা হইয়াছে,—

খোকা থাকে জগৎমায়ের
অন্তঃপুরে,—
... ...
নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে আকাশ পাতাল
মা রচেছেন খোকার খেলা-ঘরের চাতাল।
... ...
সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে সূর্য শশী
খোকার সাথে হাসে, যেন একবয়সী।
সত্য বুড়ো নানারঙের মুখোস প'রে
শিশুর সনে শিশুর মতো গল্প করে।
... ...
খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি যা ইচ্ছে তাই,—
কোনো নিয়ম কোনো বাধা-বিপত্তি নাই।
বোবাদেরও কথা বলান খোকার কানে,
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন চেতন প্রাণে।

আর বাস্তব জগতের বয়স্করা,—

আমরা থাকি জগৎপিতার বিদ্যালয়ে,—
উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা দেয়াল লয়ে।
জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে চলে সূর্য শশী,
নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে রশারশি
... ...
চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে এমনি ভাবে
যেন তারা সাত ভায়েরে কেউ না জানে।
... ...
দিঘি থাকে নীরব হয়ে দিবারাত্র—
নাগকন্যের কথা যেন গল্প মাত্র।

বিশ্ব-গুরুমশায় থাকেন কঠিন হয়ে,
আমরা থাকি জগৎপিতার বিদ্যালয়ে॥

কঠিন বাস্তবজগতের আবেষ্টনী ক্রমে শিশুকে একটু একটু করিয়া ঘিরিতে আরম্ভ করিলে, সে তাহা হইতে মুক্তি চায়, ছুটি চায়—তাহার মনের খেলার জগতে প্রবেশ করিতে চায়। তাহার মনের জগতে, যেখানে বাস্তব জগতের কোনো নিয়ম খাটে না, যেখানকার-ভালোমন্দ, সামান্য-বিশেষ, শিশুর ওজনে, শিশুর মাপকাঠিতে নির্ধারিত, সেই জগতের অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে সে সঞ্চরণ করিতে চায়। বাঁধা-ধরা পড়াশুনা তাহার ভালো লাগে না। তাই ভাব ও কল্পনার সীমাহীন স্বাধীনতা পাইবার জন্য সে ছুটি খোঁজে,—

মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল,
 সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
 করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।
তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
 না হয় যেন সত্যি হল তাই,
একদিনো কি দুপুরবেলা 'হলে,
 বিকেল হল, মনে করতে নাই?
(প্রশ্ন)

নিত্য নিত্য পাঠশালায় যাইয়া আবদ্ধ থাকা তাহার ভালো লাগে না, পাঠশালার বদ্ধ জীবন অপেক্ষা ফিরিওয়ালা, মালী, মাঝি প্রভৃতির জীবন তাহার কাছে কাম্য। কারণ শিশুর চোখে যে-সব জীবনের অবাধ স্বাধীনতা, সেখানে কোনো বাধা-নিষেধ নাই, খবরদারি করিবার কেহ নাই, নিজের মনের আনন্দে তাহারা যেখানে-সেখানে যাইতে পারে, যাহা কিছু করিতে পারে। তাহাদের বাস্তব জীবনের দিকটা শিশুর চোখে মোটেই পড়ে না, সে দেখে তাহাদের বাধাহীনতা, উন্মুক্ততা। তাই সে ফিরিওয়ালা হইতে চায়,—

"চুড়ি চা—ই চুড়ি চাই" সে হাঁকে,
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে-পথে তার খুশি,
 যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে,
 নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।

ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি ॥
(বিচিত্র সাধ)

কখনো সে বাবুদের ফুলবাগানের মালী হইতে চায়,—

কেউ তো তারে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের 'পরে ;
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো,
কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।
মা তারে তো পরায় না সাফ জামা,
ধুয়ে দিতে চায় না ধুলোবালি।
ইচ্ছে করে, আমি হতেম যদি
বাবুদের ঐ ফুলবাগানের মালী ॥
(বিচিত্র সাধ)

কখনো তাহার সাধ যায় খেয়াঘাটের মাঝি হইতে, যেখান থেকে চারিদিকের মুক্ত কর্মপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়,—

কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে ;
জাল টেনে নেয় জেলে ;
গোরু মহিষ সাঁতরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে। (মাঝি)

বাস্তবের সংঘাতে শিশু তাহার ক্ষুদ্রত্ব, অসহায়ত্ব অনুভব করে, বয়স্কদের সংসারে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-চিন্তার যে বিশেষ কোনো মূল্য নাই, তাহা সে ধারণা করিতে পারে ; কিন্তু শিশুর স্বভাবের মধ্যে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই বর্তমান থাকে, তাই কল্পনায় সেই ক্ষুদ্রত্ব ও অসহায়ত্ব সে পূরণ করে। ইহাকেই শিশুমনস্তত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন, Compensatory process, বা শিশুমনের কল্পনায় ক্ষতিপূরণ-প্রক্রিয়া।

শিশুর মাস্টার তাহাকে যাহা বলে, যেরূপে পড়ায়, শিশুও তাহার অনুকরণে সেই মাস্টারের ভূমিকা অভিনয় করিতে চায়। তাই সে বলে,—

আমি আজ কানাই মাস্টার,
পোড়ো মোর বেড়ালছানাটি।
আমি ওকে মারিনে মা, বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।

আমি ওরে বলি বার বার—
পড়ার সময় তুমি পোড়ো,
তারপরে ছুটি হয়ে গেলে
খেলার সময় খেলা কোরো।
... ...
একটু সুযোগ বোঝে যেই
কোথা যায়, আর দেখা নেই।
(মাস্টার বাবু)

কখনো বা পরমবিজ্ঞ দাদার মতো বলে,—

খুকু তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা—
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলাম ফানুস।
... ...
তোমার খুকি চাঁদ ধরতে চায়,
গণেশকে ও বলে মা গানুশ।
তোমার খুকি কিচ্ছু বোঝে না, মা,
তোমার খুকি ভারি ছেলেমানুষ॥
(বিজ্ঞ)

কল্পনায় সে বাবার মতো বড় হইয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ভুলিতে চেষ্টা করে,—

রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়,
একেলা যাব, করব না তো ভয়,
মামা যদি বলেন ছুটে এসে—
"হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ো"—
বলব আমি, "দেখছ না কি মামা,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।"
দেখে দেখে মামা বলবে, "তাই তো,
খোকা আমার সে-খোকা আর নাই তো॥"
(ছোটোবড়ো)

এই ভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইয়াছে 'বীরপুরুষ' কবিতাটিতে। শিশু একদল ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের হটাইয়া দিয়া মাকে রক্ষা করিয়াছে—এই কল্পনা তাহার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল-তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে,—
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা !
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা !

এই কল্পনা সত্য হয় না বলিয়া তাহার মনে দুঃখ,—

রোজ কতো কী ঘটে যাহা-তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা ।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে,—
দাদা বলত, "কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে !"
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
"ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে ॥"
(বীরপুরুষ)

রূপকথার রাজত্বে শিশুর চিরদিনের বাস। শিশুর মন সম্ভব-অসম্ভবের কোনো ধার ধারে না, রূপকথার সঙ্গে বাস্তবের ভেদ অনুভব করিতে পারে না। রূপকথার বিচিত্র আখ্যানভাগ তাহার কাছে পরম সত্য, তাহার মন সারাক্ষণ সেই আবেষ্টনীর মধ্যে বিচরণ করে। ছাদের পাশে তুলসীগাছের টব যেখানে আছে, সেখানে তাহার রাজার বাড়ি, মাঠের পারে দণ্ডকবন। রাজগঞ্জের ঘাটে মধুমাঝির নৌকাটা বাঁধা দেখিয়া সে বলে,—

আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা—
মিথ্যা ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে।
আমি কেবল যাই একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার ॥
(নৌকাযাত্রা)

বাদল-সাঁঝে তাহার মনে পড়ে রূপকথার তেপান্তরের মাঠের সেই রাজপুত্তুরের কথা,—

এমনিতরো মেঘ করেছে সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার বুকের 'পরে নাচে,—
রাজকন্যা কোথায় আছে খোঁজ পেলে কার কাছে?
মেঘে যখন ঝিলিক মারে আকাশের এক কোণে,
দুয়োরাণী-মায়ের কথা পড়ে না তার মনে?
দুখিনী মা গোয়াল ঘরে দিচ্ছে এখন ঝাঁট,
রাজপুত্তুর চলে যে কোন্ তেপান্তরের মাঠ॥

(ছুটির দিনে)

রামায়ণ বা রূপকথার ঘটনাকে সে নিজের শিশু-মনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাহার মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লয়। সম্ভব-অসম্ভবের তাহার কোনো বালাই নাই। রামের বনবাস সে রামযাত্রার গানে শুনিয়াছে, কিন্তু দণ্ডকারণ্য যে মাঠের পারেই, এই তাহার ধারণা, আর বন্যপ্রকৃতির সহিত এক হইয়া মিশিতেই তাহার আনন্দ,—

রোদের বেলায় অশথতলায় ঘাসের 'পরে আসি
রাখাল ছেলের মতো কেবল বাজাই বসে বাঁশি।
ডালের 'পরে ময়ূর থাকে পেখম পড়ে ঝুলে,
কাঠবিড়ালি ছুটে বেড়ায় নেজটি পিঠে তুলে।
কখন আমি ঘুমিয়ে যেতেম দুপুরবেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে॥

(বনবাস)

বন্যজন্তুর ভয়-ভাবনাও সে অনেকটা কমাইয়া আনিয়াছে লক্ষ্মণ ভায়ের সাহায্যের আশ্বাসে,—

রাক্ষসেরে ভয় করিনে, আছে গুহক মিতা,
রাবণ আমার করবে কি মা, নেই তো আমার সীতা।
হনুমানকে যত্ন করে খাওয়াই দুধে-ভাতে,
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার থাকত সাথে সাথে॥

(বনবাস)

প্রকৃতির সঙ্গে শিশুর সম্বন্ধ অতি নিবিড়। প্রকৃতি তাহার নিকট একান্ত সজীব—প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ একেবারে মানুষের সমগোত্রীয়। সন্ধ্যাবেলায় কদমগাছের আড়ালে যখন চাঁদ ওঠে, তখন শিশু মনে করে, সত্যই চাঁদ ওখানে আট্‌কা পড়িয়া গিয়াছে এবং উহাকে ধরিয়া আনা যায়। তাহার দাদা যখন বলে

যে চাঁদ অনেক দূরে থাকে, ওটা অত্যন্ত বড়ো, আর হাতে ধরা যায় না, তখন শিশু দাদার যুক্তি বুঝিতে পারে না, বলে,—

"দাদা, তুমি জানো না কিচ্ছুই।
মা আমাদের হাসে যখন ঐ জানালার ফাঁকে,
তখন তুমি বলবে কি, মা অনেক দূরে থাকে?"
... ...
"কী তুমি ছাই ইস্কুলে যে পড়।
মা আমাদের চুমো খেতে মাথা করে নিচু,
তখন কি মার মুখটি দেখায় মস্ত বড়ো কিছু।"

(জ্যোতিষ-শাস্ত্র)

বর্ষাকালের ফুল শিশুর মতোই পাঠশালার ছাত্র, তাহারা মাটির নীচে পাঠশালায় পড়ে। বর্ষাকালে উহাদের ছুটি হয়, তখন খেলা করিতে উপরে উঠে। কিন্তু বেশিক্ষণ খেলায় দেরি করিতে পারে না, কারণ তাহাদের মা তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে,—

দেখিসনে মা, বাগান ছেয়ে ব্যস্ত ওরা কতো!
বুঝতে পারিস কেন ওদের তাড়াতাড়ি অতো?
জানিস কি কার কাছে হাত বাড়িয়ে আছে।
মা কি ওদের নেইকো ভাবিস আমার মায়ের মতো?

(বৈজ্ঞানিক)

মেঘের মধ্যে যাহারা থাকে, ঢেউএর মধ্যে যাহারা থাকে, তাহারা ক্রমাগত যেন শিশুকে ডাকে খেলার জন্য, কিন্তু সে মা ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়া যায় না।

সমস্ত 'শিশু' কাব্যখানির অন্তরালে শিশুর একমাত্র বন্ধু ও সমসুখদুঃখভোগী একটিমাত্র প্রাণী আছে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই শিশুর সমস্ত ভাব-চিন্তা, কল্পনা-ধারণা উৎসারিত হইয়াছে—সে তাহার মাতা। তাহার কল্পনা যতো সুদূর অভিযানই হউক না কেন, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা যতো বিচিত্র, যতো অসম্ভবই হোক না, তাহার মধ্যে তাহার মাতার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সে তাহার সমস্ত ভাব-চিন্তা-কল্পনার সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন শিশুবন্ধু-রূপে রূপান্তরিত করিয়া লয়।

'শিশু'র দ্বিতীয় ধারার কবিতার মধ্যে শিশুর মাতা ও শিশুকে যাহারা ভালোবাসে, তাহাদের নিকট শিশু কি অত্যাশ্চর্য, পরমরহস্যময় রূপে প্রতিভাত হয়, তাহার অপূর্ব চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্য ও ভাবের ঐশ্বর্যে এই কবিতা

কয়টি মনোহর। 'জন্মকথা', 'খেলা', 'চাতুরী', 'কেন মধুর' প্রভৃতি কবিতায় শিশু তাহাদের নিকট সেই পরমসৌন্দর্যময়, পরমপ্রেমময়, পরমরহস্যময়ের ক্ষুদ্রপ্রকাশ বলিয়া প্রতিভাত, তাহাব দেহমনের সৌন্দর্যে, ক্ষুদ্রজীবনের লীলার মধ্যে একটা অনির্বচনীয়ত্বে তাহারা প্রতিক্ষণ মুগ্ধ হইতেছে—সন্তানস্নেহের মধ্য দিয়া তাহারা সকল রসের উৎস পরমদেবতাকে অনুভব করিতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের বাৎসল্য-রস রবীন্দ্র-কবিমানসের বিশিষ্ট রসে জারিত হইয়া এক মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে 'শিশু' গ্রন্থখানির এই কবিতাগুলির মধ্যে।

'জন্মকথা'য় কবি বলিতে চাহিতেছেন যে, এ-জগতে শিশুর আবির্ভাব অর্থহীন, তাৎপর্যহীন, কেবলমাত্র প্রকৃতির খেয়াল নয়। যে আনন্দ এই সৃষ্টির মূলে এবং যে আনন্দে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উল্লসিত, তাহারি একটি ক্ষুদ্র কণা শিশু। সে নিত্যকালের —অসীম ও অনন্ত। এই অসীম, অনন্ত আনন্দ সীমাবদ্ধ হইয়া মায়ের বুকে শিশুরূপে আবির্ভূত। মায়ের ও আত্মীয়স্বজনের চিরকালের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তিমান প্রকাশ শিশু। মায়ের দেহ-মনের সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য তাহার মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। অসীম, অনন্ত আনন্দের অংশ দেশ, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ হইয়া, পিতামাতার ও আত্মীয়স্বজনের জন্মজন্মান্তরেব কামনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাব মূর্তি গ্রহণ কবিয়া সংসাবে অবতীর্ণ হয়। অন্তবেব ধন আজ শিশু হইয়া মাযেব কোলে,—তাহার অপূর্ব রহস্যময় হাব-ভাব ও প্রকৃতি ক্ষণে-ক্ষণে মায়ের হৃদয বিস্ময়-রসে আপ্লুত করে। তাই মায়েব সর্বদা ভয় কখন তাহাকে হারায়,—

'হারাই হারাই' ভযে গো তাই
বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহুদুটির আড়ালে।

'খেলা' কবিতাটিতে সকালবেলায় গোষ্ঠ-গমনের জন্য প্রস্তুত, রাখালবেশধারী শিশু-কৃষ্ণের নৃত্য-লীলায় যশোদার স্নেহ-রস যেন উছলিয়া পড়িতেছে,—

বিহানবেলা আঙিনাতলে
এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণ দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিযা।

তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া
... ...
তাথেই তেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাঁচনি।

'চাতুরী' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, খোকা স্বর্গের প্রাণী হইলেও, মায়ের স্নেহ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় সে মর্ত্যে আসিয়াছে; অতুল তাহার ধনসম্পদ থাকিলেও, মায়ের স্নেহের লোভে সে ভিখারী সাজিয়া মায়ের কোলে আসিয়াছে; সে আকাশের নক্ষত্রলোকের বাঁধনহারা অধিবাসী হইলেও মায়ের স্নেহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মায়ের কোমল বুকে অসীম সুখে আত্মহারা হইতে চাহে। অসীম, অনন্ত স্নেহের কাঙাল হইয়া সংসারের স্নেহ-বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছেন।

'কেন মধুর' কবিতায় কবি বলিতে চাহেন যে, মাতা শিশুকে ভালোবাসিয়া—সন্তান-স্নেহের মধ্য দিয়াই বিশ্বের আনন্দলীলা—তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-গানকে উপলব্ধি করিতে পারেন। সন্তানের হাতে যখন রঙীন খেলনা দেওয়া যায়, তখন তাহার দেহে যে সৌন্দর্য ও মনে যে আনন্দের বিকাশ হয়, তাহার মধ্যে মা বিশ্বের সৌন্দর্য ও আনন্দকে প্রত্যক্ষ করেন। শিশুর সৌন্দর্য ও আনন্দের মধ্যে বিশ্বের আনন্দ-লীলা মায়ের চোখে মূর্ত হইয়া উঠে। শিশুকে নাচাইবার সময় মা যে গান করেন, সেই সংগীতের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির নানা অভিব্যক্তির মধ্য হইতে যে সংগীত নিরন্তর উঠিতেছে, তাহার যে মিল আছে, মা তাহা উপলব্ধি করেন। সন্তানের রসনার তৃপ্তিতে মা পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্যবস্তুর অমৃতময় স্বাদ অনুভব করেন। মাতৃত্বের সৌভাগ্যে ধন্যা নারীকে বিশ্বপ্রকৃতি অভিনন্দন জানায়।

বাৎসল্য-রসের মধ্য দিয়া ভগবানকে অনুভব করিবার কথা বৈষ্ণব-দর্শন ও বৈষ্ণব-সাহিত্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিও এই বৈষ্ণববাৎসল্য-রস দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত। তিনি কয়েকটি পত্রে ও প্রবন্ধে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এই মানবীয় চিত্তরসের মধ্য দিয়া ভগবানকে অনুভব করার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের উপর অল্পবয়স হইতেই গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। The Religion of man পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন,—"Fortunately for me a collection of old lyrical poems composed by the poets

of the Vaishnava Sect came to my hand when I was young......I was sure that these poets were speaking about the Supreme Lover, whose touch we experience in all our relations of love—the love of nature's beauty, of animal, the comrade, the beloved the love that illuminates our consciousness of reality."

১৬

উৎসর্গ

(১৩১০, গ্রন্থাকারে ১৩২১)

১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন করেন। ইহার পূর্বে ১৩০৩ সালে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম রবীন্দ্র-কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় কাব্যগ্রন্থের নাম ও ক্রম রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কাব্যগ্রন্থের নাম ও ক্রম রক্ষিত হয় নাই, কেবল ভাবধারার অনুক্রমে বিভিন্ন বিভাগে কবিতাগুলি সাজানো হইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগের মর্মার্থ জ্ঞাপনের জন্য কবি এক একটি প্রবেশক কবিতা লিখিয়া দেন। এই প্রবেশক কবিতাগুলিই প্রধানত উৎসর্গের কবিতা। উৎসর্গের অধিকাংশ কবিতাই ১৩০৮ হইতে ১৩১০ সালের মধ্যে রচিত। মোহিতবাবুর কাব্য-সংস্করণের যখন আর পুনর্মুদ্রণ হইল না এবং পূর্বের মতো কবিতাগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন এই প্রবেশক কবিতাগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া 'উৎসর্গ' নামে ১৩২১ সালে প্রকাশিত হইল।

মোহিতবাবুর সংস্করণে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি ছিল,—'যাত্রা', 'হৃদয়-অরণ্য', 'নিষ্ক্রমণ', 'বিশ্ব', 'সোনার তরী', 'লোকালয়', 'নারী', 'কল্পনা', 'লীলা', 'কৌতুক', 'যৌবনস্বপ্ন', 'প্রেম', 'কবিকথা', 'প্রকৃতিগাথা', 'হতভাগ্য', 'সংকল্প', 'স্বদেশ', 'রূপক', 'কাহিনী', 'কথা', 'কণিকা, 'মরণ', 'নৈবেদ্য', 'জীবনদেবতা', 'স্মরণ', 'শিশু', 'গান', 'নাট্য'। এই এই বিভাগের প্রত্যেকের জন্য একটা মুখবন্ধ বা প্রবেশক কবিতা রচিত হইয়াছিল। এই প্রবেশক কবিতাগুলি ছাড়াও ঐ সব বিভাগের ভাবধারার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত আরো কতকগুলি কবিতা ঐ সব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' সংস্করণে ইহা ছাড়া "১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থের যে-সকল কবিতা অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, (বা প্রকাশিত হইলেও ঐ সকল গ্রন্থে এখন মুদ্রিত হয় না, বা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ঐ সকল গ্রন্থে মুদ্রিত হইবে না) কিন্তু সময়ানুক্রম বিবেচনায় কাব্যগ্রন্থে ও উৎসর্গে সংকলিত হইতে পারিত, এইরূপ কতকগুলি কবিতা উৎসর্গের সংযোজনে প্রকাশিত হইয়াছে।" 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে কথা-বিভাগের প্রবেশক—'কথা কও, কথা কও', ও কাহিনী বিভাগের প্রবেশক—'কত কী যে আসে, কত কী যে যায়' ও 'নিবেদিল রাজভৃত্য' কবিতাটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। 'নিষ্ক্রমণ' বিভাগের প্রবেশক প্রথম সংস্করণের 'উৎসর্গ' হইতেই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

উৎসর্গের কবিতাগুলি কবির বিশেষ বিশেষ ভাবধারার কবিতার মর্মপ্রকাশক বলিয়া এক একটা পরিপূর্ণ ভাবে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন ভাব-পর্যায়ের অন্যান্য কবিতাগুলিও পরিণত ভাব-কল্পনা-ব্যঞ্জক ও উৎকৃষ্ট কাব্যরসে মনোহর।

যাত্রা (কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া, বাহির হনু তিমির রাতে তরণীখানি বাহিয়া—উৎসর্গ, বর্তমান সংস্করণ, ২ নং)

কবি জীবনদেবতার নীরব ইঙ্গিতে আশান্বিত হইয়া ভয়-সংশয়ময় কাব্যজীবনে প্রবেশ করিতেছেন। এই কাব্যজীবনে যাত্রার কালে চারিদিককার মঙ্গলচিহ্ন শুভসূচনা করিতেছে বটে, কিন্তু যদি কোনো দিন অমঙ্গল ঘটে, বা ব্যর্থতা বা অক্ষমতায় তাঁহার এ যাত্রা পর্যবসিত হয়, তবুও তিনি দুঃখিত হইবেন না। কাব্যলক্ষ্মীর যে নীরব ইঙ্গিতের সমর্থন তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে পর্যাপ্ত। তাঁহার ব্যর্থতার জন্য তিনি কাহারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করিবেন না।

হৃদয়-অরণ্য (কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—৯)

সন্ধ্যাসংগীতের কতকগুলি বিষাদময় কবিতা একত্র নিবদ্ধ করিয়া সেই বিভাগের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'হৃদয়-অরণ্য'। প্রভাতসংগীতের 'পুনর্মিলন' নামক কবিতায় কবি তাঁহার সন্ধ্যাসংগীতের যুগের মনোভাব স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

তার পরে কি যে হল—কোথা যে গেলেম চলে!
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা
তারি মাঝে হ'নু পথহারা।

"'হৃদয়-অরণ্য' নাম এই কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।" (জীবনস্মৃতি, ২ পৃ)

প্রকৃতি ও মানবজীবনের সহিত ছেলেবেলায় কবির অতি সহজ ও সরল সম্বন্ধ ছিল, তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের হৃদয়ের লক্ষ্যহীন উচ্ছ্বাসের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার বেদনা কবি ব্যক্ত করিতেছেন।

কবির মধ্যে অপূর্ব সম্ভাবনীয়তা আছে, কিন্তু তাহার বিকাশের পথ রুদ্ধ হওয়ায় কবিচিত্ত ব্যথিত হইয়াছে। নিজের মধ্যে আবদ্ধ, সংকীর্ণ ব্যক্তিজীবন বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত হইতে না পারিয়া গভীর বিষাদে মগ্ন। কিন্তু কবির বিশ্বাস, এ অবস্থার অবসান একদিন হইবে, তাঁহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এবং তিনি বিশ্বের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার জীবনের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করিবেন।

বিশ্ব (আমি চঞ্চল হে,—৮)

বিশ্বের মধ্য দিয়া অসীম ও অনন্ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে, আর মানুষের প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে অসীমের চঞ্চল স্পর্শ লাগিতেছে। মানুষ সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও সেই স্পর্শে তাহার মনে অসীমের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিযা উঠে। অনন্তের উপলব্ধির জন্য তাহার সীমা ভাঙিয়া নিজেকে বিশ্বে প্রসারিত করিবার জন্য সে চির-ব্যাকুল। অসীম জগদতীত, অনন্তপ্রসাবী ও বহুদূবেব সামগ্রী হইলেও দেহাবদ্ধ মানুষ এই অপ্রাপণীয়কে ধ্যান কবে, কামনা করে। প্রকৃতির সৌন্দযে অসীমের আভাস পাইয়া, অসীমের বাঁশি শুনিয়া কবি উন্মনা ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে এই জগতে, দেহের মধ্যে আবদ্ধ জীব, তাহা ভুলিযা গিয়াছেন। তাঁহাব মন সেই সুদূবকে পাইবাব জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্ব-বিভাগেব প্রথম কবিতাটি (১৩নং) উৎসর্গেব একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবি এই কবিতায় বিশ্বের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতেছেন—জল স্থল-আকাশ, সর্ব দেশের সর্ব মানব, পশু-পক্ষী, জড় ও চেতনে পদার্থের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করিযা দিয়া বিশ্বাত্মবোধ পূর্ণভাবে অনুভব করিতেন। চিত্রার 'বসুন্ধবা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাব সহিত ইহার ভাবের মিল আছে।

সোনার তরী (তোমায় চিনি ব'লে আমি করেছি গরব—৬)

বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীকে কবি বলিতেছেন যে, তিনি চিরদিন তাঁহাব কাব্যের চিত্র ও সংগীতে সেই অলোকসামান্যার স্বরূপ ব্যক্ত কবিতে চেষ্টা কবিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণের কাছে তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নাই। তাহারা কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কাহাকে তিনি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি যাহা বলিতে

চাহিতেছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, কিন্তু কবি আভাসে-ইঙ্গিতে সেই সৌন্দর্যময়ীর স্বরূপ ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার অধিক পরিচয় দিবার শক্তি তাঁহার নাই। কারণ এই দেবী তো অনন্তরহস্যময়ী ও অনির্বচনীয়া—তাঁহার সুস্পষ্ট পরিচয় কেহই দিতে পারে না। কবির নিকটও এই বিশ্বসৌন্দর্যদেবী নিজেকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন নাই। কবি তাঁহাকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ক্ষণ-আভাসে লক্ষ্য করিয়াছেন মাত্র। এই ক্ষণ-আভাসকে তিনি কথা, সুর ও ছন্দে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এই রহস্যময়ী চির-চঞ্চলাকে ধরিতে পারেন নাই।

লোকালয় (হে রাজন্, তুমি আমারে—১৯)

বিশ্বের সৌন্দর্য চারিদিকে বিকসিত হইয়া আছে, আনন্দস্রোত চরাচর প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু সংসার ধূলি-জালে রুদ্ধদৃষ্টি সাধারণ মানুষ সে সৌন্দর্য দেখিতে পাইতেছে না, সে আনন্দের স্বাদ বুঝিতে পারিতেছে না। কবির কাজ হইতেছে, তাঁহার কাব্য দ্বারা সেই সাংসারিকতায় আচ্ছন্ন জনগণের হৃদয় ক্ষণতরে বিশ্বসৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট করা—জগতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত আনন্দের একটু ছোঁয়াচ দেওয়া। তাই কবি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি যেন কবিকে এই বিশ্ব প্রাসাদের সিংহদ্বারে বসিয়া অবিরাম তাঁহার কাব্য-বাঁশি বাজাইতে অনুমতি দেন। যাহারা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করিতে পারে না, কবি তাহাদের হইয়া আনন্দ-বেদনা হাসি-অশ্রুর সংগীত তাঁহার বাঁশিতে গাহিবেন। সেই মূক জনসাধারণ সংসারপথে চলিতে চলিতে তাহাদেরই মনের কথা, তাহাদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কবির বাঁশিতে শুনিয়া ক্ষণতরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইবে। কবি প্রকাশের কাঙাল জনগণের মুখর প্রতিনিধি হইবেন। ইহাই তাঁহার বিধি-নির্দিষ্ট কাজ।

নারী (সাঙ্গ হয়েছে রণ—৪৩)

পুরুষের জীবনে এবং মরণে নারীর স্থান চমৎকার ভাবৈশ্বর্যে প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতাটিতে। পুরুষ জীবন-যুদ্ধে ধূলি-কর্দম সমাচ্ছন্ন ও ক্ষত-বিক্ষত-দেহ হইয়া গৃহে ফিরিলে নারী প্রেম, সহানুভূতি ও সেবার প্রলেপে তাহার সমস্ত ক্লান্তি দূর করিয়া তাহাকে নব ভাবে সঞ্জীবিত করে—তাহার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে সুসংযত ও সুবিন্যস্ত করে। গৃহের নিভৃত আবেষ্টনের মধ্যে নারী কল্যাণময়ী গৃহিণীর মূর্তিতে গৃহ পূর্ণ করিয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল সৌন্দর্যে বিরাজ করে। নারী মমতা ও সমবেদনার প্রতিমূর্তি। দুঃখদৈন্য-পীড়িত আশ্রয়হীন পুরুষকে সে অপূর্ব মমতায় আপনজনের মতো বরণ করিয়া লইয়া তাহাকে আনন্দদান করিতে চেষ্টা করে।

তারপর, পুরুষের সংসার হইতে চিরবিদায় লইবার ক্ষণেও নারী তাহার অশ্রুসজল দৃষ্টি ও ব্যগ্রবাহুর আলিঙ্গনে তাহার যাত্রা মধুময় ও সার্থক করিয়া দেয়। মৃত্যুর পরেও নারী তপস্বিনী বিধবার বেশে বেদনাদগ্ধচিত্তে স্বামীর স্মৃতিতর্পণ করে।

কল্পনা (মোর কিছু ধন আছে সংসারে—৩)

অপূর্ব রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী কবি বাস্তবের উপরে কল্পনার প্রাধান্য নির্দেশ করিয়াছেন। কবির কাব্য-কারবারে বাস্তবের মূলধনের অংশ কম, অধিকাংশ অর্থই তাঁহার কল্পলোকের ব্যাঙ্ক হইতে টানা হইয়াছে। কবি বাস্তবের অনুভূতিকে ভাবলোকে উত্তীর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন। কবির কাব্যের বাস্তবের মধ্যে অধিক পরিমাণে কল্পলোকের রঙের সমাবেশ। লোকচক্ষুর আগোচরে এই কল্পনার রস তাঁহার সমস্ত কবিসৃষ্টির মধ্যে জড়াইয়া আছে। কবিও এই বাস্তবসংস্পর্শহীন ভাবলোকের অনুভূতিকেই কামনা করিতেছেন। জগতের সকলের অলক্ষ্যে যেন এই কল্পনা-দেবী তাঁহাকে সর্বদা স্পর্শ করিয়া যান।

লীলা (তোমারে পাছে সহজে বুঝি—৪)

কবি তাঁহার কাব্য-সুন্দরী রসলক্ষ্মীকে বলিতেছেন যে, কবির জীবনে তাঁহার পরমরহস্যময় লীলা তিনি অনুভব করিতেছেন। কবিকে দিয়া তিনি যে রচনা প্রকাশ করাইতেছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ উহার বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে রহিয়াছে। বাহির হইতে উহাকে হাসির বিষয় ও কৌতুকপূর্ণ মনে হইলেও, উহার অন্তরের প্রকৃত স্বরূপ বেদনাময়। তাই, যে-কথা তাঁহাব কাব্য বলিতে চাহিতেছে, বাহ্যিক-দৃষ্ট অর্থের মধ্যে তাহা নাই। দশ জনে যেমন সোজা ভাবে কথা বলে, কবির কাব্যলক্ষ্মী তাহা বলেন না। তিনি গভীরতর ও সুন্দরতর প্রকাশের দাবী করেন, এবং সেই জন্য সাধারণের অনুসৃত পথ তিনি ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথ ধরিয়াছেন।

মোহিতচন্দ্র সেন 'ক্ষণিকা'র অধিকাংশ কবিতাকে এই 'লীলা' ভাবপর্যায়ে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কৌতুক (আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি—৫)

কবি তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীর লীলা বুঝিতে পারেন। বর্তমানে আনন্দোজ্জ্বলবেশে তাঁহার আবির্ভাব হইলেও উহা যে তাঁহার বেদনাবিধুর মূর্তির রূপান্তর তাহা তিনি জানেন। আনন্দ-মূর্তি ধারণ করিয়া কাব্য-লক্ষ্মীর এই কৌতুক-লীলার অর্থ কবি অবগত আছেন, এই বাহিরের কৌতুক-বেশে তিনি ভুলিবেন না।

যৌবন-স্বপ্ন (পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি—৭)

কবি তাঁহার কাব্য-প্রতিভার সামান্য আভাস পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার

পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করেন নাই। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য তাঁহার হৃদয়-বেলায় আঘাত করিয়া কাব্য-চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতেছে বটে, কিন্তু সেই ভাবরাজি প্রকাশ কবিবাব মতো ভাষা ও কলা-কৌশল তিনি এখনো আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এই অনুভূতিব তীক্ষ্ণতা ও প্রকাশের অক্ষমতায় কবি পাগলের মতো হইয়া গিয়াছেন।

প্রেম (আকাশসিন্ধু-মাঝে এক ঠাঁই—১৫)

কবি বলিতে চাহেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিরন্তর গতিবান ও পরিবর্তনশীল। ধ্বংস-মৃত্যুব মধ্য দিয়া এই সৃষ্টি ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহাব মধ্যে কেবল সৌন্দর্য ও প্রেমই স্থির, অচপল, ধ্বংস-মৃত্যুব অতীত—অবিনশ্বব।

কবিকথা (দুয়ারে তোমার ভিড় করে যারা আছে—২০)

কবি তাঁহাব কাব্য-লক্ষ্মীব নিকট আবেদন জানাইতেছেন যে, তিনি সংসারের ধন-বিদ্যা-ঐশ্বর্য-খ্যাতি সমস্ত ত্যাগ কবিয়া কেবল তাঁহাব প্রসাদ লাভ কবিবেন। তিনি সংসাবেব কোনো প্রয়োজনে লাগবেন না—কেবল একান্তে বসিয়া বীণা বাজাইবেন। সাংসারিক প্রয়োজনেব উর্ধ্বগত সৌন্দর্যচর্চা ও বসচর্চাই কবি জীবনেব একমাত্র সাধনা। 'চিত্রা'ব 'আবেদন' কাবতার সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য আছে।

ইহাব পরবর্তী কবিতায় (২১নং) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে একটি চিত্র আঁকিয়াছেন,—

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,—
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।

প্রকৃতিগাথা (তোমার বীণায় কত তার আছে—১৮)

প্রকৃতির বীণায় কতো বিচিত্র সুরের আলাপন হইতেছে। কবিও তাঁহার মনোবীণার সুরটি প্রকৃতির সুরের সহিত মিলাইয়া লইবেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যে কবির আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্তি ধারণ করিবে এবং তাহার বিচিত্র শোভায় কবি-হৃদয় আনন্দে অধীর হইবে। কবি-হৃদয়ের এই আনন্দ প্রকৃতির মুখে প্রতিফলিত হইয়া উহাকে আরো সুন্দর করিবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য কবির চিত্তে বিচিত্র আনন্দ-রস

উদ্বুদ্ধ করিবে এবং কবির হৃদয়ের আনন্দ হইতে উৎসারিত কাব্যসৃষ্টিতে প্রকৃতির সৌন্দর্য আরো বেশি উদ্‌ঘাটিত হইবে।

হৃতভাগ্য (পথের পথিক করেছ আমায়—৪১)

সংসারে সমস্ত বিপদাপদ, দুঃখকষ্ট, ঝড়-ঝঞ্ঝা ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া, কেবল নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অচল, অটল ভাবে জীবনপথে অগ্রসর হওয়াই কবির কাম্য।

সংকল্প (সে দিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো—৩৯)

কবির কাব্য-সুন্দরী, রসলক্ষ্মী, জীবনদেবতা কবির নবীন যৌবনে তাঁহাকে মনোহর বেশে দেখা দিয়াছিলেন। হাতে ছিল তাঁর বাঁশি, অধরে অপূর্ব হাসি, নয়নে বিলোল কটাক্ষ। তাঁহার বাঁশির সুরে কবি সমস্ত কাজ ভুলিলেন, অপূর্ব আনন্দ-চেতনায় হৃদয় দুলিয়া উঠিল, তাঁহার সহিত কেবল খেলায় মাতিয়া রহিলেন। তারপর কখন খেলিতে খেলিতে যে ঘুমাইয়া পড়িলেন, তাহার ঠিক জ্ঞান নাই। জাগিয়াই দেখিলেন যে বসন্তকাল চলিয়া গিয়াছে। ভরা-ভাদরের ঝরঝর বারিধারায় চারিদিক আচ্ছন্ন। তাঁহার যৌবনের সঙ্গিনী কাব্যলক্ষ্মী আজ জটাজুটধারিণী, রিক্তা তপস্বিনী মূর্তিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত। কবি তাঁহাকে পূর্বের মতোই অভ্যর্থনা করিয়া লইবেন এবং জীবনের সমস্ত ধন তাঁহার পায়ে সমর্পণ করিবেন। জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের বিচিত্র রসপানে কবি তাঁহার যৌবন অতিবাহিত করিয়াছেন, প্রৌঢ় বয়সে সে রসজীবন পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যার পথে ভগবানের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। কবির কাব্যলক্ষ্মী দুই মূর্তিতে দেখা দিয়া উভয় পথেই তাঁহাকে চালনা করিয়াছেন।

স্বদেশ (হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি—১৬)

কবি বিশ্বদেবকে তাঁহার স্বদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে আবির্ভূত দেখিতেছেন। প্রাচীন ভারতের তপোবন হইতে বিশ্বদেবের স্তবের মন্ত্র গায়ত্রী-গাথা প্রথম উদ্‌গীত হইয়াছিল। কবি মানস-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন যে, সুদূর ভবিষ্যতে ভারতেই এই ঐক্যের, সাম্যের মহা-মঙ্গলময় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মন্ত্র, পররাজ্যলোলুপ বিজয়োন্মত্ত যোদ্ধার রণহুঙ্কার স্তব্ধ করিয়া, অর্থলিপ্সু, শোষণকারী বণিকের অর্থের ঝংকার ডুবাইয়া দিয়া, অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইতেছে, এবং বিশ্বদেবের পদতলে ভারতের হৃদয়-পদ্ম-দলে ভারত-ভারতী আসীনা হইয়া এই অপূর্ব মহাবাণী অলৌকিক সংগীতে প্রকাশ করিতেছেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিতে ভারতবর্ষই সর্বমানবের মিলনক্ষেত্র, সর্বধর্মের সমন্বয়ক্ষেত্র এবং ভগবানের একমাত্র বিহারক্ষেত্র বলিয়া কবি মনে করিয়াছেন।

রূপক (ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে—১৭)

এইটি রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহু-আলোচিত ও বহু-উদ্ধৃত কবিতা। এই কবিতায় যে তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রগত বৈশিষ্ট্য। "আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনায় এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে—সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।" কবির কৈশোর-যুগের লেখা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামে নাটিকার নায়ক-সন্ন্যাসীর মুখ দিয়াও কবি এই তত্ত্বটি প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
অসীম হতেছে ব্যক্ত—সীমা-রূপ ধরি'।
যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা—সেও অসীম অপার —
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে।

তারপর দীর্ঘদিন ধরিয়া নানা রচনায় নানাভাবে এই তত্ত্বটি কবি প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্ব-সৃষ্টি-লীলার রহস্য এই যে, অখণ্ড এক বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, অসীম সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, চেতন জড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া, অব্যক্ত ব্যক্তের রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অখণ্ড ও খণ্ড, অসীম ও সসীম, অব্যক্ত ও ব্যক্ত পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া পরস্পরের সার্থকতা লাভ করিতেছে। অনন্ত ও অসীম সান্ত ও খণ্ডের মধ্যে আত্মপ্রকাশ না করিলে উহা একটা রূপহীন নিরালম্ব, আকাশ-বিহারী ভাবময় বায়বীয় সত্তা মাত্র, আবার খণ্ড এবং সান্তও নিতান্ত জড়পিণ্ড, ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী যদি অখণ্ড ও অনন্ত তাহার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ না করে। উভয় উভয়কে অবলম্বন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতেছে। তাই এই বিশ্ব-সৃষ্টি-লীলায় ভাব ও রূপের, অসীম ও সসীমের, মুক্তি ও বন্ধনের অবিরাম আবর্তন হইতেছে।

বিশ্ব-সৃষ্টি-লীলার এই রহস্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি-লীলাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। মর্ত্যের কবি তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিতে বিশ্ব কাব্যের চিরন্তন কবিকে অনুসরণ করিয়াছেন।

মধ্যযুগের ভারতীয় মরমী কবি দাদুর এই ভাবের অনুরূপ একটি কবিতা আছে,—

বাস কহে হম্ ফুলকো পাঁউ,
ফুল কহে হম্ বাস।
ভাব কহে হম্ সত্‌কো পাঁউ,
সত্ কহে হম্ ভাব॥
রূপ কহে হম্ ভাবকো পাঁউ,
ভাব কহে হম্ রূপ।
আপস্‌মে দউ পূজন চাহে—
পূজা অগাধ অনূপ॥

"সুগন্ধ বলে—আমি ফুলকে না পাইলে তো আমার প্রকাশেরই কোনো সম্ভাবনা নাই; আমি সূক্ষ্ম, স্থূল ফুলকে পাইলেই তবে আমি আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারি। আবার ফুল বলিতেছে—আমি স্থূল, আমি যদি গন্ধকে না পাই তবে আমার জীবন নিবর্থক হয়। ভাষা বলে—আমি যদি সত্যকে না পাই তবে আমি মিথ্যা। আবার সত্য বলে—আমি যদি ভাষাকে না পাই তবে তো আমার প্রকাশই অসম্ভব। রূপ বলে—আমি ভাবকে যদি না পাই তবে তো আমি জড়-মাত্র। আবার ভাব বলে—আমি রূপকে না পাইলে কেবলমাত্র ফাঁকা হাওয়া। অতএব সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়ে উভয়কে পূজা করিতে চাহিতেছে, এবং এই পূজার রহস্য অগাধ ও অনুপম।" (রবি-রশ্মি, ২য় খণ্ড, ৪৪ পৃঃ)

কণিকা (হায়, গগন-নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা—১২)

বৃহৎ ও অসীম ক্ষুদ্র ও সীমার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। সূর্য অতি বৃহৎ ও অমিততেজোময়, কিন্তু সে ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর মধ্যে ধরা দিয়া উহার জীবনকে গৌরবোজ্জ্বল করিতে আনন্দ পায়। 'কণিকা'র কবিতাগুলি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার তাৎপর্য বৃহৎ ও গভীর—যেন সূর্যরশ্মিদীপ্ত শিশিরবিন্দুর মতো।

মরণ (চিরকাল একি লীলা গো—৩৮)

জীবন ও মৃত্যু পরস্পরবিরোধী নয়—উহা একই সত্যের বিভিন্ন রূপ—অবস্থান্তর মাত্র। অনন্ত লীলাময় সৃষ্টির মধ্যে চিরকাল জীবন-মৃত্যুর খেলা খেলিতেছেন। জীবন-মৃত্যু যেন দোল-খেলা। এমন স্থানে দোলনা টাঙানো হইয়াছে—যাহার পিছনটা অন্ধকার—সম্মুখটা আলোকিত। দোলনার দোলে যখন দোলারোহী পিছনের অন্ধকার অংশের দিকে গেল, তখন তার মৃত্যু, আবার যখন দোলার গতিতে আলোকের মধ্যে আসিল, তখন তাহার জীবন। সে যখন অন্ধকার

পিছনের দিকে ছিল, তখন তার জীবনের ধ্বংস বা শেষ নাই—সে ঠিকই সেই আলোকিত অংশের ব্যক্তিই—কেবল অবস্থানের পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র।

লীলাময় ভগবান এই সৃষ্টির সমস্ত পদার্থকে অবিরত এক হাত হইতে অন্য হাতে লুকিয়া লইতেছেন। ইহাই জন্ম ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংস। মানুষ তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিচ্ছেদে কাতর হয়। ভগবান চিরদিনরাত নিজের সঙ্গে নিজে পাশা খেলিতেছেন ও নিজের খেলার আনন্দে বিভোর হইয়া আছেন। বিশ্বের সমস্ত পদার্থ ই ঠিক আছে—কিছুই চিরতরে হারায় না— নষ্ট হয় না।

'মরণ' বিভাগে আরো দুইটি চমৎকার কবিতা আছে উৎসর্গে, ৪৫ ও ৪৬ নং। ৪৫ নং কবিতাটিকে 'সঞ্চয়িতা'য় 'মরণ-মিলন' শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে, আর ৪৬ নং 'প্রবাসীর প্রেম' নামে মোহিতবাবুর সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীর মরণ বিভাগে ছাপা হইয়াছিল।

৪৫নং কবিতাটির ভাবার্থ এই যে, মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিলে মৃত্যু-ভয় কমিয়া যায়—মৃত্যুর বিভীষিকা—মানুষকে বৃথা উদ্বিগ্ন করে না। জীবন ও মৃত্যু দুইটি পৃথক বস্তু নয়—মৃত্যু জীবনের একটা অবস্থাভেদ মাত্র। মৃত্যু জীবনকে নবীন করে, উজ্জ্বল করে। মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিলে তাহার বাহ্যিক রুদ্র ও কঠোর বেশ দেখিয়া আমাদের আর ভয় বা অশ্রদ্ধা হয় না। তখন পরম-প্রিয়তমের মত্যো আমরা মৃত্যুকে গ্রহণ করিতে পারি।

৪৬নং কবিতায় কবির ইচ্ছা যে তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়া নব নব ভুবনে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং প্রেম নব নব রসে, বর্ণে ও গন্ধে প্রচার করিবেন।

কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল-মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পুজিতে যাব জগতে জগতে।

জীবনদেবতা (আজ মনে হয়, সকলেরি মাঝে তোমারেই ভালোবেসেছি—১৩)

কবি অনুভব করিতেছেন যে, সৃষ্টির প্রথম হইতেই জীবনদেবতা তাঁহার জীবন-চেতনার সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছেন এবং অনাদি কাল হইতে সৃষ্টির নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া তাঁহাকে চালিত করিয়া বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপস্থিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নাট্য (আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়—৩৭)

সংসার রঙ্গমঞ্চ। নর-নারী সব নট-নটী। এই জগৎ-নাট্যের নাট্যকার ও

প্রযোজক স্বয়ং লীলাময় ভগবান। অভিনেতারা, যাহার যে অংশ গ্রহণ করিয়া তন্ময় হইয়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। তাহারা অভিনয়ে এত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের অভিনীত অংশের ভাব-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, কথাবার্তা, চালচলন সবই তাহাদের সত্যকার জীবনের ঘটনা বলিয়া মনে করিতেছে। কবি বলিতেছেন, যাহারা এই অভিনয় করিতেছে, তাহারা যদি একবার অভিনয় ছাড়িয়া নির্লিপ্ত দর্শকের আসনে বসে, তবেই এই অভিনয়ের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে—বুঝিতে পারে যে, ইহা অভিনেতার জীবনের সত্য ঘটনা নয়। তাই কবি নির্লিপ্ত দর্শকের মতো বসিয়া এই মহানাটকের সুখদুঃখের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। জীবন-রঙ্গমঞ্চের অভিনয় কবির একটি প্রিয় ভাব। পরবর্তী কয়েকটি কবিতাতে ইহার সুন্দর প্রকাশ হইয়াছে। 'বীথিকা'র 'নাট্যশেষ' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

Shakespeare ও সংসারকে রঙ্গমঞ্চ বলিয়াছেন,—

All the world's a stage,
And all the men and women merely Players :

১৭

খেয়া

(১৩১৩)

'চৈতালি' হইতেই যে কবির মধ্যে জগৎ ও জীবনের রূপ-রস-ভোগের আবেষ্টনীমুক্ত একটা গভীরতর, মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল, ইহা আমরা দেখিয়াছি। 'কথা'য় দেখিয়াছি ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাসের ত্যাগ ও মহত্ত্বের কাহিনী তাঁহার ভাব-কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। 'কল্পনা' ও ক্ষণিকা'য় ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কবি ক্রমে ভোগকে পিছনে ফেলিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের উদার, গম্ভীর দিক-চক্রবালে প্রথম পাদক্ষেপ করিয়াছেন। 'নৈবেদ্যে' আসিয়া কবি অধ্যাত্ম-জীবনের উদার পরিবেশের মধ্যে নিজেকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও প্রেমের বিচিত্র আলোছায়ার মায়া আর তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতেছে না, তীরের শ্যাম

বনরেখা মুছিয়া গিয়াছে, অকূল সমুদ্রে কবি তাঁহার কামনার ধনকে খুঁজিবার জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন। এতদিন কবি তাঁহার চির-প্রার্থিত দেবতাকে জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমে রূপান্তরিত করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, এখন সেই দেবতাকে তাঁহার নিজস্ব রূপে ও রসে অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। 'নৈবেদ্য'-এ কবি প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার পথে—উপনিষদের ঋষির উপলব্ধির পথে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছেন। উপনিষদের অধ্যাত্ম-সাধনার বৈশিষ্ট্য তাহার জ্ঞানমার্গে। রবীন্দ্রনাথ সেই জ্ঞানের উপলব্ধির সহিত কিছু পরিমাণে ভক্তির অনুভূতি মিশ্রিত করিয়াছেন 'নৈবেদ্যে'। 'নৈবেদ্যে' কবির ভগবান বিরাট, অনন্ত, ঐশ্বর্যময়, তিনি পিতা, প্রভু, পরমেশ্বর। তাঁহার সঙ্গে এই ভগবানের সম্বন্ধ কবি তত্ত্বরূপেও 'নৈবেদ্যে'র অনেক কবিতায় অনুভব করিয়াছেন। তাই 'নৈবেদ্যে'-এ আমরা পাই ভগবানের বিরাট ঐশ্বর্যময় রূপ—জীবনের সঙ্গে ভগবানের—আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধের দার্শনিক চিন্তা, ব্রহ্মের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা, প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার পথেই ভারতের মুক্তির ইঙ্গিত।

'খেয়া' গ্রন্থে দেখি কবির ভগবদনুভূতির এক নূতন রূপ। তত্ত্বের উপলব্ধি এক রহস্যের অনুভূতিতে পরিণত হইয়াছে। বোধের প্রত্যক্ষ বস্তুকে যেন সরাইয়া তাহার ইঙ্গিত, সংকেত, সম্ভাবনা নিজের ভাব ও কল্পনার রঙীন কাচের মধ্য দিয়া অনুভব করিয়া কবি বেশি আনন্দ পাইতেছেন। ভগবান তাঁহার ভয়-বিস্ময়-ভক্তি-উৎপাদক বিরাট মূর্তি ত্যাগ করিয়া একেবারে লীলাময় হইয়াছেন। সেই অসীম অনন্ত নানা বেশে তাঁহার চিত্তে ক্ষণস্পর্শ দিয়া যাইতেছেন, আর কবির চিত্ত বিচিত্র রসে আপ্লুত হইতেছে। ঐশ্বর্যময় এখন লীলা-কৌতুকময়—কখনো তিনি রাজা, কখনো ভিখারী, কখনো প্রিয়তম, কখনো দাতা। কবির উপলব্ধিগত তত্ত্ব ও দর্শন এখন অপূর্ব কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে।

'খেয়া'তেই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতার আরম্ভ। অসীম স্বরূপ লীলাচ্ছলে নানাবেশে কবির চিত্তে স্পর্শ দিয়া যাইতেছেন, আর নানা স্পর্শে তাঁহার হৃদয়ে নানা রসের উৎস খুলিয়া যাইতেছে। বিচিত্র রসপ্লাবনের মধ্য দিয়া যে অসীমের লীলা-চঞ্চল অনুভূতি, তাহাই তো মিস্টিক কবিতার ভিত্তি। অসীমকে সীমায় বাঁধিতে হইলে, অজানাকে জানাইতে হইলে, অধরাকে ধরিতে হইলে, অরূপকে রূপের আভাসের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করিতে হইলে কবিকে প্রধানত রূপক, সংকেত ও ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কবির কাজ সৃষ্টি; সৃষ্টি অর্থে রূপদান—অসীমকে সীমায় বন্ধন। অসীম ও অরূপের অনুভূতির রূপসৃষ্টি কোনো রূপক বা সংকেতের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। সেজন্য মরমী কবিরা অধিকাংশ সময়ই

রূপক বা সংকেতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জনৈক ইংরেজ সমালোচক তাই বলিয়াছেন—Symbolism is the language of the mystic. 'খেয়া'র কবি এই রূপক ও সংকেতকে গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'তে ইহার পরিণত রূপ আমরা দেখিতে পাই। এই রূপক ও সাংকেতিকতার সাহায্যে কবির নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনেক নাটকে অপরূপ রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

বিচিত্র আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির অপূর্ব কাব্যরূপায়ণেই কেবল এ গ্রন্থখানির সার্থকতা নয়, শিল্পরীতিতেও বাংলাসাহিত্যে ইহা অভিনব। বাংলাসাহিত্যে ইহাই প্রথম সাংকেতিকলক্ষণাক্রান্ত কাব্য।

বাংলাসাহিত্যে দু'একখানা পূর্ণাঙ্গ রূপককাব্য দেখা যায়। হেমচন্দ্রের 'আশাকানন', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' এই জাতীয় কাব্য। অক্ষয়কুমার দত্তের 'স্বপ্নদর্শন' এই প্রকার গদ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথও 'সোনার তরী', 'পরশ-পাথর', 'দুই পাখী', 'আবেদন' প্রভৃতি কয়েকটি রূপকজাতীয় কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু 'খেয়া'তে কবি রূপকের সহিত সাংকেতিকতার মিশ্রণ করিয়াছেন।

রূপক ও সংকেতের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অবশ্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তবুও ভাবরূপায়ণে উভয়ের কার্যকারিতার মধ্যে কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। রূপক একটা নির্দিষ্ট আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া একটা ভাব, তত্ত্ব বা নীতিকথা প্রকাশের চেষ্টা করে। রূপকের দুইটি অঙ্গ,—একটি বহিরঙ্গ ও একটি অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গে যেমন একটা সুসংবদ্ধ কথাবস্তুর বিবৃতি আছে, অন্তরঙ্গ অংশে সেইরূপ ভাব বা তত্ত্বের একটা সুনির্দিষ্ট অস্তিত্ব আছে। এই প্রকাশিত রূপ ও অপ্রকাশিত রূপ, বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বা মর্মার্থ, এই বাহির ও অন্তর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে, একটি অপরটির সহিত মিলিত হয় না—উভয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই অন্তর্নিহিত ভাব বা তত্ত্ব বুঝিতে হইলে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রয়োজন। ইহা বুদ্ধির স্তরের কাজ।

সংকেত কোনো ভাব বা তত্ত্ব প্রচার করে না। একটা অতি সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য, চঞ্চল, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা ভাবকে রূপ দিবার চেষ্টা করে। বাচ্যার্থ ও মর্মার্থ, বাহির ও ভিতরের মিলনে একটা সম্মিলিত রূপ সৃষ্টি করে। ইহার কার্য ভাব-প্রতিরূপ নির্মাণ নয়, একটি সূক্ষ্ম ভাবকে, অনির্দিষ্ট অসীমের অনুভূতিকে, ব্যঞ্জনামুখর করিয়া অনুভবগম্য করা। প্রতীকের সার্থকতা একটা মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টিতে, চমকপ্রদ ব্যঞ্জনার সংগীতে। সাংকেতিক কবি-কর্মে কবির সচেতন মনের প্রচেষ্টা নাই, তাঁহার অর্ধ-চেতন বা অবচেতন মনের সূক্ষ্ম গোপন অনুভূতি—আশা-আকাঙ্ক্ষা, হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতির অভিব্যক্তি কাব্যে রূপায়িত হয়। পাঠককে

বুদ্ধির সাহায্যে ইহার অর্থ আবিষ্কার করিতে হয় না, অন্তরের গভীর অনুভূতির মধ্যে ইহার স্বয়ংপ্রকাশ হয়। ইহা হৃদয়গ্রাহ্য। শিল্পী এই অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যময় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এক নূতন স্বপ্নের জগৎ নির্মাণ করে; সেই জগতে কিছু-ব্যক্ত, কিছু-অব্যক্ত, কিছু-স্পষ্ট, কিছু-ইঙ্গিত, কিছু-প্রকাশ, কিছু-ব্যঞ্জনা দ্বারা এই বস্তুজগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ও যোগাযোগের আভাস দিয়া তাহার অন্তরের গূঢ় আবেগকে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করে।

রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় কাব্যে এবং নাটকে রূপকের সহিত সাংকেতিকতার মিশ্রণ করিয়াছেন। রূপক-সংকেতের মিশ্র রূপই রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের রূপ। তবুও খেয়াকাব্যে সাংকেতিক রীতির একটা চমৎকার প্রয়োগনৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়।

আনন্দ-বেদনা-আশা-নৈরাশ্য-আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেলিত, অশান্ত, অস্থির একটি মানবাত্মার তিনটি স্থানের মধ্যে চঞ্চল সঞ্চরণ। এই তিনটি স্থান—ঘাট, পথ ও ঘর। এই ত্রিকোণবেষ্টিত ভূমিখণ্ডে এক অজানা, অচেনা, অনির্দিষ্ট, চঞ্চল, মায়াময় সত্তাকে লাভ করিবার ইহার ব্যাকুল অন্বেষণ ও ছুটাছুটি। বাস্তবের উর্ধ্বে এক স্বপ্নরাজ্যে, এক কল্পজগতে এই মানবাত্মার বিচিত্র মানসিক বিক্ষোভ আমরা বস্তুজগতের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করিতেছি।

এই স্বপ্নরাজ্যে একটি গ্রামের ধারে প্রশস্ত নদী বহিয়া যাইতেছে। শ্যামল তরুচ্ছায়াবীথির মধ্যে একখানি কুটির। কুটিরের পাশ দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে নদীর ঘাট পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া। কুটির-সংলগ্ন একটি পুকুর। এই বড় রাস্তা হইতে ছোট একটা রাস্তা বাহির হইয়া মিশিয়াছে সেই পুকুরের ধারে। নদীর ধারে অশথ-গাছের নিচে হাট বসে। তার পাশেই খেয়াঘাট। প্রকাণ্ড এক খেয়া-নৌকা পারাপার করিতেছে। ছোট ছোট কতো নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে। কুটিরের পাশের পথের দুইধারে পল্লীপ্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যের মেলা—শ্যাম-সমারোহ।

নদীর ঘাটের উপরে লোকে সমবেত হয় কাজের চাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া একটু বিশ্রামের আশায়, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য, সাংসারিকতার হাত হইতে ক্ষণকালের জন্য মুক্তি পাইয়া একটু মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য। সম্মুখেই বিশাল নদী। খেয়া-নৌকা লোক বোঝাই করিয়া পরপারে যাইতেছে। এখানে আসিয়া নদীর দিকে তাকাইলে মনে লাগে একটা অসীমের স্পর্শ, অন্তর পায় একটা অনন্তের আভাস। বিলীয়মান সন্ধ্যা-সূর্যালোকে পরপারের নীল বনরেখা অস্পষ্ট ও ধূসর হইয়া যায়। মনে হয় পরপার অসীম রহস্যে ঘেরা স্বপ্নের

দেশ। খেয়া-নৌকা পারের যাত্রীদের লইয়া যাইতেছে সেই অজানা রহস্যের দিকে। তাই ঘাট সাংসারিক কাজ-কর্মের সমাপ্তি ও পরপারের অবগুন্ঠিত রহস্যের ভাবদ্যোতনা করে।

পথ দিয়া মানুষ কর্মের তাড়নায় ছুটাছুটি করে। কর্মের ফেনিল আবর্তময় স্রোত যেন পথের উপর দিয়া বহিয়া যায়। পথের দুইধারে লতা-গুল্ম-তরুর মধ্যে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য বর্ণে-গন্ধে-গানে আকর্ষণ করে। তাই পথ কর্মব্যস্ততা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা করিতেছে।

ঘর মানুষের স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও আত্মীয়তার লীলাভূমি। আবার জগতের কর্মকোলাহলের বাহিরে ইহা মানুষের শান্তিপূর্ণ বিশ্রামস্থান—আত্মস্থ হইবার ও আত্মবিচারের স্থান। তাই ঘর মানবিক রসভোগ ও আত্মদর্শনের ভাব প্রকাশ করে।

মানবাত্মা তাহার চিরআকাঙ্ক্ষিত, বহু-প্রার্থিত কাহারো জন্য ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিতেছে আর তাহারি সাহায্যে পরপারের রহস্যলোকে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে। সেই অজানা, রহস্যময়কে ক্ষণিকের জন্য পাইতেছে, আবার হারাইতেছে, অধীর আগ্রহে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আবার ক্ষণ-মিলনের আনন্দে আত্মহারা হইতেছে। একদিকে পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাহাকে ভুলাইতেছে, অন্যদিকে ঘরের স্নেহ-প্রেম তাহাকে টানিতেছে। এই দুই শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে অসীম অজানাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাই তাহার কর্ম-প্রচেষ্টা এই পথ, ঘর ও ঘাটের মধ্যে আবর্তিত হইতেছে।

এই যে তিনটি সংকেত—ঘাট, পথ ও ঘর—ইহাদের সাহায্যে কবি তাহার অন্তরাত্মার অসীম, অনন্তকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও তাহার মনের বিচিত্র দ্বন্দ্বকে অপূর্বভাবে রূপায়িত করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে খেয়ার মূল কবিতাগুলি এই তিন অবস্থা ও তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস।

এই যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হইল, ইহার রূপায়ণে খেয়া-কাব্যের সৌন্দর্য ও দীপ্তি বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্য হইতে একটা অনুচ্চ, করুণরাগিণী বাহির হইয়া কবি-হৃদয়ের নিস্তরঙ্গ, সহজ, সাবলীল প্রবাহের কলধ্বনির সহিত মিশিয়া এক মনোহর সংগীতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা যেন প্রসাধনের মতো কাব্যদেহের সহিত সংলগ্ন হইয়া দেহশ্রীর লাবণ্য বৃদ্ধি করিয়াছে। স্তিমিত কর্মোন্মাদনা ও নিবৃত্ত রস-সাধনার স্মৃতির মলিন আলো কবির অধ্যাত্মসাধনার জয়যাত্রার পথকে এক অপরূপ বিষণ্ণ-মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

এই দ্বন্দ্ব হইতেছে ঘাটের সহিত পথ ও ঘরের—ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সহিত কর্মোন্মত্ততা ও রূপরসভোগের—অধ্যাত্ম-জীবনের সহিত কর্মমুখর ও সৌন্দর্য-মাধুর্য-পিপাসু কবি-জীবনের।

এই যে কর্মের কথা বলা হইল, ইহা স্বদেশী-আন্দোলনের নেতৃত্ব করা। বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলার জাতীয় জীবনে একটা জোয়ার আসিয়াছিল। প্রবল রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাদেশিকতা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই জাতীয় যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত। অপূর্ব উদ্দীপনাময় স্বদেশী সংগীতের দ্বারা, 'স্বদেশী সমাজ'-এর গঠনমূলক পরিকল্পনা দিয়া, নানা রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিয়া ও সভায় পাঠ করিয়া, তিনি এই আন্দোলনকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেন।

রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সংকীর্ণ জাতীয়তার পক্ষপাতী নন। তিনি মনুষ্যত্বকে, মানুষের চিরন্তন ধর্মবোধকে জাতীয়তার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। যখন দেখিলেন, তাঁহার পরিকল্পিত গঠনমূলক কাযপদ্ধতি ও শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করিয়া দেশকে নূতন করিয়া গড়িবার আগ্রহ নাই দেশবাসীর, তখন তিনি সেই আন্দোলন হইতে সরিয়া আসিলেন। লোকে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল।

এই স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ের রচনা 'খেয়া'। ১৩১২ সালের আষাঢ় হইতে ১৩১৩ সালের শ্রাবণ পর্যন্ত এই এক বছরের কিঞ্চিৎ অধিক কালের মধ্যে 'খেয়া'র কবিতাগুলি লেখা হয়।

রাজনীতি হইতে বিদায় লইলেও যে শিক্ষার আদর্শ ও গঠনমূলক পরিকল্পনা তিনি দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহারই ভাবাদর্শ রূপায়িত হইয়াছিল। উত্তেজনায় উন্মত্ত দেশবাসী দেশের সত্যকার কল্যাণকর কর্মকে গ্রহণ করিল না দেখিয়া প্রকৃত দেশহিতৈষী রবীন্দ্রনাথ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে তাঁহার অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ব্যর্থ হইল। দেশের প্রকৃত মঙ্গল করিবার ইচ্ছা তাঁহার আছে, কিন্তু ক্ষেত্র পাইলেন না, একটা ব্যর্থতার বেদনা ও নৈরাশ্য তাঁহার মনের কোণে সঞ্চিত হইল। কবি হইলেও কর্মের উপর বিতৃষ্ণা রবীন্দ্রনাথের কোনোদিন নাই, তিনি কর্মভীরু নন। কর্মও তাঁহার কবি চিত্তের এক রূপ—তাঁহার আদর্শের রস-সাধনা। কর্ম তাঁহার একপ্রকারের কাব্য। কেবল আদর্শ অনুযায়ী কর্ম হইল না বলিয়া তিনি স্বদেশী-কর্ম হইতে পিছাইয়া আসিলেন। তারপর, কবির অন্তর্জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছিল। কবি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই নূতন ভাগবত জীবনে তিনি কামনা করেন বাহিরের কোলাহল, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য হইতে দূরে শান্ত-সমাহিত-ভাবে থাকিতে।

না হইলে তাঁহার নূতন আধ্যাত্মিক জীবনের বিঘ্ন হইবে। তাই তিনি কর্ম ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কর্মের প্রতি একটা আসক্তি, কর্মের মধ্যে তাঁহার আদর্শকে রূপায়িত করিবার আকাঙ্ক্ষা, তিনি যে কর্মভীরু নন, অন্যকে তাহা জানাইবার জন্য বাসনা তাঁহার মনের মধ্যে ছিল। তাই কর্ম করিবার প্রবৃত্তি ও কর্ম হইতে নিবৃত্তির ইচ্ছা তাঁহার ভিতরে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল।

আর একটি ভাব-গ্রন্থি তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও কামনা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম সত্তা কবির সত্তা। প্রকৃতি ও মানবের রূপ-রসভোগের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নিত্যপ্রকৃতির অংশ। এই রূপ-রসই তাঁহার কাব্য-প্রেরণার মূল শক্তি। কবিত্ব-উন্মেষের পর হইতে মরালের মতো তিনি এই রূপ-রস-সরোবরে দীর্ঘদিন কেলি করিয়াছেন। কিন্তু এই একমুখী রস-সাধনায়, এই সৌন্দর্য-মাধুর্যের চর্চায় তিনি আর তৃপ্তি পাইতেছিলেন না, আর গভীরতর ও মহত্তর রসসাধনার জন্য তাঁহার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। সে ভগবদনুভূতির রস—সে পরম-সৌন্দর্যময়, পরমপ্রেমময়ের সহিত লীলারস। কিন্তু এই নূতন রসের লীলার জন্য নূতন ক্ষেত্র, নূতন পারিপার্শ্বিক, নূতন মানসিক অবস্থা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। না হইলে এই নূতক রসের আস্বাদনের কোনো সার্থকতা থাকে না—এ নূতন লীলার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। এই নূতন পারিপার্শ্বিকে পূর্বের প্রকৃতি-মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্য-রস অর্থহীন—বরং প্রতিকূল ; তাহাকে ছাড়িতেই হইবে, না হইলে নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। অথচ উহার সহিত কবির নাড়ীর যোগ। সে যোগ ছিন্ন করিতে বেদনায় দেহ-মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তবুও উপায় নাই, এই বেদনা বুকে চাপিয়াই নূতন রসের পারিপার্শ্বিক, নূতন লীলার ক্ষেত্র রচনা করিতে হইবে। সেই পূর্বেকার রসের জন্য বেদনা ও নূতন রসের জন্য আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব আমরা 'কল্পনা' হইতেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। 'ক্ষণিকা'য় এই বেদনাকে কবি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন ইহাও দেখিয়াছি। 'নৈবেদ্য'-এ নূতন রসের জন্য প্রস্তুতিও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। 'খেয়া'য় আসিয়া কবি অনিবার্যরূপে নূতন জীবনকে গ্রহণ করিলেন এবং নূতন রসাস্বাদনের জন্য পাকাপাকিভাবে প্রস্তুত হইলেন বটে, কিন্তু তবুও সেই পূর্বের মায়াবিনীর স্মৃতি, তাহার এক-একটা চকিত চাহনি, এই নির্জন ধ্যানের আঙিনায় কবিকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করিতেছে।

এই মায়াবিনীকে কবি ভুলিতেও পারিতেছেন না, আবার সর্বচাঞ্চল্যহীন হইয়া গম্ভীরভাবে ধ্যানের আসনে বসিতেও পারিতেছেন না। তাই তাঁহার মনে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার জন্য জীবনে একটা বিষাদ ও হতাশার ভাব আসিয়াছে।

যখনই কবি এই কাব্যে পূর্বস্মৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, পূর্বজীবনের রসোচ্ছল পরিবেশের চিত্র আঁকিয়াছেন, তখনই তাহা অপূর্ব কাব্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্বের রূপরসোচ্ছল জীবনের স্মৃতি সূক্ষ্ম করুণ রাগিণীর মতো সমস্ত কাব্যখানি ঘিরিয়া বাজিতেছে। এই রাগিণীটিই এই কাব্যের একমুখী গৈরিক ধারায় অপূর্ব বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।

এই দ্বন্দ্ব, এই দো-টানা হইতেই হতাশা ও বিষাদের সুর এই কাব্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই দ্বন্দ্ব তো কবি-জীবনের সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের। এখনো কবি অতীতকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই—কেবল স্বভাবের উপর প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া নূতন জীবনের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

খেয়ার কয়েকটা কবিতা আলোচনা করিলে এ বিষয়টা বুঝা যাইবে। খেয়ার প্রথম কবিতা 'শেষ-খেয়া'র মধ্যেই একটা নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

যাহারা সংসারকে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে, সাংসারিক কর্মের মধ্যে, গৃহের শান্তি, আরাম, স্নেহ-প্রেম-দয়ার বিচিত্র লীলার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে, জগৎ ও জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যকেই যাহারা জীবনের একমাত্র কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা তৃপ্ত, শান্ত মন লইয়া জীবন-অপরাহ্ণে আনন্দের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়াছে; আবার যাহারা পিছনের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়াছে, জাগতিক ও মানবিক রসের ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ত্যাগ ও বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্দ্বন্দ্ব, প্রশান্ত মনে জীবনের শেষ বেলায় অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু যে ঘরের মায়া কাটাইতে পারে নাই, জগৎ ও জীবনের উচ্ছল রসধারা এখনো যাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, আধ্যাত্মিক জীবনের উপযোগী দ্বন্দ্বহীন, অনাসক্ত, প্রশান্ত মন যে এখনো গঠন করিতে পারে নাই, তাহার অবস্থা বাস্তবিকই করুণ ও অসহায়; জীবন-শেষে কে তাহাকে এখন সাহায্য করিবে, কে তাহাকে কৃপা করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়া হাতে ধরিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করাইয়া দিবে? তাই কবি বলিতেছেন,—

> ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
> পারে যারা যাবার গেছে পারে;
> ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
> সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।

কবি এখন—'না ঘাটকা, না ঘরকা'। এই অবস্থাটাকেই কবি বলিতেছেন;—'ফুলের বাহার নাইক যাহার, ফসল যাহার ফলল না',—তাঁহার ত্রিশঙ্কুর মতো

অবস্থা। এখানে দুইটি জীবনের কথা বলা হইতেছে। সংসার-কর্ম-লিপ্ত, সংসারের রূপরসতৃপ্ত একটি জীবন, আর একটি সংসারের ভোগত্যাগী, নিরাসক্ত, অধ্যাত্ম-জীবন। একটি সংসারের সৌন্দর্য-মাধুর্য-রূপ-রসোচ্ছল জীবন, যাহা প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত বর্ণে গন্ধে অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়া একটি পরিপূর্ণ ফুলের মতো ফুটিয়া আছে। এই ফুলের জীবন বার্ধক্যে, রূপরসসৌন্দর্যের পাপড়িগুলি ধীরে ধীরে খসিয়া পড়ার পরে, পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনরূপ ফলে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইহাই ফুল-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। কবির পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জীবন একমুখী সুসম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। বহুপূর্ব হইতেই এই ভোগ-জীবনের উপর তাঁহার একটা অনাসক্তি আসিয়া গিয়াছে। ত্যাগময়, নিরাসক্ত আধ্যাত্মিক জীবনের উপর একটা আকাঙ্ক্ষা তাহার পুষ্প-জীবনের পরিপূর্ণ রসভোগকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। তাঁহার ফুল-জীবন 'বাহার' দিতে পারে নাই—অপূর্ব সৌন্দর্যে জলজল করিয়া ওঠে নাই। ইহা আমরা প্রায় ছয়-সাত বৎসর পূর্বের 'কল্পনা' হইতে স্পষ্ট দেখিতেছি এবং তারও বহু পূর্বের 'চৈতালি' হইতে আভাস পাইতেছি। কবির মন বহুবৈচিত্র্যকামী ও নিরন্তর পরিবর্তনশীল। একরকম রসে দীর্ঘকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া তাহার ঐকান্তিক সাধনা তিনি কোনো দিন করেন নাই। ইহা তাঁহার কবি-প্রকৃতির বিরুদ্ধ। তাই পরিপূর্ণ বর্ণগন্ধময় ফুলের জীবন কোনোদিনই তাঁহার বিকশিত হয় নাই। তারপর, আবার যখন ফলের জীবন বিকশিত হইবার সময়, সে সময়েও তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ হইল না। এই ফলের জীবনে যে ত্যাগ, বৈরাগ্য, অনাসক্তি ও প্রশস্ত মনের প্রয়োজন, তাহাও সম্ভব হইল না, কারণ পিছনের রূপরসভোগের আকর্ষণ, নানা কর্মের প্রতি একটা নিগূঢ় টান এখনো তাঁহার চিত্তস্থৈর্য নষ্ট করিতেছে।

এখন কবি জীবনের শেষ-অংশে উপস্থিত হইয়াছেন। ফুলের জীবন তো ফুটিল না, তাহার আর সম্ভাবনা নাই—সূর্যদেব এখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। এখন আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হইবে—সন্ধ্যায় পূজার ঘরে দীপ জ্বলিবে। কিন্তু তাহারও কোনো সম্ভাবনা নাই, সে-জীবন এখনো পূর্ণভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। তাই—'দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁজের আলো জ্বলল না'। তাই সেই হতভাগ্য, অক্ষম, অসহায় লোকটি দীন-করুণ নয়নে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে,—'সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।'

কবি-হৃদয়ের এই যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হইয়াছে তাহা অনবদ্য কাব্যে রূপায়িত হইয়াছে পরবর্তী কবিতা 'ঘাটের পথ'-এর মধ্যে। গতজীবনের রসক্ষেত্রের দিকে অশ্রু-ছলছল দৃষ্টি, সেই রূপরসোচ্ছল জীবনের স্মৃতি-রোমন্থন অপূর্ব বেদনার মাধুর্যে

কবিতাটিকে মণ্ডিত করিয়াছে, সূক্ষ্ম করুণসুরের মূর্ছনা ইহার মর্মস্থল হইতে বাহির হইয়া একটা ব্যথার মায়া সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা যথার্থ উপভোগ্য। যে কবিতা কয়টিতে এই গতজীবনের 'স্মৃতিবেদনার মালা' গাঁথা হইয়াছে, কাব্যাংশে ও হৃদয়-গ্রাহিতায় সেইগুলিই উৎকৃষ্ট। এগুলি 'খেয়া'র গেরুয়া অঞ্চলের সোনালী নক্সা।

পূর্বের রূপরসভোগের জীবন হইতে বিদায় লইয়া, বিচিত্র কর্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অতীতের কবি-কর্ম বিস্মৃত হইয়া, নানামুখী বিক্ষিপ্ত চিত্তকে গুটাইয়া লইয়া আজ তিনি ঘরের মধ্যে শান্ত, নিরাসক্ত মনে দেবতার পূজার জন্য আসন পাতিয়াছেন, কিন্তু যখন ঘরের দরজা হইতে জলভরণে-বাহির-হওয়া বধূদের কঙ্কণঝংকার শুনিতে পাইলেন, তখনই তাঁহার অবদমিত, স্তিমিতপ্রায় অতীত জাগিয়া উঠিল। এই স্বেচ্ছানির্বাচিত ত্যাগবৈরাগ্যধূপসুরভিত রুদ্ধ পূজাগৃহে তাঁহার দেহটা পড়িয়া রহিল, প্রাণ চলিয়া গেল ঐ পথের বাঁকে বাঁকে—যেখানে কতো আনন্দময় কর্মপ্রবাহ, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের মেলা, মানুষের কতো আত্মীয়তা, কতো প্রেম, কতো স্নেহের লীলা, কতো হাসি-কান্নার গঙ্গা-যমুনার সংগম! তিনিও একদিন 'ডাহিনে শাখা হেলান বাঁশবনের' ধার দিয়া, 'কন্‌কন্‌ কাঁকন বাজাইয়া কনক-কলসে জল ভরিয়া ঘরে' ফিরিয়াছিলেন। সেই পথ তো তাঁহাকে তেমনিই আকর্ষণ করিতেছে। ছায়া-ঘেরা, মর্মারিত বনপথের চারিদিকে বিস্তৃত প্রকৃতির প্রাণ-মাতানো রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, গান এখনো তাঁহাকে ডাকিতেছে, তাঁহাকে উতলা করিতেছে,—

ওগো দিনে কতবার করে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোত-কূজন-করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে—
ওগো দিনে কতবার করে।

আজো, মনে হয় তাঁহার বহুদিনের প্রেয়সী, লীলাসঙ্গিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী তাঁহার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকে, এখনো তাহার অপাঙ্গ-দৃষ্টির ইঙ্গিত তরুপল্লবে, নদীজলে প্রকাশ পায়,—

আমি বাহির হইব বলে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।

তাই কানাকানি পাতায় পাতায়,—
কালো লহরীর মাথায় মাথায়
চঞ্চল আলো দোলে—
আমি বাহির হইব বলে।

শুধু কি জল-আনার মতো একটা নির্দিষ্ট কাজ শেষ করাই এই পথে বাহির হওয়ার উদ্দেশ্য? এই পথে চলিতে যে কতো সৌন্দর্য-মাধুর্য, কতো হৃদয়ের রসধারা, কতো আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না—কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতার তিনি সম্মুখীন হইয়াছেন।

একি শুধু জল নিয়ে আসা?
এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
কী কব, কী আছে ভাষা।
কতো-না দিনের আঁধারে আলোতে
বহিয়া এনেছি এই বাঁকা পথে
কতো কাঁদা কতো হাসা।

জলভরা তো ছিল কবির উপলক্ষ্য। সুদূরের পিয়াসী কবি মনের কি এক অজানিত ব্যাকুলতায় পথে বাহির হইয়াছেন, ভরা-কলস কতো অনির্বচনীয় রহস্যের ইঙ্গিত মৃদু মৃদু শব্দে তাঁহার কানে জানাইয়াছে, কর্মের মধ্য দিয়া জগতের কতো রস-রহস্যের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন,—

যবে বুক ভরি উঠে ব্যথা,—
ঘরের ভিতর না দেয় থাকিতে
অকারণ আকুলতা,—
আপনার মনে একা পথে চলি,
কাঁখের কলসী বলে ছলছলি
জলভরা কলকথা
যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা।

কাজের জন্য তিনি কোনো দিন ভয় পান নাই, কাজ তো তাঁহার কবি-হৃদয়ের একপ্রকার রস-সাধনা—একপ্রকার খেলার অঙ্গ। কাজের মধ্যে তিনি পাইয়াছেন নিবিড় আনন্দ, তাই কোনো বাধা-বিপত্তিকে তিনি ভয় করেন নাই,—

আমি ডরি নাই ঝড়জল।
উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে
উদ্দাম চঞ্চল!

আমি গিয়াছি আঁধার সাঁঝে,
শিহরি শিহরি উঠে পল্লব
নির্জন বনমাঝে।

কিন্তু আজ সেদিনের পথ-চলা শেষ হইতেছে। আর তিনি বাহির হইবেন না। এখন যে সন্ধ্যায় পূজার আয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু পূজার উপযোগী মানসিক স্থৈর্য তো তাঁহার আসে নাই—পথের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাই এই অন্তর্দ্বন্দ্বে কবির বেদনাময় অস্থিরতা,—

আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে—
শাখা-থরথর পাতা-মরমর
ছায়াসুশীতল বাটে ?

ক্রমে কবি এই দ্বন্দ্বের সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার সমাধান না হইলে তো তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিষ্ঠাই হয় না। তাই কবি তাঁহার অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতিপ্রেমকে ভগবৎপ্রেমে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যে ভগবানের প্রকাশ দেখিয়াছেন—প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে সেই অসীমসুন্দরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। খেয়া-পূর্ব যুগে প্রকৃতির সৌন্দর্য তাহার নিজস্বরূপে কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই সৌন্দর্যের অতি প্রবল অনুভূতির প্রকাশ তাঁহার কাব্যে আছে। তত্ত্বরূপে যদিও তিনি জানিতেন যে প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ, তাহা অসীমসুন্দরেরই অংশ, কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্রে—কাব্যের প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতির সাক্ষাৎ সৌন্দর্যই তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবের, জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য-মাধুর্যই তাঁহার কবি-মানসকে পরিচালিত করিয়াছে। এই জাগতিক ও মানসিক রূপরসই কবি-হৃদয়ের অচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ পরিগণিত ছিল। খেয়ার যুগে কবি সেই প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যানুভূতিকে অপ্রত্যক্ষ ভগবৎসৌন্দর্যের অনুভূতিতে পরিণত করিলেন। প্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে সেই অসীমসুন্দর, লীলাময়ের আবির্ভাব—তাঁহার নয়নভুলানো রূপ, প্রাণমাতানো স্পর্শ। প্রকৃতির সৌন্দর্য গৌণ হইয়া গেল—তাহার মধ্যে ভগবানের স্পর্শই মুখ্য হইল। এখন প্রকৃতির পটভূমিকাতে ভগবানের আস্বাদন চলিল। এইভাবে কবির অত্যাজ্য হৃদয়বৃত্তির রূপান্তর সাধিত হইল এবং তাঁহার মনের দ্বন্দ্বেরও সমাধান করা হইল।

'বৈশাখে' কবিতায় দেখি বৈশাখের গ্রীষ্মতপ্ত প্রকৃতির মধ্যে কবি অজানার স্পর্শ পাইতেছেন। দুপুরবেলায় আমলকির কচিপাতার নাচনে, নিমের

ফুলের গন্ধে, মৌমাছিদের গুঞ্জনে, মহুল-শাখার মর্মরধ্বনিতে, মাঠের সারি-বাঁধা তালের বনে তপ্ত বাতাসের শন্ শন্ শব্দে কবি অনুভব করিতেছেন,—

কার চরণের নৃত্য যেন
ফিরে আমার বুকের মাঝে,
রক্ত আমার তালে তালে
রিমিঝিমি নূপুর বাজে।

আজ অলস, গ্রীষ্মদিন উদাস কর্মহীনতার মধ্যে কাটিয়া গেল। শেষ বেলায় কবি ভাবিতেছেন, দিনটি নিরর্থক যায় নাই, সংসারের কাজের ছাপমারা কোনো কাজ না হইলেও, তাহার পক্ষে প্রকৃত কাজেই দিন কাটিয়াছে,—

মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবি মাঠের মধ্যে গিয়ে—
সারা দিনের অকাজে আজ
কেউ কি মোরে দেয় নি ধরা?

'বর্ষাপ্রভাত' 'খেয়া'র একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। বর্ষাধৌত নীল আকাশের স্বর্ণকিরণ প্রভাত-প্রকৃতিকে অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। ধরণী-গগন আজ সোনার জোয়ারে টলমল। বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মী আকাশ হইতে যেন মুঠি মুঠি সোনা ছিটাইয়া দিয়াছেন। মনে হইতেছে, স্বর্গের পারিজাত বনের সোনার মৌচাক ভাঙিয়া যাওয়ায় ঝরঝর করিয়া সোনার মধু পৃথিবীতে ঝরিয়া পড়িতেছে, লক্ষ্মী স্বর্গ হইতে নামিয়া আজ এই স্বর্ণ-রৌদ্রমণ্ডিত পৃথিবীর বুকে আলোর পদ্মদলে আসন পাতিবেন। ইন্দ্রাণী যেন স্বর্গ হইতে এই সোনার জোয়ারে ভাসা ধরণীকে দেখিয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে নীরবে হাসিতেছেন। এই যে বর্ষাপ্রভাতে রৌদ্রকরোজ্জ্বল ধরণীর সৌন্দর্য, ইহা তাঁহাকে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও প্রশান্তি দিয়াছে—তাঁহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইয়াছে,—

ওগো কাহারে আজ জানাই আমি—
কী আছে ভাষা—
আকাশ পানে চেয়ে আমার
মিটেছে আশা।
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাইনে কিছুর স্বর্গ-শেষে
ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা।

আজ কবির নিকট প্রকৃতির প্রত্যক্ষ আবেদন নাই, সে এক বৃহত্তর ভাবের বাহক—মহত্তর সত্তার সংকেতজ্ঞাপক।

'ঝড়' কবিতায় দেখা যায়, বৃষ্টিধারাপাত, মেঘের গুরুগুরুধ্বনি ও ঝড়ের বেগের মধ্যে কে এক চঞ্চল, উদ্দাম অজানা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবির মনে মেঘমল্লার রাগিণীর মীড় বাজিতেছে; এই কাজলমেঘে, ঝড়ের এলোমেলো হাওয়ায়, বৃষ্টির বেগে, মেঘের মৃদুগম্ভীর ধ্বনিতে কবির মন ব্যাকুল ও অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই অজানাকে পাইবার জন্য তাঁহারি সমস্ত মন আসন পাতিয়া বসিয়া আছে। সংসারের উত্থান-পতন, সকল সুখদুঃখের গান, সকল বোধ ও স্মৃতির উর্ধ্বে বহুদূরের রাজ্যে সেই অজানার উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে তাঁহার বিরহবেদনাদীর্ণ হৃদয়,—

ওরে আজি বহুদূরের
বহুদিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর
ছুটেছে কোন্‌খানে?

এই প্রকৃতির পটভূমিকায় ভগবানের অনুভূতি 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্যে'র কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

পথের দ্বন্দ্ব সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে কবি গৃহের দ্বন্দ্বেরও সমাধান করিয়াছেন। 'নীড় ও আকাশ' কবিতাটিতে এই সমাধানের ইঙ্গিত আমরা দেখি।

এতদিন ঘরে বসিয়া কবি মানুষের সুখদুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, প্রেম-বিরহ, মিলন-বিচ্ছেদের গান রচনা করিয়াছেন, আর প্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, গান তাহার সহিত নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ছিল।

ঘাসের পাতার মাটির গন্ধ,
কতো ঋতুর কতো ছন্দ,
সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল,
নীড়ে গাওয়া গানের সাথে।

কিন্তু আজ তাঁহাকে নীড়ের বাঁধনহারা নীল আকাশের গান গাহিতে হইবে, 'ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে' 'সঙ্গিবিহীন নির্মমতায়' মিশিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। যখন তিনি এই অসীম শূন্যের গান করেন তখন এক অপূর্ব আনন্দ লাভ করেন, তবুও তিনি গৃহের গান ছাড়িতে পারেন না,—

তবু নীড়েই ফিরে আসি,
এমনি কাঁদি এমনি হাসি
তবুও এই ভালবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

নীড়ের সহিত আকাশের কোনো বিরুদ্ধতা নাই, উভয়ে উভয়ের পরিপূরক—সীমা ও অসীমের মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকৃত রূপ। এই অনুভূতি কবির মধ্যে ক্রিয়াশীল হইয়া নীড় ও আকাশের মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত করিয়াছে। অবশ্য এ অনুভূতি তাঁহার মধ্যে পূর্বেও ছিল, চৈতালি ও নৈবেদ্যের অনেক কবিতায় তাহার প্রকাশও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু সেগুলিতে তত্ত্বের উপলব্ধিই রূপ পাইয়াছে। নৈবেদ্যে 'একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়' বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আকাশের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হইয়াছিল,—

আমার অতীত তুমি যেথা সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে
সকল বন্ধন-মাঝে—সেথায় উদার
অন্তহীন শান্তি আর মুক্তির বিস্তার।
তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তবু ঐশ্বর্যের পানে টানে যে আমাকে।
(নৈবেদ্য, ৮২নং)

'খেয়া'র কবি অনুভূতি ক্ষেত্রে এই মিলন সাধন করিয়াছেন। লীলাময়কে সকল লীলায় পাইতে হইবে—ঘরের লীলায়, মানুষের সমস্ত হৃদয়রসে, বাহিরের লীলা—প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্যে তাঁহাকে অনুভব করিতে হইবে, তবেই তো লীলায়-উপলব্ধির সার্থকতা। 'খেয়া'য় তো কবির লীলাময় ভগবানের প্রথম অনুভূতি—'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'তে ইহার পূর্ণরূপ।

তারপর 'অবারিত' কবিতায় তাঁহার ঘরে বহুজনসমাগমের মধ্যেই কবি স্পর্শ পাইয়াছেন। সকলের প্রতি সহানুভূতি, সকলের সহিত আত্মীয়তা ও প্রেমে, সকলের সহিত মিলনের দ্বারাই কবি ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন ; এই হৃদয়ের মিলনের মধ্যে, এই মানবিক রসের মধ্যেই সেই প্রেমময়ের আবির্ভাব হইয়াছে। ঘর ছাড়িয়া, ঘরের স্নেহ-প্রেম উপেক্ষা করিয়া, পথিকবেশে ভগবানের জন্য গভীর রাত্রে কোথাও বাহির হইতে হয় নাই। এই হৃদয়রসের পূর্ণসাধনেই সেই অজানা রহস্যময় ধরা দিয়াছেন।

এইভাবে কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবহৃদয়ের মাধুর্য উপভোগের সঙ্গে ভগবদনুভূতির মিলন করিয়াছেন। তাই 'খেয়া'য় ঘাট, পথ ও ঘরের মিলনে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া তিনি বিশ্বব্যাপী ভগবানের লীলা অনুভব করিয়াছেন 'গীতাঞ্জলি' হইতে।

'খেয়া'র কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি এই কয় ভাব-ধারার কবিতা আমরা দেখিতে পাই,—

(১) রূপরসভোগের জীবন ত্যাগ করিয়া, জীবনের বিচিত্র কর্মের উত্তেজনা ও গর্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া, গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য—ভগবদুপলব্ধির জন্য—কবির আকাঙ্ক্ষা,—শেষ খেয়া, ঘাটের পথে, গোধূলিলগ্ন, সমুদ্র, সমাপ্তি, বিদায়, প্রতীক্ষা, পথিক, প্রচ্ছন্ন ইত্যাদি।

(২) ভগবানের ক্ষণস্পর্শলাভ,—মুক্তিপাশ, জাগরণ, প্রভাতে ইত্যাদি।

(৩) ভগবানের কৃপালাভ,—ফুলফোটানো, নিরুদ্যম, কৃপণ ইত্যাদি।

(৪) রুদ্রমূর্তিতে কবির জীবনে ভগবানের আবির্ভাব,—হার, চাঞ্চল্য, শুভক্ষণ, ত্যাগ, আগমন, দান, দুঃখমূর্তি ইত্যাদি।

(৫) ভগবানেব নিকট কবির আত্মসমর্পণ ও সার্থকতালাভ,—বর্ষাসন্ধ্যা, দিঘি, বালিকাবধূ, মিলন, সব-পেয়েছির-দেশ।

(১) 'খেয়া'র প্রথম কবিতা 'শেষ খেয়া'তেই কবি বাসনা-বিক্ষুব্ধ, ভোগবহুল, কর্মোন্মত্ত জীবনের তটভূমি হইতে খেয়া পার হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনের তটে পৌছাইতে চাহিতেছেন। জীবনের শেষ পর্বে কবি অনুভব করিতেছেন যে, এতদিন তিনি সাংসারিকতা, বৈষয়িকতার ধূলিজালে রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া জীবনের প্রকৃত সার্থকতার রূপ দেখিতে পান নাই, তাই ভগবানকে অনুরোধ করিতেছেন, তিনি যেন কবিকে তাঁহার চির আনন্দ ও চির শান্তির রাজ্যে লইয়া যান—জীবনের নবতর সার্থকতার সন্ধান দেন।

ফুলের বাহার নাইকো আর ফসল যার ফলল না,—
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,—
দিনের আলো যার ফুরাল, সাঁঝের আলো জ্বলল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়!

'ঘাটের পথ' কবিতায় কবি বলিতেছেন, তাঁহার দিনের কাজ চুকিয়া গিয়াছে, জলভরা শেষ হইয়াছে, পড়ন্ত বেলায় তিনি যেন কাহার প্রতীক্ষায় গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন। তিনি আর আজ ঘাটের পথে বাহির হইবেন না। বাহিরের কর্ম তাঁহার সব শেষ হইয়াছে। তাঁহার কর্ম-সঙ্গীদের সঙ্গে আর তিনি যোগ দিবেন না। কর্মকে তিনি কোনোদিন ভয় করেন নাই, কর্মপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিতে তিনি অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। কর্মের জন্য কতো ঝঞ্ঝাট, কতো দুঃখবিপদ তিনি হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন

প্রকৃতি-মানবের বিচিত্র রূপ-রসের ফেনিল পাত্র তিনি নিঃশেষে পান করিয়াছেন ; এখনো সেই সৌন্দর্য-মাধুর্যের আকর্ষণ অনুভব করিয়া ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া যান।

কিন্তু সেই তরঙ্গ-মুখর কর্মস্রোতে আত্মসমর্পণ না করিয়া, সেই প্রকৃতি-মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্যের নিগূঢ়, অত্যাজ্য বন্ধনকে স্বীকার না করিয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে কুড়াইয়া লইয়া, শান্ত সমাহিত হইয়া তিনি এখন অন্তরের ধ্যানলোকে প্রবেশ করিবেন। তাই

আজ ভরা হয়ে গেছে বারি।
আঙিনার দ্বারে চাহি পথপানে
ঘর ছেড়ে যেতে নারি।

কবির জীবন-সন্ধ্যায় তাঁহার জীবন-স্বামীর সহিত মিলনের লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত দিন কর্মকোলাহলে কাটিয়াছে, সন্ধ্যার গোধূলি-লগ্নে তাঁহার প্রিয়তমের সঙ্গে নব-পরিচয় হইবে, রজনীর একান্ত নিভৃতে রচিত হইবে তাঁহাদের বাসর-শয্যা। আজ সন্ধ্যায় তিনি সব কাজ ফেলিয়া নববধূর বেশে সজ্জিত হইবেন,—

আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়,
কখনো কত কী কাজে।
এখন কি শুনি পূরবীর সুরে
কোন্ দূরে বাঁশি বাজে।
বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নবমিলনের সাজে ?
সারা হল কাজ মিছে কেন আজ
ডাক মোরে আর কাজে ?
(গোধূলিলগ্ন)

কবি বধূবেশে সজ্জিত হইয়াছেন, বাসর-শয্যার জন্য পুষ্পসম্ভার ও দীপ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কবির মনে সেই অজ্ঞাত-হৃদয়, নূতন প্রিয়তমের জন্য একটা ক্ষীণ উৎকণ্ঠা ও সংশয় আছে। এ-ই প্রিয়তমের সঙ্গে তাঁহার প্রথম মিলন,—হৃদয়-বিনিময়ের দ্বারা প্রিয়তমের হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই ; কি জানি সে কেমন হইবে, কেমন করিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া

প্রেমজ্ঞাপন করিবে—সে সম্বন্ধে কবির মনে একটা কৌতূহলমিশ্রিত ভয়ের ভাব আছে—

তখন এ-ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কী মন্ত্র গানে
করিবে মগন রে—
(গোধূলিলগ্ন)

কবির জীবন-তরী নদীপথ অতিক্রম করিয়া কূল-হারা সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে, দিন শেষ হওয়ায় রাত্রির অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, এই অকূল পাথারে একাকী অজানার উদ্দেশে তাঁহাকে চলিতে হইবে। নদীতীরের পরিচিত আবেষ্টন আর নাই, চেনা-মুখ আর কোথাও দেখা যাইতেছে না। তবুও তাঁহার ভয় নাই, ভাবনা নাই,—

দুলুক তরী ঢেউয়ের 'পরে ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ।
গাও রে আজি নিশীথরাতে অকূল-পাড়ির আনন্দগান।
যাক না মুছে তটের রেখা,
নাই বা কিছু গেল দেখা,
অতল বারি দিক না সাড়া
বাঁধনহারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লও রে বুকে দু-হাত মেলি
অন্তবিহীন অজানাকে।
(সমুদ্রে)

সংসারের সমস্ত কাজ-কারবার, দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া, জগৎ ও জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের মোহ কাটাইয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত করিয়া তাঁহাকে গৃহ-কোণে আজ ধ্যানের আসন পাতিতে হইবে,—

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি
ব্যবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল।
এখন ঘরে আয় রে ফিরে মাঝি,
আঙিনাতে আসনখানি মেলো।
ভুলে যা রে দিনের আনাগোনা
জ্বালতে হবে সারা রাতের আলো,
শ্রান্ত ওরে, রেখে দে জাল-বোনা,
গুটিয়ে ফেলো সকল মন্দভালো।

ফিরিয়ে আনো ছড়িয়ে-পড়া মন,
সফল হোক রে সকল সমাপন।

(সমাপ্তি)

কবি এতদিন উত্তেজনাময়, কলকোলাহলপূর্ণ কর্ম-জীবন যাপন করিতেছিলেন সহকর্মীদের সঙ্গে, এখন সে পথ হইতে সরিয়া পড়িয়া ভিন্নপথে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাই সহকর্মীদের নিকট বিদায় চাহিতেছেন,—

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুমি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।

(বিদায়)

আজ তিনি অজানার সন্ধানে অনির্দিষ্ট পথে লক্ষ্যহীনভাবে ছুটিয়া চলিয়াছেন,—

মেঘের পথের পথিক আমি আজি,
হাওয়ার মুখে চলে যেতেই রাজি,
অকুল-ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে।
তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে।

(বিদায়)

সংসারের সমস্ত স্বার্থ-সম্বন্ধ, লাভ-লোকসানের হিসাব শেষ করিয়া, সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, কবি প্রস্তুত হইয়া তাঁহার দেবতার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন,—

আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে?
নামিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা,
কেনাবেচা নানান হাটে হাটে।

বসে আছি শয়ন পাতি ভূমে
তোমার এবার সময় হবে কবে?
(প্রতীক্ষা)

গভীরতর আধ্যাত্মিক জীবন উপলব্ধির জন্য কবি ব্যাকুল। সেই 'অন্তবিহীন অজানা'র উদ্দেশে তিনি বাহির হইবেন। সে লীলাময়কে পাইতে হইলে তাঁহাকে তো পথেই বাহির হইতে হইবে। পথের অনিবার্য মায়া তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। রক্তে লাগিয়াছে আগুন। তাই ঘরের আকর্ষণ আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারিবে না। ঘরের প্রিয়জনের আহ্বান, সৌন্দর্য-মাধুর্যের উপভোগ, নিশ্চিন্ত সুখ ও আরাম তাঁহার যাত্রাপথে কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। দিন-ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিবার ধৈর্য তাঁহার নাই—তিনি নিশীথেই ছুটিয়া বাহির হইবেন। ঘরের প্রিয়জন বলিতেছে,—

মোদের ঘরে হয়েছে দীপ জ্বালা
বাঁশির ধ্বনি হৃদয়ে এসে লাগে,
নবীন আছে এখনো ফুলমালা,
তরুণ আঁখি এখনো দেখ জাগে।
বিদায়-বেলা এখনি কিগো হবে,
পথিক, ওগো পথিক, যাবে তবে?
(পথিক)

কিন্তু আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলের নিকট হইতে এক অব্যক্ত মন্ত্র এই তিমির-রাত্রে তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে, অজানা তাঁহার কাছে অদৃশ্য দূত পাঠাইয়াছে, তিনি প্রিয়জনের করুণ মিনতি, আঁখিজল উপেক্ষা করিয়া নিশীথেই ঘরের বাহির হইবেন। তিনি যে পথ-পাগল পথিক।

কবি তাঁহার রাজরাজেশ্বর প্রিয়তমের জন্য ভিখারিণীর বেশে ফুলের ডালি লইয়া পথের উপর সারাদিন বসিয়া থাকেন। সকলে তাঁহাকে দেখিয়া হাসে, অবজ্ঞা করে, কি চান জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তিনি তাঁহার মনের কথা বলিতে না পারিয়া চোখ নীচু করিয়া থাকেন। সে কথা কি বলিবার? সে যে তাঁহার গোপন মনের আকাঙ্ক্ষা,—

আমি কোন্ লাজে বা বলব আমি তোমায় শুধু চাহি,—
আমি বলব কেমন করে—
শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনী দিন বাহি,—
তুমি আসবে আমারতরে?

আমার দেহখানি যত্নে রাখি, রাজৈশ্বর্যে তব
তারে দিব বিসর্জন,
ওগো অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে কব,
তাহা রৈল সংগোপন।

(প্রচ্ছন্ন)

কবি পথের ধারে বসিয়া ভাবেন, কবে তাঁহার রাজাধিরাজ প্রিয়তম সোনার রথে চড়িয়া পৃথিবী কাঁপাইয়া আলোকমালা ও বাদ্যের সঙ্গে মহাসমারোহে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, আর এই মলিনবেশ ভিখারিণীকে ধূলা হইতে তুলিয়া তাঁহার বামপাশে বসাইবেন। তখন পথের লোক অবাক হইয়া যাইবে। কিন্তু

ওগো সময় বয়ে যাচ্ছে চলে রয়েছি কান পেতে
কোথা কই গো চাকার ধ্বনি।
তোমার এ-পথ দিয়ে কত না লোক গর্বে গেল মেতে
কতই জানিয়ে রনরনি।
তবে তুমিই কিগো নীরব হয়ে রবে ছায়ার তলে
তুমি রবে সবার শেষে—
হেথায় ভিখারিনীর লজ্জা কি গো ঝরবে নয়নজলে
তারে রখেবে মলিন বেশে?

(প্রচ্ছন্ন)

(২) কবি অলক্ষ্যে, অজানিতে তাঁহার প্রিয়তমের স্পর্শ পাইয়াছেন। দুয়ার রুদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন, কিন্তু কখন যে তাঁহার গোপনবিহারী প্রিয়তম নিশীথে আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কবি অন্যমনস্কতায় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রভাতে উঠিয়া কবি দেখিলেন, তাঁহার ঘরের দরজা-জানালা সব খুলিয়া গিয়াছে, আকাশ-বাতাস তাঁহার ঘরের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। এতদিনে তিনি ঘরে বদ্ধ ছিলেন, এখন সমস্ত আকাশ তাঁহার ঘর হইয়া গিয়াছে। এবার তাঁহার বাহিরের কোনো অবরোধ নাই, বন্ধন নাই—তিনি কেবল প্রিয়তমের আশা-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া দুয়ার খুলিয়া বসিয়া রহিবেন,—

এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে রব খোলা দুয়ারে,—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরাণবঁধু হে
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও
পরানে পরশমধু হে।

(মুক্তিপাশ)

কবি সারারাত্রি তাঁহার প্রিয়তমের অপেক্ষায় জাগিয়া থাকিয়া যদি প্রভাতে ঘুমাইয়া পড়েন, এবং সকালবেলায় তাঁহার প্রিয়তম আসিয়া যদি তাঁহাকে নিদ্রামগ্ন দেখেন, তবুও কেউ যেন তাঁহার ঘুম না ভাঙায়। তাঁহার প্রিয়তমের স্পর্শেই তিনি জাগিবেন—রাত্রির সুখস্বপ্নের মূর্তিমান প্রকাশ-রূপে, প্রভাত আলোর সর্বপ্রথম রশ্মি-রূপে, তিনি প্রিয়তমের স্পর্শসুখ অনুভব করিবেন,—

প্রথম চমক লাগবে সুখে
চেয়ে তারি করুণ মুখে,
চিত্ত আমার উঠবে কেঁপে
তার চেতনায় ভ'রে—
তোরা আমায় জাগাস নে কেউ,
জাগাবে সেই মোরে।
(জাগরণ)

'প্রভাতে' কবিতায় কবি বলিতেছেন, দুঃখের মধ্য দিয়া অপ্রত্যাশিতরূপে তিনি ভগবানের স্পর্শ পাইয়াছেন। একটি দুর্যোগময়ী শ্রাবণ-রাত্রির ঝড়জলের পর প্রভাতে উঠিয়া কবি দেখিলেন, তাঁহার শুষ্ক হৃদয়-সরোবর কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার মাঝখানে অপূর্বসুন্দর একটি শ্বেত-কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। বর্ষা-রাত্রির বহু-দুঃখময় অভিজ্ঞতার অন্তে প্রভাতে তিনি এই দৃশ্য দেখিবেন ইহা তাঁহার ধারণার অতীত,—

একটিমাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিল মাঝে।
আজি একা বসি ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি,
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।
ইহার লাগিয়া হৃদ্‌বিদারণ,
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বেদন
বক্ষে লেখি।
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।

(২) ভগবানের কৃপা ব্যতীত কখনো অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ হয় না। মানুষের চেষ্টা বৃথা। তিনি 'ভাবগ্রাহী', অন্তরের আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া কৃপা করেন। সাংসারিক হিসাবে, সংসারের লোকের আশা ও ধারণার অনুপাতে তাঁহার করুণা বিতরিত হয় না। যে সকলের নীচে, সকলের পিছে আছে, সংসারের চোখে যে অজ্ঞাত, অখ্যাত ও উপেক্ষিত, সকলের অলক্ষ্যে তাহার উপরেও কৃপা বর্ষিত হইতে পারে। মহা আড়ম্বরে ভগবৎসাধনে অগ্রসর হইলেও তাঁহার কৃপা না মিলিতে পারে। কৃপা যখন আসে, তখন আসে অত্যন্ত সহজে ও অপ্রত্যাশিতভাবে। এই কৃপাবাদ সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্রের মর্মকথা। উপনিষদেও ইহারই আভাস আছে। বৈষ্ণব-সাধকেরা প্রথমেই কৃপার ভিখারী। খ্রীষ্টীয় ধর্মমতেও ইহাকে অনেকখানি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথও তাই বলিয়াছেন যে, শত চেষ্টা করিলেও নিজের ইচ্ছা অনুসারে আধ্যাত্মিক জীবনের উপযোগী হওয়া যায় না।

তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
যতই বলিস, যতই করিস,
যতই তারে তুলে ধরিস,
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত করিস বোঁটাতে।
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
... ...
যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে!
যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

(ফুল ফোটানো)

'নিরুদ্যম' কবিতায় কবি ভগবানের অপ্রত্যাশিত কৃপালাভের কথা বলিতেছেন। কবি জীবন-প্রভাতে, সকলের সঙ্গে, কঠোর কর্তব্যসাধনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, সংকল্প ছিল সন্ধ্যার পূর্বেই সমস্ত কর্ম সমাপ্ত করিয়া, কর্ম-জীবনের তট হইতে পার

হইয়া গভীর আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তীর্ণ হইবেন। ইহাই সংসারের লোকের সাধারণ পন্থা—কবিও তাহাই অনুসরণ করিয়া সকলের সঙ্গে চলিয়াছিলেন। কিন্তু জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া, পাখীর গানে, আম্র-মুকুলের গন্ধে বিভোর হইয়া, বসুন্ধরার বুকে ঘুমাইয়া পড়িলেন; সাথীরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কবি ভাবিলেন, তিনি বহু পিছনে পড়িয়া গেলেন, জীবনসন্ধ্যায় পরপারে পৌঁছিতে না পারিলে তাঁহার সব ব্যর্থ হইবে, কিন্তু,—

শেষে গভীর ঘুমের মধ্য হতে
ফুটল যখন আঁখি,
চেয়ে দেখি, কখন এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়র দেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্য ঢাকি।
ওগো ভেবেছিলাম আছে আমার
কত না পথ বাকি।
মোরা ভেবেছিলাম পরান পণে
সজাগ রব সবে;
সন্ধ্যা হবার আগে যদি
পার হতে না পারি নদী,
ভেবেছিলাম তাহা হলেই
সকল ব্যর্থ হবে।
যখন আমি থেমে গেলাম, তুমি
আপনি এলে কবে।

প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্য দিয়া কবি সকল সৌন্দর্য-মাধুর্যের মূল উৎসের কাছে পৌঁছিয়াছেন, সৃষ্টির মধ্যে অপ্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টাকে অনুভব করার মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার চরণে উপস্থিত হইয়াছেন। কিছুই তাঁহার ব্যর্থ হয় নাই। জাগতিক রূপ-রসের সাধনা তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনায় বাধা দেয় নাই—বরং সেই পরমসুন্দর পরমপ্রেমময় তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে কৃপা করিয়াছেন।

ভগবান রাজরাজেশ্বর হইয়াও কেবল কৃপাপরবশ হইয়া মানুষের হৃদয়-দুয়ারে ভিখারীর মতো ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন। তিনি চাহেন, মানুষ তাহার প্রেম-ভক্তি, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার কর্ম, তাহার যথাসর্বস্ব, তাঁহাকে নিঃশেষে দান করে। সেই দানের অর্থই যে তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়া। মানুষের এই সর্বস্বদান যে তাহারই জীবনের মহামূল্য রত্নস্বরূপ। এই দানই তাহাকে ভগবানের

ভালোবাসা লাভের অধিকারী করিবে—তাহাকে মহাধনীর সম্পদে ভূষিত করিবে—জীবনের প্রকৃত সার্থকতার সন্ধান দিবে।

'কৃপণ' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, তিনি ভিখারী, ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিলেন, রাজা বিচিত্র সাজে স্বর্ণ-রথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ রাজা রথ থামাইয়া ভিখারীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। ভিখারীর দেওয়ার মতো কিছুই নাই; সে লজ্জিত হইয়া তাহার ঝুলি হইতে একটা চাউলের কণা রাজাকে দিল। ভিক্ষা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া ভিখারী যখন ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী ঝুলি ঝাড়িয়া বাহির করিল, তখন দেখিল, তাহার মধ্যে একটি সোনার কণা আছে। তাই কবির আক্ষেপ,—

দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে,
তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল শূন্য করে।

ভগবানকে যথাসর্বস্ব দান করিলে, দানের অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ আমরা ফিরিয়া পাই। চরমত্যাগের দ্বারাই পরমবস্তু লাভ হয়।

(৪) ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে পাইতে হইলে, কঠিন ত্যাগের পথে, পরম দুঃখের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সোনা যেমন আগুনে পুড়িয়া খাঁটি হয়, দুঃখ ও অশান্তির আগুনে পুড়িলে আমাদের ভিতরকার সমস্ত ময়লা, অসার অংশ দূর হইয়া যায়; আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণ দীপ্তিতে প্রকাশ পাইতে পারি। তখনই আমরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভের উপযুক্ত হই। ভগবানই বজ্রহস্তে, দুঃখের মূর্তিতে আমাদের জীবনে আবির্ভূত হইয়া আমাদের সমস্ত জড়তা, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, আরাম, হীনতা দূর করিয়া তাঁহার অনুগ্রহলাভের যোগ্যতা দান করেন। ভগবানের সেই রুদ্রমূর্তিতে আমাদের জীবনে আবির্ভাব বড় বেদনাদায়ক হইতে পারে, কিন্তু তাহার ফল পরম শুভ।

'হার' কবিতায় কবি বলিতেছেন, ভগবানের সঙ্গে খেলায় হার হইলেও সেই হারই চরম হার নয়। সেই হারের মধ্য দিয়া তিনি ভগবানের নিকটবর্তী হইবেন,—

হেরে তোমায় করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,

শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে,
তার পরে কী করবে তুমি
সে-কথা কেউ ভাবতে পারে?

'চাঞ্চল্য' কবিতায় রুদ্রবেশে, ঝড়ের মূর্তিতে, কবি তাঁহার জীবনে পরমদেবতার আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন,—

আজিকে হঠাৎ কী হল রে তোর,
ভেঙে যেতে চায় বুকের পাঁজর,
অকারণে বহে নয়নের লোর,
কোথা যেতে চাস ছুটে?
কে রে সে পাগল ভাঙিল আগল,
কে দিল দুয়ার টুটে?
"জানি না তো আমি কোথা হতে নামি,
কী ঝড়ে আঘাত লেগে,
জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া
কে আসিছে কালো মেঘে।"

'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতায় কবি বলিতে চাহেন যে, সুকঠিন ত্যাগের দ্বারা আমাদের সর্বপ্রকার গর্ব চূর্ণ করিতে হইবে। রাজার দুলাল রাজপুত্রকে ভালোবাসে এক সামান্য নারী। নারী জানে, প্রেমের প্রতিদান সে পাইবে না— তবুও সে শুধু ভালোবাসিয়াই তৃপ্ত। রাজপুত্রের ভালোবাসা পাইবার গর্ব তাহার নাই। প্রিয়তমের উপেক্ষায় তাহার হৃদয় দমিবে না, সে কেবল তাহার ভালোবাসা নিবেদন করিয়াই জীবন পূর্ণ মনে করিবে। সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত প্রেমেই সে তাহার জীবনের সার্থকতা পাইবে। ত্যাগের পথে, দুঃখের পথে, আত্মবিলোপের পথে আসিবে বাঞ্ছিত প্রিয়তমের স্পর্শ।

'আগমন' কবিতাতে এই প্রিয়তম রাজার আগমন রুদ্রমূর্তিতে। তবুও তাঁহাকে দরিদ্রের ঘরে, রিক্ত-আয়োজনে অভ্যর্থনা করিতে হইবে,—পরম ত্যাগের মধ্যে, দুঃখ-বেদনার মধ্যে তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে,—

ওরে দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্য তলে
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,

ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

'দান' কবিতাতে কবি বলিতেছেন, তাঁহার পরম প্রিয়তমের যে দান তাহা দৃশ্যত সুখশান্তিবর্ধক নয়, সে যে মূর্তিমান অশান্তি। তিনি প্রিয়তমের গলার মালা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে তো সুখস্পর্শ ফুলের মালা নয়, সে যে বজ্রসম ভারী, ভীষণ তরবারি। সুদুঃসহ দুঃখের মধ্য দিয়াই ভগবানের স্পর্শলাভ করিতে হয়। তাঁহার রুদ্রমূর্তি যে সহ্য করিতে পারে, তাঁহার কল্যাণ-মূর্তির স্মিত-প্রসন্ন হাস্য সে-ই লাভ করে। কবি তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে নিজেই এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"খেয়াতে 'আগমন' বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে-মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে, শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল, তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।...

ঐ 'খেয়া'তে 'দান' বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম?...

এমন যে দান এ পেয়ে কী আর শান্তিতে থাকবার জো আছে? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।...

এমন আরো অনেক গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে—যাতে বিরাটের সেই অশান্তির সুর লেগেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথা মানতেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হ'ত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়? তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে-শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়।" (সবুজপত্র, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪, আত্মপরিচয়-পৃ ৬৪-৬৫)

কবি এখন সমস্ত ভয়-সংকোচ ত্যাগ করিয়া ভগবানের দুঃখমূর্তিকে চির-জীবনের মতো বরণ করিয়া লইবেন,—তাহাতেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে,—

দুখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।

যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় ক'রে ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে, প্রভু,
চরণ ধরি' মরিব হে—
যেমন করে দাও না দেখা
তোমারে নাহি ডরিব হে।

(দুঃখমূর্তি)

(৫) কবি ভগবানে এখন পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। বর্ষাসন্ধ্যায় ঘন-বরিষণে আকাশ ও বনবনান্তর আজ আচ্ছন্ন। আজ প্রকৃতিতে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-সংকেত আভাসিত হইতেছে। কে যেন আজ অভিসারে বাহির হইয়াছে, তাহার জন্য কোন্ বিরহিণী যুঁফুলের গন্ধে ভরা লুপ্ত তারার মালা গাঁথিয়া শয্যা রচনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। বর্ষারাত্রিই তো প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের যোগ্য সময়। তাই কবি তাঁহার প্রিয়তমের সঙ্গে নিবিড় মিলন কামনা করিতেছেন। কেবল তিনি আজ জীবন-স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গন চাহেন—আর কিছুই চাহেন না,—

আমায় অমনি খুশি করে রাখো
কিছুই না দিয়ে,
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে।
আমি আপনাকে আজ বিছিয়ে দেব
কিছুই না করি',
দু·হাত মেলে দিয়ে, তোমার
চরণ পাকড়ি।

(বর্ষাসন্ধ্যা)

কবি জীবনসন্ধ্যায় ভগবানের দয়া ও প্রেমের সর্বক্লান্তিহর শীতল জলে অবগাহন করিয়া কর্মের উত্তেজনা ও দাহ এবং সাংসারিকতার ক্লেদপঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। দিঘি যেমন ঘনকালো, শীতল জলে পূর্ণ, ভগবানও সেইরূপ অপরিসীম ও গভীর করুণা ও প্রেমে পূর্ণ। ভগবানের করুণা ও প্রেমরূপ সরোবরে তিনি আত্মনিমজ্জন করিয়া নূতন নির্মল জীবন লাভ করিয়াছেন।

শেওলা-পিছল পৈঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,

ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।
ভেসে গেলেম আপন মনে, ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন
সকল-হারা দেশে।

(দিঘি)

'বালিকা-বধূ' কবিতায় কবি তাঁহার বিরাট, মহান স্বামীর সহিত বালিকা-বধূর সমস্ত বুদ্ধিহীনতা ও সরলতা লইয়া মিলিত হইতে চাহিতেছেন। 'বালিকা-বধূ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মিস্টিক কবিতার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা। ভগবানকে স্বামী-রূপে কল্পনা করা নূতন নয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে, সুফী সম্প্রদায় ও অন্যান্য মিস্টিকদের সাহিত্যে ভগবানকে স্বামীরূপে, প্রিয়তমরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধকেরা অনুভব করেন, একমাত্র সেই অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আর জীবমাত্রেই তাঁহার প্রণয়িনী। পুরুষ কেবল সেই পুরুষোত্তম, আর জীবমাত্রেই নারী। সেই কল্পনায় পূর্ণ মাধুর্য-রসের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের পূর্ণ আত্মদান ও ভয়-সম্ভ্রমহীন প্রণয়-লীলাই উহার মূল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় প্রিয়তমের ঐশ্বর্যময় মূর্তিই বেশি ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং বাঙালী ঘরের বালিকা-বধূর মনস্তত্ত্বের ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া উহার যে প্রকাশ হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই মনোহর। বুদ্ধিহীনা বালিকা-বধূ তাহার স্বামী যে কতো বড়, তাহার কতো মহিমা, কতো শক্তি, কতো মাধুর্য, তাহা বোঝে না। কেবল বোঝে যে, সে তাহার স্বামী। একটা সংস্কারগত মমত্ববোধ স্বামীর উপর তাহার অধিকার দিয়াছে বটে, কিন্তু সে অধিকারের স্বরূপ সে বোঝে না। শিশু-সুলভ বুদ্ধিতে মনে করে, সে বুঝি তাহার খেলার সাথী মাত্র। কিন্তু স্বামী বুঝিতে পারেন যে, বালিকা-বধূর এ অবস্থা চিরদিন থাকিবে না, পূর্ণ যৌবনে সে স্বামীকে চিনিতে পারিবে। প্রণয়-লীলায় সে একদিন তাহার নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং স্বামীর গভীর প্রেম আকর্ষণ করিতে পারিবে। কবি তাঁহার বরের কাছে আজ বালিকা-বধূ আছেন, কিন্তু পরে তিনি যুবতী প্রণয়িনী হইবেন। তাঁহার বর তাহা জানেন,—

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।

সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়ন তলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি মানিবে তখন
ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে।

আজ হৃদয়-রাজার সঙ্গে মিলনে কবির প্রাণ পরিতৃপ্ত। এই মিলনে তিনি এক অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার চোখে আনন্দের অঞ্জন লাগিয়াছে—যে দিকে তাকাইতেছেন, সবই মধুময়। প্রভাতের অপর্যাপ্ত আলো যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। আজ তিনি গভীর-আনন্দিত, পরমপরিতৃপ্ত,—

আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
দেহমন মোর ফুরাল,—যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরাল,—
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়াল জীবন জুড়াল—আমার
আদি ও অন্ত জুড়াল। (মিলন)

কবি এখন সমস্ত আকাঙ্ক্ষাহীন, সরল, অনাড়ম্বর, সদানন্দময়, সংসার-কোলাহলশূন্য, রহস্যময়, 'সব-পেয়েছির দেশে'র অধিবাসী হইতে চাহিতেছেন, ভূমানন্দের মধ্যে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এই পরম সন্তোষ ও চরম শান্তিময় আধ্যাত্মিক জীবনই তাঁহার কাম্য—

নাইক পথে ঠেলাঠেলি, নাইক ঘাটে গোল,
ওরে কবি এইখানে তোর কুটিরখানি তোল্।
ধুয়ে ফেল্ রে পথের ধুলো, নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতারখানা, রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে বোস্ রে হেথায়, সারাদিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশতলে সব-পেয়েছির দেশে।

১৮

গীতাঞ্জলি

(১৩১৭)

প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র রূপ-রসভোগ ত্যাগ করিয়া কবি সকল রূপ-রসের মূল সমুদ্র-তটে পৌছিবার জন্য যে নৌকায় উঠিয়াছেন, ইহা আমরা খেয়ায় দেখিয়াছি। পরম রসময়ের ক্ষণস্পর্শ কবি অপরূপ সংকেত, ব্যঞ্জনা ও রূপকে ব্যক্ত করিয়াছেন ও তাঁহাকে আরো নিবিড়ভাবে পাইবার জন্য অধীর প্রতীক্ষা ও আকুল

আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন খেয়ার কবিতাগুলির মধ্যে। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দূরে থাকায় কল্পনা ও আবেগের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় যে মায়া-জাল রচিত হইয়াছে, তাহাতে খেয়ার কাব্যাংশ হইয়াছে অপরূপ সমৃদ্ধ। 'গীতাঞ্জলি'তে কবি সেই পরম রসময়কে পাইবার জন্য, তাঁহার পায়ে পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য আরো প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে পাইতে হইলে চিত্তের যে একমুখীনতা, যে স্বচ্ছ-সরল নির্মলতার প্রয়োজন, তাহা লাভ করিবার জন্য কবির কঠিন তপস্যার বার্তা গীতাঞ্জলির অনেক কবিতায় আছে। এগুলি একরূপ তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাস। কেমন করিয়া সকল অহংকার ত্যাগ করিয়া, দুঃখ-বেদনার দাহে হৃদয়কে পোড়াইয়া নির্মল করিয়া, বিচিত্র আত্মদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কবি পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার সেই অন্তরতম অভিজ্ঞতা-গুলি গীতাঞ্জলির অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। তাই দুইটি প্রধান ভাবধারা গীতাঞ্জলিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে,—একটি, জীবনের প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা-কার্যে, জগতের প্রতিমুহূর্তের পরিস্থিতির মধ্যে, ভগবানকে পরিপূর্ণ ও নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ, অপরটি এই অবস্থা সম্ভব করিবার জন্য চিত্তশুদ্ধির আয়োজনের কাহিনী। পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধি সহজে সম্ভব হইতেছে না বলিয়া বেদনা, নৈরাশ্য ও বিরহের আকুল কান্না এবং এই দুঃখ-বেদনার দাহ-শুদ্ধ পথে ভগবানের সহিত মিলনের প্রচেষ্টাই প্রধানত গীতাঞ্জলির বিষয়বস্তু। যে সমস্ত কবিতাতে ভগবানকে একান্ত করিয়া না-পাওয়ায় একটা সুনিবিড় বিরহ-ব্যথা ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে, অথবা ক্ষণস্পর্শের আনন্দ-শিহরণ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই কাব্যাংশে হইয়াছে উৎকৃষ্ট। কিন্তু যেখানে তাঁহার সাধনার ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে সেই কবিতাগুলি তত্ত্ব ও নীতির উষ্ণতাপে অনেকটা রসহীন হইযাছে।

খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির যুগকে রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে 'ভগবদ্-রসলীলাযুগ' বলা যায়। ভগবদুপলব্ধির বিচিত্র অনুভূতিই এ-যুগের কাব্যের মূল সুর। কাব্যের আঙ্গিক হিসাবে কবি দীর্ঘ কবিতা ছাড়িয়া গান আশ্রয় করিয়াছেন। অতি নিগূঢ়, আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশের উপযুক্ত বাহনই গান। কথার চেয়ে এখানে ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাই কার্যকরী, ছন্দের স্থূল নৃত্য অপেক্ষা সুরের অতি সূক্ষ্ম কম্পনই ভাবপ্রকাশে অধিকতর শক্তিশালী। যে অতিসূক্ষ্ম ও চঞ্চল ভাব কথা ও ছন্দের সাহায্যে ব্যক্ত করা যায় না, সুর-মূর্ছনার অনির্বচনীয় জগতে তাহা ব্যঞ্জনা-মুখর হইয়া উঠে। তাই এ-যুগের কাব্যে গানই হইয়াছে ভাবের শক্তিশালী বাহন। অনেক মরমী কবি গানকেই তাঁহাদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-প্রকাশের উপযুক্ত যন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য মিস্টিক কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই মিস্টিক কবিতা বা গানগুলির তুলনা করিলে ইহাদের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী, মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতের কবীর-দাদূ প্রভৃতি ভক্ত-কবিগণের গান, পারস্যের সুফী কবিগণের কবিতা ও ইয়োরোপীয় মিস্টিকগণের রচনার ও বাণীর সহিত ইহাদের একেবারে একজাতীয় বলিয়া গণ্য করা যায় না।

বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের বা ভক্ত-ভগবানের যে প্রেমলীলা গান করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের অজানা-অসীমের সহিত প্রেমলীলা তাহা অপেক্ষা ভিন্ন। বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণবদর্শনের সুপ্রতিষ্ঠিত লীলা-তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এই লীলাবাদের উপলব্ধিই তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সাধনা—এই সংগীত বা কাব্য-সাধনা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ। মানবীয় রসের মধ্য দিয়া তাঁহারা ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ এই মানবীয় রসকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভগবানকে প্রিয়তমরূপে উপলব্ধির পশ্চাতে তাঁহাদের একটা ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি আছে। মানব-প্রেমিক-প্রেমিকার কতকগুলি মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহারা ভক্ত-ভগবানের প্রেমলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই ভগবৎপ্রেমের পশ্চাতে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মমত বা সাধন-পদ্ধতি নাই, ইহা তাঁহার জীবনের একটা স্তর ব্যাপিয়া একটা বিশিষ্ট অনুভূতি মাত্র। তিনি সাধক নন, একটা নির্দিষ্ট মতবাদ অবলম্বন করিয়া তিনি ধর্ম-সাধনা করিতেছেন না; তিনি কবি—তাঁহার একান্ত নিজস্ব ভগবদনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার এই গানে। বৈষ্ণব ভক্তগণের ভগবান নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্যময়,—তাঁহাকে পুত্ররূপে, বন্ধুরূপে, প্রিয়তমরূপে, ভক্ত কামনা করিয়াছে ও উপভোগ করিয়াছে। ভগবান এখানে একেবারে পার্থিব পুত্র, বন্ধু, প্রিয়তম। তাহার মধ্যে ভগবদ্‌জ্ঞান বিন্দুমাত্র আসিলে সাধনায় বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া বৈষ্ণবাচার্যগণ পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে দুইটি ধারা চলিয়াছে,—একটি বাহিরের মানবীয় ধারা, অপরটি রূপকরূপে তত্ত্বের ধারা। বাহিরের কাঠামোতে মানবীয় রসের চরম অভিব্যক্তি হইলেও, উহার তত্ত্বাংশের উপর মূলত বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। মাধুর্য-সাধনার চরম প্রকাশ হিসাবে ভগবান তাঁহাদের হাতে একেবারে মানুষ-প্রেমিক। নর-নারীর আকাঙ্ক্ষা-আকুতি, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-মিলন প্রভৃতি প্রেমের বিচিত্র লীলার সঙ্গে তাঁহাদের কাব্যের স্বর্গীয় প্রেমিক-যুগলের প্রেমলীলার বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। রসের দিক হইতে, শিল্পের দিক হইতে এগুলি একেবারে মর্ত্যের মানবের প্রেম-কবিতা হইলেও একটা সুনির্দিষ্ট ধর্ম-সাধনা বা তত্ত্ব-ব্যাখ্যার পটভূমিকায় ইহাদের প্রকৃত সার্থকতা বিরাজ করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঐরূপ কোনো তত্ত্ব-সাধনার তাগিদ না থাকায়, তিনি ভগবানকে কেবলমাত্র মাধুর্যরূপে অনুভব করেন নাই, ঐশ্বর্যময় রূপেও অনুভব করিয়াছেন এবং পদাবলীর ভগবানের মতো তাঁহার ভগবানকে নিতান্ত মানবীয় ভগবানে পরিণত করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ভগবান কখনো অসীম, অনন্ত, কখনো পরম প্রিয়তম, কখনো সর্বহারা দরিদ্রদের মধ্যে তাঁহার চরণ, কখনো প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশিত হইলেও অরূপ,– সর্বদা চঞ্চল, চির-বিচিত্র, অনন্ত লীলারসরসিক। পুলক-বেদনা, হর্ষ-বিষাদ, বিরহ-মিলন প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে, ও বৈষ্ণব লীলাবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বা মিস্টিক কবিতার যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয় কাব্যের মূল প্রভেদ বর্তমান। বৈষ্ণব কবিদের ভগবান ও রবীন্দ্রনাথের ভগবান এক নন। রবীন্দ্রনাথ মূর্তি-নিরপেক্ষ, সাধন-রীতি-নিরপেক্ষ বৈষ্ণব লীলাবাদের মূল তত্ত্বটুকু কেবল গ্রহণ করিয়াছেন।

পারস্যের সুফী কবিদের কবিতাও, অনেকাংশে, বাহিরের দিক দিয়া, নিতান্ত মানবীয়-রস-লিপ্ত পার্থিব ভোগের কবিতা। সুরা, সাকী ও রমণীতে তাঁহাদের কবিতা পূর্ণ হইলেও তাহার অভ্যন্তরে রহিয়াছে রূপকরূপে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ইঙ্গিত। তত্ত্ব হিসাবে সুফী মত ও বৈষ্ণব মতের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। সুফী মতে ভগবান একমাত্র সত্য; তিনি সৌন্দর্য ও প্রেম-স্বরূপ। সৃষ্টি তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ। মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র আধারে ভগবানের সমস্ত ঐশ্বরিক অংশই বর্তমান। মানবাত্মা ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ক্রমাগত তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে। উপযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুতে ভগবানের সহিত মিলিত হয়, কিন্তু পার্থিব দেহেই মানুষ প্রেমের প্রবল শক্তিতে ভগবানের সহিত সময় সময় মিলিত হইতে পারে। সে পরম আনন্দের মহা-মাহেন্দ্রক্ষণ। পার্থিব প্রেম ভগবৎ-প্রেমের সোপান। প্রকৃত প্রেমিক ভগবানের সহিত একেবারে মিশিয়া যায়।

কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব, মত বা সাধন-প্রণালী কবি-মানসের পশ্চাতে না থাকায়, রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতায় মানবীয় প্রেমকে বিস্তৃত রূপকভাবে অবলম্বন করা হয় নাই। তাঁহার ভগবৎপ্রেমানুভূতির প্রকাশ কোনো কোনো সময় রূপক ও সাংকেতিকতার সাহায্যে প্রকাশ পাইলেও, তাহা প্রত্যক্ষ ও নিরপেক্ষ। সুফীদের মতে ভগবানের সত্তা স্থির, তিনি অচঞ্চল, প্রেমময়; আর ভক্তও সেই আনন্দময়, প্রেমময় সত্তার সহিত একেবারে মিশিয়া যাইতে পারিলেই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু ভগবানের সহিত একেবারে মিশিয়া যাওয়াই রবীন্দ্রনাথ জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি অনন্তকাল ধরিয়া ভগবানকে নব নব রূপে, নব নব রসে ভোগ করিতে চাহেন। একটা স্থির

উপলব্ধির পরম শান্তি ও সার্থকতা তাঁহার কাম্য নয়, তিনি জন্মে জন্মে, নব নব পরিস্থিতির মধ্যে নব নব রসে, ভগবানকে অনুভব করিবেন। তাঁহার ভগবান রহস্যময়, অচেনা, পথিক—নানা বর্ণের অপম্রিয়মাণ আলোকপরিধির মতো, নব নব বর্ণচ্ছটায় কবিকে মুগ্ধ ও লুব্ধ করিতে করিতে চলিয়াছেন—কবিও সেই সঙ্গে সঙ্গে নব নব রসস্রোতে প্লাবিত ও তৃপ্ত হইতে হইতে, পিছনে পিছনে চলিয়াছেন। সুতরাং ভগবানের পরিকল্পনা ও উপলব্ধিতে বৈষ্ণব ও সুফীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য বর্তমান। পারস্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী-কবি জালালুদ্দিন রুমীর একটি কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা তুলনা করিলে প্রভেদটি স্পষ্ট চোখে পড়িবে। রুমী তাঁহার অপার্থিব প্রিয়তমকে বলিতেছেন,—

With Thy sweet soul, this soul of mine
Hath mixed as Water doth with Wine.
Who can the Wine and Water part,
Or me and Thee when we combine?
Thou art become my greater self;
Small bounds no more can me confine.
Thou hast my being taken on,
And all shall not I now take on Thine?
Me thou for ever hast affirmed,
That I may ever know Thee mine.
Thy Love has pierced me through and through,
Its thrill with Bone and Nerve entwine.
I rest a Flute laid on thy lips;
A lute, I on thy breast recline,
Breathe deep in me that I may sigh;
Yet strike my strings, and tears shall shine.

('The Festival of Spring'—Hastie's translation, p. 10)

এখানে ভক্ত ভগবানের সত্তায় মিশিয়া গিয়াছে; ভক্তের ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ পার্থিব সত্তা, বৃহৎ, অসীম ও অপার্থিব সত্তার সহিত মিশিয়া, একটি বৃহৎ ও পরিপূর্ণ সত্তার সার্থকতা লাভ করিয়াছে। প্রেমের অত্যাশ্চর্য অলৌকিক শক্তিতে ক্ষুদ্র হইয়াছে বৃহৎ, সসীম অসীম, ক্ষণিক চিরন্তন। মানুষ ঈশ্বরের সত্তায়, ভক্ত ভগবানের সত্তায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই অবস্থা জগতের অধিকাংশ মিস্টিকদের কাম্য। এই মহামিলনই তাঁহাদের প্রেম-সাধনার চরম ফল—আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ পরিণতি। ইহা পার্থিব

ব্যক্তি-সত্তার মায়া নাশ হইয়া চিরতরে আত্মবিলোপ নয়, ইহা বৈদান্তিকের অভেদ জ্ঞান নয়, জলবিম্বের জলে মিশিয়া যাওয়া নয়, ইহা জ্ঞান ও কর্মের পথে কোনো অধ্যাত্ম-সাধনার নির্দিষ্ট পরিণাম নয়। প্রেম-ভক্তি ও সহজানুভূতির পথে ইহা একটা চরম অবস্থা। ইহা ক্ষুদ্র, খণ্ড জীবনের বৃহৎ ও অখণ্ড জীবনে রূপান্তরিত হওয়া মাত্র। ইহাই অনন্ত আনন্দময়, সৌন্দর্যময়, সংগীতময় জীবন। ইহা এক-প্রকারের পুনর্জন্ম। সুফী ও পূর্বভারতীয় সাধকগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার ইহাই পরম তৃপ্তি ও শান্তি। ইয়োরোপীয় মিস্টিকগণেরও এই Unitive Lifeই কামনা-সাধনার চরম ফল—আধ্যাত্মিক-জীবনের পূর্ণ পরিণতি—'the supreme summit of the inner life.' ইহাই—'the final honour for which man has been made.' এই অবস্থাতেই মানুষের 'all feeling, will and thought attain their end.' বৈষ্ণবও এই অবস্থা কামনা করিয়াছে, তবে এই মহামিলনের পরেও, সে নূতন-দিব্য-জীবনে, অপার্থিব ব্রজমণ্ডলে, ভগবানের পরিকর মণ্ডলীর চির-সহচর হইয়া, তাঁহার নিত্যলীলার মাধুরী উপভোগ করার আশা করে।

রবীন্দ্রনাথ ভগবানের সঙ্গ গভীরভাবে লাভ করিয়াছেন এবং 'একই জীবনে জন্ম-জন্মান্তর' অনুভব করিয়াছেন বটে, তবুও তাহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার চরম কামনা নয়। তাঁহার ভগবান চিরন্তন খেলায় মত্ত অগ্রগামী পথচারী, অনাদি-কাল হইতে সৃষ্টির মধ্য দিয়া লীলা করিতে করিতে চলিয়াছেন; সেই লীলার বৈশিষ্ট্য, আনন্দ ও রহস্যের বিচিত্র রূপ ও রস অনুভব করিতে করিতে অগ্রসর হওয়াই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা। এই লীলারস উপলব্ধি করিয়া ও এই লীলার তালে তাল দিয়া কবি তাঁহাকে লাভ করিতে চাহেন।

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

(গীতালি)

আমি পথিক, পথ আমার সাথী।
... ...
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে,
নূতন হ'লো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

যত আশা পথের আশা
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন উঠে মাতি।

(গীতালি)

জীবনরথের হে সারথি,
আমি নিত্যপথের পথী
পথে চলার লহ নমস্কার।

(গীতালি)

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর
যবে আমার জনম হবে ভোর।
চলে যাব নবজীবনলোকে,
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে,
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
পরব তব নবমিলনডোর,
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।

(গীতাঞ্জলি)

যাত্রী আমি ওরে।
যা-কিছু ভার যাবে সকল সরে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল-সাঁঝে পরান মম টানে
কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে।

(গীতাঞ্জলি)

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ
সেই তো বাধায় সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।

... ...

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়।
প্রেমিক সে নির্দয়।
মানে না সে বুদ্ধিশুদ্ধি বৃদ্ধজনার যুক্তি,
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি।

(বলাকা)

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।
তারে নিয়ে হ'ল না ঘর-বাঁধা,
পথে-পথেই নিত্য তারে সাধা,
এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরই জাল বোনা।

(বলাকা)

অন্যান্য মিস্টিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য থাকিলেও, প্রভেদটাও কম নয়। রবীন্দ্রনাথ মোক্ষকামী আধ্যাত্মিক সাধক নহেন, তিনি কবি, তাঁহার ভগবদনুভূতি কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। তিনি অন্যান্য মিস্টিকদের মতো কোনো ধর্ম-সাধনা বা নির্দিষ্ট উপাসনা করিতে বসেন নাই; ইহা তাঁহার এক প্রকারের রস-সাধনা, বরং ভাগবতরস-সাধনা বলা যাইতে পারে। কবীর-দাদু-মীরাবাই প্রভৃতি মধ্যযুগের উত্তর-পশ্চিম-ভারতীয় মরমীগণ ও ইয়োরোপের মধ্যযুগের মিস্টিকগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মসাধক। তাঁহারা ভক্তি ও প্রেম মার্গে ঈশ্বরোপাসনা করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম-ভারতীয় মরমীগণ গানকেই প্রধানত ধর্মসাধনার উপায় রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সব গানের অনেক ভাব ও এমন কি ভাষার সহিত রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির অনেক গানের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে উভয়ে এক বস্তু নয়। অনুভূতি উভয়পক্ষেই সমান, তবে একপক্ষ এই অনুভূতির প্রত্যেক স্তরের মধ্য দিয়া একটা নির্দিষ্ট ধর্মসাধনার স্থির লক্ষ্যে উপস্থিত হইতেছেন, অপরপক্ষ এই অনুভূতির মধ্য দিয়া ভগবানের লীলা-রহস্যের অসীম আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব করিতেছেন। একটি ধর্ম-সাধকের অনুভূতি, অপরটি কবির অনুভূতি। কবির ভগবান কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেই লীলা করিতেছেন না, প্রকৃতির মধ্যে, মানবের মধ্যে, তাহাদের সৌন্দর্যে, প্রেমে, মাধুর্যে তাঁহার লীলা চলিয়াছে, কবি সমস্ত লীলাই গভীর আনন্দ ও বিস্ময়ে অনুভব করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে এতদিন প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে ভগবানের লীলারস অনুভব করিয়াছেন, এখন এই যুগে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে সে লীলা অনুভব করিতেছেন এবং আশা-নিরাশা, পুলক-বেদনা, আনন্দ-বিস্ময়ের দোলায় আন্দোলিত হইয়া সেই লীলা উপভোগ করিতেছেন। তবুও প্রকৃতি ও মানব তাঁহার একান্ত ভগবদুপলব্ধির পটভূমিকায় একটা সূক্ষ্ম মায়ালোক সৃজন

করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির কবিতাগুলি বিশ্ব-সাহিত্যে এক অদৃষ্টপূর্ব ভাব-রসের সন্ধান দিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনগণ বা সুফী কবিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তি ও প্রেমের সাধক, কাব্যে তাঁহাদের ভাবধারা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। প্রথমত তাঁহারা সাধক, দ্বিতীয়ত তাঁহারা কবি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথমত কবি—জগৎ ও জীবনের রসসাধক, দ্বিতীয়ত ভগবৎপ্রেমিক ও অতীন্দ্রিয়রসসাধক। যে সমস্ত পাশ্চাত্য কবির মধ্যে এই ভগবৎপ্রেমের অনুভূতি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের সহিত তুলনায় রবীন্দ্রনাথ বহু উচ্চে। কল্পনার বিস্তৃতি, আবেগের গভীরতা ও ভাবের রসঘন প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চাঙ্গের কাব্যকলার নিদর্শন দিয়াছেন এই সব কবিতায়, ব্লেক্, ফ্রান্সিস্ টম্পসন্ প্রভৃতির কবিতা তাহার বহু নিম্নে। তাঁহাদের কবিতায় একটা সাধারণ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদ ও মধ্যযুগের ক্যাথলিক মিস্টিকদের ভাবের ছায়া ছাড়া আর কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্লীলারসোপলব্ধির সৌন্দর্য, মাধুর্য ও রহস্য তাহাতে নাই।

বৈষ্ণব পদাবলী, সুফীগণের কবিতা, কবীর-দাদূ প্রভৃতির গান, ইয়োরোপীয় মিস্টিক কবিগণের রচনার সহিত খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির কবিতার সাদৃশ্য ও পার্থক্যের উল্লিখিত আভাস রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য বুঝিবার পক্ষে আশা করি কিছু সাহায্য করিবে। যে অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের এই সকল কবিতার প্রেরণা যোগাইয়াছে, তাহা মূলত ভগবানের লীলাবাদের অনুভূতি। ভগবান অসীম, অনন্ত ও অনাদি হইলেও বিশ্বের মধ্যে, প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে, নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অনন্ত হইলেও অন্তের মধ্যে, অখণ্ড হইলেও খণ্ডের মধ্যে প্রেমে তিনি ধরা দিতেছেন; তাইতো অন্তের বুকের মধ্যে অনন্তের বাঁশী বাজিতেছে, সীমার মধ্যে অসীমের সুর ধ্বনিত হইতেছে। বিশ্বের নিরন্তর পরিবর্তন, ভাঙা-গড়া, প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও মানবজীবনের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, অসংখ্য কর্ম-প্রচেষ্টা সমস্তই সেই পরম লীলাময়ের রসলীলা! অসীম প্রেমে তিনি মানুষকে নিরন্তর তাঁহার দিকে টানিতেছেন, তাঁহারই প্রেমের আকর্ষণে মানুষ চলিয়াছে তাঁহারই দিকে ছুটিয়া—দুঃখ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, পতন-অভ্যুদয়ের বিচিত্র পথ বাহিয়া। অনাদি সৃষ্টির মধ্য দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে ভগবানের লীলা—মানুষও জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহারই পিছনে ঘুরিতেছে। এই অনন্ত চলার পথে কতো বিচিত্র রূপে, কতো বিচিত্র রসে, মানুষ তাঁহার স্পর্শ লাভ করিতেছে, কতো অভাবনীয় বেশে তাহাকে তিনি দেখা দিতেছেন। ক্ষণ-দর্শন-অদর্শনের মধ্য দিয়া সুখ-দুঃখ-বিচিত্র পথে মানুষ জন্মে জন্মে চলিয়াছে তাঁহারই

দিকে। ইহা মানুষের অনন্ত অভিসার-যাত্রা। এই মানুষ-ভগবানের, খণ্ড-অখণ্ডের লীলা চলিয়াছে চিরকাল। এই লীলার রহস্য ও বিস্ময় রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি এই অনন্ত অভিসার-যাত্রার আনন্দ ও রসে একেবারে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন; এই নিরন্তর পথ-চলার মধ্যেই মিলনের সার্থকতা দেখিয়াছেন। প্রকৃত মিলন অপেক্ষা মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার কাছে বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছে। এই 'পথে চলা', এই অনন্ত অন্বেষণই তাঁহার কাছে মিলন—ভগবানকে 'পাওয়া'। ইহাই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য মিস্টিক কবিতার সঙ্গে প্রভেদ।

এই পথ-চলার নেশা, ক্রমাগত অগ্রসর হইবার মোহ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-মানসের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কবির কাব্য-সৃষ্টিতে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহা তাঁহার এইরূপ মানসিকতার ফল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাব্য-সৃষ্টিতে রূপ হইতে রূপে, রস হইতে রসে যে ক্রমাগত অগ্রগমন, তাঁহার কাব্যের ঋতুতে ঋতুতে যে বেশ-বদল, তাহার কারণ তাঁহার চঞ্চল, পথিক-সুলভ, বন্ধন-বিমুখ মনোবৃত্তি। ভগবানের ভাব-পরিকল্পনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের ভগবান পরমরসিক মহাকবি ও লীলারঙ্গে মত্ত। সেই অনন্ত পুরুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি-মানুষকে লইয়া ক্রমাগত লীলা করিয়া চলিয়াছেন। তিনি রসরাজ, নটরাজ, সর্বকলাপারংগম কবি-শ্রেষ্ঠ। এই ভগবানকে পাইতে হইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী লীলাকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং এই লীলার তালে তাল দিতে হইবে। এইরূপ কলারসিকের লীলা নৈর্ব্যক্তিক, উদ্দেশ্যবিহীন, অহেতুকী এবং নিছক খেলার রসে খেলা মাত্র; এই খেলাকে উপলব্ধি করাই তাঁহাকে উপলব্ধি করা। রবীন্দ্রনাথ নব নব আনন্দ ও ব্যাকুলতার সহিত, নব নব রূপে ও রসে এই লীলাময়ের লীলা উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাই হইয়াছে তাঁহার সাধনা, ইহারই আনন্দে তাঁহার চরম সার্থকতা। এই চঞ্চল লীলাময়কে তো স্থিরভাবে ধরিবার উপায় নাই, তাঁহার লীলা দেখিতে দেখিতে তাঁহার সঙ্গে পথে চলাই রবীন্দ্রনাথের নিকট সার্থকতার চরম রূপ বলিয়া মনে হইয়াছে। খেয়া হইতে আরম্ভ করিয়া গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি ও বলাকা প্রভৃতি পরবর্তী অনেক কাব্যগ্রন্থে এই মনোভাবের একটা স্পষ্ট রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিশ্বসৃষ্টির মূল রহস্যই তো খেলার রহস্য—লীলারসপানের জন্যই তো অসীম সসীম হইয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যে তিনি লীলা করিতেছেন, মানুষের সঙ্গেও চলিয়াছে তাঁহার লীলা নানা রূপে, নানা রসে। অনন্তকাল ধরিয়া লোক-লোকান্তর, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া মানুষের সঙ্গে চলিয়াছে তাঁহার এই লীলা। ভগবান চির-পথিক, চির-অগ্রসরমান,

নিরুদ্দেশের যাত্রী। মানুষও এই চির-পথিকের সঙ্গী—এই দীর্ঘ পথের ক্ষণে ক্ষণে, বহু রসে, সে তাঁহার লীলা-স্পর্শ পাইতেছে। কখনো 'দুঃখের বেশে', কখনো শরৎ-প্রভাতে 'নয়ন-ভুলানো' রূপে, 'ঝড়ের রাতে পরানসখা বন্ধু' রূপে, কখনো 'সাপ খেলানো বাঁশী' হাতে বিদেশী রূপে; কখনো তাঁহার ঝড়ের বেশ, কখনো তাঁহার মৃত্যুর রূপ। প্রকৃতির মধ্যে কতো বিচিত্র মূর্তিতে তাঁহার আবির্ভাব—প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে এই নটরাজের কতো নৃত্যলীলা। ক্ষণে ক্ষণে এই লীলার স্পর্শ কবির পথচলাকে মধুর করিয়াছে—এই চির-পথিকের সঙ্গীরূপে পথে চলাই হইয়াছে তাঁহার সমস্ত কামনা-সাধনার চরম তৃপ্তি।

গীতাঞ্জলির মধ্যে মোটামুটি পাঁচটি ভাব-ধারার কবিতা লক্ষ্য করা যায়,—

(১) ভগবানকে সহজে না পাইবার জন্য হতাশ-ভাব ও প্রবল বিরহ-বেদনার অনুভূতি।

(২) অহংকার ত্যাগ করিয়া দুঃখ-বেদনার দাহে হৃদয়কে নির্মল করিয়া ভগবদুপলব্ধির উপযোগী করা ও তাঁহার দয়া-প্রার্থনা।

(৩) প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র রূপ-রসে ভগবানের আভাস ও ক্ষণস্পর্শের অনুভূতি।

(৪) দীন-দরিদ্রের মধ্যে, হীন অস্পৃশ্যদের মধ্যে পতিতপাবন ভগবানের অবস্থান—ধরণীর ধূলায় ভূমার আসনের অনুভূতি।

(৫) অসীম-সসীমের লীলাতত্ত্বের অনুভূতি।

গীতাঞ্জলির ১৫৭টি গানের মধ্যে প্রথম চৌদ্দটি ১৩১৩ হইতে ১৩১৫ সালের মধ্যে রচিত; অবশিষ্ট ১৪৩টি ১৩১৬ সালের আষাঢ় মাস হইতে ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাসের মধ্যে রচিত। কবির 'শারদোৎসব' নাটিকার কতকগুলি ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(১) খেয়া হইতেই কবি ভগবানকে একান্ত করিয়া পাইবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এই আকাঙ্ক্ষা গীতাঞ্জলিতে প্রবল বিরহ-বেদনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বিরহের কবিতাগুলি কাব্যরসে বিশেষ সমৃদ্ধ। বৈষ্ণব-পদাবলী ও মেঘদূতের বিরহ-কবিতার ঐতিহ্যের সৌরভে কতকগুলি কবিতা অনুবাসিত হওয়ায় আমাদের হৃদয়ের রসতন্ত্রীর উপর একটা অনির্বচনীয় অনুরণন তোলে। বর্ষায় যে অকারণ বিরহ-বেদনা আমাদের চিত্তকে উতলা করে, তাহাকেই পটভূমিকা অবলম্বন করিয়া কবির ভগবদ্-বিরহ-বেদনা উৎসারিত হইয়াছে,—

মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।
... ...
তুমি যদি না দেখা দাও
কর আমায় হেলা,
কেমন ক'রে কাটে আমার
এমন বাদল-বেলা।

(১৬নং)

গগনতলে গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি।

(১৭নং)

আজি শ্রাবণঘন গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
... ...
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে। (১৮নং)
আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
গেল রে দিন বয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে,
খুঁজে না পাই কূল ;
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে
ভিজে বনের ফুল।

আঁধার রাতে প্রহরগুলি
কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি
আজি আকুল হয়ে। (১৯নং)

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশসম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরানসখা বন্ধু হে আমার। (২০নং)

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
ভরা ভাদরে।
আকাশভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে।
... ...
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ঐ ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে। (২৭নং)

আবার, গভীর রাত্রে ব্যাকুল বেদনায় তাঁহার চিত্ত অধীর হইতেছে,—

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন
গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝংকার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি,
পাই নে দেখা তার (৩০নং)

আবার, কখনো গভীর হতাশে জীবনের ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন,—

হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয়নি সে গান গাওয়া—
আজো কেবলি সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া।

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
... ...
আজি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয়নি আমার পাওয়া। (৩৯নং)

কখনো নিজের বিরহকে বিশ্ব-চরাচরে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখিতেছেন,—

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।
... ...
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুর গলিয়া ঝরিয়া
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া
আমার হিয়ার মাঝে হে।
(২৫নং)

সমস্ত প্রাপ্তির মধ্যে পরম অপ্রাপ্তির বেদনা কবি ভুলিতে চাহেন না,—

যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমার ঘরে হয়নি আনা
সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে। (২৪নং)

(২) গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় ধারার কবিতায় কবির আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস পাওয়া যায়। অহংকার, আত্ম-প্রচার ও স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, দুঃখের আগুনে পোড়াইয়া মনকে প্রস্তুত করিয়া, কবি জীবনে পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধির উপযোগী হইতেছেন। এই শ্রেণীর কবিতার অধিকাংশই কাব্যাংশে নিকৃষ্ট। উহাদের মধ্যে নীতি ও তত্ত্বের অংশই বেশি। 'আমার মাথা নত করে দাও', 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই', 'বিপদে মোরে রক্ষা করো', 'অন্তর মম বিকসিত করো', 'ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়', 'দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও',

'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন', 'এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে', 'নামাও নামাও আমায় তোমার চরণতলে', 'মেনেছি, হার মেনেছি', 'তোমার প্রেম যে বইতে পারি', 'দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে', 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা', 'তারা তোমার নামে বাটের মাঝে মাশুল লয় যে ধরি', 'ছিন্ন করে লও হে মোরে', 'একা আমি ফিরব না আর এমন করে', ইত্যাদি বহু কবিতায় প্রকৃত কাব্যরসসৃষ্টি হয় নাই। ইহাদের মধ্যে নীতি ও তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কবির ভগবদুপলব্ধির পথে সীমার মধ্যে অসীমের লীলা উপলব্ধির পথে, যে বাধাবিঘ্ন, তাহাদিগকে দূর করা ও নিজের চিত্তকে উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য প্রকাশ করার মধ্যে উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি নাই; এই বাধাবিঘ্নে তাঁহার মনে যে বেদনাময় অনুভূতির উদ্রেক হইয়াছে, বা সেই বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া তাঁহার মনকে ভগবদ্‌মুখী করা ও ভগবানের আভাস বা স্পর্শ লাভের মধ্যে যে আনন্দময় অনুভূতি জাগিয়াছে, সেই আনন্দ-বেদনার অনুভূতি-প্রকাশের মধ্যেই প্রকৃত কাব্যরস। গীতাঞ্জলির এইরূপ কবিতাগুলিই কাব্য-সম্পদে উজ্জ্বল। অবশ্য এরূপ কবিতার সংখ্যা গীতাঞ্জলিতে অপেক্ষাকৃত কম। ইহাতে কবির সাধনার ইতিহাসই বেশি।

(৩) গীতাঞ্জলির তৃতীয় ধারার কবিতায় কবি তাঁহার পরম-দয়িতের যে ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা, যে ক্ষণস্পর্শ পাইয়াছেন, প্রকৃতির বিচিত্ররূপের মধ্যে যে আভাস তাঁহার চিত্তকে উতলা করিয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। শরৎ-প্রকৃতির আলোছায়ার লুকোচুরির মধ্যে, বরষার সঘন বাদল বরিষণে, বসন্তের দখিন সমীরণে, কবি তাঁহার প্রিয়তমের আভাস পাইতেছেন; স্বপ্নের মধ্যে তাঁহার ক্ষণস্পর্শে, প্রভাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন কবির প্রতি তাঁহার করুণ নয়নপাতে, কবিকে আনন্দ-বেদনায় অনুক্ষণ আপ্লুত করিয়াছে। কবি তাঁহার প্রিয়তমের স্পর্শে আনন্দে বিভোর হইয়া জীবনকে ধন্য মনে করিতেছেন। এই ভাবের কবিতা-গুলি গীতাঞ্জলির কাব্যোরসোচ্ছল কবিতা।

কবি শরতের শিশির-ভেজা, শিউলি-ঝরা, আলো-ছায়ার মায়াময়, লঘু, শুভ্র রূপের মধ্যে তাঁহার নয়ন-ভুলানো প্রিয়তমের আগমন-সংবাদ পাইতেছেন,—

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে

অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে। (১৩নং)

তাঁহার প্রাণের দ্বারে এক নবীন অতিথি উপস্থিত, সে অতিথিকে আজ বরণ করিয়া লইতে হইবে,—

শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়
আনন্দগান গা রে।
... ...
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখ্‌রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যা রে। (৩৮নং)

জ্যোৎস্না-প্লাবিত বসন্তযামিনীতে কবি তাঁহার প্রিয়তমের স্পর্শ পাইয়া পুলক-রোমাঞ্চিত হইতেছেন,—

আজি আম্রমুকুলসৌগন্ধ্যে,
নব- পল্লবমর্মরছন্দে,
চন্দ্রকিরণসুধাসিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রুসরস মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে। (৫৪নং)

প্রভাতে যখন কবি তন্দ্রালসভাবে শয্যায় পড়িয়া ছিলেন, তখন তাঁহার দেবতা তাঁহার গৃহ-বাতায়নের দিকে একবার তাকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, ঘুম-ভাঙার পর কবি তাহা জানিতে পারিয়া উতলা হইয়া উঠিয়াছেন,—

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণবরণ পারিজাত লয়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া মোর বাতায়ন পানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।
(৬৭নং)

রাত্রিতে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন কবির শয্যাপার্শ্বে তাঁহার প্রিয়তম আসিয়া বসিয়া-

ছিলেন, জাগিয়া উঠিয়া কবি তাঁহার দেহ-সৌরভে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এই পরম মিলন-ক্ষণ অবহেলায় নষ্ট হওয়ায় কবি অনুতপ্ত,—

সে যে পাশে এসে বসেছিল,
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।
... ...
জেগে দেখি, দখিন হাওয়া
পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়,
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগে নি। (৬১নং)

কখনো পরম-দয়িতের ক্ষণ-স্পর্শে কবির হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার চোখে ধরণী অসীম আনন্দে উজ্জ্বল, জীবন তাঁহার সার্থক,—

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন। (৪৪নং)
আলোয় আলোকময় ক'রে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা
যে দিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবই ভালো। (৪৫ নং)

(৪) রবীন্দ্রনাথের ভাগবত সাধনা সংসারবিরাগী কোনো তপস্বীর সাধনা নয়। ত্যাগ ও দুঃখ-বেদনার দাহে নিজেকে উপযোগী করিয়া একান্তে কেবল তাঁহার সাধনালব্ধ ফল উপভোগ করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে চাহেন না। এই সংসারের সর্বত্র

তাঁহার দেবতাকে অনুভব করিতে চাহেন। সেই দেবতা কোনো মন্দিরে আবদ্ধ নহেন, কোনো বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি তিনি নন। মানুষ-রচিত সমাজে যাহারা অধঃপতিত, নির্যাতিত ও হীন, যাহারা দরিদ্র, নিঃস্ব, সর্বহারা, তাহাদের মধ্যেই তাঁহার ভগবানের আসন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেবতাকে এ সংসারের সকলের মধ্যে, সকলের দেবতারূপে উপলব্ধি করিতে চহেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি কামনা কোনো দিনই করেন নাই; সংসারের সহস্র বন্ধন মাঝেই মুক্তির স্বাদ পাইতে চাহিয়াছেন। এ যুগের কবি-মানসের একান্ত সাধনাতেও তিনি বিশ্বের ভগবানকেই উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন।

যে স্বদেশে কবি তাঁহার বিশ্বদেবের প্রতিমূর্তি দেখিয়াছেন, যে স্বদেশ বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র, সেই স্বদেশ কৃত্রিম জাতিভেদের দ্বারা, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার দ্বারা মানুষকে যে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে কবি যথেষ্ট ব্যথিত হইয়াছেন। মানুষকে ঘৃণা করার প্রতিফল স্বরূপ ভগবানের হাত হইতে একদিন তাহাকে চরম শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে,—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্র রোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

(১০৮নং)

গীতাঞ্জলিতে কবি এই সর্বমানবের ভগবানকে চাহিয়াছেন। সকলের সঙ্গে তাঁহার প্রেম লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইতে কামনা করিয়াছেন,—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে,

সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো। (১৪নং)

ভগবানের চরণ জগতের দীন-দরিদ্রদের মধ্যে, রিক্তভূষণ নিঃস্বের বেশে তিনি চাষী-মজুরদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে পাইতে হইলে ধনী-মানীর সমাজে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না—রুদ্ধদ্বার মন্দিরের নিভৃত ভজন-পূজনেও তাঁহাকে মিলিবে না। যেখানে তিনি নিঃস্বের সঙ্গী হইয়া আছেন, যেখানে তিনি রৌদ্র-জলে ভিজিয়া চাষী-মজুরদের সঙ্গে কাজ করিতেছেন, সেইখানে সেই অবস্থাতেই তাঁহার সঙ্গ মিলিবে। কবি বলিতেছেন,—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে। (১০৭নং)

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রজলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার 'পরে

(৫) রবীন্দ্রনাথের অসীম ও সসীমের, মানুষ ও ভগবানের লীলাতত্ত্বের অনুভূতি সম্বন্ধে পূর্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে। মানুষের সঙ্গে ভগবানের

প্রেমলীলা চলিয়াছে অনাদিকাল হইতে। জন্মাজন্মান্তর ব্যাপিয়া, সৃষ্টির—মানব ও প্রকৃতির—সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের মধ্য দিয়া ভগবান ও মানুষের অনন্ত মিলন-অভিসারের পালা রচিত হইয়া চলিয়াছে। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। মানুষ না হইলে তাঁহার আত্মোপলব্ধি, তাঁহার অনন্ত প্রেমশক্তির আস্বাদন সম্ভব নয়। সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার একটা অবিচ্ছেদ্য প্রেম-সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। অসীম নিজেকে সসীম করিয়াছেন—পরম ভাব রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, নিজেরই আত্মোপলব্ধির জন্য—অসীম প্রেমানুভূতির জন্য; আবার সীমাও তাহার পরম সার্থকতার জন্য অনুক্ষণ অসীমের মিলন কামনা করিতেছে। এই লীলা চলিয়াছে অনাদি কাল হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া। কবি জন্মে জন্মে তাঁহার প্রিয়তমের কতো রূপ দেখিয়াছেন, কতো অমৃত-রস আস্বাদন করিয়াছেন,—

জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা, হে প্রিয়, কত গৃহ পথে
　　রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।
…　　　…　　　…
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
　　অরূপের কত রূপ দরশন।
কত যুগে যুগে, কেহ নাহি জানে,
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরানে
　　কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
　　অমৃতের কত রস বরষণ।　　　(২১নং)

এক অনির্দিষ্ট অতীত হইতে কবি জীবন-স্রোতে ভাসিয়াছেন; তখন হইতেই তিনি পরম-দয়িতের সঙ্গে মিলনের জন্য একটা অন্তর্গূঢ় গোপন আকাঙ্ক্ষা বহন করিয়া আসিতেছেন,—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
　সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে—
　সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
　　ঝরনা যেমন বাহিরে যায়,

জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি
তেমনি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়। (৬৫নং)

কবিই যে কেবল এই মিলনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহা নয়, তাঁহার দয়িতও তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অনন্ত অভিসার-যাত্রা করিয়াছেন,—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকালসাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
গেছে আমায় ডেকে। (৩৪নং)

মানুষকে—সৃষ্টিকে—ভগবানের একান্ত প্রয়োজন। তাহার মধ্য দিয়াই ভগবান তাঁহার আত্মোপলব্ধি করিতেছেন, আত্মদর্শন করিতেছেন, আত্মরস আস্বাদন করিতেছেন। কবি বলিতেছেন,—

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর,
তুমি তাই এসেছ নিচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছে এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধ'রে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাই তো তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি

ফিরছ কত মনোহরণ বেশে—
প্রভু, নিত্য আছ জাগি। (১২১নং)

মানবের সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্যে অসীম তাঁহার ব্যাকুল বাঁশি বাজাইতেছেন—, বিচিত্র বর্ণ, গন্ধ, গানে, সেই অরূপের রূপের লীলায়, মানব-জীবন হইয়া উঠিয়াছে পরম মনোহর,—

সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর। (১২০নং)

মানব-জীবনের যত কিছু ভাব, চিন্তা, অনুভূতি, কায, সবই অসীম ও অরূপের রূপ-লীলা—তাঁহার আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন চলচ্ছবি মাত্র। তাঁহার মধ্যে যাহা ভাবরূপে ছিল, যাহা আশা-আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে ছিল, তাহা মানবের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না, উত্থান পতনের মধ্য দিয়া রূপ ধরিয়া উঠিতেছে,—

তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে,—
বিশ্ব-সাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে, তোমার শোভা
এমন সুমধুর। (ঐ)

সেই রূপ লীলার জন্যই তো জীবন, ইহার মধ্যেই তো জীবনের সব সার্থকতা। মানব-জীবনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই—পরম-দয়িতের প্রেম-লীলার বাহন রূপেই তো তাহার যথার্থ সার্থকতা। তাতেই তাহার এই মরজন্মে নবজন্ম

লাভ হইবে ও সমস্ত জীবন প্রিয়তমময় হইয়া এই সৃষ্টিধারার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা পড়িবে। ইহাই মানব-জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। তাই কবি বলিতেছেন,—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
মরে গিয়ে বাঁচব আমি তবে,
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।

(১৩০নং)

কবির অসীম বিস্ময় যে, তাঁহার মধ্য দিয়াই তাঁহার দেবতা আত্মোপলব্ধি করিতেছেন, নিজের রসাস্বাদন করিতেছেন,—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি,—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

(১০১নং)

গীতাঞ্জলির এই অংশের অনুভূতির সঙ্গে বৈষ্ণবদের লীলাবাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। একথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

১৯

গীতিমাল্য

(১৩২১—শ্রাবণ)

'গীতিমাল্য'-এ রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনেকটা পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। গীতাঞ্জলিতে কবি-হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা ও বিরহের কান্না গীতিমাল্যে একটা মধুর বিরহ-বেদনায় পরিবর্তিত হইয়াছে। নিরাশা ও দুঃখের তীব্র অনুভূতি কমিয়া গিয়াছে; চোখের জলের মধ্য দিয়া একটা দূর সান্ত্বনার তটভূমি তাঁহার চোখে পড়িয়াছে। এই বেদনা একটা মণিখণ্ডের মতো তাঁহার বুকে শোভা পাইতেছে; ইহার সম্ভাবনীয়তা, বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য কবির নিকট যেন সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। এ বিরহ আর তাঁহার নিকট কোনো নিরবচ্ছিন্ন

বেদনাদায়ক অনুভূতি নয়, ইহা একটা নিশ্চিন্ত উদ্দেশ্যে মধুর দুঃখবহন মাত্র। যাঁহাকে না পাওয়ায় তিনি কাতর, তিনি তাঁহার একান্ত আপনার, এই না-ধরা-দেওয়ার মধ্যেই, এই একটু-ছুঁইয়া-পলাইয়া-যাওয়ার মধ্যেই চলিতেছে তাঁহার প্রেম-জ্ঞাপন। তিনিও যে কবির স্পর্শ পাইবার লোভে ব্যাকুল। ইহাই কবির প্রিয়তমের লীলা—এই বিরহ-বেদনার রন্ধ্রপথেই লীলার সৌন্দর্য ও রহস্যের অনুভূতি—অনাদি বিরহের পর্দার উপর সসীম-অসীমের, ভক্ত-ভগবানের প্রেমলীলার বিচিত্র অভিনয়ের চিত্র-প্রতিফলন। 'গীতিমাল্য'-এ কবি বিরহের প্রকৃত রহস্য যেন বুঝিতে পারিয়াছেন এবং "গীতালি' ও পরবর্তী রচনায় এই বিরহ-ব্যথা, মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই প্রিয়তমকে অনুভব করিয়াছেন। চাওয়াই তাঁহার পাওয়া হইয়াছে। উপলব্ধির দিকেও কবি অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন। ক্ষণ-স্পর্শের মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাঁহার প্রিয়তমের চঞ্চল প্রেমলীলা, আনন্দ-বেদনার রসস্রোতে কবির চিত্ত প্লাবিত হইয়াছে; কখনো সহজ উপলব্ধির আনন্দ ও তৃপ্তিতে জীবন ভরিয়া উঠিয়াছে—পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কবি নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়াছেন।

ভক্ত-ভগবানের প্রকৃত মাধুর্যময় লীলার অনেকখানি প্রকাশ হইয়াছে গীতিমাল্যে। কিন্তু এই প্রেমলীলায় ক্ষণ-মিলন অপেক্ষা বিরহের উৎকণ্ঠা ও মিলনের আকাঙ্ক্ষাই কবি যেন বেশি উপভোগ করিয়াছেন—'পথ-চাওয়াতেই আনন্দ' তাঁহার ব্যক্ত হইয়াছে বেশি। তাঁহার প্রিয়তম তাঁহাকে কাঁদাইতেছেন বটে, কিন্তু এ দুঃখ মহামিলনের আনন্দে একদিন মহিমান্বিত হইবে—এ ব্যথার পরম দান তিনি একদিন পাইবেন - সকল ব্যথা তাঁহার 'রঙীন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠবে'। গীতাঞ্জলিতে দুঃখ-বেদনার দাহে চিত্তকে নির্মল ও একমুখী করিয়া ভগবানের নিত্য-বিহার-ক্ষেত্র রচনা করিবার জন্য প্রচেষ্টা কবি করিয়াছেন। ক্রমেই দুঃখের পরম সার্থকতা, সত্যকার তত্ত্ব কবি উপলব্ধি করিয়াছেন। দুঃখ-বেদনার বেশে যে পরম-দয়িতের লীলা চলিয়াছে, মিলনকে তীব্র মধুর করিবার জন্যই যে ইহার মূল্য, তাহা কবি বুঝিয়াছেন। সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল লীলা-রহস্য যে বিচ্ছেদ বা বিরহ এবং নানা বেশে ও নানা রসে ক্ষণ-মিলনের আনন্দ লাভ করিলেও, চিরন্তন না-পাওয়ার বেদনাই যে প্রেমকে অপূর্ব মধুর করিতেছে, এই অনুভূতি কবি-চিত্তকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে তাঁহার প্রিয়তমের লীলা চলিয়াছে তাঁহাকে লইয়া, কতো হাসি-অশ্রু, মিলন-বিরহের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যাত্রা বহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু যাঁহাকে পাইবার জন্য কবির এত আকুলি-বিকুলি, তাঁহাকে একান্তে নিভৃতে পাইয়াও যেন তাঁহার চরম শান্তি নাই; আবার নব নব রূপে ও রসে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা, বিচিত্র বিরহ-

বেদনার অনুভূতি। প্রিয়তম কবিকে অনুক্ষণ স্পর্শ দিয়াও ধরা দিতেছেন না, এ আকাঙ্ক্ষার বেদনা ও বিরহের কান্না লইয়াই তাঁহার পথ চলিতে হইতেছে,—

ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ-আছ"র স্রোত বহে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গলে।

'গীতালি'তেও দেখি, মিলনেও কবি বেদনার সার্থকতা ভুলেন নাই। এই বিরহের বেদনাময় অনুভূতির মধ্যেই তাঁহার মিলন সার্থক হইয়াছে,—তাই তাঁহার 'মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদে বেদনায়'। এই 'বেদনার আলোকে'ই কবি তাঁহার প্রিয়তমকে নিখিল-বিশ্বে পরিব্যাপ্ত দেখিতে চাহিতেছেন। এই বেদনাই তাঁহাকে প্রিয়তমের স্পর্শ লাভ করাইতেছে,—

ব্যথা-পথের পথিক তুমি,
চরণ চলে ব্যথা চুমি,
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার
চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধরে।

এই ব্যথার পরম দান তিনি আহরণ করিয়াছেন গীতালিতে। গীতিমাল্যের মধ্যে ভক্ত-ভগবানের নিবিড় প্রেমলীলার অভিব্যক্তি থাকিলেও, একটা পরিপূর্ণ ও শেষ মিলনের মধ্যে কবি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের চরম পরিণতি খুঁজেন নাই এবং গীতালিতেও নিবিড় উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণের মধ্যে নব-চেতনার একটা সুর বাজিয়াছে। মিলনের আনন্দের সহিত, উপলব্ধির পরমতৃপ্তির সহিত, একটা অতৃপ্তি ও বেদনা কবি যেন উপভোগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই অনাদি বিরহের বেদনা বুকে ধরিয়া, নব নব রূপে, নব নব রসে, নব নব পরিস্থিতিতে, প্রিয়তমের সহিত নিত্য নূতন লীলা করাই কবির কামনা, তাই কোনো পাওয়াই তাঁহার চূড়ান্ত পাওয়া নয়, কোনো মিলনই চির-মিলন নয়। এই ভাবটি ভগবানের অনুভূতিমূলক কবিতাগুলিতে গীতাঞ্জলি হইতে আরম্ভ হইয়া গীতিমাল্যের মধ্য দিয়া ক্রম-পরিস্ফুট হইয়া চলিয়াছে। অবশ্য ইহাই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতিমূলক কবিতার বৈশিষ্ট্য। একথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

গীতিমাল্য বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত ভাবধারার কবিতাগুলি মোটামুটি লক্ষ্য করা যায়:—

(ক) সংসারের নানা কর্মের মধ্যে ও প্রকৃতির নানা রূপের মধ্যে পরম-

দয়িতের স্পর্শের ব্যাকুলতাময় অনুভূতি ও তাঁহার সহিত কবির প্রেমলীলায় আনন্দ প্রকাশ।

(খ) সহজ ও সরল উপলব্ধির বিপুল আনন্দ প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ।

(গ) কবির ব্যক্তিগত জীবনে লীলাতত্ত্বকে অনুভব করিয়া নিজের অন্তর-প্রেরণাতেই সাধনপথে অগ্রসর হওয়া।

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন,—

"গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য এই দুই নামের মধ্যেই দুই কাব্যের পার্থক্য দিব্য সূচিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলি যেন দেবতার পায়ে সসম্ভ্রমে গীতি-নিবেদন— সেখানে "দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে, বন্ধু ব'লে দুহাত ধরিনে।" গীতিমাল্য বঁধুর গলায় গীতিমাল্যের উপহার। দূরত্বের বাধা দূর হইয়া অত্যন্ত নিকট নিবিড় পরিচয়।

বঁধুর কাছে আসার বেলায়,
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য ক'রে
করবো মূল্যবান!"

(কাব্যপরিক্রমা, ১৪৪ পৃঃ)

অবশ্য একথা খুবই ঠিক যে, গীতিমাল্যের মধ্যে তত্ত্ব বা সাধনার অংশ কম এবং কবির ভগবদুপলব্ধি অনেকখানি অগ্রসর হইয়া সহজ ও সরল রস-মাধুর্যে মনোহর হইয়াছে, কিন্তু তবুও কবি তত্ত্ব বা নীতিকে একেবারে ছাড়াইতে পারেন নাই, এমন কি পরবর্তী পরিণত কাব্যগ্রন্থ 'গীতালি'তেও না। 'আমি হাল ছাড়লে তবে তুমি হাল ধরবে জানি', 'সকল দাবী ছাড়বি যখন পাওয়া সহজ হবে', 'মিথ্যা আমি কি সন্ধানে যাবো কাহার দ্বার?' 'তোমার কাছে শান্তি চাবো না', 'জীবন আমার চলছে যেমন তেমনিভাবে' ইত্যাদি কবিতা গীতাঞ্জলির তত্ত্ব ও সাধনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গীতিমাল্যের অন্যান্য কবিতা হইতে এগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট। গীতালিতেও 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে', 'দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?' 'সহজ হবি সহজ হবি, ওরে মন সহজ হবি', 'না রে তোদের ফিরতে দেবো না রে', প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা অন্যান্য অপূর্ব লীলারসানুভূতির কবিতাগুলির তুলনায় হীন-সম্পদ।

গীতিমাল্যের ১১১টি কবিতার মধ্যে ৪নং হইতে ২১নং কবিতা তাঁহার তৃতীয়বার বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে রচিত। অন্যান্যগুলি বিলাত যাইবার পথে, বিলাতে ও বিলাত হইতে ফিরিবার পথে ও দেশে আসিবার পর রচিত। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে তাঁহার বিলাত যাত্রার কথা হয় চিকিৎসার জন্য। কিন্তু নিজের

রোগ-চিকিৎসা ছাড়াও আর একটি গভীরতর উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল। তিনি ইয়োরোপের মানুষের বিচিত্র জীবন-ধারাকে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে দেখিয়া সেখানকার মানুষ সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞানলাভ করিবেন। কিন্তু যাত্রার পূর্বে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়া শিলাইদহে নিভৃত-বিশ্রামের জন্য চলিয়া যান। ১৫ই চৈত্র হইতে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত সেখানে গীতিমাল্যের আঠারোটি গান রচিত হয়। সেই সঙ্গে তিনি কয়েকটি কবিতা ও গানের ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। "ভবিষ্যতে যে অনুবাদ তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়াছিল, ঐখানেই তাহার সূত্রপাত।"

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন, এই নিরালা অবসর ভগবানকে নিবিড় ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিয়াছিল কবিকে।

"কবির কাব্যের সঙ্গে জীবন একসূত্রে গ্রথিত বলিয়া অন্য মানুষের জীবনে যে সকল ঘটনা তুচ্ছ ও নগণ্য, কবির কাছে তাহারা একটি অভূতপূর্ব অসামান্যতা লাভ করিয়া বিস্ময়কর রূপে প্রতীয়মান হয়। ...সামান্য ব্যাপারই কবির কাছে এমন একটি প্রবল ব্যাপার যে তাহা সমস্ত মনকে, সমস্ত চৈতন্যকে নাড়া দিয়া কাব্যের মধ্যে একটা অননুভূত ভাবকে জাগাইয়া তোলে এবং জীবনকেও একটা নূতন রহস্যে মণ্ডিত করিয়া দেখে। কবি ইউরোপ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা এমনি একটি অসামান্য ব্যাপার। ......কোনো কারণ না জানিয়াও তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে এ যাত্রা তাঁহার তীর্থ-যাত্রার মতো—এ যাত্রা হইতে তিনি শূন্যহাতে ফিরিবেন না। এবার মহামানবতীর্থের যে শক্তিসমুদ্রমন্থনজাত অমৃত তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিবেন, তাহাতে তাঁহার কাব্যের ও জীবনের মহা অভিষেক হইবে।

তীর্থ-যাত্রার জন্য এই ব্যাকুলতা যখন পূর্ণমাত্রায় মনকে অধিকার করিয়া আছে, তখন হঠাৎ স্নায়ুদৌর্বল্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কবির যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল। কবি শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। ষষ্ঠ হইতে ষট্‌ত্রিংশৎ (৬—৩৬) পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে কবিতা ও গানগুলি গীতিমাল্যে স্থান পাইয়াছে, তাহারা সেখানে 'আমের বোলের গন্ধে অবশ' মধুমাসে রুগ্ণ অবস্থায় রচিত। তখন কাজকর্ম, দেখাসাক্ষাৎ, সমস্তই বারণ হইয়া গিয়াছে :—

কোলাহল তো বারণ হ'লো
　　এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
　　কেবল মাত্র গানে গানে।

বাহির হইতে দেখিতে গেলে এই সামান্য ঘটনার আঘাতে এই নূতন প্রাণের আলাপের সূত্রপাত হইল।" (কাব্যপরিক্রমা, পৃঃ ১৫৯-৬০)।

(১) জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে, কবি তাঁহার প্রিয়তমকে উপলব্ধি করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত হইতেছেন। প্রতিদিনের কর্মপ্রবাহের সহিত কবির জীবন-ধারা বহিয়া চলিতেছিল। চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন-পথে জীবনের রথচক্র চিরদিনের মতো মুখর রবে অগ্রসর

হইতেছিল। কিন্তু চিরাভ্যস্ত ও চিরপরিচিত পথের বাঁকে একদিন কোন্ অজানার চপলচরণ চকিতে তাঁহার চোখে পড়িল; কবি সব ভুলিয়া গেলেন; জীবনের ক্ষতি-লাভের কর্ম-ভার পথের পাশে রহিল পড়িয়া,—

সকল-জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়ে ছিলো অজানা যে,
তাই দেখে আজ বেলা গেলো
নয়ন ভরে আসে।
পসরা মোর পাসরিলাম
রইলো পথের পাশে। (৫নং)

কবি আভাসে, ইঙ্গিতে এতদিন তাঁহার প্রিয়তমের ক্ষণস্পর্শ পাইতেছিলেন; ফুলের সুবাসে, দখিন হাওয়ায়, পাতার কাঁপনিতে তাঁহার মনে হইতেছিল যে তাঁহার প্রিয়তম অতি নিকটেই আছেন, কিন্তু আজ তাঁহাকে বিশেষভাবে দেখিলেন,—

এ কী গভীর, এ কী মধুর,
এ কী হাসি পরান-বঁধুর
এ কী নীরব চাহনি,
এ কী ঘন গহন মায়া,
এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া
নয়ন-অবগাহনি!

তাঁহার প্রার্থনা,—

আমার চির জীবনেরে
লও গো তুমি লও গো কেড়ে
একটি নিবিড় নিমেষে॥ (৯নং)

বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে কবির পরম-দয়িত সাপুড়ের বেশে বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে নৃত্যলীলায় মাতিয়াছেন। সেই সাপ-খেলানো বাঁশির সুরে চরাচর আনন্দ-শিহরণে অধীর। কবির চিত্ত-গুহার নাগিনী বাঁশির স্বরে মুগ্ধ হইয়া গভীর অন্ধকার ছাড়িয়া বাহির হইয়া নত মাথায় লুটাইয়া আছে। কবির ইচ্ছা, তিনি এই সাপুড়ে-বেশী নটরাজের আনন্দ-নাচে যোগ দিয়া ফণা দোলাইয়া নৃত্য করেন। গুহার অন্ধকারের রুদ্ধ-জীবনে আর তিনি ফিরিয়া যাইবেন না, কারণ,—

তোমার বাঁশির বশ মেনেছে,
বিশ্বনাচের রস জেনেছে,
রবে না আর ঢাকা সে॥ (১০নং)

সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রবর্তী যে নিভৃত-কুঞ্জবনে একমাত্র পরম পুরুষ আছেন, তাহার 'গোপন দুয়ার' আছে 'চরাচরের হিয়ার কাছে'। সেই 'জগৎ-জোড়া ঘরে' মাত্র দুইটি প্রাণীর স্থান—এক তিনি আর তাঁহার মুগ্ধ-ভক্ত ও প্রেমিক। এই প্রেমিক জীবন-পথিকের দীর্ঘ-যাত্রার অবসান সেইখানে। বিশাল বিশ্বের মর্মস্থলে এই দ্বৈত প্রেমলীলা উদ্‌যাপিত হইতেছে। এই পরম পুরুষকে পূর্ব হইতেই বিশিষ্ট বেশে বা আকারে জানিবার উপায় নাই, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার কোনো নির্দিষ্ট পথ-সংকেতও নাই, কেবল বিশ্বব্যাপী আভাস-ইঙ্গিতে ও প্রাণের আকুলতাতেই প্রেমিক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। প্রেমিক জীবন-পথিক জানে না তিনি কে, কেবল—

বুকের কাছে প্রাণের সেতার
গুঞ্জরি নাম কহে যে তার,
শুনেছিলাম জ্যোৎস্নারাতের স্বপনে।
অপূর্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে।

(১১ নং)

সেই নিভৃত-লোকের পথ দেখাইবার কেহ নাই—কেবল,—

শুনেছি সেই একটি বাণী
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো;
সে মন্ত্র যে প্রাণের পারে
অনাহত বীণার তারে
গভীর সুরে বাজে সকাল সাঁঝে গো।

(১১নং)

কবির সহিত চলিয়াছে তাঁহার প্রিয়তমের অপূর্ব প্রেমলীলা সংগোপনে। মনোহর লীলার বেশে সজ্জিত হইয়া তিনি আসেন কবির গৃহে। কবির স্পর্শ পাইবার জন্য তিনি লোলুপ। কত দিনে-রাতে, শীতে-বসন্তে, সুখে-দুঃখে তাঁহাদের এই মিলন ঘটিয়াছে। তাঁহাদের এই যুগল-মিলনের গোপন-কাহিনী রটিয়া গিয়াছে সারা পৃথিবীর ফুলের গন্ধে ও দখিন হাওয়ায়,—

আমার পরশ পাবে ব'লে
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ তো জানে না তা।

রইলো আকাশ অবাক্ মানি
করলো কেবল কানাকানি
বনের লতাপাতা।
মোদের দোঁহার সেই কাহিনী
ধরেছে আজ কোন্ রাগিণী
ফুলের সুগন্ধে ?
সেই মিলনের চাওয়া-পাওয়া
গেয়ে বেড়ায় দখিন হাওয়া
কতো বসন্তে ॥ (১২নং)

১৫-সংখ্যক কবিতাটি দ্বৈত লীলাতত্ত্বের অপূর্ব অনুভূতির প্রকাশে রসোচ্ছল। পরম প্রিয়তম নিজেই বিরহ-মাধুর্য উপভোগ করিবার জন্য কবিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজে আড়াল দিয়া দূরে থাকিয়া, কবির প্রাণে যে বিরহ-বেদনা জাগাইতেছেন, তাহাতে তিনি নিজেরই বিরহ নিজে উপভোগ করিতেছেন। কবির সঙ্গে যে বিরহ-মিলন, হাসি-কান্নার পর্যায়ক্রমে খেলা চলিতেছে, সে তো তাঁহারই গরজে। তিনিই কবির কাছে ধরা দিয়াছেন, আর উভয়ের হাসি-কান্নার, বিরহ-মিলনের গানে সারা বিশ্ব উঠিতেছে ঝংকৃত হইয়া চরাচর মাতিয়াছে লীলার রসে,—

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা,
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
কাটে সকল বেলা ॥

তাঁহাদের মিলনের জন্য ধরণী শ্যাম-শোভায় সজ্জিত হইয়াছে, আকাশ আলোয় ঝলমল করিতেছে, সৃষ্টির অনাদিকাল হইতে এই মিলনের আশায় তাঁহার জীবন-তরণী কোন্ নিরুদ্দেশের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

চল্‌ছে ভেসে মিলন-আশা-তরী
অনাদিস্রোত বেয়ে।
কতো কালের কুসুম ওঠে ভরি'
বরণডালি ছেয়ে।

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা ॥ (৫২নং)

তাঁহাদের মিলন না হইলে সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্য নিরর্থক, তাঁহার প্রিয়তমের আকাঙ্ক্ষারও কোনো তৃপ্তি হইবে না,—

ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলো বাকি,
সে দিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা ;
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে ॥ (৮০নং)

কিন্তু পরিপূর্ণ মিলনের চির-পরিতৃপ্তি তো কবির কাম্য নয়। তাই গীতিমাল্যে যুগল-প্রেমলীলার অপূর্ব রস উৎসারিত হইলেও, তাহা একটা শেষ চরিতার্থতায় নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। নব নব বিরহ ও মিলনের মাধুর্য উপভোগই কবি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। প্রিয়তমের সঙ্গে তাঁহার দেনা-পাওনার শেষ নিষ্পত্তি কোনো দিনই হইবে না,—

কতো জনম-মরণেতে
তোমারি ঐ চরণেতে,
আপনাকে যে দেবো তবু
বাড়বে দেনা।
আমারে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের হাটে হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চল্‌বে বেড়ে দিনে রাতে,
আপনা নিয়ে করবো যতোই
বেচা-কেনা ॥ (৮৪নং)

(২) একদিকে যেমন গীতিমাল্যে পাওয়া যায় অপরিতৃপ্তির একটা সুর, অন্যদিকে সরল উপলব্ধি, স্বচ্ছ, সহজ পরমানন্দময় অনুভূতি ও অহেতুক প্রেমের প্রকাশও পাওয়া যায় অনেক কবিতায়। ভাবের রসঘন জটিলতা ও অনুভূতির বৈচিত্র্য ক্রমেই যেন একটা স্বচ্ছ, সরল অথচ গভীর রূপ ধারণ করিয়াছে। একটা উদার, ভারমুক্ত আত্মতৃপ্তির হাওয়া কতকগুলি কবিতায় অনুপম সৌন্দর্য দান করিয়াছে।

৩১-সংখ্যক কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন যে, তিনি সারা জীবনের পসরা মাথায় করিয়া হাঁকিয়া বেড়াইতেছেন, কে তাঁহাকে কিনিয়া লইবে? রাজা বলের দ্বারা কিনিতে পারিলেন না, ধনী অর্থ দিয়া কিনিতে পারিলেন না, নারী সৌন্দর্য দিয়া কিনিতে পারিল না, শেষে সংসার-সাগরের তীরে যে-শিশু ঝিনুক লইয়া খেলা করিতেছিল, সে-ই তাঁহাকে বিনামূল্যে কিনিয়া লইল। শিশুর সারল্যের কাছে কবি আত্মসমর্পণ করিলেন। এই শিশুর মতো শুভ্র সারল্য লইয়া কবি ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং এই সহজ, সরল আত্মনিবেদনের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে গীতিমাল্যের অনেক কবিতায়। শিশুর মতো সরল, আত্মভোলা ও পরমনির্ভরশীল হইয়া কবি ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন,—

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা-গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে,
সেই সুরে মোরে বাজাও।

(৩৯নং)

প্রয়োজনহীন, উদ্দেশ্যহীন হইয়া কেবল সহজ ও সরল আনন্দে কবি ভগবানকে অনুভব করিবেন,—

বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাকবো তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে॥

(৩২নং)

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখো থুয়ে।

সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখবো কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সংগোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু। (৪৪নং)

ভগবদনুভূতির গভীর আনন্দ কয়েকটি কবিতায় চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে ভোরের বেলা অজানিতে কবি প্রিয়তমের স্পর্শ পাইয়াছেন, দেহ-মনের একটা বিরাট রূপান্তর ঘটিয়াছে,—

মনে হ'লো আকাশ যেন
কইলো কথা কানে কানে।
মনে হ'লো সকল দেহ।
পূর্ণ হ'লো গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটলো পূজার ফুলের মতো,
জীবননদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে॥

(৩৫নং)

পরিপূর্ণ অনুভূতি ও উপলব্ধিতে কবির জীবন ধন্য, এই জীবনেই তাঁহার নব-জন্ম লাভ হইয়াছে,—

এই লভিনু সঙ্গ তব
সুন্দর, হে সুন্দর॥
পুণ্য হ'লো অঙ্গ মম,
ধন্য হ'লো অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠলো ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হ'লো
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥

এই তোমারি পরশ-রাগে
চিত্ত হ'লো রঞ্জিত ;
এই তোমারি মিলন-সুধা
রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর,
জন্ম-জন্মান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর ॥

(১০২নং)

গীতিমাল্যের এই ধারার গানগুলি সম্বন্ধে অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন,—

"গানগুলি একেবারে স্বচ্ছ, ভারমুক্ত, ফুলের মতো নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত। গীতাঞ্জলির কোনো গানই এই গানগুলির মতো এমন মধুর, এমন গভীর, এমন আশ্চর্য সরল নহে।"

"কবির সৌন্দর্য-সাধনা যেমন কড়ি ও কোমল ও চিত্রাঙ্গদার ভোগপ্রদীপ্ত বর্ণ-উজ্জ্বলতায় প্রথম সূচনা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সোনার তরী-চিত্রার 'মানসসুন্দরী', 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতার বর্ণপ্রাচুর্যে ও বিলাসে বিচিত্র হইয়া অবশেষে ক্ষণিকায় বর্ণবিরল, ভোগবিরত সুগভীর স্বচ্ছতায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া ক্রমশ কবির অধ্যাত্ম-সাধনা এই গীতিমাল্যে বিচিত্রতা হইতে ঐক্যে, বেদনা হইতে মাধুর্যে, বোধপ্রাখর্য হইতে সরল উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে।" (কাব্যপরিক্রমা, ১৬৫ পৃঃ)

(৩) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনায় নিজের নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন—নিজের প্রেম ও সহানুভূতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের দেশের প্রচলিত সাধন-ভজনের মত ও পথ সম্বন্ধে তিনি সংশয়ই প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্র, গুরু বা মার্গ তাঁহাকে কোনো নির্দিষ্ট পথে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার কথা,—

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাবো কাহার দ্বার ?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার ॥
শুধাতে যাই যারি কাছে,
কথার কি আর অন্ত আছে ?
যতোই শুনি চক্ষে ততোই
লাগায় অন্ধকার ॥

(৬২নং)

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস্ নি যে
ফিরে যা রে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ করে
আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে।

(৭২ নং)

ওদের কথায় ধাঁধা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই তো সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভরে ওঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি॥

(৭৩নং)

কেউবা ওরা ঘরে ব'সে
ডাকে মোরে পুঁথির পাতায়।
কেউবা ওরা অন্ধকারে
মন্ত্র প'ড়ে মনকে মাতায়।
ডাক শুনেছি সকলখানে
সে কথা যে কেউ না মানে,
সাহস আমার বাড়িয়ে দিয়ে
পরশ তোমার বুলিয়ে দাও।
বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে
টলিয়ে দাও গো ভুলিয়ে দাও॥

(৯৭নং)

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন,—

"আমাদের দেশের অধ্যাত্ম-সাধনার যে সকল মার্গ নির্দিষ্ট আছে—সে সকল কোনো পন্থারই তিনি পন্থী নহেন। বিবেক বৈরাগ্য বা শমদমাদি সাধন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি যোগ সাধন, বৈষ্ণবের

শান্তদাস্যাদি পঞ্চরসের সাধন,—এ কোনো সাধন-প্রণালীই তাঁহার জীবনের পক্ষে উপযোগী নয়। তাঁহার পথ তাঁহার আপনার পথ—কোনো শাস্ত্র বা গুরুর দ্বারা সে পথ নির্দেশিত হয় নাই।.. রবীন্দ্রনাথের সাধন-পন্থা না এ-দেশীয় না বিদেশীয়, কোনো সাধন-পন্থার সঙ্গে মেলে না।" (কাব্যপরিক্রমা—১৮৯ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মুখবন্ধেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২০

গীতালি

(১৩২১, অগ্রহায়ণ)

১৩২১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে ৩রা কার্তিক পর্যন্ত লেখা কবিতা ও গান 'গীতালি'তে স্থান পাইয়াছে।

গীতাঞ্জলির আকুল বিরহের কান্না ও গীতিমাল্যের শান্ত মধুর বিরহ-ব্যথার পর, গীতালিতে কবি এই বেদনার একটা সার্থকতা দেখিতে পাইলেন। এই বেদনার চরম ও পরম লাভে তিনি ধন্য হইলেন। তাঁহাকে আঘাত দিয়া, কাঁদাইয়া শেষে প্রিয়তম তাঁহাকে দেখা দিলেন। এতদিনের কান্না তাঁহার সার্থক হইল। তাঁহার প্রিয়তমকে আজ তিনি ভালো করিয়া চিনিলেন। দুঃখ বেদনার তোরণ-পথেই তাঁহার জয়যাত্রা। দুঃখের রাঙা শতদলে তাঁহার পূজা, কবির ব্যথা তাঁহার প্রিয়তমের মুকুট-মণি। পূর্ণ উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণে এতদিনের জাগরণ ও কান্না সফল হইল। কবি তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনায় এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন যে, দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়াই ভগবানের আবির্ভাব ও তাঁহার উপলব্ধি, সুখ শান্তির পথে তাহা সম্ভব নয়।

গীতালিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, গীতিমাল্যের যুগল-প্রেমলীলা হইতে বিশ্বলীলার মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিবার দিকে কবি যেন বেশি আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রকৃতি ও মানুষ যেন দ্বৈত-লীলার পিছনে আবার উঁকি মারিতেছে।

গীতালিতে তিনটি প্রধান ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়,—

(১) ব্যথার মধ্য দিয়া ভগবানকে লাভ—বেদনার পরম দান গ্রহণ।

(২) পূর্ণ উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণ।

(৩) পথিক-মনোবৃত্তির প্রকাশ ও নবতর চেতনা ও রসের অন্বেষণ।

(১) দুঃখের বর্ষা যখন চারিদিকে নিবিড় হইয়া ঘনাইয়া আসিল, তখনই

কবি তাঁহার দরজায় বন্ধুর সাড়া পাইলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটিল, এতকালের কান্নার সার্থকতা মিলিল। নয়ন-জলের বন্যায় আর তাঁহার ভয় নাই, সে তাঁহাকে পারাবার উত্তীর্ণ করাইয়া দিবে। কবির বিশ্বাস, তাঁহার প্রিয়তম তাঁহার এই বেদনার প্রকৃত মূল্য দিবেন,—

বাহির ঘেরে তুমি মোরে
রাখবে না কি আড়াল ক'রে
তোমার আঁখি চাইবে না কি
আমার বেদনাতে।

(১২নং)

বেদনার আগুন তাঁহার জীবনকে নবতর দীপ্তি ও গরিমা দান করিবে, তাই তাঁহার প্রার্থনা,—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন ধন্য করো দহন দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর,
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।
... ...
ব্যথা মোর উঠবে জ্ব'লে ঊর্ধ্ব পানে।

(১৮নং)

কবি ব্যথার স্বর্গে একাকী বসিয়া আছেন, তাঁহার আশা,—

দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিলবে তবে
সুধার সুধায় ভরা।

(২২নং)

কবি দুঃসহ দুঃখের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রিয়তমকে লাভ করিবেন, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস,—

না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে?

বক্ষ আমার এমন করে
বিদীর্ণ যে করো
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমন তরো ?
এই যে আমার ব্যথার খনি
জোগাবে ঐ মুকুটমণি,—
মরণ-দুঃখে জাগাবো মোর
জীবন-বল্লভে ॥ (৩২নং)

প্রিয়তমের প্রেমের মর্ম কবি বুঝিতে পারিয়াছেন, দুঃখের প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া তিনি বাহুবন্ধনে ধরা দেন,—

সামান্য নয় তব প্রেমের দান।
বড়ো কঠিন ব্যথা এ যে
বড়ো কঠিন টান।
মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তবে মিলন-বেশে,
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
বাঁধো বাহুর ডোরে ॥ (৫৮নং)

আঘাতের দ্বারা কি করিয়া তাঁহাদের মিলন হইল, তাহাই কবি বলিতেছেন,—

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুঃখে নিলেম চিনে। (৯নং)

(২) মর্মান্তিক বিরহবেদনার পর যে মিলন আসিল, তাহা নিবিড় ও অপূর্ব আনন্দময়। তৃপ্তি ও সার্থকতায় কবির জীবন ভরিয়া উঠিল,—

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখিতারা। (১৪নং)

মালা হ'তে খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও,
ঐ মাধুরী-সরোবরের নাই যে কোথাও তল
হোথায় আমার ডুবতে দাও গো মরতে দাও।
দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
নিভৃতে আজ বন্ধু, তোমার আপন হাতের টিকা
ললাটে মোর পরতে দাও গো পরতে দাও।

(৩৪নং)

কবির 'হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে' তাঁহার প্রিয়তম যে 'নীরব শয়ন পরে' একেলা ঘুমাইয়া আছেন, গভীর প্রেম ও মধুর মিনতিতে তিনি তাঁহাকে জাগাইতেছেন মিলন-লীলার জন্য,—

মিলাবো নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাবো এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
হৃদয় পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

(৫০নং)

পরিপূর্ণ উপলব্ধির ভাব-গাম্ভীর্যে কবির হৃদয় অবনত,—এই জীবনের মধ্যে তিনি নব-জীবনের সূচনা অনুভব করিতেছেন,—

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহমন ভূমানন্দময় হবে।
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো,
এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে।

(৭১নং)

পরম নিশ্চিন্তে ও গভীর বিশ্বাসে এবার আত্মসমর্পণের পালা, প্রিয়তমের হাতে কবি নিজেকে নিঃশেষে দান করিতেছেন,—

ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে,
শেষ হ'লো মোর গান;
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলেম আনি,
ঐ হাতে মোর হাত দু'টি লও
লও গো আমার প্রাণ।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।
ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা
চুকিয়ে লও গো ভয়।
বিরোধ আমার যত আছে
সব ক'রে লও জয়।
লও গো আমার নিশীথ রাতি,
লও গো আমার ঘরের বাতি,
লও গো আমার সকল শক্তি,
সকল অভিমান।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান। (৬৭নং)

রুদ্রবেশী বিজয়ী প্রিয়তমকে কবি অভিনন্দন জানাইতেছেন। নিজের সংকীর্ণ আমিত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া কবি জীবনের প্রকৃত রূপ দেখিতে পারেন নাই; তাঁহার প্রিয়তমই কঠিন আঘাতে সে কারা-প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিয়া অপার্থিব আলোকের বন্যায় সমস্ত অন্ধকার, মালিন্য ও কালিমা দূর করিয়া দিয়াছেন ও তাঁহার জীবনের অমৃতময় সত্তার সন্ধান দিয়াছেন। কবির জীবনের অনন্ত সম্ভাবনীয়তা তাঁহার প্রিয়তমই উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন, তাই কবির কণ্ঠে তাঁহার জয়-সংগীত,—

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়। (১০১নং)

কবির অধ্যাত্ম-জীবন শেষ পরিণতি লাভ করিল। খেয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা ও প্রতীক্ষা, গীতাঞ্জলির হতাশা ও বিরহ-বেদনা, গীতিমাল্যের যুগল-প্রেমলীলা ও বিরহানুভূতি গীতালিতে পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণে সার্থকতা লাভ করিল। দেবতার মূর্ত প্রতীক স্বরূপ বিশ্ববাসীকে প্রণাম করিয়া কবি তাঁহার দেবতার চরণে শেষ পুষ্পাঞ্জলি দান করিলেন ও আরতির সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইলেন,—

এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা-দীপ মুখে,
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছো এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে ;
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিল মোর ঘরে, দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছো প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছো চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজার মোর তোমাদের সবারে প্রণাম॥ (১০৮নং)

(৩) সকল আধ্যাত্ম-সাধকের এই পরিপূর্ণ মিলনই কাম্য, সকল দুঃখ-বেদনাময় সাধনার ইহাই চরম ফল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো চরম অবস্থাতেই চিরতৃপ্ত নন। সাধনার কোনো নির্দিষ্ট শেষফল তিনি চাহেন না, কেবল নিত্য-নূতন সাধনার বেদনা-মাধুর্য, নব নব অনুভূতির বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্য তাঁহার চিত্ত লোভাতুর,—

সেই তো আমি চাই,
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয়তো খোঁজা,
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।

এমনি ক'রে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন ব্যথা। (৩৭নং)

চিরন্তন পথিকের মনোবৃত্তি তাঁহাকে কোনো সীমাতেই বাঁধিতে পারে না, তাই পূর্ণ উপলব্ধি ও আত্মসমর্পণের পরেও গীতালিতে একটা অতৃপ্তির সুর ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে। দিগন্তের মায়া তাঁহাকে হাতছানি দিতেছে—সুদূর পথ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে, অবস্থান্তরে প্রয়াণের জন্য কবি-চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে—

আমি পথিক, পথ আমার সাথী।
... ...
যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালবাসা,
পথে চলার নিত্য রসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি। (৮৩নং)

রবীন্দ্র-কবি-মানসের এই স্বভাব ও তাঁহার মিস্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে দেখিবার বিষয় এই যে, দীর্ঘ কয়েক বৎসর একটা বিশিষ্ট ভাবজগতের আবেষ্টনীর মধ্যে কাটাইবার পর কবি এখানে মোড় ফিরিলেন। খেয়া হইতেই রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন কাব্য-জগৎ একাধারে বিদায় লইয়াছে, খেয়া হইতে গীতালি পর্যন্ত কবি ধরণীর কথা ভুলিয়া, প্রকৃতি ও মানবের রূপ ও রসের জগৎ ত্যাগ করিয়া, কেবল আধ্যাত্মিক অনুভূতির জগতে, কেবল তুমি-আমির লীলার মধ্যে কাটাইয়াছিলেন। গীতালির শেষে আসিয়া কবি আবার ধরণীর দিকে তাকাইলেন। পূর্বে সৃষ্টির সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্য দিয়া কবি স্রষ্টাকে দেখিয়াছিলেন, তারপর স্রষ্টাই একান্ত হইয়া তাঁহার ভাব-কল্পনাকে গ্রাস করিয়াছিল, আবার কবি এখন সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টাকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন,—

পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো আমার গেহ।
... ...
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি॥ (৯৯নং)

আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরিণতির স্তরে কবি আবার তাঁহার পূর্ব-পরিচিত ধরণীর সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছেন—সৃষ্টির মধ্য দিয়াই স্রষ্টাকে আবার নব রূপে, নব রসে আস্বাদন করিতে চাহিতেছেন,—

আবার যদি ইচ্ছা করো
　　আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো
　　এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধূলার পরে করি খেলা,
হাসির মায়া-মৃগীর পিছে
　　ভাসি নয়ন-নীরে।
কাঁটার পথে আঁধার রাতে
　　আবার যাত্রা করি ;
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিংবা
　　আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
　　আবার ধরণীরে॥

(৮৩নং)

কিন্তু পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'বলাকা' হইতে যে অনুভূতির ধারা লক্ষ্য করা যায়, তাহা ঠিক সৃষ্টির রূপরসের মধ্যে স্রষ্টাকে অনুভব করা নয়, তাহা সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে একত্র করিয়া অনুভব। কবির কাব্য-প্রবাহ এখান হইতে ঘুরিয়া ভিন্ন পথে যাত্রা করিল।

বলাকা

(১৩২৩)

রবীন্দ্র-কবি-মানস ও রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে 'বলাকা' একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বলাকা হইতে কবির ভাব, কল্পনা ও অনুভূতি পূর্বনির্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া নূতন পথে যাত্রা করিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে ইহা একটা নূতন যুগ।

খেয়া হইতে আরম্ভ করিয়া গীতালি পর্যন্ত কবি আধ্যাত্মিক ভাব ও অনুভূতির জীবন যাপন করিয়াছেন। তুমি আমির লীলারসে তিনি এতদিন মত্ত ছিলেন। তাঁহার কাব্যের দিক্‌চক্রবালে প্রকৃতি ও মানুষ সাধারণভাবে অদৃশ্য হইয়াছিল। মাঝে মাঝে দু'একটা ক্ষীণ রেখা ভাসিয়া উঠিলেও তাহা লীলারসপুষ্টির সহায়ক রূপেই পরিগণিত হইয়াছে। গীতালির শেষের দিকে, পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধির মধ্যেও একটা নূতন সুর আমাদের কানে ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার চির-চঞ্চল পথিক-মন পুরাতন ভাব-চক্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন পরিস্থিতির জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে কবি বিস্মৃতপ্রায় ধরণীর প্রতি আবার সাগ্রহ দৃষ্টি দিতেছেন, আবার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য ও মানুষের হাসিকান্না তাঁহার মন আকৃষ্ট করিয়াছে। 'বলাকা'য় কবি তাঁহার পূর্বেকার প্রকৃতি-মানবের রূপ-রসের জগতে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু এই যে ফিরিয়া আসিলেন, ইহা একেবারে নূতনভাবে, নূতন ভাব-কল্পনার ঐশ্বর্য লইয়া, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া। মানসী হইতে ক্ষণিকা পর্যন্ত কবির যে রূপ-রসের জগৎ—প্রকৃতির মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্য প্রেমের জগৎ— সে জগৎ হইতে বলাকার জগৎ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। পূর্বের জগৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতির জগৎ, ধরণী ও মানব-জীবনের রূপ-চেতনার অকপট, প্রত্যক্ষ প্রকাশের অনাবিল রসোচ্ছল জগৎ—একান্তভাবে কাব্যের জগৎ, আর বলাকার জগৎ, প্রকৃতি ও মানবের সত্যকার গভীর রহস্য ও তাহাদের রূপরসের প্রকৃত তত্ত্বানুভূতির জগৎ— বিশেষভাবে কাব্য-দর্শনের জগৎ। সৃষ্টির প্রকৃত স্বরূপ, ভগবানের সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধে, প্রকৃতি ও মানবের পরস্পর সম্বন্ধ, এই বিশাল বিশ্বসৃষ্টিতে মানুষের হৃদয়-বৃত্তির যথার্থ মূল্য ও রূপ, কবির সহিত ভগবানের ও বিশ্ব-সৃষ্টির সম্বন্ধ, সৃষ্টির পটভূমিকায় কবির গত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের পর্যালোচন প্রভৃতির চিন্তা কবি-চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া অনুভূতির স্তরে উঠিয়া কাব্য-রূপ লাভ করিয়াছে। সৃষ্টি কবি-চিত্তে প্রত্যক্ষভাবে যে অনুভূতি জাগাইয়াছে, তাহারই প্রকাশ হইয়াছে বলাকার পূর্বের যুগে, আর সৃষ্টি কবির চিত্তে যে চিন্তা জাগাইয়াছে, সেই চিন্তা অনুভূতিতে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলাকায় ও তাহার পরবর্তী

যুগে। পূর্বে জগৎ ও জীবন এবং তাহাদের স্রষ্টা প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল কবির ভাবাবেগকে, এ যুগে উহারা প্রথমে স্পর্শ করিয়াছে তাঁর চিন্তাকে ; চিন্তা উদ্দীপিত হইয়া অনুভূতিকে করিয়াছে আলোড়িত, এই চিন্তা বা মনন দ্বারা উদ্বুদ্ধ অনুভূতির প্রকাশ হইয়াছে এ যুগের কাব্যে। এক একটি চিন্তা কবির মনে উদিত হইয়াছে আর তাহাকে ভাব, কল্পনা ও সংগীতের অতুলনীয় ঐশ্বর্যে সজ্জিত করিয়া কবি অপূর্ব সুন্দর কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। বলাকা-পূর্বযুগের কাব্যে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির সাবলীল প্রকাশ, এ যুগের কাব্যে একটা সচেতন অলংকরণের প্রচেষ্টা আছে। এক একটা বা চিন্তা, তত্ত্ব বা চিন্তার ক্রম অগ্রসর-পদ্ধতি কবি শব্দযোজনার পারিপাট্যে, বিচিত্ররূপে ছন্দের দীপ্ত-মধুর বিচিত্রতার হিল্লোলে, ভাব-কল্পনার অপরূপ বিলাসে মনোহর রূপে রূপায়িত করিয়াছেন। এই যুগে ধরণী ও মানবের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেও কবির স্বচ্ছদৃষ্টিতে সমালোচক ও দার্শনিকের অঞ্জন খানিকটা লাগিয়া গিয়াছে। শুধু রসরূপটি উদ্ঘাটনই কবির কর্ম হয় নাই, তাহার অন্তর্নিহিত সংকেত, তাহার যথার্থ স্বরূপের একটা ইঙ্গিতও কবি সেই সঙ্গে দিয়াছেন। কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের একটা ফল্গু ধারা প্রবাহিত হইয়াছে।

পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধিতে জীবনের সকল রসের বৈচিত্র্যের অবসান ও সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধান যে রবীন্দ্রনাথের নয় একথা পূর্বে আভাস দেওয়া হইয়াছে। জীবনের বহুবিচিত্র রস ও ভাবের সাধক তিনি, কোনো একটা নির্দিষ্ট রস বা ভাব-স্থিতির মধ্যে তিনি বেশি দিন আবদ্ধ থাকিতে পারেন না, ইহাও পূর্বে দেখা গিয়াছে। অপার্থিব প্রিয়তমের সঙ্গে লীলায়, একপ্রকার রসের মধ্যে তিনি বহুদিন আবদ্ধ ছিলেন, সে রসে যখন তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন আবার জগৎ ও জীবনের রসের জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে প্রিয়তমের অতীন্দ্রিয় রসলীলা তাঁহার চরিত্রে যে অতি সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ আনন্দের মীড় টানিয়াছিল, তাহার অনুরণন বিস্মৃত হওয়া তাঁহার অন্তর্গূঢ় কবিপ্রকৃতির পক্ষে সহজ নয়, অথচ এই নিশ্চল আত্মকেন্দ্রিক, জগৎ ও জীবনবিমুখ রস সাধনায় তাঁহার চরম চরিতার্থতাও আসিতে পারে না, তাই তাঁহার প্রিয়তমকে তিনি কল্পনা করিয়াছেন পথিকরূপে,—সৃষ্টির মধ্য দিয়া—জগৎ ও জীবনের মধ্য দিয়া তিনি নিরন্তর নিজের বহু বিচিত্র সত্তাকে বিকশিত করিতে করিতে চলিয়াছেন, আর তাঁহার আসঙ্গলিপ্সু প্রেমিকও তাঁহার পিছনে পিছনে পথিকরূপে ছুটিয়াছে। সেই অপার্থিব প্রিয়তম সৃষ্টি পরিব্যপ্ত করিয়াও সৃষ্টির বাহিরে আছেন। মানুষের যাহা-কিছু ভাবনা-চিন্তা- কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, তাহাদের সুদূর পরিণামরূপে

তিনি অলক্ষ্যে বর্তমান আছেন। গীতালির শেষের দিক হইতে এই অনুভূতি কবি-চিত্তে প্রবেশ করিয়াছে। বলাকায় যখন কবি আবার সৃষ্টির মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যরূপটি তাঁহার চোখে পড়িল। সৃষ্টি নিরন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে চির-পথিকবেশী ভগবানের আত্মবিকাশের গতির সঙ্গে সঙ্গে। নিরন্তর অগ্রসর হওয়া প্রকৃতি ও মানবের ধর্ম। ইহাতেই তাহাদের সার্থকতা। কোনো বিশেষ স্থান, কাল বা ভাবের মধ্যে আবদ্ধ হওয়া তাহাদের পঙ্গুতা ও ব্যর্থতাই প্রকাশ করে। গতি-চাঞ্চল্য ও চির-তারুণ্যই জীবনের ধর্ম। প্রকৃতি তাহার গতি-বেগের মধ্যে তাহার অস্তিত্বের চির-জীবন্ত রূপের পরিচয় দিতেছে। এ যুগে কবি প্রকৃতি ও মানবকে আবার ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু অতি সূক্ষ্মভাবে ভগবানকে তাহাদের পট-ভূমিকায় স্থাপন করিয়া ও উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের একটা রহস্যময় আলোকে। জগৎ ও জীবনের অত্যন্ত রূপরসভোগী কবির মধ্যে চিরকালই একটা বৈরাগ্য বা অনাসক্তির প্রচ্ছন্ন ভাব বর্তমান। তাঁহার অন্তরে চিরদিনই এক বাউল একতারা বাজাইতেছে। একটা অতৃপ্তি বা 'নেতি নেতি'র সুর তাহাকে নিত্য-নূতনের সন্ধানে চালিত করিয়াছে। প্রকৃতভাবে ভগবানের কোনো স্থির, প্রশান্ত-গম্ভীর চিরন্তন রূপের প্রকাশ নাই, প্রকৃতির কোনো নির্দিষ্ট স্থান ও কালের দ্বারা আবদ্ধ, সংহত মূর্তি নাই, মানবজীবনেরও কোনো স্থায়ী জাগতিক রূপ নাই। ভগবান চলিয়াছেন সৃষ্টির মধ্য দিয়া নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে করিতে, প্রকৃতিও সেই সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে নিরন্তর নানা গতির ঘূর্ণিপাকে, মানবজীবনও ভাব-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া বারে বারে পরিবর্তনের সম্মুখীন হইতেছে। এ যুগে ইহাই কবির অনুভূত সত্য। চলমান অবস্থাটাই সৃষ্টির প্রকৃত রূপ ও স্বধর্ম। এই গতি রোধ করিলে একটা বিকৃত অবস্থা আসিবে। তাই প্রকৃতি ও মানবজীবনে চিরদিন গতির মাহাত্ম্য ঘোষিত হইতেছে। চির-যৌবনের বাণীই জীবনের মূল বাণী। চির-পরিবর্তনের সুর তাহার চিরন্তন সুর। এই চিন্তা কবি-মানসকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং ইহাই কম-বেশি রসরূপ ধারণ করিয়াছে গীতালি-পরবর্তী-যুগের রচনায়—কাব্যে ও নাটকে। স্থবিরত্ব ও জরার বন্ধন ঘুচাইয়া, পুরাতনের অত্যাচারকে রোধ করিয়া, মৃত্যু ভয় লঙ্ঘন করিলেই নব-জীবনের চিরন্তন আনন্দধারা লাভ করা যায়, তাই বারে বারে জীবনে বসন্ত-উৎসবের প্রয়োজন। ইহাই 'ফাল্গুনী' নাটকের মর্মকথা।

'বলাকায়' কবি দেখিলেন নিরন্তর গতির মধ্যেই বিশ্বের প্রাণশক্তির প্রকৃত প্রকাশ ও যৌবনের গতি-বেগের মধ্যেই জীবনের সত্যাকার পরিচয়। মানব-

জীবনের সব-কিছুই পলাতকা—সবই বন্ধন হইতে মুক্তির জন্ম ছুটিতেছে; হাসি-অশ্রু, প্রেম-লজ্জা, ভয়-অপমান-অত্যাচারের কোনো নির্দিষ্ট স্থায়ী সত্তা নাই। জীবনের চলমান গতিবেগের মধ্যে ইহারা কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। কেবল পশ্চাতে রাখিয়া যাইতেছে ক্ষণিকের তরে একটা অসামান্যতা ও রসমাধুর্যের স্পর্শ। 'পলাতকা'য় এই ভাবেরই আভাস কবি দিয়াছেন। নানা জটিলতা ও দ্বন্দ্ব, দুঃখ-ক্ষোভ, লাভ-লোকসান জীবনপথে বার বার জড়ো হইয়া জীবনের প্রকৃত স্বরূপকে বিকৃত করিতেছে। জীবনের স্বরূপ শিশু-স্বভাবের মতো নির্মল, সরল, আত্মভোলা, দুঃখক্ষোভাতীত ও মুক্ত। ভগবান ভোলা মহেশ্বর। এই ভোলানাথ বিশ্বসৃষ্টিকে একবার ভাঙিতেছেন আর বার গড়িতেছেন—কিছুই চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতেছেন না। কেবল শিশুর মতো অহৈতুক আনন্দে ভাঙা-গড়া করিতেছেন। এই ভোলানাথ বিশ্বেশ্বরকে আমরা অনুভব করিতে পারি শিশু-স্বভাবের মধ্যে এবং চিরন্তন আত্মস্বরূপকেও উপলব্ধি করিতে পারি শিশু-স্বভাবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া। শিশু-স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যই নিত্য নূতন উদ্‌ভাবন, নব নব সৃষ্টি ও নূতন ধ্বংসের মধ্য দিয়া ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। ভোলানাথ বিশ্বেশ্বরের এ বিশ্বসৃষ্টি-রহস্যও তাই। মানবের অন্তর্নিহিত সত্তার স্বরূপও তাই। শিশু-জীবনকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করা, আত্মস্বরূপকে ও বিশ্বেশ্বরকে উপলব্ধি করার নামান্তর। ইহাই 'শিশু ভোলানাথ'-এ রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। আমাদের নিরন্তর প্রবহমাণ জীবন স্রোতকে কোনো বাঁধ দিয়া রুদ্ধ করিলেই তাহা নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। মানবসত্তার প্রকৃতি সর্বপ্রকার স্বার্থ, লোভ ও সংকীর্ণতার বাধা অতিক্রম করিয়া স্বচ্ছ মুক্ত-প্রবাহে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়া। যুবরাজ অভিজিৎ মানুষের সেই অন্তরতম সত্তার প্রতীক। ইহাই 'মুক্তধারা'র মর্মাভাস। 'পূরবী'তেও দেখি কবি মহাকালের নিকট তাঁহার উদ্দাম যৌবনের শৃঙ্খলহীন, উচ্ছল দিনগুলি ফিরিয়া চাহিতেছেন। মানব-জীবনের এই অশান্ত গতিপথে যৌবনই বার বার তাঁহাকে চিরনূতনত্বে ভূষিত করিতেছে। 'মহুয়া'তে দেখা যায় কবি পুষ্পধনুকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন। নবসৃষ্টির মূলেই প্রেম। প্রেমই মানুষের যাত্রাপথে তাহাকে অনির্বচনীয় আনন্দ ও সংগীতরসে অভিষিক্ত করে। 'বনবাণী'তে কবি মূক গাছ-পালার মধ্যে আদিপ্রাণের লীলায়িত রূপ দেখিয়াছেন, তাহার মজ্জায় মজ্জায় সুরের কাঁপন ও ছন্দের নাচন গভীরভাবে অনুভব করিয়া অন্তরে মুক্তির বাণী শুনিতে পাইয়াছেন। 'বনবাণী'র অন্য অংশে 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'য় তাঁহার প্রিয়তম দেবতার নৃত্যে পদে পদে ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টি জাগিয়া উঠিতেছে।

কবির মতে জগতে ও জীবনে নটরাজের নৃত্যলীলার রহস্য-উপলব্ধির আনন্দে সর্ববন্ধনমুক্ত হওয়া যায়। 'বনবাণী'র অন্য অংশ 'নবীন' গীতিনাট্য তো চির-নবীনতা ও যৌবনের জয়গান। 'পরিশেষ'-এও কবি মহাপথিক— নূতনজীবন, নূতন সম্ভাবনার আহ্বানে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়, তিনি প্রাণমন্ত্রের সাধক। যেখানে অফুরন্ত যৌবন, সৌন্দর্য, আনন্দ, সেইখানেই কবির স্থান। তাই দেখা যায় 'বলাকা' হইতে 'পরিশেষ' পর্যন্ত কবি একটা বিশিষ্ট ভাব-চক্রের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, জগৎ ও জীবনের সর্ববন্ধনমুক্ত, নিরন্তর অগ্রসরমাণ চিরনবীন স্বরূপের ভাব-কল্পনা-অনুভূতি কবি-মানসের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম যুগ হইতেই দেখা যায় যে একটা সচল গতি-বেগ, নব নব রূপ ও রসের সন্ধানে অগ্রগমন কবি-মানসকে কমবেশি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, কিন্তু এ যুগের পরিবর্তনের একটা বিশিষ্ট রূপ ও মূল্য আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসে।

কবি জীবনের প্রথম পর্ব ছিল প্রতিভা-উন্মেষের যুগ —অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ ও উল্লাসের যুগ। দ্বিতীয় পর্বে বিশ্ব-সৌন্দর্য-চেতনা কবিকে অভিভূত করিয়াছিল। প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র রূপ-রস, সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেম কবি-মানসকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সৌন্দর্য চেতনা এত প্রবল হইয়াছিল যে সৌন্দর্যের একটা abstract নারীমূর্তি তাঁহার সমস্ত কাব্যপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে বলিয়া তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। ক্রমে সে মূর্তি দেবতায় পরিণত হইয়া তাঁহার জীবন, তাঁহার ইহকাল, পরকাল, জন্মজন্মান্তর পর্যন্ত পরিচালিত করিল। কবির জীবনের এই দেবতা শেষে বিশ্ব-দেবতার সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। প্রথম হইতেই কবি সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমে একটা অনির্বচনীয়ত্ব ও অসীমত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং এই বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য প্রেম ও মহত্তর হৃদয়াবেগের চমৎকারিত্বের মধ্যে কবি অসীম ও অনন্ত ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন। বিশ্বের সমস্ত রূপ ও রসের অনির্বচনীয়ত্ব ও মনোহারিত্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের প্রকাশ তাঁহার অনুভূতিকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কবি জীবনের এই পর্বে বিশ্বকে—প্রকৃতি-মানুষকে—নানা রূপে ও রসে উপভোগ করিয়াছেন। এখানে বিশ্ব প্রথমে, ভগবান তাহার পশ্চাতে—বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বাতীতকে অনুভব। 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত কবি-জীবনের এই পর্ব চলিয়াছে। তারপর 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' হইতে 'গীতালি' পর্যন্ত আর এক পর্যায়। এই পর্যায়ে বিশ্বের রূপ-রসে বিশ্বেশ্বরকে অনুভব না করিয়া কবি তাঁহার নিজস্ব রূপ-রসে অনুভব করিয়াছেন। কবির ব্যক্তি-সত্তার সহিত বিশ্বেশ্বরের লীলাই এ যুগের কাব্যের প্রধান বিষয়-

বস্তু। বিশ্বের সমস্ত রূপ-রসের মূলে যে পরম সৌন্দর্যময় ও রসময়, তাঁহারই একান্ত অনুভূতির পুলক-বেদনাময় ও রহস্যময় প্রকাশ হইয়াছে এ যুগে। ইহা আর নিছক কাব্য-যুগ বা শিল্প-যুগ নয়, ইহা আধ্যাত্মিক অনুভূতির যুগ বা অতীন্দ্রিয় রস-শিল্পের যুগ। চতুর্থ পর্ব আরম্ভ হইয়াছে 'বলাকা' হইতে। এ যুগে আবার বিশ্ব কবির অনুভূতির মধ্যে আসিয়াছে, বিশ্বেশ্বর তো আছেনই, আর কবির ব্যক্তি সত্তা ইহাদের সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্ব—প্রকৃতি-মানব—ভগবান ও কবির ব্যক্তিসত্তা - এই তিনের ঘাত-প্রতিঘাত, পরস্পরের সম্বন্ধ, তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃত স্বরূপ, কবির অনুভূতি ও বোধকে গভীর ও প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছে। এই সৃষ্টির গতি ও প্রকৃতি, সৃষ্টির সহিত ভগবানের সম্বন্ধ, এই সৃষ্টিধারার মধ্যে মানবের স্থান, কবির ব্যক্তি-সত্তার স্থান, মানবের প্রকৃত স্বরূপ, তাহার গতজন্ম, ইহকাল ও পরকাল ব্যাপিয়া সৃষ্টি ও ভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ, কবির ব্যক্তিগত জীবনের গতি, তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বিগত-দিনের রূপ-রসভোগের স্মৃতি ও তাহার বৈশিষ্ট্য, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন-পথের দুইধারের নানা দৃশ্য ও পরিস্থিতির রূপ ও রসের স্মৃতি-পর্যালোচনা, মৃত্যুর স্বরূপ ও তাহার পট-ভূমিকায় কবির জীবন-পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির বিচিত্র অনুভূতি, চিন্তা, ভাব, কল্পনা কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে এ যুগের রচনায়। 'বলাকা' হইতে 'পরিশেষ' পর্যন্ত এবং, 'বীথিকা'তেও চলিয়াছে এই চতুর্থ যুগের ধারা। কমবেশি এই সব চিন্তা, ভাব, কল্পনাই তাঁহার শেষ-জীবনের কাব্যে নূতন ভঙ্গীতে, নূতন সুরে রূপ লাভ করিয়াছে।

এই 'বলাকা-পরিশেষে বীথিকা' যুগের কাব্য ও 'সোনারতরী-ক্ষণিকা' যুগের কাব্য যে একজাতীয় নয়, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এ যুগের কাব্যে ঐশ্বর্যের একটা অপরূপ দীপ্তি আছে। ছন্দের বৈচিত্র্য, অপূর্ব শব্দচয়ন, অজস্র অলংকার-প্রয়োগ, কল্পনার অভিনবত্ব, বিশ্বের রহস্য-চিন্তা, আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধিকে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। এসব কাব্য একাধারে রসজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির পরিণত মনের উপভোগের সামগ্রী।

দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে নূতন মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব তাঁহার নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় (১২৯৮, অগ্রহায়ণ) 'সাধনা' পত্রিকা বাহির হইলে তিনিই প্রধান লেখক হইলেন। ছোট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ-রচনার জোয়ার আসিয়াছিল তাঁহার জীবনে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট সম্পদ এই পত্রিকার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইলে (১৩০৮, বৈশাখ) তিনি তাহার সম্পাদক হইলেন এবং বলিলেন, "...সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে

বর্তমান বঙ্গ-চিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা।” ভারতের নানা ভেদ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার মূল ‘ঐক্য আছে—সে ঐক্য ভারতের প্রাচীন আদর্শের মধ্যে—উপনিষদের সমাজব্যবস্থা ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে। অনেক স্মরণীয় রাজনৈতিক এ সামাজিক প্রবন্ধ, ‘নৈবেদ্যে’র অনেকগুলি কবিতা, ‘খেয়া’র কয়েকটি কবিতা ও বিশেষ করিয়া তাঁহার উপন্যাস ‘চোখের বালি’ ও ‘নৌকাডুবি’ প্রকাশিত হয় ‘বঙ্গদর্শনে’। তারপর সুরসিক সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ‘সবুজপত্র’ নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় (১৩২১, বৈশাখ)। ইহা ছিল সংবাদ ও আলোচনাবর্জিত, চিত্রহীন, বিজ্ঞাপনহীন, নিছক সাহিত্যবিষয়ক পত্র। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণাতেই মনে হয় এই পত্রিকার সৃষ্টি; তিনিই ছিলেন উহার একেবারে একমাত্র না হইলেও প্রধানতম লেখক। এই পত্রিকা উপলক্ষ্য করিয়া কবির নব-সৃষ্টির জোয়ার আসিল। ‘বলাকা’র কবিতা, গান, ‘হালদার গোষ্ঠী,’ ‘হৈমন্তী’, ‘বোষ্টমী’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘ভাইফোঁটা’, ‘শেষের রাত্রি’, ‘অপরিচিতা,’ ‘পয়লা নম্বর’ প্রভৃতি মনন-ক্রিয়া-প্রধান নবপর্যায়ের গল্পগুলি, ‘চতুরঙ্গ’, ‘ঘরে বাইরে’ প্রভৃতি নূতন ধরনের উপন্যাস, ‘ফাল্গুনী’ নাটক, এবং ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে বহু বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘সবুজ পত্রে’র মধ্য দিয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। এই ‘সবুজ পত্রে’র যুগে কবি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া, নূতন পরিপ্রেক্ষিতে, সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কবির ভাব-জীবনে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহার প্রকাশ হইয়াছে এ যুগের রচনায়।

কবি অন্তর্জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখিলেন যে, দেশের জীবনে, সমাজে, ধর্মে, চিন্তাধারায় একটা জড়ত্ব, স্থবিরত্ব ও নানা জঞ্জাল জড়ো হইয়া জীবনের মুক্ত প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এ সব বাধা-বন্ধন দূর না হইলে জীবনের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যাইবে না। তাই তাঁহার নব-জীবনের বাণী, নব-সৃষ্টির সংগীত চারিদিকে ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন। বাঙালী জাতির মনে একটা প্রবল নাড়া দিয়া তাহাকে আত্ম-সচেতন করিবার ইচ্ছা তাঁহার এই পত্রিকা-প্রকাশের মধ্যে ছিল। এই ‘সবুজ পত্র’কে তাঁহার নব ভাবধারার এক প্রকার প্রচার-পত্র হিসাবে গণ্য করা যায়। মুখ-পত্রে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—

“আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্রমণ্ডিত নবশাখার উপর অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙালিজাতির সবচেয়ে যা বড় অভাব তা কতকটা দূর করতে পারব। আমরা যে আমাদের সে-অভাব সম্যক উপলব্ধি করতে পারি নি, তার প্রমাণ এই যে আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য ব’লে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা ব’লে, আলস্যকে ঔদাস্য ব’লে, শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ ব’লে, উপবাসকে উৎসব ব’লে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় ব’লে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও

স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্ম-প্রসাদের জন্ত। আত্মপ্রবঞ্চনার মতো আত্মঘাতী জিনিস আর নাই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে না, কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।

বাঙালার মন যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে।" সবুজপত্র, বৈশাখ, ১৩২১।

প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে বলিলেন,—

"...সমাজে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ বাঁধি-বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে...আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি পদে পদে কেবলি বাধা। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় খাঁচাটাকে ভাঙ, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটোকে অসাড় করিয়া দিল ; নয় বলিতে হয় ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে, কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন, অতএব এই খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখা-ঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ।...এমন করিয়া দেশের নবযৌবনকে সমাজের কর্তারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তারুণ্যের জয় হউক! তাহার পায়ের তলায় জঞ্জাল মরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হোক, তাহার অবিবেচনার উদ্দাম বেগে অসাধ্য সাধন হইতে থাক।"

এই প্রথম সংখ্যাতেই তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'সবুজের অভিযান' বাহির হইল। তিনি 'কাঁচা', 'অবুঝ', 'সবুজ', 'দুরন্ত', 'জীবন্ত', 'অশান্ত', 'প্রচণ্ড', 'প্রমত্ত', 'প্রমুক্ত', 'চিরজীবী', 'অমর' নবীনকে চিরপ্রচলিত অন্ধ-কুসংস্কারের খাঁচা ভাঙিবার জন্ত ও 'শিকল-দেবীর পূজাবেদী' ভূমিসাৎ করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক প্রবল শক্তিশালী নূতন সুর ধ্বনিত হইল। সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসেও উহা এক প্রবল শক্তিশালী নূতন সুর বলিয়া পাঠক-মহলে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

এই নূতন সুর 'বলাকা'র সুর। প্রকৃতির মধ্যে একটা অশ্রান্ত গতি-বেগ বর্তমান। এই চলমান গতি-প্রবাহের মধ্যেই মানবজীবনেরও চরম সত্যরূপ নিহিত। ইহাদের যিনি অধীশ্বর তিনিও ইহাদের মধ্য দিয়া লীলারসে মত্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। পরিবর্তন ও অগ্রগমনই সৃষ্টির সত্য-রূপ। এই পরিবর্তনে বাধা দিলে জড়ত্ব ও পঙ্গুতায় মৃত্যু আসিবে। পরিবর্তন ও নিত্য-নূতনকে বরণ করাই জীবনের অস্তিত্বের পরিচয়। 'বলাকা'য় কবির এই নবলব্ধ ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে।

বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে মোটামুটি এই কয়টি ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়,—

(ক) নিখিল বিশ্বের মধ্যে অবিরাম গতিবেগের অনুভূতি।

(খ) মানবজীবনে গতির অনুভূতি ও গতির প্রতীক যৌবনের জয়গান।

(গ) ভগবানের লীলা-রহস্যের অনুভূতি।

(ক) কবি অনুভব করিয়াছেন, সৃষ্টির মধ্য দিয়া নিরন্তর পরিবর্তনের একটা স্রোত চলিয়াছে। বিশ্বের কোন-কিছুই স্থির হইয়া নাই। প্রতি মুহূর্তে তাহার রূপান্তর ঘটিতেছে। প্রত্যেক বস্তুর একটা গতি আছে, গতিই তাহার সত-রূপ। অনন্ত কাল অস্থির প্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছে বিশ্বের সৃষ্টিধারাকে সঙ্গে করিয়া। সৃষ্টি-ধ্বংস, জন্ম-মৃত্যু, জন্ম-জন্মান্তরের রূপ-রূপান্তবের মধ্য দিয়া এই গতি-স্রোত নিরন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহাই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত কারের রূপ। এই তত্ত্ব কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ভাবাবেগের মধ্য দিয়া অপূর্ব কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে 'চঞ্চলা', 'বলাকা', 'ছবি, 'শা-জাহান' প্রভৃতি কবিতায়।

'চঞ্চলা' কবিতায় কবি বলিতেছেন,—

(অনন্ত কাল-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক বিশাল সৃষ্টির স্রোত বাহয়া চলিয়াছে। এই স্রোতের আবর্তমুখে কতো শত সৌর-জগৎ, কতো শত সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্র, একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। সীমাহীন মহাব্যোমে কতো শত জ্যোতিঃপুঞ্জের একবার উদয় হইতেছে, আবার বিলয় হইতেছে। জগতের বুকে কতো শত দেশ, কতো রাজ্য, রাজধানী, জাতি, শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির উদ্ভব হইতেছে আবার অন্তর্ধান হইতেছে। সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া এই প্রবাহ অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে।)

এই নিরন্তর প্রবহমান, চির-পরিবর্তনময় কাল-প্রবাহকে কবি নদী বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। নদীর স্রোতোবেগ যেমন বাহির হইতে দেখা যায় না, কেবল বুঝা যায় ভাসিয়া-যাওয়া ফেনাপুঞ্জের গতি দেখিয়া, সেইরূপ বিবাট কাল নদীর অবিরাম ধারাকে আমরা বুঝিতে পারি, বিশ্বের বস্তুপুঞ্জ—গ্রহ-নক্ষত্র, মৃত্তিকা-পর্বত-সাগরের গতি দেখিয়া। এই অন্ধকারময় কালস্রোত হইতে আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাপুঞ্জের রূপ ধারণ করিতেছে, আবার স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে এই চন্দ্র-সূর্য-তারকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় বুদ্বুদের মতো নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। এই অবয়বহীন, রূপহীন স্রোতের বেগে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এই ভয়ংকর, নির্মম, অনাসক্ত, অনন্ত সুদূরের উদ্দেশে ধাবমান গতি-প্রবাহ, রূপ-রূপান্তর, সৃষ্টি-ধ্বংস, জন্ম-মৃত্যু, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা, এক পরিবর্তন হইতে অন্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোনো অবস্থার দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, কাহারো দিকে তাকাইবার

অবসর নাই। অন্তহীন দূরের প্রেমে মত্ত হইয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে কেবল সম্মুখের পানে।

এই গতিকে—এই নিরন্তর চলাকে কবি ভৈরবী, বৈরাগিণী, অনন্ত অভিসারিকা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এই অভিসার-যাত্রায় বেগে, ঘন আন্দোলনে তাহার বুকের হার ছিঁড়িয়া অসংখ্য নক্ষত্ররূপ মণি আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এলো চুলে আকাশ হইয়াছে অন্ধকার, কানের দুল বিদ্যুৎ-চমকে অসীম শূন্যকে দিতেছে সচকিত করিয়া। এই নৃত্যোন্মত্তা অভিসার-যাত্রীণীর কম্পিত অঞ্চল ধরণীর বন-বনান্তরে, বৃক্ষ-লতা-পল্লব-পুঞ্জে লুটিতেছে, হাতের ঋতুর সাজি হইতে বারবার জুঁই-চাঁপা-বকুল-পারুল তাহার চলার পথে ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার দুঃখ নাই, শোক নাই, কেবল চলার আনন্দে আত্মহারা হইয়া উদ্দামবেগে ছুটিতেছে। স্বর্গ-মর্ত্যের নানা সৃষ্টি-ধ্বংসের মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহার অভিসার। যখনই কোনো সৃষ্টির পরিপূর্ণতা আসে, তখনই ধ্বংস আসিয়া উপস্থিত হয়। ধ্বংসের পরে আবার হয় নূতন সৃষ্টি। তাই অভিসারিকার পাদস্পর্শে বিশ্ব সর্বদা নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র থাকে। কোনো আবর্জনা, বস্তুস্তূপ ও জঞ্জাল চিরতরে জড়ো হইতে পারে না। পলে পলে ধ্বংসের পর নবজীবনের পত্তন হয়।

এই নটীর নৃত্যগীত যদি একটি মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়, তবে বস্তুর পর্বতে সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ হইয়া উঠিবে। সমস্ত অচল স্থিতিতে পরিণত হইবে। নানা আকারের পুঞ্জীভূত স্তূপে অকোশ-বাতাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই পুঞ্জীভূত অচল স্থিতিতে নূতন সৃষ্টির অবসর—নবতম রূপের বিকাশের সম্ভাবনা আর থাকিবে না। এই চঞ্চল নটীর নৃত্যস্রোতে, ধ্বংস-মৃত্যুর অবগাহনে, বিশ্ব শুচি-স্নাত হইয়া, নূতন প্রাণ ও রূপ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে।

সৃষ্টির এই নিরবচ্ছিন্ন গতি, এই 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা' কবির চিন্তা ও ভাবাবেগকে গভীর ভাবে উত্তেজিত করিয়াছে। এই সৃষ্টির গতিবেগের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। এই গতির সঙ্গে সঙ্গে কতো জন্ম-জন্মান্তর, কতো রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রাণের যাত্রা,—

নাড়িতে নাড়িতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

জন্ম-জন্মের সমস্ত সঞ্চয়—ধন, মান, খ্যাতি—সব নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া আসিয়াছেন—

নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।

ইহজন্মেও কবি তাঁহার এতদিনের সমস্ত সঞ্চয়, তাঁহার ভাব-সাধনা, তাঁহার সমস্ত উপার্জন, এই কূলে রাখিয়া এই মহাস্রোতে ভাসিয়া যাইবেন,—

ওরে দেখ্, সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থর থর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,
তাকাসনে ফিরে!
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে অকূল আলোতে।

সৃষ্টির এই গতি-তত্ত্ব, বিশ্বজগতের মধ্যে এই চিরন্তন বেগের রহস্য 'বলাকা' কবিতায় অতি সুন্দরভাবে রূপলাভ কারযাছে। এই কবিতাটি হইতেই সমগ্র গ্রন্থের নাম হইয়াছে বলাকা। ইহার মধ্যে বলাকার মূল সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

কবি ছিলেন তখন কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে ঝিলম নদীর উপর হাউস-বোটে। সন্ধ্যায় বোটের ছাদে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। কবি কল্পনা করিতেছেন, যেন দিনের আলোতে ভাঁটা পড়িয়াছে, রাত্রি তাহার কালো জলের জোয়ার লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। আকাশের অসংখ্য তারা কালো জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। মনে হইতেছের রাত্রির জোয়ারের প্লাবনে তারকাগুলি ফুলের মতো ভাসিয়া আসিয়াছে। অন্ধকার, পর্বতের পাদদেশে সারি সারি দেবদারু গাছ দাঁড়াইয়া আছে। সমস্ত প্রকৃতি—সেই-জল-স্থল-আকাশ—যেন স্বপ্নাবিষ্ট; এই অবস্থায় তাহার গোপন মর্মের কথা

সে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহা সুস্পষ্ট বাণীরূপ লাভ করিতেছে না। সেই অব্যক্ত বাণী চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রকাশের ব্যর্থতায় গুমরিয়া মরিতেছে।

সেই সময় হঠাৎ এক ঝাঁক হাঁস কোথা হইতে আসিয়া মাথার উপর দিয়া সশব্দে দূর-দূরান্তরে উড়িয়া গেল—মনে হইল, হংস-বলাকার পাখার শব্দ নিস্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকার-আকাশের বুকে বিদ্যুৎ-ছটার মতো রেখা আঁকিয়া গেল। ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটা উল্লাস ও মত্ততা আছে, হংস-বলাকার পাখার গতির মধ্যে সেই তেজ ও উন্মত্ততা নিহিত আছে। পাখার গতির শব্দে মনে হইল যেন উল্লাসের অট্টহাসিতে একটা বিস্ময়ের ঢেউ আকাশের উপর দিয়া তরঙ্গিত হইয়া চলিয়া গেল। অরণ্য-পর্বত-নদীতে—জলে-স্থলে—নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। সেই নিস্তব্ধতা যেন নীরবে ধ্যানমগ্ন ছিল। হংস-বলাকার পক্ষধ্বনি—উচ্চহাস্যময়ী অপ্সরার মত সেই ধ্যানমগ্ন নিস্তব্ধতার তপস্যা ভঙ্গ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। এই অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তিমির-মগ্ন পর্বতশ্রেণী ও দেওদারবন যেন শিহরিয়া উঠিল।

কবির চিন্তা ও ভাব প্রবলবেগে আলোড়িত হইয়া উঠিল। চারিদিকের স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ একটা গতির আবেগ লক্ষ্য করাতে কবি মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, যেন পাখার গতির শব্দে নিশ্চল প্রকৃতি অন্তরে অন্তরে একটা প্রবল গতির আবেগ অনুভব করিতেছে। অচল পর্বত যেন কালবৈশাখীর ঝড়-তাড়িত মেঘের মতো নিরুদ্দিষ্টভাবে দূর-দূরান্তরে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে। তরুশ্রেণীও যেন বলাকার মতো পাখা মেলিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে। সেই স্তব্ধ অন্ধকারে, স্বপ্নাচ্ছন্ন বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মধ্যে, সুদূরের জন্য অব্যক্ত বেদনার ঢেউ জাগিয়াছে। হংস-বলাকার পাখার চাঞ্চল্য ও গতিশীলতার বাণী যেন বিশ্বের প্রাণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশেহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

হংস-বলাকার পাখার চঞ্চল গতি-বেগ কবির কাছে সেই রাত্রে বিশ্বের মর্ম-বাণীটি উদ্ঘাটন করিয়া দিল। সেই স্তব্ধতার আবরণ উন্মোচিত হইল। কবি জল-স্থল-শূন্যে কেবল পাখার উদ্দাম, চঞ্চল শব্দ শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—সমস্ত চরাচর ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। তৃণপুঞ্জ মাটির উপর গজাইয়া উঠিতেছে, বড়ো হইতেছে, কিন্তু তাহারা যেন উড়িয়া যাইবার জন্য মাটির আকাশে ডানা ঝাপটাইতেছে। মাটির নিচে লক্ষ লক্ষ বীজ তাহাদের অঙ্কুরের পাখা মেলিয়া উড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। পর্বত, বন, উন্মুক্ত ডানায় দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরের অজানার উদ্দেশে উড়িয়া চলিয়াছে, নক্ষত্রের দল অজানাকে না পাওয়ায়, কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধকারকে চমকিত করিয়া অজানার উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। বস্তু-বিশ্বের এই নিরন্তর প্রবাহই কেবল কবির মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিল না, মানুষের ভাব-চিন্তা-বাণীও যুগ হইতে যুগান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল,—

শুনিলাম মানবের কতো বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব মানবের মধ্যে রূপ ও ভাবের নিরন্তর পরিবর্তন ও অগ্রগমন কবির চোখে একটা বিশিষ্ট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইল।

কোনো আত্মীয়ের গৃহে মৃত পত্নীর ছবি দেখিয়া কবি যে-ভাব-চিন্তা ও আবেগের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন 'ছবি' কবিতায়। কবির পত্নী আজ অচল ছবিতে পর্যবসিত হইয়াছেন, কিন্তু জীবিতকালে তিনি সংসার-যাত্রার পথিকদের সঙ্গেই জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। বিশ্বছন্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহার প্রাণ চলার পথে নব নব ছন্দে লীলায়িত হইয়াছে। কবির জীবনে তিনি কতো সত্য ছিলেন! তাঁহার মাধুর্যের মধ্য দিয়াই কবি বিশ্বকে সুন্দর ও রসময় দেখিয়াছিলেন, বিশ্বের আনন্দের বার্তাকে তিনিই মূর্তিমতী বাণীরূপে কবির কাছে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন।

দুইজনে একসঙ্গে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুতে কবি-পত্নীর যাত্রা থামিয়া গেল। কবি একাই জীবন-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতি-মুহূর্তে নানা পরিবর্তন, ধ্বংস-সৃষ্টির মধ্য দিয়া অজানার উদ্দেশে চলিয়াছে তাঁহার যাত্রা। কিন্তু পত্নী চিরদিনের মতো থামিয়া নিশ্চল হইয়া একেবারে ছবি হইয়া রহিয়া গেলেন,—

অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

এই পর্যন্ত আসিয়া কবির চিন্তাধারা ভিন্নমুখে মোড় ফিরিল। এতক্ষণ পর্যন্ত কবি বলিতেছিলেন যে, চলমান সৃষ্টিধারার মধ্যে ছবিই অচল, গতিশীলতার মধ্যে তাহার চিরস্থৈর্য, কিন্তু এখন বলিতেছেন যে, তাঁহার এ ধারণা ভুল। তাঁহার পত্নী রেখার বন্ধনে তো চিরকালের মতো আবদ্ধ হইয়া নাই। তাঁহার মধ্যে সৃষ্টির যে আনন্দ মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই আনন্দ তো চিরন্তন, সে নব নব মূর্তিতে, নব নব ভঙ্গীতে চিরকাল ধরিয়া বিশ্বের মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে। কবি তাঁহাকে চোখে দেখিতে না পারিয়া যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সে ভুল তো বাহিরের। প্রত্যক্ষ চেতনার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেও তিনি হৃদয়ের গভীর মগ্নচৈতন্যে অবস্থান করিয়া কবির সমস্ত ভাব, সৌন্দর্য-উপভোগ ও কবিত্ব-শক্তির প্রেরণা জোগাইতেছেন। সুতরাং কবির পত্নী আর অচল ছবি মাত্র নন, তিনি এখন একটা বেগবতী শক্তি।

কী প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছো স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে?
তুমি যে নিয়েছো বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
... ...
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছো যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই;

আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

'শা-জাহান' কবিতায় কবি বলিতেছেন,—

সম্রাট শা-জাহান জানিতেন যে তাঁহার দোর্দণ্ড রাজশক্তি, অতুল ঐশ্বর্য, দুর্লভ যশমান সবই কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে, কিছুই চিরকাল থাকিবে না, এ সমস্ত তাঁহার কাছে কোনো বিশেষ মূল্য বহন করে না। কিন্তু তাঁহার পত্নীপ্রেম ও পত্নীর বিয়োগ-বেদনা যে তাঁহার জীবনে সত্যরূপে দেখা দিয়াছে, এই প্রেমের স্মৃতি ও তাঁহার অন্তর-বেদনাকে তিনি চিরন্তন করিয়া রাখিয়া যাইতে চাহেন, তাই অপূর্বসুন্দর স্মৃতিসৌধ তাজমহলের সৃষ্টি। তাঁহার হৃদয়-নিঙড়ানো, পত্নী-শোকের এই একবিন্দু অশ্রু যেন সৌন্দর্যের এক অপরূপ প্রকাশরূপে কালের অঙ্কে চিরকাল শোভা পায়, এই ছিল তাঁহার ইচ্ছা।

মানুষ চির-পথিক—কোথাও স্থির হইয়া তাহার দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায় নাই। জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া সে কেবল সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। এক জীবনের সঞ্চয়—ধন, মান, যশ—সবই সেই জীবনে পড়িয়া থাকে। রিক্ত-হাতে তাহাকে পরবর্তী জীবনে যাইতে হয়। সময়ের স্রোতবেগে সে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার এক এক জীবনের সঞ্চয়ও কোথায় ভাসিয়া মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইবার তাহার সময় নাই। কিন্তু পত্নী-বিয়োগ-দুঃখ ছিল শা-জাহানের জীবনের পরম সত্য ও অবিস্মরণীয় তথ্য। ইহাকে তো তিনি ভুলিতে চাহেন না, বা পারেন না। তাই তিনি উহাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এক অত্যাশ্চর্য সুন্দরবস্তু নির্মাণ করিলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস রহিল যে, এমন সৌন্দর্যসৃষ্টি দেখিয়া কালও আনন্দ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহার সর্বনাশা হাত উহার উপর নিক্ষেপ করিবে না। সম্রাট তাঁহার পত্নীর গোপনে-ডাকা নাম 'মমতাজ' অনুসারে উহার নাম দিলেন 'তাজমহল'। সেই গোপন প্রিয় নাম সর্বজনজ্ঞাত ও চিরন্তন হইয়া রহিল। তাঁহার প্রিয়-বিরহ-ব্যথা সৌন্দর্যের এক অপরূপ মূর্তি ধরিয়া চিরকালের মতো মর্মর-প্রস্তরে ফুটিয়া রহিল।

তাজমহল যেন সম্রাট-কবি শা-জাহানের নূতন মেঘদূত। বিরহ-বেদনায় এই

মর্মরীভূত অমর কাব্য অপূর্ব ছন্দে ও সংগীতে তাঁহার বিদেহী চির-বিরহিণী প্রিয়ার উদ্দেশে তাঁহার হৃদয়ের অসীম প্রেম জ্ঞাপন করিতেছে।

কালিদাসের 'মেঘদূতে'র দূত ছিল মেঘ, আর শা-জাহানের নব মেঘদূতের দূত তাজমহলের সৌন্দর্য। মেঘ যেমন যক্ষের বাণীকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার প্রিয়ার কাছে, তাজমহলের অনুপম ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যও দূতের মতো যেন চিরকাল ধরিয়া শা-জাহানের এই বাণীকে নীরবে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে তাঁহার মৃত পত্নীর উদ্দেশে,—

"ভুলি নাই ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

কবি বলিতেছেন যে, শা-জাহান চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার রাজ্য, সৈন্যদল, ঐশ্বর্য, ধনসম্পদ ও বিলাসের আয়োজন কোথায় কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই অমর সৌন্দর্য-দূত, কালের ধ্বংস-মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া যুগ-যুগান্তরে ঐ একই বাণী ঘোষণা করিতেছে,—

তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা-গড়া
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

এই পর্যন্ত কবির চিন্তাধারা এক পথে চলিয়াছিল, ইহার পর হইতে বিপরীত মুখে চলিল।

শা-জাহান অপূর্ব সুন্দর তাজমহল রচনা করিয়া সর্বধ্বংসী কালকে ফাঁকি দিয়া তাঁহার পত্নী-প্রেমের স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়াছেন। এই তাজমহল তাঁহার চিরন্তন সংবাদ-বাহক, সে তাঁহার অশরীরিণী প্রিয়াকে সর্বসময়ে জানাইতেছে যে সম্রাট তাঁহাকে ভুলেন নাই। কবির নিজেরই এই মন্তব্যকে তিনি আবার ভালো করিয়া বিচার করিয়া দেখিতেছেন।

শা-জাহান যে চিরকাল প্রিয়ার স্মৃতিকে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে কখনো ভোলেন নাই—এ কথা কি ঠিক? কে সে শা-জাহান? তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি? এ জন্মে মোগল-সম্রাটের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সুন্দরী স্ত্রীকে ভালোবাসিয়াছেন ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রেমের স্মৃতিকে অক্ষয় করিবার জন্য এক অত্যাশ্চর্য স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই কি বলিতে

হইবে তাঁহার হৃদয়ে পত্নীপ্রেম চিরদিন অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে? সে জন্মের অভিনয় তো শেষ হইয়া গিয়াছে। আবার পরজন্মে তো বেশ-বদল, নূতন অভিনয়, নূতন ভূমিকা; পূর্ব অভিনয়ের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। সে হাব-ভাব, ভঙ্গী, আবৃত্তি, মানসিক ভাবজ্ঞাপন সম্পূর্ণ পৃথক, পূর্বের অভিনয়ে অভিনেতা কি বলিয়াছিল, কি ভাবিয়াছিল, কি করিয়াছিল, তাহা একেবারে মূল্যহীন, অবান্তর ও বিস্মৃতির পরপারে। শা-জাহানের প্রকৃত স্বরূপ তো নিরাসক্ত, অনন্তপথযাত্রী, চিরন্তন পথিক। মানবাত্মা নিত্যমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ, কোনো স্থিতি বা প্রকাশের মধ্যেই তাহার চরম পরিণতি নয়। এক জন্মের এক বিশিষ্ট সীমা বা রূপের মধ্যে কিছু দিনের জন্য আবদ্ধ হইলেও মৃত্যুর পর সে তাহার চিরন্তন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কোনো জন্মের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্নেহ-প্রেম, হিংসা-দ্বেষ, ধন, ঐশ্বর্য, কীর্তির সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। পরিত্যক্ত আবর্জনার মতো জন্ম-জন্মের সঞ্চয় সব পিছনে পড়িয়া থাকে—মহাপথিক যাত্রা করে অজানার আহ্বানে বিশ্ব-পথে—লোকলোকান্তরে। সুতরাং শা-জাহান যে পত্নীর স্মৃতি বুকে ধরিয়া চিরকাল শোক করিতেছেন, একথা অর্থহীন। সমাধি-মন্দির যাঁহার রচিত, বা যাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছে, তাঁহাদের কাহাকেও আর উহা স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—তাঁহারা এখন বিরহ-শোকের চির-অতীত। সে সমাধি-মন্দির এখন একস্থানে স্থির হইয়া থাকিয়া ভারত-ইতিহাসের মোগল সম্রাট শা-জাহান ও তাঁহার পত্নী মমতাজের প্রেম ও ঐশ্বর্যের চরম পরিণতি জ্ঞাপন করিতেছে মাত্র—আসল শা-জাহান ও মমতাজ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন,—

মিথ্যা কথা—কে বলে যে ভোলো নাই?
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির?
সমাধি-মন্দির
একঠাঁই রহে চিরস্থির,
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে

তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।
... ...
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

এই দুইটি চিন্তাধারার উভয়টিই সত্য। মানুষ তাহার প্রিয়জনকে চিরস্থায়ী করিতে চায়; তাঁহার প্রেম, তাহার বিরহ-বেদনা, তাহার কীর্তি তাহার মৃত্যুর পরেও চিরন্তন হইয়া থাক, ইহাই তাহার কামনা। তাই সে সমাধি-মন্দির নির্মাণ করে, স্মৃতি-স্তম্ভ তোলে—কতো উপায় অবলম্বন করে, যাহাতে সর্বধ্বংসী কালের হাত হইতে তাহার প্রিয়জন রক্ষা পায়। স্মৃতির এই নানা আবরণ দিয়া সে মৃত্যুকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। শা-জাহানও তাহাই চাহিয়াছিলেন ও তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু শা-জাহান বা মমতাজের নিত্য-সত্তাকে—তাহাদের জীবনকে—কিছুতেই ধরিয়া রাখা যায় না। তাহাদের পথের প্রেম পথের ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, তাহাদের কীর্তি উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রের মতো এককোণে পড়িয়া আছে। তাহাদের সে মর্ত্য-জীবনের প্রেম, বিরহ, ঐশ্বর্য, কীর্তির স্মৃতি সমাধি-মন্দিরের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে—তাহারা কোন অনন্ত পথে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছে।

এই কবিতায় কবির মননশক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, দুইটি ভাবের পক্ষেই সমান ওকালতি করিয়াছেন। যুক্তি, উপমা, কল্পনা, ও প্রকাশের অদ্ভুত মায়াবলে দুই প্রতিপাদ্যই সমান সত্য বলিয়া মনে হওয়ায় পাঠকের মনে একটা ধাঁধার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

বলাকার এই চারিটি কবিতা রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ছন্দের অভিনবত্ব, সুনির্বাচিত সংস্কৃতশব্দের ঝংকার, ভাষার অপূর্ব কারুকার্য, গভীর ভাবদ্যোতনা, আবেগের সাবলীল প্রবাহ ও কল্পনার বিস্তৃতি আমাদিগকে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্ময়াভিভূত করে।

এই ভাবধারায় আর একটি কবিতা ১৬নং (রূপ)। ইহাতে কবি গতিতত্ত্বের

স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। এই নিরবচ্ছিন্ন গতি-প্রবাহ রূপ লাভ করিতেছে বস্তুপুঞ্জে। এই গতির স্বরূপ অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ হওয়া, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়া। কবি অনুভব করিতেছেন, বিশ্বের সমস্ত বস্তুরাশি যেন প্রকাশের মত্ততায় নৃত্য করিতেছে। মানুষের কামনা-ভাবনাগুলিও রূপলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের ভাবনা, চেষ্টা, আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রকাশই তো নগর-নগরী। আর এমন সব কামনা-ভাবনা আছে, যাহারা এখনো রূপ পায় নাই। তাহারা কেবলমাত্র আমাদের পূর্ব-পুরুষদের চিত্তে উদিত হইয়াছিল; তাহারা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বাণীরূপ পাইবার জন্য তাহারা লোকালয়ের তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা সব আঁধারের যাত্রী, প্রকাশের জন্য আলোক-তীর্থের অভিমুখে চলিয়াছে। কবে যে তাহারা কি ভঙ্গীতে রূপ পাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না,—

অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি;
খোঁজে তারা আমার বাণীরে
লোকালয়-তীরে-তীরে।
আলোক-তীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।

(খ) বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে এই গতিবেগের সঙ্গে কবি বিশেষ করিয়া মানব-জীবনের মধ্যে গতির বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন। বিশ্ব-ধারার সঙ্গে মানুষও ভাসিয়া চলিয়াছে মৃত্যুর মধ্য দিয়া জন্ম হইতে জন্মে। কেবল জন্মে-জন্মে নয়, একই জীবনে তাহার কতো রূপান্তর হইতেছে, কতো পরিবর্তন হইতেছে, গতির স্রোতে কতো নব নব অবস্থার উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে। এই [illegible]তে পুরাতন সঞ্চয় ও নিশ্চল অবস্থাকে ভাসাইয়া দিয়া নূতন জীবন ও যৌবনের পথ প্রশস্ত করিতেছে। ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি চলিতেছে প্রতিপদে,—

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যত কিছু বস্তুভার।
... ...
যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আ[illegible]রণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়;

পুণ্য হই সে চলার স্নানে
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।
ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই। (১৮নং)

এই গতির অনুভূতিতে কবির ব্যক্তি-জীবনের স্বরূপ ও তাহার পরিণাম-সমস্যা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনও তো চলিয়া যাইবে, মৃত্যুতে তাঁহার এ জীবনের সব সুখদুঃখ, আকাশ-ভরা আলো, পৃথিবী-ভরা শ্যামলিমা সব পড়িয়া রহিবে। বুকে তাঁহার একটা বেদনা ও অনিশ্চয়তার দোলা লাগা স্বাভাবিক, কিন্তু কবি তো তাঁহার জীবনের স্বরূপ বুঝিয়াছেন। জীবন তো অনন্তপথে নিরুদ্দিষ্ট যাত্রী। সৃষ্টির মধ্য দিয়া যে বিরাট অজানা প্রবল গতিস্রোতে আত্ম-প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে, মানবজীবনও তাহারই সহিত যুক্ত হইয়া গতিস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। মানবজীবনের মধ্যে সেই অসীম অজানার লীলা চলিয়াছে গতি স্রোতের পটভূমিকায়। কবে এ যাত্রার আরম্ভ হইয়াছে, কবে শেষ হইবে, কেহ বলিতে পারে না। জন্ম-জন্মের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ঐশ্বর্য-খ্যাতি, সব ভাঙা কাচের মতো উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে, নিরাসক্ত পথিক-জীবন চলে অজানা পথে সুদূরের উদ্দেশে। এই চলাটাই তাহার পরম সত্য। তাই কবি বলিতেছেন,—

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দুদিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা।
তার পরে তার খবর কী যে ধারিনে তার ধার গো,
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।
(৩০ নং)

সংসারের সুখদুঃখ, ভয়-সংশয়, স্নেহ-প্রেম এই চিরপথিকের কাছে মূল্যহীন—

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে ?
দুঃখ-সুখের লীলা
ভাবিস একি রৈবে বক্ষে চেপে
জগদ্দল-শিলা ?
চলেছিস রে চলাচলের পথে
কোন্ সারথির উধাও-মনোরথে ?

নিমেষ তরে যুগে যুগান্তরে
দিবে না রাশ-ঢিলা।

চলতে যাদের হবে চিরকালই
নাইকো তাদের ভার।
কোথা তাদের রইবে থলি-খালি,
কোথা বা সংসার ?
দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাদের ঘূর্ণ-পাকের হাওয়া ;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চলছে নিরাকার।
ওরে পথিক, ধর্ না চলার গান,
বাজা রে এক-তারা !
এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাইকো কূল-কিনারা। (৪৪ নং)

কিন্তু একথা সত্য যে, ধরণী তাহার সৌন্দর্য-মাধুর্যে, জীবন তাহার প্রেম-স্নেহে, আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে ; সৃষ্টির রূপ-রসের সহিত মানুষের জীবন একেবারে মিশিয়া গিয়াছে ; বিশ্ব-চৈতন্যের সহিত জীবন-চৈতন্যের পূর্ণ মিলন হইয়াছে। এই বিশ্ব ও মানব জীবনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে তো অর্থহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কবি বলিতেছেন, ইহাও যেমন সত্য, আবার একদিন মরিতে হইবে ও এই ধরণীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইহাও তেমনি সত্য। এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ সত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই আছে, না হইলে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য যে প্রবঞ্চনার জাল স্বরূপ হইত,—

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা।
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেতো কালো।
(১৭নং)

বলাকার যুগে এই সমস্যা তাঁহার কাছে নূতন রূপে উপস্থিত হইলেও এ মিল কবি বহুদিন আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সামঞ্জস্য-সাধনই তাঁহার কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এই সমাধানের চাবি-কাঠি রহিয়াছে মৃত্যু সম্বন্ধে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। মৃত্যু জীবনকে নবরূপ দান করে। এক জন্মে একটি বিশিষ্ট রূপের মধ্যে জীবন আবদ্ধ হইয়া যখন স্থবির হইয়া পড়ে, বৈচিত্র্যহীনতার শুষ্ক আবরণে যখন সকল পরিস্থিতি অসাড় ও বেগহীন হয়, মৃত্যু তখন সেই বিশিষ্টরূপকে ভাঙিয়া দিয়া আবার নূতন আকার দান করে, নূতন তেজ ও সজীবতা দান করে। মানবাত্মা অসীম ও অনন্ত, কিন্তু সে সীমায় আবদ্ধ হয়, রক্ত-মাংসের রূপ গ্রহণ করে। সীমা তো নির্দিষ্ট, স্থবির ও অচল। মৃত্যুই সেই সীমাকে বার বার ভাঙিয়া দিয়া জীবনের শাশ্বত স্বরূপকে উদ্ঘাটন করে। কোনো সীমার মধ্যে প্রকাশ হওয়া ব্যতীত যেমন অসীমের কোনো উপায় বা সার্থকতা নাই, সীমাও তাহার গণ্ডীকে না ভাঙিলে তাহার চিরন্তন বেগবান প্রাণধারা ও অনন্ত প্রসারণশীলতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন। মৃত্যু এই সীমাকে ভাঙিয়া জীবনকে তাহার চিরন্তন বিশালতার ক্ষেত্রে মুক্তি দেয়। তাই এই ধরণীর রূপ-রস, এই মানবজীবন, ইহার স্নেহ প্রেম, দ্বেষ-হিংসা, হাসি-কান্না খ্যাতি-অখ্যাতি সত্য, আবার মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ যে অসীম, অনন্ত, সে-যে চিরন্তন পথিক, কোনো জন্মের কোনো সঞ্চয় বা অনুভূতির সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই, ইহাও সেইরূপই সত্য—হয়তো বা বৃহত্তর সত্য। এই উভয় সত্যই রবীন্দ্র-কবি-মানসে চিরদিন প্রতিফলিত হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এই ভোগ ও ত্যাগ, এই বন্ধন ও মুক্তি, এই আসক্তি ও বৈরাগ্য তাঁহার কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তবে বলাকার যুগে, কবির জীবন অপরাহ্নে, দ্বিতীয় সত্যটিই তাঁহার চিত্তকে বেশি আলোড়িত করিয়াছে, ইহার রহস্য তাঁহাকে বেশি অভিভূত করিয়াছে।

মানুষের এক জীবনেও যখন সে একটা চিরাগত সংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়, যখন কেবল গতানুগতিকভাবে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে, তখন সে একটা গতিহীন, অচল অবস্থার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। মানুষের সমাজে ও ধর্মে সমস্ত বিকৃত ব্যাখ্যা, কুসংস্কার, আবর্জনার মতো জমা হইয়া তাহাদের সচল গতিপ্রবাহকে রুদ্ধ করে। সে সমাজ ও ধর্ম তখন মানুষের পূর্ণ বিকাশকে বাধা দেয়। ইতিহাসেও দেখা যায়, কোনো বিশেষ যুগে, এই শুষ্ক প্রথা ও আচারের বন্ধনে মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়ে। যৌবনই তাহার অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও গতিবেগের দ্বারা সেই বিকৃত অবস্থার গণ্ডীকে ভাঙিয়া বেগবান প্রাণধারাকে প্রবাহিত

করাইয়া দেয়। যৌবন জরা-মৃত্যু-বিজয়ী। পুরাতনের জড়তা ধ্বংস করিয়া নূতন সৃষ্টি ফুটাইয়া তোলে। এই যৌবন দুরন্ত, দুর্বার, 'সর্বনেশে'। মৃত্যু পুরাতন জীবন হইতে নূতন জীবনে লইয়া যায়, যৌবন একই জীবনে নূতন জীবন সৃষ্টি করে—সমাজে, ধর্মে নূতন ভাবধারার জোয়ার আনিয়া মুক্তিস্রোত বহাইয়া দেয়। তাই কবি যৌবনকে আবাহন ও তাহার জয়গান করিতেছেন,—

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডীতে ?
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।
খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্‌ঝটিকা,
জীর্ণতারি বক্ষ দু-ফাঁক করে
অমর পুষ্প তব
আলোকপানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব। (৪৫ নং)
চিরযুবা তুই যে চিরজীবি,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস্ আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা,
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।
(১নং, সবুজের অভিযান)

কবি তাঁহার ভুলে যাওয়া যৌবনের পত্র পাইয়াছেন, সে যৌবন নিত্যকালের। মৃত্যুর পরেও সে যৌবন তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবে।

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কি মনে করে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।
... ...
লিখেছে সে—
এসো এসো চলে এসো বয়সের পথশেষে,

মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার।
ফেলে এস ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধুলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার। (১৩নং)

বলাকার গতিবাদের আলোচনায় ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর মতবাদ উল্লেখ করা স্বাভাবিক মনে হয়, কারণ উভয়ের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। 'বলাকা'-রচনার কয়েক বৎসর পূর্বে বের্গসঁর বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ Creative Evolution প্রকাশিত হয়। তাঁহার মতে জগতের মধ্যে নিরন্তর পরিবর্তন চলিতেছে। "We change without ceasing, and the state itself is nothing but change. This is no feeling no idea, no volition, which is not undergoing change at every moment; if a mental state ceased to vary, its duration would cease to flow." কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ বুঝিতে হইলে বের্গসঁর বা হিন্দু বা বৌদ্ধ-দর্শনের কোনো গতিবাদের উল্লেখ প্রয়োজন করে করে না। প্রতিভার অঙ্কুরোদ্গম হইতে এই গতি-মাহাত্ম্য কবি-মানসের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, ইহা রবীন্দ্র-কাব্য যাঁহারা কিছু পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। কোনো একটা বিশেষ অবস্থা, ভাব বা আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে জীবনে জড়ত্ব ও পঙ্গুতা উপস্থিত হয়, সচল প্রাণধারায় বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায় না এবং জীবন হয় মৃত্যুতুল্য। এই গতিই জীবনকে রক্ষা করিতেছে এবং নূতন সৃষ্টির দ্বারা সমৃদ্ধ করিতেছে, এই গতিই জীবনের ধর্ম, চির-যৌবনই তাহার বাণী—এই অনুভূতি ও চিন্তা রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। এই গতিবেগের অনুভূতি ও চিন্তাই তাঁহার কবি-সৃষ্টিতে অতো বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। আকৈশোর বহু কবিতায় এই গতিবাদের দৃষ্টান্ত মিলিবে। বলাকার যুগে এই গতিবাদ ভাব-কল্পনার গভীরতা ও ঐশ্বর্যে এক নূতন রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র।

তারপর বের্গসঁর সহিত রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও চিন্তার একটা মিল থাকিলেও, মৌলিক অ-মিল আছে অনেকখানি। বের্গসঁ দেখিয়াছেন, একটা অফুরন্ত

গতির বেগ, একটা নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের স্রোত। সৃষ্টির এই নিরন্তর পরিবর্তন বা রূপান্তর, এই becoming, একটা প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক ধারা মাত্র। এই গতির মধ্যেই বের্গসঁ সত্যের চরম রূপ দেখিয়াছেন। কিন্তু মিস্টিক ও লীলাতত্ত্বরসিক রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন এই গতির একটা উদ্দেশ্য ও পরিণাম। নিরবচ্ছিন্ন গতি সত্যের একটা রূপমাত্র, কিন্তু তাহাই চরম রূপ নয়। স্থিতি ও গতির মিলনেই চরম রূপ। দ্রুত বহমান বিশ্ব-প্রবাহের মধ্য দিয়াই বিরাট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, মানবজীবনও সেই সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বহন করিয়া। এই ভাঙা-গড়া, জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া যে-মানব চলিয়াছে, সে এই বিশ্বলীলার অংশরূপে, ঐ লীলার কাণ্ডারীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া, তাঁহার সহচররূপে, জীবনের সার্থকতা পাইতে চায়। বার বার এই উত্থান-পতন, এই দুঃখ-বেদনা, ধ্বংস-মৃত্যু অর্থহীন নয়। ইহার গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ, লীলাময়ের বিশ্বলীলার সঙ্গে একসুরে বাঁধা। এই গতির মধ্যে একটা গভীর তাৎপর্য আছে। মানুষের অব্যক্ত অরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-ভাবনাও একদিন রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিবে। এই বিশ্ব-লীলার তাৎপর্যের ভূমিকায় তাহাদেরও একটা সার্থকতা আছে। নটরাজের লীলায় ধ্বংস নবতর সৃষ্টির জন্য, মৃত্যু অমৃতের জন্য, বিচ্ছেদ নব মিলনের জন্য।

বলাকার ৩৭-সংখ্যক কবিতাটি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লিখিত। ইয়োরোপব্যাপী যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হইল, যে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি দেওয়া হইল, সেই মহাপ্রলয় নিরর্থক নয়, তাহারো একটা মহত্তর ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। কবি বলিতেছেন,—

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর-ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিবে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো ?
... ...
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

এই যুগে গতি-বাদ যেমন কবিচিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে, সেই সঙ্গে এই গতির পরিণাম সম্বন্ধেও কবি একটা ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। গতির প্রতিপদে, ধ্বংস-মৃত্যুর আবির্ভাব হইতেছে বটে, কিন্তু নবসৃষ্টিরও সেই সঙ্গে পত্তন হইতেছে। গতিই গতির শেষ পরিণাম নয়, ধ্বংস-মৃত্যু অর্থে লয় বা নির্বাণ নয়। উহা নূতন পরিণতির সম্ভাবনাকেই সূচিত করে। এই সৃষ্টির গতির মধ্যে দুইটি শক্তি কাজ করিতেছে—একটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, বিক্ষিপ্ত করে, সর্বনাশ ঘটায়, প্রলয় আনে, অপরটি সেই উদ্দাম গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাকে শোভন ও সংযত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত মঙ্গলকে আহরণ করে, তাহার ফলকে গ্রহণ করে। এই দুইটি শক্তির সামঞ্জস্য-বিধানেই সৃষ্টি চলে—এই দুইটি তারেই বিশ্বের সৃষ্টি-সংগীত বাজে। একটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। প্রথম প্রলয়ংকরী শক্তিকে বাদ দিলে জড়ত্বে, পঙ্গুত্বে সব আড়ষ্ট হইয়া যাইবে, আবর্জনার স্তূপ চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়াইবে, আবার দ্বিতীয় কল্যাণী শক্তিকে বাদ দিলে কেবল ধ্বংসই চলিবে, নূতন সৃষ্টির পত্তন হইবে না। সৃষ্টির মধ্যে যেমন এই দুইটি শক্তির লীলা চলিয়াছে, মানুষের মনেও এই দুইটি প্রেরণা কাজ করিতেছে। একটি ফুল ফুটাইতেছে, অপরটি ফল ধরাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই দুই শক্তিকে বলিয়াছেন—উর্বশী আর লক্ষ্মী,—

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দু'হাতে ছড়ায়ে তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।
আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য-সুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র-সঙ্গমতীর্থ-তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

(গ) গীতালির কবি ও ভগবানের লীলার একটা চরম রূপ আমরা দেখিতে পাই বলাকায়। ভগবদুপলব্ধির ইহা এক নবতর ও বৃহত্তর রূপ বলিয়া মনে হয়। খেয়া-গীতাঞ্জলির প্রতীক্ষা ও বিরহের কান্না নাই, গীতিমাল্য-গীতালির নিবিড় মিলনের আনন্দও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কবি এখন তাঁহার প্রিয়তমের সহিত, সৃষ্টির সহিত তাঁহার সম্বন্ধের সত্যকার রূপ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার প্রিয়তম যে তাঁহার একান্ত আপনার, কবির সহিত রসলীলায় তাঁহার স্থান যে তাঁহার প্রিয়তমের উর্ধ্বে, এই সৃষ্টি-লীলার তিনি যে একটা অপরিহার্য অঙ্গ, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন।

১৭-সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, যতক্ষণ কবি এই ধরণীকে ভালোবাসেন নাই, ততক্ষণ আকাশ, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের দীপ জ্বালাইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, কখন তাঁহার প্রেমের দৃষ্টি দ্বারা তিনি তাহার অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করিবেন। কবি যখন ধরণীকে ভালোবাসিলেন, তখন তাঁহার প্রেমের চিরন্তন আনন্দসম্পদ গ্রহ-নক্ষত্র-তারার আলোয় চিরন্তন হইয়া রহিল। আকাশ তাহার সার্থকতা লাভ করিল, ধরণী তাহার পরিপূর্ণতা লাভ করিল। তিনি না ভালোবাসিলে এ ভুবন তাহার পরিপূর্ণতা লাভ করে না।

২৯-সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, ভগবান কবিকে সৃষ্টি করিবার পূর্বে তাঁহার নিজের স্বরূপই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কবিকে সৃষ্টি করার মধ্যে ভগবানের সুপ্তি ভাঙিয়া জাগরণ আসিল, কবির মধ্যে বিশ্বের প্রকাশ হইল, আলোর ফুল ফুটিয়া উঠিল। তাঁহাকে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া ভগবান তাঁহাকে নব নব রূপান্তরে ফিরিয়া পাইলেন, কবিকে পাইয়াই তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্যই ভগবান এই সূর্য-তারার আলো জ্বালিলেন। কবির জন্যই বিশ্ব সত্য হইয়া উঠিল। দ্বৈতের মধ্য দিয়া অদ্বৈতের লীলা সার্থক হইল। সীমার মধ্য দিয়াই অসীমের আত্মোপলব্ধি হইল।

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে হয়নি তোমার দেখা।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম ;
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই ত তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

ইহাই মানুষ-ভগবানের লীলার চরমতম রূপ। কবি বলাকায় এই লীলাতত্ত্বের শেষ উপলব্ধিতে পৌঁছিয়াছেন।

৩৫-সংখ্যক কবিতাতে কবি বলিতেছেন যে, ভগবানের স্বর্গ কোথায়? তাহার তো বাহিরে কোনো অস্তিত্ব নাই। সে যে আছে কবির অন্তরে, তাঁহারই প্রেমের নব নব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তো স্বর্গ রচিত হইয়া উঠিতেছে। ভগবানের মানব-সরোবরে কবির জীবন-পদ্মটি জন্ম হইতে জন্মে এক-একটি দল খুলিয়া দিতেছে, আর বিশ্ব মহা কৌতূহলে সূর্য-তারার আলো জ্বালিয়া তাই দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। ভগবানের সৃষ্ট জগৎ ভগবানের হাতে পুষ্পগুচ্ছের মতো প্রকাশ্যভাবে শোভা পাইতেছে, কিন্তু ভগবানের স্বর্গ যে নিভৃতে কবির হৃদয়ে লুকাইয়া আছে। তাঁহার জীবন যেমন ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণতা লাভ করিতেছে, স্বর্গও ধীরে ধীরে তাঁহারই হৃদয়ে গড়িয়া উঠিতেছে। সেই হৃদয়স্বর্গেই ভগবানের সহিত কবির পূর্ণ মিলন। তিনি ছাড়া যে ভগবানের স্বর্গের অস্তিত্ব অসম্ভব, তাঁহার পূর্ণ আনন্দলাভও সুদূরপরাহত।

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে,
একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

গভীর প্রেমের অপূর্ব বিশ্বাস ও দাবী!

২২

পলাতকা

(১৩২৫)

'বলাকা'র সৃষ্টি-ধারার গভীর চিন্তা ও রহস্য কবির মনোজগৎ নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। চিন্তা, আবেগ ও কল্পনার আতিশয্যে মনের তার হইয়াছিল বাঁধা অতি উচ্চগ্রামে। তারপর, জাপান, আমেরিকা ভ্রমণের সময় ও তাহার পর, নানা পরিস্থিতির মধ্যে, বক্তৃতা, প্রবন্ধ-রচনা, বাদানুবাদ প্রভৃতিতে মনের অবস্থা আরো প্রখর ও দ্বন্দ্বময় হইয়াছিল। সেই অতি-তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও চিন্তার নানা জটিলতা ও চাপ হইতে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় 'পলাতকা'য় ও 'শিশু ভোলানাথ'-এ। নিরবচ্ছিন্ন ভাব, কল্পনা ও রহস্যানুভূতির জগৎ হইতে কবি নামিয়াছেন ধরণীর মাটিতে। রহস্যঘন দৃষ্টি হইয়াছে স্বচ্ছ, গম্ভীর চিন্তা ও সমস্যার আবেষ্টনীমুক্ত হইয়া কবি ধরণীর ধূলির উপর ক্ষণস্থায়ী মানুষের তুচ্ছ হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের মধ্যে তাঁহার মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই দৃষ্টিতে নিতান্ত সামান্য মানুষের ক্ষুদ্র হাসি-কান্নার অসামান্যতা ও রস-মাধুর্য ধরা পড়িয়াছে। ধরণী ও মানুষের স্বাভাবিক ও সহজ সত্তাকে কবি দেখিতেছেন অনেকদিনের পরে। ভাবের সঙ্গে আঙ্গিকেরও পরিবর্তন হইয়াছে। যে অসম, মুক্ত ছন্দ কবি বলাকায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটা চঞ্চল নৃত্যের ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু-বিচিত্র হিল্লোল ছিল, 'পলাতকা'য় সেই অসম ছন্দের গতি মন্থর ও দীর্ঘায়ত হইয়াছে। কবি-চিত্তের আবেগের দোলা তাহার চাঞ্চল্য ছাড়িয়া গভীর ও সংহত মূর্তি ধরিয়াছে। ভাষা হইয়াছে অত্যন্ত সহজ ও সরল—প্রায় চলিয়াছে কথ্য-রূপের কাছ ঘেঁষিয়া। বলাকার ভাষার অলংকারের বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য আর নাই। অনাড়ম্বর, স্বচ্ছ ভাষায় কবি তাঁহার আখ্যায়িকাগুলি বলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অপূর্ব কবিত্বের বিদ্যুৎ ঝকঝক করিয়া উঠিতেছে, আর স্থানে স্থানে একটা রহস্যের ইঙ্গিতের আলো বক্তব্যের বাহিরে কোনো বার্তাকে আমাদের মানস-চক্ষে প্রতিফলিত করিতেছে। বলাকার যুগের স্বপ্নময় ও রহস্যঘন দৃষ্টির আবেশ এখনো যেন কবির চোখে একটু লাগিয়া আছে। তবুও, ভাব ও আঙ্গিকের দিক দিয়া কবি অনেকখানি সহজ ও মুক্ত হইয়াছেন।

এই যে কবি 'পলাতকা'য় মাটির উপর ও 'ধূলামাটি'র মানুষের স্নেহ-প্রেম,

সুখ-দুঃখের মধ্যে নামিলেন, এই নামার মধ্যে অন্তরের একটা নিগূঢ় দ্বন্দ্ব বর্তমান আছে। সৃষ্টির গতিবেগের মধ্যে সবই ভাসিয়া চলিয়াছে। এই গতিবেগের একটা বৃহৎ পরিণাম আছে, বন্ধন হইতে মুক্তি না পাইলে জীবনের সার্থকতা নাই, অজানার বাঁশি প্রতিক্ষণই আমাদের ঘর-ছাড়া করিতেছে ; জীবনের বন্ধন, সমাজ, ধর্ম, আচার এমন কি প্রতিদিনের সাংসারিকতার বন্ধন হইতে অজানা আমাদের ডাক দিতেছে বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে। সেইখানেই আমরা অসীমের স্পর্শ পাইতেছি। জগৎ ও জীবনের সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তিতেই মানুষের নিত্যস্বরূপের উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু তবুও এ ধরণীর মাটি, ইহার ফল-জল, জীবনের স্নেহ-প্রেম, সুখ-দুঃখের সহস্র বন্ধন একান্তভাবে সত্য! ইহাদের বন্ধন কাটাইয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে নিতান্ত বেদনা-দায়ক। ইহাদের ছাড়িয়া যাওয় যেমন সত্য, মানুষের জীবনে ইহাদের প্রভাবও তেমনি সত্য। এই সহস্র বন্ধনের স্বরূপ ক্ষণস্থায়ী ও চঞ্চল বটে, তবুও এ জগতে ইহারাই যে মানুষের সবখানি জীবন জুড়িয়া আছে। এই চঞ্চল স্নেহ-প্রেম, সুখ-দুঃখ গতিস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার স্মৃতি যে জীবনব্যাপী স্থায়ী, তাহারা মর-জন্মের অক্ষয়-সম্পদ। এই নিত্য ও অনিত্যের লীলার চরম ট্র্যাজেডি মানুষের জীবনে ফুটিয়া আছে। কবির এই ট্র্যাজেডির অনুভূতি, এই মানসিক দ্বন্দ্বের রূপ পাইয়াছে 'পলাতকা'য়। কবি বলাকার দৃষ্টি লইয়া 'ধূলামাটি'র মানুষকে দেখিতেছেন, তাই মানব-জীবনের করুণ, অসহায় রূপটি তাঁহার চোখে পড়িয়াছে।

পলাতকার প্রথম কবিতা 'পলাতকা'য় এক পোষা হরিণ প্রভু-গৃহের আদর-যত্ন, নিশ্চিন্ত আশ্রয়, কুকুর-বন্ধুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া হঠাৎ একদিন কিসের ডাকে 'নিরুদ্দেশের আশে' ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কেন যে গেল তাহা সে জানে না, যাহার ডাকে গেল তাহাকেও সে চেনে না, কেবল রক্তে তাহার ঘর-ছাড়ার দোলা অনুভব করিল,—

বুকে যে তার বাজল বাঁশি বহুযুগের ফাগুন দিনের সুরে—
কোথায় অনেক দূরে
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন।
তারেই অন্বেষণ
জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চলচপল চোখের কোণে জেগে।

কোনো কালে চেয়ে নাই সে যারে
সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধুলা ঘোচায় একেবারে।

অজানার বাঁশি তাহাকে ঘর-ছাড়া করিল, সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া সে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল।

'চিরদিনের দাগা' কবিতায় শৈল নামে একটা বাঙালী মেয়ের ক্ষুদ্র জীবনের কথা আছে।

ভাগ্য-মাঝি ওপার হইতে এপারে কতো ছেলে-মেয়েকে পার করিয়া অন্ধকারের মধ্যে কতো ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেছে। মর্ত্যের উপর তাহাদের নব নব জীবন আবার বিচিত্র সুখে-দুঃখে গড়িয়া উঠিতেছে। এই রকম একটা জীবন বাঙালীর ঘরে আসিয়া এক মায়ের কোলে পরপর তিনটি মেয়ের পর চতুর্থ মেয়ে রূপে জন্ম নিল। মেয়ে-জন্ম গরীব বাঙালীর ঘরে অভিসম্পাত, তাই শৈল বাপ-মায়ের চির-অনাদরে উপেক্ষিত হইয়া রহিল। বিয়ের জন্য নানা চিন্তা-ভাবনার পর তাহার পাত্র জুটিয়া গেল। বিয়ের পরে বরের সঙ্গে স্বামীর ঘরে যাইবার পথে জাহাজডুবি হইয়া সে মারা গেল,—

আবার ভাগ্য নেয়ে
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন্ পারে হায় গেল নৌকো বেয়ে।
কেন এল, কেনই গেল, কেই বা তাহা জানে।

প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ মেয়েটিকে ভালবাসিতেন, তাঁহার বুকে ব্যথা জমিয়া রহিল, আর রহিল সেই অনাদৃতা মেয়ের বাবার বুকে। বাবার হিসাবের খাতায় শৈল একদিন হিজিবিজি কালির আঁচড় কাটিয়াছিল, তাহার জন্য শাস্তিও পাইয়াছিল। শৈল নাই, শৈলর স্মৃতিচিহ্ন বাবার বুকে চিরদিনের বেদনা সঞ্চিত করিয়া রাখিল,—

আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই কখানা পাতা,
আজকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতো।
হিসাবের সেই অঙ্কগুলার সময় হল গত—
সে শাস্তি নেই, সে ছুট্টু নেই ;
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগা
শিশু-হাতের আঁচড় ক'টি আমার বুকে লাগা !

শৈল কোথা হইতে আসিয়াছিল, আবার কোথায় চলিয়া গেল! কিন্তু তাহার এই নগণ্য স্মৃতির বেদনাটুকু পিতার বুকে চিরদিনের মতো সযত্নে রক্ষিত রহিল স্নেহের আবরণে।

'মুক্তি' কবিতাটি পলাতকার উল্লেখযোগ্য কবিতা। মধ্যবিত্ত বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারে বধূ যে আলোকহীন, বৈচিত্র্যহীন বন্দীজীবন যাপন করে, তাহার মধ্যে যে দুঃখ-বেদনা ও নির্মম হৃদয়হীনতা আছে, কবি তাহাই অতি সুন্দর ভাবে উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন।

বধূ স্বামী-গৃহে প্রবেশ করিয়া বৃহত্তর জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একেবারে অন্তঃপুরের কারাগারে বন্দিনী-জীবন যাপন করিতেছে। ন'বছরের মেয়ে 'দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা' জীবন-তরীটাকে বাইশ বছর অবধি টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কর্মের চাকা অক্লান্ত ভাবে ঘুরিয়াছে। তাহার সংকীর্ণ পরিবেশ ব্যতীতও যে বাহিরে একটা প্রকাণ্ড বিশ্ব তাহার অজস্র দানের ঐশ্বর্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা তাহার জ্ঞানের বাহিরে ছিল। নিজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাও তাহার নিকট ছিল অজ্ঞাত। সে কেবল জানিত—'রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা'। তারপর, তাহাকে ধরিল সাংঘাতিক রোগে। মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া খোলা জানালার পথে সে প্রথম বিশ্বপ্রকৃতির স্পর্শ পাইল। অপূর্ব মুক্তির আনন্দে তাহার দেহ-মন পূর্ণ হইল। সেই দিন সে প্রথম নিজের অন্তরের সত্তার পরিচয় পাইল,—

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।

আসন্ন মরণ চিরন্তন মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক রূপে তাহার চোখে দেখা দিল। মরণ তাহার পরম প্রিয়তম, সে-ই তাহার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে সার্থক করিল, তাহাতে অমৃত-রসের সন্ধান ছিল,—

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ-মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্!
মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক

দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু-
হেলা আমায় করবে না সে কভু।

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি!
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

কোনো বন্ধন, কোনো অচল পরিস্থিতির মধ্যে অবরুদ্ধ হইলে জীবনের প্রকৃত আনন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, বিশ্বের সঙ্গে তাহার অন্তরতম যোগ সাধিত হয় না। জীবনের সঙ্গে এই মুক্তি-ক্ষেত্র রচনা হওয়া প্রয়োজন তবেই জীবনের সার্থকতা। মৃত্যু সেই অনন্ত মুক্তির দূত। সে কেবল জীবনের মধ্যকার অচল আবেষ্টনীই ভাঙে না, সমগ্র জীবনের রুদ্ধ অবস্থাকেও ভাঙিয়া মুক্তির আনন্দ ও নব জীবনের আস্বাদ দেয়।

'ফাঁকি' কবিতাটির বিষয়বস্তু প্রায় একরূপ। শ্বশুরবাড়িতে নানা প্রথা, সংস্কার ও সংকোচনের দেয়াল-আঁটা রুদ্ধ ঘরে বিনুর প্রথম যৌবনের দিনগুলি কাটিয়াছিল। এই অবরোধের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে তাহার নিবিড় মিলনের সুযোগ হয় নাই। দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর যখন সে হাওয়া-বদলের জন্য বাহির হইল বিদেশে কেবলমাত্র স্বামীর সঙ্গে, তখনই সে জীবনে প্রথমে স্বামী-মিলনের আনন্দ লাভ করিল। জীবনের প্রতি মুহূর্ত তাহার আনন্দ ও সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল। মৃত্যুকালে সে স্বামীকে বলিয়া গেল,—

"……এ জীবনে আর যা-কিছু ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্যসিঁদূর-সম।
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে,
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।"

বিনু অবরোধমুক্ত অবস্থায় প্রথম জীবনের স্বাদ পাইল, তাহার নারীজীবন সার্থক হইল, তারপর সে মৃত্যুতে মহামুক্তি লাভ করিল। কিন্তু তাহার স্বামীর মনে সে চিরস্থায়ী হইয়া রহিল, এবং সেই স্মৃতির সঙ্গে তাহার স্বামী যে তাহার অনুরোধ অনুসারে এক কুলী-রমণীকে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া ফাঁকি দিয়াছিল, সেই মিথ্যাটাও চিরস্থায়ী হইয়া রহিল।

'ছিন্নপত্র' কবিতার কর্মবীর কাজের জালে আবদ্ধ হইয়া কর্ম ছাড়া আর সংসারে কিছুই দেখিতে পায় নাই। জীবনের প্রথম প্রেম-পাত্রীর স্মৃতি কর্মপ্রবাহে

কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে প্রথম প্রেম যে তাহার জীবনে কতখানি সত্য ছিল, জীবনের যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ-সম্পদ ছিল, একথা এখন বিস্মৃতির অতল তলে। তারপর একদিন কর্মহীন অবসরে হঠাৎ এক টুকরা ছেঁড়া-চিঠির অংশ তাহার শৈশব-সঙ্গিনী মনোরমাকে মনে করাইয়া দিল। তখন সে দেখিল, মনোরমাই তাহার জীবনের একমাত্র সত্য-সম্পদ,—

সেই তো আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেছে পথহারা ;
সেই তো আমার শিশুকালের শিউলিফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে ;
সেই তো আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।

কিন্তু তাহাকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই, কেবল তাহার স্মৃতি পুঞ্জীভূত বেদনায় চিত্তকে নিরন্তর দহন করিবে,—

"মনুরে কি গেছ ভুলে"
এ প্রশ্ন কি অনন্তকাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো।
কত চিঠির জবাব লিখব কত,
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জ্বলবে বহ্নিশিখা—
অক্ষরেতে হবে না আর লিখা ॥

জীবন পলাতকা, তাহার স্নেহ-প্রেমও পলাতকা, কিন্তু যে স্মৃতি তাহারা পিছনে ফেলিয়া যায়, তাহার বেদনা তাহার উপলব্ধি মানুষের কাছে নির্মম ও বৃহৎ সত্য। এই চঞ্চল জীবনের চঞ্চল স্নেহ-প্রেমের বেদনার অপরূপ মাধুর্য কবি আহরণ করিয়াছেন পলাতকার অনেক কবিতায়।

'হারিয়ে-যাওয়া' কবিতায় মানবের অসহায় অবস্থা ও অজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি কবি কল্পনা করিতেছেন প্রকৃতির মধ্যে। ছোট্ট মেয়ে বামী প্রদীপ হাতে করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচের তলায় নামিয়া আসিবার সময় হঠাৎ বাতাসে আলো নিভিয়া গেলে সে "আমি হারিয়ে গেছি" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই বিশ্বপ্রকৃতি সূর্য-চন্দ্র-তারার দীপ হাতে লইয়া চলিতেছে, যদি হঠাৎ কোনো কারণে একদিন তাহার দীপ নিভিয়া যায়, তবে সে-ও অসীম অন্ধকারের মধ্যে "আমি হারিয়ে গেছি" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবে।

এই পলায়নপর, অনিশ্চিত জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষ অজ্ঞ। সে সরল

বিশ্বাসে ধরিয়া লইয়াছে যে তাহার অস্তিত্বের সকল আবেষ্টনী চিরকাল বর্তমান থাকিবে। পরম নির্ভরতা ও সরল বিশ্বাসে সে জীবনের এই নির্মম, ধ্বংসকারী সত্যকে ভুলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতিও তাহার গভীর আত্মবিশ্বাসে মনে করিয়াছে যে সে চিরকাল স্বপ্রকাশ থাকিবে ; কিন্তু সে নিতান্ত অজ্ঞ, তাহার সরল বিশ্বাস ভ্রান্তিময়। মানুষের তুলনায় সে অতি বৃহৎ, অতি অধিককাল স্থায়ী বটে, কিন্তু যদি তাহার চন্দ্র-সূর্য নিবিয়া যায়, তখন দেখা যাইবে যে, সে মানুষের মতোই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া ছিল।

মানবজীবন সম্বন্ধে কবির চিত্ত নানাভাবে আন্দোলিত হইলেও, কবি একটা নির্দিষ্ট ধারণায় পৌছিয়াছেন, 'শেষ প্রতিষ্ঠা'য়। সংসারে সর্বদা শোনা যায়— 'অমুক চলিয়া গিয়াছে', 'অমুক নাই'। কিন্তু এ কথাটা মিথ্যা, ইহা দৃষ্টিভ্রান্তি মাত্র—অনন্ত মহাসমুদ্রের মধ্যে যেখানে জীবন-প্রবাহের চরম গতি, সেই মহা-পরিপূর্ণতার মধ্যে সকলেই বিরাজ করিতেছে। এ সংসারে যাওয়া-আসা—জন্ম ও মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র ; কোনোটাই চরম রূপ নয়। কবির সিদ্ধান্ত,—

মানুষের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে-সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

অবশ্য এ সিদ্ধান্ত কবির নূতন নয়, তবে এ যুগে নূতনভাবে উপলব্ধি ও গ্রহণ।

নিত্যপরিবর্তনশীল জগৎ ও চঞ্চল মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ কবি বুঝিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্নেহ-প্রেম যে জীবনের গভীর তলদেশ হইতে উৎসারিত—ইহাদের অস্তিত্ব ব্যতীত যে জীবন অর্থহীন, তাহাও গভীর-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

কল্লোল-মুখর এই বিরাট মরণ-স্রোতের ভাঙন-ধরা পাড়ির উপরে, পাতার কুটীরের মধ্যে, মানুষের ক্ষণিক জীবনে যে অমৃত সঞ্চিত আছে, কবির চোখে তাহাই জীবনের পরম সম্পদ বলিয়া মনে হইতেছে। এই ক্ষণিকের স্নেহ-প্রেম, হাসি-কান্নাই তো জীবনকে সুধায় ভরিয়া দিতেছে। তাই কবি জীবনের শেষ-বেলায় তাঁহার চারিদিকের পরিচিত সকলের প্রাণের নিবিড় প্রীতির ক্ষণিক স্বাদ লইয়া কৃতার্থ হইতে চাহিতেছেন,—

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্য-ডোবার বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
বলে নে, "ভাই, এই যে দেখা, এই যে ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।" (শেষ গান)

বাহিরের দিক হইতে একটি আঘাত কবির মনে এই ভাব-দ্বন্দ্বের পুষ্টিসাধন করিয়াছে বলিয়া মনে হয়; তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার ব্যাধি ও মৃত্যু যেমন তাঁহার চোখের সামনে জীবনের পলায়নপরতার মূর্তি তুলিয়া ধরিয়াছে, অন্যদিকে মানবজীবনে স্নেহ-প্রেমের সর্বগ্রাসী শক্তি ও অচ্ছেদ্য-স্বরূপের পরিচয়ও তাঁহাকে দিয়াছে। কবির ব্যক্তিগত বেদনার মধ্যে মানবজীবনের এই চিরন্তন বেদনা রূপ পাইয়াছে। তাই বোধ হয় 'পলাতকা'র অধিকাংশ আখ্যায়িকাই বাঙালী মেয়েকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ক্ষণিক স্নেহ-প্রেমকে কবি একান্তভাবে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন এবং যাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া এই অপূর্ব রস উৎসারিত হইতেছে, তাহাদিগকে আরো প্রাণের কাছে আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিতেছেন।

অবশ্য আর একটি কথাও ঠিক যে, কবি চিরদিনই একান্তভাবে জগৎ ও জীবনের রূপরসভোগী। দীর্ঘদিন আধ্যাত্মিক অনুভূতির জগতে বাস ও সৃষ্টি-ধারার রহস্য-দর্শন করিলেও জগৎ ও জীবনের বিচিত্র রসমাধুর্য তিনি বেশি দিন ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। ইহাই যে তাঁহার সত্য অবলম্বন। তাঁহার কবি-মানসের বৈশিষ্ট্যই যে সান্ত, খণ্ড, ক্ষণিককে ত্যাগ করিয়া নয়, তাহার মধ্য দিয়াই অনন্ত, অখণ্ড ও চিরন্তনকে উপলব্ধি করা। এই ক্ষণিক ও চিরন্তন যে একত্রে তাঁহার কাছে পরম সত্য। তাই কবি আবার জগৎ ও জীবনের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন ও জীবন-অপরাহ্ণে শেষ বারের মতো ইহাদের অপূর্ব রসমাধুর্য আহরণ করিয়া যাইতে চাহিয়াছেন। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'পূরবী' ও 'মহুয়া'য় ইহার পরিচয় সুপ্রকাশ।

২৩

শিশু ভোলানাথ

(১৩২৯)

'পলাতকা'র চারি বৎসর পরে 'শিশু ভোলানাথ' প্রকাশিত হয়। এই সময়টা কবির জীবন নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। নূতন রাজনৈতিক আন্দোলন, স্যর উপাধিত্যাগ, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা, ইয়োরোপের নানা দেশ ও আমেরিকা ভ্রমণ প্রভৃতি অল্প-বিস্তর তাঁহার চিন্তা ও কর্মকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, পরিচালিত করিয়াছে। এ সময়ের মধ্যে কোনো নূতন কাব্য-রচনা নাই, কেবল পুরাতন নাটকের কিছু রদ-বদল করিয়া অভিনয়যোগ্য সংস্করণ করা, প্রবন্ধ, গল্প এবং অপূর্বকাব্যময় গদ্যে 'লিপিকা'র কথিকা-রচনা প্রভৃতি সাহিত্য-প্রচেষ্টা চলিয়াছে। নূতন সৃষ্টির প্রেরণা কোনো নবতর রূপ এখনো গ্রহণ করে নাই।

পলাতকায় কবি নিরন্তর পরিবর্তনশীল জগতের বুকে, চঞ্চল মানবজীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে আবার আন্দোলিত হইবার যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার জের চলিয়াছে 'পূরবী'তে। 'শিশু ভোলানাথ'-এ কবি বিরুদ্ধ ভাব-চক্রে অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে জীবন ও জীবনের সব-কিছুই ক্ষণিক। ক্ষণিক সুখ-দুঃখ ও স্নেহ-প্রেমে আন্দোলিত হওয়া তো অর্থহীন। সৃষ্টির রহস্যই তো ধ্বংস ও তারপর আবার নূতন রূপ-গঠন। এই ক্ষণিকতায় কবির মনে একটা বেদনা জাগিয়াছে, তাই সৃষ্টির রহস্যের আলোকে জীবনকে নূতনভাবে দেখিয়া এই খেলার মর্ম বুঝিয়া শান্তির আশা করিতেছেন। জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া শান্ত ও নিরাসক্ত মনে কবি 'পূরবী'তে যে সৌন্দর্য মাধুর্য-প্রেম উপভোগ করিবেন, তাহারই জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন 'শিশু ভোলানাথ'-এ। কবি তো এই ক্ষণিকের মধ্যেই চিরন্তনকে দেখিয়া থাকেন। এই খণ্ডকে বাদ দিলে অখণ্ডের উপলব্ধি তো সম্ভব নয়। ধ্বংসও যেমন সত্য, নবসৃষ্টিও তেমনি সত্য। এই খেলার জগতে দুদণ্ডের খেলনা লইয়া খেলাও ত একটা সত্য অবস্থা। 'শিশু ভোলানাথ'-এ কবি জীবনের ক্ষণিকতার বেদনাকে সৃষ্টিলীলার একটা রহস্যের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া মনকে শান্ত ও ভারমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ইহার সঙ্গে, নানা বিরুদ্ধ চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত, নানা কর্মের জটিল পরিবেশ, জগতের জড়বাদী সভ্যতার বস্তু-সঞ্চয়ের ভয়াবহ বিকৃত রূপ হইতেও মুক্তি কামনা করিতেছেন। এই দুই প্রচেষ্টাই 'শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতা-রচনার প্রেরণা জোগাইয়াছে।

শিশুকে কবি ভোলানাথ বলিয়াছেন। ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর সৃষ্টিকে একবার ভাঙিতেছেন আবার গড়িতেছেন। বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়া এই ধ্বংস ও পুনর্গঠনের লীলা চলিয়াছে। ধ্বংস না হইলে নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এক ধ্বংস হইতেছে, আবার নূতন সৃষ্টি হইতেছে, আবার তাহা ধ্বংস হইতেছে, আবার নূতন সৃষ্টি হইতেছে। এইভাবে নিত্য-নূতন সৃষ্টি হইতেছে, নিত্য-নূতন ধ্বংস হইতেছে।

বিশ্বেশ্বর ভোলানাথ। তিনি সবই ভুলিয়া যান। কোনো কিছুতে তাঁহার মায়ামমতা নাই, আসক্তি নাই, কোনো কিছু চিরদিনের মতো ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা নাই। নিছক খেলার আনন্দে তিনি একবার ভাঙিতেছেন, আবার গড়িতেছেন। ইহাতে তাঁহার কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো প্রয়োজন নাই।

শিশুও বিশ্বেশ্বর ভোলানাথের মতো। তাহার কোনো উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই —সারাক্ষণ খেলার আনন্দে মাতিয়া আছে। তাহার খেলনা সে একবার ভাঙিতেছে, আবার গড়িতেছে। ধুলো-মাটি, কাঠি-কুটো লইয়া সে সকল সময় একটা-না-একটা কিছু গড়িতেছে। একটা-কিছু গড়া শেষ হইতে না হইতেই সেটা ভাঙিয়া দিয়া, আবার নূতন কিছু গড়িতেছে। এই খেলাতেই তাহার পরমানন্দ। নূতন নূতন খেলার আনন্দে শিশু ভোলানাথ বিভোর হইয়া আছে।

বিশ্বের সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে কোনো কিছুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখা যায় না। সঞ্চয়ের চেষ্টা বৃথা—দুঃখ ও শোক অর্থহীন। শিশু-চিত্ত কোনো সঞ্চয়কে পুঞ্জীভূত করিতে চাহে না, কোনো ধ্বংসে তাহার দুঃখ নাই, সমস্ত দুঃখ-ক্ষোভের অতীত সে। ভগবানের সৃষ্টিলীলা-রহস্যের মর্ম শিশুই কেবল বুঝিতে পারে—তাহার জীবন সেই সুরে বাঁধা। কবিও শিশু-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত দুঃখ-শোক-ক্ষোভের অতীত হইতে চাহিতেছেন—তাঁহার হৃদয়কে নির্মল করিয়া বস্তুর নানা বন্ধন হইতে মুক্তি-কামনা করিতেছেন। শিশু-চিত্তে প্রবেশ করাই তো সৃষ্টি-রহস্যকে উপলব্ধি করা—বিশ্বেশ্বর ভোলানাথের লীলাকে উপলব্ধি করা।

'শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতাগুলি লিখিবার উদ্দেশ্য কবি তাঁহার 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে ("যাত্রী") প্রকাশ করিয়াছেন,—

"...কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর-কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে-স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক-এক জায়গায় এই সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে, সেই স্রোতেরই অবিরত বেগ ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে—পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে

অকৃপণ,—সে কিছুতেই জমতে দেয় না ; কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়,—সে যে নিত্য নূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে, সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে নিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরী করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়-গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করেছে,—এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধূলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্য সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এ-সব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি···শ্বাসরুদ্ধ প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালেরবাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম, সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম, বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তার খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।" ৭ই অক্টোবর, ১৯২৩।

আমরা দেখিয়াছি যে খেয়া হইতে আরম্ভ করিয়া কবি বিশ্বেশ্বরের লীলারস অনুভব করিতেছেন। প্রথমে তাঁহার ব্যক্তিজীবনের সহিত লীলা, তারপর, সৃষ্টির মধ্যে লীলা কবি অপূর্ব আনন্দ-বিস্ময়ে অনুভব করিয়াছেন। এই লীলাময় ভগবানের যে ভাব-মূর্তি কবির কল্পনাকে অধিকার করিয়া আছে, তাহার সহিত হিন্দু-পুরাণের নটরাজ শিবের পরিকল্পনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বেদের রুদ্রদেবতা পুরাণের শিবে পরিণত হইয়াছেন কি না, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তবে কবি ভগবানের যে কল্পনা করিয়াছেন এইযুগে, তাহা ভোলানাথ শিবেরই কল্পনা। সৃষ্টির মধ্য দিয়া তিনি নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, তাঁহার একপাদক্ষেপে ধ্বংস হইতেছে, অন্য পাদক্ষেপে নূতন সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিতেছে। কোনো দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, কিছুতেই কোনো আসক্তি নাই, মায়া নাই, সুখ-দুঃখের বিকার নাই, কেবল উদ্দাম নৃত্যরসে মাতিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন। মানবও সেই সঙ্গে তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া। কোনো জন্মের কোনো সঞ্চয় সে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। মৃত্যু আসিয়া বারে বারে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিতেছে। একজন্মের সুখদুঃখ-হাসিকান্না পিছনে পড়িয়া রহিতেছে। সে মৃত্যুস্নানে শুচি হইয়া নবীন জীবনে চলিয়া যাইতেছে। ক্রীড়া-রসমত্ত ভগবান যেমন চির-পথিক, মানুষও তাহাই। কোনো বন্ধনই

তাহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। শিশুই ভোলানাথ মহেশ্বরের প্রকৃত চেলা। সে নিরাসক্ত—কেবল খেলার আনন্দে তাহার খেলনার ভাঙা-গড়া করিতেছে। মানুষকে তাহার প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, শিশুচিত্তের নির্বিকার, সহজ, খেলার আনন্দরসের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। তবেই সে তাহার নিত্য-মানবসত্তার নিরাসক্ত, পথিক রূপটি উপলব্ধি করিতে পারিবে ও সুখদুঃখের সমস্ত বন্ধনমুক্ত হইয়া অনাদি শিশুসাথীর সহিত লীলার আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।

কবি শিশুর ভক্ত-শিষ্য হইতে চাহিয়াছেন,—

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে;
দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ঐ ঘোর,
খেলনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।

(শিশু ভোলানাথ)

তাহা হইলেই নিত্য-শিশুর সহিত জন্মে জন্মে তাঁহার খেলা সম্ভব হইবে,—

দিন গেল ঐ মাঠে বাটে,
আঁধার নেমে প'লো;
এপার থেকে বিদায় মেলে যদি
তবে তোমার সন্ধ্যাবেলার
খেয়াতে পাল তোলো,
পার হব এই হাটের ঘাটের নদী।
আবার, ওগো শিশুর সাথি,
শিশুর ভুবন দাও তো পাতি
করব খেলা তোমায় আমায় একা।
চেয়ে তোমার মুখের দিকে
তোমায়, তোমার জগৎটিকে
সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা।

(শিশুর জীবন)

'শিশু ভোলানাথ' 'শিশুর'ই অনুবৃত্তি—শেষ অংশ বলা যাইতে পারে। শিশু-মনের যে কৌতূহল, সন্ধানপরতা ও নানা রহস্য, শিশু-কল্পনার যে বিচিত্র লীলা

কবি অপূর্বভাবে রূপায়িত করিয়াছেন 'শিশু'তে, এ গ্রন্থে তাহারই জের চলিয়াছে। তবে শিশুকে কবি এখানে নিত্য-শিশু ভোলানাথ মহেশ্বরের প্রতীক বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। শিশু-মনস্তত্ত্বের কাব্যরূপায়ণে ও শিশু-জীবনের রহস্য-দর্শনে বিশ্ব-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়।

২৪

পূরবী

(১৩৩২)

'পলাতকা'য় কবি তাঁহার 'আপন মানুষগুলি'র স্পর্শ চাহিয়াছিলেন, আবার 'কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়' 'ডুব' দিতে চাহিয়াছিলেন, 'পূরবী'তে সত্যই কবি সেই ধরার ধূলা-মাটি, তরু-লতা, জল-হাওয়া, সেই প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রসের মধ্যে, মানুষের স্নেহ-প্রেম, হাসি-কান্নার মধ্যে নামিয়া আসিলেন। 'ক্ষণিকা' হইতেই এই জগৎ বিদায় লইয়াছিল। তারপর, 'খেয়া' হইতে 'গীতালি' পর্যন্ত দীর্ঘদিন কবি আধ্যাত্মিক অনুভূতির জগতে ছিলেন,—ভগবানের সহিত ব্যক্তি-জীবনের লীলার রস ও রহস্যের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। 'বলাকা'য় কবি—এই সৃষ্টির মধ্যে ভগবানের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির সামনে সৃষ্টির প্রকৃত স্বরূপ—জগৎ ও জীবনের সত্যকার রূপ ধরা পড়িয়াছে। সৃষ্টির গতিবেগে কোনো কিছুই স্থায়ী নয় ইহা কবি বুঝিয়াছেন, কিন্তু জগৎ ও জীবনের যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও প্রেম তাঁহার আজীবন সাধনার ধন—তাঁহার কবি-চিত্তের অক্ষয় সম্পদ, তাহাকে তো কিছুতেই তিনি ছাড়িতে পারেন না। সোনারতরী-চিত্রা-চৈতালির যুগে কি নিবিড় আনন্দ ও বিস্ময়ে কবি প্রকৃতির ও মানবের রূপ-রস পান করিয়াছেন! জল-স্থল-আকাশের অপরিসীম সৌন্দর্যে তিনি চমকিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল রূপবৈচিত্র্যে তাঁহার প্রাণে আনন্দের মহামহোৎসব চলিয়াছে, প্রকৃতির সহিত তাঁহার গভীর আত্মীয়তার অবিচ্ছিন্ন ঐক্যবন্ধন ও মানুষের ক্ষুদ্র জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের নিবিড় অনুভূতির বিচিত্র রসোচ্ছল প্রকাশ হইয়াছে অসংখ্য কবিতা, গান ও গল্পে বহুকাল ধরিয়া। ইহাদিগকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়া তো তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়—ইহারা যে তাঁহার অন্তরতম কবিপ্রকৃতির সত্যকার অংশ, একদা ইহারাই যে তাঁহার অনুভূতি ও কল্পনাকে দিবারাত্রি আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। তারপর দীর্ঘদিন চলিয়া গিয়াছে, কতো নূতন ভাব-পরিস্থিতির মধ্য দিয়া তাঁহাকে

অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কতো চিন্তা, কতো রহস্য-দর্শন, কতো কর্মের তরঙ্গ তাঁহাকে নব নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার জীবনকে বিচিত্র দোলায় আন্দোলিত করিয়াছে। কিন্তু নিতান্ত আত্মগত অধ্যাত্ম-অনুভূতির সূক্ষ্ম রস-কম্পনের মায়াজাল, বা সৃষ্টিধারা ও মানব-জীবনের যথার্থ স্বরূপের গভীর রহস্য-চিন্তার অভ্রভেদী আভিজাত্য, তাঁহার এতদিনের বিস্মৃত প্রেম ও সৌন্দর্যের জীবনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। জীবন-অপরাহ্নে কবি একবার তাঁহার সেই সাধের .জীবনকে, সেই সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের পরমমনোহর, সুদুর্লভ স্মৃতিগুলিকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছেন।

দীর্ঘদিনের অধ্যাত্ম-সাধনা ও অতীন্দ্রিয় রস-বিহার এবং সৃষ্টির—প্রকৃতি-মানবের—অন্তর্নিহিত সত্তার চিরন্তন রহস্য-নির্ণয় কবি-চিত্তে এই জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা ও সুগভীর বিশ্বাস দিয়া গিয়াছে। কবি স্থিরভাবে জানিয়াছেন যে সৃষ্টি ও মানুষের নিরন্তর পরিবর্তন হইতেছে। মানুষ চিরন্তন পথিক, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্নেহ-প্রেম পিছনে ফেলিয়া সে জীবন হইতে জীবনান্তরে চলিয়া যাইতেছে। তবুও তো এই অসম্পূর্ণ জীবনের ক্ষণিক হাসি-কান্না যে মানুষের জীবনের সবখানি জুড়িয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের মতো অতো অনুভূতিপ্রবণ ও স্পর্শকাতর কবির পক্ষে এই জীবনকে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব। তাই এ জীবনের নিশ্চিত পরিণাম জানিয়াও ইহাকে একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই। কবিচিত্তের এই দ্বন্দ্ব পলাতকার আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে রূপ পাইয়াছে। শেষে পলাতকার 'শেষ গানে' কবি জীবনের শেষ কয়দিন, 'পুণ্য ধরার ধূলো-মাটি ফল-হাওয়া-জল-তৃণ তরুর সনে' প্রাণের মিলন চাহিয়াছেন ও তাঁহার প্রাণের মানুষের সঙ্গে 'কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায়' সাঁতার দিতে চাহিয়াছেন। শুধু কামনা নয়, 'এই ভালো এই ভালো' বলিয়া তিনি তাঁহার নির্বাচনকেও যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই কবিতাটি 'পূরবী' গ্রন্থের দ্বারদেশে স্থাপিত হইয়া ঐ গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাবধারার ইঙ্গিত করিতেছে।

কবি তাঁহার পূর্ব জীবনের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবন যে ফুরাইয়া আসিতেছে। যে অপরূপ সৌন্দর্যময়ী ধরণীর বুকে অফুরন্ত রূপবৈচিত্র্য ও রসমাধুর্যের মধ্যে কবি আবার আসিয়া নামিলেন, সে ধরণী হইতে তো তাঁহাকে শীঘ্রই মহাযাত্রা করিতে হইবে। জীবনের দিকচক্রবাল ব্যাপিয়া তো বিদায়ের করুণ রাগিণীর আলাপন সুরু হইয়াছে। আবার নূতন করিয়া সে জীবন উপভোগ করিবার বয়স নাই—সময় নাই। মৃত্যু-দূত অলক্ষ্যে দ্বারে দাঁড়াইয়া তো প্রতীক্ষা করিতেছেই, তারপর গীতালি-বলাকার মনোভাব

এ জীবনের কোনো উপকরণেরই যে যথার্থ মূল্য নাই এ ধারণাও তাঁহার মনের পশ্চাতে সঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, তাই আবার জীবন-মধ্যাহ্নের রূপ-রসের স্বর্গ রচনা করা সম্ভব হইল না, দিনের আলো থাকিতে থাকিতে আবার সেই পুরাতন গানের তান ধরার কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। আবার 'সোনারতরী-চিত্রা'র মতো কাব্য রচনা সম্ভব হইল না। বার্ধক্যে যখন যৌবনের স্বর্গ আর রচনা করা হইল না, তখন স্মৃতিতে সেই মধুময় বিগত দিনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, তাহার যতখানি মাধুর্য সম্ভব কবি আহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের পার্থক্যের দীর্ঘনিঃশ্বাসে এবং আসন্ন চির-বিদায়ের চিন্তায় কবির সে স্মৃতির আনন্দও ম্লান ও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যেন কোনো বিগত সুখের দিনের স্মৃতি-তর্পণ। একদিকে অতীতের সৌন্দর্য-মাধুর্য-ভরা জীবনের মধুর স্মৃতির আকর্ষণ ও উহাকে ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে মৃত্যুর সুনিশ্চিত আহ্বান 'পূরবী'র মধ্যে আলো-ছায়ার যে মায়া-রচনা করিয়াছে, তাহা সূর্যাস্তকালে পশ্চিমাকাশের আসন্ন অন্ধকারের পট-ভূমিকায় ক্ষণিক বর্ণসমারোহের মতো করুণ ও মনোহর।

পূরবীতে প্রধানত দুইটি ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়,—

(ক) অতীতের প্রকৃতি-মানবের রূপ-রসোচ্ছল জীবনের আকর্ষণ-অনুভব ও সেই জীবনকে ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা এবং আসন্ন মৃত্যুর পট-ভূমিকায় সে-জীবন উপভোগের করুণ ব্যর্থতা।

(খ) আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি ও মহাযাত্রার আহ্বান।

(ক) নানা চিন্তার জটিলতা, বহু কর্মের কোলাহল, বহু ভ্রমণ ও জনসমাগম, পশ্চিমের যান্ত্রিক সভ্যতার সর্বগ্রাসী ঐশ্বর্য-বিলাস, সৃষ্টির রহস্য ও মানবজীবনের পরিণাম সম্বন্ধে ধারণা কবির মনকে দীর্ঘদিন একেবারে গ্রাস করিয়াছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্য এবং মানবের সুকোমল চিত্তবৃত্তির মাধুর্যের জীবন হইতে কবি কোথায় দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। এই জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মহা-মহোৎসবের মধ্যেই তো তাঁহার সত্যকার বাসভূমি, কিন্তু তিনি এতদিন সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়া ছিলেন। তারপর এই সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যময়ী, শ্যামলা মাটি-মায়ের সহিত তাঁহার নাড়ীর অচ্ছেদ্য বন্ধন বুঝিতে পারিয়া আবার তাহার স্নেহ-মেদুর বুকে ফিরিয়া আসিলেন,—

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে-ভরা শোভার নিকেতন;

অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণদেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
(মাটির ডাক)

কিন্তু কবি এই মাটিমায়ের কোল ছাড়িয়া 'দূরে ইটকাঠের পুরে বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে' দিন কাটাইয়াছেন, সেখানে 'তৃপ্তি নাই, কেবল নেশা', কেবল 'ঠেলাঠেলি', কেবল 'উপার্জনে আবর্জনা জমে'। আজ আবার কবি মাকে ফিরিয়া পাইয়াছেন,—

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ;
ছয় ঋতু ধায় আকাশ-তলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান। (ঐ)

আবার তিনি নিজের ঘরে ফিরিয়াছেন,—

কী ভুল ভুলেছিলাম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন;
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন। (ঐ)

এই ধরণীর বুকে যে অজস্র সৌন্দর্যের আয়োজন, তাহার সহিত যে কবির প্রাণের নিগূঢ় যোগ, কিন্তু সে সৌন্দর্য-লোকে প্রবেশের চাবি তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন,—

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত কেঁপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
সেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগত পুলক কী মন্তরে
কচি পাতায় প্রথম কলকথায়,

সেদিন মনে হত কেন
ঐ ভাবারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে। (মাটির ডাক)

আর আশ্বিনের ফসল-ক্ষেতে যখন 'কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়' 'সবুজ সাগর' দুলিয়া উঠিত,—

সেদিন আমার হ'ত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি ;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,

কিন্তু

কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি। (ঐ)

কবি তাঁহার এতদিনের হারানো চাবি আবার খুঁজিয়া পাইয়াছেন, আবার সেই সৌন্দর্যের যজ্ঞশালায় তিনি বহুদিন পরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বি-ষষ্টিতম বর্ষের জন্মদিন তাঁহার নিকট আসিয়াছে আজ নূতন বেশে,—

...সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে-সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

ধরণী-গগনের অপর্যাপ্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের সুধাভাণ্ড হাতে যৌবনের আগমন।

সেই জন্মদিন তাঁহার চিত্ত-মাঝে চিরনূতনের ডাক দিয়াছে। তাঁহার প্রথম জন্মদিনের সেই অম্লান, তরুণ নবজাতককে কবি আবাহন করিতেছেন,—

হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
... ...
হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্যের মতন।

বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন।

(পঁচিশে বৈশাখ)

'চির-তারুণ্যের পূজারী কবি জীবন-সায়াহ্নে যৌবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য-রসোচ্ছল, সুধাময় দিনগুলি ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছেন। কবির কাজই তো চির-বসন্ত, চির-যৌবনের লীলাকে অব্যাহত রাখা। যৌবনের আনন্দের সুধাপাত্র তো কখনোই রিক্ত হইতে পারে না। সেই চিরন্তন অথচ অধুনা-বিস্মৃত যৌবনের দিনগুলির জন্য কবি মহাকালের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন তাঁহার বহু-খ্যাত 'তপোভঙ্গ' কবিতায়।

কালের অধীশ্বর মহেশ্বর সব-ভোলা, সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী। কবির যৌবন-কালের 'যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল' দিনগুলি কি তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন? বসন্তের শেষে কিংশুকমঞ্জরী শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাঁহার সেই রসোচ্ছল দিনগুলি কোথায় অকূল শূন্যে ভাসিয়া গিয়াছে! 'স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়' 'আশ্বিনের শীর্ণশুভ্র মেঘের' মতো সেই জলন্ত যৌবন-স্মৃতি কি 'বিস্মৃতির ঘাটে' অন্তর্হিত হইয়াছে? কিন্তু ভোলানাথ বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কবির এই যৌবনের উদ্দাম দিনগুলি তাঁহার রুক্ষ, রিক্ত সন্ন্যাসিবেশকে দূর করিয়া একদিন তাঁহাকে অপরূপ সৌন্দর্য ও শোভায় সাজাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার ডম্বরু-শিঙা কাড়িয়া লইয়া মন্দিরা-বাঁশি হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, তাঁহার ভিক্ষাপাত্র কমণ্ডলু বসন্তের গীত-গন্ধ-রসে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

সেদিন ভোলানাথের তপস্যার শুষ্কতা ও রিক্ততা কোথায় শূন্যে ভাসিয়া গেল তাঁহার ধ্যানের নিগূঢ় আনন্দ-মন্ত্রটি বাহিরে আসিয়া ধরণীকে পুষ্পসম্ভারে ও নব কিশলয়ে ভূষিত করিল। বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের অবসান হইল। আপন অন্তর-নিহিত সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়া ভোলানাথ আনন্দে অধীর হইয়া 'বিশ্বের ক্ষুধার' 'সুধার পাত্রটি' পান করিলেন। তখন আরম্ভ হইল মহেশ্বরের উদ্দাম আনন্দ-নৃত্য। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার নব নব রূপ ও নব নব সৌন্দর্যের বিকাশ হইল সেই অপূর্ব নৃত্যের নব নব রূপ ও নব নব সৌন্দর্যের লীলা দেখিয়া, কবি আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই নৃত্যের ছন্দে ও তালে কত সংগীত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আজ সেই সুধার পানপাত্র কি ক্ষ্যাপার তাণ্ডব-নৃত্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল কবির যৌবনের সেই উচ্ছল দিনগুলি কি 'নিঃস্ব কালবৈশাখার নিঃশ্বাসে' রিক্ততা

বেদনায় ম্লান হইয়া গেল? কবির বিশ্বাস, সে দিনগুলি কখনোই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। মহেশ্বর সেই চঞ্চল, আনন্দোচ্ছল দিনগুলিকে আপনার মধ্যে সম্বরণ করিয়া সংগোপনে রাখিয়াছেন; সে উচ্ছ্বাস, উদ্দামতা ও প্রচুর্যকে তপস্যার নিঃশ্বাসে শান্ত করিয়া রাখিয়া লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সাজিয়াছেন। কবি নিঃসংশয়ে জানেন, সর্বসংকোচকারী তপস্যার নিস্তব্ধতা আবার ভাঙিবে, আবার যৌবনের সেই দিনগুলি ফিরিয়া আসিবে,—

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

কারণ, কবিই মহেশ্বরের এই তপস্যাভঙ্গ করিবেন। কবির কাজই রিক্ততা ও শুষ্কতা দূর করিয়া নব নব রূপ, নব নব রস ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা, আনন্দের উদ্দাম প্রবাহে জীবনকে প্লাবিত করা, বেদনার সংগীতে ধরণীকে আনন্দ-শিহরিত করা,—

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,—
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা;
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি
মোর গান হানি।

ভোলানাথের বাহিরের এই রিক্ততা ও শুষ্কতা তাঁহার ছদ্মবেশ; কবি সন্ন্যাসীর ছলনা বুঝিতে পারিয়াছেন,—

সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

কবি সুন্দরের সেবক, বৈরাগ্যের সহিত এই যুদ্ধে সুন্দরের সমস্ত শক্তিই তো কবির সংগীতের ইন্দ্রজালের শক্তি।

কবি মহেশ্বরের এই ছদ্মবেশের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন—তিনি বিচ্ছেদের দুঃখদাহে উমাকে কাঁদাইয়া মিলনের আনন্দকে নিবিড় ও তীব্র করিবার জন্য ধ্যানের ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়া-মিলনের বিচিত্র ছবি কবিই তো কাব্যে আঁকিয়াছেন। কবিই তো মিলনের লগ্নে শ্মশান-বিহারী বৈরাগীর বেশ পরিবর্তন করাইয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে, পট্টবস্ত্রে অপূর্ব বরবেশে সজ্জিত করিয়াছেন,—

অস্থিমালা গেছে খুলে
মাধবীবল্লরীমূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু; চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে;
সে-হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে।

কবি চির-তরুণ, যৌবনের আনন্দ-সম্ভারে তাঁহার নিত্য-অধিকার, ধরণীর সৌন্দর্য-মাধুর্যের তিনি চিরকালের উপাসক।

সমুন্নত কল্পনার লীলায়, আবেগের স্নিগ্ধগম্ভীর প্রকাশে ও ভাষার অপরূপ ঐশ্বর্যে কবিতাটি অনবদ্য। রবীন্দ্র-কাব্যে উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির এটি অন্যতম।

'তপোভঙ্গ' পূরবীর তথা রবীন্দ্রকাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতাটিতে কবির ভাব-প্রেরণা ও কবিতাটির ব্যাখ্যা একটু স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

'তপোভঙ্গ' কবিতার মূল ভাব-প্রেরণা বিশ্লেষণ করলে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়:—

(১) জীবন-সায়াহ্নে জরা-বার্ধক্যের আধিপত্যে কবির পূর্বেকার ধরণীর রূপরসশব্দস্পর্শাত্মক উপলব্ধি, মানবজীবনের প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যের তীব্র অনুভূতি ক্ষীয়মান হয়ে পড়ায়, কবি চিরদিনের প্রিয় জগৎ ও জীবনের রসবিহারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন, 'সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-ক্ষণিকা'-যুগের প্রেমসৌন্দর্যের কাব্যরচনা স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু কবির বিহারক্ষেত্র তো প্রেম-সৌন্দর্যের অনুভূতি, তাই তিনি 'ফাল্গুনী' নাটকে প্রচারিত একটি ভাব-সত্য বা তত্ত্বকে গ্রহণ ক'রে, তাঁর চিত্তের নৈরাশ্য ও শূন্যতাকে দূর ক'রে কবির চিরসহজ ও নিত্যউৎসারিত যৌবনাবেগে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছেন। এই কবিতাটি কবির অন্তর্জীবনের

একটি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা—নিজস্ব কবি-সত্তাকে পুনঃপ্রাপ্তির প্রয়াস। কবির জরা-বার্ধক্য নাই। অন্তরে তিনি চির-যুবক, প্রেম-সৌন্দর্যে চিরসাধক—চিরযৌবনের বাণী-বাহক।

(২) কবি তাঁর এই ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য যে রূপকটি গ্রহণ করেছেন, তা তাঁর চিরপ্রিয়, বহু-প্রশংসিত কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এ শিবের তপোভঙ্গ। কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের আবির্ভাব হয় ও মদন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কুসুম-শায়কে মহাদেবের তপোভঙ্গ হয় এবং মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হয়। তারপর পার্বতী কঠোর তপস্যা করে মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। মহাদেবের তপস্যা তাঁর সন্ন্যাস, শুষ্কতা, রিক্ততা একদিন পার্বতীর প্রেম-সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দে বিলীন হয়। কালিদাসের শিবের এই কল্পনার সঙ্গে নটরাজ শিবের কল্পনা মিশ্রিত হয়েছে। নটরাজ বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নৃত্য করছেন,—তাঁর এক পদক্ষেপে ধ্বংস, অন্যপদক্ষেপে সৃষ্টি। তাঁর কাজই হচ্ছে,—ধ্বংস-সৃষ্টি, শূন্যতা-ঐশ্বর্য, সন্ন্যাস-প্রেমসৌন্দর্যের আকর্ষণের মধ্যে পর্যায়ক্রমে লীলা করা। কবির বিশ্বেশ্বরের এই নটরাজমূর্তি—লীলারসে মত্ত হয়ে একবার ভাঙছেন, আরবার গড়ছেন।

(৩) বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ-প্রবাহের একটা রূপান্তরের লীলা চলছে—একটা নৃত্যের আবর্তন হচ্ছে। ধূসরবসন রক্তলোচন সন্ন্যাসী বৈশাখের পরে আসে সজল-শ্যামল মেঘমায়া ও অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ, সন্ন্যাসী-বৈশাখের সঙ্গে মিলন হয় শ্যামলী-প্রিয়া বর্ষার ; তারপর মেঘমুক্ত আকাশে সোনালী আলোর স্বপ্ন, সে স্বপ্ন মিলিয়ে যায় হেমন্তের ধূমল রঙের ঘোমটার আড়ালে ; শেষে শীতের উত্তর-বাতাসে বিকীর্ণ, শীর্ণ, জীর্ণ পাতার শ্মশান-শয্যা,—তারপর বসন্তের নবীন মায়া, অজস্র পুষ্পসমারোহ, নন্দনের সংগীত। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একটি চিরন্তন সত্য, রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এক একটি পর্যায় তার শেষ সূচনা করে না, এক পর্যায়ের শেষ পরবর্তী পর্যায়ের আবির্ভাবের জন্য। মানুষের জীবনেও জরা-বার্ধক্যই চরম পরিচয় নয়, আনন্দময় যৌবনের একটা রূপান্তরমাত্র—নূতন সম্ভাবনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। 'ফাল্গুনী'তে কবিশেখর বলেছেন—"বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে, প্রাণের মধ্যে যৌবনের সে একই লীলা।" যৌবন নিত্যকালের, বার্ধক্যের আড়ালে চাপা থাকতে পারে না, ক্ষণিক আবৃত হয় মাত্র, তার চিরন্তনত্ব নষ্ট হয় না। কবি চিরকাল যৌবনের—প্রেমসৌন্দর্যের উপাসক। এই কবিতাটিতে কবির যৌবনের জয়গান উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে।

লীলারসরসিক, মহাকাল, সন্ন্যাসী মহেশ্বরের দরবারে বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত কবি তাঁর কবি-হৃদয়ের বেদনা ও তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন,—

কালের অধীশ্বর মহাদেব চিরকালই ভোলা সন্ন্যাসী। কবির যৌবনকালের যে আনন্দ-বেদনারঞ্জিত জীবন এবং যে সৌন্দর্য-মাধুর্য-রসোচ্ছল কাব্য রচনা করে তিনি তাঁর যৌবন-বেদনাকে সার্থক করেছিলেন, সেই জীবন ও কাব্য কি ভোলানাথ ভুলে গিয়েছেন? কবির যৌবন-বসন্তে মধু-যামিনীর স্বপ্ন ও পুষ্পসৌন্দর্যে-বিহ্বলতা কি আজ উপেক্ষিত ও বিস্মৃত হয়ে শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেল? আশ্বিনের জলহারা মেঘ যেমন প্রয়োজনহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে আকাশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অন্তর্হিত হয়, আমার সেই কাব্য-সংগীতময় যৌবনদিনগুলি কি স্বেচ্ছাচারী হৃদয়হীন কালের হাওয়ায় শীর্ণ মেঘের মতো ভেসে ভেসে বিস্মৃতির পারে চলে গিয়েছে? (১)

হে নির্মম উদাসীন সন্ন্যাসী, তোমার কি মনে নাই যে, হঠাৎ বসন্তের আবির্ভাবে একদিন তোমার রুক্ষ পিঙ্গল জটাজুট বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাজিতে সজ্জিত হয়েছিল, বসন্তের সেই পুষ্পরাজি দস্যুর মতো তোমার শিঙা, ডম্বরু কেড়ে নিয়ে তোমার হাতে বাঁশী ও মঞ্জিরা তুলে দিয়েছিল, আর কৌতুকচ্ছলে গন্ধবিধুর বসন্তের উন্মাদনা-রসে তোমার ভিক্ষাপাত্র কমণ্ডলু ভরে দিয়েছিল। (২)

বসন্তের প্রবল অভিঘাতে সেদিন তোমার তপস্যা কোথায় ভেসে গেল! শীতের আবহাওয়ায় যে শুষ্কপত্র ঝরে পড়ছিল, গান-প্রাণহীন ছিল পরিবেশ, উত্তরে বাতাস বইছিল, বসন্তের উন্মাদনায় তারা সব উত্তরমেরুতে যেন অকস্মাৎ পালিয়ে গেল। তুমি আত্মস্থ হয়ে ধ্যানাসনে যে নিগূঢ় মন্ত্রটি জপ করছিলে, বসন্ত তার দক্ষিণ বাতাস আর পুষ্পসৌরভে যেন সেই সৌন্দর্য-মন্ত্রটি উদ্ধার করে এনে ধরণীতে প্রকাশ করে দিল। সেই মন্ত্রের গুণ ও প্রভাবে বিচিত্র পুষ্পদল নূতন প্রাণ ও সৌন্দর্য লাভ করল, নূতন পাতায় উদ্‌গমে বনে বনে শ্যামলতার দীপ্ত সৌন্দর্য বিস্তৃত হল। (৩)

বসন্তের নবজীবনের চাঞ্চল্যে, যৌবনাবেগের উন্মেষে, হে আত্মবিস্মৃত সন্ন্যাসী, তোমার সন্ন্যাসের অবসান ঘটল। তোমার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের স্বরূপ তুমি উপলব্ধি করলে, আপন অন্তরঙ্গ সত্তার পরিচয় তোমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হল, আপনাকে আপনি ফিরে পেলে, তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হল বিশ্বের চতুর্দিকে। তখন তোমার জটায় প্রবাহিত গঙ্গার কুলুকুলুধ্বনি তোমার কানে বিরহিণীর করুণ-ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি তুলল, তুমি তোমার ঐশ্বর্য ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হলে। তোমার অন্তরের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য-মাধুর্য তোমাকে বিস্মিত করল। তুমি আকৃষ্ট হলে বিশ্বের কামনা-বাসনা, প্রেম-সৌন্দর্য প্রভৃতিতে। (৪)

তখন তুমি নব-আবিষ্কৃত জগৎ ও জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্য-মাধুর্য-সম্ভারে মুগ্ধ হয়ে আনন্দ-নৃত্যে মগ্ন হলে। তোমার আনন্দ-নৃত্যের বিচিত্র তাল আমার কবি-

সত্তাকে উদ্বোধিত করেছিল। সেই উদ্বোধনের বহিঃপ্রকাশরূপে আমার কাব্য-সংগীত অজস্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তোমার ললাটের চন্দ্রালোকে এক অত্যাশ্চর্য স্বর্গীয় স্বপ্নের আভাস পেয়েছিলাম। জগৎ ও জীবনের নব নব সৌন্দর্যের অনুভূতিতে আমার মন-প্রাণ ভরে গিয়েছিল। প্রেমিকা নারীর লজ্জা ও আনন্দের যুগপৎ প্রকাশে যে মনোহর রূপ ফুটে ওঠে, তা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এইরূপে জগৎ ও জীবনের সৌন্দয-সায়রের শত শত তরঙ্গ আমাকে উদ্বেলিত করেছিল। (৫)

হে কালের অধীশ্বর নটরাজ, আজ তোমার সেই আনন্দনৃত্য বন্ধ করেছ। জগৎ ও জীবনের যে সৌন্দর্য-মাধুর্য, কামনা-বাসনার পানপাত্র তুমি আনন্দে পান করেছিলে, তা আজ নিঃশেষপ্রায়। সেই পানপাত্রে তোমার চুম্বনের বাঁকা রেখা কি আজ সন্ধ্যারাগের করুণ রক্তাভ বর্ণের মতো তার সমাপ্তি জ্ঞাপন করছে? তোমার ভক্ত-সঙ্গী কবির কতশত অসমাপ্ত গান, হাসি-অশ্রু প্রভৃতি বিচিত্র রসের অপর্যাপ্ত সঞ্চয় কি আজ তোমার ভগ্নপাত্রে আবর্জনার মতো নিক্ষিপ্ত হল? হে মহাকাল, তোমার সর্ববিধ্বংসী তাণ্ডবনৃত্যে জগৎ ও জীবনের সেই ক্ষণস্থায়ী সামগ্রীগুলি কি ধুলোয় পর্যবসিত হয়েছে? সেই পূর্বস্মৃতিময় বিলুপ্ত দিনগুলি আজ সর্বরিক্ত বৈশাখের তপ্ত বায়ুতে তাদের আকুল বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে! (৬)

কবির বিশ্বাস, মহাকালের সেই আনন্দনৃত্যের উদ্দামতা, সেই সৌন্দর্য-মাধুর্য-সোচ্ছল দিনগুলির শেষ হয় নি। হে লীলারসিক, এও তোমার এক অভিনব লীলা। তুমি গভীর ধ্যানের নিঃশব্দতার মধ্যে তাদের সংহরণ করে নিয়েছ, তোমার ধ্যানের গুহায় তাদের লুকিয়ে রেখেছ। তোমার মাথার জটায় গঙ্গা আজ কুলুকুলুধ্বনি করছে না, তোমার ললাটের চন্দ্র আজ নিষ্প্রভ, স্তিমিত, সে আর আজ নব নব স্বপ্নজাল রচনা করছে না। এ কোন্ লীলাবশে আজ বাহ্যদৃষ্টিতে তুমি এমন নিঃস্ব সেজেছ! চারিদিকের আকাশ-বাতাস আজ আঁধারে আচ্ছন্ন, সর্বত্র নিঃস্বতা ও শূন্যতার দীর্ঘশ্বাসে অশ্রুবাষ্পাকুল পরিবেশ। (৭)

মহাদেব কালের পরিচালক। ধ্বংস ও সৃষ্টি তাঁর লীলা। তিনি নটরাজ—তাঁর নৃত্যের গতিতে একবার ধ্বংস হচ্ছে, আরবার নব সৃষ্টি জেগে উঠছে। তিনি যখন তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে ধ্যানস্থ হন, তখন সমগ্র সৃষ্টি তাঁর মধ্যে সংহত হয়ে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়; আবার যখন তাঁহার তপস্যা ভাঙে, তখন সৃষ্টি পুনর্বার ফুটে ওঠে—আবার নব নব রূপলীলা আত্মপ্রকাশ করে, আবার অফুরন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের প্রবাহে জগৎ ও জীবন প্লাবিত হয়।

কবি এই কালের অধীশ্বরকে বলছেন—তুমি কালের রাখাল। রাখাল যেমন সন্ধ্যাকালে বংশীধ্বনি করলে চরণরত সমস্ত গরু গোশালায় ফিরে আসে, তেমনি

তোমার হাতে যখন প্রলয়ের শিঙা বাজে, সমগ্র সৃষ্টি চরণরত গরুর মতো প্রত্যাবর্তন ক'রে তোমার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে ; প্রলয়কালের অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়। সৃষ্টির এই রূপসৌন্দর্যের পরিবর্তে প্রলয়কালীন বিদ্যুৎ-চমকিত মেঘে চারিদিকে বিভ্রান্তকারী শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তোমার নিগূঢ় তপস্যার রুদ্ধশ্বাসে সমস্ত চঞ্চলতা শান্ত হয়ে চারিদিক বিষাদ ও নৈরাশ্যে ভরে ওঠে। (৮)

কবি জানেন, যৌবনকে, জীবনের বসন্ত-উৎসবকে কেহ চিরদিন রুদ্ধ করে রাখতে পারে না ; সে চিরন্তন। কিছুকাল তা আবরণে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু পরে দ্বিগুণ শক্তিতে তার পুনরাবির্ভাব হয়। কবি নিশ্চিন্ত জানেন, মহেশ্বরের এই স্তব্ধতা, রিক্ততা, শূন্যতা একদিন চঞ্চল আনন্দনৃত্যের উন্মত্ত আবেগে বিলীন হবে। এই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কলধ্বনি করতে করতে বন্দী যৌবন আবার বেগে উৎসারিত হবে। স্তব্ধ, অচঞ্চলের অধিকার মুক্ত হয়ে বিদ্রোহী যৌবন বারে বারে আত্মপ্রকাশ করবেই। কবির কার্যই এই বিদ্রোহী নবীন যৌবন-বীরকে অভ্যর্থনা করা—তার নবজাগরণের বাণী ঘোষণা করা। (৯)

মহাদেব যখন গভীরধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তারকাসুর বধের জন্য কার্তিকেয়ের জন্ম প্রয়োজন মনে করে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ধ্যানভঙ্গ করিয়ে পার্বতীর সঙ্গে পরিণয় সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাঁরা মদন ও বসন্তকে এই কার্যে নিযুক্ত করেন। বসন্ত প্রথমে সমস্ত প্রকৃতিতে বসন্তের আবির্ভাব করালেন, তপোবনের সমস্ত প্রকৃতি শীতের জড়তা ত্যাগ করে হঠাৎ এক নূতন সৌন্দর্যের বেশ ধারণ করল, আবহাওয়া মিথুনরাগে রঞ্জিত হল, পশু-পক্ষীর মধ্যেও নূতন প্রেম-চেতনা জাগ্রত হল। প্রকৃতির এই মাদকতাময় প্রভাবে মহাদেবের তপোভঙ্গ হল, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রবক্ষের মতো তাঁর হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি চোখ খুলে দেখলেন —বসন্ত পুষ্পাভরণে সজ্জিতা পার্বতী লজ্জাবনতমুখে তাঁর চরণে প্রণাম করছেন। মহাদেব সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দেখলেন যে মদন দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মহাদেবের এই চিত্তচাঞ্চল্য মদনের পুষ্পবাণনিক্ষেপেরই ফল বুঝতে পেরে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তিনি তৃতীয় নেত্রের অগ্নিদৃষ্টিতে মদনকে ভস্মীভূত করলেন।

কবি বলছেন, হে কঠোর রুদ্রমূর্তি সন্ন্যাসী, ইন্দ্র যে তোমার তপোভঙ্গের জন্য মদন ও বসন্তকে পাঠিয়েছিল, আমি তাদেরই সহচর। আমি কবি, তোমার তপোভঙ্গের আমিও দূত, তোমার তপস্যার বিরুদ্ধে স্বর্গের চক্রান্তের মূর্তিমান্ প্রকাশ আমি। আমি কবি, চিরকাল শুষ্কতা, রিক্ততা দূর করবার জন্য সন্ন্যাসকে আক্রমণ করি, সন্ন্যাসকে পরাজিত করে আমি জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করি, আমার কাব্যে ও সংগীতে চঞ্চলতাই আত্মপ্রকাশ করে, প্রকৃতির মধ্যে নূতন সুর ঝংকৃত হয়, সৌন্দর্য

ও মাধুর্যে গোলাপ সচকিত হয়ে নূতন ইঙ্গিত দান করে, কিশলয় আমার সংগীতে নব স্পন্দনের সংকেত বহন করে। কবি চিরযৌবনের পূজারী, সৌন্দর্য-মাধুর্যের চির-উপাসক। চিরকাল সে সন্ন্যাস, রিক্ততা, শুষ্কতার শত্রু। (১০)

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন,—মহাদেবের এই যে বৈরাগ্য, এই তপস্যা, এই সন্ন্যাস সমস্তই ছলনা। কবি বুঝতে পেরেছেন যে সুন্দরের হাতে পরাজিত হবার আনন্দলাভের জন্যই এই যুদ্ধের ছল—এই বিরুদ্ধাচরণ একটা মিথ্যা অভিনয় মাত্র। কবি বৈরাগ্যের ছদ্মবেশধারী মহাদেবকে বলছেন—তুমি মদনকে ভস্ম করেছ বটে, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যে বারে বারে তাকে পুড়িয়ে অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মতো দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্যে তাকে প্রকাশিত করা। মদন যে সম্মোহন বাণে তোমার তপস্যা ভঙ্গ করেছিল, তার তূণত কবিই বারে বারে পূর্ণ করে, কবিই বসন্ত ও যৌবনরঙ্গে চারিদিক চঞ্চল করে—তার কাব্যসংগীতের এক মনোহর মায়া, এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করে পৃথিবীর বুকে। কবির এই মায়াজাল সৃষ্টিই তো তপস্যাভঙ্গের সম্মোহন বাণ। (১১)

উমা মহাদেবের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় লজ্জা ও দুঃখে মহাদেবকে লাভ করবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তারপর মহাদেব তাঁর প্রেমের গভীরতা ও একাগ্রতা লক্ষ্য করে তাঁর কাছে ধরা দেন।

কবি বলছেন, এই যে মহাদেবের বার বার ধ্যানস্থ হওয়া, এর কারণ হচ্ছে প্রিয়ার আর্ত প্রেমনিবেদন শুনে নূতন উৎসাহে ও আনন্দে বার বার ধ্যানভঙ্গ করা। উমাকে তীব্র বিরহ-বেদনা অনুভব করাবার জন্য, হে ভোলানাথ, ধ্যানচ্ছলে উমার সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ কর। তারপর তোমার তপস্যা যখন ভেঙে যায় এবং উমার সঙ্গে তীব্র প্রেমাবেগে আবার মিলিত হও, তখন তোমার এই পুনর্মিলনের প্রেমলীলা যুগে যুগে কবির সংগীতেই ঝংকৃত হয়। (১২)

হে বৈরাগী, তোমার অনুচরগণ—যারা নিঃস্বতা ও শূন্যতার বিলাসলীলায় মত্ত, তারা কবিকে চেনে না, তারা রিক্ততার ও দারিদ্র্যের গর্বে কবির সাজসজ্জা দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসে। তোমার তপস্যা ও শূন্যতার দিনে আমাকে তোমরা সকলেই অবজ্ঞা কর। কিন্তু যখন তপস্যাভঙ্গে বাসন্তী রঙে চারিদিক রঞ্জিত হয়ে ওঠে, উমার সঙ্গে মিলনের মুহূর্ত আসন্ন হয়, লজ্জা ও আনন্দের ঈষৎ হাস্যে উমার গণ্ডদেশ আরক্তিম হয়ে উঠে, এবং বরযাত্রী সপ্তর্ষিমণ্ডলীর সঙ্গে তুমি পরিণয়ের জন্য যাত্রা কর, তখন কবি মাঙ্গলিক পুষ্পমাল্য হাতে করে বরযাত্রী দলে যোগদান করে। শুষ্কতা ও তপস্যার দিনে কবি কেউ নয়, কিন্তু যখনই প্রেমের লীলা আরম্ভ ঠিক তখনই কবির প্রয়োজন। এই রসবিহারই কবির একমাত্র উপজীব্য। (১৩)

তারপর তোমার অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন—সন্ন্যাসী থেকে বর! হে ভৈরব, তোমার বিবাহদিনে তোমার রক্তলোচন প্রেতসঙ্গীরা তোমার পরিবর্তন দেখে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেল। বাঘছালের পরিবর্তে তোমার রজতগিরিধবল দেহ রক্তবর্ণের পট্টবস্ত্রে আবৃত হয়েছে, অস্থিমালার পরিবর্তে গলায় দুলছে মাধবীমঞ্জরীর মালা, গায়ে চিতাভস্মের পরিবর্তে পুষ্পরেণু মাখা। যে প্রেমের প্রভাবে তপস্বীর এই পরিবর্তন, সেই প্রেমের মর্ম কবিই জানে বলে উমা কবির পানে তাকিয়ে কৌতুক-হাসি হাসেন। যে সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রভাবে মহাদেবের এই পরিবর্তন, সেই সৌন্দর্য ও প্রেমের জয়গান কবির কাব্য-সংগীতে ধ্বনিত হল। (১৪)

'আগমনী' কবিতায় কবি বার্ধক্যে আবার যৌবনের শুভাগমন অনুভব করিতেছেন। মাঘের শীতে প্রকৃতি শুষ্কতা ও জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, হঠাৎ তাহার বুকে বসন্তের আবির্ভাব হইল। দখিন হাওয়ায় বসন্তের আগমনী বনে বনে প্রচারিত হইল। কোকিল, দোয়েল, শ্যামা, কপোত আগমনী-সংগীত গাহিয়া উঠিল। আমের বোলের গন্ধে বাতাস উচ্ছ্বসিত হইল, পুষ্পকুঞ্জে মাধবী, শিরীষ, কনকচাঁপা, বনমল্লিকার মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। কবির অন্তর-প্রকৃতি বার্ধক্যের শীতে আড়ষ্ট, শুষ্ক, রিক্ত হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ সেখানে যৌবন-বসন্তের চঞ্চলতা ও উল্লাস ফিরিয়া আসিল।

কবির হৃদয় আজ বসন্তের সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ,—

বনের তলে নবীন এল, মনের তলে ভোর।

জীবন-শেষে বাহিরের বিচিত্র কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সেই সৌন্দর্য ও প্রেমের জগতে কবি আবার প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন,—

আলোতে তোরে দিক না ভ'রে ভোরের নব রবি,
বাজ্‌রে বীণা বাজ্‌।
গগনকোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্‌রে দুলে কবি,
ফুরালো তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর-বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে, বাঁধন যাক-টুটি।

যখন কবির যৌবনের সেই লুপ্ত দিনগুলি আবার ঘুরিয়া আসিল, আবার তিনি বহুদিন পরে সেই জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও প্রেমের জগতে প্রবেশ করিলেন, আবার তাঁহার 'সোনারতরী-চিত্রা'র জীবনকে ফিরিয়া পাইলেন, তখনই তাঁহার

বহুকালবিস্মৃতা, কাব্যসৃষ্টির প্রেরণাদাত্রী, তাঁহার মানস-সুন্দরী, বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মী জীবন-দেবতার সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহার যৌবনের নিরুপমা প্রিয়তমা, লীলাসঙ্গিনী কাব্য-লক্ষ্মী আজ জীবন-সন্ধ্যায় দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া কিঙ্কিণী বাজাইয়া পূর্বপরিচিত-কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিতেছে। এই অসময়ে সাক্ষাতের আনন্দ-বেদনা ব্যক্ত হইয়াছে বিখ্যাত কবিতা 'লীলাসঙ্গিনী'তে।

কবির যৌবনের লীলাসঙ্গিনী আজ দ্বারে উপস্থিত। তাহার এলোচুল ও চঞ্চল অঞ্চলের সেদিনকার পরিমল কবিকে উতলা করিতেছে। কতো লীলা-বিচিত্র দিন কবি তাঁহার প্রিয়তমার সঙ্গে কাটাইয়াছেন। কখনো ইসারায়, কখনো চকিত-চাহনিতে, কখনো বা হাসি, কখনো বা বাঁশিতে ডাকিয়া, সব কাজ ভুলাইয়া, সে প্রিয়তমা কবিকে জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য-সম্ভোগের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এই অসময়ে, বহু কাজের দেয়ালঘেরা রুদ্ধ-কক্ষে, তাঁহার পুরানো খেলার সাথীর উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য কি?

নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে,—
অযাত্রাপথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে?

আবার কি তাঁহাকে সৌন্দর্য-প্রেম-রসোচ্ছল কবিজীবন আরম্ভ করিতে হইবে?

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি?
কল্পনাপটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি?

কিন্তু জীবনের দিন যে ফুরাইয়া আসিয়াছে, বার্ধক্যে কবিত্বশক্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে, এই অসময়ে আবার নূতন করিয়া রূপ-রসের খেলায় যোগ দিবার শক্তি তো তাঁহার নাই,—

দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষরাগিণীর বীণ।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।

এবার লীলাসঙ্গিনীর সহিত তাঁহার শেষ খেলা হইবে মৃত্যুর নিশীথ-অন্ধকারে, কিন্তু তাহাতে কবির ভয়-ভাবনা নাই, তাঁহার গোপনরঙ্গিণী, রসতরঙ্গিণী, প্রিয়তমা যে চিরজীবনের চেনা।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে।
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে?
... ...
যদি রাত হয়, না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি তবু ছলিবে কি,
হে গোপনরঙ্গিনী।

এই যে সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার প্রিয়া তাঁহাকে খেলায় নিমন্ত্রণ করিল, এ যে তাঁহার নিশীথ-রাত্রিকে প্রভাত-সূর্যের আলোকচ্ছটায় রঞ্জিত করা। কবির হারিয়ে-ফেলা সেদিনের বাঁশি আজ তাঁহার লীলাসঙ্গিনী খুঁজিয়া আনিয়াছে, যে-সুর কবিকে সে শিখাইয়াছিল, কবির বুকের তলায় সেই সুর গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে, সে-দিনের চাঁপাফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, এই অন্ধকারে কবির প্রাণে জাগিয়াছে অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা, বাতাস কাঁপিতেছে ছুটির গানে গানে থরথর করিয়া—প্রিয়া তাহার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া কবিকে তাহার বুকের মাঝখানে টানিয়া লইতে চাহিতেছে। বৃদ্ধ কবি যে তাঁহার যৌবনের প্রিয়তমার কেবল স্মৃতি-পূজা করিবেন, ইহা তাঁহার প্রিয়ার অভিপ্রেত নয়, তাঁহার প্রিয়া চায় তাঁহার সহিত আবার লীলা-বিলাস। কবিও তাহাতেই রাজী হইয়াছেন,—

তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি। (খেলা)

তাঁহার লীলাবিলাসিনী প্রিয়তমাকে আজ বুকে না জড়াইয়া ধরিলে কবির উপায় নাই। তাই কবি সেই প্রিয়তমাকে জীবন-সন্ধ্যায় আবার খুঁজিতে বাহির হইলেন। যে প্রিয়া একদিন

নিখিলের আনন্দমেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল; দিল আনি

ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলিপাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্তে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়ালো পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথমে দুলায়ে দিল রূপের মণিকা ;
. . . . . .

তাহাকে

এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পুজিতে। (শেষ অর্ঘ্য)

কবির হৃদয়ে সেই সুন্দরী ক্ষণিকার আবির্ভাব কবির জীবনব্যাপী ভাব ও চিন্তার উপর কী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কী তিনি পাইয়াছেন, কী হারাইয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন কবি অপূর্ব ভাবরসোদ্বেল কবিতা 'ক্ষণিকা'য়।

ক্ষণিকা ক্ষণে ক্ষণে কবির হৃদয়কে এক সময়ে সৌন্দর্য ও প্রেমের অনির্বচনীয় আনন্দে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। কবি মনে করিয়াছিলেন, সেই ক্ষণ-স্পর্শের প্রভাব সংসারের ধূলিতলে মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ দেখিতেছেন, তাহার প্রভাব গোপনে তাঁহার গানের ছন্দকে অধিকার করিয়া আছে।

তাহার ক্ষণিক আবির্ভাব সংকোচের ছায়াতলে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, তারপর সে একবার পিছনে দৃষ্টিপাত করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল,—কিন্তু সেই বিদায়-কালীন দৃষ্টির রহস্য ও মাধুর্য কবির স্থায়ী সম্পদ হইয়া রহিয়াছে,—

তার সেই ত্রস্ত আঁখি সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন।

যদি সেদিন চঞ্চল-চরণে তাঁহার ক্ষণিকা বিদায় না লইত,—

তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হলে পরমলগ্নে, সখী,
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি।

আজ জীবন-সন্ধ্যায় কবি সেই চঞ্চল, পলাতকা ক্ষণিকাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছেন,—সমস্ত সৌন্দর্য ও আনন্দের উৎসের সন্ধান পাইতে চাহিতেছেন,—

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী-'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা ;
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা।

'কৃতজ্ঞ' কবিতায় কবি তাঁহার প্রিয়তমা লীলাসঙ্গিনীকে বহুদিন ভুলিয়া থাকার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। বহুদিন হইল তাঁহার প্রিয়া শেষ চুম্বন দিয়া গিয়াছে, 'সেদিনের চুম্বনের পরে কত নব বসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে' শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কতো সন্ধ্যা 'সোনার বিস্মৃতি' আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে, কত রাত্রি 'স্বপনলিখন' দিয়া সে স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যৌবন-বসন্তের সেই বাণী যদি আজ ভুলিয়া গিয়া থাকেন, সে প্রেম-বেদনার দীপ যদি নিবিয়া গিয়া থাকে, তাহার জন্য কবি ক্ষমা চাহিতেছেন। তবে এ কথা কবি স্বীকার করিতেছেন যে, তাঁহার প্রিয়তমাব আবির্ভাব জীবনে যে অক্ষয় সম্পদ দান করিয়াছিল, সে দানের অনুগ্রহ হইতে তিনি এখনো বঞ্চিত হন নাই,—

একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে
আজো নাই শেষ,.........
তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কি পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান।

বিশ্বের সৌন্দর্য-মাধুর্যের দেবীর এই আবির্ভাব যে কবির জীবনে এক পরম বিস্ময়কর মহা সত্য,—সকল বিস্মৃতির মধ্যে এই আবির্ভাবের স্মৃতি তো অক্ষয়,—

আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন—
সব মানি—সব চেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন।

কবির জীবনে এই প্রিয়তমার স্থান এবং বিচ্ছেদের বেদনা অপরূপ মাধুর্যে প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতাটিতে।

এই ভাবধারার আর দুইটি কবিতা 'দোসর' ও 'বকুলবনের পাখি'। 'অসীম-

নীলিমা-তিয়াষি' বকুলবনের পাখীর মতোই কবির 'দূরে-যাওয়া মনখানি', 'উড়ে-যাওয়া' আঁখি। সে তাঁহার ছেলেবেলার বন্ধু—তাঁহার গানের সাথী। জীবন-সন্ধ্যায় আবার মুক্ত আকাশে কবি তাঁহার সেই বন্ধুর সহিত 'শ্যামলা ধরার নাড়ীর' গান গাহিতে গাহিতে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে,—

আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখি।
আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে
বিদায়ের আগে লওগো আপন ক'রে।
শোনো শোনো, ওগো বকুল বনের পাখি,
সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে না কি।
পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার
খেয়াল খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার,
শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার
সুরের সুরার সাকী।

'আহ্বান' কবিতায় কবি তাঁহার কাব্যপ্রেরণার দেবী, তাঁহার রসলক্ষ্মী, তাঁহার অন্তরবাসিনী জীবন-দেবতার স্বরূপ, কবির সহিত তাঁহার নিগূঢ় সম্বন্ধ, কবির জীবনে তাঁহার কাজ ও প্রভাব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মননশীলতার সহিত পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই পূরবীর লীলাসঙ্গিনী-ভাবধারার একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা।

কবির কাব্যলক্ষ্মী কবির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য কবিকে আহ্বান করেন, কবিও তাঁহার কবি-জীবনের চরম সার্থকতার জন্য বার বার তাঁহাকে অন্বেষণ করেন। উভয়ের যখন মিলন হয়, কাব্যলক্ষ্মী যখন কবিকে গ্রহণ করেন, তখন কবি তাঁহার সত্যপরিচয় পান। কাব্যের অনুপ্রেরণার উপস্থিতি ও উপলব্ধিতে কবি আত্মসচেতন হন ও নিজেকে কবি বলিয়া জানিতে পারেন।

সংসারের বাস্তবজীবনের আবিল কর্মস্রোতে শত-সহস্রের সঙ্গে সর্বক্ষণ কবি ভাসিয়া চলেন। সাধারণের সঙ্গে তাঁহার কোনো পার্থক্য থাকে না। নিজের কবি-সত্তাকে ভুলিয়া একেবারে 'অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে' নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁহার রস-লক্ষ্মী সেই সাধারণ অবস্থা হইতে, সেই 'নামহীন, দীপ্তিহীন, তৃপ্তিহীন, আত্মবিস্মৃতির তমসা'র মধ্য হইতে অকস্মাৎ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন। তখন কবি তাঁহার কবি-সত্তাকে উপলব্ধি করেন এবং সেই আত্মোপলব্ধির আনন্দ তাঁহার সংগীতে প্রকাশ পায়।

উষার আবির্ভাবে যেমন আলোকের ঐশ্বর্য সারা আকাশকে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় খচিত করে, আলোক-বীণার অপার্থিব সংগীত যেমন বিশ্বে অপূর্ব চাঞ্চল্য জাগায়

—ধরণীর উচ্ছ্বসিত আবেগ প্রকাশ পায় তৃণ-রোমাঞ্চে—বনে বনে জাগে প্রাণের হিল্লোল—ধরণীর নগণ্য ধূলিও 'বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি পত্রপুষ্পভারে'—জল-স্থল-আকাশ এক অভূতপূর্ব আনন্দ-শিহরণে ও আত্মপ্রকাশের বেদনায় অধীর হইয়া ওঠে,—তেমনি কবির কাব্যপ্রেরয়িত্রী দেবী সেই স্বর্গীয় আলোক-ধারার মতো কবির হৃদয়-আকাশকে বহুবর্ণসমারোহে রঞ্জিত করিয়া অপূর্ব আবেগে রোমাঞ্চিত করিয়া দেন। তিনি 'দেবতার দূতী', 'মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে' 'স্বর্গের আকৃতি' বহিয়া আনেন, 'ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে যে অমৃতবারি গুপ্ত' আছে, তাহারই সন্ধান দেন। কবির কাব্য-প্রেরণা—তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভা, নব নব সৃষ্টির আনন্দ-বেদনায় কবিকে চঞ্চল করিয়া তোলে এবং কবি এই ধরণীর, এই জীবনের, নিতান্ত সাধারণ, নগণ্য বস্তুর মধ্যেও অসাধারণত্বের ও অলৌকিক সৌন্দর্যের সন্ধান পান। এই কল্যাণী দেবীই তাঁহাকে দুর্লভ কবি-সৌভাগ্যের অধিকারী করেন।

এই লীলারঙ্গিণী প্রিয়তমা কবিকে একবার খুঁজিয়া লইয়াছিল, আজ জীবন-সন্ধ্যায় কবি তাঁহার সেই অভিসারিকার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। আজ তাঁহার দীপ নির্বাণপ্রায়, বীণা মৌন, চারিদিক নির্জন অন্ধকার। সে আসিয়া তাঁহার দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিবে, নীরব বীণায় ঝংকার তুলিবে, অন্ধকার আলোকিত করিবে। কবি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর চরম আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। এ জীবনে তাঁহার শেষগান গাওয়া হয় নাই—নবতম সৃষ্টির চরম রূপ ফুটিয়া ওঠে নাই, কেবল অপ্রকাশের বেদনায় কবি বিনিদ্র প্রহর যাপন করিতেছেন, কিন্তু কোথায় তাঁহার প্রত্যাশিতা প্রিয়া ?

কোথা তুমি শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে ?
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ, রমণী,
নীরব নিশীথে ?

সে লীলাসঙ্গিনী প্রিয়া তাঁহার নীরবতা ও অপ্রকাশের অন্ধকারের বুক বিদ্যুতের আলোকে চিরিয়া দিক, তাঁহার বর্ষণ-ক্লান্ত কবিত্বশক্তির মেঘে কালবৈশাখীর নবশক্তির বেগ ও বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করুক ; কবি-প্রতিভা-মেঘের দান—তাহার বৃষ্টিধারা আজ স্তব্ধ, অবরুদ্ধ, কবির প্রিয়া সেই নিরুদ্ধ, স্তম্ভিত কাব্য-মেঘকে দুঃসহ বেগে মুক্ত করুক, কবিও তাঁহার অবরুদ্ধ কাব্য-দান বর্ষণ করিয়া শান্তি লাভ করুন।

এই শেষজীবনে যদি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী একবার তাঁহাকে দিয়া চরমতম সৃষ্টি করাইয়া চির-বিদায়ও লন, তবুও কবির দুঃখ নাই। কারণ শেষ সার্থকতার গৌরবে তাঁহার জীবন আনন্দময় ও শান্তিময় হইয়া উঠিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার লীলাসঙ্গিনী বহুক্ষণ তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবীর প্রেরণা আর কবি বৃদ্ধবয়সে অনুভব করিতেছেন না।

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রাসহচরী।
দক্ষিণ পবন
বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি,
নিকুঞ্জভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার।

কবির অন্তর-গহন-বাসিনী এই রহস্যময়ী কাবর পূজারিনী। সেই তো অনুপ্রেরণা দিয়া, নব নব কাব্য-সৃষ্টির অর্ঘ্য বচনা করিয়া, তাঁহার কবি-সত্তাকে অর্চনা করিতেছে। জীবনসন্ধ্যার নির্জন মন্দিরে কি সে শেষ পূজা করিবে না? আরতির দীপ কি সে আর জ্বালিবে না? হৃদয়ের অস্পষ্টতার অন্ধকারেব মধ্যে যে বাণী লুকাইয়া আছে, তাহাকে মন্ত্রপাঠে উদ্বোধিত করিবে না? সে পূজা যখন সম্ভব হইল না, তখন এ জন্মের মতো পূজারিনীর

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলি।

মরণের পরে, পরজন্মে কি কবি প্রিয়তমার পূজা পাইবেন না—আবার কি কবি হইয়া সৃষ্টির প্রেরণাকে নব নব কাব্যে রূপায়িত করিবেন না? এ জীবনের শেষ পূরবী রাগিণী কি পরজন্মের প্রভাতী ভৈরবী রাগিণীতে পরিণত হইবে না?

'অপরিচিতা', 'আনমনা', 'বিস্মরণ', 'স্বপ্ন', 'শেষ বসন্ত', প্রভৃতি এই ভাব-ধারার কবিতা। বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে কবি লীলাসঙ্গিনী, রসরঙ্গিণীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, কাব্যলক্ষ্মীর প্রকৃত স্বরূপ প্রভৃতি ঐসব কবিতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই লীলাসঙ্গিনী-ভাবধারার কবিতাগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, কবি-মানস-প্রবাহের এই স্তরে, কবি জীবন-মধ্যাহ্নের জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও প্রেমের উজ্জ্বল ও রসমধুর যুগকে কামনা করিতেছেন—আবার তত্ত্ব, দর্শন ও

পর্যালোচন ছাড়িয়া নিছক শিল্পী-জীবন ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছেন। সেই যুগের মধুর স্মৃতিগুলি তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে, তাহারা অপূর্ব-সুন্দররূপে কবির কাছে প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু আর সে-দিন ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই—বার্ধক্য আসিয়া পড়িয়াছে; আবার, চিরপথিক মানুষের কাছে জীবনের এই রূপ-রসের, হাসি-কান্নার কোনো যথার্থ মূল্যও নাই। অথচ এই জীবন যে তাঁহার প্রকৃত আনন্দরসের জীবন—এ জীবনের কাব্যসৃষ্টি তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম ধন, তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়া যে কবির পক্ষে বিষম বেদনাদায়ক—পরম দুর্ভাগ্য। এই আনন্দ-বেদনার দ্বন্দ্ব এই ভাবধারার কবিতার মধ্যে একটা শান্ত-করুণ মাধুর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(খ) এই ভাবধারার কবিতায় কবি মৃত্যু-চিন্তাকে নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছেন। প্রকৃতির নানা ক্ষণস্থায়ী রূপ-রসের বস্তু ও মানবজীবনের চরম পরিণাম চিন্তা করিয়া কবি তাঁহার জীবনের ও তাঁহার এই জগতের রূপরস-ভোগের পরিণাম সম্বন্ধে একটা ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। মহাযাত্রা তাঁহাকে করিতেই হইবে, এবং সেই সত্যের পটভূমিকায় জগৎ ও জীবনের যে নানা রূপ কবির চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রকাশ হইয়াছে এইসব কবিতায়। 'যাত্রা', 'উৎসবের দিন', 'ঝড়', 'পদধ্বনি', 'শেষ', 'অবসান', 'মৃত্যুর আহ্বান', 'সমাপন', 'বৈতরণী', 'কঙ্কাল', 'অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতায় কবির এ সংসার হইতে বিদায়ের চিন্তা কোনো-না-কোনো রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি কবিতায় বলাকার চিন্তাধারার সাদৃশ্য আছে।

'যাত্রা' কবিতায় কবি শরৎ-প্রভাতের সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে যাত্রার আয়োজন অনুভব করিতেছেন। আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলে বনতল আচ্ছন্ন—'তারা মরণকূলের উৎসবে ছুটেছে দলে দলে।' তবুও তাহারা এই প্রভাতে, বিদায়ের ক্ষণে, তাহাদের জীবনান্তকারী প্রভাত-সূর্যের আলোর দিকে হাসিমুখে একবার তাকাইয়া বিদায় লইতেছে। এই যাত্রার প্রভাতে 'দিগবধূর বেণুতে বেণুতে বেজেছে ছুটির গান', ভাঁটার নদীর ঢেউগুলি মুক্তির কল্লোলে মাতিয়া, নৃত্যবেগে ঊর্ধ্বে বাহু তুলিয়া বলিতেছে, "চলো, চলো", 'বাউল উত্তরে-হাওয়া' মরণের রুদ্র-নেশায় দক্ষিণমুখে ধাইতেছে, তালপল্লব করতাল বাজাইয়া বৈরাগ্য-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে, কাশের মঞ্জরী প্রান্তরে প্রান্তরে, 'উৎকণ্ঠিত সুখে', 'বৃন্তবন্ধহারা, আনন্দিত সর্বনাশে উদ্দামের পথে' ধাবিত হইতে চাহিতেছে। তাহারা সব কবিকে ডাকিতেছে। কবিও বলিতেছেন,—

যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে

মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বরমাল্য-সাথে,.........
আমি তব সাথি।
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা,—মোর সুচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে,
সমর্পিব নির্বাণবাণীর হোমানলে।

'উৎসবের দিন' কবিতায় কবি উৎসবের মধ্যে, একটা 'অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি', একটা ভৈরবী রাগিণীর করুণ কান্না উপলব্ধি করিতেছেন। 'মিলনসুখের বক্ষোমাঝে', 'প্রেমের শিয়র-কাছে' নিত্য ভয় জাগিয়া আছে, 'আনন্দের হৃৎস্পন্দনে' 'বেদনার রুদ্রদেবতা' ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত হইতেছে। এই আনন্দের দিনে কবি প্রকৃতির রূপ-রসের মধ্যেও বিষন্ন রাগিণীর আভাস পাইতেছেন। কতোবার তাঁহার জীবনে সৌভাগ্য-লগ্ন আসিয়াছিল, বসুন্ধরা আশার লাবণ্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল, আজ উৎসবের সুরের সহিত সেই বিগত স্মৃতি মিশিয়া প্রভাতের আকাশ-বাতাসকে উদাস-করুণ করিতেছে। উৎসবের বাঁশি কবির কাছে আজ অন্য বার্তা আনিয়াছে,—

কালস্রোতে এ অকূলে আলোচ্ছায়া দুলে দুলে
চলে নিত্য অজানার টানে।
বাঁশি কেন রহি রহি সে-আহ্বান আনে বহি
আজি এই উল্লাসের গানে ?

কবি দূরের ডাকে সাড়া দিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতেছেন,—

যায় যাক, যায় যাক, আসুক দূরের ডাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাতবেগে সংগীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়নন্দন।
মুহূর্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক পথে মত্ত হয়ে বাজায়ে মাদল ;
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

'ছবি' কবিতায় কবি জাহাজে বসিয়া সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণ-সমারোহ দেখিতেছিলেন, তাঁহার মনে হইতেছিল, শীঘ্রই এই বর্ণচ্ছটা 'উদাসীন

রজনীর' কালো কেশের আড়ালে লুপ্ত হইয়া যাইবে। মানুষের জীবন-আকাশেও এইরূপ ক্ষণকালের জন্ম বর্ণের লীলাবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। আবার অন্ধকারে মুছিয়া যায়। আলো-ছায়ার এই লীলাই বিশ্বের চিরন্তন রহস্য,—

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্তে যায় রবি :
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ে কবির প্রাণে রুদ্রের জয়গান ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে এই রুদ্র-দেবতার আহ্বান কবি শুনিতে পাইতেছেন, সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া তাঁহাকে মহাযাত্রায় বাহির হইতে হইবে,—

বলে ঝড় অবিশ্রান্ত
"তুমি পান্থ, আমি পান্থ,
জয়, জয়, জয়।"
চলেছি সম্মুখ-পানে
চাহিব না পিছু।
ভাসিল বন্যার টানে
ছিল যত কিছু।
রাখি যাহা তাই বোঝা,
তারে খোওয়া, তারে খোঁজা,
নিত্যই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।
(ঝড়)

'পদধ্বনি' কবিতায় কবি, যে-নির্মম, উদাসীন অজানা আপন চরণ-তলে চিরদিন, পিছনের পথ মুছিয়া চলিয়াছে, যে-'নিত্যশিশু' কিছুই চায় না—কেবল 'নিজের খেলনাচূর্ণ ভাসাইছে অসম্পূর্ণ খেলার প্রবাহে', তাহারই পদধ্বনি নিজের বক্ষে শুনিতে পাইতেছেন। সে

ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ি মোর

শয্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান খেলায়।

তাহাতে কবির কোনো ভয়-সংশয় নাই—এ খেলার গোপন উদ্দেশ্য কবি জানেন,—

হোক তাই,
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারম্বার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন ক'রে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা।

ধ্বংস যে বিনাশ নয়, তাহার পরিণাম যে নব সৃষ্টি, সৃষ্টির নিরন্তন পরিবর্তন যে কোনো বৃহত্তর সার্থকতার জন্য, কবির এ ধারণা 'বলাকা'তে প্রকাশ পাইয়াছে। পূরবীতে কবি এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মৃত্যু তো সীমার বন্ধন ভাঙিয়া অসীমের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান দেয়, মৃত্যু বা কোনো ধ্বংস বা পরিবর্তন নিরর্থক নয়, তাহার অন্তরে আছে এক মহান উদ্দেশ্য। 'শেষ' কবিতায় কবি বলিতেছেন,—

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব বেশ,
কী মহিমা।
জ্যোতির্হীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি,
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার।
হয় সে অমৃতপাত্র সীমার ফুরালে অহংকার।

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, ক্ষণিক জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য-উপভোগ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বৃথা হইয়া যায় না। মৃত্যুর পারে, অদৃশ্যের উপকূলে, তাহারা পরিপূর্ণতায় সার্থক হইয়া বিরাজ করে। কবিও মনশ্চক্ষে দেখিতেছেন যে, তাঁহার জীবনের সমস্ত রূপ, বর্ণ, রস—তাঁহার সৌন্দর্য-প্রেম-উপভোগ, মৃত্যুর রূপহীন, সীমাহীন, সুপ্তি-সুগম্ভীর অন্ধকারে দীপ্তবেশে শোভা পাইতেছে,—

তোমার অরূপতলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে,
সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে
শ্রবণের পরপারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।

যে-সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্ম বেশে,
সে চিরমধুর
দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।
(বৈতরণী)

একটা পশুর কঙ্কাল মাঠের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কবি মনে করিতেছেন, পাণ্ডু অস্থিরাশি যেন ইঙ্গিতে তাঁহাকে বলিতেছে যে, এই পশুর যাহা পরিণাম, কবিরও তাহাই পরিণাম,—'প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে ভাঙাপাত্র পড়ে রবে অমনি ধূলায় অনাদরে'। কিন্তু কবি তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি তো কেবল অন্নপানের বিকারময় জড়দেহধারী পশু নন, তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি-বাক্-শক্তিরথ-মানুষ—তারপর অপার্থিব কবিত্ব-সম্পদের অধিকারী—চিরসুন্দর ও নিত্য-আনন্দের সেবক। তাঁহার মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের এই সামগ্রী তো নশ্বর দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হইতে পারে না—ইহারা যে অনন্তের অংশ—অবিনশ্বর। তাই কবি বলিতেছেন—

যা পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্ত্যে তার কোথা পরিমাণ।
আমার মনের নৃত্য কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে।

… … …

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপমধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধারপ্রান্তরে। (কঙ্কাল)

কবি জীবন-সায়াহ্নের মৃত্যু-ভাবনাকে ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব-বিচার ও সত্য-দর্শনের প্রভাবে দূর করিয়া দিতেছেন। ভাব-গম্ভীর 'অন্ধকার' কবিতায় কবি বলিতেছেন, জীবনের পরপারের যে অন্ধকার সে তো শূন্যের আবাস-ভূমি নয়—নিঃশেষের অতলস্পর্শ গহ্বর নয়। সে নবসৃষ্টির পূর্বক্ষণের ধ্যান-গাম্ভীর্য—প্রকাশের পূর্বেকার মহান মৌনিতা। আলোকের জন্মস্থানই তো অন্ধকারের নিভৃত বক্ষে। তাই কবি জীবনের শেষে, বিশ্রামের জন্য অন্ধকারের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, যাহাতে আবার নূতন উদ্যমে নূতন জীবন আরম্ভ করিতে পারেন,—

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ার ধূসর।

হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।

যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে "দ্বার খোলো"।

কবি অন্ধকারের নিঃশব্দ গোপন ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন,—যে আলো প্রকাশের অপেক্ষায় সঞ্চিত আছে, তাহাই দেখিতে চাহিতেছেন। তাঁহার দিনের সমস্ত সঞ্চয়, তাঁহার সারা-জীবনের যশ, মান, অর্থ, আজ জীবন-সন্ধ্যায়, দিনের আলো শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহারা ঝুঁটা বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্ধকারের কষ্টিপাথরে তাহাদের অসারত্ব প্রমাণিত হইবে। কিন্তু একটি খাঁটি জিনিস তাঁহার আছে—সে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি। তাঁহার লীলাসঙ্গিনী কাব্যলক্ষ্মী তাঁহাকে এই দান দিয়াছিলেন। সেই কাব্য-প্রতিভা চিরন্তন, অম্লান;—এ-জন্মের এই দানকে কবি অন্ধকারের থালায় যেখানে অসংখ্য নক্ষত্র অপরূপ দীপ্তিতে শোভা পাইতেছে, তাহার মধ্যে রাখিয়া দিবেন। অন্ধকার অপরিবর্তনীয়, চিরকালের—তাই নিত্য-নূতন। অন্ধকারের মহান নৈঃশব্দ্য ও ধ্যান-গাম্ভীর্যের মধ্য হইতে কবির কবিত্ব-শক্তি জন্ম লইয়া কবে একদিন তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার ঠিক নাই। একদিন আত্ম-সচেতন হইয়া দেখিলেন, কবিত্বের অম্লান মাধুরী তাঁহার হৃদয়ের বিজন পুলিনে ভাসিয়া উঠিয়াছে—তিনি কবি হইয়া গিয়াছেন। অপ্রকাশ ও নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে রূপ ও বাণী। সারাদিনের কর্মের ধূলিজাল, খ্যাতি ও গর্বের আবর্জনা ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই চিরশুভ অম্লান কবিত্বশক্তি অন্ধকারেরই দান, তাহা আবার চিরন্তন, নিত্য-নবীন অন্ধকারকেই কবি ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছেন। এই কবিত্ব-শক্তির দ্বারাই কবি অন্ধকারের স্বরূপ চিনিয়াছেন,—অন্ধকারের ধ্যানের ঐশ্বর্য ও আনন্দ যে তাঁহার কবিত্বের অন্তরে নিহিত আছে। অন্ধকারের সঙ্গে কবির প্রাণের অচ্ছেদ্য ও চিরন্তন সম্বন্ধ কবি উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই সমস্ত প্রকাশ, সমস্ত রূপসৃষ্টি, সমস্ত নব নব সম্ভাবনীয়তার মূলাধার অন্ধকারকে আর তাঁহার ভয় নাই, সে যে তাঁহার প্রাণের সহিত চিরন্তন-সূত্রে আবদ্ধ, তাঁহার কবিত্বের আদিজননী,—

হে চরম, এরি গন্ধে তোমারি আনন্দ এল মিশে,
বুঝেও তখন বুঝি নে সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হল অবসান
আমার ধেয়ান হতে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
তোমার আকাশে।

'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' কবিতাটি পূরবীর একটি বহু-খ্যাত কবিতা। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি কেবল তাঁর অসীম স্নেহপ্রীতিই প্রকাশ করেন নি, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের ও তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কবিগুরু অনুপম কাব্য ও ছন্দে রূপায়িত করেছেন। এই কবিতাটি বিশেষভাবে আলোচ্য।

কবি বলছেন,—

(প্রথম স্তবক)

নববর্ষার মেঘরাজি আজ সমাগত রাজকীয় সমারোহে ধরণীর পূর্বতোরণে বজ্রধ্বনিতে তার আগমন-বার্তা জানিয়ে। বর্ষামেঘের এই ঐশ্বর্যময় আবির্ভাব বাল্মীকি, কালিদাস থেকে আরম্ভ করে যুগে যুগে কবির অনুভূতি ও কল্পনাকে করেছে আলোড়ন; তাঁদের কাব্য-বীণায় তুলেছে অপূর্ব ঝংকার; বর্ষার ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও সংগীত বাঁধা পড়েছে 'নবঘনমন্দ্রিত' সুরে আর উত্তাল 'তুমুল ছন্দে' কবির কাব্যে,—রচিত হয়েছে অপরূপ বর্ষাকাব্য। কিন্তু নববর্ষার এই রূপৈশ্বর্য আজ আর অমর্ত্যবাসী কবির হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারবে না; আর রচিত হবে না নববর্ষার আবাহনগীতি। আজ সারা প্রকৃতি মেতেছে বর্ষার কাজরি-গীতোৎসবে, পূবে-হাওয়ায় সিক্ত তরু-পল্লব দুলছে ঝুলন-দোলায়; কিন্তু যে কবি-ভারতী প্রতিবর্ষে বর্ষার নৃত্যগীতকে রূপায়িত করতো মর্মস্পর্শী সুরের চমকে আর নৃত্যদোদুল ছন্দে, সে আজ সর্ববিলাসবঞ্চিতা, রিক্তা বিধবার বেশে শিরে করাঘাত ক'রে লুটিয়ে পড়েছে ধুলোর পরে চরম দুর্ভাগ্যের বেদনায়;—সে আজ মূক, লুপ্তচেতন, বিগতশ্রী। প্রকৃতির বর্ষা-উৎসবের সংগীত ও নৃত্য আজ কিভাবে বাণীরূপলাভে সার্থক হবে? আবার শরৎ অপরূপ উৎসববেশে সজ্জিত হয়ে শুভ্র শেফালির সাজি-হাতে কবির আঙিনায় উপস্থিত হবে, কিন্তু কে তার শুভ্রোজ্জ্বল বেশের সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে অনুপম সুর ও ছন্দে প্রকাশ করে সার্থকতা দেবে? বৎসরে বৎসরে শরৎ জ্যোৎস্না-ধবল নিশিতে কবির ললাটে জ্যোৎস্নার বরণ-তিলক

পরিয়ে দিত। শরতের জ্যোৎস্না-উচ্ছলিত রাত্রির সৌন্দর্য, তার রহস্য, তার অনির্বচনীয়ত্ব তো প্রকাশ পায় কবির ধ্যানে, কবির অন্তরের গভীর উপলব্ধিতে, কবির বাণীরূপের সাহায্যে, তাই শরতের সমস্ত সার্থকতার কেন্দ্রই তো কবি—কবিই তার বরণীয় পুরুষ। শরতের মর্মজ্ঞাতা, রস-বেত্তা, সৌন্দর্য-প্রচারের অগ্রদূত সেই কবি আর আজ নাই। পূর্বের অভ্যাসবশে এবারেও শরৎ কবির সন্ধানে তার ঘরে প্রবেশ করবে, কিন্তু দেখবে কবি নাই। ব্যর্থ হবে তার সৌন্দর্য-মাধুর্য, তার অন্তরের বাণী প্রকাশের সম্ভাবনা; তাই তার অন্তরঙ্গ দরদী বন্ধুর বিহনে তার চোখের জল ঝরে পড়বে শিশির-ভেজা ফুলের সঙ্গে আর তারি সঙ্গে সারা প্রভাতের বুকের মধ্যে বাজতে থাকবে একটা করুণ বেদনার রাগিনী।

(দ্বিতীয় স্তবক)

সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম ছিল অপরিসীম ও অকৃত্রিম। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে তাঁর কাব্যে তিনি নব নব ছন্দ ও সুরে রূপায়িত করেছেন। তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে উচ্চ প্রতিবাদ; তিনি জর্জরিত করেছেন অন্যায়কারী, অত্যাচারীকে সুতীব্র ধিক্কার-বাণে। বাংলা কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ যোজনা করেছেন একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নূতন সুর, সে সুর কখনো উচ্চরবে, কখনো মৃদু-আলাপনে চিরদিন ঝংকৃত হবে বঙ্গ-ভারতীর কাব্যবীণায়। বাংলায় বসন্ত ও বর্ষা ঋতুতে প্রকৃতি নব নব সৌন্দর্য-বেশ পরিধান ক'রে তার আনন্দ প্রকাশ করে, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে বসন্ত ও বর্ষার অপরূপ চিত্র অঙ্কন করেছেন; বসন্তের কোকিলের কুহুস্বর, বর্ষার ময়ূরের কেকাধ্বনি সত্যেন্দ্রনাথকে নব নব ছন্দের প্রেরণা দান করেছে, কাননের বিচিত্র পুষ্প সম্ভারের সৌন্দর্যে তাঁর চিত্তের বিহ্বল আনন্দ রূপলাভ করেছে তাঁর কাব্যে।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে দেশপ্রেমের যে উদ্দীপনা ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীরসৈনিকদের উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দন ও জয়গান উচ্চারিত হয়েছে, বাংলা দেশের অনাগত যুগের তরুণরা যখন অন্ধকারময় ভীতির শৃঙ্খল ছিঁড়ে, স্বাধীন, নূতন জীবনের অভিযানে দুর্গম, সুকঠিন পথে নির্ভীকভাবে যাত্রা করবে, তখন তাঁর উদ্দীপনাময় কাব্য ও সংগীত থেকে তারা এক অপূর্ব প্রেরণা ও উন্মাদনা লাভ করবে। ঐ দেশপ্রেমের উদ্দীপনা ছাড়াও অনাগত যুগের পাঠক-পাঠিকা সত্যেন্দ্রনাথের বিচিত্র ছন্দোময় কাব্যের মধ্য থেকে নানাভাবে তাঁর পরিচয় লাভ করবে এবং তাদের সঙ্গে সত্যের উপাসক সত্যেন্দ্রনাথের চিরকালের বন্ধুত্ব-রাখি বাঁধা হবে।

(তৃতীয় স্তবক)

সত্যেন্দ্রনাথের ভাবীকালের দেশবাসীরা তাঁর চাক্ষুষ-দর্শনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলেও, তাঁকে তারা তাঁর কাব্যের মধ্যে অশরীরীরূপে অনুক্ষণ অনুভব করবে ; তাঁর ভাবধারা, তাঁর কল্পনা, তাদের কাছে চিরদিনের আনন্দ ও প্রেরণাস্বরূপ কাজ করবে। কিন্তু যারা তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল, তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিল, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ ছিল, তাদের ক্ষতি হবে অপরিসীম, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাদের বেদনা হবে প্রচুর।

রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুগত ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে দারুণ বেদনার সৃষ্টি করেছে। এই পরলোকগত বন্ধু কতো মিলনোৎসবে রবীন্দ্রনাথের আনন্দ বর্ধন করেছে ; তাঁর সহৃদয়তায়, শ্রদ্ধায় ভদ্রব্যবহারে, ভালোবাসায়, কাব্যালোচনায় আনন্দদানে ও গ্রহণে, রবীন্দ্রনাথকে এই বন্ধু বার বার মুগ্ধ করেছে, রবীন্দ্রনাথের বন্ধুমিলনোৎসব নব নব রসে পরিপূর্ণ ও সার্থক করেছে। এর পরে বন্ধুসমাগমে সত্যেন্দ্রনাথের অভাব একান্তভাবে অনুভূত হবে—সত্যেন্দ্রনাথের অদর্শনে চমকিত হয়ে উঠবে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়। তখনই মনে হবে, তিনি আর ইহজগতে নাই। তাঁর স্মৃতি বন্ধু-সভার সমস্ত আলাপ-আলোচনা, হাস্য-পরিহাসকে চাপা অশ্রুর কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে ম্লান করে দেবে।

(চতুর্থ স্তবক)

রবীন্দ্রনাথ এই মর্তভূমিতে শোকচ্ছায়ামলিন অন্ধকারে একেলা অবস্থান করছেন। এখানে প্রতিমুহূর্তে ধ্বংস ও মৃত্যুর অভিযান চলেছে, এই সর্ববিধ্বংসী মৃত্যুস্রোতের ধারে ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে রবীন্দ্রনাথ আবদ্ধ হয়ে আছেন। সত্যেন্দ্রনাথ এখন এই মর্তভূমি ছেড়ে আনন্দলোকে প্রয়াণ করেছেন। যে-সুন্দরের আরাধনা সত্যেন্দ্রনাথ করে গিয়েছেন মর্তভূমিতে তাঁর কাব্যসাধনায়, যাকে তিনি মর্তচক্ষুতে দেখতে পান নি, আজ অমৃতলোকে প্রবেশ করে তিনি কি সেই সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছেন ? আজ এই নবজীবনের উদয়-অচলে পৃথিবীর সর্ববন্ধনমুক্ত হয়ে, কোন্ নূতন ছন্দে, কোন্ নূতন সুরে, আনন্দলোকের নবসূর্যরূপ অপার্থিব সুন্দরের কোন্ বন্দনা-গীতি রচনা করলেন সত্যেন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের এটাই জিজ্ঞাস্য। সত্যেন্দ্রনাথের নব-সূর্যবন্দনার গানের অপার্থিব সুর আজ প্রভাত-আলোয় বন্ধু-বিরহ-বেদনার অশ্রুর সঙ্গে মিলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের কানে ভেসে আসছে। ঐ গানের সুর একদিকে যেমন সত্যেন্দ্রনাথের মর্ত-জীবনের চির-বিদায় ঘোষণা ক'রে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে বেদনার সঞ্চার করছে, অন্যদিকে সত্যেন্দ্রনাথের নূতন

অমর্ত-জীবনের শুভ-উদ্বোধন ঘোষণা ক'রে রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দও দিচ্ছে। মর্ত-জীবনের দিক থেকে এই গানের মধ্যে বিদায়ের করুণ ভৈরবী রাগিনী আছে, আবার অমর্ত-জীবনের দিক থেকে এর মধ্যে আসন্ন দেব-আরাধনার ভৈরব রাগের আলাপন শোনা যাচ্ছে।

(পঞ্চম স্তবক)

যে জন্ম-তরীর মাঝি আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন দিনে সত্যেন্দ্রনাথকে পরপারে নিয়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে বহুবার রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর কতদিন তার মিলন-লীলা-সংগীতে অজানা পথের আহ্বান রবীন্দ্রনাথের বুকে বেদনার সঞ্চার করেছে, সূর্যাস্তের স্বর্ণরাগরঞ্জিত রক্তিম আকাশ ইঙ্গিত করেছে অজানা পথের। রবীন্দ্রনাথের সেই জীবন-তরণীর কর্ণধার—তাঁর জীবন-দেবতার সঙ্গে আজ আবার তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। সে-ই আজ বর্ষায় ঝরেপড়া কদম্বকেশরের গন্ধসুরভিত সত্যেন্দ্রনাথের শেষ-বিদায়জ্ঞাপক পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই পত্রের উত্তর রবীন্দ্রনাথ নিজে হাতে করে নিয়ে যাবেন—যখন তিনি ইহজীবন পরিত্যাগ করে পরপারের জন্য সেই মাঝির তরণীতে উঠবেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ-বিদায়ের সেই শুভক্ষণ কখন আসবে তা তিনি জানেন না। হয়তো শরতে, যখন শিউলি ঝরে পড়ে বনতল আমোদিত করবে, হয়তো বসন্ত-প্রভাতে, যখন দক্ষিণ সমীরে পাখীর প্রথম কূজন শোনা যাবে, বা শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন ঝিল্লিরবমুখরিত সন্ধ্যায়, বা শ্রাবণের অবিরল ধারাপ্লাবিত মধ্যরাত্রে, বা কুয়াসাচ্ছন্ন হেমন্ত সন্ধ্যায়, তাঁর চিরবিদায়ের শুভলগ্ন উপস্থিত হবে।

(ষষ্ঠ স্তবক)

বিশ্বপ্রাণের লীলাবিলাসের একটি অঙ্গরূপে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের বহুপূর্বে এই সংসারে এসেছেন এবং সুখঃদুখের মধ্য দিয়ে অনেকখানি জীবনের পথ অতিক্রম করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ এসেছেন তাঁর পিছনে কবিরূপে, কাব্য-বীণা-হাতে, স্বাধীন ও তেজস্বী মন নিয়ে—সরস্বতীর আশীর্বাদ-মাল্য মাথায় প'রে। কিন্তু তিনিই আজ রবীন্দ্রনাথের আগে চলে গেলেন। এই ধরণীর ধূলি-মলিন দিনক্ষণগুলি, সমস্ত মিথ্যা আচ্ছাদন থেকে সত্যেন্দ্রনাথ মুক্ত হলেন। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কবি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন হয়ে গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এখন সর্বব্যাপী বিশ্বচিত্তলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেখানে নিরন্তর গম্ভীরভাবে অনন্ত রাগিনী ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সংগীত বিচিত্র সৌন্দর্যরূপে সৃষ্টিধারার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। সত্যেন্দ্রনাথ সেই বিশ্বচিত্তলোক-প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের অগ্রগামী। যদি মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ

যেখানে যান, তবে এক অভিনবরূপে রবীন্দ্রনাথকে দেখবেন, পাবেন তাঁর নূতন পরিচয়। কি যে সে রূপ, কি সে পরিচয় তা তিনি এখনও জানেন না। যে রূপেই তিনি সতেন্দ্রনাথকে দেখতে পান না, তিনি আশা করেন, সত্যেন্দ্রনাথ বেন এই লজ্জা-ভয়-সুখ-দুঃখবিজড়িত ধরণীর জীবনের স্মৃতি ভুলে না যান। এই মর্তজন্মে তাঁর মুখে যে নম্র, স্নিগ্ধ হাসি ছিল, যে অকপট, বলিষ্ঠ সরলতা ছিল, যে সহজ সত্যের আলোক ছিল, এবং ভাষণে যে সংযম ছিল, তাই নিয়েই যেন সত্যেন্দ্রনাথ এই নবাগত জ্যেষ্ঠ কবি-ভ্রাতা ও বন্ধুকে সেই অমর্তলোকের দ্বারের কাছে অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করেন, ইহাই রবীন্দ্রনাথের একান্ত কামনা।

২৫

লেখন

(কার্তিক, ১৩৩৪)

ও

স্ফুলিঙ্গ

(২৫শে বৈশাখ, ১৩৫২)

'লেখন' কতকগুলি ছোট ছোট কবিতার সংগ্রহ। যখন কবি চীন-জাপান প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যান, তখন সে দেশের লোক তাঁহার হস্তাক্ষর রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে খাতায়, রেশমী কাপড়ে, রুমালে, পাখায় তাঁহাকে কিছু লিখিয়া দিতে অনুরোধ করে। সেই অনুরোধ মিটাইবার ফলে এই ছোট ছোট কবিতা-গুলির উৎপত্তি। এই কবিতাগুলি ও ঐ সঙ্গে উহাদের অনেকগুলি ইংরাজী অনুবাদ কবির হস্তাক্ষরে বার্লিনে ছাপা হয়। ইহার কতকগুলি কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ১৩৩৪ সালের ভাদ্রমাসের 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'লেখন'এর ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন,—

"এই লেখনগুলি সুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায়, কাগজে, রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তারপরে স্বদেশে ও অন্যদেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি ক'রে এই টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল। ......জর্মনিতে হাতের অক্ষর ছাপবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখনগুলি ছাপিয়ে নেওয়া গেল।"

পরে কবি ১৩৩৫ সালের কার্তিক-সংখ্যা প্রবাসীতে এই বইএর উৎপত্তি ও এই প্রকারের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ব'লিয়াছেন,—

"যখন চীন জাপানে গিয়েছিলেম, প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষর-লিপির দাবী মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে।...দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট ক'রে দিয়ে তার যে একটা বাহুল্য-বর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হ'লেই তাকে কবিতা ব'লে উপলব্ধি আমাদের বাধে।...জাপানে ছোট কাব্যের অমর্যাদা নেই। ছোটর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেননা তারা জাত্ আর্টিস্ট—সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না।...এইরকম ছোট ছোট লেখায় আমার কলম যখন রস পেতে লাগল, তখন আমি অনুরোধনিরপেক্ষ হয়েও খাতা কিনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি, এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিনয় করে বলেছি—

আমার লিখন ফুটে পথ-ধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে-জিনিসটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখিনে—যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুলে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়ো-ফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হ'তে পারে।"

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির কবি নাম দিয়াছেন, 'কবিতিকা'। ইহারা কবির পূর্বের লেখা 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলির প্রায় সম-শ্রেণীর। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে একটা ভাব, তত্ত্ব বা অনুভূতিকে উপযুক্ত উপমা বা তুলনার সাহায্যে রূপায়িত করিয়া সুন্দর ব্যঞ্জনামুখর করাই এই প্রকার রচনার সার্থকতা। এই জাতীয় রচনায় রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি এই জাতীয় কবিতা কিছু কিছু লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি অনেকক্ষেত্রে হইয়াছে নীতি বা তত্ত্বের পদ্যরূপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টি তাহাতে নাই। 'কণিকা'র মধ্যে কিছু কিছু তত্ত্বের অংশ থাকিলেও 'লেখন' বা 'স্ফুলিঙ্গ' গ্রন্থে তত্ত্বের অংশ খুব কম। কবির পরিণত হাতে অনেকগুলির মধ্যে কাব্য-সৌন্দর্যের অপরূপ প্রকাশ হইয়াছে। এক একটি ভাব, অনুভূতি বা তত্ত্ব, ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সহজ ও সরলভাবে রূপায়িত হইয়া ব্যঞ্জনা, সৌন্দর্য ও রসে মণিখণ্ডের মতো ঝলমল করিতেছে।

নানা সময়ে, নানা প্রয়োজনে লিখিত ও ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কবির এইরূপ রচনা তাঁহার মৃত্যুর পর 'স্ফুলিঙ্গ' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। একই রূপের কবিতা বলিয়া 'লেখন'এর সঙ্গেই ইহাদের আলোচনা করা হইল।

স্ফুলিঙ্গের প্রকাশক লিখিয়াছেন,—

"১৩৩৪ সালে লেখন প্রকাশিত হয়। লেখনের সগোত্র আরও বহু কবিতা রবীন্দ্রনাথের নানা পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন পত্রিকায়, ও তাঁহার স্নেহভাজন বা আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংগ্রহে এতদিন বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল। শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন স্বাক্ষর-সংগ্রহের খাতা হইতে এইরূপ অনেকগুলি লেখা চয়ন করিয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেন ; যাঁহাদের সংগ্রহে এইরূপ কবিতা ছিল তাঁহারাও অনেক বিভিন্ন পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিতাসমষ্টি হইতে সংকলন করিয়া স্ফুলিঙ্গ প্রকাশিত হইল।

লেখন গ্রন্থখানি প্রকাশের পূর্বে, উহা স্ফুলিঙ্গ নামে প্রকাশিত হইবে, একবার এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থে সেই নামটি ব্যবহৃত হইল। ইহার প্রবেশক কবিতাটি লেখন হইতে গৃহীত।

কবিতাগুলির অধিকাংশের রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ ; বিভিন্ন স্বলেখনসংগ্রহে কবির স্বাক্ষরে যে কবিতার যে তারিখ পাওয়া যায়, তাহাই যে উহার রচনাকাল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বহু কবিতা লেখন-প্রকাশের পরবর্তীকালে রচিত, কতকগুলি লেখনের সমসাময়িক, বহু পুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতেও কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে।"

এই দুই গ্রন্থ কবি মানসের ক্রম-অগ্রসর ইতিহাসে কোনো স্তর নির্দেশ করে না। ইহারা একেবারে আকস্মিক।

লেখন ও স্ফুলিঙ্গের কবিতাগুলির সৌন্দর্য ও রসমাধুর্যের পরিচয়ের জন্য কয়েকটা কবিতা উদ্ধৃত করা গেল :—

লেখন

আঁধার সে যেন বিরহিণী বধু
অঞ্চলে ঢাকা মুখ,
পথিক আলোর ফিরিবার আশে
বসে আছে উৎসুক ॥

সুন্দরী ছায়ার পানে
তরু চেয়ে থাকে ;
সে তার আপন, তবু
পায় না তাহাকে ॥

সমস্ত আকাশভরা
আলোর মহিমা
তৃণের শিশির-মাঝে
খোঁজে নিজ সীমা ॥

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল,
সেই তারি আনন্দ ॥

সূর্যাস্তের রঙে রাঙা
ধরা যেন পরিণত ফল।
আঁধার রজনী তারে
ছিঁড়িতে বাড়ায় করতল ॥

কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ, নাই তার লাজ,
পূর্ণতা অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ।
বসন্তের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের সুন্দর এ বাধা ॥

স্ফুলিঙ্গ

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে॥

গাছ দেয় ফল ঋণ ব'লে তাহা নহে।
নিজের সে দান নিজেরি জীবনে বহে।
পথিক আসিয়া লয় যদি ফলভার
প্রাপ্যের বেশি সে সৌভাগ্য তার॥

বড়ো কাজ নিজে বহে আপনার ভার।
বড়ো দুঃখ নিয়ে আসে সান্ত্বনা তাহার।
ছোটো কাজ, ছোটো ক্ষতি, ছোটো দুঃখ যত-
বোঝা হয়ে চাপে, প্রাণ করে কণ্ঠাগত॥

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু॥

যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে—
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে॥

কল্লোলমুখর দিন ধায় রাত্রি-পানে।
উচ্ছল নির্ঝর চলে সিন্ধুর সন্ধানে।
বসন্তে অশান্ত ফুল পেতে চায় ফল;
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে চলিছে চঞ্চল॥

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন॥

যতো বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর-আকাশে-আঁকা,
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা॥

বেছে লব সব-সেরা, ফাঁদ পেতে থাকি—
সব-সেরা কোথা হতে দিয়ে যায় ফাঁকি।
আপনারে করি দান, থাকি করজোড়ে—
সব-সেরা আপনিই বেছে লয় মোরে।

যে রত্ন সবার সেরা
তাহারে খুঁজিয়া ফেরা
ব্যর্থ অন্বেষণ।
কেহ নাহি জানে, কিসে
ধরা দেয় আপনি সে
এলে শুভক্ষণ॥

২৬

মহুয়া

(১৩৩৬, আশ্বিন)

একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের তাগিদ মিটাইবার জন্য 'মহুয়া'র উদ্ভব হইলেও রবীন্দ্র-কবি-মানসের ক্রম-অগ্রসর ধারার সহিত যে ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই একথা বলা যায় না। বারে বারে কবির কাব্যের বেশ-বদল হইয়াছে, নবতর কাব্যে নূতন রূপ ও নূতন ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা একেবারে আকস্মিক নয়। পূর্বের ভাবচক্রের অন্তর্নিহিত কোনো বীজের হয়তো সে নবরূপ— কোনো নিগূঢ় ভাব-চেতনার ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া। ফরমাসের তাড়ায় 'মহুয়া'র উদ্ভব হইলেও, প্রাথমিক উদ্দেশ্যটা পিছনে পড়িয়া আছে, কবি সেই অন্তরের প্রচ্ছন্ন ভাবধারার নবরূপ দিয়াছেন এই কাব্যে। এই নবরূপ পূর্বরূপ হইতে পৃথক হইলেও, ইহা একেবারে ভিন্ন ও আকস্মিক নয়। প্রকৃতির ছয় ঋতুর আবর্তনের মধ্যেও যেমন একে অন্যের সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন ধারাবাহিক সূত্রে আবদ্ধ, তাঁহার মনের ঋতুর পরিবর্তনেও নূতন নূতন রূপ ও রসের মধ্যে প্রচ্ছন্নযোগসূত্র বর্তমান—বর্ষার জলভরা কালো মেঘ হয়তো শরতের লঘু শুভ্র মেঘে পরিবর্তিত, শরতের স্ফটিকবিন্দুর মতো শিশির হয়তো শীতের কুয়াসায় রূপান্তরিত। কবির মনের এ ঋতু 'বলাকা' বা 'পূরবী'র ঋতু নয় ইহা ঠিক, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে কোনো অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধও নাই একথা বলা যায় না। কবি নিজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

> "বারো মাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে-ঋতু যায় সে আর-এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা করে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না এ হতেই পারে না, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলের মতো।"
>
> (শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে কবির পত্র—'মহুয়া'র পাঠ-পরিচয়ে উদ্ধৃত)

'মহুয়া'র পাঠ-পরিচয়ে উহার উৎপত্তিসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিয়াছেন,—

> "মহুয়া"র অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। এই সময়ে কথা হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহার দেওয়া যায় এইরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল ; এই সব কবিতা এখন "মহুয়া" নামে বাহির হইতেছে।
>
> ইহার কিছু পূর্বে, ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে, "শেষের কবিতা" নামে উপন্যাসের জন্য কয়েকটি কবিতা লেখা হয়। ভাবের মিল হিসাবে সেই কবিতাগুলিও এই সঙ্গে ছাপা হইল।"

'নির্ঝরিনী', 'শুকতারা', 'অচেনা', 'পথের বাঁধন', 'বাসরঘর', 'বিদায়', 'প্রণতি', 'নৈবেদ্য', 'অশ্রু', 'অন্তর্ধান' নামে কবিতাগুলি 'শেষের কবিতা' হইতে লওয়া। মহুয়ার 'বিচ্ছেদ' ও 'বিরহ' নামে কবিতা দুইটি 'শেষের কবিতা'র জন্য লিখিত হইলেও ঐ উপন্যাসে ব্যবহার করা হয় নাই।

মহুয়া কাব্যের উদ্দেশ্য ও মূল ভাব সম্বন্ধে কবি স্বয়ং চমৎকার একটা বিবৃতি দিয়াছেন,—

"লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা—প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে—আর তাঁরই দালালি করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল·········ফরমাস ব্যাপারটা মোটরগাড়ির স্টার্টার-এর মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু তারপরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক্ প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাসের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে।

'আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতি-কাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতে তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধন-বেগই প্রবল।

মহুয়ার "মায়া" নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে—নিজের ভিতরকার বর্ণে, রসে, রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান-গন্ধ, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত-লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হোতে থাকে—সেখানে ভাবে ভঙ্গীতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্যে ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়ত্ব ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের এই মায়ালোকের কাব্য; তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।'

এই দুয়ের মধ্যে নূতনের বাসন্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে—নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকত না।··· এই বইএর প্রথমে ও সব শেষে যে-গুটিকয়েক কবিতা আছে সেগুলি মহুয়া পর্যায়ের নয়। সেগুলি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের। দোল-পূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নব-বসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা বলে নকীবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।

কাব্যের বা কাব্য-সংকলনগ্রন্থের নামটাকে ব্যাখ্যামূলক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নামের দ্বারা আগে-ভাগে কবিতার পরিচয়কে সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়া আমি অত্যাচার মনে করি। কবিতার অতি-নির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছা করেই মহুয়া নামটি দিয়েছি, নাম পাছে ভাষ্যরূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে! অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সঙ্গতি আছে—মহুয়া বসন্তের অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা।"

বহুদিন অতীন্দ্রিয় জগতে বাস করিয়া পূরবীতে কবি শ্যামলা ধরণীর উপর, মানুষের স্নেহ-প্রেমের মধ্যে, অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছেন, ইহা আমরা

দেখিয়াছি। যে প্রেম মর্তমানব-চিত্তের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার সৌন্দর্য ও রহস্তের মধ্যে কবি প্রবেশ করিয়াছেন 'মহুয়া'য়। পূরবীর জগৎ ও জীবন-প্রীতি মহুয়াতে এক নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—পূর্বের ঐ ভাব-চেতনার জের চলিয়াছে বর্তমান গ্রন্থে। বাহিরের তাগিদ হইয়াছে একটা উপলক্ষ্য, উহা কেবল তাঁহার মনের কোণে সঞ্চিত এই বিচিত্র ভাবধারার প্রকাশের সুবিধা করিয়া দিয়াছে মাত্র। ইহা কবি-মানসের ক্রম-বিবর্তনের একটা অংশ, একেবারে আকস্মিক নয়।

প্রেমের অনুভূতি কবি-চিত্তের স্বভাবজ বৃত্তি। চিত্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অনুভূতি নানারূপে পরিবর্তিত হয়। প্রথম যৌবনের প্রেমানুভূতি ও প্রেমের কল্পনা পূর্ণযৌবনে বদলায়, যৌবনের অনুভূতি প্রৌঢ়ত্বে, প্রৌঢ়ত্বের অনুভূতি বার্ধক্যে বদলায়। এই বিভিন্ন স্তরের অনুভূতির মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকিলেও, রূপ হয় বিভিন্ন। মহুয়ার প্রেমানুভূতি, মানসী-সোনারতরী-চিত্রা বা ক্ষণিকার অনুভূতি নয়, পূরবীর অনুভূতিও নয়। রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেম চিরকালই নরনারীর দেহ-মনের আকাঙ্ক্ষা-কামনার ঊর্ধ্বে একটা ভাবময় প্রেরণা—যৌনাকর্ষণবর্জিত, দেহমন-নিরপেক্ষ একটা ভাব-সাধনা মাত্র। তাঁহার প্রেম-কবিতায় উৎকৃষ্ট কাব্য, সংগীত ও ব্যঞ্জনার অপরূপ লীলা থাকিলেও, দেহসৌন্দর্যের যে-নিবিড় আকর্ষণ প্রাণের সমস্ত তন্ত্রীতে ঝংকার তুলিয়া উন্মত্ত রাগিণীর সৃষ্টি করে, 'প্রতি অঙ্গ তরে প্রতি অঙ্গ কাঁদে' যে-চরম কামনা দেহকেই স্বর্গ বলিয়া মনে করে ও এ জড়দেহকেই চিরন্তনত্ব দান করে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল' বলিয়া অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, যে-আকাঙ্ক্ষা দেহ ও মনকে ঘিরিয়াই তাহার সার্থকতার স্বপ্ন রচনা করে, দেহ ও মনের সমস্ত লীলা ও অভিব্যক্তির মধ্যে পায় চরম আনন্দ ও রহস্যের সন্ধান, সেই নরনারীর পরস্পর আকর্ষণ, কামনা-আকাঙ্ক্ষার সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত মনোহর প্রকাশ তাহাতে নাই। ইহা ক্ষণিকা পর্যন্ত প্রেম-কবিতায় লক্ষ্য করা গিয়াছে।

বার্ধক্যে আধ্যাত্মিক এবং নানা তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভাব-চিন্তার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া আসিয়া কবি আবার যে প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে প্রেমের একটা ভিন্নরূপ আমরা দেখিতে পাই। এ প্রেমও সেই দেহমনের ঊর্ধ্ব-স্তরে ; ইহা প্রেমের অন্তর্নিহিত স্বরূপ, মানবজীবনে প্রেমের প্রভাব ও মাহাত্ম্য, বর্ণনা—প্রেমের জয়ঘোষণা। ইহা প্রেমের তত্ত্ব ও দর্শনের অপূর্ব কাব্যরূপ। তবুও বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহারের উপযোগী কবিতা-রচনার কথাটা প্রথমে মনে থাকায় বোধহয় সাধারণ নরনারী সম্বন্ধে কবিকে একবার ভাবিতে হইয়াছিল, তাই স্থানে স্থানে রক্তমাংসের নরনারীর হৃদয়ের উষ্ণতাপ আমাদিগকে একটু স্পর্শ করে, আভাস,

ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনায় দেহাকাঙ্ক্ষার একটা সূক্ষ্ম আবহাওয়া মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। তবে মোটের উপর ইহারা ভাবধর্মী, আদর্শমূলক প্রেম-কবিতা, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রেম-কবিতার প্রায় সমশ্রেণীর। তবে ইহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রেমের ভাব-কল্পনার ইহা একটা নূতন রূপ—ইহা প্রেমের তপস্যা, পূজা ও তত্ত্বনিরূপণ।

'মহুয়া'র এই নবপর্যায়ের প্রেমে আর একটি নূতনত্ব আছে। কবি প্রেমকে একটি মহীয়সী শক্তিরূপে অনুভব করিয়াছেন। প্রেম নরনারীকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন করে, সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অপরাজেয় শক্তি ও সাহস দান করে। এই প্রেম অনেকখানি বাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনে দুঃখদুর্দিনের ঝড় যখন বহিবে, অসত্য, কুশ্রীতা, ছলনা যখন পদে পদে বিড়ম্বিত করিবে জীবনকে, তখন এই প্রেমই চিত্তকে মহত্ত্বের দিকে প্রসারিত করিয়া দিবে, প্রাণে সঞ্চার করিবে বিপুল বিশ্বাস। এই প্রেম বাসরকক্ষে বা সেবাকক্ষে দেহকেন্দ্রিক ভোগের জন্য কেবল নরনারীকে আহ্বান করে না, এই প্রেম প্রবল আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে এবং জীবনে যা-কিছু বৃহৎ ও মহৎ তার দিকে আকর্ষণ করে, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যুক্ত করে। এই প্রেম আত্মার বন্ধন নয়—মুক্তি।

কবি 'মহুয়া'র কবিতাগুলির মধ্যে দুইটি দল দেখিয়াছেন। একদলে আছে প্রণয়ের 'প্রসাধন-কলা', অপরদলে প্রণয়ের 'সাধন বেগ'। কথা দুইটি চমৎকার ভাবপ্রকাশক। প্রেম হৃদয়কে ইন্দ্রধনুর নানা বর্ণে রঞ্জিত করে, সেই বর্ণ-বৈচিত্র্য দেহমনকে অবলম্বন করিয়া নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ পায়। ইহাই প্রেমের ইন্দ্রজাল—প্রেমের পরমসুন্দর মায়া। প্রেমের এই প্রসাধন লীলাই কেবলমাত্র পর্যাপ্ত নয়, ইহার সহিত গভীর আবেগ ও নিবিড় ধ্যান-মাধুর্যের প্রয়োজন, তবেই প্রেম পরিপূর্ণরূপে শোভা পায়। মহুয়ায় এমন অনেক কবিতা আছে যাহাতে উভয় অংশই মিলিত হইয়াছে।

একটু বিস্তৃতভাবে দেখিলে মহুয়ার মধ্যে তিনটি ভাবধারার কবিতা লক্ষ্য করা যায়,—

(ক) প্রেমের নবতর উদ্বোধন।

(খ) প্রেমের বিচিত্র বর্ণসমারোহ ও মায়াজাল।

(গ) প্রেমের দুরূহ সাধনা।

(ক) মহাদেবের রোষবহ্নিতে দগ্ধ মদনকে কবি পুনর্জীবিত করিতেছেন 'উজ্জীবন' কবিতায়। মদনের মধ্যে যে স্থূল ও রূঢ় অংশ ছিল, যে কলুষ ছিল, রুদ্রের ক্রোধাগ্নিতে তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়া নির্মল নূতনরূপে তাহার আবির্ভাব হোক, ইহাই কবির কামনা। কামনা-বাসনামুক্ত, নিষ্কলঙ্ক প্রেমের

নিত্য-জ্যোতির্ময় রূপ ফুটিয়া উঠুক। সে প্রেমের অধিকারী হইবে যে নরনারী, তাহারাই বীরত্ব-গৌরবের অধিকারী। সে প্রেম হইবে প্রখর দীপ্তিময়, তাহাতে কামনার ক্ষুদ্রতা ও লোলুপতা থাকিবে না, তাহাতে স্বপ্নবিহ্বলতা ও কোমল ভাবপ্রবণতা থাকিবে না, সংসারের কঠিন বাস্তব-ভীতি থাকিবে না—সে প্রেম চলিবে জীবনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ বাহিয়া, সমস্ত লৌকিক লজ্জা-ভয় উপেক্ষা করিয়া। পুষ্পধনুর সেই নব জন্ম, সেই নবরূপ কবি কামনা করিতেছেন—

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি,
অমৃত সে মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমিরতোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথচক্র-নির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।
(উজ্জীবন)

এই অমিত-বীর্যশালী, সত্য-প্রতিষ্ঠ প্রেমকে কবি আবাহন করিয়াছেন 'মহুয়া'য়। কবির প্রেমের ভাব-কল্পনায় ইহা একটা নূতন রূপ।

প্রেমের আগমনের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে মহুয়ার প্রথম কয়েকটি কবিতায়। প্রেম-দেবতার সহিত তাঁহার অনুচর, 'নকীব' বসন্ত মাধবী প্রভৃতির আগমন কবি ঘোষণা করিয়াছেন, 'বোধন', 'বসন্ত', 'বরযাত্রা', 'মাধবী', 'বিজয়ী' প্রভৃতি কবিতায়। 'কুমার-সম্ভব'এর তৃতীয় সর্গের অকাল-বসন্তের বর্ণনার ক্ষীণ ছায়া যেন উহার উপর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতিতে একটা উন্মাদনা ও মিথুন-ভাবের সৃষ্টি প্রেমের আবির্ভাবের পক্ষে স্বাভাবিক ও উপযুক্ত, তাই কবি এই সুন্দর পট-ভূমিকাটুকু গড়িয়াছেন।

(খ) মহুয়ার দ্বিতীয় ধারার কবিতার মধ্যে চলিয়াছে প্রেমের প্রসাধনলীলার রূপ-বৈচিত্র্য। 'অর্ঘ্য', 'দ্বৈত', 'সন্ধান', 'শুভযোগ', 'মায়া', 'নির্ঝরিনী' 'শুকতারা', 'প্রকাশ', 'বরণডালা', 'অসমাপ্ত' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের নানা রূপ, নানা ভঙ্গী, নূতন নূতন সৃষ্টি-সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ইন্দ্রজাল ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'নাম্নী'

কবিতাগুচ্ছও এই পর্যায়ের অন্তর্গত। নারীর বিচিত্র রূপের ঐশ্বর্য ও রসের অপরূপ চিত্র এগুলি।

প্রেম প্রণয়িনীকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করে। চোখে আসে নূতন দৃষ্টি, কণ্ঠে নূতন বাণী, হাসিতে বাঁশির সুর, সারা দেহমন বাসন্তী রঙে রঙীন হইয়া ওঠে,—

আজ যেন পায় নয়ন আপন
নতুন জাগা।
আজ আসে দিন প্রথম দেখায়
দোলন লাগা।
... ...
আমার প্রকাশ নতুন বচন ধরে,
আপনাকে আজ নতুন রচন করে,
ফাগুন-বনের গুপ্ত ধনের
আভাস-ভরা;
রক্তদীপন প্রাণের আভায়
রঙীন করা॥

(অর্ঘ্য)

প্রিয়ার দেহ-মনে অপূর্ব ছন্দে প্রিয়-বরণ গান বাজিয়া উঠিয়াছে—প্রাণের পূর্ণ স্রোতে পূজার অর্ঘ্য ভাসিয়া আসিয়াছে,—

মোর তনুময় উছলে হৃদয়
বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি
হোক না সারা।
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা,
দেহ ঘিরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে।
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর
সকল কাজে॥

(বরণডালা)

'মায়া' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, প্রিয়া-প্রিয়তমের অন্তরের গহনতলে প্রবেশ করিয়া বর্ণ-গন্ধ-গানে প্রিয়তমের হৃদয়কে নূতনরূপে গড়িয়া তুলিবে। প্রিয়তমের দেহ-মন লীলায়িত হইবে সেই বর্ণ গন্ধ-গানের লীলায়; এক ভাবময়,

মায়াময় রাজত্বে হইবে তাহাদের বাস। এ এক অপূর্ব নূতন জগৎ। বস্তুজগৎ মিলাইয়া গিয়া সেই পরমসুন্দর জগৎ সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিবে,—

হাওয়ার ছায়ায় আলোর গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি রচে
আপন করো।

'নারী' কবিতাস্তবক রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর এমন কবিত্বময় চিত্র কোনো সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়াছে কিনা জানি না। এক এক টাইপের নারী যেন আমাদের কল্পনায় রূপ ধরিয়া উঠিয়া অজস্র আনন্দ-বিস্ময়ে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। 'শ্যামলী'র চিত্র,—

সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে,
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে;
নুয়ে-পড়া তটতরু ঘনছায়া-ঘেরে
ছোট ক'রে রাখে আকাশেরে।
জগৎ সামান্য তার, তারি ধূলি পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে,
মধু তার নিজ-মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।
গৃহকোণে ছোটো দীপ জ্বালায় সেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।

'কাজলী'র চিত্র—

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মতো,
তৃষ্ণাহরা
আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা।

সে যেন গো তমালের ছায়াখানি
অবগুণ্ঠনের তলে পথ-চাওয়া আতিথ্যের বাণী।

'হেঁয়ালী'র রূপ—

যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।
নূতন ধাঁধায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তারে,
কেবলি আলো-আঁধারে
সংশয় বাধায় :—
ছল-করা অভিমানে বৃথা সে সাধায়।
সে কি শরতের মায়া
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া?

'নাগরী'র রূপ,—

রঙ্গ-সুনিপুণা,
প্রেমবাণ-সন্ধান-দারুণা।
অনুগ্রহ-বর্ষণের মাঝে
বিদ্রূপ-বিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে।
সে যেন তুফান
যাহারে হেলন করে সে তরীকে করে খান্ খান্
অট্টহাস্যে আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে :
প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে
রেখেছে সে কণ্টক-অঙ্কুর বুনে বুনে :

(গ) মহুয়ায় কবির যে প্রেম-কল্পন, সে প্রেম শক্তিতে দৃঢ়, স্বপ্নালুতা ও ভাব-প্রবণতার ঊর্ধ্বে, সংসারের প্রতিকূল পরিস্থিতি ও দুঃখবিপদের মধ্যে অটল, অচল। সংসারের সাধারণ নরনারীর প্রেম হইতে ইহা ভিন্ন, তাই ইহার সাধক ও সাধিকাকে হইতে হইবে বীর। এই বীরাচারী সাধক ও সাধিকাই প্রেমের সত্য-মূর্তির দর্শন পাইবে, অনিত্যের মধ্যে নিত্যের সন্ধান তাহাদেরই মিলিবে ও মৃত্যুর মধ্য হইতে তাহারা অমৃত আহরণ করিবে। এই দুরূহ প্রেমের সাধক, বীর-প্রেমিক তাহার প্রিয়তমাকে বলিতেছে,—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর-রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে।

ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—
তুমি আছ, আমি আছি। (নির্ভয়)

এই প্রেমের শক্তিতে শক্তিশালিনী নারী বলিতেছে,—

যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন,
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে?
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা। (সবলা)

এই বীর প্রেম-পূজারী তাহার প্রিয়তমাকে চিত্তের সমস্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে; তাহার প্রিয়ার প্রেম তাহাকে সংসারের সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা, গ্লানি-কালিমা, মনুষ্যত্বের সর্ব-বন্ধন ও খর্বতা হইতে মুক্ত করিয়া মহত্ত্বের উদার প্রতিষ্ঠান-ভূমিতে স্থাপিত করিবে। এই দুর্লভ সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতাকে প্রেমিক বলিতেছে,—

সেবাকক্ষে করি না আহ্বান;—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে-বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।
... .
হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চিরসত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি,—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ॥
(প্রতীক্ষা)

'লগ্ন', 'বরণ', 'মুক্তিরূপ', 'স্পর্ধা', 'আহ্বান' প্রভৃতি কবিতায় প্রণয়ী-প্রণয়িনী ধ্যান-গম্ভীর, সর্ববন্ধনহীন, চিরমুক্ত, শান্তির আনন্দময়, সংসারের সমস্ত দুঃখবেদনা-

বিজয়ী, লালসার গ্লানিহীন, চিরন্তন প্রেম কামনা করিতেছে। এই প্রেমলাভেই তাহাদের প্রেম-সাধনার চরম পরিণতি—জীবনের পরম সার্থকতা।

প্রেম অমৃত—স্বর্গের চিরন্তন সম্পত্তি। প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে ইহা ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হইলেও, তাহাদিগকে অমৃতের স্বাদ দিয়া কৃতার্থ করে। তারপর প্রেম যদি তাহাদের হৃদয় হইতে চলিয়াও যায়, তবুও কোনো ক্ষতি নাই। একবার তাহারা যে-প্রেমলাভে ধন্য হইয়াছে—সেই প্রেমের স্মৃতিই তাহাদের অক্ষয় আনন্দ প্রস্রবণ। উহাই অনুক্ষণ তাহাদিগকে প্রেমের স্বাদ জোগাইবে। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকার সমস্ত হৃদয় একবার জুড়িয়া বসিয়াও যদি নিঃশেষ হইয়া যায়, তবুও কেহ কাহাকে দোষী করা ঠিক নয়। প্রেমহীন মিলনকে স্থায়ী করিতে গেলে, সে প্রেম হয় বন্ধনস্বরূপ। জীবনের পথে চলিতে চলিতে, জীবনের গতিস্রোতের মধ্যে, নর-নারী একবার ভালোবাসিয়া আবার ভুলিতে পারে, বা প্রতিদান না দিতে পারে, কিন্তু যে মুহূর্তটিতে তাহারা প্রেম অনুভব করিয়াছিল, সেটি তো অমর—চির-উজ্জ্বল। সেই ক্ষণিক প্রেম চির-বিরহের পটভূমিকায় চিরন্তন হইয়া থাকিবে—অনিত্য হইবে নিত্য। 'দায়-মোচন', 'প্রত্যাগত' প্রভৃতি ও 'শেষের কবিতা' হইতে উদ্ধৃত কবিতাগুলির মধ্যে এই ভাবের ইঙ্গিত আছে।

জীবনের গতিস্রোতে, নানা ঘটনা ও মনোভাবের অনিবার্য আবর্তে, লাবণ্য অমিতের জীবন হইতে দূরে সরিয়া পড়িল, কিন্তু সে যে একদিন অমিতকে ভালোবাসিয়াছিল, সেই প্রেমের স্মৃতি তো অক্ষয়, জ্যোতির্ময়। সে তো স্বপ্ন নয়, সে যে সত্য। জীবনের সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে সেই তো অপরিবর্তনীয়। তাই লাবণ্য শেষ পত্রে লিখিয়াছে,—

তবু সে তো স্বপ্ন-নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু বিদায়॥
(বিদায়)

অমিতের কাছেও এই ক্ষণ-প্রেম চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে। বিচ্ছেদের সিংহদ্বার

দিয়া লাবণ্য চিরদিনের মতো তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে,—

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন
অন্তরে অলক্ষ্যালোকে তোমার পরম আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।
জীবন আঁধার হোলো, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছ দান।
বিচ্ছেদেরি হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে॥

(অন্তর্ধান)

'সাগরিকা' কবিতাটি মহুয়ার ভাবধারার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না হইলেও ইহাকে প্রেমকবিতার শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এক দেশের সহিত অন্যদেশের প্রেম-সম্বন্ধের নানা স্তর নায়ক-নায়িকার রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এই কবিতাটিতে। ভাব-কল্পনার বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিত্বে এবং ছন্দ, সুর ও তালের বিচিত্র প্রকাশে ইহা রবীন্দ্র-কাব্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন।

সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সংস্কৃতির যে বিজয়-অভিযান চলিয়া আসিয়াছে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির সেই অবদান সমষ্টিকে, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর সাহচর্য ও ভাববিনিময়ের রূপকচ্ছলে, অপূর্ব কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের শুষ্ক তথ্য কল্পনার বিচিত্র বর্ণসম্পাতে একটি ঐক্যবদ্ধ, উজ্জ্বল, রসোচ্ছল চিত্র-মূর্তিতে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করিবার সময় কবি বলীদ্বীপকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।

অতীত ইতিহাসে ভারতের সহিত এই দ্বীপের নানা সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। ভারতের ধর্ম, নৃত্যগীত, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, অলংকারশিল্প, প্রসাধনপদ্ধতি প্রভৃতির প্রভাব ইহার অণুপরমাণুতে জড়াইয়া আছে—ইহার ভাব, চিন্তা ও কর্মকে নানারূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ভারতের এই প্রভাব, এই দান, আসিয়াছে বহুদিন ধরিয়া ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের গতিপথ বাহিয়া। সেই পূর্বযুগ হইতে ভারতের নানা প্রতিনিধি আসিয়াছে এই মিলন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নানা রূপে ও নানা বেশে। কবি কল্পনা করিতেছেন—তিনি ভারতের সেই রাজপ্রতিনিধি, ভারতের সাংস্কৃতিক দূত—প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি আসিয়াছেন এদেশে

নানা বেশে, নানা কামনা-বাসনা লইয়া, নানা অবস্থায়। এই বিংশ শতাব্দীতেও তিনি আসিয়াছেন ভারতের প্রতিনিধি হইয়া, তবে পূর্বের সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নয়, মাত্র কবির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া।

এই দেশের সহিত বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায় মিলনের বিস্ময়-আনন্দ-বেদনা-উদ্বেলিত কবিচিত্তের ইতিহাসই এই কবিতাটির বিষয়বস্তু।

প্রথম যুগে সাগরকূলে এই অপূর্বসুন্দর দেশ দেখিয়া ভারতীয়েরা আসিয়াছিল এখানে ব্যবসা ও উপনিবেশ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে। তাহার প্রতিনিধি তখন বীরের বেশে আসিলেও তাহার ধর্ম ও পূজাপদ্ধতির প্রভাব দ্বারা এদেশে এক নূতন ধর্ম ও উপাসনা-পদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। সে বাণিজ্যিক অভিযান ধর্মের অভিযানে—সাংস্কৃতিক অভিযানে পরিণত হইয়াছিল—হৃদয়-জয়ে পর্যবসিত হইয়াছিল। কবি ভারতের সেই প্রথম অভিযানের সেনাপতিরূপে নিজেকে কল্পনা করিয়া তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন কবিতাটির প্রথম দুই স্তবকে।

এই দ্বীপ সাগরকূলে প্রথম প্রভাতে এক অপূর্ব সুন্দরী নারীমূর্তিতে কবির চোখে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই নারী সাগরজলে সদ্য স্নান করিয়া উপল-বিছানো তীরে ভিজে এলোচুলে বসিয়া ছিল। হলদে রঙের শাড়িখানির শিথিল প্রান্ত চারিদিকে কুঞ্চিত হইয়া মাটির উপর লুটাইতেছে। অনাবৃত তাহার বক্ষ—দেহ তাহার অলংকারহীন। প্রভাত-সূর্যের স্বর্ণরশ্মি তাহার উন্মুক্ত আভরণহীন দেহের সৌন্দর্যবিধান করিতেছিল। কবি এই স্বভাব-সুন্দরীর অনিবার্য আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কবির অঙ্গে রাজ-প্রতিনিধির যোদ্ধবেশ। মাথায় তাঁহার মুকুটের চূড়া মকরাকৃতি। হাতে ধনুর্বাণ। বিদেশী বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিলেন।

নারী এই অসম্বৃত ও অসহায় অবস্থায় এক বিদেশীকে সৈনিকবেশে দেখিয়া ভয়ে চমকিয়া উঠিল। হয়তো ভাবিল, বিদেশী তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। সভয়ে সে বিদেশীর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। যোদ্ধবেশী তাহাকে তৎক্ষণাৎ অভয় দিলেন। বলিলেন, তাঁহার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। তাহার কোনো বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য তিনি নষ্ট করিবেন না। কেবল তাহার অপূর্ব-সুন্দর ফুলের বাগান হইতে দেবপূজার জন্য কিছু ফুল তুলিবেন। নারীর ভয় গেল দূরে। কবি নানাপ্রকারের ফুল তুলিলেন। নারী সানন্দে তাঁহার সহযোগিতা করিল। শেষে দুইজনে ফুলের ডালি সাজাইয়া লইয়া নটরাজ শিবের পূজা করিলেন। কবির অর্ধাঙ্গিনীরূপে নারী দেবপূজায় তাঁহার সহিত মিলিত হইল। যে ভয়, অবিশ্বাস ও সন্দেহের কালিমা তাহার চারিদিকে এতক্ষণে

জন্মিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। মহাদেবের বাহিরের মূর্তি ভয়ংকর ও আচার-ব্যবহার অস্বাভাবিক হইলেও পার্বতী যেমন তাঁহার হৃদয় জানিয়া, তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া প্রসন্ন-কল্যাণ হাস্যে তাঁহাব প্রতি প্রেমজ্ঞাপন করেন, এই নারীও সেইরূপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যে সৈনিকবেশীর উপর প্রেম, বিশ্বাস ও আস্থা জ্ঞাপন করিল।

ভারত ও বলীদ্বীপ প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইল ও বলীদ্বীপ ভারতের শৈবধর্ম পরমানন্দে গ্রহণ করিল।

তারপর ইতিহাসের পরবর্তী এক যুগে ভারতের অলংকার, প্রসাধন, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি এই দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিল। সেই যুগেরও প্রতিনিধি কবি। এই যুগের প্রতিনিধির কার্যাবলী কবিতার পরবর্তী দুইটি স্তবকে বর্ণিত হইয়াছে।

ভারত-প্রেমিকা এই দ্বীপ-নারী সন্ধ্যাবেলায় একেলা ঘরে বসিয়া ছিল। পরনে তাহাব নীল শাড়ি—গলায় ছিল মালতীর মালা—হাতে দু'খানি কাঁকন। এমন সময় কবি দ্বারে উপস্থিত হইয়া অতিথি বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। ভয়ে তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া রাজবেশী অতিথিকে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অতিথি বলিল—তাহার কমনীয় দেহখানি নানা আভরণে সাজাইবে বলিয়া সে আসিয়াছে। আনন্দোজ্জ্বল স্নিগ্ধহাস্যে নারী সম্মতি জানাইল। কাব অর্ধচন্দ্রাকৃতি সোনার হার তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন, মাথার খোপার উপরে পরাইয়া দিলেন তাঁহার মকরাকৃতি-চূড়াবিশিষ্ট সেই মুকুটটা। সখীদল আলো জ্বালিয়া দিল। রত্ন-অলংকারে নারীর সারাদেহ ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। তারপর চলিল কবির সঙ্গে সারারাত্রিব্যাপী নৃত্য-গীত। কবির বাজনার তালে তালে নারী বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচিতে লাগিল। আকাশ ছিল পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত—সাগরজলে ছিল আলো-ছায়ার লীলা—যেন অর্ধনারীশ্বরের নৃত্য চলিতেছে।

এই যুগে ভারতের অলংকার, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতির প্রভাব এই সব দ্বীপে বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং আনন্দের সঙ্গে দ্বীপবাসীরা এই প্রভাব গ্রহণ করিয়াছিল।

তারপর আসিল ভারতের দুর্দিন। সে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ হারাইল। হারাইল তাহার স্বাধীনতা। তাহার যে সুউচ্চ সংস্কৃতি ও সভ্যতা একদিন ভারতের আশে-পাশে নানা দেশ জয় করিয়াছিল, লোকে তাহা ভুলিয়া গেল। তাহার অপূর্ব সম্পদ কালসমুদ্রের অতল তলে ডুবিয়া গেল। এই সময়েও কবি সেই নষ্টগৌরব, শ্রীহীন দীন ভারতের প্রতিনিধিরূপে এই দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবারে তাঁহার আগমনের কোনো গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য নাই—কেহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল না তিনি কেবল চুপে চুপে তাঁহার বিগত ঐশ্বর্যের

স্মৃতিচিহ্নগুলি—তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল দানের বস্তুগুলি দেখিয়া যাইবেন। কবির এইবারের দৌত্য পরবর্তী দুই স্তবকে বর্ণিত হইতেছে।

আবার এই দ্বীপে আসিবার সময় প্রবল ঝড়ে কবির ধনরত্নভরা তরণি ডুবিয়া গেল। তাঁহার কপাল ভাঙিল। তিনি রাজবেশ ছাড়িয়া মলিন দীনবেশে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নটরাজের মন্দিরদ্বার খুলিয়া দেখিলেন—যে ফুল দিয়া বহু বর্ষ পূর্বে নটরাজকে তিনি পূজা করিয়াছিলেন, তখনো সেগুলি ডালিতে সাজানো আছে। কবির পূর্বতন প্রণয়িনীর অঙ্গে কবিরই হাতের পত্রলেখা অঙ্কিত, তাঁহারই দেওয়া মালা তাহার গলায়। কবির হাতে-বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দে সে উৎসবরাত্রে নানা ভঙ্গীর ললিতনৃত্যে ও গীতে তন্ময় হইয়া আছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নিদর্শন এই সব দ্বীপে ছড়াইয়া আছে। বহুবর্ষের ব্যবধানেও সে-সব নষ্ট হয়। নাই যে-কোন দর্শক বা বিদেশী পর্যটকের নিকট সেগুলি সুস্পষ্ট।

বহুশত বৎসর পরে, বিংশ শতাব্দীতে, কবি ভারতের প্রতিনিধি হইয়া এই দ্বীপে আবার আসিয়াছেন। এবার তাঁহার রাজবেশ নাই। মাথায় মুকুট, হাতে ধনুর্বাণ নাই। এবার তিনি এদেশের ফুলবাগানে ফুল তুলিতে আসেন নাই। এবার কেবল তাঁহার বীণাটি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। এবার তাঁহার পূর্ব-প্রণয়িনী তাঁহাকে চিনিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

কবির এবারের আসার কোনো সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। এবার তিনি কোনো ধর্মপ্রচার করিতে আসেন নাই—বা কোনো জ্ঞান বিতরণ করিতে আসেন নাই। এবার কেবল কবিচিত্তের প্রেম, প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিয়াছেন,—এবারে তাঁহার কাজ শুধু 'হৃদয় দিয়া হৃদয় অনুভব'—শুধু অন্তরে-অন্তরে ভাব-বিনিময়।

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'র প্রেমের ভাব-কল্পনার সহিত ইংরেজ কবি ব্রাউনিঙের প্রেমের ভাব-কল্পনার খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এই তেজোময়, বলিষ্ঠ, অচপল, তপঃসিদ্ধ প্রেমই ব্রাউনিঙের প্রেম।

ব্রাউনিঙের ভাব ও চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও চিন্তাধারার সাদৃশ্য আছে। এ বিষয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশ্বরিক সত্তায় ব্রাউনিঙ পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। জীবন অনন্ত ও অসীম। এই সংসারের ক্ষণিক জীবন সেই অনন্ত জীবনের সোপান মাত্র। জন্ম-জন্মের উত্থান-পতন, দুঃখ-বেদনা, অকৃতকার্যতা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া মানুষ এই আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে। এ জীবনের পরাজয়

ভবিষ্যৎ জয়ের সূচনা করিতেছে। ইহার অসম্পূর্ণতা ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত। মানব-সত্তার অমরত্ব ও তাহার অনন্ত সম্ভাবনীয়তায় ব্রাউনিঙ রবীন্দ্রনাথের মতোই আশাবাদী। Rabbi Ben Ezra, A Death in the Desert প্রভৃতি কবিতায় ও The Ring and the Book গ্রন্থের বহুস্থানে ব্রাউনিঙ এই ভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। নানা অসম্পূর্ণতায় পঙ্গু এই মানবজীবনকে তিনি গভীরভাবে ভালো-বাসিয়াছেন। ইহার রহস্য তাঁহাকে অসীম বিস্ময়ে মুগ্ধ করিয়াছে; ইহার অনিশ্চয়তা, ইহার সুখদুঃখকে তিনি গভীর তাৎপর্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। জীবনকে তিনি আর্ট ও ধর্মের উপরে স্থান দিয়াছেন। ব্রাউনিঙের মতে ভগবানকে লাভ করা ও মানবসত্তার ক্রমোন্নতির পথ প্রেমের মধ্য দিয়া। মর্ত্য-জীবনের উদ্দেশ্যই প্রেমের সাধনা। এই প্রেম-সাধনার দুইটি ধারা—একটি সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেম, অপরটি মানব-প্রেম। কিন্তু মানব-প্রেমের মধ্য দিয়াই ভগবৎপ্রেমে পৌঁছানো সহজ ও স্বাভাবিক মনে করিয়া ব্রাউনিঙ মানব-প্রেমকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। প্রেমই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—ইহাই মানুষ ও ভগবানের মিলনের সেতু। এই প্রেম-সাধনার সুযোগলাভের জন্যই তো জীবন,—

For life, with all it yields of joy and woe,
And hope and fear,......
Is just our chance o' the prize of learning love.

A Death in the Desert.

প্রেমের অনুভূতিতে জীবন ধন্য না হইলে জীবন যে বিফল,—

...It loses what it lived for
And eternally must lose it;

Christina.

তাই ব্রাউনিঙ তাঁহার কাব্যে প্রেমের অতো উদাত্ত জয়-সংগীত গাহিয়াছেন।

ব্রাউনিঙের কাব্যে প্রেম একটা সর্বগ্রাসী, সর্বপরিবর্তনকারী, ঊর্ধ্বে উত্তোলনকারী, অলৌকিক দীপ্তশক্তি। এই জলন্ত ঐশ্বরিক শক্তি হৃদয়ের সমস্ত আবর্জনা পুড়াইয়া, তাহাকে দেব-মন্দিরের মতো পবিত্র করে, ক্ষণ-অনুভূতিকে চিরন্তন অনুভূতির সহিত মিলাইয়া দেয়—এই শত অসম্পূর্ণতার ক্লিষ্ট, ক্ষণিক জীবনকে মহামহিমান্বিত ও নিত্যকালের সামগ্রী করে।

নানা কবিতায় ব্রাউনিঙ প্রেমের এই বিচিত্র শক্তির কথা বলিয়াছেন। বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতে নরনারীর প্রেমকে কবি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন—ইহার গভীর রহস্য ও তাৎপর্য তাঁহাকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছে।

প্রেমের অদ্ভুত যাদু-শক্তি ও অপরিসীম মূল্যের কথা ব্রাউনিঙ অনেক কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। Natural Magic কবিতায় কবি প্রেমকে ঐন্দ্রজালিকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রেমই এই মরুভূমির মতো জীবনকে চির-বসন্ত-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে। জীবন ছিল হিম-শীতল অন্ধ-কারা ; প্রিয়ার আগমনে সে রুদ্ধ গৃহ আজ অপূর্ব বাসন্তী সুষমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে,—

> This life was as blank as that room :
> I let you pass in here.·········
> Wide opens the entrance ; where's cold now, where's gloom ?

By the Fireside কবিতায় স্বামী তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে যে, প্রেম জীবনের অমূল্য সম্পদ। ইহার একটু কম-বেশিতে জীবনের বিরাট পরিবর্তন হয়,—

> Oh, the little more, and now mueh it is !
> And the little less and what worlds away !
> How a sound shall quicken content to bliss,
> Or a breath suspend the blood's best play,
> And life be a proof of this !

প্রেম তাহার জীবনে এক অক্ষয় আশীর্বাদ স্বরূপ নামিয়া আসিয়াছে—তাহার আত্মার শক্তি ও সম্ভাবনীয়তা বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে ; তাহার ক্ষুদ্র জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

Asolandoর Summum Bonum নামে চমৎকার কবিতাটিতে কবি প্রেমকে সংসারের সমস্ত বস্তুর মধ্যে সারবস্তু—সংসারের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা সাধনার চরম ফল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

> Truth, that's brighter than gem,
> Trust, that's purer than pearl,—
> Brightest truth, purest trust in the universe—all were for me
> In the kiss of one girl.

নারীর একটি চুম্বন জীবনের সমস্ত গৌরব, সমস্ত সত্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ঘনীভূত নির্যাস! প্রেমের কী অপূর্ব অনুভূতি, কী নির্ভীক প্রকাশ! মানব-জীবনের highest good বা চরম মঙ্গল—এই নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধে নানা মত বর্তমান। জ্ঞানবাদীরা বলেন, আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞানে মিলিয়া যাওয়াই মানব-জীবনের চরম আদর্শ ; বৌদ্ধেরা বলেন—সমস্ত কামনা-বাসনার নিবৃত্তি—নির্বাণ ; ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ও খৃষ্টানগণ বলেন, ভগবানের কৃপা ও ভালোবাসা লাভ করা ও তাঁহার সান্নিধ্য-সুখ উপভোগ করা ; চার্বাকপন্থীরা বলেন,

পার্থিব সুখভোগ, ওমর খৈয়াম বলেন, পেয়ালা ভরা সুরা। কিন্তু ব্রাউনিঙের কাছে প্রেমের মধ্যে, একটি তরুণীর চুম্বনের মধ্যেই মানুষের সেই চরম মঙ্গল নিহিত আছে। ইহা দেহসর্বস্ববাদীর ইন্দ্রিয়সুখভোগের পক্ষ-সমর্থন নয়, ইহা দেহকে অবলম্বন করিয়া মানুষের স্বভাবজ হৃদয়বৃত্তির সর্বোচ্চ প্রকাশের অনুভূতি—দেহের মধ্যস্থিত অনির্বচনীয় রহস্যের অনুভূতি। ইহা বাস্তবকে বাদ দিয়া নয়, বাস্তবের মধ্য হইতে উত্থিত অপার রহস্যের অনুভূতি। ইহাই ব্রাউনিঙের প্রেমের অনুভূতি। এই অনুভূতির মধ্যেই জীবনের সব রস-রহস্যের চরম সন্ধান কবি পাইয়াছেন। এই অনুভূতিতেই উঠিয়াছে ক্ষণিকের মধ্য হইতে চিরন্তন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ হইতে পরম ভাব, মৃন্ময়ী হইতে চিন্ময়ী।

প্রেম দেহমনকে কেন্দ্র করিয়া আবির্ভূত হইলেও ইহা অসীম ও অনন্ত। প্রেমের অনুভূতির মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও চিরন্তন বেদনা আছে। মানুষের সসীম হৃদয় সেই অসীম অনুভূতিকে ধারণ করিতে পারে না—তাই নিরন্তর চাঞ্চল্য অনুভব করে। Two in the Campagna কবিতাটিতে প্রেমিক প্রেমিকার দেহমনের নিবিড় মিলনেও তৃপ্তি পাইতেছে না। মিলন-মুহূর্তের আবেশ এক লহমায় কাটিয়া যাওয়ায় কি এক অপ্রাপ্ত বস্তুর সন্ধানে সে ব্যাকুল হইয়াছে। শুধু সে অনুভব করিতেছে,—

Infinite passion, and the pain
Of finite hearts that yearn.

ব্রাউনিঙের কাছে প্রেমের ক্ষণিক অনুভূতিও জীবনের মহা-মাহেন্দ্রক্ষণ। সেই ক্ষণ-অনুভূতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে জীবনের চরম সার্থকতা মিলিতে পারে। এই প্রেম কোনো দান-প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না, ইহার কাছে কোনো লাভ-লোকসানের খতিয়ান নাই, এমন কি মৃত্যুভয় পর্যন্তও ইহাকে বিন্দুমাত্র ম্লান করিতে পারে না। প্রেমই প্রেমের সার্থকতা ও পরিসমাপ্তি। Asolandoর Now ও Last Ride Together প্রভৃতি কবিতাতে ব্রাউনিঙ সেই পরমক্ষণকে চিরন্তন বলিয়া অনুভব করিয়াছেন,—'Out of all your life give me but a moment' —'The instant made eternity'. In a Gondola কবিতায় প্রেমিক এই প্রেমের অনুভূতিতে আত্মহারা হইয়া গভীর আনন্দে শান্তমনে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছে। প্রেমিকার বাহুবন্ধনে বেষ্টিত হইয়া তাহার বুকের উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করাতেই তাহার পরম তৃপ্তি। তাহার হত্যাকারীরা তো প্রকৃত জীবনের স্বাদ পায় নাই—সে যে সত্যই সে স্বাদ পাইতেছে। তাই তাহার মৃত্যুতে কোনো ক্ষোভ নাই।

The three, I do not scron
To death, because they never lived ; but I
Have lived indeed, and so—(yet one more kiss)—can die!

প্রেমই প্রেমের সার্থকতা। যাহাকে ভালোবাসা যায়, সে যদি প্রতিদান না দেয়, তবুও প্রেম ব্যর্থ নয়। প্রেমই প্রেমের পুরস্কার। প্রতিদানহীন ব্যর্থ প্রেমের গৌরব ও সান্ত্বনা কবি অপূর্বসুন্দররূপে ফুটাইয়াছেন তাঁহার Last Ride Together কবিতাটিতে। প্রেমপাত্রী প্রেমের প্রতিদান না দিলেও, প্রেমিক তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, তাহার চিরভক্ত। সেই অপূর্বসুন্দরী নারীই তো তাহার হৃদয়ে এই দুর্লভ প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছে। সে এই প্রেমের একটুমাত্র স্মৃতি কামনা করে, তাহাই তাহার চিরসম্পদ হইয়া থাকিবে। অশ্বপৃষ্ঠে প্রেমপাত্রীর সহিত একবারের মতো ভ্রমণের রোমাঞ্চ, বিস্ময় ও নিবিড় আনন্দে সে দেবত্বলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই ক্ষণ-মিলনের গৌরবের মাদকতায় সে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে যে পৃথিবীতে আজ প্রলয় উপস্থিত হোক এবং অনন্তকালের মধ্যে তাহাদের এই মিলন চিরস্থায়ী হোক।

So, one day more am I deified.
Who knows but the world may end to-night ?

তাহার প্রেম ব্যর্থ হইয়াছে, দীর্ঘদিনের ভালোবাসার কোনো পুরস্কার লাভ হয় নাই, তাহাতে কি হইয়াছে? কয়জন জীবনে সফলতা লাভ করে? রাজনীতিক, সৈনিক, কবি, গায়ক, ভাস্কর কি তাহাদের জীবনব্যাপী সাধনা ও আত্মোৎসর্গের উপযুক্ত পুরস্কার এ সংসারে পাইয়াছে? কিন্তু তবুও তো সে ক্ষণ-মিলনের গৌরবে ভাগ্যবান হইয়াছে—উহাই তাহার অনন্ত সম্পদ। মানুষ তো জীবনে তাহার আকাঙ্ক্ষিত নির্দিষ্ট বস্তু পায় না, সে কেবল পাইতে চেষ্টা করে মাত্র। এ জীবন তো কেবল প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্র—কেবল পরীক্ষার স্থান। জন্মজন্মের চেষ্টা ও সাধনায় মানুষ তাহার আকাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু এই সুকোমল দেহের স্পর্শের রোমাঞ্চে বর্তমানের সকল চিন্তা তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, এই ক্ষণ-অনুভূতির মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের অনন্ত সম্ভাবনীয়তা ও স্বর্গের বিশালত্ব আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। ইহাতেই সে তাহার জীবন সার্থক মনে করিতেছে।

প্রেমে দান-প্রতিদানের কোনো প্রশ্নই নাই; প্রেমের অনুভূতিই এক অমূল্য সম্পদ। এই অনুভূতিই একটা যুগান্তকারী প্রবল শক্তি। ইহা অসংযত প্রবৃত্তিকে দমন করে, মানবের অন্তর্নিহিত উচ্চ বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, মানবকে দেবত্বে উন্নীত করে। এই প্রেম যাহার হৃদয়ে উদ্ভূত হয়, সে ধন্য। প্রেমের কোনো প্রতিদানের

অপেক্ষা প্রকৃত প্রেমিক রাখে না। প্রেমের আনন্দই পর্যাপ্ত। One Way of Love, The Lost Mistress, Rudel to the Lady of Tripoli, Bad Dreams প্রভৃতি কবিতায় ব্রাউনিঙ এই প্রতিদানহীন ব্যর্থ প্রেমের চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রেমিকের কোনো দুঃখ নাই, কাহাকেও দোষ দেওয়া নাই, কোনো হতাশার ভাব নাই, গভীর সান্ত্বনা ও আনন্দে সে তাহার অক্ষয় সম্পদ প্রেমকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

প্রকৃত প্রেম অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয়। কোনো কাল বা পরিবেশ তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে না। Love Among the Ruins কবিতাটিতে কবি এই ভাবটি চমৎকার ফুটাইয়াছেন। যেখানে একদিন সভ্যতার সমস্ত ঐশ্বর্য ও গর্ব বহন করিয়া ইতিহাস-বিখ্যাত নগরী শোভা পাইত, সেখানে আজ জনহীন প্রান্তর,—মেষপালের ঘণ্টারবে মুখরিত হইতেছে। এই তৃণ-শ্যামল উপত্যকায় একদিন কতো গগনচুম্বী প্রাসাদশ্রেণী ছিল—আজও তাহার ধ্বংসাবশেষ ঘাসের গালিচার নীচে সমাহিত হইয়া আছে। বৃক্ষ-লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত এক প্রাসাদেব ভিত্তির অংশ পড়িয়া আছে। হয়তো এই প্রাসাদের চূড়া হইতে রাজা, রাণী ও সহচরীরা একদিন বথ চালনা-প্রতিযোগিতা দেখিতেন, আর তাহাদের অনুগ্রহদৃষ্টি প্রতিযোগী রথীদেব উৎসাহিত করিত। আজ ইহার পাশে মেষপালকদের কুটীর। কালেব ধ্বংসস্রোতে সে গৌরবময়ী নগরী কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।

আব সে রাজা-রাণী নাই, তাহাদের সহচর সহচরী নাই—আর তাকাইলেই সেই দৌড়েব মাঠ, নগরীর লক্ষ লক্ষ প্রাসাদের চূড়া, সভ্যতার ঐশ্বয ও দীপ্তি চোখে পড়ে না। আজ সেই জনহীন স্থানে দাঁড়াইয়া এক পল্লী-তরুণী তাঁহার প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। ব্রাউনিঙ বলিতেছেন, এই তরুণীর প্রেম রাজা-রাণী ও তাঁহাদের ঐশ্বর্যের চেয়েও অধিক ঐতিহাসিক সত্য। সভ্যতা ক্ষণস্থায়ী, প্রেম অবিনশ্বর। বহু শতাব্দীব্যাপী সভ্যতা ও রাজগণের ঐশ্বর্য, দম্ভ, বিলাস, আনন্দ-কোলাহল কোথায় ধরণীর ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই ধ্বংসের মধ্যে প্রেমই চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে।

Oh, heart ! oh, blood that freezes, blood that burns !
Earth's returns
For whole centuries of folly, noise and sin !
Shut them in,
With their triumphs and their glories and the rest !
Love is best !

প্রেম জন্মজন্মান্তরের সাধনার সামগ্রী। যদি এক জীবনে কাহারও প্রেম ব্যর্থ

হয়, তবুও তাহার হতাশার কোনো কারণ নাই। প্রেম যদি সত্যকার হয়, তবে অন্য জন্মে সে সাধানার সিদ্ধি তাহার মিলিবে। সত্যকার প্রেম কোনো দিন ব্যর্থ হয় না। জন্মে জন্মে সে প্রেমের শক্তি বর্ধিত হইবে ও প্রেমপাত্রীকে সে একদিন পাইবেই। প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তি ও সম্ভাবনীয়তায় ব্রাউনিঙ পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন। Christina ও Evelyn Hope কবিতা দুইটিতে কবি এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

অভিজাত সম্প্রদায়ের তরুণী তাহাব প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কিন্তু প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেম বিন্দুমাত্র কমে নাই। তরুণীকে সে দেহে না পাইলেও, প্রাণে লাভ করিয়াছে। লাভ তাহাবই—অপূর্ব প্রেমসম্পদে সে বিত্তশালী। এই সম্পদে সে ধনী হইয়া সানন্দে পবপারে চলিয়া যাইবে—ইহাব সার্থকতা তাহার একদিন আসিবেই।

She has lost me, I have gained her
Her soul's mine : and thus, grown perfect,
I shall pass my life's remainder.
Life will just hold out the proving
Both our powers, alone and blended :
And then, come the next life quickly !
This world's use will have been ended

Christina

ষোড়শী সুন্দরী এভিলিন হোপেব প্রেমিক তাহাব অপেক্ষা বয়সে তিনগুণ বড। এভিলিন তাহাকে চেনে না, তাহার নামও জানে না। কিন্তু সেই প্রেমিক এভিলিনকে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসিয়াছিল। এভিলিন মারা গেল। তাহার প্রেমিক তাহাকে পায় নাই, এ জীবনে তাহাদের মিলন সম্ভব হইল না। কিন্তু তাহার প্রেম ব্যর্থ হয় নাই। একদিন না একদিন তাহাদের মিলন সম্ভব হইবেই—সে তাহাব প্রেমের প্রতিদান পাইবেই। এই আশায় যুগযুগান্ত ধরিয়া সেই প্রেমিক অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। তাহার প্রেমেব দাবীতেই সে তাহাকে পাইবে।

God above
Is great to grant, as mighty to make,
And creates the love to reward the love :
I claim you still, for my own love's sake !
Delayed it may be for more lives yet
Through worlds I shall traverse, not a few :

Much is to learn and much to forget
Ere the time be come for taking you.
Evelyn Hope.

প্রেমের যুগান্তকারী শক্তি ও ইহার অমরত্ব ও অসীমত্বের অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাউনিঙের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা অধিক পরিমাণে বস্তুনিরপেক্ষ দেহমিলন-বিদ্বেষী ও ভাবধর্মী। চিত্ত-সংযম, আত্মগত-শালীনতা, সৌন্দর্য ও প্রেমের বাস্তবনিরপেক্ষ আদর্শকল্পনা কবিকে নরনারীর দেহ-মনের স্বভাবজ আকর্ষণ ও ভোগ-কামনা হইতে দূরে রাখিয়াছে। তাঁহার প্রেম-কবিতার মধ্যে একটা স্নিগ্ধ-মধুর, রহস্যময় অতীন্দ্রিয় আবহাওয়া রক্তমাংসের উষ্ণতা ও নিবিড়তা হইতে আমাদিগকে ঊর্ধ্বে টানিয়া লয়। কিন্তু ব্রাউনিঙের কবিতায় দেহ-কামনার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের বিপুল আবেগের প্রকাশ যেমন আছে, সেই সঙ্গে দেহোত্তীর্ণ প্রবলশক্তিশালী যে শাশ্বত প্রেম, তাহারও প্রকাশ আছে। নরনারীর প্রেমকে একটা দেহনিরপেক্ষ আদর্শ সৌন্দর্য ও অতীন্দ্রিয় রসবোধের মধ্যে উঠাইয়া লইয়া অনুভব করিবার চেষ্টা ইহাতে নাই, দেহের অণুপরমাণুকে কামনা করিয়া অপূর্ব একাগ্রতা ও তন্ময়তার ফলে প্রেমের যে নূতন রূপ ব্রাউনিঙ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কাব্যে প্রেমের রূপ। ইহা দেহকে অবলম্বন করিয়াই দেহোত্তীর্ণ ও চিরন্তন। এই প্রেম জড় দেহকে পোড়াইয়া দিয়া দিব্যদেহের চিরদীপ্তিতে শোভা পাইতেছে। ইহাই 'নিকষিত হেম'। ইহা কোনো মানসিক মোহ নয়—কোনো ভাববিলাস নয়। ইহা দেহ-সাগর হইতে উত্থিত অমৃত।

প্রেম-কবিতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বৈষ্ণব পদাবলীতে এবং শেক্সপীয়র, বার্ণস্, লরেন্স প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের যে প্রেম-কবিতা আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা সে শ্রেণীর নয়। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 'মহুয়া'তে প্রেমের এই নূতন রূপের সহিত ব্রাউনিঙের অমিতবীর্যশালী প্রেমের কিছু সাদৃশ্য আছে।

বনবাণী

(১৩৩৮, আশ্বিন)

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য ও নানা রস-রহস্যের কবি। প্রকৃতিকে অন্তরে ও বাহিরে এমন করিয়া উপলব্ধি আর কোনো কবি করেন নাই। কবি-জীবনের প্রত্যুষ হইতেই এই নিসর্গ-প্রীতি কবির মধ্যে জাগিয়াছে। তারপর প্রতিভা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রকৃতির কতো বিচিত্র রূপ, কতো রস-রহস্য, কবি কতো ছন্দ-গানে রূপায়িত করিয়াছেন। প্রকৃতি ও মানুষের একপ্রাণতা ও তাহাদের পরস্পরের আদান প্রদান ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণও প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এমন করিয়া একাধারে প্রকৃতির লীলা ও অন্তরের প্রাণের রহস্য এক বিশ্বব্যাপী প্রাণের লীলা-রহস্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া, অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্যে রূপায়িত জগতের আর কোনো কবি করেন নাই।

সৃষ্টির আদিতে যে প্রাণতরঙ্গ বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া লীলায়িত ছিল, বৃক্ষের মধ্যে সেই প্রাণের স্ফূর্তি। বৃক্ষের মধ্যেই প্রাণের প্রথম পরিচয়। নিখিল প্রাণতরঙ্গের সৌন্দর্যরূপ প্রথম এ ধরায় বৃক্ষের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বাণীশূন্য জলস্থলের সংগীত একদিন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াই বাজিয়া উঠিয়াছিল, সূর্যালোক হইতে বৃক্ষ প্রথম নানাবর্ণচ্ছটা আহরণ করিয়াছে—তাহাতেই ধরণী যৌবনবেশে সজ্জিত হইতে পারিয়াছে।

সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যালোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা। (বৃক্ষবন্দনা)

বৃক্ষই প্রবল শক্তিকে ধৈর্যে আবদ্ধ করিয়া শান্তির রূপ প্রদর্শন করিয়াছে। বৃক্ষ সূর্যরশ্মি পান করিয়া তাহার সমস্ত তেজ আহরণ করিয়াছে; সেই তেজই শ্যামস্নিগ্ধ রূপে মানবের পরমকল্যাণ সাধনে নিযুক্ত আছে। কবি সেই মহোপকারীর ধন্য মানবজাতির প্রতিনিধিরূপে বৃক্ষকে কাব্য-অর্ঘ্য দান করিতেছেন—

তব প্রাণে প্রাণবান্,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান্,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব, তারি দূত হয়ে,
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য ল'য়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ করি আমি
অর্পিলাম তোমার প্রণামী ॥

এই তরুলতাগুল্মের সহিত মানুষের প্রাণের গভীর আত্মীয়তা ও প্রকৃতির ঋতু-সজ্জার রহস্য ও আনন্দ কবি 'বনবাণী' গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। বনের বাণীই আদি প্রাণের বাণী। গ্রন্থের এই ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন,—

"আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীব-জগতের আদিভাষা, তার ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়,—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।

ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। "এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি" দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

... ...

......গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর,......বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন,—দুইএ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী,—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেব"। শুনেছিলেন "যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, "কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ"—প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেচে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কতো রেখা, কতো ভঙ্গী, কতো ভাষা, কতো বেদনা! সেই প্রথম প্রাণ-প্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?"

বিশ্বপ্রাণের সকল রস-রহস্য, ইঙ্গিত-সংকেত তরুলতাগুল্ম, ভাষাহীন বাণীতে মানুষের মনে অব্যর্থ ভাবে বহন করিয়া আনে। এদের একতারার গান সেই বিশ্বসংগীতকেই প্রতিধ্বনিত করে। সেই সংগীতের রসে মন নির্মল করিলেই মুক্তির আনন্দ লাভ করা যায়।

'বনবাণীর বিষয়বস্তু চারিটি ভাগে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে,—(ক) বনবাণী—তরুলতা ও পশুপক্ষীর প্রতি আন্তরিক প্রীতিজ্ঞাপন ও তাহাদের বন্দনা।

'আম্রবন' কবিতায় কবি আম্রবনের অন্তরের সহিত নিজের অন্তরের একটা মিল খুঁজিয়া পাইয়াছেন। আম্রবন যেমন অদৃশ্যের নিঃশ্বাসে অন্তরে অন্তরে চঞ্চল রসের ব্যগ্রতা অনুভব করে, তাহার আনন্দের ঘনগূঢ় ব্যথা প্রকাশ পায় মঞ্জরীতে, চিকণ কিশলয়রাজির কম্পনে, কবির অন্তরও তেমনি অজানার স্পর্শে অন্তর্লীন আনন্দ-আবেশে কল্পনা-কুসুমে বিকশিত হইয়া ওঠে। আম্রবন যেন ধরণীর বিরহবার্তা তাহার মঞ্জরীর ভাষায়, বাতাসের নিঃশ্বাসে, মৌমাছির গুঞ্জনে আকাশকে জানাইয়া দেয়; কবির চিত্তে ও তাঁহার স্বপ্নে সেই নিভৃত ভাষা সঞ্চারিত হয়, কবি আম্রবনের গন্ধে সুদূর জন্মের ভুলিয়া-যাওয়া প্রিয়-কণ্ঠস্বর শুনিতে পান, তাঁহার ভাবনারাজি জন্মমৃত্যুর পরপারে সুন্দরের দেউল-প্রাঙ্গণে উপনীত হয়। আম্রবনের মজ্জায় মজ্জায় চির-বসন্তের রস সঞ্চিত, কবির চিত্তেও সেই রসেরই আবেশ। উভয়েরই বাসস্থান একস্থানে ;—

শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে-বক্ষ পৃথ্বীর
প্রাণরস করো তুমি পান,
ওগো আম্রবন,
সেথা আমি গেঁথে আছি দুদিনের কুটীর মৃত্তির,—

'শাল' কবিতায় কবি শালগাছকে ধ্যানগম্ভীর তপস্বী বলিয়া কল্পনা করিতেছেন। দক্ষিণের মদির পবনে কিংশুক, শিমুল, বকুল প্রভৃতি সর্বাঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করে, কিন্তু শালের অন্তরে সে চঞ্চলতা স্পর্শ করে না। তাহার অভ্রভেদী মহিমারাশি লইয়া সে অন্তরের নিগূঢ় গভীরে ফুল ফুটাইবার ধ্যানে নিবিষ্ট থাকে। সূর্যালোক হইতে অমৃত মন্ত্রতেজ গ্রহণ করিয়া, নীল আকাশের শান্তিবাণী উপলব্ধি করিয়া সে শান্ত আত্মসমাহিত অবস্থায় বৎসরে বৎসরে বিশ্বের প্রকাশ-যজ্ঞের প্রাণধারা দান করিতেছে।

রাজার সাম্রাজ্য কতো শত
কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে যায় বুদ্‌বুদের মতো।
মানুষের ইতিবৃত্ত সুদুর্গম গৌরবের পথে
কিছুদূর যায়, আর বারম্বার ভগ্নচূর্ণ রথে
কীর্ণ করে ধূলি। তারি মাঝে উদার তোমার স্থিতি,
ওগো মহা শাল, তুমি সুবিশাল কালের অতিথি,
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গীতে,

বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্মর সংগীতে,
মঞ্জরীর গন্ধের গণ্ডুষে। যুগে যুগে কতো কাল
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, বসেছে রাখাল,
শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখী, যায় তারা পথ বাহি
আসন্ন বিস্মৃতি পানে, উদাসীন তুমি আছ চাহি।

(খ) নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা,—

কবি ভগবানকে নটরাজ শিবের মূর্তিতে কল্পনা করিয়াছেন। এই ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর সৃষ্টির মধ্যে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার তাণ্ডবে পুরাতন ধ্বংস হইতেছে, নূতন সৃষ্টির উদ্ভব হইতেছে। নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে পুঞ্জীভূত আবর্জনা, যাহা-কিছু জীর্ণ, গলিত, পুরাতন, অসত্য, অন্যায়, পাপ, গ্লানি, ক্লেদ, পঙ্ক—সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে—তাহার উপরে গড়িয়া উঠিবে নূতন সৃষ্টি। নৃত্যের তালে তালে একবার ধ্বংস আরবার সৃষ্টি, আবার ধ্বংস আবার সৃষ্টি। এই নৃত্যে সৃষ্টির চিরন্তন প্রাণধারাকে অব্যাহত রাখা হইয়াছে। জীবন-মৃত্যু, ধ্বংস-সৃষ্টি, রূপ-রূপান্তর, জন্ম জন্মান্তর একসূত্রে গাঁথা—একই সত্যের বিভিন্ন রূপ। সৃষ্টির প্রাণধারার এই রহস্য, এই নৃত্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিলে দুঃখশোকের, কর্মচাঞ্চল্যের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইবে এবং চিত্ত ভরিয়া উঠিবে মুক্তির নির্মল আনন্দে। এই তত্ত্বোপলব্ধি রবীন্দ্র-কবিমানসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়ামক।

... .

প্রকৃতির ঋতুগুলি নটরাজের রঙ্গপীঠ, এই ষড়্ঋতুর মঞ্চে নটরাজ নব নব নৃত্যলীলা প্রদর্শন করিতেছেন। এক ঋতুর নৃত্য শেষ হইয়া আর এক নূতন নৃত্য আরম্ভ হইতেছে, আবার তাহার শেষে, আর এক নূতন নৃত্য হইতেছে। ষড়্ঋতুর ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে নব নব নৃত্যের নব নব রূপ ও সুষমা ফুটিয়া উঠিতেছে। নটরাজের এই লীলারস উপলব্ধির আনন্দে কবি সর্ববন্ধনমুক্ত হইতে চাহিতেছেন। এই অংশের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন,—

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। "নটরাজ" পালা-গানের এই মর্ম।"

এই নৃত্যের বেগে সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়া দুঃসাহসী যৌবনের আবির্ভাব হইবে—মৃত্যুর মধ্য হইতে নবজন্মের প্রকাশ হইবে, শুষ্ক মরুতে শ্যামলের বন্যা ছুটিবে। এই পুরাতনকে বিদায় দিয়া চির-নবীনের জয়গান কবি চিরকাল

করিয়াছেন। আজ বিশ্বের মধ্যে—প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বেশ্বরের এই পুরাতনধ্বংসী ও নূতনের-প্রবর্তক নৃত্যলীলার রস ও রহস্য কবি নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়া মুক্তির আনন্দ কামনা করিতেছেন,—

নটরাজ, আমি তব
কবি-শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লবো।
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি ;
সর্ব অমঙ্গল-সর্প হীনদর্প অবনম্রফণা
আন্দোলিবে শান্ত-লয়ে।

(উদ্বোধন)

শেষজীবনে পুরাণের সর্বভোলা মহেশ্বর ও নটরাজ শিবের কল্পনা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

(গ) বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ-উৎসব—বর্ষাঋতুর প্রশস্তি-সংগীত ও বৃক্ষবন্দনা।

(ঘ) নবীন—

বসন্তঋতুর বন্দনা—বসন্ত চির-নূতন ও চির-যৌবনের প্রতীক। কবি বসন্ত-ঋতুকে আবাহন করিয়াছেন।

২৮

পরিশেষ

(ভাদ্র, ১৩৩৯)

সাত বৎসর পূর্বে 'পূরবী'তে আমরা কবির অন্তর্জীবনের পরিচয় পাইয়াছি, তাহার পর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কবি কতকগুলি নাটক, উপন্যাস, গান লিখিয়াছেন, মহুয়ার কবিতাও লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কবি-মানসের বিশিষ্ট পরিচয় আমরা পাই নাই। সে-সব রচনা কবি-মানসের কোনো নির্দিষ্ট ধারাবাহিক স্তর নির্দেশ করে নাই। 'পরিশেষ' গ্রন্থে আমরা অনেকদিন পরে কবির মনোজগতের চিত্র—তাঁহার ক্রম-অগ্রসরমান অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনার একটা রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এই সময়ের মধ্যে কবির জীবনের উপর দিয়া নানা ঘটনাস্রোত বহিয়া গিয়াছে। কবি ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা, পারস্য প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিপুল সংবর্ধনা পাইয়াছেন, সেই সব দেশের শ্রেষ্ঠ কবি, শিল্পী ও মনীষীদের

সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়াছেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও পরোক্ষভাবে তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বাংলার বন্যার ধ্বংসলীলা, হিজলী জেলে পুলিশের গুলীতে বন্দীহত্যা প্রভৃতি কবির স্পর্শকাতর মনকে আলোড়িত করিয়াছে; সমসাময়িক ঘটনায় এই আলোড়ন পরিশেষের কয়েকটি কবিতায় প্রকাশও পাইয়াছে। নানা বক্তৃতা, সংবর্ধনার উত্তর, সংবাদ-পত্রে বিবৃতি, নানা জনকে নানা বিষয়ে পত্র লেখা, অভিনয়ের আয়োজন প্রভৃতিতে কবি একেবারে ডুবিয়া আছেন। কিন্তু এইসব সাময়িক ঘটনার ভাবতরঙ্গের তলদেশে তাঁহার কবি-সত্তা একটা পরিবর্তন বা পরিণতির পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে তিনি অনেক দেখিয়াছেন, অনেক বুঝিয়াছেন, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছেন; জীবন-সায়াহ্নে মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকারের সামনে নিজের জীবনকে ভালো করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন; তাহারই ফলে তাঁহার অন্তরতম কবি-মানস যে সত্য লাভ করিয়াছে, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, যে বিশিষ্ট ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে—তাহারই প্রকাশ হইয়াছে, 'পরিশেষ'-এর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে।

সত্তর বছর পার হইয়া কবি মনে করিতেছেন, শীঘ্রই তাঁহার মর্ত্যজীবন শেষ হইবে, তাই তাঁহার এতদিনকার জীবনের একটা হিসাব-নিকাশ করা প্রয়োজন। তিনি কি ছিলেন, কোন্ অনুভূতি, কোন্ চিন্তা, কোন্ ভাব, কোন্ আদর্শ তাঁহাকে কাব্য-প্রেরণা দিয়াছে, তাঁহার কবি-কৃতির স্বরূপ কি, তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের সত্যকার স্বরূপ কি, মৃত্যুর স্বরূপ কি, জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি, মৃত্যুর কাছে কি দান তিনি আশা করেন, এই সব বিষয় শেষ বারের মতো কবি পর্যালোচনা করিতেছেন। মৃত্যুর আলোকে এই আত্ম-জীবন-দর্শন ও আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদানই 'পরিশেষ'-এর বিষয়বস্তু।

কবি মনে করিয়াছেন, এই তাঁহার সর্বশেষ কথা বা শেষদান, তাই বোধ হয় এই কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়াছেন 'পরিশেষ'। এক-এক ভাব-পর্যায়ের শেষে আসিয়া কবি তাঁহার কাব্যের এইরূপ সমাপ্তিসূচক নাম দিয়াছেন,—যথা 'চৈতালি', 'খেয়া', 'পূরবী'; কিন্তু তাহার পর, আবার তাঁহাকে 'পুনশ্চ' আরম্ভ করিতে হইয়াছে, কেবল তাহাই নয়, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পনর-যোলখানা কাব্য, চার-পাঁচখানা গল্প ও উপন্যাস, কয়েকখানা নাটক ও অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, এক ভাবধারার পরিণতির পর, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন ভাব-কল্পনা, নূতন রহস্যবোধের ইন্দ্রজাল লইয়া নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির আবির্ভাব হইয়াছে। 'পরিশেষ'-এর পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কবি কতো জীবন-দর্শন, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মবোধ

ও তাহার রূপ ও রহস্যের কতো নিবিড় অনুভূতি, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিদ্যুৎ-চমক, জীবনের প্রকৃত স্বরূপের শান্ত-সমাহিত বোধ ও বিশ্বাস, বিশ্ব-বিধানের রহস্য, প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা প্রভৃতি নানা ভঙ্গীতে, নানা রসে ব্যক্ত করিয়াছেন। কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত লীলা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, গূঢ় অর্থগ্রহণ, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধ, অতীন্দ্রিয় রহস্যানুভূতি, অজানা অসীমের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি যাহা রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই; বরং নূতনভাবে প্রকাশের একটা অতিরিক্ত মর্যাদা ও মূল্য লাভ করিয়াছে। বিস্ময়কর কবির প্রতিভার বিশালতা, সজীবতা ও মৌলিকতা। জরা-বার্ধক্য-বিজয়ী কবিপ্রাণের এমন নিত্যনবীন প্রবাহ বোধহয় পৃথিবীর কোনো কবির মধ্যে দেখা যায় নাই।

পরিশেষ কাব্যখানি বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি এই কয়টি ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়,—

(ক) আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে সারাজীবনের কবি-কৃতি ও তাঁহার কবি-সত্তার পরিচয় প্রদান।

(খ) মৃত্যুর পটভূমিকায় সৃষ্টি ও মানব-জীবনের সত্যতার স্বরূপ দর্শন।

(গ) সমসাময়িক ঘটনার প্রভাবে লিখিত কবিতা।

(ঘ) গদ্য-কবিতার আরম্ভ—নূতন আঙ্গিকে রচিত কথিকা।

(ক) 'পূরবী' হইতেই কবি যে বিদায়ের রাগিণী ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারই মূর্ছনা কমবেশি পরবর্তী কাব্যে রহিয়া রহিয়া ধ্বনিত হইয়াছে। এই সঙ্গে চলিয়াছে জীবনের আলোচনা, অতীত ও বর্তমানের তুলনা, তাঁহার কবি-সত্তার স্বরূপ-বিশ্লেষণ, মানব-জীবনের স্বরূপ-দর্শন এবং অসংখ্য পূর্বস্মৃতি-উজ্জীবন ও পর্যালোচনা। 'পরিশেষ'-এ কবি প্রথমত তাঁহার কবি-কর্মের বিশ্লেষণ ও তাঁহার কবি-সত্তার পরিচয় দিতেছেন।

'প্রণাম' কবিতায় কবি তাঁহার কবি-কর্মের একটি বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা দিয়াছেন। জীবনের প্রত্যূষেই কবি অলৌকিক কাব্য-প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। জীবনের প্রথম যাত্রাপথে তাঁহার কাব্য-প্রেরণার দেবতা তাঁহার হাতে 'নর্ম-বাঁশিখানি' তুলিয়া দিয়াছিলেন, তিনি সেই বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার সহযাত্রী কতো লোক কতো দিকে ধাবিত হইল, অর্থের আকাঙ্ক্ষায়, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায়, কতো কর্মের দুঃসাহসিক ও কঠোর প্রচেষ্টায়, কিন্তু কবি কেবল বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি কেবল এই বিশ্বসত্তার গভীর স্পর্শ চাহিয়াছেন, এই বিশ্বের বহু-

বিচিত্র সৌন্দর্যের সুরগুলি তাঁহার কাব্য-বাঁশরীতে আলাপ করিতে চাহিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির গূঢ় মর্মতলে আত্মপ্রকাশের যে বেদনা, তাহার চিরন্তন সৌন্দর্য বিকাশের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা কবি তাঁহার বাঁশির সুর-মূর্ছনায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভাতের নবারুণরশ্মিস্পর্শে ধরণীর আনন্দ-শিহরণকে কবি তাঁহার কাব্য-বাঁশির নানা বিচিত্রসুরে প্রকাশ করিয়াছেন। রজনীর আলোক-বন্দনা-মন্ত্র-জপের নিগূঢ় চেতনা কবি নিজের হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন। প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে গোপন ও অস্ফুট সৌন্দর্য-মাধুর্যকে তিনি তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিশ্ব-চেতনার আনন্দ ও বেদনা তাঁহার কাব্যে নানা ছন্দে রূপায়িত হইয়াছে। বিশ্বানুভূতির রস ও রহস্য তাঁহার সংগীতের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তর লাভ করিয়াছে। কবির যাত্রা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, জীবন-সন্ধ্যায় সেই কাব্য-বাঁশিখানি ভগবানের চরণে তাঁহার শেষ-প্রণামের প্রতীকস্বরূপ রাখিয়া, বিশ্ববাসীর নিকট বিদায় লইতেছেন,—

এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ;—একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম-বাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

'বিচিত্রা' কবিতাটিতে, তাঁহার কাব্য-প্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী, লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতা তাঁহাকে জীবনের এই দীর্ঘ পথ কতো বিচিত্র রূপ ও রসের অনুভূতির মধ্য দিয়া, কতো ভাবের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়া, কতো আনন্দ-বেদনার লীলার মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া লইয়া আসিয়াছেন,—কবি তাঁহার অন্তর-জীবনের সেই ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। সারা জীবনের বহু-বিচিত্র সুখদুঃখময় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার যে কাব্য-ফসল তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে ফলিয়া উঠিয়াছে, তাহা তো তিনি কণায়-কণায় বিচিত্রার পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। এই জীবন-সন্ধ্যায় আবার কেন তাঁহার দান-গ্রহণের ইচ্ছা ?

তবু কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে।
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব-করা দানে॥

'পান্থ' কবিতায় কবি তাঁহার কবি-সত্তার পরিচয় দিতেছেন। তিনি মুক্তিকামী নন, তিনি সাধক নন। কোনো আধ্যাত্মিক জীবনের শেষফল তাঁহার কাম্য নয় ; তিনি একান্তভাবে কবি, থাকেন ধরণীর অতি নিকটে, এপারের খেয়াঘাটে। সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে তরঙ্গভঙ্গময় রৌদ্রছায়াখচিত প্রাণের নদী। সেই

প্রাণ-নদীর, সেই বিশ্ব-প্রবাহের তরঙ্গ, নৃত্য ও সংগীত তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিলেই তাঁহার মুক্তি। কিছুই তিনি আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন না। কেবল সবার সঙ্গে ভাসিয়া যাইতে চাহেন। তাঁহার কবি-সত্তার এই স্বরূপই তাঁহার ব্যক্তি-সত্তার স্বরূপ। তিনি তো মহাপথিক, তাঁহার কোনো নির্দিষ্ট পরিণাম নাই। ব্যক্তি-সত্তার অনন্ত যাত্রা-পথে চঞ্চলের নৃত্য ও গানের মধ্যেই তাঁহার কবি-সত্তার মুক্তি—চরম ও পরম প্রাপ্তি।

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক,
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম ;
তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলাদানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

'জন্মদিন' কবিতায় কবি তাঁহার অন্তরবাসী কবি-সত্তার শেষ আকাঙ্ক্ষার কথা বলিয়াছেন। বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রস-আস্বাদনের জন্য কবির চিত্ত চির-কাঙাল। বিশ্ব-সত্তার আনন্দময় স্পর্শই তাঁহার চরম কামনা। তিনি কর্ম চাহেন না, খ্যাতি চাহেন না, কোনো পাণ্ডিত্যের তর্ক বা জ্ঞানের সংশয়-নিঃসংশয়ের ধার ধারেন না, কেবল জীবনের শেষে, শেষবারের মতো বিশ্ব-রস-সরোবরে অবগাহন করিতে চাহেন,—

এই বিশ্ব-সত্তার পরশ
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সব দেহে রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্ব-রস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয়মনদেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, "আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা ॥"

(খ) 'ধাবমান', 'অগ্রদূত', 'দীপিকা', 'বিস্ময়', 'বর্ষশেষ', 'মুক্তি', 'অপূর্ণ', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'যাত্রী', 'সান্ত্বনা', 'আমি', 'তুমি', 'নিরাবৃত' প্রভৃতি কবিতায় কবি সৃষ্টি ও মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

এই সৃষ্টিধারা—এই মানবজীবন একটা প্রবল স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। কোনো স্থায়িত্বের বন্ধন ইহাদিগকে বাঁধিতে পারে না,—

সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে
এ পারের সব কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে,
কাঁদায়ে হাসায়ে,
অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে ;
নয় নয় এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে
মহাকাল সমুদ্রের পারে। (ধাবমান)

তবুও এই ধাবমান স্রোতোবেগে, ক্ষণিকের অস্তিত্বের মধ্যে, অসীমের আনন্দ, শাশ্বতের আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে ; যতটুকুই ইহার স্থিতিকাল হোক না কেন, এই মহান অসীমের দানকে আমরা গ্রহণ করিব, তারপর সমস্ত লোভ, দুঃখ, শোকের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সে জীবনকে আমরা সানন্দে বিদায় দিব।

……তবু ভালোবাসি,—
চমকে বিনাশ-মাঝে অস্তিত্বের হাসি
আনন্দের বেগে।
মরণের বীণা-তারে উঠে জেগে
জীবনের গান ;
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্ফুরি
শাশ্বতের দীপশিখা
উজ্জ্বলিয়া মুহূর্তের মরীচিকা।
… … …
অসীমের দান
ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে।
কাল ব্যাপি রহে নাই রহে
তবু সে মহান ;
যতক্ষণ আছে তারে মূল্য দাও পণ করি প্রাণ।

তারপর,

ধায় যবে বিদায়ের রথ,
জয়ধ্বনি করি, তারে ছেড়ে দাও পথ
আপনারে ভুলি।

কারণ,

বিরাটের মাঝে
একরূপে নাই হয়ে অন্যরূপে তাহাই বিরাজে।

জীবন ও মৃত্যুর প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী, এই সান্ত্বনার আভাস কবির কাব্যে অনেক পূর্ব হইতেই পাওয়া যায়। 'বলাকা'য় এই প্রশ্ন কবির মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। সৃষ্টির এই নিরন্তর পরিবর্তন ও গতিবেগ কবি উপলব্ধি করিলেও ধ্বংসের পরিণাম নবসৃষ্টি, এবং মৃত্যুর মধ্য হইতে অমৃতের উদ্ভব সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ভাবেই ফুটিয়া উঠে। 'পূরবী'তে এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ ও জীবনকে কবি নূতনভাবে ভালোবাসিয়াছেন, এই হাসি কান্নার গঙ্গা-যমুনায় ঘট ভরিতে ও ডুব দিতে চাহিয়াছেন। 'পরিশেষ'-এ কবি জগৎ ও জীবনের এই পরিণাম জানিয়াও এই অনিত্যের মধ্যে নিত্যের লীলা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই দুই অনুভূতি যুগপৎ তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। অসীমের স্পর্শের জন্য এই ক্ষণিক জীবন সার্থক—অপূর্ব সুন্দর। এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য কবি শেষবারের মতো আহরণ করিতে চাহিয়াছেন। মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি নয়—জীবন অসীমের অংশ বলিয়া ইহার দীপ্তি চিরন্তন ও বৈশিষ্ট্য অম্লান। 'বীথিকা'তেও এই ভাবের অনুবৃত্তি চলিয়াছে। যতই মৃত্যুর দিকে কবি অগ্রসর হইয়াছেন, ততই এই বিশ্বাস, এই অনুভূতি দৃঢ় ও গভীর হইয়াছে। এই চলমান জগৎ ও ক্ষণভঙ্গুর জীবনের শত তুচ্ছতা, স্থূলতার মধ্যে তিনি অসাধারণ দুর্লভের ব্যঞ্জনা দেখিয়াছেন, মানবের একটু স্নেহ, একটু চপল প্রেমের মধ্যে নিত্যকালের অসীমতা উপলব্ধি করিয়াছেন, জীবনের একটা পলাতক মুহূর্তও তাঁহার কাছে গূঢ় তাৎপর্যময় মনে হইয়াছে। তাঁহার শেষজীবনের কাব্যগুলি ইহার সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর একেবারে দ্বারদেশে পৌঁছিয়া কবি এই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনকে আবার নূতন দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, সেই স্বচ্ছ ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ইহাদের নূতন সৌন্দর্য ও সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের এই জীবনে ভূমার আসন, এই ক্ষণস্থায়ী দেহের মধ্যে আত্মার বাস। সে আত্মা অবিনাশী, চিরন্তন, অসীম। সুতরাং মানুষের কাছে, জরা, ধ্বংস মৃত্যু কিছু নয়, মানুষ অপরাজেয়, শাশ্বত ও মহান্। শেষের কাব্য কয়খানিতে কবি এই মানবাত্মার জয়গান করিয়াছেন, এই ঔপনিষদিক অধ্যাত্ম-উপলব্ধির বাণীরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

'অগ্রদূত' কবিতায় অনন্তপথযাত্রী মানবকে কবি বলিতেছেন,—

নব জীবনের সংকট পথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম মাঝে পথ করি দিবে,—
জীবনের ব্রত তব।

প্রাণ-নটিনীর চিরন্তন অভিসার কবি লক্ষ্য করিয়াছেন,—

ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান
মরণে মরণে চকিত চরণে
ছুটে চলে প্রাণ-নটিনী॥
(দীপিকা)

'বিস্ময়' কবিতায় কবি বলিতেছেন, মানুষ যে জন্মে জন্মে এই পৃথিবীর বুকে ঘুরিয়া আসিয়া ক্ষণিকের জীবন যাপন করিয়া যাইতেছে, তাহাই তো অন্তহীন বিস্ময়। কালস্রোতে কতো মহাদেশ ডুবিয়া গেল, কতো জ্যোতিষ্ক আলোহীন হইল, 'কতো বিশ্বজয়ী বীরের কীর্তিস্তম্ভ ধূলায় মিশিয়া গেল, কিন্তু এই ধ্বংসধারার মধ্যেও মানুষ বার বার নবজন্ম লইয়া আসিয়া গ্রহ-নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের নীচে, সমুদ্র ও পর্বতের নিকট ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইতেছে। যে যুগযুগান্তরের অরণ্যানী কতো রাজা কতো রাজ্যের ধ্বংসলীলার নীরব সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মানুষ তাহার ছায়াতলে একদিনের জন্যও বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছে। মানুষের এই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য।

কবি নিজের জীবনের দিকে তাকাইয়া তাহার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার জীবন শেষ হইয়া আসিল। মরণের দিগন্তসীমায় দাঁড়াইয়া জীবনের অপূর্ব মহিমা আজ দেখিতে পাইলেন। জীবলোকে অনন্ত রহস্যময়, মানবজন্মের অধিকার পাইয়া তিনি ধন্য। জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে, যুগে-যুগান্তরে যে অমৃত-ধারা উৎসারিত, সে-তো তাঁহারই জন্যে! তিনি তো এই জীবনেই অসীমকে অনুভব করিয়াছেন,—

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।

অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা॥

(বন-শেষ)

এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, জগৎ ও জীবনে অভিব্যক্ত অসীমের আনন্দময় সত্তার অনুভূতিই তাঁহার জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তি-সত্তার এই অনুভূতি তাঁহার কবি-সত্তারও অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য-সৃষ্টির মূলে এই অনুপ্রেরণা। জীবনের এ বিচিত্র গৌরবে মৃত্যু আজ তাঁহার কাছে পরিপূর্ণ—অশেষের ধনে তাঁহার শেষ গৌরবান্বিত।

কবি আজ শান্ত-স্নিগ্ধ মনে সংসার হইতে, 'প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণ-পতন-পীড়া' হইতে, 'তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে'র বিক্ষোভ হইতে চিরমুক্তি চাহিতেছেন। 'মুক্তি' কবিতা দুইটিতে সেই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। পদতলে 'ধূলির নিবিড় টান' ও 'ক্ষুব্ধ কোলাহল' ভুলিয়া, অব্যাকুল, দ্বিধাশূন্য সরলতায় কবি অন্তিম শান্তির উদ্দেশে মহাপথে যাত্রা করিতে চাহেন।

জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে এই যে জীবন, এই অস্তিত্ব, ইহা কি নিরর্থক? এই প্রশ্ন কবির মনে জাগিয়াছে ও ব্যক্ত হইয়াছে 'অপূর্ণ' কবিতাটিতে। 'বস্তু ও ছায়া', 'সুখ-দুঃখ-ভয়-লজ্জা-ক্লেশ', 'আরব্ধ ও অনারব্ধ, সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ, তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ' ব্যক্তিরূপে—ভূমি-রূপে পুঞ্জীভূত হইয়া কয়দিন পূর্ণ করিয়া শেষে কোথায় গিয়া মেশে! এই চৈতন্যধারা কি সহসা উদ্ভূত হইয়া অকস্মাৎ গতি-হারা হইবে? ইহার মধ্যে যে নিখিলের নিজ পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহার কি কোনো সার্থকতা নাই?

অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন?

কবি ইহার সমাধান পাইয়াছেন তাঁহার নিত্য-সত্তার, তাঁহার আত্মার অমরত্বের বিশ্বাসে। তাই মৃত্যুভীতি তাঁহার নাই,—

আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে॥

(মৃত্যুঞ্জয়)

কবি মহাযাত্রার পূর্বক্ষণে প্রাণে সান্ত্বনা আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। জীবন ও মৃত্যু, লাভ আর ক্ষতি, অসীম মহামৌন পারাবারে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

ওরে তুমি, ওরে আমি
যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
তরঙ্গের ওঠা-নামা, একই খেলা, একই তার গতি।
কান্না আর হাসি
এক বীণাতন্ত্রী-তারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
একই শমে এসে
মহামৌনে মিলেযায় শেষে। (যাত্রী)

তাই জীবনের পারে যে-শান্তি নিবিড় প্রেমে স্তব্ধ হইয়া আছে, সেই শান্তি-সিন্ধুর মাঝে কবি অচঞ্চল স্থিতি কামনা করিতেছেন। 'সান্ত্বনা' কবিতায় কবি সেই চরম শান্তি আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। বিশ্বচিত্তের অন্তরে সান্ত্বনার যে চির-উৎস আছে, নিখিল আত্মার কেন্দ্রে যে আরোগ্য ও শান্তির মহামন্ত্র বাজে, কবি মন-প্রাণ ভরিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন। যে আদিম আনন্দ বিশ্বের আদি-অন্তে বিরাজ করে, সেই আনন্দলহরীর মধ্যেই তাঁহার চরম পথ। ইহাই মানবাত্মার চরম কামনা।

কবি তাঁহার কাব্যেও সেই বার্তা বহন করিতে চাহিতেছেন,—

আমার বাণীতে দাও সেই সুধা,
যাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধা॥

পরিশেষ হইতেই কবির ভাব-জীবনের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কবি এতদিন এই সৃষ্টির মধ্যে, এই জগৎ ও জীবনে অভিব্যক্ত অসীম আনন্দময় সত্তাকে অনুভব করিতেছিলেন। প্রথমে সৌন্দর্য ও প্রেমরূপে, তারপর সৃষ্টি ও মানবের মধ্য দিয়া চঞ্চল ক্রীড়া-কুতূহলী লীলাময়রূপে, কবি অসীমকে অনুভব করিয়াছেন। 'পরিশেষ' হইতে অসীমকে কবি মানবের হৃদয়বিহারী আত্মা রূপে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অসীমের অনুভূতি পূর্বের আভাস, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও রহস্যময়তা ক্রমে ত্যাগ করিয়া যেন একটা স্থির উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে। ভগবান আর লীলাময় নন, এখন তিনি আত্মা। কবির কাজও যেন আর লীলামাধুর্যের অনুভূতি নয়, এখন 'আত্মানং বিদ্ধি'র। এই স্তর হইতে আরম্ভ হইয়া একেবারে শেষের কাব্য কয়খানিতে এই উপলব্ধি পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। অতীন্দ্রিয় রস-রহস্যবেত্তা, কাব্য-রসিক অনেকটা অধ্যাত্ম-

সাধকে রূপান্তরিত হইয়াছেন। বন্ধন-মাঝে আর মুক্তি না চাহিয়া, একেবারে বন্ধন হইতে মুক্তি চাহিতেছেন।

পরিশেষ হইতেই দেখা যায়—কবির লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতা, যিনি বিশ্বের নব নব রূপ ও রসের মধ্য দিয়া কবিকে এতদিন পরিচালিত করিয়াছেন, তিনি কবির চিত্তে এখন লুপ্ত,—

হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এলো যে রাতি।
চেনা মুখখানি আর নাহি জানি
আঁধারে হয়েছে গুপ্ত,
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ,
কোথায় সে হার সুপ্ত।
অবগুণ্ঠিত তব চারি ধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার চন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত।

(তুমি)

এই জীবনদেবতা এখন বাবর অন্তরবাসী নিত্য-আমিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন তিনি আর এখন রসপ্রেরণাদাত্রী নন, তিনি দেহাবরণবদ্ধ চির-জ্যোতির্ময় আত্মা। কবি তাঁহাকে লইয়া সৃষ্টির রূপে-রসে আর ভুলিতে পারেন না, নিভৃতে তাঁহার স্বরূপ দেখিতে চাহেন,—

হেত ভবিষ্যৎ লহে সে-বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে॥

(আমি)

(গ) এই দুইটি প্রধান ধারা ব্যতীত পরিশেষে অনেক কবিতা আছে, যেগুলি সাময়িক নানা প্রয়োজন উপলক্ষে রচিত। কতকগুলি ব্যক্তিগত শুভকামনা, কতকগুলি বিবাহের স্নেহোপহার, কতকগুলি দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে রচিত দেশ-প্রশস্তি। 'বক্সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' কবিতাটি বক্সা দুর্গে অন্তরীন বাঙালী যুবকগণ কর্তৃক 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' অনুষ্ঠানের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর।

"অমৃতের পুত্র মোরা"—কাহারা শুনালো বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

ইহাই কি বিপ্লবীর সত্য পরিচয় নয়?

'প্রশ্ন' কবিতাটির মধ্যে মহাত্মাজীর অকস্মাৎ গ্রেপ্তারে কবি-মনের বেদনা ও সংশয় ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় গোলটেবিল-বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে মহাত্মাজী দেশে ফিরিলেন। (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩১) ভারতব্যাপী দমননীতির রুদ্রলীলা চলিল। ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩২, মহাত্মাজী কারারুদ্ধ হইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক নেতাকে জেলে পাঠানো হইল। মহাত্মাজীর এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত গ্রেপ্তার ও গভর্ণমেন্টের নির্বিচার দমন-নীতি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ব্যথিত করিয়াছিল। এই সময়ে এই কবিতাটি রচিত হয়।

বিশ্ব-বিধানের মঙ্গলময় পরিণাম ও ভগবানের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে কবির সন্দেহ জাগিয়াছে। সংসারে আজ বড়ো দুর্দিন নামিয়া আসিয়াছে, তাঁহার চারিদিকে আজ অমানিশার অন্ধকার। ভগবানের প্রেরিত শান্তির দূত যুগে যুগে প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছেন। মহাত্মাজীও সেইরূপ ভগবান-প্রেরিত শান্তির দূত। কিন্তু আজ ভগবানের সেই সব দূতের বাণী উপেক্ষিত। ঘোরতর অন্যায় ও অবিচারের উদ্ধত রথচক্রের পেষণে আজ দেশ জর্জরিত; কোথায় শান্তি—কোথায় ন্যায়,—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

যাহারা ভগবানের অনুমোদিত উচ্চ মানবতার আদর্শকে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহাদিগকে কি ভগবান ক্ষমা করিয়াছেন—ন্যায়-বিচারের দ্বারা তাহাদের কি শাস্তি দিবেন না?

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো॥

(ঘ) কবি 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী' প্রভৃতিতে যে সব গদ্য কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার আরম্ভ হয় পরিশেষে। 'বলাকা' হইতেই আমরা দেখিয়াছি, কবি ছন্দের নিরূপিত প্রতি পংক্তির মাত্রাবন্ধনকে অস্বীকার করিয়া ছন্দকে অনেকখানি মুক্ত ও তাঁহার ভাব ও চিন্তার বাধাহীন প্রকাশের উপযোগী করিয়াছেন। বলাকা হইতে পরিশেষ পর্যন্ত কবি এই ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তবুও ইহাতে পদ্যের শব্দ-বিন্যাস-গত রীতি ও অন্ত্যমিলের বন্ধন পরিত্যক্ত হয় নাই। এই বন্ধনকেও অস্বীকার করিয়া ভাবের নিরঙ্কুশ-প্রকাশে কাব্যরস সঞ্চার করা যায় কিনা তাহারই পরীক্ষা চলিয়াছে গদ্যকবিতার আঙ্গিকে। গদ্য কবিতার আঙ্গিক, ভাষা ও রীতি সম্বন্ধে আলোচনা 'পুনশ্চ' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে করা যাইবে।

'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি', 'আগন্তুক', 'জরতী', 'সাথী', 'বোবার বাণী', 'আঘাত', 'ভীরু', 'আতঙ্ক' প্রভৃতি কবিতা কবির নূতন আঙ্গিকে রচিত কবিতার নিদর্শন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে, ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে, ক্ষণিক ভাবানুভূতির রূপায়ণে এগুলি পূর্ণাঙ্গ গদ্যকবিতার সম-জাতীয়।

২৯

পুনশ্চ

(আশ্বিন, ১৩৩৯)

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে সর্বপ্রথম দৃষ্টি পড়ে কবিতার আঙ্গিকের পরিবর্তন। 'পরিশেষ' গ্রন্থের শেষ দিক হইতেই কবি এই নূতন আঙ্গিক অনুসরণ করিয়াছেন ও 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' গ্রন্থে এই আঙ্গিকের পূর্ণরূপ প্রকটিত করিয়াছেন। ছন্দের জাদুকর কবি শব্দের বহু-বিচিত্র নৃত্য ও ধ্বনি-সুষমার যে অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছেন, রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠক এতদিন তাহাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ ছিল, তাই এই আকস্মিক রীতি-পরিবর্তন তাহাকে এক নূতন, অনভ্যস্ত জগতে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত রচনাকে গদ্য-কবিতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার ছন্দকে 'গদ্যছন্দ' বা 'ভাবছন্দ' বলা হইয়াছে।

ছন্দ বলিতে আমরা সাধারণত সুনিয়মিত, সুপরিমিত ও সুনির্দিষ্ট ধ্বনি-বিন্যাস বা বৃত্ত-বন্ধন এবং অন্ত্য-মিল বুঝিয়া থাকি। অন্ত্য-মিল না থাকিলেও সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনি-বিন্যাসের ফলে ছন্দের উদ্ভব হইতে পারে, যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। কিন্তু

'গদ্যের ছন্দ' কথাটি আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়, কারণ এই ছন্দের দ্বারাই গদ্য ও পদ্যের সীমারেখা নিরূপিত হয়। গদ্য কাব্য হইতে পারে, সংস্কৃত-সাহিত্য গদ্যকেও কাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং রসাত্মক বাক্যকেই কাব্যের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। দশকুমারচরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি রচনা সংস্কৃত-সাহিত্যে গদ্য-কাব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। উপনিষদের গদ্য-রচনাও অনেকখানি কাব্যলক্ষণযুক্ত। বাংলা-সাহিত্যেও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাতচিন্তা', 'নিশীথচিন্তা', 'নিভৃতচিন্তা', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক রচনা, এবং রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লিপিকা' প্রভৃতিকে গদ্যকাব্য বলা যায়। গদ্য কাব্যের পর্যায়ে উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কবিতা কোনো দিন বলা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এইরূপ পর্বানুসারে সাজানো গদ্যকে কবিতা আখ্যা দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই আবিষ্কার, এই নূতন রীতির প্রবর্তন আমাদের মনে একটা সংশয়ময় বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যিনি বিচিত্র ধ্বনির ইন্দ্রধনুচ্ছটায় সংগীতের অপরূপ মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার বাণী কতো বিচিত্র সুরে ও ভঙ্গীময় নৃত্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, তিনি যে ধ্বনি-রূপের সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়া তাঁহার কাব্যকে একেবারে সংগীত ও সুরের আবেশ হইতে মুক্তি দিয়াছেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় বৈ কি। ভাবাবেগ, কল্পনা ও সংগীত—এই তিনের সম্মিলিত রূপায়ণই উৎকৃষ্ট কবিতার রূপ। একটাকে অন্য হইতে পৃথক করা যায় না। এই সম্মিলিত রূপের সমস্ত ঐশ্বর্য লইয়া অপরূপ কবিতা-লক্ষ্মী কবির হৃদয়-সমুদ্র হইতে উত্থিতা হন—একেবারে পূর্ণ প্রস্ফুটিতা! বিশেষ করিয়া উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার অপরিহার্য অঙ্গ সংগীত—তাহার ধ্বনি বা ছন্দরূপ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রেষ্ঠ গীতি-প্রতিভা, যিনি একদিন বাল্মীকির ভূমিকায় বলিয়াছিলেন—'মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর', যিনি 'সংসারধূলিজালে গীতরসধারা সিঞ্চন' করিয়া আনন্দলোক বিরচন করিতে চাহিয়াছিলেন, যিনি 'সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে মৃত্তিকার কোলে' নামিয়া আসিয়াছেন, তিনি এইরূপ সংগীত ও সুরের অনির্বচনীয়ত্বকে একান্ত খর্ব করিলে, তাঁহার কাব্য অনেকখানি বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে বলিয়া সাধারণ পাঠক যে বেদনা পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুত অনেক কাব্য-রসিক এ প্রকার কবিতা হইতে রস গ্রহণে অসমর্থ হইয়া হতাশ হইয়াছেন।

অপূর্ব সংগীতকার ও সুরবেত্তা কবি যে তাঁহার ভাষার বিস্ময়কর নৃত্য-লীলা ও সংগীত খেয়ালের বশে অকস্মাৎ ত্যাগ করিলেন, তাহা নয়; এই রচনার দ্বারা

তিনি একটা অভিনব রূপসৃষ্টি—একটা নূতন পরীক্ষা করিতে চাহেন। সমস্ত ধ্বনি-রূপের বন্ধন হইতে, অতিনিয়ন্ত্রিত শিল্পরচনার কলা-কৌশল হইতে কাব্যকে মুক্ত করিয়া, তাহার অন্তর্নিহিত ভাবের উপরই তাহার স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিতে কবির ইচ্ছা। এই রীতি-পরিবর্তনের মূলে কবি-মানসের একটা পরিবর্তন নিহিত আছে। 'বলাকা'র যুগ হইতেই রবীন্দ্র-কাব্যে চিন্তা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আবেগ ও কল্পনার সঙ্গে গভীর মননশীলতা, আত্ম-জিজ্ঞাসা ও যুক্তি-দৃষ্টান্ত সমভাবে মিশ্রিত হইয়া বলাকা ও তাহার পরবর্তী যুগের কাব্যে একটা বৈশিষ্ট্য রচনা করিয়াছে। এ যুগের কাব্যের রূপ অনেকাংশে গদ্যের রূপ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ কোনো ভাবের প্রত্যক্ষ প্রকাশের উপর, কোনো নূতন চিন্তা ও যুক্তি-তর্কের উপস্থাপনের উপরই কবির বেশি লক্ষ্য। বলাকা হইতেই কবি সুনিয়মিত ছন্দের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া, এমন কি প্রতি পংক্তির মাত্রা-সংখ্যার বন্ধনকেও অস্বীকার করিয়া চিন্তাধারার উত্থান-পতন ও যুক্তি-জিজ্ঞাসার অনুযায়ী এক নূতন মুক্তচ্ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন এবং বলাকা-পলাতকা-মহুয়া-পরিশেষ পর্যন্ত এই ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু পুনশ্চ গ্রন্থে কবি ছন্দের সমস্ত বিধি-বিধান—বৃত্তবন্ধন, অন্ত্য-মিল প্রভৃতি একেবারে ত্যাগ করিয়া নূতন রীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

এই নূতন-রীতি-গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে পুনশ্চ গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন,—

"গদ্যকাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।"

কবির উদ্দেশ্য, পদ্যের 'সসজ্জ, সলজ্জ অবগুণ্ঠন' অর্থাৎ ছন্দের নিয়মিত বিবিধ-বন্ধনকে দূর করিয়া অসংকুচিত গদ্যরীতি অবলম্বন করিয়া কাব্যের অধিকারকে সুপ্রসারিত করা। কিন্তু তাঁহার এই রচনা গদ্যে লেখা কাব্য নয়, ইহাকে পর্বে পর্বে সাজাইয়া কবিতার রূপ দিয়া কবিতা বলা হইয়াছে। ইহাতে কবির মনোগত ভাব এই যে, ছন্দের বহুমূল্য জড়োয়া অলংকার ও বেনারসী শাড়ির ঔজ্জ্বল্য ও বন্ধন হইতে ভাবকে মুক্ত করিলে, তাহার স্বাভাবিক গতি ও অন্তর্নিহিত শক্তির রূপ ফুটিয়া ওঠে। এই সব কবিতায় ভাবের প্রাধান্যের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। ভাবানুযায়ী পর্ববিন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া কবি গদ্য-কবিতার ছন্দকে 'ভাবচ্ছন্দ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং গদ্য-কবিতা ভাবেরই কবিতা বলিয়া তাহাকে 'গদ্যছন্দ'ও বলিয়াছেন। ভাব বা চিন্তাই বিশেষভাবে কবি-মনকে এ

যুগে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাই তাহার প্রকাশ হইয়াছে এই অভিনব ভঙ্গীতে—অপূর্ব রূপদক্ষ কবির সৃজন-প্রতিভার এক অসামান্য নিদর্শনরূপে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার প্রকৃত স্বরূপ এই যে, ইহা গদ্যও নয়, পদ্যও নয়—গদ্য-পদ্যের সমন্বয়ের একটা পরীক্ষা। বিচিত্র রূপস্রষ্টা কবির ইহা এক অভিনব রূপসৃষ্টি। সাধারণ গদ্যের মতো ইহার বাক্য রচিত নয়, শব্দযোজনা, অন্বয়, যতি-স্থাপন প্রভৃতি প্রচলিত গদ্য হইতে পৃথক। আবার ইহা ছন্দোবদ্ধ কবিতাও নয়। গদ্য অনেকটা উন্নত হইয়া ছন্দের কতকটা আভাস প্রাপ্ত হইয়াছে, আবার পুরাপুরি কবিতার দৃঢ়বন্ধনও বহুলপরিমাণে শিথিল হইয়াছে। এই প্রকার গদ্যে একটা বেশ ধ্বনিরূপ লক্ষ্য করা যায়; এই পর্বে পর্বে সাজানো কথাগুলির মধ্যে অনতিস্ফুট ছন্দ-সৌন্দর্যের একটা মৃদু-মধুর আলোক উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। অথচ পদ্যের নিরূপিত ও পরিমিত ছন্দের দৃঢ়বন্ধন না থাকায় গদ্যের স্বাধীন ও অবাধগতির ধারা অব্যাহত আছে। মনে হয়, এই প্রকার গদ্য-পদ্যের সমন্বয়ে কাব্য-রচনা কবির উদ্দেশ্য। তাঁহার নিজের কথায় "পদ্য-ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে, গদ্যে কবিতার রস দেওয়া"ই তাঁহার ইচ্ছা।

এই নব-প্রবর্তিত গদ্য-কবিতার নূতন ছন্দের সঙ্গে কবি শান্তিনিকেতনের প্রান্তবাহিনী সাঁওতাল পাড়ার নদী কোপাইএর সাদৃশ্য দেখিয়াছেন,—

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালী।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে;
পিছনে পিছনে যাবে গাঁয়ের কুকুরটা;
আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়। (কোপাই)

এইরূপ গদ্য-কবিতার রীতিতে যে গদ্য-পদ্যের সমন্বয়ে ভাষার স্থল-জলের মিলন এবং সংগীত ও আটপৌরে ভাবপ্রকাশের মিশ্রণ সাধিত হয়, এবং ভাষার স্তব্ধতা ও চাঞ্চল্য একসঙ্গে প্রকাশ পায়, এই কথা কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন 'নাটক' কবিতায়—

পদ্য হোলো সমুদ্র
সাহিত্যের আদি যুগের সৃষ্টি
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এলো অনেক পরে;
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এলো
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শালদোশালা
এলো জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনঝন্ ঝংকার লাগিয়ে দিলে।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্য বাণীর মহাদেশ;
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিঃশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।
কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।
একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ,
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতিকালের চাঞ্চল্য।

এই সব গদ্য-কবিতার মধ্যে সাধারণত মর্মবিদারণকারী অনুভূতি ও আবেগের অপরূপ প্রকাশ নাই, গভীর কল্পনার বিস্ময়কর লীলা নাই। ইহারা inspired momentএর অনবদ্য দান নয়। এখানে আবেগ অগভীর, কল্পনা অর্ধ-সক্রিয়—যেন কেবল চোখে-দেখা কতকগুলি জিনিসের উপর কবিত্বপূর্ণ মন্তব্য। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে গভীর দার্শনিক চিন্তা ও রহস্যবোধ ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ইহারা চিন্তার স্তর অতিক্রম করিয়া গভীর অনুভূতির মধ্যে প্রকৃত কাব্যরূপ ধরে নাই—মর্মস্থলের সংহত রস-ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয় নাই। তবে মোটামুটি সেই

সব উচ্চ দার্শনিকচিন্তাপূর্ণ ও অধ্যাত্ম-তত্ত্বের কবিতাগুলির একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গৌরব আছে।

শুধু ছন্দে নয়, ভাবের দিক দিয়াও 'পুনশ্চ' কাব্যে একটি মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্র কাব্যধারায় কতকগুলি বাঁক বা গতি-পরিবর্তনের স্থান লক্ষ্য করা যায়। প্রকাশের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কবি ক্রমাগত রূপ হইতে রূপে, রস হইতে রসে অগ্রসর হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। একটা নূতনত্ব বা বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে ক্রমাগত পরিচালিত করিয়াছে। কোন একটা বিশিষ্ট রূপ বা রসের গণ্ডীর মধ্যে তিনি বেশীদিন আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। এক আবেষ্টনী ভাঙিয়া, একপ্রকার রূপ বা রসের সীমা অতিক্রম করিয়া, তিনি নবতর প্রকাশের মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন, আবার সেখান হইতে চলিয়াছে যাত্রা ভিন্নপথের অভিমুখে। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে এই পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষাতেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে বহুমুখী ও বিচিত্র ভঙ্গীমাময়।

তিনি কোন বিশিষ্ট রূপে বা রসে তাঁহার কবিজীবনের পূর্ণতা বা শেষ প্রকাশ বলিয়া মনে করেন নাই। যেখানেই তিনি 'শেষ' টানিতে গিয়াছেন, সেখানেই 'অশেষ' 'নূতন দ্বার খুলিয়া' দিয়াছে। যেখানেই তিনি তাঁহার কাব্যের সমাপ্তিসূচক নাম দিয়াছেন, তার পরেই আবার তাহাকে নূতন কাব্য লিখিতে হইয়াছে। 'চৈতালী', 'পূরবী' এইরূপ এক-একটি পর্বের সমাপ্তিসূচক কাব্যনাম। এই পর্যায়ের 'পরিশেষ' তাহার শেষ সমাপ্তিসূচক কাব্যনাম। তাহার পরেও কবি আবার 'পুনশ্চ' কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন।

এই আঙ্গিকের রীতি-পরিবর্তনের মূলে কবি-মানসের পরিবর্তন খুবই সঙ্গতভাবে আমরা অনুমান করিতে পারি।

ছন্দতো ভাবেরই একটি রূপমাত্র। ভাবেরই অভিব্যক্তির সঙ্গে ছন্দ অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। সুতরাং ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশরীতির পরিবর্তন অনুমান করা যায়। প্রকাশরীতির পরিবর্তনের জন্য আমরা নিম্নলিখিত কারণগুলি সহজেই নির্ধারণ করিতে পারি।

ক। কবি-স্বভাবের অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষা ও পরিবর্তনশীলতা।

খ। বাস্তব-সচেতনতা।

গ। কাব্যে চিন্তা ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের উপর ঝোঁক।

ঘ। অগভীর আবেগ ও অর্ধসক্রিয় কল্পনার সঙ্গে চোখে দেখা কতকগুলি দৃশ্য ও ঘটনার উপর কবিত্বময় মন্তব্য—'অলস মনের মাধুরী' বিস্তারের চেষ্টা।

(ক) রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবি-জীবনে দেখা গিয়াছে যে কাব্যে ধীরে ধীরে তাঁহার বাণীরূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। একই রকম ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী তিনি বরাবর ব্যবহার করেন নাই। নিত্য-নূতনের বৈচিত্র্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে এবং নূতন নূতন প্রকাশভঙ্গী তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন। 'ক্ষণিকা'তে প্রথম আমরা দেখি এই পরিবর্তনের রূপ ও সুর।

'ক্ষণিকা'তেই কবি প্রথমে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন। 'ভাষা যেন তীরের মতো বুকে আসিয়া বিদ্ধ হয়, তাই লঘু কৌতুক ও সহজ ভাব প্রকাশের এইটাই উপযুক্ত বাহন। বাংলা হসন্ত শব্দের প্রচুর ব্যবহারে ছন্দে লাগিয়াছে একটা অপূর্ব লঘুনৃত্যের দোলা। কথ্য ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা, সৌন্দয ও ধ্বনিমাধুর্য কবি ক্ষণিকাতেই প্রথম বুঝিতে পাবেন এবং বহু গ্রন্থে এইরূপ রচনাভঙ্গীই অবলম্বন করিয়াছেন। নৃত্য-দোদুল ছন্দ, সরল কথ্য ভাষা, সহজ সত্য প্রকাশ এবং অনায়াস অলংকার প্রয়োগে 'ক্ষণিকা' বাংলা গীতিকাব্যে এক অভিনব স্থান অধিকার করিয়াছে।'

এই স্তরেও কবি-মানসের একটা ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। 'কল্পনা' পর্যন্ত চলিয়াছে কবির প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের যুগ—শিল্পী-জীবনের চরম অভিব্যক্তির যুগ। কল্পনা থেকেই লক্ষ্য করা যায়, কবির ভাব-জীবনের একটা পরিবর্তনের সুর। কবি সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের রসোচ্ছল শিল্পীজীবন ছাড়িয়া ত্যাগ ও তপস্যার পথে, মহাজীবনের পথে, আধ্যাত্মিক জীবনের পথে যাত্রা করিয়াছেন। পূর্বেকার রসের পরিমণ্ডল ত্যাগ করিবার যে অন্তর্গূঢ় বেদনা তা আবেগহীন সরল ভাষায় কৌতুকহাস্যের হাওয়ায় উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন।

তারপর 'বলাকা'তেও কবি অসমছন্দ বা মুক্তছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কাব্যজীবনে নূতন প্রবর্তন ও পরীক্ষা। অন্ত্যমিল বজায় আছে বটে, কিন্তু ছন্দের কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন নেই। এখানেও তাঁহার কবি-মানসের পরিবর্তন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই পর্ব হইতেই কবির চিত্ত নানা সমস্যা; চিন্তা ও যুক্তি-তর্ক প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

তারপর 'পুনশ্চ' পর্যায়ে আসিয়া কবি একেবারে নিয়মিত ছন্দোবন্ধন ও অন্ত্যমিল ত্যাগ করিয়াছেন। এই 'গদ্যছন্দ' বা 'ভাবচ্ছন্দ' কবি অনুসরণ করিয়াছেন, 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' গ্রন্থে। মধ্যে 'বীথিকা'য় কবি ছন্দ-প্রবাহ ও অন্ত্যমিল অবলম্বন করিয়াছেন। মনে হয়, বীথিকাতে জগৎ ও জীবনের গভীর ধ্যান ও অনিত্য জীবনে চিরন্তনের লীলাবৈচিত্র্যের অনির্বচনীয় রহস্য ও বিস্ময়, কবি ছন্দের লীলায়িত নৃত্য ও সংগীতের অনির্বচনীয় মাধুর্যের ইন্দ্রজালে বন্দী করিতে চাহিয়াছেন।

জীবনের শেষ-পর্বের কবিতায় কবি আবার গদ্য কবিতার আঙ্গিকে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সময় ভাষা বাহুল্যবর্জিত নিরাভরণ রূপ ধারণ করিয়াছে—পূর্বের অনিয়ন্ত্রিত মুক্ত ছন্দই ব্যবহৃত হইতেছে বটে, কিন্তু চরণের দীর্ঘতা ও নানা বৈচিত্র্য কমিয়া গিয়াছে—অন্ত্যমিল অনেক স্থলে অনুপস্থিত। এখানেও কবি-মানসের পরিবর্তন হইয়াছে। এ যুগের কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে অনুভূত সত্যের নিরাভরণ, স্বচ্ছ বাণীরূপ—এযুগের কাব্য কবির শিল্পৈশ্বর্যের চোখঝলসানো প্রদর্শনী নয়—স্বল্পাক্ষর মন্ত্রের উচ্চারণ-ধ্বনি।

স্থতরাং কবি-জীবনে তাঁহার অন্তরের তাগিদেই—তাঁহার ভাব-চিন্তার পরিবর্তনেই তাঁহার কাব্যে নব নব রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

(খ) ১৩৩০ সাল হইতে কবি বাহির হইয়াছেন বিদেশ-ভ্রমণে—ঘুরিয়াছেন ইউরোপের নানাস্থানে—প্যারিস, জার্মানি, জেনেভা, সোভিয়েট রাশিয়া, তারপরে গিয়াছেন আমেরিকায়, তারপর পারস্য ও ইরাক ভ্রমণের পর এই পর্বের ভ্রমণ শেষ হইয়াছে। বিদেশে ও ভারতে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলন তুলিয়াছে তাঁহার মনে। গভীর দার্শনিক চিন্তা ও আত্মতত্ত্বসমস্যায় মগ্ন কবির মন চারিদিকের বাস্তবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কবির দৌহিত্র নীতীন্দ্রের মৃত্যুতে এই বাস্তবানুভূতি সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কবির নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন ও ধ্যান ভাঙিয়া গিয়াছে। তিনি চারিপাশের সাধারণ মানুষ ও দৃশ্যকে নূতন চোখে দেখিয়াছেন। এই পারিপার্শ্বিক-সচেতনতা ও বাস্তব-সচেতনতা তাঁহার কাব্যকলার রীতি পরিবর্তনেও অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিবে। কবি দেখিতেছেন,—

'ঋতুর বদল হয়ে গেছে', 'প্রকৃতির হল বর্ণভেদ'
''ছোটো ছোটো বৈষম্যের দল
দেয় ঠেলা,
করে হাসাহাসি।
রুচি আশা অভিলাষ
যা মিশিয়ে জীবনের স্বাদ,
তার হল রসবিপর্যয়।"
('আগন্তুক', 'পরিশেষ')

কবি দেখিলেন,—

"কালের নৈবেদ্যে লাগে যে-সকল আধুনিক ফুল
আমার বাগানে ফোটে না সে।"
('আগন্তুক', 'পরিশেষ')

কিন্তু তাঁহাকে এ যুগের 'খাজনার কড়ি' দিতে হইবে, এই যুগের খাজনার

উপযোগী সেই কড়ি তাঁহার হাতে নাই, তাই এমন কিছু দান করিতে চাহেন, যাহা উপস্থিত কালের দাবী মিটাইয়াও চিরকালের জন্য থাকিয়া যাইবে।

"তবু যা সম্বল আছে তাই দিয়ে
একালের ঋণ শোধ করে অবশেষে
ঋণী তারে রেখে যাই যেন।"

('আগন্তুক', 'পরিশেষ')

এই নূতন যুগের কাব্যের দাবীর কথা কবি বলিয়াছেন, তাঁর সমসাময়িক প্রবন্ধ 'আধুনিক কাব্য'প্রবন্ধে। এই প্রসঙ্গে সেই প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয়, তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্‌ন্‌। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

... ...

নিজের মনের মতো করে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে আছে বলেই মেনে নেয়। ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না।

... ...

ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা।

... ...

এখানকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না।

কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্য।

... ...

আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্যে সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক"।

কবি আধুনিক রুচি-অনুযায়ী এই গদ্য-ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন বলিলেও রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। প্রকৃতির চিত্রই হোক আর পূর্বস্মৃতির কোনো চিত্রই হোক, কবির রোমান্টিক ভাবালুতার স্পর্শ, তাঁহার কল্পনার বর্ণচ্ছটার ছাপ তাহাতে আছে। ('বাসা', 'পুকুর ধারে', 'সুন্দর' প্রভৃতি কবিতা) অনেকগুলি কবিতায় মানবিকতার আবেদন—তুচ্ছ অবহেলিত সাধারণ মানুষের জন্য কবির গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। ('শেষ চিঠি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'একজন লোক', 'বাঁশি' প্রভৃতি কবিতা)।

(গ) বলাকা হইতেই কবির কাব্যে চিন্তা ও যুক্তি প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। দার্শনিক চিন্তা, আধ্যাত্মিক ভাবনা, যুক্তিমূলক পদ্ধতি, প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। গদ্য-কবিতার গ্রন্থগুলিতে ব্যঞ্জনা অপেক্ষা, কেন্দ্রগত রসপরিণাম অপেক্ষা, ঘটনার বর্ণনা ও উপস্থাপনের উপরেই যেন কবির বিশেষ ঝোঁক। আখ্যায়িকা-জাতীয় কবিতাই হোক, কি স্মৃতি-চিত্রই হোক, কি প্রকৃতি-চিত্রই হোক, একটা বিশিষ্ট মননের ধারার সঙ্গে কবির বর্ণনা বা বিবৃতি যেন আঁকা-বাঁকা পথে অগ্রসর হইয়াছে।

(ঘ) গদ্য কবিতার অধিকাংশের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় যে, কবি-মানস যেন গভীরতা ও আবেগ-তন্ময়ত্ব পরিহার করিয়া চলিয়াছে। এইসব কবিতার মধ্যে আবেগের উচ্চ সুর বা সুদূরপ্রসারী কল্পনার বিস্ময়কর লীলা নাই। ইহাদের রস যেন ইচ্ছা করিয়াই ভাসা-ভাসা করা হইয়াছে। যেন চলতি মুহূর্তের তাড়াতাড়ি একটা রস-নিষ্কাশন করাই ইহাদের মধ্যে কবির উদ্দেশ্য। উৎকৃষ্ট কবিতার মত ইহারা মর্মস্থলের সংহত রসব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত নয়।

অবশ্য 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন' দুইটি কবিতা ভিন্ন-জাতের। 'শেষ সপ্তকের' মধ্যে এই জাতীয় কবিতার সংখ্যা বেশি, 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'তেও এই জাতীয় কবিতা আছে। ভাবের সমুন্নতি, উচ্চ কল্পনা ও সংহত আবেগের বেগবান প্রকাশে এই কবিতাগুলির একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এইগুলি ছাড়া অন্যান্য গদ্যকবিতা অগভীর উচ্ছ্বাস ও অর্ধজাগ্রত কল্পনার ছায়াচিত্র অঙ্কন মাত্র।

গদ্যকবিতা-রীতির প্রবর্তনের মূলে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহাই বলা যায় যে, ছন্দের অতিনিরূপিত ও নিয়মিত বিধিবন্ধনকে দূর করিয়া এবং ভাষা ও প্রকাশরীতিতে 'সসজ্জ-সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা' দূর করিয়া দিয়া গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে কাব্যের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিষয়ে এই পরীক্ষা, এই নূতন আঙ্গিক সম্বন্ধে সমসাময়িককালে অনেক বিস্ময়-প্রকাশ, অনেক জিজ্ঞাসা ও অনেক বাদানুবাদ ঘটিলেও ইহার পরবর্তী সময়ে এই গদ্যকবিতার আঙ্গিক বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান বাহন হইয়াছে। ইংরেজীতে মার্কিন কবি Whitman এইরূপ prose verseএর প্রবর্তক। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই এই অভিনব গদ্যছন্দের রূপস্রষ্টা।

ছন্দের ধ্বনিবিন্যাস, বৃত্তবন্ধন, অন্ত্যমিল প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত গদ্য-ছন্দ একান্তভাবে ভাবের অধীন। গদ্য-ছন্দের যতি পড়ে বাক্যগত ভাবের অধীন হইয়া। গদ্য-ছন্দই বাংলায় সত্যকার মুক্ত

ছন্দ। এখানে যতি-স্থাপন ও চরণবিন্যাস একান্তভাবে কবির অন্তরের ভাবরসের অধীন। সেইজন্য গদ্যকবিতার ছন্দকে কবি ভাব-ছন্দ বলিয়াছেন এবং গদ্যকবিতা ভাবেরও কবিতা বলিয়া তাহাকে গদ্য-ছন্দও বলিয়াছেন। গদ্য-ছন্দই হইতেছে কবির মতে ভাব-ছন্দ।

'পুনশ্চের' গদ্যছন্দে যতিস্থাপন কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্নের উপর নির্ভরশীল নহে। বাক্যের ভাবের উপরই যতি-বিভাগ নির্ভর করে এবং সম ও বিসম মাত্রায় ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, এমনি ১১, ১২, ১৩ মাত্রার পর্বও পরস্পর সংলগ্ন থাকে। আর এইগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে বাক্যের অন্তর্গত ভাবচ্ছন্দ। ভাবচ্ছন্দই কবিতাকে সামঞ্জস্যময় পরিণতি দান করে।

রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ'কাব্য ও গদ্যকবিতার রীতি সম্বন্ধে, 'কাব্যে গদ্যরীতি', 'কাব্য ও ছন্দ', 'গদ্যকাব্য' এই কয়টি প্রবন্ধে তাঁহার মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এইগুলি হইতে গদ্যকবিতা সম্বন্ধে কবির অভিমত আমরা জানতে পারি।—

"বিবাহ সভায় চন্দনচর্চিত বর-কনে টোপর মাথায় আলপনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুত পড়ে চলেছে মন্ত্র, ওদিকে আকাশ থেকে আসছে শাহানা রাগিনীতে শানাইয়ের সংগীত। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্য মিলনের পরিভূষিত উৎসব। কিন্তু তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারো মাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত শাহানা সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না।

... ...

এখন থেকে শাহানা রাগিনীটা অশ্রুত বাজবে। এমন কি, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্তশ্রুত কড়া সুরও না মেশা অস্বাভাবিক। সুতরাং একেবারে না মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি-বেনারসি তোলা রইল। আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে।

... ...

সে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলেছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না। তাকে কাব্য শ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেই জন্যেই চারিত্রশক্তি আছে।

... ...

কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তাহলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা

জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সবত্রে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নীচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচু নিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনও ঘাসের উপর, কখনও কাঁকরের উপর দিয়ে।

... ...

নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই বা লাগল; তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসর ঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মালমসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্য-কাব্যেরই এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা। ভীড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি-শাড়ির প্রান্ত তুলে-ধরা, আধ-ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়। এই গেল আমার 'পুনশ্চ গ্রন্থের কৈফিয়ৎ।"

('কাব্যে গদ্যরীতি'—সাহিত্যের স্বরূপ)

... ...

"অন্তরে যে ভাবটা অনির্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারী প্রকাশ করবে গানে নাচে, এটাকে লিরিক বলে স্বীকার করা হয়। এর ভঙ্গীগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে বলেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবলভাবে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্য বিশেষ প্রসাধন, আয়োজন, বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, একটি দূরত্ব। কিন্তু একবার সরিয়ে দাও ওই রঙ্গমঞ্চ, জরির আঁচলা দেওয়া বেনারসি শাড়ি তোলা থাক পেটিকায়। নাচের বন্ধনে তনুদেহের গতিকে মধুর নিয়মে নাই বা সংযত করলে। তা হলেই কি রস নষ্ট হল। তা হলেও দেহের সহজ ভঙ্গিতে কান্তি আপনি জাগে।

... ...

বরঞ্চ এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা—আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি। তার বাহুল্যবর্জিত আত্মনিবেদনে তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কাছের সম্বন্ধ ঘটে।

... ...

প্রশ্ন উঠবে গদ্য তাহলে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিনী বলে কল্পনা কর, তাহলে জানবে, তিনি তর্ক করেন, ধোপার বাড়ির কাপড়ের হিসাব রাখেন, তার কাশি সর্দি-জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন—এ সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত। এরই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উচ্ছ্লিয়ে ওঠে পাথর ডিঙ্গিয়ে ঝরণার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণী। গদ্য কাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে দেওয়া চলে।"

('কাব্যে গদ্যরীতি'—সাহিত্যের স্বরূপ)

"ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য—কোনখানে তাদের মূলগত মিল? সেখানে লড়াই করে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য। কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয়নি, তার হাজার প্রমাণ আছে; গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে। ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে, আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে। কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।......

গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্য-ছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে, তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।

কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল, এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।"

('কাব্য ও ছন্দ'—সাহিত্যের স্বরূপ)

"মনে পড়ে একবার শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম, ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।'

সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুবই কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল, তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমি স্বয়ং এই কাব্যরচনার চেষ্টা করেছিলুম 'লিপিকা'য়, অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাইনি। 'লিপিকা' লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখিনি। বোধ করি সাহস হয়নি বলেই। কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছ-বিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতি-মাধুর্য—অতি-লালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়। নটীর নাচে শিক্ষিতপটু অলংকৃত পদক্ষেপ। অপর পক্ষে, ভালো চলে এমন কোন তরুণীর চলনে ওজন-রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গীতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হল সেইরকম—অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।......

গদ্য ও পদ্যের ভাসুর-ভাদ্র বউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করিনে।

রুচিভেদ নিয়ে তর্ক করে কিছু লাভ হয় না। এই মাত্রই বলতে পারি, আমি অনেক গদ্য-

কাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোন রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে। হয়তো সজ্জা নেই কিন্তু রূপ আছে এবং এই জন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্য-গোত্রীয় বলে মনে করি! কথা উঠতে পারে, গদ্যকাব্য কী! আমি বলব, কী ও কেমন জানি না, জানি যে এর কাব্যরস এমন একটা জিনিস যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার নয়। যা আমাকে রচনাতীতের আস্বাদ দেয়, তা গদ্য বা পদ্যরূপেই আসুক, তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।" ('গদ্য কাব্য'—সাহিত্যের স্বরূপ)

এই প্রকার পর্বে পর্বে সাজানো কথাগুলির মধ্যে মধ্যে যে একটা অনতিপরিস্ফুট ছন্দের স্পন্দন আছে নিম্নলিখিত অংশটি লক্ষ্য করলেই বুঝা যাইবে।—

উর্ধ্বে গিরি চূড়ায়/বসে আছে ভক্ত/তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ॥
আকাশে তার/নিদ্রাহীন চক্ষু/খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত ॥
মেঘ যখন ঘনীভূত/নিশাচর পাখি/চীৎকার শব্দে/যখন উড়ে যায়।
সে বলে,/ভয় নেই ভাই,/মানুষকে মহান বলে/জেনো', ॥
ওরা শোনে না/বলে/পশুশক্তিই/আদ্যাশক্তি। ॥

'পুনশ্চ' গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবধারার কবিতা লক্ষ্য করা যায়:—

(ক) প্রকৃতির কোনো দৃশ্য বা জীবনের কোনো ঘটনার উপর অগভীর উচ্ছ্বাসের সহিত অর্ধজাগ্রত কল্পনার ছায়া-চিত্র অঙ্কন। এই সব কবিতা যেন কোনো ভাবুক ও রসিক দর্শকের ক্ষণিক অনুভূতির ব্যঞ্জনা-মুখর চিত্র—চলতি মুহূর্তের রস-নিষ্কাশন।

(খ) বিশ্বসৃষ্টিরহস্য, মানবসত্তার রহস্য, মানুষের আত্মস্বরূপের যথার্থ পরিচয়, প্রকৃতির সত্যকার রূপ ও তাহার সহিত মানবের যোগসূত্র প্রভৃতি গভীর দার্শনিক চিন্তা ও অধ্যাত্মরহস্যের উপলব্ধি চমৎকার কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে অনেক গদ্যকবিতায়। কবির আত্মতত্ত্ব-বিশ্লেষণ হিসাবে এই কবিতাগুলির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। উচ্চ কল্পনা, সংহত আবেগ, ভাবের সমুন্নত মহিমা ও সেই সঙ্গে দীর্ঘায়ত চরণগুলির মধ্যে ছন্দ-তরঙ্গের মৃদু কল্লোলধ্বনি এইগুলিকে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার একটা বিশিষ্ট দানে পরিণত করিয়াছে। এই জাতীয় কবিতার সংখ্যা 'পুনশ্চ'এর মধ্যে কম, 'শেষ সপ্তকে'র মধ্যে বেশি, 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'র মধ্যেও অনেক আছে। পুনশ্চের বিখ্যাত কবিতা 'শিশুতীর্থ' এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 'শাপমোচন'-এও অনেকটা এই বৈশিষ্ট্য আছে।

(গ) আখ্যায়িকা-জাতীয় কবিতা। এই সব কবিতায় 'অপূর্ব বাগ্‌বৈভব' মনোহর কাব্যসম্পদ ও নিগূঢ় সৌন্দর্যবোধ আমাদিগকে মুগ্ধ করে বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কতকগুলি কেন্দ্রগত রসপরিণাম লাভ করে নাই। ইহাদের রস যেন-

ভাসা-ভাসা। কোনো নিরবচ্ছিন্ন প্রগাঢ় রস ও সৌন্দর্য আমাদের মনকে একটা অনির্বচনীয় চমৎকারিত্বের আস্বাদ দেয় না।

এই কয় প্রকারের ভাবধারাই প্রধানত গদ্য-কবিতার গ্রন্থ চারিটিতে প্রবাহিত হইয়াছে।

(ক) 'পুকুর ধারে', 'ফাঁক', 'বাসা', 'দেখা', 'সুন্দর', 'স্মৃতি', 'ছুটি', 'শালিখ', 'গানের বাসা', 'পয়লা আশ্বিন' প্রভৃতি কবিতা এই ধারার অন্তর্ভুক্ত।

'দেখা' কবিতায় কবি এক বাদলা-দিনে প্রকৃতির পর্যায়ক্রমে রূপ-পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছেন। সারারাত্রির কালো মেঘপুঞ্জের বর্ষণের পর প্রভাতের সূর্যোদয়, তারপর বিকালে আবার ঝড়বৃষ্টি, তারপর সন্ধ্যায় কৃশ চাঁদের ক্লান্তহাসি কবি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছেন আর ভাবিতেছেন,—

মনে বলে, এই আমার যত দেখার টুক্‌রো
চাইনে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চলতি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে,
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব কিছু॥

'ছন্দে-গাঁথা কুঁড়েমির' কারু-কার্যে খচিত এই যে চলতি মুহূর্ত, এ বর্তমানে আবদ্ধ নয়, কোনো নির্দিষ্ট কালের গণ্ডীতেও ইহা পড়ে না,—ইহা সকল কালের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইহাতে যে সৌন্দর্য উদ্ভাসিত, তাহা চিরন্তন। এই ভাব কবি 'সুন্দর' কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আষাঢ়ের আকাশে মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি কবির কাছে চিরন্তন সৌন্দর্য ও সংগীতের প্রতীক,—

…এই যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
আকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন,
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশ-বীণায় গৌড়-সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে॥

'পয়লা আশ্বিন' কবিতায় কবি শরতের আকাশপ্লাবী শুভ্র আলোর ধারার মধ্যে অমর-প্রাণ-সন্ধানী, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, মৃত্যুবরণকারী বিশ্ববিজয়ীদের বিজয়শঙ্খের

'অমর ধ্বনি' শুনিতে পাইতেছেন, আর কামনা-বাসনা-বিড়ম্বিত নিজের মনকে উদ্বোধিত করিতেছেন,—

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন,
গান জাগিয়ে চলো সমুদ্রপথে,
যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে
নব সূর্যোদয়ের দিকে।
নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ধরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও,
লালসাকে দলো পায়ের তলায়।
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ের গ্লানি-ভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।
ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্বজয়ী,
তাদের মাভৈ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে
নির্মল এই শরৎরৌদ্রালোকে,
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে॥

এই শ্রেণীর অনেক কবিতায় কবি আমাদের চির-পরিচিত ও অবহেলিত গদ্যময় প্রকৃতি ও মানুষের পরিবেশের উপব ক্ষণ-দৃষ্টির তুলি বুলাইয়া গিয়াছেন, আর নিতান্ত নগণ্যের মধ্য হইতে অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ব্যঞ্জনা কবির রস-দৃষ্টিতে পরম বিস্ময়কর-রূপে ধরা পড়িয়াছে।

(খ) গদ্য-কবিতার মধ্যে এই জাতীয় কবিতা সার্থক সৃষ্টি। সুদূরপ্রসারী কল্পনা গভীর দার্শনিক চিন্তা, গূঢ় অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা, দৃঢ়সংবদ্ধ গুরুগম্ভীর শব্দধ্বনি, প্রগাঢ় অথচ সংহত আবেগ, ধীর অথচ বীর্যশালী প্রবাহ, উপলব্ধির প্রত্যক্ষ প্রকাশ এই কবিতাগুলিতে রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত করিয়াছে। উদ্দীপনার তীব্রতা বা অনুপ্রেরণার প্রচণ্ড বেগ এই সব কবিতাতে নাই, কিন্তু গভীর অনুভূতির সংযত ও গাম্ভীর্যময় প্রকাশে ইহারা অপরূপ দীপ্তিশালী। লিরিক কবিতার মতো কেবল একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ভাবের উপর ইহাদের অবস্থান নয়, রহস্যময়তা এবং জিজ্ঞাসার এক সম্মিলিত রূপায়ণেই ইহাদের বৈশিষ্ট্য। ইহারা কতকটা এপিক জাতীয়। 'জন্ম-রোমান্টিক' রবীন্দ্রনাথের গূঢ় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও চিরন্তন সত্যের রস ও রহস্যোপলব্ধি একটা স্থির, সংহত, স্বচ্ছ, ক্ল্যাসিক্যাল প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে এই সব কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে।

'পুনশ্চ'-এ এই জাতীয় কবিতা দুইটিমাত্র আছে। কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থ 'শেষ সপ্তক' ও 'পত্রপুট'-এর অধিকাংশ কবিতাই এই জাতীয়। 'শ্যামলী'তেও কয়েকটা আছে।

'শিশুতীর্থ' কবিতাটি রবীন্দ্র-কাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। চরম আদর্শের সন্ধানে মানবজাতির চিরন্তন যাত্রা ও নানা অবস্থার মধ্য দিয়া সেই আদর্শের প্রতীক এক নবজাত শিশুর নিকট পৌঁছানো রূপকচ্ছলে এই কবিতায় চিত্রিত হইয়াছে। এক সুদূর-প্রসারী কল্পনার বিস্ময়কর লীলা ও বিচিত্র ভাবোদ্দীপক শব্দযোজনার অনুপম কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে এই কবিতায়।

সৃষ্টির আদি হইতে কতো দীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষ এই পৃথিবীর বুকে বাস করিতেছে। তাহারা কেবল আহার-বিহার ও পরস্পরের মধ্যে হানাহানিতে মত্ত হইয়া পশু-স্বভাবের পরিচয় দিতেছে। দৈহিক শক্তিই তাহাদের একমাত্র শক্তি। তাহাদের মতে সংগ্রাম ও হিংসাই মানুষের একমাত্র কাম্য।

তাহাদেরই পাশে থাকেন ভক্ত এক সাধু। তিনি মানুষদের এই গ্লানি ও কদর্যতা দেখিয়া ডাকিয়া বলেন,—মানুষ অতো ছোট নয়, তাহাকে মহান বলিয়াই জানিও। কেউ বিশ্বাস করিতে চায় না তাঁহার কথা—বলে, ওকথা আত্মপ্রবঞ্চনা। চারিদিক ছিল আদিম যুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ক্রমে মেঘ সরিয়া গেল। নবযুগের প্রভাত হইল। ভক্ত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—এখন যাত্রা করো। এ কথার অর্থ কেহ ভাল করিয়া বুঝিল না। কেবল প্রভাতের প্রাণ-চাঞ্চল্যের মধ্যে এক অশরীরী সূক্ষ্ম স্বর যেন তাহাদের কানে কানে বলিল—চলো সবে সার্থকতার তীর্থে। অগণ্য মানুষের—স্ত্রী-পুরুষ-শিশু, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-পণ্ডিত-পুরোহিতের সীমাহীন শোভাযাত্রা চলিল। ইহাই মানুষের সত্যান্বেষণের প্রথম যুগ।

কতো দিন-রাত তাহারা চলিল, কতো দুর্গম পথ অতিক্রম করিল। ক্লান্তি ও হতাশায় শেষে তাহারা মরীয়া হইয়া, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া তাহাদের চালক সাধুকে হত্যা করিল। তারপর যাত্রীদের মধ্যে দেখা দিল একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া। সকলেই অনুতপ্ত, হতবুদ্ধি—কোথায় তাহারা যাইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। তখন এক বৃদ্ধ বলিলেন—যাহাকে আমরা মারিয়াছি, সেই আমাদিগকে পথ দেখাইবে, সে মরিয়া আমাদেরই জীবনের মাঝে সঞ্জীবিত হইয়া আছে—সে মহামৃত্যুঞ্জয়। তরুণের দল মহোল্লাসে আবার অগ্রসর হইল। মনে তাহাদের সংশয় নাই, চরণে তাহাদের ক্লান্তি নাই। তাহারা বলিতে লাগিল,—আমরা ইহলোক জয় করিব এবং লোকান্তর। মৃত অধিনেতার আত্মা আমাদের অন্তরে বাহিরে। আমাদের পৌঁছাইতে হইবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে। ইহাই তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধির প্রেরণা।

ক্রমে তাহারা নগর, রাজার দুর্গ, সোনার খনি, মারণ-উচাটন-মন্ত্রের পুঁথি-শাসিত দেশ পার হইয়া, এক সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে, পর্বতের পাদদেশে, অরণ্যের প্রান্তে শান্ত এক গ্রামে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা এক ঝরনার তীরে পর্ণকুটীরে মাতার কোলে এক নবজাত শিশুকে দেখিতে পাইল। সেই শিশুকে দেখিয়া সকলে নতজানু হইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল, "জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।" এইখানেই তাহাদের যাত্রা হইল শেষ। তাহারা সফলতার তীর্থে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে পৌছিল।

এই রূপকের মর্মার্থ এইভাবে ধরা যায়,—মানুষ চিরকাল চরম আদর্শের অভিযানে চলিয়াছে। সেই চরম আদর্শ বা শেষ লক্ষ্য হইতেছে তাহার আত্মস্বরূপের দর্শনলাভ—তাহার অন্তরস্থিত নিত্য-মানবকে উপলব্ধি। কিন্তু পশুশক্তির বিকাশে লোভ, কাম, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নানা কলুষ তাহার অন্তরস্থিত দেবতাকে উপলব্ধি করিতে বাধা দেয়। সে মনে করে, পশুশক্তির সাধনাই তাহার একান্ত কাম্য—বিশ্বাস করে না যে তাহার মধ্যে দেব-অংশ আছে—মানুষের আর কোনো বৃহত্তর সম্ভাবনা আছে। যুগে যুগে সাধু ও তত্ত্বজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়। তাঁহারা বলেন, মানুষকে বাহিরের দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায়, সে তাহা নয়, সে মহান, সে চিরন্তন। সংসারের নানা আবিলতায় ও বীভৎসতায় সে রুদ্ধদৃষ্টি—তবুও মাঝে মাঝে সে আলোকের ইঙ্গিত খোঁজে। ভক্ত-সাধুদের কথায় তাহার বিশ্বাস হয় না—মনে করে, এ সব আত্মপ্রবঞ্চনার কথা। তারপর ক্রমে কদর্য আবহাওয়ার কুয়াশা কাটিয়া যায়, মহাপুরুষের বাণী তাহাদের সুপ্ত বিবেকে আঘাত করে। তাঁহারই উপদেশ-বাণীতে মানুষ আত্মসাক্ষাৎকারের পথে অগ্রসর হয়, তাঁহারই নেতৃত্বে সে সফলতার তীর্থের দিকে যাত্রা করে। নানা প্রকারের লোক নানা অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। কেউ তাঁহার উপদেশ অল্প বুঝিতে পারে, কেউ অবিশ্বাস করে, কেউ বিকৃত ব্যাখ্যা করে। নিজেদের দুর্বলতার জন্যই যখন সেই আদর্শ-লাভে বিলম্ব হয়, তখন ঘোর অবিশ্বাসে তাহারা তাহাদের মহান নেতাকে হত্যা করে। এইরূপেই যাঁহারা বৃহত্তর জীবনের উপদেশ দেন, শত দুর্বলতা ও কদর্যতায় নিমগ্ন মানুষ তাঁহাদের উপদেশের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে নির্যাতিত করে। তাঁহাদের মৃত্যুর পর, তাঁহাদের ত্যাগের মহান দৃষ্টান্তে মানুষের পশুবুদ্ধি অনেকখানি কাটিয়া যায়। মৃত মহাপুরুষদের বাণী, তাঁহাদের অনুপ্রেরণাই ক্রমে মানুষকে লক্ষ্যে পরিচালিত করে। ক্রমে মানুষ পশুশক্তির দম্ভ, ঐশ্বর্য, বিলাস ত্যাগ করিয়া শান্ত-সমাহিত চিত্তে আপন অন্তরস্থিত আত্মাকে—চির-মানবকে দর্শন করে। সেই নিত্য-মানব নবজাত শিশুর মতো ক্লেদগ্লানিহীন, শুভ্র, নির্মল,

উদার। শিশুই মানুষের অন্তরস্থিত নিত্য-মানবের প্রতীক। এই শিশু-সন্দর্শনই মানবের জীবনে নবযুগ—সফলতার চরম স্তর।

'শিশুতীর্থ'কে আত্মোপলব্ধির রূপক ছাড়াও আমরা জগতের মহাপুরুষদের আবির্ভাব বিষয়ের রূপক বলিয়া ধরিতে পারি। যখন দেশে ও সমাজে নানা গ্লানির আবির্ভাব হয়, অধর্মের ও অসত্যের অন্ধকার চারিদিকে নামিয়া আসে, তখনই হয় জন্ম মহাপুরুষদের।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এই মহাপুরুষরা সকলেই শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই শিশুর জন্মেই এক নবযুগের সৃষ্টি হয়, মানবতার গৌরব আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ ফিরিয়া পায় আবার তাহার সত্য, সনাতন আদর্শ। এইরূপে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যীশুখৃষ্ট জন্মিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শিশুরূপে প্রথমে মায়ের কোলে আসিয়াছিলেন। এই শিশুদের জন্মে মর্ত্যে এক-এক নূতন যুগ নামিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধদেবের পূর্বে পশুবলি, যাগযজ্ঞের বিকট হুংকার ও আনুষ্ঠানিক ধর্মের উদ্ধত অত্যাচারে মানবতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখনই বুদ্ধদেব নূতন বাণী লইয়া আসিলেন—করুণা, মৈত্রী ও প্রেমের বাণীতে আবার মানবতা হইল প্রতিষ্ঠিত। যীশুখৃষ্টও মানবতার পরম দুর্দিনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; রাজশক্তির দম্ভ, হিংসা, যথেচ্ছচারিতায়, মানুষের নৈতিক অধঃপতনে ধরণীর বুকের উপর দিয়া এক পঙ্কস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তখনই প্রেমের মূর্ত প্রতীক যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাঙালী-সমাজের ছিল ঘোর দুর্দিন; সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সামাজিক উচ্চ-নীচের বিচার, চরম নৈতিক অধঃপতনে বাঙালী সমাজ হইয়াছিল শেওলাপূর্ণ বদ্ধ জলার মতো। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে প্রেমের প্লাবনে বদ্ধজলায় আবার চাঞ্চল্য আসিল। সমাজ ও জীবন পাইল মুক্তি। তাই যুগে যুগে মহাপুরুষদের জন্মের জন্য দেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের ভাবাদর্শের দিকে অগ্রসর হয়। তাঁহাদের আবির্ভাবেই মানুষ লুপ্ত মানবতার গৌরবকে ফিরিয়া পায়।

এখানে কবি যীশুখৃষ্টের জন্মকেই রূপকচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবিতায় দুইটি উল্লেখ বাইবেলের ঘটনার সহিত মিলিয়া যায়। যাত্রীদলের গন্তব্যস্থান নির্দেশ করিতে নক্ষত্র-সংকেতবিদ্ জ্যোতিষী বলিল, "নক্ষত্রের ইঙ্গিত ভুল হতে পারে না, তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেছে।"

"Now when Jesus was born in Bethlehem of Judoea in the

days of Herod the King, behold, there came wise men from the East to Jerusalem.

Saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him." *St. Matthew*, *Chapter II*.

তারপর যীশুখৃষ্ট জন্মিয়াছেন নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে—আস্তাবলের মধ্যে। সেখানকার আশেপাশের অধিবাসীরা সকলেই ছিল দরিদ্র মেষপালক।

"And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn."

"And there was in the same country, shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night." *St. Luke*, *Chapter II*.

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও দেখা যায়, যাত্রীরা যেখানে জ্যোতিষীর সংকেত অনুসারে উপস্থিত হইল, সেখানে—

কুমোরের চাকা ঘুরচে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনচে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভরে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ উচাটন মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?

দরিদ্র গ্রামে, দারিদ্র্যের আবহাওয়ার মধ্যেই যীশুখৃষ্টের জন্ম বলিয়া কবি ইঙ্গিত করিতেছেন। বাইবেলের জ্ঞানীরা হইয়াছে জ্যোতিষী কবির হাতে। ভক্তও John the Baptist-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

'শিশুতীর্থ'-এর আখ্যায়িকাটি তিনি রচনা করেন জার্মানির বিখ্যাত চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী উফা কোম্পানীর অনুরোধে। ১৩৩৮ সালে ইয়োরোপ ভ্রমণের সময় ঐ কোম্পানী চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার জন্য কবিকে একটি গল্প লিখিয়া দিতে অনুরোধ করে। তাহাদের অনুরোধে তিনি The Child নামে একটি আখ্যায়িকা লেখেন। ইহারই বাংলা রূপ 'শিশুতীর্থ'। খৃষ্টান দর্শকদের জন্য এই আখ্যায়িকা যীশুখৃষ্টকেই কেন্দ্র করিয়া লিখিত, কিন্তু চিরদিনই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসকে অতিক্রম করিয়া সর্বজনীন সত্যে ও বিশ্বজনীন ভাবে উপনীত হন।

এই ধরনের আর একটি কবিতা 'শাপমোচন'। ইহার ভাববস্তু ও 'রাজা' নাটকের ভাববস্তু একই। "যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে 'শাপমোচন' কথিকাটি রচনা করা হল।"

বাহিরের রূপের মোহে কামনা-বাসনা-বিজড়িত মন লইয়া যখন আমরা সুন্দরকে পাইতে চাই, তখন সুন্দরকে পাওয়া যায় না; রূপের মোহ ত্যাগ করিয়া যখন অন্তরের নিবিড় অনুভূতির মধ্যে আমরা সুন্দরকে পাইতে চাই, তখনই সুন্দর আমাদের কাছে ধরা দেয়।

রূপের মোহে আকৃষ্ট হইয়া রানী কমলিকা যতদিন গান্ধাররাজকে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, ততদিন তাহার কুৎসিত চেহারাটাই সে দেখিয়াছে। "কুশ্রীর পরম বেদনাতেই যে সুন্দরের আহ্বান" একথা রানী মানিয়া লয় নাই। তারপর রূপের মোহ কাটিয়া গেলে যখন গান্ধাররাজের বীণার সংগীতে সে তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্যের পরিচয় পাইল, তখন বাহিরের রূপের অপেক্ষা অন্তরের সৌন্দর্যই বড়ো বলিয়া মনে করিল। কুশ্রী স্বামী তাহার চোখে পরম সুন্দর হইয়া উঠিল। যে কমলিকা গান্ধাররাজের কুশ্রী দেহ দেখিয়া বলিয়াছিল,—

"কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা"—

আজ তার

কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরতে চায় না পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠল, "প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার।"

(গ) 'অপরাধী', 'ছেলেটা', 'সহযাত্রী', 'শেষ চিঠি', 'বালক', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'প্রথম পূজা' কাহিনীগুলি এই ধারার অন্তর্গত। 'অপরাধী' ও 'ছেলেটা'য় কবি দুষ্ট ছেলের চিত্র আঁকিয়াছেন ও হিরণ-মাসীর মা-মরা বোনপোর প্রসঙ্গে তাহার নিজের বাল্যকালের জীবনচিত্র দিয়াছেন। 'শেষ-চিঠি'তে করুণরসটুকু চমৎকার ফুটিয়াছে। 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' ও 'ক্যামেলিয়া'তে প্রেমের ব্যর্থতা ও নিয়তির পরিহাসের কাহিনী চিত্রিত হইয়াছে।

৩০

বিচিত্রিতা

(শ্রাবণ, ১৩৪০)

গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী চিত্র-শিল্পীদের অঙ্কিত ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত কতকগুলি ছবির সংগ্রহ এবং রবীন্দ্রনাথ-রচিত সেই ছবিগুলির ভাবব্যাখ্যামূলক কবিতা 'বিচিত্রিতা'র বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথের নিজের অঙ্কিত সাতখানি ছবি ইহাতে আছে। তাহা ছাড়া গ্রন্থের প্রথমে বিচিত্রিতা নামে অঙ্কনটি রবীন্দ্রনাথের। 'সত্তর বছরের প্রবীণ যুবক' রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী' নন্দলালকে এই গ্রন্থে উৎসর্গ করিয়াছেন। কতকগুলি ছবিকে অবলম্বন করিয়াই কবির ভাব ও কল্পনার লীলা উৎসারিত হইয়াছে, ইহাতে কবির অন্তর-জগতের কোনো চিত্র প্রতিফলিত হয় নাই—তাঁহার কবি-মানসের কোনো বিশিষ্ট অবস্থা বা স্তর ইহাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। এই কবিতাগুলি প্রয়োজনসাপেক্ষ রচনা এবং নানা বিচ্ছিন্ন ভাব ও কল্পনার মূর্তরূপ। ইহারা নানা ছন্দে রচিত ও মিলযুক্ত, এবং আঙ্গিক ও ভাব-কল্পনায় 'বিচিত্রিতা', 'মহুয়া-পরিবেশ-বীথিকা'র সমগোত্রীয়।

চিত্র অবলম্বনে রচিত হইলেও কবির ভাব ও কল্পনা চিত্র অতিক্রম করিয়া বিচিত্র রূপে ও রসে মূর্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাব-কল্পনার মূর্তি ধারণ করিয়াছে। বিচিত্রিতার 'শ্যামলী' কবিতাটি মহুয়ার 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছের 'শ্যামলী' কবিতার পূর্ণরূপ। 'পুষ্প' কবিতায় নারীর সহিত পুষ্পের সাদৃশ্য চমৎকার ফুটিয়াছে। শেষ দুটি লাইন—'সুন্দর আমাতে আছে আমি, তোমাতে সে হোলো ভালোবাসা'—অপূর্ব। দেবসেনাপতি কুমার কার্তিকেয় কবির কল্পনায় নবরূপ লাভ করিয়াছেন,—

দৈত্যের হাতে স্বর্গের পরাভবে
বারে বারে বার, জাগো ভয়ার্ত ভবে।
ভাই ব'লে তাই নারী করে আহ্বান,
তোমারে রমণী পেতে চাহে সন্তান,
প্রিয় ব'লে গলে করিবে মাল্য দান
আনন্দে গৌরবে।

'বধূ', 'ভীরু', 'ছায়াসঙ্গিনী' প্রভৃতিতে কবির ভাব ও কল্পনার লীলা সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৩১

শেষ সপ্তক

(বৈশাখ, ১৩৪২)

'শেষ সপ্তক' গ্রন্থখানি কবি-মানসের ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে একটা নির্দিষ্ট স্তর নির্দেশ করে। জগৎ ও জীবনের আধারে সৌন্দর্য, প্রেম ও বিচিত্র রস-মাধুর্যরূপে কবি অসীমকে উপভোগ করিয়াছেন, অনন্ত লীলাময়রূপে ব্যক্তিগত জীবনে ও বিশ্বের মধ্যে তাঁহার বিস্ময়কর লীলার রহস্যও কবি বিপুল পুলক-বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছেন। এই লীলা-চঞ্চল সত্তা আভাস-ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনায় কবির চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে, আর সেই অনুভূতির অপার আনন্দ-বিস্ময়কে তিনি কল্পনার শতবর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া অপূর্ব কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। 'পরিশেষ' পর্যন্ত কবির কাব্যে আমরা ইহাই দেখিতেছি। কিন্তু এখন হইতেই এই লীলা-রসিক ভগবান কবির নিকট তাঁহার হৃদয়-বিহারী আত্মায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। চঞ্চল লীলা-রহস্য এখন আর তাঁহার মুগ্ধ বিস্ময় উৎপাদন করে না, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির শান্ত গাম্ভীর্যে হৃদয় এখন পরিপূর্ণ। আত্মা অসীম ও অনন্ত এবং মানবদেহে আবদ্ধ হইলেও বিশ্বাত্মার অংশ। তাই, বিশ্বজগতের সঙ্গে তাহার অন্তরতম যোগ। মানুষের এই অন্তরতম সত্তার—এই আত্মার বিস্মিত উপলব্ধিই নানাভাবে কবি শেষজীবনের কাব্যে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 'শেষ সপ্তক' হইতেই কবির ভাব-জীবনে এই ঔপনিষদিক যুগের আরম্ভ। তারপর 'বীথিকা', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'র মধ্য দিয়া এই ভাবধারা আগাইয়া চলিয়াছে এবং 'প্রান্তিক' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে।

গদ্য-কবিতার গ্রন্থ চারিখানির মধ্যে 'শেষ সপ্তক'ই শ্রেষ্ঠ। 'পুনশ্চ'তে গদ্যকবিতার টেকনিকের নিখুঁত প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখা যায় না। ভাষার একটা ভাবানুগত সহজ সরল প্রবাহ স্বচ্ছন্দভাবে প্রবাহিত হয় নাই; কোনো স্থলে উপমার উপর উপমা লাগাইয়া ভাষাকে জমকালো করার চেষ্টা আছে, আবার কোথাও নীরস গদ্যময় উক্তিও চোখে পড়ে। তরলে-মধুরে, কঠিনে-কোমলে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়া ভাব-কল্পনা একটা স্বাভাবিক সর্বাঙ্গীণ কাব্য-মূর্তি ধরে নাই। 'পত্রপুট'-এ দীর্ঘ চরণের গম্ভীর, মন্থর পদক্ষেপে, বহু গভীর চিন্তার জটিলতায়, বহুমুখী কল্পনার নানা রশ্মিচ্ছটায় ও সংস্কৃতঘেঁষা শব্দের গুরু-গম্ভীর ধ্বনির ঠাস-বুনানিতে প্রকাশের একটা স্বচ্ছন্দ সাবলীল প্রবাহ যেন অনেকটা আড়ষ্ট হইয়াছে।

'শ্যামলী'তে ভাবের রঙ একটু ফিকে, রেখা সব স্থানে খুব গভীর নয় এবং ভাষা একটু গদ্যগন্ধী—ভাব ও রূপের মণিকাঞ্চনযোগ হয় নাই। কিন্তু 'শেষ সপ্তক'-এ ভাষা বিশেষ কলাসংগতভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অতি গভীর চিন্তাকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে কাব্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। কবিতাগুলিতে ভাব ও ভাষার পূর্ণ মিলন হওয়ায় রসের অপূর্ব কেন্দ্রসংহতি হইয়াছে। এগুলিকে গদ্য-কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায়।

'পুনশ্চ'তে যে কয়টি ভাবধারার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে মোটামুটি তাহাই কম-বেশি গদ্যকবিতার পুস্তকগুলির মধ্যে প্রবাহিত। অবশ্য 'শেষ সপ্তক'-এ দ্বিতীয় ধারার কবিতার সংখ্যাই বেশি। আত্মবিশ্লেষণ ও মানবসত্তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ই 'শেষ সপ্তক'-এর মূল সুর।

বিশ্বসৃষ্টিধারার মধ্যে মানবের সত্য-পরিচয়, তাহার অন্তরতম সত্তার রূপ কবি গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। বিশ্বসৃষ্টির চলমান ধারার তলে যে অচঞ্চল গাম্ভীর্য আছে, অস্তিত্বের ছায়ার মায়া হইতে মুক্ত হইয়া তাহার সঙ্গে যুক্ত হইবার ইচ্ছা করিব। সৃষ্টির তলে কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রবেশ করিয়াছে, মানবের নিত্য-মুক্ত সত্তার পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। সৃষ্টি ও মানবজীবনকে তিনি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া পর্যালোচনা করিয়া তাহার মধ্যস্থিত গভীরতম সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন ও সেই বিস্মিত উপলব্ধির প্রকাশ হইয়াছে 'শেষ সপ্তক'-এর অধিকাংশ কবিতায়।

মোটামুটি কবির এই চিন্তা ও ভাব নানাপ্রকারে কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১২, ২১, ২২, ২৩, ২৬, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪০ সংখ্যক কবিতায়।

চার-সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, এই জগৎ ও জীবনের রূপ-রস-স্বপ্নে তিনি আবিষ্ট হইয়া অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন আজ 'শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়' বাহির হইয়া আসিবে। বিশ্বধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিয়া, প্রকৃতির নানা প্রকাশের মধ্যে নিজেকে মিশাইয়া দিয়া, এই বিরাট অস্তিত্ব-ধারার গভীর তলে তিনি নিমজ্জিত হইবেন। এই বিশাল বিশ্বধারার সঙ্গে তাঁহার জীবন-চেতনাও ভাসিতে ভাসিতে 'চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন মৃত্যু-মহাসাগর-সঙ্গমে' চলিয়া যাইবে। এই দুঃখহীন, চিন্তাহীন মনের অবস্থাতেই তাঁহার দিব্যদৃষ্টি লাভ হইবে এবং মানব-জীবনের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইবেন।

এই 'দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে' তাঁহার 'সমগ্র সত্তায়' 'সমস্ত পরিচয়' 'পরিপূর্ণ অবারিত' হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন পাঁচ-সংখ্যক কবিতায়,—

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে,
বধূ যেমন সত্য ক'রে জানে আপনাকে,
সত্য ক'রে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে,
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা,
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

সাত-সংখ্যক কবিতায় বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরালে, যেখানে মহাকাল নিরাসক্ত অবস্থায় অবিচলিত আনন্দে বিরাজ করিতেছেন, সেখানে কবি আশ্রয় চাহিতেছেন,—

হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

আট-সংখ্যক কবিতায় কবি দূর অতীতের দিকে দৃষ্টি বিসর্পিত করিয়া দেখিতেছেন যে, কত নামহীন রূপকার প্রাচীন গুহাচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আনন্দ, তাঁহাদের নিঃশব্দ বাণী রহিয়াছে গুহায়, কিন্তু ভাবী কালের খ্যাতি তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন। পবিত্র বিস্মৃতির অন্ধকার নাম-ক্ষালনের দ্বারা তাঁহাদের সাধনাকে করিয়াছিল নির্মল। কবিও নামের অহংকার হইতে মুক্ত হইতে চাইতেছেন। তিনিও সেই পবিত্র অন্ধকারকে কামনা করেন,—

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

এই দুইটি কবিতায় সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা উদ্বেলিত না হইয়া, সকল অহংকার, নাম-খ্যাতি ত্যাগ করিয়া, নির্মল নিরাসক্ত চিত্তে কবি আত্মতত্ত্বচিন্তায় মগ্ন হইতে চাহিতেছেন, মনের এই অবস্থাতেই তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিবে ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হইবে।

নয় ও বারো-সংখ্যক কবিতায় কবি মানবসত্তার অগম্যতা, অবোধ্যতা ও অজানা রহস্যের কথা বলিয়াছেন।

এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,
বাষ্পআবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে
দূরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।
যাকে বলতে পারি আমার সবটা,
তার নাম দেওয়া হয়নি,
তার নক্সা শেষ হবে কবে?
সে নক্সা আছে বিশ্বশিল্পীর হাতে
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,
তাই আমাকে বেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কা'রো চোখের সামনে ধরবার সময় আসেনি,
সবাই রইল দূরে,—
যারা বললে জানি, তারা জানলে না। (নয়-সংখ্যক)

কেউ চেনা নয়
সব মানুষই অজানা।
চলেছে আলোর রহস্যে
আপনি একাকী।
এমন সময় কোথা থেকে
ভালোবাসার বসন্ত হাওয়া লাগে,
সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,
বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা।
সামনে তাকে দেখি স্বয়ংস্বতন্ত্র, অপূর্ব, অসাধারণ,
তার জুড়ি কেউ নেই।
তখন হঠাৎ দেখি আমার মধ্যেকার অচেনাকে,
তখন আপন অনুভবের
তল খুঁজে পাইনে
সেই অনুভব
"তিলে তিলে নূতন হোয়"। (বারোসংখ্যক)

বাইশ-সংখ্যক কবিতায় কবি জড় দেহমন ও আত্মার পার্থক্যের কথা বলিতেছেন। জন্মের প্রথম দিন হইতেই এই দেহ-মন জরাহীন, মৃত্যুহীন, প্রাণকে অধিকার করিয়া আছে; এই প্রাণ জরামৃত্যুর অধীন হইয়া কামনা-বাসনার দাহে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত সত্তা পরিবর্তনহীন, নিরাসক্ত। কবি সেই নিত্যকালের মানব-সত্তাকে জড় দেহ-মন হইতে পৃথক করিয়া আজ উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন,—

আমি আজ পৃথক হব।
ও থাক্ ঐ খানে দ্বারের বাইরে,
ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষ।
ও ভিক্ষা করুক্ ভোগ করুক্,
তালি দিক্ বসে বসে
ওর ছেঁড়া চাদরখানাতে;
জন্ম-মরণের মাঝখানটাতে
যে আল-বাঁধা ক্ষেতটুকু আছে
সেইখানে করুক্ উঞ্ছবৃত্তি।
... ...
উপরের তলায় ব'সে দেখব ওকে
ওর নানা খেয়ালের আবেশে,
আশা-নৈরাশ্যের ওঠা-পড়ার সুখদুঃখের আলোআঁধারে।
দেখব যেমন ক'রে পুতুলনাচ দেখে,
হাসব মনে মনে।
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসবের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা॥

তেইশ-সংখ্যক কবিতায় দেখি, কবি এক শরৎ-প্রভাতে তাঁহার নগ্ন চিত্ত সাংসারিক পরিবেশের মূলদেশে প্রেরণ করিয়া দেখিতেছেন যে, তাঁহার চিরাভ্যস্ত পারিপার্শ্বিক হইতে তিনি বহু দূরে, অভ্যস্ত পরিচয়ের মধ্যে তিনি অজানা, প্রতিদিনের তুচ্ছতার মলিন-বসনের নীচে তাঁহার অনির্বচনীয় অস্তিত্বের অম্লান দীপ্তি,—

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।

তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি ক'রেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ ॥

ছাব্বিশ-সংখ্যক কবিতায় দেখি, অসংখ্য প্রয়োজনের ভারে পরিকীর্ণ-চিত্ত কবি তাঁহার সংকীর্ণ জীবন হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বপ্রকৃতির সুবিপুল অবকাশের মধ্যে আত্মনিমজ্জন করিয়া বিশ্বহৃদয়ের অনাদি প্রাণের মন্ত্র, সেই আনন্দ-মন্ত্র "ভালোবাসি" উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এই বাণীই সৃষ্টির আদিম ও শাশ্বত বাণী। কবি কামনা করিতেছেন,—

আজ দিনান্তের অন্ধকারে
এজন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনের শেষ বাণীতে হোক্ উদ্ভাসিত—
"ভালোবাসি"।

পঁয়ত্রিশ ও ছত্রিশ সংখ্যক কবিতায় কবি মানবের অন্তরতম সত্তার অনির্বচনীয়ত্ব ও অলৌকিকত্বের কথা বলিতেছেন। এই যে সুখদুঃখবন্ধুর জীবনপথে ভিড়ের উদ্দাম কলরবের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি, এই কলরবের পরপার হইতে কি মাঝে মাঝে গানের গুঞ্জন আসিতেছে না? দেহবদ্ধ এই যে নিত্যজীবন এ তো ক্ষণে ক্ষণে আমাদের দেহাতীত কথার আভাস দিতেছে; বিশ্ব-প্রকৃতির নানা রূপরসের মধ্যেও এই জীবনের অস্তিত্বের আভাস আমরা পাইতেছি। প্রেমের স্পর্শে, সংগীতের মনোহারিত্বে, এক দুর্লভ মুহূর্তে সেই বৃহত্তর জীবনের ক্ষণিক উপলব্ধি হইতেছে।

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত আবেগ।
—যে কথা দেহের অতীত। (পঁয়ত্রিশ)

…অন্তর্যামী
হঠাৎ যেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে,
কবির গানের সুর দিয়ে,
তখন যে-আমি ধূলিধূসর
সামান্য দিনগুলির মধ্যে মিলিয়ে ছিল
সে দেখা দেয় এক নিমিষের অসামান্য আলোকে।
সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্নভাণ্ডারে থেকে যায় কি না জানিনে;
এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিস্ময়ের নিত্যকালের সেই বাণী
"আমি আছি।" (ছত্রিশ)

উনচল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় মৃত্যু সম্বন্ধে কবির উপলব্ধি ব্যক্ত হইয়াছে। মৃত্যুই জীবনকে নানা বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া তাঁহার নিত্য-স্বরূপকে অব্যাহত রাখে। মৃত্যুর দ্বার দিয়াই আমরা জীবনের অমৃতলোকে প্রবেশ করি। মৃত্যু পুরানো, জীর্ণ, ক্লান্ত, অচলকে ধ্বংস করিয়া নব-জীবনের ধারা প্রবাহিত করে। মৃত্যুর কাজ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,—

আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ-ক্ষেত্রে।
যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিইনি তাকে কোনো গর্তে আটক থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই।

চল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় কবি অমৃতের অংশ-স্বরূপ মানবের নিত্য-সত্তার পরিচয় দিতেছেন। এই মানবসত্তা 'প্রথমজাত অমৃত', 'নবীন', 'নিত্যকালের'।

বার বার জরা-মৃত্যুর কুয়াশা তাহাকে ঘিরিয়াছে, কিন্তু প্রতিবারেই সে মেঘমুক্ত সূর্যের মতো বাহির হইয়া আসিয়াছে। কবি ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, এই জীবনের স্পর্শ তিনি পাইয়াছিলেন বালককালে ধরণীর সবুজে, আকাশের নীলিমায়,—তারপর জীবনের রথ পথে-বিপথে ছুটিল, ক্ষুব্ধ অন্তরের নিশ্বাসে, দিগন্তে শুকনো পাতা উড়িল, বাতাস হইল ধূলায় নিবিড়, ক্ষুধাতুর কামনা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ধরাতলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল,—সে স্পর্শ তিনি আর পাইলেন না। আজ জীবনের শেষে সেই নবীনের সম্মুখে তিনি দাঁড়াইবেন, সেই স্পর্শ তিনি আবার পাইবেন—তাঁহার নিত্য-স্বরূপকে উপলব্ধি করিবেন।

এ জন্মের ভ্রমণ হলো সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে॥

তেতাল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁহার জন্মদিনে নিজের জীবনকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—তাঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের 'নানা রবীন্দ্রনাথের' একখানি পরিচয় মাল্য এতদিন গাঁথা হইয়াছে। কিন্তু তিনি এখন সকল পরিচয়ের হাত হইতে মুক্তি-কামনা করিতেছেন। জীবনের নানা সুর এক চরম সংগীতের গভীরতায় মিলাইয়া দিতে চাহিতেছেন,—

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে ;
নির্জন নামহীন নিভৃতে ;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

'শেষ সপ্তক'-এ অন্য ভাবধারার কবিতাও কতকগুলি আছে।

এক-দুই-তিন-চৌদ্দ-সংখ্যক কবিতা প্রেম-স্মৃতির ক্ষণ-অনুভূতির মাধুর্যমণ্ডিত।

একত্রিশ-সংখ্যক কবিতাটি কল্পনার অভিনবত্ব ও প্রেমের গভীরতার প্রকাশে অপূর্ব।

বত্রিশ ও তেত্রিশ-সংখ্যক কবিতা আখ্যায়িকাজাতীয়।

৩২

বীথিকা

(ভাদ্র, ১৩৪২)

'পরিশেষ'-এর শেষ দিক হইতে কাব্যের আঙ্গিক হিসাবে কবি যে গদ্য-কবিতার প্রথা গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'পুনশ্চ' ও 'শেষ সপ্তক'-এ তাহা পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে, কিন্তু 'বীথিকা'য় কবি এ রীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। আবার পরবর্তী দুইখানি গ্রন্থ 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'তে কবি গদ্য-কবিতার আঙ্গিকই গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যে কেবল কতকগুলি ছবির ভাবব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'বিচিত্রিতা' ও মৌলিক গ্রন্থ 'বীথিকা'তে কবি ছন্দ-প্রবাহ ও অন্ত্যমিল অবলম্বন করিয়াছেন। গদ্য-কবিতার যুগে এই ব্যতিক্রম মনে হয় তাঁহার নিগূঢ় কবি-মানসের রূপাভিব্যক্তির তাগিদে, তাঁহার গভীর ভাব-কল্পনার বাণীরূপ দানের প্রয়োজনেই ঘটিয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে গদ্য-কবিতারীতিতে কবি একটা পরিবর্তিত মানস-দৃষ্টিকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন; উচ্ছ্বাস ও আবেগের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহবর্জিত, শব্দধ্বনিমাধুর্য ও সংগীতমুখরতামুক্ত হৃদয়ের ভাব ও অনুভূতির অনাড়ম্বর, স্বচ্ছপ্রকাশ, কল্পনার অলস, মন্থর-লীলা, প্রকৃতি ও জীবনের ক্ষুদ্র, তুচ্ছ রূপ-রসের প্রতি নির্লিপ্ত দর্শকের দৃষ্টি, চিন্তার নিরাভরণ নগ্নরূপ, অনুচ্চ ও বিক্ষিপ্ত আবেগের সহিত স্মৃতি-রোমন্থন প্রভৃতি যাহা গদ্য-কবিতার বৈশিষ্ট্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কবি-মানসের একটা বিশিষ্ট অবস্থা বা দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। ঐ মানস-দৃষ্টিভঙ্গীর উপযুক্ত রূপায়ণ গদ্য-কবিতাতেই সুন্দরভাবে সম্ভব বলিয়া কবি ঐ প্রকাশ-পদ্ধতিকেই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টি ও মানবজীবনের চিরন্তন ধারার যে গভীর ধ্যান, জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপের যে প্রশান্ত পর্যালোচন, অনিত্য জীবনে চিরন্তনের লীলাবৈচিত্র্যের যে অনির্বচনীয় রহস্য ও বিস্ময় কবি বীথিকার কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য বোধ হয় আবেগ-তরঙ্গায়িত, সংগীত-মুখর ছন্দ-প্রবাহই উপযুক্ত বাহন বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ রস ও রহস্য কবি হয়তো ছন্দের লীলায়িত নৃত্য ও সংগীতের অনির্বচনীয় মাধুর্যের মায়াজালে বন্দী করিতে চাহিয়াছেন।

এই বৃহৎ কাব্যগ্রন্থখানি বলাকা-মহুয়া-পরিশেষ যুগের শেষ ফল। এই সৃষ্টিধারা, বিশ্বসত্তা ও মানবসত্তার অন্তরতম পরিচয়, অনিত্যের পট-ভূমিকায় নিত্যের লীলারহস্য, মানবের স্নেহ-প্রেমের স্বরূপ-বিচার, কবির নিজ-জীবন ও কবি-সত্তার

স্বরূপ বিচার, আসন্ন মৃত্যুর ছায়ালোকে বসিয়া জগৎ ও জীবন-পর্যালোচনের যে দার্শনিকতা, রস ও রহস্য নানা পরিবেশ অবলম্বন করিয়া বিচিত্র ভাব-কল্পনার শতবর্ণচ্ছটায় দীপ্তরূপ লাভ করিয়াছে বলাকা হইতে, ইহা তাহারই শেষ পরিণতি। ইহা কবি-মানসের কাব্য-দর্শন যুগের চরম দান।

এই গ্রন্থখানির একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। গভীর দার্শনিকতার সহিত এমন উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনার সমন্বয় কবির খুব কম গ্রন্থেই হইয়াছে। এক একটি ভাব অপূর্ব চিত্রে যেন রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়ায়, তুচ্ছ একটা ঘটনা, সামান্য একটা পূর্বস্মৃতির বর্ণনা অপরূপ অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনায় যেন ঝলমল করিয়া উঠে। বলাকা হইতেই কবির কাব্য-রচনার একটা সচেতন শিল্পপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, এমন কি গদ্য-কবিতার মধ্যেও স্থানে স্থানে কল্পনার অস্বাভাবিক নূতনত্বে একটা চমক সৃষ্টি করা ও পল্লবিত অতিভাষণের চেষ্টা আছে। কিন্তু বীথিকার ভাষা, কল্পনা ও ছন্দে এমন একটা পরিমিতি ও সংহতি আছে যে, মনে হয়, কবিতাগুলি স্বাভাবিক ও সহজভাবে ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ ইহাদের অন্তরে গভীর ভাব ও চিন্তা, কাব্য ও রহস্যদৃষ্টি ঘনীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

কবি সৃষ্টিধারা এবং জীবন ও মৃত্যুর একেবারে গভীর স্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সমস্ত রহস্য জানিয়া যেন একটা স্থির সত্যে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার কোনো দুঃখ-বেদনা নাই, আবেগের চাঞ্চল্য নাই, কোনো সংশয়-সন্দেহ নাই; এই গভীর, স্থির অনুভূতির অকুণ্ঠিত প্রকাশ হইয়াছে এই কাব্যে।

বীথিকার কবিতার মধ্যে মোটামুটি এই দুই ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়,—

(ক) নিরন্তর প্রবহমান সৃষ্টিধারায় অতীতের রূপ, মানব-জীবনের ও কবি-জীবনের স্বরূপ এবং জন্ম-মৃত্যুর স্বরূপ।

(খ) এই অসম্পূর্ণ সংসার ও অনিত্য জীবনেই পূর্ণ ও নিত্যের স্পর্শ—'চিরন্তনের খেলাঘর অনিত্যের প্রাঙ্গণে'—সামান্যের মধ্যে অসামান্যের ব্যঞ্জনা।

(ক) এই বিশ্ব-রহস্যের মূলে কবির কুতূহলী দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই নিরন্তর প্রবহমান বিশ্ব-প্রবাহের স্বরূপ, লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী অতীতের রূপ, বর্তমানের সঙ্গে অতীতের প্রভেদ, কবির জীবনের সহিত অতীতের সম্বন্ধ, বর্তমান-অতীত লইয়া বিশ্বের যে দুর্জ্ঞেয় লীলারহস্য চলিতেছে, তাহার বৈশিষ্ট্য, কবি-জীবনের গূঢ় রহস্য ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কল্পনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া রূপলাভ করিয়াছে বীথিকার অনেক কবিতায়। 'অতীতের ছায়

'রাত্রিরূপিণী', 'আদিতম', 'নাট্যশেষ', 'প্রণতি', 'আসন্ন-রাত্রি', 'বিরোধ', 'রাতের দান', 'নবপরিচয়', 'জয়ী', 'শেষ', 'জাগরণ' প্রভৃতি কবিতায় সৃষ্টি-রহস্য ও জীবন-মৃত্যু-রহস্য নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচিত্র ভাব-কল্পনার সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

'অতীতের ছায়া' কবিতায় কবি অতীতকে নিরাসক্ত, ধ্যান-গম্ভীর শিল্পীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই বিশ্ব-চেতনাধারা প্রতি মুহূর্তে অতীতে চলিয়া যাইতেছে। অতীত-বর্তমান লইয়া বিশ্ব-ইতিহাস রচিত হইয়া উঠিতেছে। কল-কোলাহলময়, জীবন্ত বর্তমান অতীতের চিরমৌন নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইতেছে। কবি কল্পনা করিতেছেন, এই অতীত-দেবী বর্তমানের দিবালোক শেষ হইলে অতীতের রাত্রির তারালোকে বসিয়া ধ্যান-গম্ভীর-চিত্তে বর্তমানের বিলুপ্ত জীবন-রেখাকে উজ্জীবিত করিয়া চিত্র-রচনা করিতেছেন। অসংখ্য বিগত বসন্তের ক্লান্ত-গন্ধ-পুষ্পে তাঁহার নিবিড় কালো কেশ শোভিত, কণ্ঠে তাঁহার বহু প্রাচীন শতাব্দীর মণি-মাল্য। বর্তমান চলিতে চলিতে মহাশূন্যে নিঃশেষ হইয়া যায় না, অতীতের মধ্যে বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, কর্ম-কীর্তি, অশরীরী মূর্তিতে চিরদিন বর্তমান থাকে। তাহার দ্বারাই ইতিহাস রচিত হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানের জীবন্ত কর্ম-সংঘাত শেষ হইলে, সুখ-দুঃখের উত্তাল ঢেউ থামিয়া গেল, অতীত দেবী ইতিহাস-দেবী—শান্তচিত্তে নিভৃতে বসিয়া কতক ঘটনা বাদ দিয়া, কতক রাখিয়া, সুনিপুণ শিল্পীর মতো প্রেক্ষা-পট রচনা করিতেছেন। বর্তমানের কতক ঘটনা চিরদিনের মতো উজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছে। কতক চিরদিনের মতো বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যাইতেছে। ইহাই মানুষের ইতিহাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য। বর্তমানের এই প্রত্যক্ষ জীবনধারা অদৃশ্য অতীতের ছায়ালোকে নূতন শিল্পমূর্তিতে রূপায়িত হইতেছে। কবি আজ দীর্ঘ কর্মময় জীবনের শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার নানা সুখদুঃখ-খ্যাতি-অখ্যাতিময় জীবন শীঘ্রই অতীতের কর্মশালায় স্থান-লাভ করিবে। এই অতীতরূপিণী শিল্পীর সহিত কবি আজ মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছেন। তিনিও, বর্তমান জীবন-চেতনার কর্ম-খ্যাতি-সুখ-দুঃখ বিগত হইলে, প্রশান্ত দৃষ্টিতে জীবনকে পর্যালোচন করিয়া, নিভৃতে বসিয়া তাহার নানা শিল্পরূপ রচনা করিবেন। অতীত ও বর্তমানের মধ্য দিয়া, স্মরণ ও বিস্মরণের লেখনীমুখেই যেমন বিশ্ব-কাব্য রচিত হইয়া উঠিতেছে, কবির জীবন-কাব্যও সেই মতো শিল্পরূপ লাভ করিবে।

শিল্পী ও ঐতিহাসিকের নিরাসক্ত, প্রশান্ত মন ও নির্লিপ্ত দৃষ্টি লইয়া কবি জীবন পর্যালোচনা করিবেন।

ক্লান্ত হোলো লোকমুখে খ্যাতির আগ্রহ ;
দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্তি তারে দিব নানা মতো
আপনার মনে মনে।
কল-কোলাহল-শান্ত জনশূন্য তোমার প্রাঙ্গণে
যেখানে মিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোর,
তারার আলোয়
সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা,
কর্মহীন আমি সেথা বন্ধহীন সৃষ্টির বিধাতা॥

'মাটি' কবিতায় কবি অনন্ত কাল-প্রবাহে এই ধরণীর সহিত মানুষের সম্বন্ধ বিচার করিতেছেন। যুগে যুগে মানুষ জয়লাভ করিয়া, নিজেদের গণ্ডী কাটিয়া এই ধরণীকে ভাগ করিয়া ইহাকে তাহাদের চিরকালের আবাসস্থল বলিয়া মনে করিয়াছে, কিন্তু কালের গতিতে কোথায় তাহারা সব ভাসিয়া গিয়াছে। কতো আর্য, কতো অনার্য, কতো নামহীন, ইতিহাসহারা জাতি এই মৃত্তিকার উপর বাসা বাঁধিয়াছিল, কেহই এই মাটির উপর তাহাদের অধিকারের স্থায়ী চিহ্ন আঁকিয়া যাইতে পারিল না। কবি বলিতেছেন,

কালস্রোতে
আগন্তুক এসেছি হেথায়
সত্য কিম্বা দ্বাপরে ত্রেতায়
যেখানে পড়েনি লেখা
রাজকীয় স্বাক্ষরের একটিও স্থায়ী রেখা।
হায় আমি,
হায় রে ভূস্বামী,
এখানে তুলিছ বেড়া,—উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে-ই র'বে লীন
পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে। তারপরে!—
এই ধূলি র'বে পড়ি আমি-শূন্য চিরকাল তরে।

'রাত্রিরূপিণী' কবিতায় কবি ক্লান্ত জীবন-দিবার শেষে, অতীত ও মৃত্যুর রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জীবনের অন্তহীন প্রয়াসের মত্ততা-জ্বর অপনীত করিয়া গভীর শান্তি পাইতে চাহিতেছেন।

তুমি এসো অচঞ্চল,
এসো স্নিগ্ধ আবির্ভাব,
তোমারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক যত ক্ষতি লাভ।

তোমার গুরুতাখানি
দাও টানি
অধীর উদ্‌ভ্রান্ত মনে
যে অনাদি নিঃশব্দতা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে
বহ্নিদীপ্ত উদ্যমের মত্ততার স্বর
শান্ত করি করে তারে সংযত সুন্দর,
সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।

'আদিতম' কবিতায় কবি নিজ-সত্তার মধ্যে আদিতম প্রাণ-কম্পনের ধ্বনিহীন ঝংকার শুনিতে পাইতেছেন। সমস্ত জলে-স্থলে যে আদি ওংকার ধ্বনির গুঞ্জন উঠিতেছে, কবির জীবন-চেতনাতেও তাহারি মৌন-গুঞ্জন বাজিতেছে,—

ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান
চেয়ে থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।

'নাট্যশেষ' কবিতায় বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে মানবরূপী নট-নটীর লীলা-রহস্য ও বিশ্ব-কবির মহাকাব্যে তাহাদেব স্থান নিজের জীবন-ভূমিকার সহিত মিলাইয়া পর্যালোচন করিয়াছেন। পুরাতন একটা ভাব কবির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপস্থাপন ও রীতিতে অপরূপ কাব্যে রূপায়িত হইয়াছে।

এই যে মানুষ দেহ-ছদ্ম-সাজে নটরূপে সংসার-রঙ্গমঞ্চে আসিয়া আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া, কখনো হাসিয়া, কখনো কাঁদিয়া, নিজ নিজ অভিনয় সাঙ্গ করিয়া গেল, এই খেলার কোনো অর্থ হয়তো আছে বিশ্ব-মহাকবির কাছে। নট-নটীরা কিন্তু তাহাদের প্রত্যহের হাসি-কান্না, উত্থান-পতন সত্য বলিয়াই জানিয়াছিল, তারপর যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে যখন দীপশিখা নিভিয়া গেল, বিচিত্র চাঞ্চল্য থামিয়া গেল, তখন তাহারা নিস্তব্ধ অন্ধকারে রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া পড়িল। তাহাদের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, নিন্দাস্তুতি, লজ্জা-ভয়, একেবারে লুপ্ত ও অর্থহীন হইয়া গেল। কিন্তু বিশ্ব-মহাকবির নাট্য-কাব্যে এই নিরর্থক হাসি-কান্না কাব্যের অঙ্গহিসাবে একটা স্থান লাভ করিয়াছে।

যুদ্ধে উদ্ধারিয়া সীতা
পরক্ষণে প্রিয়হস্ত রচিতে বসিল তার চিতা;

সে পালার অবসানে নিঃশেষে হয়েছে নিরর্থক
সে দুঃসহ দুঃখদাহ, শুধু তারে কবির নাটক
কাব্য-ডোরে বাঁধিয়াছে, শুধু তারে ঘোষিতেছে গান,
শিল্পের কলায় শুধু রচে তাহা আনন্দের দান।

কবিও মৃত্যুর অন্ধকারের তটে পৌঁছিয়া তাঁহার জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কের ।-বেদনাময় দিনগুলিকে অর্থহীন, ছায়াময় বলিয়া মনে করিতেছেন—তাহারা আজ হৃদয়ের অজন্তাগুহার ছবি মাত্র।

অদৃষ্টের যে অঙ্গুলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হোলো গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সব চেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের সুরে।......
সে দিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে ; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প সাথে॥

'প্রণতি' কবিতায় কবি জীবনের অস্তমহাসাগরতট হইতে তাঁহার ধরার জীবনের প্রথম উদয়ের স্থান উদয়গিরিকে নমস্কার জানাইতেছেন। তিনি এই ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই ধরণীকে ভালোবাসিয়াছেন, অনেক ক্ষুধা-তৃষ্ণার মাঝে সুধার সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু সেই নানা সুখদুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতার জীবনকে ফেলিয়া যাইতে হইবে। তবুও তাঁহার কোনো দুঃখ নাই, কারণ তাঁহার এই ক্ষণিক জীবনেই তিনি অনেক সুধার সন্ধান পাইয়াছেন,—

এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা
উঠেছে ভরি কানায় কানা
রঙীন রসধারায় অনুপম।
একটুকুও দয়া না-মানি
ফেলায়ে দেবে জানি তা জানি,—
উদয়গিরি তবুও নমোনম।

'আসন্নরাত্রি' কবিতায় কবি জীবনের শেষে—শীতের সন্ধ্যায়—মৃত্যুর ঘনবগুণ্ঠিত নিরলংকার মূর্তির প্রতীক্ষায় বাসর সাজাইয়া বসিয়া আছেন।

'বিরোধ' কবিতায় কবি বলিতেছেন, মৃত্যুর মধ্যেই নির্মম শ্রেয়ের বাস।

মনে জেনো, মৃত্যুর মূল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে দুর্মূল্য যা, অমর্ত্য যা, যা-কিছু অক্ষয়।

'রাতের দান' কবিতায় কবি বলিতেছেন, দিনশেষে জীবনের আলো নিভিয়া আসিলেও মৃত্যুর অন্ধকার-রাত্রি একেবারে বন্ধ্যা নয়। দিনের জনতামাঝে যে বাণী নীরব ছিল, রাত্রি তাই নিভৃত ইঙ্গিতে ব্যক্ত করে; যাহাকে জীবনে পাওয়া যায় নাই, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

'নব পরিচয়' কবিতায় কবি অনুভব করিতেছেন যে, মানব-জীবন চির-যৌবন-শক্তির প্রতীক—অনন্ত শিখার একটি অংশ। যে মহিমা সংসারের সীমা ছাড়াইয়া অতীতে-অনাগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, যে চির-মানব মৃত্যুকে পরাভূত করিয়া চিরন্তন বিরাজ করিতেছে, কবি সেই চির-পথিককে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিতেছেন। মানব-জীবন অনন্তের অংশ—নিত্যমুক্ত, নিরাসক্ত।

সংসারে ঢেউখেলা
সহজে করি অবহেলা
রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—
সিক্ত নাহি করে তা'রে
মুক্ত রাখে পাখাটারে—
উর্ধ্ব'শিরে পড়িছে আলো এসে।

'জয়ী' কবিতায় কবি ধ্বংস-মৃত্যুর মধ্যে মানবের চিরন্তন-বাণীর জয়ঘোষণা করিয়াছেন।

আস্ফালিছে লক্ষ লোল ফেন-জিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা,
তরঙ্গ-তাণ্ডবী মৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা,
সে রুদ্র সমুদ্রতটে ধ্বনিতেছে, মানবের বাণী,
বাধা নাহি মানি ॥

'শেষ' কবিতায় কবি আসন্ন মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করিতেছেন—এ সংসার, এ জীবন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এই জগৎ ও জীবনের সমস্ত বন্ধনে আজ তিনি উদাসীন, নির্লিপ্ত,—সম্মুখে দেখা যাইতেছে নবজীবনের আলোক-রেখা—জ্যোতির্ময় তারকার মতো তাঁহার জীবন-চৈতন্য বিশ্ব-সত্তা-প্রবাহে ভাসিতেছে। সে চৈতন্যের কোনোদিন বিলুপ্তি নাই,—

যাত্রার আরম্ভ তার নাহি জানি কোন্ লক্ষ্যমুখে।
পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে, সম্মুখেতে নিস্তব্ধ নির্বাক
ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময়
অশোক অভয়,

স্বাক্ষর লিখিল তাহে সূর্য অস্তগামী।
যে মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শূন্যে সেই মন্ত্র—"আমি"।

'জাগরণ' কবিতায় কবি এই জীবনকে পরজন্মে কি চোখে দেখিবেন, বর্তমান জীবনের এই রূপ পরবর্তী জীবনে সত্য না স্বপ্ন বলিয়া মনে হইবে, তাহাই নিজেকে প্রশ্ন করিতেছেন।

এই সব কবিতায় কবি মানব-জীবনের স্বরূপ, জন্ম-মৃত্যুর স্বরূপ, মৃত্যুর পটভূমিকায় জীবনের যথার্থ রূপের পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন। ক্রমেই কবি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে, ব্যক্তি-চেতনা মহা-বিশ্বচেতনার অংশ এবং এই জীবন-রহস্যের মূলে অবিনাশী আত্মার রহস্য। এই আত্মার উপলব্ধিই যে জীবনের সমস্ত আকৃতির সমাধান, এই ভাব ক্রমেই কবির মধ্যে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া একেবারে শেষজীবনের কাব্যগুলির মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে।

(খ) জগৎ ও জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্বরূপ বুঝিয়াও কবি ইহাদের মধ্যে অপার্থিবত্ব দেখিয়াছেন। এই অনিত্যের প্রাঙ্গণে, সৌন্দর্য, প্রেম ও মহত্বের দ্বারে নিত্য-অনির্বচনীয়ের দর্শন মেলে—ইহাদের মধ্যেই সেই অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী কবির মধ্যে চিরকালই দেখা গিয়াছে, তবে শেষের দিকের কবিতায় যেন পূর্বের দৃষ্টির মায়াজাল ও রহস্য-আবিলতা প্রত্যক্ষ-দর্শনের স্বচ্ছতা ও স্থিরতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। গদ্য-কবিতা যুগের আরম্ভ হইতেই কবি নূতন ভঙ্গীতে, প্রেম যে চিরন্তন, প্রেমই পৃথিবীকে নিত্যনবীন রাখে, এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। বীথিকাতেও এই চঞ্চল, ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবনে ক্ষণিক প্রেমের স্পর্শকে নিত্যকালের সমারোহের মধ্যে দেখিয়াছেন।

'সত্যরূপ' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, জন্ম-মৃত্যুর চঞ্চল আবর্তনের মধ্যে এই ক্ষণিক জীবনই তো স্বর্গের জ্যোতির্ময় দীপ।

মায়ার আবর্ত রচে আসার যাওয়ার
চঞ্চল সংসারে।
ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ার
ভাঁটার জোয়ারে।
... ... বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রাখিল সত্তায় মোর রচি নিজ সীমা,
আপন দেউটি

সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী-মাঝে
সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে ;
সেই তো বাখানে
অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে ॥

'দেবতা' কবিতায় মর্ত্যের সৌন্দর্য ও প্রেমে কবি দেবতার আবির্ভাব অনুভব করিয়াছেন,—

দেবতা মানব-লোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্য লীলায়।
মাঝে মাঝে দেখি তাই
আমি যেন নাই,
ঝংকৃত বীণার তন্তুসম দেহখানা
হয় যেন অদৃশ্য অজানা,
আকাশের অতি দূর সূক্ষ্ম নীলিমায়
স গীতে হারায়ে যায় ;
নিবিড় আনন্দ-রূপে
পল্লবের স্তূপে
আমলকি-বীথিকার গাছে গাছে
ব্যাপ্ত হয় শরতের আলোকের নাচে।
প্রেয়সীর প্রেমে
প্রত্যহের ধূলি-আবরণ যায় নেমে
দৃষ্টি হতে শ্রুতি হতে,
স্বর্গসুধাস্রোতে
ধৌত হয় নিখিল গগন,
যাহা দেখি যাহা শুনি তাহা যে একান্ত অতুলন।
মর্ত্যের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।

'মাটিতে-আলোতে' কবিতায় শরৎ-ঋতুতে ধরণী-গগনের যে লীলা, সবুজে-সোনায় মিতালি, সেই সৌন্দর্যের মধ্যে কবি অপার্থিব সৌন্দর্যের আভাস পাইয়াছেন। সেই অপরূপ সৌন্দর্যের আনন্দ কবির কাব্য-চেতনাকে শতধারে উৎসারিত করিয়াছে। এই সৌন্দর্য প্রিয়জনের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে অতো সুন্দর দেখায়। সেই অপার্থিব সৌন্দর্যের মোহাঞ্জন মাখিয়া কবি যে দিকে

তাকান, তাহার মধ্যেই এক অনির্বচনীয় রহস্যের সন্ধান পান। বস্তুর মধ্য হইতে অপূর্ব ভাবমূর্তি বাহির হইয়া আসে। সংসারের সামান্য ধূলিকণা স্বর্গীয় সৌন্দর্যের স্পর্শমণির ছোঁয়াচে স্বর্ণকণায় পরিণত হইয়া যায়। এই অপূর্ব রোমান্টিক দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বীথিকার কতকগুলি কবিতাকে অপরূপ সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে 'মাটিতে-আলোতে' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। কবি বলিতেছেন,—

আরবার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেবশিশু, মরতের
সবুজ কুটীরে। আরবার বুঝিতেছি মনে—
বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে ওঠে মর্ত্যের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের 'পর,
তখন সে সম্মিলিত লীলারস তারি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তা'রে
বহে নিই চেতনার শেষ পারে,
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন।

... ...

হে প্রেয়সী, এ জীবনে
তোমারে হেরিয়াছিনু যে-নয়নে
সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয়,
সেথানে জ্বেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়।
আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়া-ভরা
দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টি-করা।

কবির দৃষ্টি সমস্ত স্থূল ও জড়ের অন্তর ভেদ করিয়া অনির্বচনীয় ভাবমূর্তির সন্ধান পাইয়াছে। প্রত্যক্ষ জগতের পশ্চাতে চিরন্তন জগতের ছায়া বিরাজ করিতেছে। সংগীতনিরতা নারীর মধ্য হইতে একটা অলৌকিক রূপ কবির চোখে ভাসিয়া উঠিয়াছে,—

তুমি যবে গান করো, অলৌকিক গীতমূর্তি তব
ছাড়ি তব অঙ্গসীমা আমার অন্তরে অভিনব
ধরে রূপ, যজ্ঞ হতে উঠে আসে যেন যাজ্ঞসেনী—
ললাটে সন্ধ্যার তারা, পিঠে জ্যোতি-বিজড়িত বেণী,

চোখে নন্দনের স্বপ্ন, অধরের কথাহীন ভাষা
মিলায় গগনে মৌন নীলিমায়, কী সুধা পিপাসা
অমরার মরীচিকা রচে তব তনুদেহ ঘিরে।

(গীতচ্ছবি)

তাহার সুরে কবি বিশ্ব-বীণার সুর উপলব্ধি করিতেছেন এবং সেই সুরের প্রভাবে বিশ্বের প্রাণের অন্তরতম রহস্য-লোকে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন,—

অনাদি বীণায় বাজে যে-রাগিণী গম্ভীরে গভীরে
সৃষ্টিতে প্রস্ফুটি উঠে পুষ্পে পুষ্পে, তারায় তারায়,
উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে, নির্ঝরের দুর্দম ধারায়,
জন্ম-মরণের দোলে ছন্দ দেয় হাসি-ক্রন্দনের,
সে অনাদি সুর নামে তব সুরে, দেহবন্ধনের
পাশ দেয় মুক্ত করি, বাধাহীন চৈতন্য এ মন
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্যলোকে, যেখানে বিদ্যুৎ-সূক্ষ্মছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি,
সেই তো কবির বাক্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি। (ঐ)

অসাধারণ গীতধর্মী ও ভাবধর্মী কবির কাছে বিশ্ব-কাব্যের নিগূঢ় রহস্য ও নিজ কাব্যসৃষ্টির রহস্য মিলিয়া গিয়াছে।

কবির কৈশোরের প্রিয়া তাঁহার কাছে চিরন্তনী দীপ্তিময়ী নারী,—

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে
কোন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চির-মানবীর হিয়া।
দেশের কালের অতীত যে মহা দূর,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন ফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে।

'ছন্দোমাধুরী' কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন যে, জগতের এই নিষ্ঠুর লোভ, হিংসা-হলাহল ও প্রলয়ের বিভীষিকার মধ্যে, এই বেসুর ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও কোথা হইতে সৌন্দর্য-দূতী ছুটিয়া আসিয়া নৃত্যে গানে এই মরুভূমির বুকে রসের প্লাবন বহাইয়া দেয়—অপার্থিব শান্তি ও অমৃতের বাণী বহন করিয়া আনে।

ছন্দভাঙা হাটের মাঝে
তরল তালে নূপুর বাজে
বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে।
কর্কশেরে নৃত্য হানি
ছন্দোময়ী মূর্তিখানি
ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে।
ভরিয়া ঘট অমৃত আনে
সে কথা সে কি আপনি জানে,
এনেছে বহি সীমাহীনের ভাষা।

বীথিকায় কবি যেমন জগৎ ও জীবনকে অসম্পূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, সেই সঙ্গে এই ক্ষণিকের মধ্যে অপার্থিবত্ব ও চিরন্তনত্বও অনুভব করিয়াছেন। চঞ্চল বস্তুধারা অলৌকিক আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিয়া অপূর্ব মায়া সৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছে,—ইহাই সৃষ্টিধারা—ইহাই জীবনধারা। এই জীবন এক স্বর্গীয় আলোকে সমুজ্জ্বল, নিগূঢ় তাৎপর্যের মহিমায় গৌরবান্বিত, অপূর্ব রহস্যে মণ্ডিত।

এই মূল দুইধারার কবিতা ছাড়া বীথিকায় আরো কতকগুলি কবিতা আছে। সেগুলিতে কবি নানা দৃশ্যের ক্ষণিক মাধুর্য আহরণ করিয়াছেন। কয়েকটি মহুয়ার ভাবানুসঙ্গী প্রেমের কবিতাও আছে।

৩৩

পত্রপুট

(বৈশাখ, ১৩৪৩)

বিশ্বসৃষ্টি ও মানবসত্তার চিরন্তন রহস্য, এই রহস্যের পট-ভূমিকায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের গভীর পর্যালোচন ও রহস্য-উদ্ঘাটন, এই অনিত্য ধরণীর মধ্যে অসীম ও চিরন্তনের স্পর্শ ও ইহার ক্ষুদ্র সুখদুঃখের সার্থকতা প্রভৃতি 'পত্রপুট'-এর বিষয়বস্তু। 'বীথিকা'র সহিত এই গ্রন্থের কতকটা ভাবগত সাদৃশ্য আছে; গভীর চিন্তাশীলতা, কল্পনার বহু-বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, নানা ভাবের একত্র সমাবেশ ও সংস্কৃতানুগ ভাষার বিচিত্র ধ্বনিময় ঐশ্বর্যে কবিতাগুলিকে নানা সুরের সম্মিলিত ঐক্যতান বলিয়া মনে হয়। এই জাতীয় কবিতা কতকটা এপিকের লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতাগুলির মধ্যে 'পত্রপুট'-এর কবিতাগুলি ভাবের গভীরতা ও প্রকাশের গাম্ভীর্যে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

'পত্রপুট'-এর মধ্যে প্রধানত দুই প্রকার ভাবধারা লক্ষ্য করা যায় :—

(ক) মানবসত্তার সত্য পরিচয় ও রহস্য-উদ্ঘাটন এবং কবি-সত্তা ও কবির ব্যক্তিগত জীবনের গভীর পর্যালোচন,—ছয়-দশ-বারো-তেরো-পনেরো-সংখ্যক কবিতা।

(খ) এই অনিত্য ধূলিময় ধরণীর প্রতি গভীর প্রীতি ও ইহার নগণ্য অংশের মধ্যেও অসীমের অপরূপ ব্যঞ্জনার অনুভূতি,—তিন-পাঁচ-সাত-আট-সংখ্যক কবিতা।

(ক) ছয়-সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁহার অন্তরতম নিত্য-সত্তাকে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। বিশ্বাত্মা ভগবানের নিকট তাঁহার প্রার্থনা, তিনি যেন কবির ব্যক্তি-সত্তার সমস্ত গ্লানি ও মালিন্য দূর করিয়া তাঁহার মধ্যস্থিত আত্মাকে উপলব্ধি করিবার সহায়তা করেন। ভগবানকে কবি অতিথিবৎসল এবং তাঁহার ব্যক্তি-সত্তাকে নানা জীবনে নানা পথে ভ্রমণকারী পথিক-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই পথিক কালো ছায়ার মধ্যে বাস করে, এবং জীবনের সুখদুঃখকে সত্য বলিয়া মনে করে। নানা উপকরণ জোটাইয়া সে তাহার পান্থশালার বাসাটাই বুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু ইহাই তো তাহার প্রকৃত রূপ নয়, সে ভগবানেরই অংশ—তাঁহারই আলো ও আনন্দের অংশীদার। তাই তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার সত্য-স্বরূপের পরিচয় জানাইতে ভগবানকে অনুরোধ করিতেছেন,—

আপনাকে চেনার সময় পায়নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায় ;
পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,
তোমারি সঙ্গে তার রূপের মিল।
তোমার যজ্ঞের হোমাগ্নিতে
তার জীবনের সুখদুঃখ আহুতি দাও,
জ্বলে উঠুক তেজের শিখায়,
ছাই হোক যা ছাই হবার।
হে অতিথিবৎসল,
পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে,
আপনি যে ছিল আপনার হয়ে
সে পাক আপনাকে॥

দশ-সংখ্যক কবিতায় কবি আত্মোপলব্ধির কথা বলিতেছেন। দেহের আবিল আবরণে আত্মার মুক্ত রূপ ঢাকা আছে, কবি প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহটাকে মন হইতে সরাইয়া ফেলিয়া, আপন অন্তরলোক অন্বেষণ করেন এবং সূর্যের মধ্যেই মানুষের যে অন্তরতম সত্য, যে মহৎস্বরূপ ঋষি-কবিরা

দেখিয়াছেন, তাহাই দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করেন। এই কবিতাটির প্রেরণা আসিয়াছে উপনিষদের একটি মন্ত্র হইতে।

" এই দেহখানা বহন ক'রে আসছে দীর্ঘকাল
বহু ক্ষুদ্র মুহূর্তের রাগদ্বেষ ভয়ভাবনা,
কামনার আবর্জনারাশি।
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে
আত্মার মুক্ত রূপ।
... ...
প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
... ...
ব'লি,—হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন,—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে-আমার দেহের অণুপরমাণু,
তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে
আমার অন্তরতম সত্য।
... ...
সেই সত্য তোমারি।
তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎস্বরূপকে
দেখেছে কালেকালে।

বারো-সংখ্যক কবিতাটি কবির গভীর আত্মবিশ্লেষণের চিত্র। কবি বলিতেছেন, তাঁহার কবি-সত্তার ভোগময় জীবনকে তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু যে-সত্তা জীবনকে মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাণের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করে, তাহাকে উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহার কবি-সত্তা পাহাড়তলীর নিস্তরঙ্গ হ্রদ, তাহাতে ঋতুর পর্যায়ে পর্যায়ে তীরের সহিত ফুটিয়া উঠে লীলার বৈচিত্র্য ও মাধুর্য, কিন্তু তাহার স্রোত পাথরের সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্তর্গূঢ় আবেগে নবজীবনের আকাঙ্ক্ষায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করে নাই। মানুষ বহুকে বঞ্চিত করিয়া,

বহুকে দুঃখবেদনা দিয়া, অন্যায় ও অত্যাচারে পৃথিবীর ঐশ্বর্য লৌহদুর্গে আবদ্ধ করিয়াছে, এই দানবের বিরুদ্ধে দেবতার যে অভিযান, সেই অভিযানে কবি কোনো প্রত্যক্ষ সাহায্য করেন নাই। কেবল স্বপ্নে শুনিয়াছেন, দেবসেনাপতির গুরু গুরু ডমরু-ধ্বনি আর সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন। যে মানুষ দুঃখ-পাপ-মৃত্যুকে নাশ করিয়া নূতন সৃষ্টি করে, তাহার পরিচয় কবি পান নাই। তবুও জীবন-সন্ধ্যায় কবি মানুষের হৃদয়াসীন নবসৃষ্টিকারী নিত্য-মানবকে প্রণাম করিতেছেন—যে মানব যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্যাগের দ্বারা আত্মোৎসর্গের দ্বারা পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন।

জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে
নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে।
গান যে-মানুষ গায়, দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে ;
যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার।
দেখেছি শুধু আপনার নিভৃত রূপ·
ছায়ায় পরিকীর্ণ,
যেন পাহাড়তলীতে একখানা অনুত্তরঙ্গ সরোবর।
... ...
মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।
... ...
যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে,
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে॥

তেরো-সংখ্যক কবিতায় কবি তাঁহার সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল চিত্তবৃত্তিগুলি—'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট', তাঁহার কবি-সত্তাকে কি পরিমাণে রসের যোগান দিয়াছে, বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে কিভাবে তাঁহার নিবিড় যোগসাধন করিয়াছে, বস্তুর অতীত সত্তাকে তাঁহার গানের অশ্রুতচ্ছন্দে কেমন করিয়া স্পন্দিত করিয়াছে

তাহার একটা মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন। কাব্যাংশে এই কবিতাটি অনুপম। অপূর্ব কাব্যরস যেন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটি হইতেই বোধ হয় গ্রন্থের নাম হইয়াছে 'পত্রপুট'। শেষের স্তবকটি করুণ-বিষাদে আমাদের অন্তর পূর্ণ করে,—

আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের
ঝরবার দিন এলো জানি।
শুধাই আজ অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে—
কোথায় গো সৃষ্টির আনন্দনিকেতনের প্রভু,
জীবনের অলক্ষ্য গভীরে
আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়
অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়
যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্ঞের দৃষ্টির সম্মুখে,
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার ক'রে।

পনেরো-সংখ্যক কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। আশৈশব তাঁহার কবি-চিত্তের স্বরূপ ও গূঢ় রহস্যের বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে এই কবিতায়।

কোনো সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট দেবতাকে তিনি পূজা করেন নাই। তিনি গুরু-পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কোন ধার ধারেন নাই। তিনি জাতিহীন, মন্ত্রহীন, ব্রাত্য। তিনি বাউলের মতো একতারা-হাতে গানের ধারা বহিয়া মনের মানুষের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে 'নারকেল শাখার ঝালর-ঝোলা বাগানটিতে' 'ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর একলা ব'সে' সূর্যের নিকট হইতে আলোর মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তেজোময়ী লহরীর অনির্বচনীয় স্পন্দন তিনি নাড়ীতে অনুভব করিয়াছেন এবং ভাবিয়াছেন, অযুত নিযুত বৎসর পূর্ব হইতে সূর্যমণ্ডলে তাঁহার বাস। প্রতিদিনের জাগরণের আনন্দেই তাঁহার পূজা সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার বন্ধু ছিল না, দল ছিল না। তাঁহার সঙ্গী ছিল ইতিহাসের যাহারা বীর, তপস্বী, যাহারা মহাপুরুষ, মৃত্যুঞ্জয়—যাহারা সত্যের সাধক, যাহারা অমৃতের অধিকারী। মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারাইয়াও দেশ-বিদেশের সীমানার পারে তাহাকে পাইয়াছেন। তামসের পরপার হইতে মহান মানুষকে তিনি দেখিয়াছেন। যৌবনে নারীর সংস্পর্শে আসিয়া কবি দেখিয়াছেন,

কেহই কাহাকে চিনে না—উভয়ের আত্মার রহস্য উভয়ের কাছেই অপরিচিত। তবুও নারীকে ভালোবাসিলেন, সংসার পাতিলেন। তাঁহার প্রেমের একটি ধারা রহিল অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া, আর একটি ধারা বেষ্টন করিল এক আদর্শ নারীকে, যাহার যৌবনশ্রী শতধারে ঝরিয়া পড়িয়াছে সৃষ্টির রূপে-রসে, যে সমস্ত কদর্যতা ও অশুচিতার উর্ধ্বে। তাই কবি বলিতেছেন,—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হোলো
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

(খ) এই ধারার কবিতায় ধরণীর প্রতি কবির অসীম অনুরাগ এবং ইহারই বুকে অতি ক্ষুদ্র প্রকাশের মধ্যেও অসীমের ব্যঞ্জনা ও অমরতার অনুভূতির কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

তিন-সংখ্যক কবিতায় কবি পৃথিবীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইয়াছেন। এই পৃথিবীর নানা মূর্তি—কখনো সে স্নিগ্ধ, কখনো হিংস্র, কখনো 'অন্নপূর্ণা', কখনো 'অন্নরিক্তা', কখনো 'পুরাতনী', কখনো 'নিত্যনবীনা',—বিপরীত ললিত-কঠোরের সমন্বয়ে সে ভীষণ-মধুরা। নানা ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নব নব মূর্তি—নানা পথে ছড়ানো তাহার শত শত ইতিহাসের অর্ধলুপ্ত অবশেষ। কবি এই পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র অংশে ক্ষুদ্র কালের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন, আবার কখন ইহাকে চিরতরে ছাড়িয়া যাইবেন। তবুও বিদায়কালে তাঁহার শেষ প্রণতি রাখিয়া যাইতেছেন—

আজ আমার প্রণাম গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ-নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে।
... ...
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে-রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে॥

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি ॥

সমাস ও অনুপ্রাসবহুল সংস্কৃতশব্দের গুরু-গম্ভীর ধ্বনি ও দূরপ্রসারী কল্পনার নানা বৈচিত্র্যে কবিতাটি খুব জমকালো হইয়াছে।

পাঁচ-সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, ধরণীর বুকের নানা প্রকাশ—সংগত-অসংগত, অদ্ভুত-স্বাভাবিক, কাব্যময়-গন্তময়—সমস্ত মিলিয়াই ধরণী মধুময়—সংগীতময়।

সাত-সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসময়, অমৃতময় মুহূর্তগুলি বিরাট সৃষ্টি-স্রোতের মধ্যে নিরর্থক নয়—ক্ষণিক নয়। তাহারা নিখিল সৃষ্টি-পটের রঙ এবং সৃষ্টির সঙ্গে একত্র গাঁথা। বিশ্বসৃষ্টির রসধারা কবির প্রাণে যে আনন্দ-শিহরণ জাগাইয়াছে, তাহাতে সৃষ্টির প্রকাশের দিক হইয়াছে আরো সমৃদ্ধতর। এই রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলি লইয়া কবি ঋতুর দরবারে মালা গাঁথিয়াছেন, সেই কাব্যমাল্যে সৃষ্টির প্রকাশ-শিল্প উজ্জ্বল হইয়াছে, পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। কবির এই আনন্দ-চেতনার মধ্য দিয়াই সৃষ্টির পরিপূর্ণতা আসিয়াছে, তাই—

বিশ্ব আমাকে পেয়েছে।
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা ॥

আট-সংখ্যক কবিতায় কবির বক্তব্য এই যে, এই সৃষ্টির একটা নগণ্য অংশও নিরর্থক নয়। ইহা গভীর তাৎপর্যময় ও চিরন্তন। একটা বুনো ফুলও কবির মতে সুদূর অতীত হইতে অন্তহীন ভাবী কাল পর্যন্ত বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাসে বর্তমান।

একটুকু কালের মধ্যে সম্পূর্ণ ওর যাত্রা।
একটি কল্পে যেমন সম্পূর্ণ
আগুনের পাপড়ি-মেলা সূর্যের বিকাশ।
ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে
বিশ্ব-লিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।
তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস।
দৃষ্টি চলে না এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায়।
শতাব্দীর যে নিরন্তর স্রোত বয়ে চলেছে
বিলম্বিত তালের তরঙ্গের মতো,
যে ধারায় উঠল নামল কত শৈলশ্রেণী,
সাগরে মরুতে কত হোলো বেশ পরিবর্তন,

সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে
এই ছোটো ফুলটির আদিম সংকল্প
সৃষ্টির ঘাতপ্রতিঘাতে।
লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয়নি দেখা।
এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে।
যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে॥

৩৪

শ্যামলী

(ভাদ্র, ১৩৪৩)

এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মাটির ঘর 'শ্যামলী'র নামানুসারে। 'শেষ সপ্তক'-এর চুয়াল্লিশ-সংখ্যক কবিতায় কবি বলিয়াছেন,—

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।

মাটির প্রতি কবির গভীর আকর্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতায়। কবি ভালোবাসেন সেই মাটিকে যাহার মধ্যে শত শত শতাব্দীর রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ আছে নিঃশব্দ হইয়া, সব বেদনা, কলঙ্ক, বিদ্রূপ যেখানে দূর্বাদলের স্নিগ্ধতার মধ্যে সমাহিত হইয়াছে। কবি ভালোবাসিয়াছেন বাংলাদেশের মেয়েকে যাহার রূপের মধ্যে মাটির শ্যাম-অঞ্জনের ছায়া, কচি ধানের চিকন আভা, যাহার চোখের করুণ আভা নীল বন-সীমার গোধূলির শেষ আলোটির মতো। শেষ জীবনে এই মাটির বুকে আশ্রয় লইয়াই তিনি জীবনের সকল তাপ-দাহ, কর্ম-খ্যাতি ভুলিয়া নবজীবনে মুক্তিলাভ করিবেন,—

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষ বেলায়।

এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে,
নবদূর্বাশ্যামলের
করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নব জীবনের বিস্মৃত প্রভাতে ॥

এই শ্যামলীতে বাসই কবি তাঁহার নূতন আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে অনুকূল মনে করিয়াছেন। ইঁট-পাথর দিয়া গাঁথা ভিৎ বন্ধনের প্রতীক, মাটির বাসাই তো চিরপথিক মানবের উপযুক্ত বাসস্থান। মাটির ঘরে নীড় যেমনি সহজে বাঁধা যায় তেমনি সহজে ভাঙা যায়, নিরাসক্ত মাটি যেমন আছে তেমনিই পড়িয়া থাকে।

যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়-দিনে
আমার ভাঙাভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল ল্যাজ দুলিয়ে।
এক সাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি, আবার যেদিন চাই চ'লে ॥

'শ্যামলী'র মধ্যেও অন্যান্য গদ্য-কাব্যের ভাবধারাও প্রবাহিত হইয়াছে। তবে 'পুনশ্চ'-এর সহিত ইহার মিল আছে বেশি। বিভিন্ন ভাবধারায় কবিতাগুলিকে এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়,—

(১) মানবসত্তার অপরিমেয়তার উপলব্ধি—'আমি', 'অকাল ঘুম', 'প্রাণের রস', 'চিরযাত্রী', 'কাল রাত্রে'।

(২) চিত্তের ক্ষণিক অনুভূতির রূপায়ণ—'বিদায়-বরণ'।

(৩) প্রেমমূলক—'দ্বৈত', 'শেষ পহরে', 'সম্ভাষণ', 'হারানো মন', 'বাঁশিওয়ালা', 'মিল-ভাঙা'।

(৪) আখ্যায়িকাজাতীয়—'কণি', 'দুর্বোধ', 'অমৃত', 'বঞ্চিত'।

(১) 'আমি' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে মানুষের নিত্য-সত্তা—'নিত্য-আমি' অসীমের অংশ। এই অসীমের অংশ মানুষের দেহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য। মানুষ না হইলে অসীমের এই বিশ্ব-শিল্প রঙে ও রসে সার্থক হইত না।

ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে, "আমি"।

এই আমির গহনে আলো আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
না কখন ফুটে উঠে হোলো হাঁ, মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

অসীমের সৌন্দর্য মানুষের প্রেম না হইলে নিরর্থক হইত। মানুষের প্রেমের মধ্যেই অসীম তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেন। মানুষ না হইলে বিশ্ব-সৃষ্টির কোনো মাধুর্যই থাকিত না—'কবিত্বহীন বিধাতা একা বসে রইতেন, নীলিমাহীন আকাশে ব্যক্তিহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে'। এই কবিতাটি 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি' যুগের কবির একটি প্রিয় ভাবকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

'অকাল ঘুম' কবিতায় অসমাপ্ত ঘরকন্নার একধারে গৃহকর্মক্লান্ত নারীর নিদ্রিত মূর্তি কবির নিকট অসামান্য রহস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে আর প্রতি-দিনের চিরপরিচিত নারী নয়, তাহার অন্তরতম সত্তার দীপ্তিতে সে আজ অনির্বচনীয়। প্রতিদিনের সাংসারিক আবেষ্টনের ধূলিতে চক্ষু আমাদের রুদ্ধ থাকে, কোনো এক শুভ মুহূর্তে চোখের পর্দা সরিয়া যায়, আমরা দিব্যদৃষ্টিতে আমাদের অস্তিত্বের অতলস্পর্শে রহস্য ও অমরত্ব দেখিতে পারি—আমাদের মুক্ত স্বরূপের পরিচয় পাই।

ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে
কোন্ নির্বাক রহস্যের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি,
"কে তুমি?
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে।"

'প্রাণের রস' কবিতায় কবি প্রকৃতির আনন্দের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস নিজের চেতনা দ্বারা ছাঁকিয়া লইতেছেন। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সমস্যা হইতে মুক্ত হইয়া কবি তাঁহার অপর্যাপ্ত প্রাণকে অনুভব করিতে এবং বিশ্বপ্রাণের সহিত তাঁহার প্রাণের অভিন্নত্ব উপলব্ধি করিতে চাহেন।

আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্য দিয়ে ছেঁকে।
এখন আমাকে বসে থাকতে দাও
আমি চোখ মেলে থাকি।

'চিরযাত্রী' কবিতায় কবি বার বার জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া মানবসত্তার চির-পথিক-রূপ দেখিতেছেন,—

ওরে চিরপথিক,
করিসনে নামের মায়া,
রাখিসনে ফলের আশা,
ওরে ঘরছাড়া মানুষের সন্তান ;
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি
—"পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।"

(২) 'বিদায়-বরণ' কবিতায় কবি-মনের কতো 'ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ', কতো 'হারিয়ে-যাওয়া গান', কতো 'তাপহারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া'য় রচিত যে স্বপ্নচ্ছবি, সে 'ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী' হইলেও কবির কাছে সেগুলি সত্য ও মধুর। কবি বলিতেছেন,—

করো ওকে বিদায়-বরণ।
বলো তুমি সত্য, তুমি মধুর,
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেড়ায়
বসন্তের ফুলফোটা আর ফুলঝরার ফাঁকে।
তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনায়
রক্তের রাঙা রঙে।

(৩) শ্যামলীর প্রেম-কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভাবধর্মী রোমান্টিক প্রেম-কবিতারই নিদর্শন। পরিণত হাতের এই কবিতাগুলিতে প্রেমের চিরন্তন রহস্য নানা ভাব-কল্পনার আলোকে অপূর্ব স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে। আবেগের তীব্রতা কম হইলেও কল্পনার উচ্চতা ও চিন্তাশীলতায় এই কবিতাগুলি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

পূর্বে 'শেষ সপ্তক'-এর ৩১নং কবিতার কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী গ্রন্থ 'আকাশপ্রদীপ', 'সানাই' প্রভৃতির মধ্যে দুই-চারিটি কবিতায় প্রেমের মহিমা ও নারী-হৃদয়ের গূঢ় রহস্য বিস্ময়কররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এইগুলিই কবি-জীবনের শেষপর্ণায়ের প্রেম-কবিতা। জীবন-সন্ধ্যায় পরিণত অভিজ্ঞতায় প্রেমের নিগূঢ় রহস্য ও দর্শন যেন কবির দিব্যদৃষ্টিতে পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়াছে আর সুদূরপ্রসারী কল্পনার লীলায় সেগুলিকে অভিনব কাব্যরূপে বাঁধা হইয়াছে।

'দ্বৈত' কবিতার বক্তব্য এই যে প্রেমিকা প্রেমিকের মনের সৃষ্টি—তাহারই মনের ভাবে ও রসে সে নূতন মূর্তিতে প্রতিভাত হয়। রবীন্দ্রনাথেরই পুরাতন কথা—'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'।

দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারিদিকে
কখনো ঝড়ের বেগে
কখনো মৃদুমৃদু দোলনে।
... ...
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁয়া
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।

নারী সাধারণ হইলেও প্রেমিকের চোখে সে অসাধারণ। প্রসাধনরতা এ যুগের সাধারণ নারীকে দেখিয়া কবির মনে হয়, সে যেন প্রাচীন কাব্যের কোনো নায়িকা,—

ঠিক এমনি করেই দেখা দিত অন্তযুগের অবন্তিকা
ভালোলাগার অপরূপবেশে
ভালোবাসার চকিত চোখে।
অমরুশতকের চৌপদীতে
—শিখরিণীতে হোক স্রগ্ধরায় হোক—
ওকে তো ঠিক মানাতো।
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ঐ যে আসছে অভিসারিকা
ও যেন কাছের কালে·আসছে
দূরের কালের বাণী।
(সম্ভাষণ)

'বাঁশিওয়ালা' কবিতায় কবি বলিতে চাহেন যে, সাধারণ নারীর মধ্যে যখন প্রেমের আলোক জ্বলে, তখন সে·নূতন জীবনে বাঁচিয়া ওঠে—সে হয় অসাধারণ।

'মিল-ভাঙা' কবিতাটি কবির প্রথম যৌবনের প্রেমের স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। যদিও কবির জীবন দীর্ঘদিন নানা কর্ম-কোলাহলের মধ্য দিয়া জটিল ও কুটিল পথে অগ্রসর হইয়াছে, তবুও শেষ বয়স পর্যন্ত প্রথম প্রেমের জাদুর প্রভাব কাটে নাই। এ জীবনের যা-কিছু বাসন্তিক স্পর্শ, তাহার মধ্যেই সেই প্রথম প্রেমের ছায়া—বহুবিচিত্র সুরের মধ্যে সেই সুরের মৃদু অনুরণন।

আজ আমার যন্ত্রে
তার চড়েছে বহুশত
কোনোটা নয় তোমার জানা।
যে সুর সেধে রেখেছ সেদিন
সে সুর লজ্জা পাবে এর তারে।
সেদিন যা ছিল ভাবের লেখা
আজ হবে তা দাগা-বুলোনো।
তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের
প্রথম দরদ;
এর মধ্যে আছে তার জাদু.
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে।
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।

কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

খাপছাড়া

(মাঘ, ১৩৪৩)

ছড়ার ছবি

(আশ্বিন, ১৩৪৪)

প্রহাসিনী (পৌষ, ১৩৪৫) **ছড়া** (ভাদ্র, ১৩৪৮)

রবীন্দ্র-সাহিত্যে কৌতুক-কবিতার সংখ্যা বেশি নয় এবং পূর্ণাঙ্গ হাসির কবিতা বা গান বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার সংখ্যা নিতান্তই কম। কৌতুক ও ব্যঙ্গপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি নাটক ও প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে চমৎকার হাস্যরস ফুটিয়াছে। তাঁহার প্রহসন, 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতিতে যথেষ্ট হাসির খোরাক আছে, কিন্তু হাস্যরস রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার কোনো অঙ্গ নয়। তাঁহার একান্ত গীতধর্মী ও ভাবধর্মী প্রতিভায় অসমঞ্জস বা অনুচিত বিচার-বুদ্ধির কোনো স্থান নাই। এই সব

প্রহসনে ঘটনা-সন্নিবেশ বা চরিত্রসৃষ্টিতে কোনো উচ্চাঙ্গের হাস্য-রসিকতা ফুটিয়া উঠে নাই। ইহাদের বৈশিষ্ট্যই সংলাপের অপূর্ব বাগ্-বৈভবে। উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে শব্দ-বিন্যাসের কৌশল বা কথার মারপ্যাচ একটা চমৎকার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই প্রকারের রসিকতা পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন, মার্জিতরুচি নর-নারীর ক্ষণিক চিত্তবিনোদন করিতে পারে, কিন্তু রস-সাহিত্যের আর্টের সর্বাঙ্গীণ দাবী পূরণ করিতে পারে না।

কৌতুক-কবিতা অপেক্ষা ব্যঙ্গ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অধিকতর সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে কয়টি ব্যঙ্গ-কবিতা আছে, সবগুলিতেই রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ ব্যঙ্গশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যিক-জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অনেক বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ সহ্য করিতে হইয়াছে, তিনি সাধারণত ফিরিয়া আঘাত করেন নাই। কিন্তু যৌবনে যে-ক্ষেত্রে তিনি দু'একবার আক্রমণ করিয়াছেন, সেখানে একেবারে অমোঘ শক্তি লইয়া। 'দামু-চামু', 'হিং টিং ছট্', 'বঙ্গবীর' প্রভৃতি ব্যঙ্গ-কবিতা তাহার নিদর্শন। শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি যখন হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্রাহ্মধর্মের অসারত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের পক্ষ লইয়া তাহার উত্তর দেন। তখন একপক্ষ 'প্রচার' ও 'নবজীবন', অন্য পক্ষ 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'ভারতী'র আসরে নামিয়া বিরাট বাগ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্রও এই যুদ্ধে কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর, 'সাহিত্য' ও 'সাধনা' পত্রেও চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ চলে। রবীন্দ্রনাথ নব্য হিন্দুদের এই উৎকট আর্যামিকে তীব্র ব্যঙ্গ করেন। কবির বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একখানি পত্র 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় (ভারতী, ফাল্গুন, ১২৯২), তাহার কিয়দংশ এইরূপ,—

ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,—
ছুঁচালো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন, 'আমি কল্কি', গাঁজার কল্কি হবে বুঝি!
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলি-ঘুঁজি।
পাড়ায় এমন কত আছে কত কব তার,
বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা' অবতার।
দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে,
দাঁত-কপাটি লাগে তাদের দাঁত-খিঁচুনীর ভঙ্গী দেখে।
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তন্ত্রসাধনা করিতে আরম্ভ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে তিনি কল্কি অবতার। নূতন নাম লইয়াছিলেন কৃষ্ণানন্দ। অনেক শিক্ষিত বাঙালী তাঁহার চেলা জুটিয়াছিল। এই কল্কি অবতারকে বিদ্রূপ করিয়া এই পত্রলেখা।

ইহার কিছু পরে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় তাঁহার বিখ্যাত ব্যঙ্গ-কবিতা 'দামুচামু' প্রকাশিত হয়। কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) এই কবিতাটি সংযোজিত ছিল। পরে উহা বাদ দেওয়া হয়। তখন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা ছিল রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) প্রভৃতি ছিলেন ইহার পরিচালকদলের মধ্যে। আর সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মদের পত্রিকা ছিল 'সঞ্জীবনী'। উহার পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। দুই পত্রিকায় প্রবল মসীযুদ্ধ হইত। 'দামুচামু' যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে আক্রমণ করিয়া লেখা। উহার একাংশ এইরূপ,—

দামু বোসে, চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্যাখানা বড্ড ফেনিয়েছে।
আমার দামু, আমার চামু।
দামু ডাকেন,—"দাদা আমার,"
চামু ডাকেন—"ভাই,"
"সারা দুনিয়া খুঁজে এলাম
যোদের জুড়ি নাই।"
আমার দামু, আমার চামু।
... ...
রব উঠেছে ভারত ভূমে হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন ভয় নেইক আর।
ওরে দামু, ওরে চামু।
তাই বটে গৌতম অত্রি যে যার গেছে মরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে করে।
আহা দামু, আহা চামু!
লিখছে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যে কথা, চামু দিচ্ছে গাল।
হায় দামু, হায় চামু!
... ...
দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলছে হিঁদুশাস্ত্রের মূল,
মেলাই কচুর আমদানীতে বাজার হুলুস্থুল।
দামু চামু অবতার।

মেড়ার মতো লড়াই করে
লেজের দিকটা মোটা,
দাপে কাঁপে থরথর
হিঁদুয়ানির খোঁটা।
আমার হিঁদু দামু চামু!

'খাপছাড়া' শিশুদের উপযোগী হাসির ছড়ার সংগ্রহ। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ও পরস্পর-বিরোধী কতকগুলি উক্তির একত্র সমাবেশের উপর ইহার হাস্যরসের ভিত্তি। কোনো একটা সামান্য ঘটনার অস্বাভাবিকত্ব, ঔচিত্যহীনতা বা আতিশয্যকে কেন্দ্র করিয়া একটা ক্ষণিক হাসির হিল্লোল। কবি জাদুকরের মতো একটা ক্ষণিক ভেল্কি দেখাইতেছেন। নিজেই বলিয়াছেন,—

ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজ্‌বাজীর এই ঠাট্টা।

কবির নিজের আঁকা ছবি এই ছড়াগুলির ভাবকে পরিস্ফুট করিয়াছে। একটি ছড়ার নমুনা এইরূপ,—

ক্যান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে,
চুন দেয় তারা ডাল্‌নায়॥

'ছড়ার ছবি' কোনো হাস্য-রসের রচনা নয়, ছড়ার ছন্দে শিশুদের উপযোগী করিয়া কতকগুলি গল্প-চিত্র অঙ্কিত করা। বাংলা-সাহিত্যে এই ছড়া-জাতীয় রচনা রবীন্দ্রনাথের হাতে একটি উচ্চ কলাসংগত পরিণতি লাভ করিয়াছে। ছেলেবেলায় ছড়া রবীন্দ্রনাথের উপর একটা অনির্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি একসময়ে আমাদের বাংলার ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিয়া 'সাহিত্যপরিষদ

পত্রিকা'য় প্রকাশ করেন। লোক-সাহিত্য-সংগ্রহে বাংলা দেশে তিনিই বোধ হয় অগ্রণী। এই ছড়ার রসসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত-কোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প, চন্দন, গোলাপজল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে—সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং সরস।

.........এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ-সংগীতস্বর জড়িত আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহীগণের শৈশবনৃত্যের নূপুর-নিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে। (লোকসাহিত্য)

ছড়ার চলতি শব্দের বিন্যাস ও সহজ স্বরবৃত্ত ছন্দের দোলা শিশুচিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় ও তাহার মনশ্চক্ষে এক অপূর্ব জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে। শিশুচিত্তের উপর ছড়ার প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ভালোরূপ বুঝিয়াছিলেন। 'কড়ি ও কোমলে', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'সাত ভাই চম্পা' প্রভৃতি কবিতায়, 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'খাপছাড়া' প্রভৃতি গ্রন্থে, ছড়ার ভাষা ও ছন্দ অনেক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। 'ছড়ার ছবি' তাহারই একটা পরিণতি। এই বইএর ভূমিকায় ছড়ার ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,—

"এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা।...ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরোয়া ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্র সমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে এর সজ্জায় কাব্য-সৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গম্ভীর কথা হাল্‌কা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমর রাখে না।...ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা।"

এই ছন্দ আমাদের পল্লীসংগীত, মেয়েলি ছড়ায়, বাউলের গান প্রভৃতিতে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদ তাঁহার গানে, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার অনেক কবিতায় এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রও এই ছন্দ অনেকস্থানে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই বাংলার এই খাঁটি ছন্দটিকে পরিমার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সর্বপ্রকার ভাবের বাহনরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

'ছড়ার ছবি' ছেলেদের জন্য লেখা হইলেও, মাঝে মাঝে উপমার বৈচিত্র্য, ভাবের গাম্ভীর্য ও ভাষার পারিপাট্যে পরিণত মনের উপভোগের বস্তু হইয়াছে। পিস্‌নি বুড়ীর গ্রাম-ছাড়ার বর্ণনাটা এইরূপ,—

চোখে এখন কম দেখে সে, ঝাপ্‌সা যে তার মন,
ভগ্নশেষের সংসারে তার শুকনো ফুলের বন।

স্টেশন মুখে গেল চলে, পিছনে গ্রাম ফেলে,
রাত থাকতে, পাছে দেখে পাড়ার মেয়ে ছেলে।
দূরে গিয়ে, বাঁশ বাগানের বিজন গলি বেয়ে
পথের ধারে বসে পড়ে, শূন্যে থাকে চেয়ে॥

পদ্মার উপর কবি নৌকা-বাসের বর্ণনা করিতেছেন,—

আমার নৌকা বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে
হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে,—
জানিনে মন-কেমন-করা লাগত কী সুর হাওয়ায়
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার।
কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্ আঁকিয়ের লে
ঝিকিমিকি সোনার রঙে হাল্‌কা তুলির রেখা।

'প্রহাসিনী'তে কবির পরিহাসপ্রিয়তা কয়েকখানি ব্যক্তিগত পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। পত্রগুলি আত্মীয়া-পরিচিতাদের কাছে লিখিত। কয়েকটা 'খাপছাড়া'র ছড়াজাতীয় কবিতাও আছে। 'মাল্যতত্ত্ব'-এর রসিকতার আড়ালে একটা তত্ত্ব ও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ উঁকি মারিতেছে। পরিহাসপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত স্বভাবের একটা অলংকার ছিল। তাঁহার মতো উচ্চমননশীল, সংস্কৃতি-কষিত কবি-মনের পরিহাস নানা-উল্লেখ-সমৃদ্ধ, কাব্য-ঘেঁষা ও অতি-মার্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। 'প্রহাসিনী'তে এইরূপ উচ্চাঙ্গের রসিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

কবি প্রস্তাবনায় বলিতেছেন যে, মাঝে মাঝে তাঁহার মনের গগনে একটা হাসির ধূমকেতু উদিত হইয়া কিছুক্ষণ কৌতুক-কণা বর্ষণ করিয়া আবার মিলাইয়া যায়,—

আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু,
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।
… … …
দুই হাতে মুঠা মুঠা কৌতুকের কণা
ছড়ায় হরির লুট, নাহি যায় গনা,
প্রহর কয়েকে যায় মুছে।

কবির পরিহাসের একটা নমুনা এইরূপ,—

"পাক-প্রণালী"র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।

চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত ব'লে দাবী নাহি করে মু'চটা,
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন ॥

(পরিণয়-মঙ্গল)

মানব-চরিত্রের একটা দুর্বলতা লইয়া কবি চমৎকার কৌতুক করিয়াছেন,—

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি
লোকে তার 'পরে মহারাগ করে হাতি দেয় নাই বলি,
বহু সাধনায় যার কাছে পায় কালো বিড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে "দাতা বটে ষোল আনা।"

(গৌড়ী রীতি)

'ছড়া' খাপছাড়ার মতোই একখানা ছড়ার বই—অসমঞ্জস ও অদ্ভুত উক্তির বিচিত্র সমাবেশময়। শেষ জীবনে অসুস্থ অবস্থায় কবি-মনে এই এলোমেলো, ছিন্নভিন্ন টুকরা কথার ঝাঁক কোথা হইতে উপস্থিত হইত। কবি মুখে মুখে ছড়াগুলি বলিয়া যাইতেন। কবি-চিত্তে এইরূপ পরস্পরসম্বন্ধহীন অদ্ভুত সব উক্তি এবং হাস্যরসের আবির্ভাব যে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক, কবি তাহা বারে বারে বলিয়াছেন। 'ছড়া'র ভূমিকাতেও কবি বলিয়াছেন,—

ছেড়ে আসে কোথা থেকে দিনের বেলার গর্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস কারো বা নাই অর্থ,
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের আসর তাহার জমে

খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী সব ডুবছে এবং ভাসছে,
ওরা কী যে দেয় না জবাব কোথা থেকে আসছে।

ছড়ার নমুনা এইরূপ,—

হুইস্‌ল বাজে ইস্টেশনে, বরের জ্যাঠামশাই
চমকে ওঠে, গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গোঁসাই।
সাঁৎরাগাছির নাচনমণি কাট্‌তে গেল সাঁতার,
হায়রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার।
মোষের শিঙে ব'সে ফিঙে লেজ দুলিয়ে নাচে,
শুধোয় নাচন, সিঁথি আমার নিয়েছে কোন্ মাছে।

(৬)

কদমগঞ্জ উজাড় ক'রে আসছিল সব মালদহে,
চড়ায় প'ড়ে নৌকাডুবি হোলো যখন কালদহে,

তলিয়ে গেল অগাধজলে বস্তা বস্তা কদমা যে,
পাঁচ মোহনার কৎলু ঘাটে ব্রহ্মপুত্র নদ-মাঝে।
আসামেতে সদ্কি জেলায় হাংলু-ফিড়াঙ পর্বতের,
তলায় তলায় ক-দিন ধ'রে বইল ধারা সর্বতের।

(২)

গলদা চিংড়ি তিংড়ি-মিংড়ি, লম্বা দাঁড়ার করতাল,
প্যাকড়াশিদের কাঁকড়া-ডোবায় মাকড়শাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর, লেজখানা যায় ছিঁড়ে
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার কুট্‌ছে নতুন চিঁড়ে।
কলেজ পাড়ায় শেয়াল তাড়ায় অন্ধ কলুর গিন্নী,
ফটকে ছোঁড়া চোটকিয়ে খায় সত্যপিরের সিন্নি।

(৭)

৩৫

প্রান্তিক

(পৌষ, ১৩৪৪)

রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে প্রান্তিক হইতে এক নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সূচনা পূর্ব হইতে, বিশেষ করিয়া 'শেষ সপ্তক' হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছে, তবে ইহা পূর্ণ রূপ ধরিয়াছে প্রান্তিক হইতে।

১৩৪৪ সালে রবীন্দ্রনাথ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হন। লুপ্তচেতন কবি একেবারে মৃত্যুর দ্বারদেশে পৌঁছিয়া আবার জীবনে ফিরিয়া আসেন। এই মৃত্যুর অভিনব অভিজ্ঞতার আলোকে কবি জীবনের স্বরূপ অতি স্বচ্ছ ও প্রশান্ত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। জীবনের বিচিত্র সঞ্চয়ের মূল্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভিমানের প্রকৃত রূপ এবার তাঁহার কাছে নিঃসংশয়ে ধরা পড়িল। কবি বরণ করিয়া লইলেন মৃত্যুকে, ব্যাধির যন্ত্রণাকে, জীবনের অজস্র মহামূল্য ঐশ্বর্যের নিকট বিদায়-গ্রহণের বেদনাকে, অবিচলিত বিশ্বাসে ও ধীর-প্রশান্ত চিত্তে। ইহারাই তাঁহার জীবনের সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটন করিল। ধনজন-ঐশ্বর্যখ্যাতির ইন্দ্রজাল কোনো চরম মূল্য বহন করে না, জীবনের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা ইন্দ্রধনুচ্ছটার মতোই কেবল ক্ষণস্থায়ী—কেবল মানবসত্তাই অসীম, অনন্ত, চিরজ্যোতির্ময়। অবশ্য এই উপলব্ধি কবির কাব্যে বহু পূর্ব হইতেই ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তবুও তাহার মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা, অপরিচয়ের

সংশয় ও কৌতূহল, নূতনের উত্তেজনা ছিল। এখন কবি সংশয়লেশহীনভাবে স্থির-চিত্তে এই পরম সত্যকে গ্রহণ করিয়াছেন।

একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 'নৈবেদ্য' হইতে 'খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি' পর্যন্ত কবি ছিলেন লীলাবাদী বা মিস্টিক—মানুষ ও ভগবানের জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া প্রেমলীলার সৌন্দর্য-মাধুর্য ও রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জগৎ ও জীবনের একটা প্রয়োজন ছিল – লীলারসপুষ্টির জন্য। এই জীব, ভগবান ও সৃষ্টির সম্মিলিত লীলার রহস্যধারা চলিয়াছে 'পরিশেষ' পর্যন্ত। লীলার জন্যই মানবসৃষ্টি, বিশ্বসৃষ্টি, সুতরাং এই বন্ধন মাঝেই তিনি মুক্তি চাহিয়াছিলেন। বন্ধন হইতে মুক্তি চাহেন নাই। ইহাই ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বরূপ। 'শেষ সপ্তক' হইতে তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপনিষদের পথ ধরিয়াছে। মানুষের অন্তরে আছে তাহার আত্মা, এই আত্মার পরিচয়ই তাহার সত্য পরিচয়। এই আত্মা মহান ব্রহ্ম বা পরমাত্মার স্বরূপ। জীবনের দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হইয়া নানা আবিলতায় তাহার নিত্য স্বরূপকে ভুলিয়া যায়—ছায়াকেই মনে করে কায়া। মৃত্যুই তাহার জীবনের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার বিশুদ্ধ রূপের পুনরুদ্ধার করে। সে কেবল রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মাত্র, মৃত্যুই তাহার ছদ্মবেশ খসাইয়া তাহার প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটিত করে। সে এই বিশ্বজগৎ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ মহাজ্যোতির্ময় সত্তার অংশ। তখন সে তাহার সেই নিত্য-ভাস্বর স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারে। এই আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধিই এখন কবির কাম্য—লীলাবাদের রহস্যানুভূতি নয়। অবশ্য ইহা আমাদের ভারতীয় আধ্যাত্ম-সাধনার চিরপরিচিত সত্য—উপনিষদের ঋষিদের অলৌকিক দিব্যানুভূতি। এই আধ্যাত্মিক সত্যকে রবীন্দ্রনাথ অত্যুৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা বিপুল আবেগ ও অপূর্ব ভাষার কারুকলার সাহায্যে অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যে রূপায়িত করিয়াছেন।

'শেষ সপ্তক', 'বীথিকা', 'পত্রপুট'-এর মধ্যে একটা রহস্যদর্শন বা জিজ্ঞাসার একটু সামান্য ভাব আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ব্যাধির বেদনা ও আসন্ন মৃত্যুর ছায়া কবিকে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্থির ভূমিতে দাঁড় করাইয়াছে। কবি এখন নিঃসংশয় হইয়া আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। 'প্রান্তিক' হইতে 'সেঁজুতি', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা' প্রভৃতির মধ্য দিয়া কবির মূল কাব্যধারাটি এই ঔপনিষদিক উপলব্ধির পথে প্রবাহিত হইয়াছে।

কবি মর্ত্যের জীবন-চেতনার একেবারে শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন, যে সত্য দর্শন করিলেন,

যে শিক্ষা লাভ করিলেন, তাহাই প্রশান্ত চিত্তে, অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন 'প্রান্তিক'-এ।

আঙ্গিকের দিক হইতে কবি পূর্বেকার গন্ত-কবিতার ছন্দ-রীতি এই গ্রন্থ হইতে ত্যাগ করিয়াছেন। 'বলাকা' হইতে ক্রমপ্রসারশীল ভাবোচ্ছ্বাসের প্রত্যক্ষ রূপায়ণের প্রয়োজনে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট ছন্দোবন্ধনের রীতি ভাঙিয়া যে একপ্রকার মুক্তচ্ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন, এখন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ জীবনের কাব্যগুলিতে তাহাই পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই গন্ত-কবিতার রীতিত্যাগের মধ্যে আত্ম-সচেতন ও অতিমাত্রায় শিল্প-সচেতন কবির মনের পরিবর্তনের ইতিহাস আছে। এ যুগে কবি যে মনোভাব ব্যক্ত করিতে চাহেন, হয়তো গন্ত-কবিতার রীতিতে তাহার সর্বাঙ্গসুন্দর রূপায়ণ সম্ভব নয় বলিয়া কবি আবার তাঁহার পূর্ব-রীতিতে ফিরিয়া গিয়াছেন।

কবির জীবন-চৈতন্য ধীরে ধীরে লুপ্ত হইল, অন্ধকারের অন্তরালে চুপে চুপে মৃত্যুদূত তাঁহার শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এই বিভ্রান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ক্ষণিকের। ক্রমে চৈতন্যের আলোক আঁধারের স্তূপ দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিল। ক্ষণকাল আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব চলিল। তারপর—

নূতন প্রাণের সৃষ্টি হোলো অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ অভ্যুদয়ে।

কবির ব্যক্তি-সত্তার ব্যবধান ভাঙিয়া পড়িল। বন্ধনমুক্ত আপনার অন্তরতম সত্তার যথার্থ পরিচয় তিনি পাইলেন,—

বন্ধনমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

(১)

'কামনার আবর্জনা', 'ক্ষুধিত অহমিকার উঞ্ছবৃত্তি-সঞ্চিত জঞ্জালরাশি' আজ 'মরণের প্রসাদবহ্নিতে' দগ্ধ হইয়া যাক ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। (২)

'এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র' যখন অদৃশ্য আঘাতে ছিন্ন হইয়া গেল, তখন 'অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা মাঝে' কবি নয়ন মেলিলেন। তিনি একা, বিশ্বসৃষ্টিকর্তাও একা, তাই 'সৃষ্টি কাজে' তাঁহার 'আহ্বান বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে'। 'পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা পশ্চাতে ফেলিয়া' রিক্তহস্তে আজ তিনি বিরচন করিবেন 'নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়'। (৩)

'সংসারের বিচিত্র প্রলেপে' 'বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে' তাঁহার জীবনের সত্য অবলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুর আরতি-শঙ্খধ্বনিতে বুঝিতে পারিলেন যে, সব বেচা-কেনা থামাইয়া, তাঁহাকে যাইতে হইবে 'আদি-কৌলীন্যের' পরিচয় বহন করিয়া 'নীরবের ভাষাহীন সংগীত-মন্দিরে একাকীর একতারা হাতে'। (৪)

'অতৃপ্ত তৃষ্ণার ছায়ামূর্তি', 'স্বপ্নের বন্ধন', 'কামনার রঙিন ব্যর্থতা', মৃত্যুর হাতে ফিরাইয়া দিয়া, কবি 'মেঘমুক্ত শরতের দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চির-পথিকের বাঁশির ধ্বনি শুনিয়া তাহার অনুগামী হইতে চাহিতেছেন। (৫)

কবি আজ মুক্তি চাহিতেছেন—কিন্তু সে মুক্তি 'কৃচ্ছ্র সাধনার ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের আত্ম-অস্বীকার' নয়, 'রিক্ততায়, নিঃস্বতায়, পূর্ণতার প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা' নয়, সে মুক্তি—'সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে'—এই নিখিল বিশ্বে যে মহা আনন্দ পরিব্যাপ্ত, তাহার মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে নিমজ্জন করিয়া সেই আনন্দকে উপলব্ধি করা। (৬)

মৃত্যুদূতের স্পর্শে কবি নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিয়া পুরাতনকে বিসর্জন দিলেন বটে, কিন্তু এই ধরণী ও জীবনের উপর তাঁহার অসীম কৃতজ্ঞতা। এই সত্য ও ছলনায় মিশ্রিত জীবনেই তিনি অপরূপ অনির্বচনীয়ের স্পর্শ পাইয়াছেন, তাই—

ধন্য এ জীবন মোর—
এই বাণী গাব আমি······
আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়॥
(৭)

কবি ক্রমে ঔপনিষদিক আত্মোপলব্ধির মধ্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত হইতেছেন—সেই অসীম জ্যোতির্লোকের মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া চরম মহামুক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। মৃত্যুদূতের স্পর্শে তাঁহার এতদিনের নাট্যসাজ আজ নিরর্থক প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাঁহার আত্মপরিচয়ে, আপনার নিগূঢ় পূর্ণতায় তিনি আজ বিস্ময়-স্তব্ধ। আসন্ন জীবন-চেতনার গোধূলিবেলায় যখন বিশ্ববৈচিত্র্যের উপরে অন্তহীন তমিস্রা-আবরণ নামিয়া আসিল, তখন সেই তমসার পারস্থিত মহান জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখিতে কবির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। 'সৃষ্টির সীমান্তে জ্যোতির্লোকে', 'নিখিল জ্যোতির জ্যোতি যে আলোক', 'সেই আলোকের সামগান' তাঁহার 'সত্তার গভীর গুহা হইতে মন্দ্রিয়া' উঠিবে, এই অপূর্ব ও বিস্ময়কর

অভিজ্ঞতার জন্যই তো তাঁহার একমাত্র আকিঞ্চন—এই চরমের কবিত্ব-মর্যাদা লাভের জন্যই তো এতদিন জীবনের রঙ্গভূমে তান সাধিয়াছেন, (৮, ৯, ১০)।

তার আজ 'কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ' হইতে চিরতরে তাঁহার আসন তুলিয়া লইবেন, পরমতের মানদণ্ডে নিজের মূল্য যাচাই করিবার লজ্জাকর দীনতা পরিত্যাগ করিবেন,—তাঁহার চরম আকাঙ্ক্ষা তো খ্যাতি-সম্মান নয়,—

এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নব বসন্তের
আগমনে অরণ্যের শেষ শুষ্ক পত্রগুচ্ছ যথা।
যার লাগি আশাপথ চেয়ে আছ সে নহে সম্মান,
সে যে নব জীবনের অরুণের আহ্বান ইঙ্গিত,
নব জাগ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যোতির তিলক॥
(১২)

এই ধরণী ও জীবনের সহিত আবদ্ধ হইলেও তিনি তো দূরের যাত্রী, সূর্য-নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁহার সখ্যডোর বাঁধা,—

তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়॥ (১৩)

অস্তসিন্ধুপরপারে পথচিহ্নহীন শূন্যে ভ্রষ্ট-নীড় পাখীর মতো উড়িয়া যাইবার পূর্বে কবি এই বসুন্ধরার আতিথ্য ও জীবনের অতীন্দ্রিয় ঐশ্বর্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন,—

এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে॥ (১৪)

মৃত্যুর কৃষ্ণ-যবনিকা অপসারিত হইলে কবি নিজেকে নবীন মূর্তিতে দেখিতেছেন—যেন তিনি 'তীর্থযাত্রী অতিদূরে ভাবী কাল' হইতে 'মন্ত্রবলে ভাসিয়া আসিয়া' 'বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে' এই মুহূর্তেই পৌঁছিয়াছেন। ব্যক্তি-সত্তার উপর হইতে প্রত্যহের আচ্ছাদন খসিয়া গিয়াছে, নিজের বাহিরে নিজেকে দেখিতেছেন 'অপর যুগের কোনো অজানিত'-এর মতো। 'নগ্ন চিত্ত' আজ সমস্তের মাঝে মগ্ন, অক্লান্ত বিস্ময়ে তিনি চারিদিকে চক্ষু মেলিতেছেন, ছুটির নিরাসক্ত আনন্দ ও শান্তিতে মন আজ তাঁহার পূর্ণ,—

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ সম॥ (১৫)

প্রান্তিক-এর শেষের দুইটি কবিতার অনুপ্রেরণা আসিয়াছে সমসাময়িক ঘটনা হইতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব হইতেই মানুষের লোভ, অহংকার, নিষ্ঠুরতা বাড়িয়া চলিয়াছিল ও মনুষ্যত্বের উপর সর্বপ্রকার বর্বরতার আঘাত হানা হইতেছিল। ফ্যাসিস্ট ইতালীর আবিসিনিয়া-গ্রাস, ফ্রাঙ্কো কর্তৃক স্পেনের গণতন্ত্র-ধ্বংস, জাপানের চীন-গ্রাস করিবার উদ্যম, হিটলারের ধীরে ধীরে পররাজ্য-গ্রাস প্রভৃতি সর্বধ্বংসী মহাযুদ্ধের ভূমিকা রচনা করিতেছিল। মানুষের উপর দিয়া অপমান, অত্যাচার, অবিচার, হত্যা, ধ্বংসের বন্যা বহিয়া যাইতেছিল। সদ্য-রোগমুক্ত, লব্ধতত্ত্বজ্ঞান, প্রশান্তচিত্ত কবির চিত্তও গভীরভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি এই বীভৎসতাকে শত-সহস্র ধিক্কার দিবার জন্য বজ্রবাণীর প্রয়োজন অনুভব করিলেন,—

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে॥ (১৭)

মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনায় ব্যথিতচিত্ত-কবি-কণ্ঠে আহ্বান শোনা গেল,—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে॥

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতেও মাঝে মাঝে সমসাময়িক ঘটনায় কবিমনের বিক্ষোভ ব্যক্ত হইয়াছে। 'পরিশেষ' হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়।

৩৬

সেঁজুতি

(ভাদ্র, ১৩৪৫)

প্রান্তিকের কবি-মানসের দৃষ্টিভঙ্গী ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ধারা 'সেঁজুতি'তেও বর্তমান আছে। কবি চির-বিদায়ের আয়োজন করিয়াছেন, এই বিদায়ক্ষণে নিজের জীবন, গতজীবনের স্মৃতি, এই জগৎ ও জীবনে যে-সব বস্তু তাঁহাকে আনন্দ দিয়াছিল, কবি-সত্তাকে ধারণ-পোষণ করিয়াছিল তাহাদের স্বরূপ, নানা কর্মখ্যাতিমুখরতার মধ্যে তাঁহার সহজ ব্যক্তি-সত্তার রূপ, সৃষ্টিধারার সঙ্গে মানবসত্তার সম্বন্ধ প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই পর্যালোচনায় যে ভাব-কল্পনা বিশেষভাবে রূপলাভ করিয়াছে, তাহা এই যে, এই জগৎ ও জীবন ধ্বংসশীল ও নিরন্তর পলাতকা হইলেও কবির জীবনে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে, ইহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচ্ছুরিত অসীমের স্পর্শ তাঁহার আত্ম-সত্তার সত্য পরিচয় উদ্ঘাটন করিয়াছে। এই অনিত্যের বুকেই তিনি নিত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। 'পূরবী' হইতেই এই ভাবদ্বন্দ্ব কবি-মানসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং 'বীথিকা'র মধ্যে ইহার পূর্ণরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। 'সেঁজুতি'র সঙ্গে 'বীথিকা'র এই দিক দিয়া ভাবের একটা ঐক্যবন্ধন আছে। তবে আলোচ্য গ্রন্থে মৃত্যুভাবনা অনেক অগ্রসর হইয়াছে, তাই আত্মচিন্তা, নিজের জীবনের এতদিনের হিসাব-নিকাশের উপরই কবির দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হইয়াছে।

'সেঁজুতি' অর্থে সন্ধ্যা-দীপ। এই নামকরণে কবি হয়তো ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, জীবনের সন্ধ্যায় সাঁঝের বাতি জ্বালাইয়া তিনি সারাদিনের নানা কর্মকোলাহলময় জীবনের লাভ-লোকসানের একটা হিসাব করিবেন।

কবি এই বইখানি উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার চিকিৎসক ডাক্তার নীলরতন সরকারকে। উৎসর্গ-পত্রে কবি বলিতেছেন, আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকার গুহা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এক নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন। যে প্রাণ-চেতনা এই সংসার-রঙ্গমঞ্চে এতদিন সুখদুঃখের নাট্যলীলায় নিরত ছিল, সে আজ সমস্ত অভিনয় ছাড়িয়া তাঁহাকে কোথায় 'অচিহ্নিতের পারে, নব প্রভাতের উদয়সীমায় অরূপলোকের দ্বারে' লইয়া যাইতে চাহিতেছে। কবি-দৃষ্টি আজ সুদূরপ্রসারিত, আলো-আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে তিনি 'অজানা তীরের বাসা' দেখিতে পাইতেছেন, শিরায় শিরায় তাঁহার 'দূর নীলিমার ভাষা' 'ঝিমি ঝিমি' করিতেছে। সে

ভাষার চরম অর্থ এখনো তাঁহার কাছে প্রস্ফুট হয় নাই, তবুও সেই সুদূর নীলিমার ভাষাকে তিনি ছন্দের ডালিতে সাজাইয়াছেন।

এই আলো-আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে অজানা তীরের বাসার ইঙ্গিত, এই জগৎ ও জীবনে অভিব্যক্ত অসীম ও অরূপের হাতছানি তাঁহাকে উতলা করিয়াছে। বহুদূরের পথিক, সৃষ্টির আদিম জ্যোতির কণা, ধরণীর এক কোণে আলো-আঁধারের মরীচিকার মধ্যে তো আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, এই জগৎ ও জীবন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে না। এই চিরচঞ্চল ও ধ্বংসশীল জগৎ ও জীবনকে ছাড়িতেই হইবে, তবুও ইহাদের নিকট তিনি চির-কৃতজ্ঞ, তাঁহার জীবনে ইহাদের সার্থকতা আছে। ইহাদের মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মস্বরূপ তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—তাঁহার চরম রূপ ও পরম আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনপর্যালোচনার পট-ভূমিকায় এই সত্য উপলব্ধিই 'সেঁজুতি'র মর্মকথা।

'জন্মদিন', 'পত্রোত্তর', 'যাবার মুখে', 'অমর্ত্য', 'পলায়নী', 'স্মরণ', 'জন্মদিন' (দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে), 'প্রতীক্ষা', 'পরিচয়' প্রভৃতি কবিতায় কবি নিজ জীবন ও তাঁহার এই ভাব-চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন।

'জন্মদিন' কবিতাটি রবীন্দ্র-কাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। আত্মজীবনের গভীর বিশ্লেষণ কবি অপূর্ব কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। এই কবিতায় কবির বক্তব্য এই যে, ধরণী ও জীবন মানুষের চিরপথিকবেশী অন্তরতম সত্তাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। ধরণীর শত শত বন্ধন ও জীবনের আসক্তির ডালি ও অপবিত্র সঞ্চয় সে ভগ্ন মৃৎপাত্রের মতো দূরে ফেলিয়া দিয়া যায়। সে ইহাদের চেয়ে বহু বৃহৎ, সে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মহামানব—স্বরূপ তাহার চিরানন্দময়। জরামরণশীল দেহে আবদ্ধ হওয়ায় তাহার চিরদীপ্ত জ্যোতি ম্লান হয় না। তবুও কবি মৃত্তিকার ঋণ স্বীকার করেন। কারণ আত্মস্বরূপের চিরন্তনত্বের এই যে উপলব্ধি, ইহা সম্ভব হইয়াছে এই ধরণীর সহিত যুক্ত হওয়ায়। এই অনিত্যের বুকের উপর হইতেই তিনি নিত্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।........

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি

উদয়শিখরে তার দেখো আদি জ্যোতি। করো মোরে
আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা।......

হে বসুধা,
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে—যে তৃষ্ণা যে ক্ষুধা
তোমার সংসার-রথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল কমে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে।......

যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে করো অন্ধ প্রায়
যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ র'বে সগৌরবে, তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।......

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে, ভালোবাসিয়াছি।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার।......

যেথা তব কর্মশালা
সেথা বাতায়ন হতে কে জানি পরায়ে দিত মালা
আমার ললাট ঘেরি সহসা ক্ষণিক অবকাশে,
সে নহে ভৃত্যের পুরস্কার; কী ইঙ্গিতে কী আভাসে
মুহূর্তে জানায়ে চলে যেত অসীমের আত্মীয়তা
অধরা অদেখা দূত, ব'লে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে;......

জেনো অবজ্ঞা করিনি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
লীন হোত জড় যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে-গূঢ় রহস্য দিনে দিনে

হোত নিঃশ্বসিত, আজি মর্ত্যের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।

'পত্রোত্তর'-এ কবি বলিতেছেন, এই 'মর্ত্যের বুকে' 'আলোকধামের আভাস' 'অমৃতপাত্রে' ঢাকা আছে। সেই আভাসের আহ্বানে কবির বিস্মিত সুর গানে গানে ব্যক্ত হইয়াছে। সংসারের নানা দুঃখদৈন্য, বিশৃঙ্খলা ও 'পরুষ-কলুষ ঝঞ্ঝা'র মধ্যেও তিনি অনাদি 'শান্ত শিবের বাণী' শুনিয়াছেন। তবুও আজ বিশ্ব-সৃষ্টির চির-অগ্রসরমান নৃত্যলীলার ছন্দে তাঁহার হৃদয়ে অহেতুক আনন্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে, তিনিও এই ছন্দে যোগ দিয়া, মৃত্যুর দ্বার দিয়া অমর জ্যোতির্ময়লোকে মুক্তি পাইবেন।

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধনছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা।
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে,
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে;
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি
যাব অলক্ষ্যে সূর্যতারার সাথী।

'যাবার মুখে' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, জীবন তো টুটিয়া ধূলিময় হইয়া যাইবেই, এ জীবনের সঙ্গীরাও ক্ষণজীবী, তবুও এই জীবনেই তিনি 'অসীমের ইসারা' দেখিয়াছেন ও 'অমরাবতীর নৃত্যনূপুর'-এর ঝংকার শুনিয়াছেন। ধরণীর নিকট হইতেও কবি তাঁহার চিরন্তন আত্মপরিচয় জানিয়াছেন,—

সকাল বেলার প্রথম আলোয় বিকালবেলার ছায়ায়
দেহপ্রাণমন ভরেছে সে কোন্ অনাদিকালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে
দূর জনমের আদি পরিচয় এই ধরণীর সাথে।
অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীম কালের বুকে
নাচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।

'পলায়নী' কবিতায় শেষ বিদায়ক্ষণে কবির চোখে বিশ্বসৃষ্টির পলায়নের শোভাযাত্রা ধরা পড়িয়াছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নগর-নগরী সব ছুটিয়া পলাইতেছে। কবিও সেই স্রোতে ভাসিতে চাহিতেছেন,—

ওরে মন, তুই চিন্তার টানে
বাঁধিস নে আপনারে,
এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে
অনায়াসে ভেসে যা রে॥

'অমর্ত্য' কবিতায় কবি বলিতেছেন, কোনো মোক্ষধাম বা বৈকুণ্ঠধাম তিনি কামনা করেন না। বাসা নিয়েছেন মাটির উপরে অস্থায়ীভাবে। নৃত্যপাগল নটরাজের তিনি শিষ্য—তাঁহারই পিছনে পিছনে তাঁহার যাত্রা। তাঁহার বস্তুদেহের মধ্যে ঐ দেহের অতীত এক অনির্বচনীয় আনন্দময় দেহকে তিনি অনুভব করেন—গানেই যাহার ভাষা, সুদূরের মধ্যে যাহার ইঙ্গিত, নামহীন সুন্দরের যে প্রত্যাশী। সেই সুদূরের পিয়াসী তাঁহার মর্ত্যজীবনের পরেও তাঁহার পথচলায় সাথী হইবে,—

যে-দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে-দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়,
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে কেবল অনুভাবে॥

৩৭

আকাশ-প্রদীপ

(বৈশাখ, ১৩৪৬)

'আকাশ-প্রদীপ'-এ প্রান্তিক ও সেঁজুতির দার্শনিক চিন্তা ও অধ্যাত্ম-উপলব্ধির কোনো প্রকাশ নাই; সেই গুরু-গম্ভীর সুরেরও পরিবর্তন হইয়াছে। কবি বহুদিন পরে আবার সহজ ও সরল কল্পনার লীলার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন, রসজ্ঞ দ্রষ্টার পরিহাস-তরল সুরটি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, তাঁহার বাল্য-পরিবেশের নানা স্মৃতি-খণ্ডকে কাব্যরূপ দিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

এই গ্রন্থের মূল ভিত্তি স্মৃতি-রূপায়ণ। দীর্ঘ-জীবন অতিক্রম করিয়া কবি শেষ-বিদায়ের লগ্নে পৌঁছিয়াছেন। আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন, যাঁহারা তাঁহার চারিদিকে এতদিন ভিড় করিয়া ছিলেন, তাঁহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কবির ঘরে আজ অপরিচিত লোকের ভিড়। স্মৃতির আকাশে পূর্বের পরিচিতেরা বিস্মৃতপ্রায় ক্ষীণ রেখায় পর্যবসিত হইয়াছেন। জীবনের সন্ধ্যায় কবি কল্পনার দীপ জ্বালাইয়া সেই

স্বপ্নময়, বিলীয়মান স্মৃতিকে নবরূপে উদ্দীপন করিয়া দেখিতে চাহিতেছেন। সূচনায় কবি বলিয়াছেন,—

গোধূলিতে নামল আঁধার
ফুরিয়ে গেল বেলা,
ঘরের মাঝে সাঙ্গ হোলো
চেনা-মুখের মেলা।

দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।

'ভূমিকা'য় কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য স্মৃতিকে আকার দিয়া আঁকা। কারণ কালস্রোতে বস্তুমূর্তি ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে, কিন্তু কল্পনা-রচিত মূর্তি চিরস্থায়ী।

আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে ;

'আকাশ-প্রদীপ'-এর মধ্যে দুইটি প্রধান ভাবধারার কবিতা লক্ষ্য করা যায়,—

(ক) বিচ্ছিন্ন সাধারণ বাস্তব ঘটনাবলী বা চিত্রের মধ্যে সার্বভৌম সত্যের ব্যঞ্জনা ও বিশিষ্ট অর্থ-গৌরব প্রতিষ্ঠা,—'ধ্বনি', 'বধূ', 'জল', 'নামকরণ', 'তর্ক' প্রভৃতি।

(খ) অলস কল্পনার স্বচ্ছন্দবিহার ও ক্ষণিক ভাবানুভূতির রূপায়ণ,—'শ্যামা', 'জানা-অজানা', 'পাখীর ভোজ', 'যাত্রা', 'সময়হারা', 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' ইত্যাদি।

(ক) 'ধ্বনি' কবিতায় কবি বলিতেছেন, কবির বাল্যকালে, চিলের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠ, পাড়ার কুকুরের কোলাহল, ফেরিওয়ালাদের ডাক, রাস্তার সহিসদের ডাক, পাতিহাঁসের স্বর, স্কুলের ঘণ্টা প্রভৃতি তাঁহার 'সূক্ষ্ম তারে বাঁধা' মনকে আঘাত করিত ও তাঁহাকে বিশ্বসৃষ্টির পরপারে 'রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে' লইয়া যাইত।

'বধূ' কবিতাটি কল্পনার রহস্যময়তায় অপূর্ব। ছড়ার বধূকে একটি চিরন্তন কল্পলোকের নিবিড় রহস্যময়ী মূর্তিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। চিরজীবন উৎকণ্ঠিত কবি সে-বধূর আগমনের অপেক্ষায় আছেন, কিন্তু তাহার দর্শন মিলিল না—এমন কি নিজের বধূ আসিলেও না,—

অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ,
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
"তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন ঘাট হতে
এসেছ আলোতে।"

উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ,
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, "আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।"

সেই কল্পনার বধূ অপ্রাপণীয়া; সেই অসীম সৌন্দর্য ও প্রেমের বিগ্রহরূপিণী কোনো দিন মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইবে না। তাহারই আভাস-ইঙ্গিতবাহিনী দূতীকে আমরা সংসারের বধূরূপে লাভ করিয়া সেই চির-অন্তরালবর্তিনীর রস-রহস্য কিছু পরিমাণে আস্বাদ করিতে পারি।

'নামকরণ' ও 'তর্ক' কবিতা দুইটি 'আকাশ-প্রদীপ'-এর শ্রেষ্ঠ রচনা। শেষ বয়সের এই মনন-প্রধান প্রেমকবিতাগুলি রবীন্দ্রকাব্যের বিশিষ্ট সম্পদ। ভাবের গাঢ়তা, কল্পনার নিবিড়তা ও প্রেমের মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের গভীরতায় এগুলি অনবদ্য। 'নামকরণ' কবিতায় কবি কেন তাঁহার প্রিয়াকে 'চৈতালি পূর্ণিমা' নাম দিতেছেন, তাহার কারণ দেখাইতেছেন,—

জীবনের যে সীমায়
এসেছে গম্ভীর মহিমায়
সেথা অপ্রমত্ত তুমি,
পেরিয়েছ ফাল্গুনের ভাঙাভাঙা উচ্ছিষ্টের ভূমি,
পৌঁছিয়াছ তপঃশুচি নিরাসক্ত বৈশাখের পাশে,
এ কথাই বুঝি মনে আসে।
... ...
হয়তো মুকুলঝরা মাসে
পরিণতফলনম্র অপ্রগল্‌ভ যে মর্যাদা আসে
আম্র ডালে
দেখেছি তোমার ভালে
সে পূর্ণতা স্তব্ধতা মন্থর,
তার মৌন মাঝে বাজে অরণ্যের চরম মর্মর।
... ...
তুমি যেন রজনীর জ্যোতিষ্কের শেষ পরিচয়,
শুকতারা, তোমার উদয়
অস্তের খেয়ায় চড়ে আসা,
মিলনের সাথে বহি বিদায়ের ভাষা।
তাই বসে একা
প্রথম দেখার ছন্দে ভরি লই সব শেষ দেখা।

ফাল্গুনের অতিতৃপ্তি ক্লান্ত হয়ে যায়,
চৈত্রে সে বিরলরসে নিবিড়তা পায়,
চৈত্রের সে ঘনদিন তোমার লাবণ্যে মূর্তি ধরে ;
মিলে যায় সারঙের বৈরাগ্যরাগের শান্তস্বরে,
প্রৌঢ় যৌবনের পূর্ণ পর্যাপ্ত মহিমা
লাভ করে গৌরবের সীমা।

এই উপমা-তুলনাগুলিতে নারীর পরিণত-যৌবনের শান্ত, গম্ভীর, পরিপূর্ণ মহিমা বিচিত্র ভাবময় চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্রগুলি অনুপম। ভাবধর্ম ও চিত্র-ধর্মের মিলন হওয়ায় এই কবিতাটি প্রথম শ্রেণীর কবিতার মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

কবি বলিতেছেন, নাম-করণের এই সব ব্যাখ্যা যে কোনো সত্য অর্থ বহন করে না, এ কথা বলা ভুল। কারণ

পুরুষ যে রূপকার
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী,
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি ;

নারীর সৌন্দর্য মাধুর্য-রহস্যময় মূর্তি যে অনেকখানি পুরুষের নিজের মনের রচনা, এ কথা কবির একটা প্রিয় ভাব। এক পরমসুন্দর দেহাতীত মায়ায় নারী অনির্বচনীয় মনোহর। সে মায়ার বাস পুরুষের হৃদয়ে—তাহার অঞ্জন পুরুষের চোখে লাগানো। সেই মায়ার অনিবার্য আকর্ষণই মোহ।

'তর্ক' কবিতায় কবি বলিতেছেন, এই মোহ না হইলে প্রেমের যথার্থ আস্বাদই পাওয়া যায় না,—

আমি কহিলাম, "যদি প্রেম হয় অমৃতকলস,
মোহ তবে রসনার রস।
সে সুধার পূর্ণ স্বাদ থেকে
মোহহীন রমণীরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে।
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়া,
তাহার তো বারো আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
প্রেমে আর মোহে
একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে ?
আকাশের আলো
বিপরীতে ভাগ করা সে কি সাদা কালো।"

ঐ আলোই তো আপনার পূর্ণতাকে ভাঙিয়া তৃণে শস্যে পুষ্পে পর্ণে আকাশে, বাতাসে বিচিত্র বর্ণে আত্মপ্রকাশ করে, আর বিশ্বে চোখ ভুলাইবার মোহ বিস্তৃত করে। মন ভুলাইবার ইচ্ছা না থাকিলে, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি তো তাৎপর্যহীন হইত। তাই,—

পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হ'য়ে থাকে
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।
অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।
এর নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে,
পড়ে থাকে তীরে।
পুরুষ যে ভাবের বিলাসী
মোহতরী বেয়ে তাই সুধাসাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া,
অসীমের ছায়া।
অমৃতের পাত্র তার ভ'রে ওঠে কানায় কানায়
স্বল্প জানা ভূরি অজানায়।

নারীর রূপ-মহিমার অতলস্পর্শ রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এই দুইটি কবিতায়।

(খ) 'শ্যামা' কবিতায় কবির কৈশোর-প্রেমের স্মৃতি ভালো কাব্যরূপ ধরিতে পারে নাই। কল্পনা অতি শিথিলভাবে মন্থরগতিতে যদৃচ্ছামত চলিয়াছে। কবি তাঁহার বক্তব্যটা যেন কোনো মতে বলিয়া ফেলিতে পারিলেই একেবারে খালাস। ভাষা অনেকটা গদ্যঘেঁষা—রবীন্দ্রনাথের চিরসিদ্ধ অলংকার-নৈপুণ্য ও ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার গৌরব ইহাতে নাই।

'জানা-অজানা'য় ঘরের পুরানো আসবাবপত্র নূতন কালের কাছে মূল্যহীন, তাহারা অতীতের ছায়া, 'নূতনের মাঝে পথহারা'—এই কথা বলা হইয়াছে।

'পাখীর ভোজ' কবিতাটি সার্থক বর্ণনাত্মক কবিতা। পাখীদের চটুল দেহ-হিল্লোল, চঞ্চুতে চঞ্চুতে খোঁচাখুঁচি ও হিংসা, শেষে বিবাদের পর আবার শান্তভাব ও নৃত্য প্রভৃতি সুন্দর বর্ণনা করা হইয়াছে। 'যাত্রা' কবিতায় স্টীমারের ক্যাবিন ও তাহার উপর জীবন-যাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়া শেষে উহাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ায় সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ রসবোধে বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

'সময়হারা' নামে দীর্ঘ কবিতাটিতে রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, শিল্পীর শিল্প

যে কালেরই হোক না কেন, তাহার মূল্য নষ্ট হয় না। বর্তমান কর্তৃক উপেক্ষিত এক শিল্পী তাহার প্রাচীন শিল্প-সম্ভার লইয়া এক ভূতুড়ে পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দিন কাটাইতেছিল, শেষে কালপুরুষের সিংহদ্বার হইতে দৈববাণী শুনিতে পাইল, যে, শিল্পীর সৃষ্টি নিত্য-কালের—কেবল চিরপুরাতন নব নব যুগে নব নব রূপ পরিগ্রহ করে, 'পুরানো সে নতুন আলোয় জাগল নতুন কালে'। এই কবিতায় একটা অতি-প্রাচীন ও ভূতুড়ে আবহাওয়া রচনায় কবির যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

৩৮

নবজাতক

(বৈশাখ, ১৩৪৭)

'নবজাতক' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন,—

"আমার কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হতে থাকে তখন মৌমাছিদের মধু জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায় চারিদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে।…কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হোতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। হয়তো…এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা……"

কবির কাব্যে যে 'ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে', একথা খুবই ঠিক। তাঁহার দীর্ঘ সাহিত্য-সাধনায় নানা রূপের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে আমাদের—নানা ঋতুর বহু-বিচিত্র ফসল আমরা পাইয়াছি। এই 'ভিতরের মননজাত অভিজ্ঞতা'-পুষ্ট প্রৌঢ় ঋতুর ফসল আমরা 'বলাকা' হইতে 'পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী'র মধ্য দিয়া নানা পর্যায়ে নানা রূপে পাইয়াছি। বর্তমান পর্যায়ে কবি এই নবতম ফসলের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

কবি তাঁহার কাব্যকে 'নবজাতক' নাম দিয়াছেন। এই নূতন কাব্যে কি নূতনত্ব আছে, তাহা দেখিবার বিষয়। কবিতাগুলি আলোচনা করিলে দুইটি ভাবধারা একটু নূতন বলিয়া মনে হয়। প্রথম, বর্তমান ধনসঞ্চয়সর্বস্ব, পরস্বলোভী

স্বায় ও মনুষ্যত্বপীড়ক উদ্ধত রাষ্ট্র ও সমাজ এবং অর্থগৃধ্নু, সভ্যতার বীভৎসতা ও ধ্বংসলীলার উপর কবির ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি আশা করিতেছেন যে, শীঘ্রই এই পৃথিবীব্যাপী মানবের দুঃখ-দুর্দশার দিন শেষ হইবে, তাহারা নূতন জীবন ও নূতন আলোক পাইবে এবং এই অমঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নবযুগের মানবের বৃহত্তম ও মহত্তম আদর্শের আবির্ভাব হইবে। সেই নবজাতক নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো বহন করিয়া আনিবে। মৃত্যুর পূর্বে 'ঐ মহামানব আসে' গানটিতেও কবি এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিক উপকরণকে তিনি কাব্য-সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, প্রয়োজনের জিনিসকে সৌন্দর্যলোকে উন্নীত করিয়াছেন। এই দুই দিক দিয়া এই কাব্যে একটা নূতনত্বের আভাস পাওয়া যায়। কবির বিশ্বাস আগামী যুগের মানবের মধ্যে এই হানাহানি ও রক্তপাতের পর শান্তি ও মিলনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তবে এগুলি কি কবির পক্ষে সত্যই নূতন? বহুদিন হইতেই তিনি বর্তমান সভ্যতার মনুষ্যত্বধ্বংসী বর্বর স্বরূপের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় তিনি বহু বক্তৃতায় এ কথা বলিয়াছেন, তাঁহার বহু প্রবন্ধেও ইহার উল্লেখ আছে। নানা মারণাস্ত্রের প্রয়োগে এশিয়ায় ও ইয়োরোপের স্থানে স্থানে যে হত্যা ও ধ্বংসের লীলা চলিতেছিল, তাহাতে কবির মনোবেদনা যে অপরিসীম হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। তারপর কবি চিরদিন শান্তির উপাসক ও অবিনশ্বর মানবতায় বিশ্বাসী, পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামীদের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন যে জগতে একদিন স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিবে; সেই ভাবী স্বর্গরাজ্যের অগ্রদূতকে বন্দনা করিবার কল্পনাও তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কবি-মানসের ভাবপরম্পরা হিসাবে ইহাতে খুবই একটা নূতনত্ব নাই। ইহা পূর্বভাবেরই একটা রূপ-প্রকাশ।

কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতাগুলির মধ্যে নূতন সমাজ-চেতনা, বৃহত্তর জনমানস-চেতনা, বাস্তব-চেতনা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন। অবশ্য গত মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় মানুষের অশেষ দুর্গতি, দুর্বলের উপর সবলের পীড়ন, অপরিমেয় ধনলোভ ও রাজ্যলোভে লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোকের বলি প্রভৃতিতে কবি মনোবেদনা পাইয়াছেন; এই সব সমসাময়িক ঘটনায় কবিচিত্তের বিক্ষোভ প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার কাব্যে। কিন্তু বর্তমানে এই কথাগুলি একটি নির্দিষ্ট মতবাদের আনুষঙ্গিক ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কবির পক্ষে এই প্রকার চেতনা কোনো নবলব্ধ জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গীর তাগিদে নয়। রবীন্দ্রনাথের এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কোনো রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় নাই, সকল লোকে

সমান ধনের অধিকারী নয় বলিয়া কবির এ বেদনা বা প্রতিবাদ নয়; কবির বেদনা, সকল মানুষের হৃদয়বিহারী যে নিত্য-মানব, যাঁহার প্রকাশ জ্ঞানে, প্রেমে, ন্যায়ে, সত্যে—মানবতার চরম উৎকর্ষে, তাঁহারই অবমাননায়, তাঁহারই লাঞ্ছনায়। সেই বৃহত্তর বোধের ক্ষেত্রে, সেই আধ্যাত্মিক ঐক্যের ক্ষেত্রে তিনি সকল মানুষের সমতা কামনা করেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ। পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। কেবল শেষ বয়সে নয়, চিরকালই মানুষের উপর অত্যাচার ও পীড়নে কবির মন উত্তেজিত হইয়াছে। অসভ্য আফ্রিকাবাসীর উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের সংবাদই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার প্রেরণা। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ক্ষোভ তাঁহার উপাধি-ত্যাগে অভিব্যক্ত। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সকল প্রকার বন্ধন ও পীড়ন হইতে অন্তরাত্মার মুক্তিই তাঁহার আদর্শ। আর বাস্তব-চেতনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কমবেশি প্রায় সময়েই উপস্থিত আছে। বাস্তবের ভিত্তির উপরই তাঁহার ভাবের কাঠামো নির্মিত হইয়াছে। সীমার মধ্য দিয়াই তাঁহার কাছে অসীমের প্রকাশ হইয়াছে। নরনারীর রূপবর্ণনা ও প্রকৃতির রূপবর্ণনা কবির যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করিয়াছেন, তবে তাহার মধ্যে তিনি অসীম ভাবলোকের ছায়াপাত করিয়াছেন। তারপর গদ্যকবিতার যুগ হইতে এ পর্যন্ত কতো নগণ্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র তাঁহার কথার ক্যামেরাতে ধরা পড়িয়াছে--নেড়ী কুকুর হইতে শালিখ, বেজি পর্যন্তও তাঁহার কাব্যাঙ্গনে আসন পাতিয়া বসিয়াছে।

কিন্তু একথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে তাঁহার কবি-মানস একান্তভাবে ভাবধর্মী--তাঁহার নিজের কথাতেই তিনি 'জন্মরোম্যান্টিক'। রোমান্টিসিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে বাস্তবকে বাদ দেওয়া নয়—বাস্তবকে পরিশুদ্ধ করা, সুন্দর ও বৃহত্তরভাবে রূপ দেওয়া। কবি বাস্তবকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উপরে তাঁহার ভাব-কল্পনার প্রলেপ দিয়া তাঁহার মনোমত মূর্তি গড়িয়াছেন। গদ্য-কবিতার যুগ হইতে 'সানাই' পর্যন্ত আমরা দেখিব তাঁহার কোনো বাস্তব বর্ণনাই খাটি রিয়ালিস্টিকের বর্ণনা নয়—নানা ভাবের লম্বমান আলোছায়ায় খচিত সেই বাস্তব নূতন রূপ ধরিয়াছে। উড়োজাহাজ, বেতার বা ইষ্টিশানও তাঁহার কল্পনার রাজ্যে সৌন্দর্যমণ্ডলের মধ্যে উঠিয়া বসিয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের কাব্যে মানুষের কথা শুনিলেই তাঁহার সমাজতান্ত্রিক মনোভাব ধারণা করা বা দু-একটি আধুনিক কালের জিনিসের নাম শুনিলেই তাঁহার শেষকালে রিয়ালিজমের দিকে মতিগতি ফিরিয়াছে মনে করা সংগত নয়।

'নবজাতক' কাব্যে কবি-কথিত "সৃষ্টি-বদল" খুব বেশি রকম চোখে পড়ে না।

দুই চারিটি কবিতায় একটা নূতন আরম্ভের সূচনা দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা অগ্রসর বা পরিণতিপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গ্রন্থের ভাবধারার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বহু কবিতা এই গ্রন্থে আছে।

এই গ্রন্থখানি বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি এই কয়টি ভাবধারার কবিতা দেখা যায়,—

(১) বর্তমান মনুষ্যত্বনাশী সভ্যতার প্রতি ঘৃণা ও আগামী যুগের নূতন আদর্শের আবির্ভাব-প্রার্থনা,—'প্রায়শ্চিত্ত', 'নবজাতক' প্রভৃতি।

(২) বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিক উপকরণকে কাব্যসৌন্দর্যদান,—'পক্ষীমানব', 'সাড়ে ন'টা', 'ইস্‌টেশন' প্রভৃতি।

(৩) কোনো খণ্ড বাস্তবদৃশ্য বা ঘটনার মধ্যে গভীর সত্যের ব্যঞ্জনা,—'অস্পষ্ট', 'এপারে-ওপারে', 'রাত্রি', 'প্রজাপতি' প্রভৃতি।

(৪) বিশ্বরহস্যজিজ্ঞাসা,—'কেন', 'প্রশ্ন', 'রাতের গাড়ি', 'হিন্দুস্থান', 'রাজপুতানা' প্রভৃতি।

(৫) কবির ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনা,—'শেষ দৃষ্টি', 'ভাগ্যরাজ্য', 'জবাবদিহি', 'জন্মদিন', 'রোম্যান্টিক', 'অবর্জিত', 'শেষ হিসাব', 'জয়ধ্বনি', 'শেষবেলা', 'রূপ-বিরূপ', 'শেষ কথা' প্রভৃতি।

(১) 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, প্রতাপশালী ও দলিত-পিষ্ট, দুর্বল, ভূরিভোজী ও ক্ষুধাতুরদের নিদারুণ সংগ্রামে, পাপের দুর্দহন তাপে, পৃথিবীতে আজ ভূমিকম্পের সৃষ্টি হইয়াছে; নরমাংসাশীরা রক্তপঙ্কে পৃথিবীকে কলুষিত করিয়াছে। কিন্তু এই ধ্বংসলীলার শেষে পৃথিবীতে আবার শান্তি জাগিয়া উঠিবে,—

যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে॥

কবি আশা করেন, এই অমঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নবযুগের নূতন মানব নূতন আদর্শ লইয়া এই রক্তপ্লাবিত ধরণীতে আবার শান্তি-তীর্থ রচনা করিবে। তিনি তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,—

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।

আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি
আগামী প্রাতের শুকতারা সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির-আশ্বাসবাণী,
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝিবা দিতেছে আনি॥ (নবজাতক)

(২) 'পক্ষী-মানব' বর্তমান যান্ত্রিকযুগের একটা প্রতিবাদ। পূর্বে কেবলমাত্র পাখীরা আকাশে উড়িত। গগন, পবন ও মেঘের তাহারা স্বাভাবিক সঙ্গী ছিল। তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান আকাশের সুরে বাঁধা ছিল। মহাকাশের মহাশান্তির সহিত তাহারা এক ছন্দে গাঁথা ছিল। কিন্তু আজ মানুষের স্পর্ধা দুই পাখা মেলিয়া কর্কশ গর্জনে আকাশের শান্তি নষ্ট করিতেছে এবং হিংসা ও মৃত্যুর অনল ঢালিতেছে। আকাশে আজ আর দেবতার আসন পাতা নাই। তাই কবি এই গর্বোদ্ধত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ধ্বংস কামনা করিতেছেন। কাব্যাংশে কবিতাটি সার্থক।

দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,
এই ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে॥
আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন,
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন॥

'সাড়ে ন'টা' কবিতাটি চমৎকার। বেতারের গান কবির নিকট মনে হইতেছে যেন কোনো সুদূর আদর্শলোকের এক অভিসারিকা, গিরি-নদী-সমুদ্র, যুদ্ধ-মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া রাগিণীর দীপশিখা হাতে করিয়া একাকিনী অভিসারে আসিতেছে। যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূতও ঐরূপ কালের সমস্ত বিপ্লব উপেক্ষা করিয়া চিরন্তন ভাসিয়া আসিতেছে।

সেদিনের যে প্রভাতে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল
জীবনে উচ্ছল,
ওর মাঝে তার কোনো আলো পড়ে নাই।
রাজার প্রতাপ সেও ওর ছন্দে সম্পূর্ণ বৃথাই।

যুগ যুগ হয়ে এল পার
কালের বিপ্লব বেয়ে, কোনো চিহ্ন আনে নাই তার।
বিপুল বিশ্বের মুখরতা
উহার শ্লোকের পটে স্তব্ধ করে দিল সব কথা॥

নিতান্ত গন্ধময় একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপারকে কবি কল্পনার আগুনে গলাইয়া উৎকৃষ্ট কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

(৩) 'অস্পষ্ট' কবিতায় কবির বক্তব্য এই যে, বাস্তব ও কল্পনায় মিলিয়া বস্তু-চেতনা সম্পূর্ণ হয়।

বুদ্ধি যাহারে মিছে ব'লে হানে
সে যে সত্যের মূলে
আপন গোপন রসসঞ্চারে
ভরিছে ফসলে ফুলে।
অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে
ফেলিছে রঙিন ছায়া,
বাস্তব যত শিকল গড়িছে,
খেলেনা গড়িছে মায়া॥

'এপারে-ওপারে' কবিতায় রাস্তার একপাশে সাধারণ বাঙালীর জীবনযাত্রা, তাহার মামুলী ও অগভীর চালচলন এবং নিম্নস্তরের আমোদ-আহ্লাদের সহিত অপরপারে কবির গম্ভীর, নিঃসঙ্গ, দার্শনিক তত্ত্বালোচনার জীবনের তুলনা করিয়া কবি পূর্বোক্ত জীবনের সহজ সরল প্রাণপ্রবাহের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

'রাত্রি' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে রাত্রির মধ্যে একটা আদিম অস্পষ্টতা, একটা মায়া ও কামনার আবিলতা যেন লুকানো আছে। দিনের স্পষ্টতা, নিঃসংশয়তা ও শুভ্রতা যেন উহার মধ্যে নাই। তাই রাত্রির প্রতি মনের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে,—

নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন ব'লে ওঠে,
নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত
কঠিন মাটির পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় করে চলা॥

(৪) কবি বিশ্বসৃষ্টিধারার রহস্য চিন্তা করিতেছেন 'কেন' কবিতায়। এই যে গ্রহনক্ষত্র ও মানুষ একবার সৃষ্ট হইতেছে আবার লীন হইতেছে, মহাকাল যে এই সৃষ্টিকে একবার বাঁ হাতে আর একবার ডান হাতে লইয়া পাশা খেলিতেছেন, ইহার কারণ কি ?

'প্রশ্ন' কবিতাতেও কতকটা এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। এই যে গ্রহ-নক্ষত্র অনন্তকাল আকাশে চক্রাকারে ঘুরিতেছে কাহাকে কেন্দ্র করিয়া, আর কেমন করিয়াই বা "আমি" নামে এই সত্তাটির উদ্ভব হইল। এই অজ্ঞেয় সৃষ্টি "আমি" আবার অজ্ঞেয় অদৃশ্যে চলিয়া যাইবে।

'হিন্দুস্থান' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, কালের মন্থর-দণ্ডাঘাতে হিন্দুস্থানের বুকের উপর অভ্রভেদী প্রাসাদের ফেনপুঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে, লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী, শুভ-অশুভের বিচিত্র আলপনা চিত্রিত হইয়াছে, যে স্থানে ঐশ্বর্যের মশাল জ্বলিয়াছিল আবার ক্ষুধিতের অন্নথালিও লুণ্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থানে আজ পীড়িত ও পীড়ন-কারীর বিবাট কবর বিস্তৃত হইয়াছে ; তাহাদের বহু শতাব্দীর মান-অপমানের একত্রে অবসান হইয়াছে।

ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,
বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অন্তর্দিগন্তের
জীর্ণযুগান্তের ॥

'রাজপুতানা'তে কবি বলিতেছেন যে, রাজপুতানা পূর্ব গৌরবের সমস্ত সম্পদ হারাইয়া শ্মশানভস্মের মতো পড়িয়া থাকিয়া কেবল সমালোচকের কৌতুকদৃষ্টির দ্বারা পলে পলে মলিন হইতেছে। তার চেয়ে রাজপুতানা একেবারে ধরাবক্ষ হইতে নিশ্চিহ্ন হইলে ভালো হইত।

তাই ভাবি, হে রাজপুতানা,
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক ;
জনতার চোখ
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।
শংকরের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে।

(৫) 'ভাগ্যরাজ্য' কবিতায় কবি অতি গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিতেছেন। আজো কবির ভাগ্যরাজ্যের একধারে অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা, দুরাশা, কামনার

আদিম রক্তরাগ স্তূপীকৃত আছে। নিজের যে পূর্ণতার মূর্তি তিনি আঁকিয়াছিলেন তাহা অসমাপ্ত রহিয়াছে, পূর্ণ শিল্পসাধনার চেষ্টাও থামিয়া গিয়াছে।

'জন্মদিন' কবিতার বক্তব্য এই যে, জনতা ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথকে নানা অলংকার দিয়া সাজাইলেও লুব্ধ ধূলির গ্রাস হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

তোমাদের জনতার খেলা
রচিল যে পুতুলিরে
সে কি লুব্ধ বিরাট ধূলিরে
এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে।
এ কথা কল্পনা করো যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আঁখিকোণে
সেই কথাই ভাবি আজ মনে।

'রোম্যান্টিক' কবিতায় কবি তাঁহার কবি-মানসের সত্য পরিচয় দিয়াছেন,—

আমারে বলে যে ওরা রোমান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থপথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রঙ লাগায়েছি প্রিয়ে।
... ...
যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই,
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে,
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ রস,
আনি তাঁরি জাদুর পরশ।
জানি তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে—এরে কভু বলে বাস্তবিক?
আমি বলি—কখনো না, আমি রোমান্টিক।

'জয়ধ্বনি' কবিতায় কবি নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটি অকপটে স্বীকার করিতেছেন,—

বলি বার বার
পতন হয়েছে যাত্রাপথে
ভগ্ন মনোরথে,

বারে বারে পাপ
ললাটে লেপিয়া গেছে কলঙ্কের ছাপ ;
... ...
মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটিনি করিতে প্রতিকার
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।
অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।

আজ মৃত্যুর সম্মুখে দণ্ডায়মান কবির অকপট আত্ম-সমালোচনা চলিয়াছে।

'রূপ-বিরূপ' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে তাঁহার কাব্য চিরকাল সুন্দরের উপাসনা করিয়াছে, তাঁহার 'সুকুমারী লেখনী' পরুষ, উৎকট ও নিষ্ঠুরকে আপন চিত্রশালায় সঞ্চয় করে নাই, তাই তাহার সংগীতে তালভঙ্গ হইয়াছে। কারণ 'সুন্দর ও কুৎসিত', 'রূপ ও বিরূপে'র নৃত্যই সৃষ্টিরঙ্গভূমে চিরকাল চলিতেছে। একটাকে বাদ দিলে সংগীত পরিপূর্ণ হয় না। সেজন্য কবির শেষ প্রার্থনা,—

তাই আজ বেদমন্ত্রে, হে বজ্রী, তোমার করি স্তব,
তব মন্ত্ররব
করুক ঐশ্বর্যদান,
রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান,
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার,
বাণী-বিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার।

'শেষকথা' কবিতাটি বিদায়ের প্রশান্তি ও স্তব্ধ বেদনায় করুণ-মধুর,—

এ ঘরে ফুরাল খেলা
এল দ্বার রুধিবার বেলা।
... ...
জানি না বুঝিব কি না প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নতুন রঙে আঁকিবে কি তুমি শিল্পী কবি।

৩৯

সানাই

(আষাঢ়, ১৩৪৭)

সৃষ্টিধারা ও মানবসত্তার তত্ত্বনিরূপণ, আসন্ন মৃত্যুর পটভূমিকায় জীবন ও মৃত্যুকে পুনঃ পুনঃ পর্যালোচন ও নানা গভীর দার্শনিক চিন্তার জটিলতা হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়া কবি আবার তাঁহার স্বচ্ছন্দ ও সহজ কল্পনার লীলার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন 'সানাই' কাব্যগ্রন্থে। যে স্বাভাবিক সুর ও ছন্দে তাঁহার ভাবনা-কামনা-কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে গীতিকাব্যের সুর ও ছন্দ। গীতিকাব্যের সেই ভঙ্গী ও সুর 'সানাই'-এ অনেকখানি ফিরিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্য-প্রেমের যুগটি যেন আবার চোখে পড়িতেছে এবং বিদায়-বেলার গোধুলি-আলোর ছায়া সেই পুরাতন প্রেম ও মাধুর্যের স্মৃতিকে অপরূপ স্বপ্নমায়ায় মণ্ডিত করিয়াছে। বহুকালবিস্মৃত তাঁহার কাব্যরসোৎসারিণী লীলাসঙ্গিনীকে মনে পড়িয়াছে। কিন্তু আজ আর তাহার সে বেশ নাই, সে লীলা নাই। মহাকালের তাণ্ডবনৃত্যে সেই সুন্দরী নর্তিনীর 'ঝংকৃত কিঙ্কিণী' ছিন্ন হইয়াছে, 'সীমন্তের সীঁথি' ও কণ্ঠহার চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—

আভরণশূন্য রূপ
বোবা হয়ে আছে করি চুপ,
ভীষণ রিক্তত্য তার
উৎসুক চক্ষুর 'পরে হানিছে আঘাত অবজ্ঞার।
নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে, মুগ্ধ হস্তে গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা।
মোহনদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হোত রসের প্লাবন
মত্ততার শেষ পালা আজি সে করিল উদ্‌যাপন।

(বিপ্লব)

ডমরুধ্বনির মধ্যে তাহার স্খলিত কঙ্কণে আজ নূতন সংকেত বিচ্ছুরিত হইতেছে।

যে লীলাসঙ্গিনীকে তিনি 'পরিশেষ' হইতেই বিদায় দিয়াছিলেন তাহাকে স্মরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু সে তো আর সেদিনের সে নয়, তিনিও আর

সেদিনের তিনি নন। কাল তাঁহাকে আর তাঁহার প্রিয়াকে আজ ভিন্নরূপে গড়িয়াছে। সেই সৌন্দর্য-মাধুর্যের জীবনের জন্য দীর্ঘশ্বাসের সূক্ষ্ম ছায়া 'সানাই'-এর অনেকগুলি কবিতাকে করুণ-মধুর করিয়াছে। এই দিক দিয়া 'পূরবী'র সঙ্গে ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে।

ঋষি রবীন্দ্রনাথের নয়, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের নয়, কবি রবীন্দ্রনাথের এই 'সানাই' গ্রন্থই শেষ দান। তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনা ও কাব্য-সাধনা দুইটি প্রধান অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইয়াছে—একটি লীলাবাদের অনুভূতি, অপরটি সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতি। 'দূরের গান' ও 'কর্ণধার' কবিতায় প্রথমটির একটু ক্ষীণ আভাস ও বহু কবিতায় দ্বিতীয়টির পরিচয় দিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদায় লইলেন। এই গ্রন্থে রহিল তাঁহার শেষ পরিচয়।

'এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলিয়া' সেই অভিসারিকা আজ আসিয়াছে বটে ডালিতে পুষ্প-অর্ঘ্য সাজাইয়া, কিন্তু কবির তাহা গ্রহণ করিবার কোনো ক্ষমতা নাই।

হে দূতী, এনেছ আজ গন্ধে তব যে ঋতুর বাণী
নাম তার নাহি জানি।
মৃত্যু অন্ধকারময়
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয়।
তারি বরমাল্যখানি পরাইয়া দাও মোর গলে
স্তিমিতনক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গনতলে;
এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে॥ (শেষ অভিসার)

'দূরের গান' কবিতায় কবি বলিতেছেন, কোন সুদূরবাসী এক অজানা নিশীথ-রাত্রে তাঁহার জীবন-চেতনাকে এই মর্ত্যে পাঠাইয়াছিল। এ জগতে আসিয়া সেই অজানার বিরহবেদনাই তিনি চিরকাল অনুভব করিয়াছেন। সকল কথায় সকল গানে তিনি সেই দূরের অজানাকে খুঁজিয়াছেন—তাহার স্বপ্ন দেখিয়াছেন,—

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে;
আজিও চলেছি তার টানে।

বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।
ওগো দূরবাসী,
কে শুনিতে চাও মোর চিরপ্রবাসের এই বাঁশি,—
অকারণ বেদনার ভৈরবীর সুরে
চেনার সীমানা হ'তে দূরে
যার গান কক্ষচ্যুত তারা
চিররাত্রি আকাশেতে খুঁজিছে কিনারা॥

'কর্ণধার' কবিতায় কবির বক্তব্য এই যে তাঁহার জীবন-তরণীর কর্ণধার জোয়ারের মুখে এই তরীখানি ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, আবার মৃত্যু-ভাটায় কোথায় অজানা, রহস্যময় স্থানে লইয়া যাইবেন। ভাটার মুখে জীবন-সন্ধ্যার গোধূলিতে সমস্ত জগৎ স্বপ্নময় বলিয়া মনে হয়। অন্ধকারের মধ্যে বিরহের বেহাগ রাগিণী বাজে, নিঃশব্দ রাত্রির বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের মধ্যে চিরন্তন বিরাট মনের বিরহগান ধ্বনিত হয়। যখন জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাঁহার কর্ণধার 'অন্তিম যাত্রার' 'পাল' ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেন, তখন তিনি সেই জ্যোতির্ময় অচিন্ত্যকে অসীম অন্ধকার বলিয়া ব্যক্ত করিতে চাহেন। কর্ণধার এই মৃত্যু-ভাটায় জীবনতরী কোন্ রহস্যময় ঘাটে লইয়া যাইতেছেন,—

ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবনতরী মৃত্যুভাটায়
কোথায় করো পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার,
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার॥

'সানাই'-এর মধ্যে মোটামুটি এইসব ভাবের কবিতা লক্ষ্য করা যায়,—

(ক) কোনো ঘটনা, দৃশ্য বা স্মৃতি-চিত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্যে গভীর ভাব ও সত্যোপলব্ধি,—'সানাই', 'অনসূয়া', 'অপঘাত', 'পরিচয়', 'মানসী' প্রভৃতি।

(খ) প্রেমমূলক,—'মায়া', 'অদেয়', 'আহ্বান', 'শেষ কথা', 'অত্যুক্তি', 'নারী', 'দূরবর্তিনী', 'অসম্ভব', 'গানের মন্ত্র' ইত্যাদি।

(গ) মনের ক্ষণিক অনুভূতি বা কল্পনার রঙীন খেয়ালের সূক্ষ্ম, ব্যঞ্জনামুখর রূপায়ণ,—'অনাবৃষ্টি', 'নতুন রঙ', 'গানের খেয়া', 'অথবা', 'বিদায়', 'যাবার আগে', 'পূর্ণ', 'কৃপণা', 'ছায়াছবি', 'দেওয়া নেওয়া', 'দ্বিধা', 'আধোজাগা', 'ভাঙন', 'গানের জাল', 'মরীয়া', 'গান', 'বাণীহারা' ইত্যাদি।

(ক) এই শ্রেণীর সুদূরের রহস্যমণ্ডিত ও গূঢ়তম সত্যের ব্যঞ্জনামুখর কবিতাগুলি রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়ে অপূর্ব মাধুর্য ও উজ্জ্বলতায় আমাদিগকে মুগ্ধ করে। কবির অসামান্য রোমান্টিক প্রতিভা কঠিন নীরস বাস্তবকে অসীম ভাবলোকে লইয়া গিয়াছে, লোহাকে করিয়াছে সোনা, ধূলিকণাকে পরিণত করিয়াছে অমৃত বিন্দুতে। এই ভাবধর্মের নিবিড়তা ও গভীরতা শেষের দিকের কাব্যে ক্রমেই বেশি হইয়াছে।

এই গ্রন্থের 'সানাই' কবিতাটি এই শ্রেণীর কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেই কবিতা হইতেই বোধ হয় এই গ্রন্থের নাম হইয়াছে 'সানাই'। বিবাহ-বাড়ির ভোজের আয়োজন, অতিথিদের লোভ, চাকর-বাকর ও কর্মীদের ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটাছুটি, পারিপার্শ্বিকের কুশ্রীতা,—ধানের কলের ধোঁয়া ও ধানপচানির গন্ধ প্রভৃতির মধ্যে যখন সানাই বাজিয়া উঠিল, তখন এই সব 'ছন্দভাঙা অসংগতি' মাঝে 'নিবিড় ঐক্যমন্ত্র' ধ্বনিত হইল—মনে হইল কোনো অমর্ত্য লোক হইতে, সৃষ্টির কোনো মূল উৎস হইতে এই আনন্দধারা ঝরিয়া আসিয়া সংসারের সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করিতেছে,—

মনে ভাবি এই সুর প্রত্যহের অবরোধ পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।

ইহাই অসামান্য গীতধর্মী রোম্যান্টিক প্রতিভার দৃষ্টিভঙ্গী। সমস্ত অসংগতির মধ্যে সংগতি, বেসুরের মধ্যে সুর, নানা খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডতা তিনি চিরদিন

উপলব্ধি করিয়াছেন। সারা জীবন তিনি এই পরিপূর্ণ সুরের, ঐক্যের, অখণ্ডের সাধনা করিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্টি-চেতনা এক অখণ্ড সুরের অনির্বচনীয় মূর্ছনারূপে তাঁহার চোখে প্রতিভাত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার কবি-মানসের সত্য পরিচয়।

'অনসূয়া' কবিতাতেও স্তূপীকৃত আবর্জনা, ক্লেদ-পঙ্ক ও কুশ্রীতার মধ্যে 'জন্ম-রোম্যান্টিক' কবি অতীতযুগের প্রণয়িনীদের নির্বাস-সুরভিত প্রেমের অমরাবতী রচনা করিয়াছেন। কবি এক নোংরা বস্তীর বীভৎস আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেন বটে কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখেন এক অপূর্বসুন্দর আদর্শ রাজ্যের,—

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে পথ জানে—
মাধবী'র অদৃশ্য আহ্বানে।
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা
আকাশ-কুসুম-কুঞ্জবনে
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার বার।

অতীতের কাব্যের আড়ালে যে মালবিকা অর্ধাবগুণ্ঠনে ছিল, কবির হৃদয়প্রাঙ্গণে আজ সে অভিসারে আসিয়াছে, কালো দুটি চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, কবির কণ্ঠে সে প্রথম প্রিয়নাম শুনিয়া আধফোটা মল্লিকার মালা কবির হাতে তুলিয়া দিল। কবি এই চিত্র-আঁকায় বিভোর হইয়া আছেন, কিন্তু এই স্বপ্নরাজ্য ছাড়িয়া আবার তাঁহাকে বাস্তবের মধ্যে প্রকাশ করিতে হইবে,—

স্বপ্নের বাঁশিটি আজ ফেলে তব কোলে
আর বার যেতে হবে চ'লে
সেথা. যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়
দিন চলে যায়।

'পরিচয়'-এ কবি বলিতেছেন যে, প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়েই ভালোবাসে একটা আদর্শকে, সেই আদর্শের প্রতীকরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়—নরনারীর প্রেমের মধ্যে আছে প্রেমের অতীত সেই আকর্ষণীয় বস্তু।

আবার সেই তো দেখতে পেলেম
আজো তোমার স্বপ্ন-ঘোড়ায় চড়া
নিত্যকালের সন্ধান সেই মানসসুন্দরীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরের মাঠে।
দেখতে পেলেম ছবি
এই বিশ্বের হৃদয়মাঝে
বসে আছেন অনির্বচনীয়া
তুমি তাঁরি পায়ের কাছে বাজাও তোমার বাঁশি।
... ...
আমি কি নই সেই দেবীরই সহচরী
ছিলাম না কি অচিন রহস্যে
যখন কাছে প্রথম এসেছিলে ?

(খ) এই সব কোমল প্রেমকবিতা রবীন্দ্রনাথের চিরসিদ্ধ ভাবুকতার মায়া-রশ্মিতে রহস্য-মধুর। বাস্তবের ঊর্ধ্বে রোমান্টিক প্রেমের জগতে—স্বপ্নরাজ্যে কবির অভিযান।

জ্বেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ
বিজন ঘরের কোণে।
নামিল শ্রাবণ, কালো ছায়া তার
ঘনাইল বনে বনে।
বিস্ময় আনো ব্যগ্র হিয়ার পরশ প্রতীক্ষায়
সজল পবনে নীল বসনের চঞ্চল কিনারায়,
দুয়ার বাহির হতে আজি ক্ষণে ক্ষণে
তব কবরীর করবীমালার বারতা আসুক মনে।
(আহ্বান)

তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন্ অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত,
সে যে অঙ্গের সংগীত।
আমি তারে মনে জানি সত্যেরো অধিক,
সোহাগ-বাণীরে মোর হেসে কেন বলো কাল্পনিক।
(অত্যুক্তি)

স্বপ্নরূপিণী তুমি
আকুলিয়া আছ পথ-খোওয়া মোর
প্রাণের স্বর্গভূমি।

নাই কোনো ভাব, নাই বেদনার তাপ,
ধূলির ধরায় পড়ে না পায়ের ছাপ।
তাই তো আমার ছন্দে
সহসা তোমার চুলের ফুলের গন্ধে
জাগে নির্জন রাতের দীর্ঘশ্বাস,
জাগে প্রভাতের পেলব তারায়
বিদায়ের স্মিত হাস।
(মায়া)

পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্ত্যের মদিরা মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ।
তারি চিহ্ন যেখানে সেখানে
কাব্যে গানে,
ছবিতে মূর্তিতে,
দেবালয়ে দেবীর স্তুতিতে।
কালে কালে দেশে দেশে শিল্পস্বপ্নে দেখে রূপখানি
নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি।
দুর্বলতা নাহি তাহে, নাহি ক্লান্তি,—
টানি লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি
আদি স্বর্গলোক হতে নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
উদ্ভাসিত ছিলে তুমি, অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণ লোকে
সেই ছবি আনিতেছে ধ্যান ভরি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্য সহচরী।
(নারী)

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে;
যূথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণীবাঁধনের মালায় পেতেম যে-সংবাদ।
এই তো জেগেছে নব মালতীর সে সৌরভ—
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।
ভাবনার ভুলে কোথা চলে যাই অন্যমনে
পথ-সংকেত কত জানায়েছে যে বাতায়নে।

শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের আভাসে জড়িত আবারি গান।
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

(অসম্ভব)

(গ) বহুদিন পরে রবীন্দ্রসাহিত্যে এই রকম ছোট লিরিকের দর্শন মিলিল। 'বলাকা' হইতে অনিয়মিত ছন্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রসারণের মধ্যে যে গুরু-গম্ভীর ভাবের প্রবাহ ছুটিয়াছিল, এইরূপ কবিতার অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও ভাবের ইঙ্গিতময়তার কোনো স্থান ছিল না তাহার মধ্যে। এই সব কবিতায় একটা লঘু মৃদু সুরের মূর্ছনার মধ্যে এক একটি চঞ্চল ভাব অপূর্ব ব্যঞ্জনা-মুখর রূপ ধারণ করিয়াছে।

তুমি গো পঞ্চদশী
শুক্লা নিশার অভিসার পথে
চরম তিথির শশী।
স্মিত স্বপ্নের আভাস লেগেছে
বিহ্বল তব রাতে।
ক্বচিৎ চকিত বিহগ কাকলী
তব যৌবনে উঠিছে আকুলি
নব আষাঢ়ের কেতকী গন্ধ-
শিথিলিত নিদ্রাতে।
যেন অশ্রুত বনমর্মর
তোমার বক্ষে কাঁপে থরথর।
অগোচর চেতনার
অকারণ বেদনার
ছায়া এসে পড়ে মনের দিগন্তে,
গোপন অশান্তি
উছলিয়া তুলে ছলছল জল
কজ্জল-আঁখিপাতে॥ (পূর্ণা)

এই যে একেবারে 'মানসী-ক্ষণিকা'র যুগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অদ্বিতীয় রূপদক্ষ শিল্পীর প্রতিভা অশীতিবৎসরেও অম্লান রহিয়াছে!

৪০

রোগশয্যায়

(পৌষ, ১৩৪৭)

এইবার আমরা রবীন্দ্র-কাব্যের এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম, এক নূতন রূপের সম্মুখীন হইলাম। যে-মৃত্যু সম্বন্ধে কৈশোর হইতে কবির ভাব-কল্পনা-চিন্তা বিচিত্র কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে, নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যাহার ভীষণতা, রহস্য ও মাধুর্য তিনি অনুভব করিয়াছেন, আজ সত্য-সত্যই সেই মৃত্যুর সম্মুখীন হইলেন। ধরণীর উপর তাঁহার জীবনের শেষ বৎসর আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েক বৎসর পূর্বে নিদারুণ ব্যাধিতে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা তাঁহার হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ভাব-কল্পনা প্রবলভাবে আলোড়িত হইয়াছিল—তাহার ফল আমরা 'প্রান্তিক'-এ দেখিয়াছি। কিছুদিন সেই ভাবচক্রের মধ্যে থাকিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাভাবিক কবি-মানস ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। এবার মহাপ্রস্থানের পূর্বে, আট-নয় মাস ধরিয়া কবি ব্যধিগ্রস্ত অবস্থায় কাটান। দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে ও পরে কিঞ্চিৎ আরোগ্যের পথে আসিয়া রোগক্লিষ্ট দুর্বল দেহ-মন লইয়া যে কবিতাগুলি লেখেন, তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে শেষের চারিখানি গ্রন্থে—'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা'। ইহাদের মধ্যে ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের এতখানি মিল আছে যে ইহারা একই গ্রন্থের চারিটি অধ্যায় বলিয়া মনে হয়।

ব্যাধির যন্ত্রণা, মৃত্যুদূতের আনাগোনা, অসুস্থ দেহমনের নানা বিক্ষোভ, বিকারের অস্থির দৃষ্টিবিভ্রম, দেহের ও জীবনের নানা সঞ্চয়ের ক্ষণভঙ্গুরতা, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সত্যরূপ, জীবনের চরম সার্থকতা, মানবাত্মার অমরত্বে অবিচলিত বিশ্বাস ও তাহার জয়-ঘোষণা, ধরণীর সৌন্দর্যকে নূতন দৃষ্টিতে দেখা, মানবের স্নেহ-প্রেমের নূতন মূল্যনির্ধারণ প্রভৃতি কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে এই চারিখানি গ্রন্থে।

একেবারে শেষের এই কবিতাগুলির একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহাদের মধ্যে কল্পনার সেই জলস্থলসঞ্চারী লীলা নাই, প্রকাশের সচেতন শিল্পনৈপুণ্য নাই, ভাবের নানা বৈচিত্র্যের সমারোহ নাই,—আভাস-ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার মোহসৃষ্টি নাই,—এখানে কবির দৃষ্টি একেবারে স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট, অনুভূতির প্রকাশ একেবারে প্রত্যক্ষ। ভাষা বাহুল্যবর্জিত, নিরাভরণ রূপ ধারণ করিয়াছে, সেই অলংকারের চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য আর নাই, পূর্বের অনিয়মিত মুক্ত ছন্দই ব্যবহৃত হইতেছে বটে,

কিন্তু চরণের দীর্ঘতা ও নানা বৈচিত্র্য কমিয়া গিয়াছে, অন্ত্যমিল অনেকস্থলে অনুপস্থিত। কবির কাব্য তাঁহার চিরদিনের বহুমূল্য রাজবেশ ছাড়িয়া যেন যোগীর নির্মল, পবিত্র, তপোজ্যোতি-বিচ্ছুরিত গৈরিক পরিধান করিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই, এ-যুগের কাব্য তাহার অন্তর্হিত শক্তি হারায় নাই। কাব্যের শক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় মানুষের হৃদয়জয়ে। আমরা এতদিন রবীন্দ্র-কাব্যের ইন্দ্রজালের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া মুহুর্মুহুঃ মুগ্ধ, বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেছিলাম, আজ চিরবিদায়ের গোধূলি-লগ্নে, সে গণ্ডী ভাঙিয়া দিয়া কবি তাঁহার কাব্যের এক নূতন মূর্তি আমাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের সামনে উপস্থাপিত করিলেন। এই উদাসীন, প্রশান্ত, গম্ভীর, প্রসন্ন, অশ্রু-ছলছল মূর্তি আমাদের হৃদয়ে নূতন আনন্দবেদনার রেখাঙ্কন করিতেছে। এ তো ভাব-কল্পনার লীলা-বিলাস নয়, এযে দৃষ্ট-সত্যের নিরাভরণ বাণীরূপ; এ তো বিচিত্র ছন্দের মনোহর নৃত্য নয়, এযে স্বল্পাক্ষর মন্ত্রের উচ্চারণ-ধ্বনি; ইহার আবেদন তো চিত্তবিনোদনে নয়,—নিগূঢ়-অধ্যাত্ম-অনুভূতির স্বরূপ-প্রদর্শনে।

এই কবিতাগুলি আর এক দিক দিয়াও আমাদিগকে আকর্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে আমরা মানুষ রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের একটা পরিচয় পাই। অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ কবি দারুণ রোগ-যন্ত্রণাকে জয় করিয়া কী গভীর ও অবিচলিত বিশ্বাসে আত্মার জয়ঘোষণা করিয়াছেন; 'দেহ-দুঃখ-হোমানলে' পুড়িয়া তাঁহার অন্তরতম সত্তার অপরাজেয় বীর্যের প্রমাণ দিয়াছেন। এ তো কাব্যের ভাববিলাস নয়, মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া এযে অকৃত্রিম, গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতি। আত্মভোলা শিশুর সহজ অথচ গভীর আনন্দের সঙ্গে কবি ধরণীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়াছেন, রোগশয্যার শুশ্রূষাকারিণীদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং ক্ষোভহীন, ধীর, প্রশান্ত চিত্তে জীবন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

চিরকাল উপনিষদের রসপুষ্ট কবি, উপনিষদের বাণীকে উপলব্ধি করিয়া ঋষির মতো মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃতলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। জীবনের এই পর্বে তাঁহার দেহেরও একটা পরিবর্তন হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী তাঁহার চমৎকার বইখানিতে এক জায়গায় লিখিয়াছেন,—

"এই নয় মাসে ধীরে-ধীরে চেহারা বদলে গিয়েছিল, তিনি শীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু তাতে তাঁকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখাত না, তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা একটি করুণায় পূর্ণ হয়েছিল, তাঁকে ইদানীং মনে হোত তপঃক্লিষ্ট ঋষি, আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্যে দিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে, মুখে ঠিকরে পড়ত একটি প্রীতি ও শান্তির ধারা।" (নির্বাণ, পৃঃ ৪১)

'রোগশয্যায়'-এ ভাবের দুইটি মূল ধারা প্রবাহিত হইয়াছে—একটি ব্যাধির যন্ত্রণা ও তজ্জনিত দেহমনের নানা প্রতিক্রিয়া, অপরটি মৃত্যু ও জীবনের স্বরূপদর্শন ও মানবাত্মার জয়ঘোষণা।

নিদারুণ ব্যাধির আক্রমণ ও আরোগ্যের কাহিনী বোধহয় আর কোথাও কাব্যাকারে গ্রথিত হয় নাই। বিশ্বসাহিত্যে এ ধরণের কাব্য মনে হয় সম্পূর্ণ নূতন।

রোগ-কাব্য-রচনায় অগ্রসর হইয়া অতিমাত্রায় শিল্প-সচেতন কবি বুঝিতে পারিতেছেন যে ব্যাধিজর্জর কবির কল্পনা ক্ষীণ, ভাষা আড়ষ্ট ও ছন্দ শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাই তাঁহার সংকোচ হইতেছে,—

> তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
> তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে ;
> কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ-তালে।

তবুও মহাকবির প্রকাশ-ক্ষুধা ব্যাধির যন্ত্রণাকে জয় করিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কল্পনা, ভাষা ও ছন্দের দৈন্য ঢাকিয়া গিয়াছে বক্তব্যের মহিমা, উপলব্ধির আন্তরিকতা ও দৃষ্টির স্বচ্ছতায়।

৫নং কবিতায় কবি দেহের উপর তীব্র রোগ-যন্ত্রণার ছবি আঁকিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবাত্মার অপরাজেয় বীর্য ও সহিষ্ণুতার কথা বলিয়াছেন। কবি অনুভব করিতেছেন, মহাবিশ্বতলে যেন যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র অবিরাম চলিতেছে, গ্রহতারা চূর্ণ হইতেছে, সেই উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ প্রচণ্ড আবেগে দিগ্-বিদিকে নানা অস্তিত্বের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে,—

> মানুষের ক্ষুদ্র দেহ
> যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।
> সৃষ্টি ও প্রলয়-সভাতলে—
> তার বহ্নিরসপাত্র
> কী লাগিয়া যোগ দিল বিশ্বের ভৈরবীচক্রে
> বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা—কেন
> এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
> রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত

কিন্তু মানবের আত্মা অপরাজেয়,—

> দেহ-দুঃখ-হোমানলে
> যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
> জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
> তার কি তুলনা কোথা আছে।

এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে
হেন জয়যাত্রা—

৭নং কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার রুগ্ণশয্যার পাশে যখন স্নেহময়ী শুশ্রূষাকারিণীকে দেখেন তখন মনে হয়, তাঁহার এই জর্জর প্রাণ-চেতনার সহিত বিশ্বের প্রাণধারার সাহায্য-সূত্র গাঁথা আছে, কিন্তু যখন সে চলিয়া যায় তখন মনে হয় জগৎ তাঁহার প্রতি উদাসীন হইয়া নীরব হইয়া আছে, মন তাঁহার আতঙ্কে পূর্ণ হয়।

৯নং কবিতায় তাঁহার রুগ্ণ মনের কাব্যসৃষ্টির অপূর্ণতার কথা বলিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন আদিম অন্ধকারে যখন প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন যেরকম বিরূপ, কদর্য, বিকলাঙ্গ, পঙ্গু বস্তুপিণ্ড সব সৃষ্ট হইয়া অন্ধকারে অপেক্ষা করিতেছিল, সেইরূপ অর্ধ-অচেতনার কুয়াশাবৃত কবি-মনে চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা ও প্রকাশ-ক্ষুধার নানা অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খল, অদ্ভুত ছায়ামূর্তি রচিত হইতেছে। কি করিয়া কবি-মনে এই সব অপূর্ণ মূর্তি রচিত হইতেছে, তাহার বর্ণনাটি একেবারে কবির প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফল।

রোগীর দুঃখ-বেদনার মধ্যেও যে প্রিয়জনের সেবা-শুশ্রূষায় একটু আনন্দের স্পর্শ আছে, ১৪নং কবিতায় কবি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। রোগীর ঘরের বদ্ধ আবহাওয়া এবং সাধারণ জীবন-যাত্রা হইতে বিছিন্ন সংকীর্ণ জীবনযাত্রার সহিত নদীর সাধারণ স্রোতোধারা হইতে বিচ্ছিন্ন শৈবাল-গঠিত ক্ষুদ্র দ্বীপের তুলনা করিয়াছেন। এই সীমাবদ্ধ জীবনে প্রিয়জনের মমতাভরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচর্যা বিপুল দুঃখের মধ্যেও অমৃতের আস্বাদ দেয়। কিন্তু তাহাও একদিন শেষ হইবে,—

একদিন বন্যা নামে, শৈবালের দ্বীপ যায় ভেসে ;
পূর্ণ জীবনের যবে নামিবে জোয়ার
সেই মতো ভেসে যাবে সেবার বাসাটি
সেথাকার দুঃখপাত্রে সুধাভরা এই ক'টা দিন।

এই দুঃখ-বেদনা ভেদ করিয়া মানবাত্মার অমরত্বের নিঃসন্দেহ বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে,—

রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোকবিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি
মনে ভাবি কী তার নির্দেশ।

পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেই মতো যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকার বুদ্বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে ॥ (২০নং)

কবির দেহবদ্ধ যে চৈতন্য, নিখিল বিশ্ব ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর চৈতন্যের সহিত তাহার পূর্ণ আত্মীয়তা,—

যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়
আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা-কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃতরূপে,
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি' মর্মে মর্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহতারা
অস্খলিত ছন্দঃসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে ॥ (২৮নং)

আজ কবি সদ্য রোগমুক্ত হইয়া এই নিখিল বিশ্বের প্রাণ-লীলার সহিত তাঁহার নিবিড় একপ্রাণতা অপূর্ব আনন্দ-শিহরণের সঙ্গে অনুভব করিতেছেন,—

খুলে দাও দ্বার,
নীলাকাশ করো অবারিত,
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়;

আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক্ মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্পশ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে ;
তারি পুণ্যঅভিষেকে করি আজ স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ঐ নীলিমার বুকে ॥ (২৭নং)

৪১

আরোগ্য

(ফাল্গুন, ১৩৪৭)

'আরোগ্য'-এ সদ্য রোগমুক্ত কবির এক নূতন মানস উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মনের মনের উপর হইতে ব্যাধির কুহেলিকা সরিয়া গিয়াছে। চিরদিনের স্পর্শকাতর মনের অনুভূতি হইয়াছে আরো তীক্ষ্ণতর। নানা ভাব-কল্পনা-চিন্তার হাত হইতে মুক্ত হইয়া কবি শিশুর মতো সহজ ও বিস্ময়-বিহ্বল হইয়াছেন। এই ব্যাধির প্রসাদে কবি নবজন্মলাভ করিয়া নূতন চোখে আজ ধরণীর সৌন্দর্য ও মানবের স্নেহ-প্রেমকে দেখিতেছেন।

ধরণীর সৌন্দর্য ও মানবের স্নেহ-প্রেমকে নূতন চোখে দেখা, এবং চরম সত্য উপলব্ধি করিয়া ধীর, প্রশান্ত ও কৃতজ্ঞ চিত্তে চিরবিদায়ের জন্য প্রস্তুতি—এই দুইটি ভাবই বিশেষ করিয়া 'আরোগ্য'-এ ব্যক্ত হইয়াছে।

মৃত্যু-রাত্রির লাঞ্ছনা কাটাইয়া প্রভাতের প্রসন্ন আলোকের মধ্যে 'জীর্ণদেহ-দুর্গ-শিরে' আপনার 'দুঃখবিজয়ীর মূর্তি'—নিজের সত্য-স্বরূপকে কবি দেখিলেন। এই নবলব্ধ জ্ঞানে চক্ষুর দৃষ্টি পরিবর্তিত হইল। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে কবি আবার নূতন করিয়া দেখিতেছেন। এ দেখা ভাব-কল্পনা-চিন্তার নানা বর্ণচ্ছটার মধ্য দিয়া নহে—একেবারে মুক্ত, সহজ, প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখা। আজ পৃথিবী সুন্দর, মানুষ সুন্দর, পশুপক্ষী তরুলতা সুন্দর—ইহাদের মধ্যে সত্যের আনন্দরূপ অভিব্যক্ত। এ অনুভূতি কবির পূর্ব-পূর্ব যুগের কাব্যেও পাওয়া গিয়াছে,

কিন্তু এ যুগের অনুভূতির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আসিয়াছে কোনো অতীন্দ্রিয় রহস্যবোধের মধ্য দিয়া নয়, কোনো তত্ত্ববিচার বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মারফতে নয়, একেবারে দেহের ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ অনুভব-ক্রিয়ার সাহায্যে। সরল শিশুর মতো অসীম কৌতূহল, বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে কবি ইহা অনুভব করিয়াছেন।

আজ কবির চোখে দ্যুলোক-ভূলোক মধুময়, মধুময় এই মাটির ধূলিতে তাঁহার শেষ প্রণাম নিবেদন করিতেছেন,—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।......
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এই ধুলায় রাখিনু প্রণতি॥ (১নং)

প্রতি প্রভাতে নূতন আলোক-স্নানে এই ধরণীর বক্ষে অসংখ্য রসমূর্তি রচিত হইতেছে, আলোছায়ার স্পন্দনে প্রকৃতির নানা রূপে অসীম সৌন্দর্য ঝলমল করিতেছে, পাখীদের গানে জীবনলক্ষ্মীর প্রশস্তি গীত হইতেছে, আর প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত স্নেহ-প্রেম মিশিয়া সংসারকে মধুময় করিয়াছে।

সব কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন। (২নং)

এই নূতন দৃষ্টির সম্মুখে জীবনের পুরাতনস্মৃতিগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেই পদ্মার ভাঙা পাড়ির নীচে নৌকাবাস, পাল-তোলা জেলে-ডিঙি, ঘোমটা-পরা পল্লীমেয়েদের নদীর ঘাটে আসা-যাওয়া, ছায়ায়-ঢাকা আমবাগানের মধ্য দিয়া বাঁকাপথ, পুকুরের ধারে সর্ষের ক্ষেত, হাটের দিনে নদীর ঘাটে, প্রাচীন অশথতলায় পারগামী হাটুরেদের ভিড়, গঞ্জের টিনের চালাঘর. গুড়ের আড়ত, পাটবোঝাই গাড়ি, ঝুড়ি-কাঁখে মেছুনী, ধানের ক্ষেত, মোষের গলা ধরিয়া চাষীর ছেলের সাঁতার প্রভৃতি বাংলা-পল্লীর দৃশ্য, তর্মুজের ক্ষেতে লাঠি-হাতে কৃষাণ-বালকের ছাগল-খেদানো, শাকের-সন্ধানে-ফেরা পল্লীনারী, গুনটানা মাল্লার সারি, ইঁদারার জলটানা প্রভৃতি পশ্চিমের পল্লীদৃশ্য একের পর এক ছায়াছবির মতো তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে। এই মধুময় মাটির মধুময় স্মৃতি এগুলি।

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার-রবে এনে দেয় মনে ॥ (৪নং)

এ ধরণী ও এই জীবনের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদের ক্ষীণ বেদনাটুকু কবি অসীম সান্ত্বনায় নিঃশেষ করিতেছেন ৮নং কবিতায়। অনন্তের সিংহদ্বারে যে রাগিণী বাজিতেছে, তাহারই তো মূর্ছনার সঙ্গে মিশিয়াছে 'এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর',—'স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘযাত্রা-পথে'। সেই মূল রাগিণীর সিংহদ্বারের অভিমুখেই তো এই পান্থশালা হইতে তাঁহার যাত্রা।

৯নং কবিতায় কবির ধ্যানদৃষ্টি একেবারে সৃষ্টি-রহস্যের মূলে পৌঁছিয়াছে। কবি বলিতেছেন, এই যে বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে, অনাদি অদৃশ্য হইতে অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্রের আতসবাজির খেলা উৎসারিত হইয়াছে, এই খেলায় আমিও একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকণারূপে ক্ষুদ্র দেশ-কালের পরিধির মধ্যে ছিটকাইয়া পড়িয়াছি। আবার নাট্যলীলা শেষ করিয়া যাইবার বেলা মনে হইতেছে, যেন এক যুগকল্প শেষ হইয়া গিয়াছে এবং 'শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে' নটরাজ নিস্তব্ধ হইয়া আছেন। এই সৃষ্টির পশ্চাতে স্রষ্টা অসীম রহস্যে চিরমৌনী আছেন, কল্প-কল্প ধরিয়া একবার সৃষ্টি প্রসারিত করিতেছেন, আবার সংহরণ করিতেছেন, কিন্তু কেহই ইহার সংযোগ-বিয়োগের কর্তাকে জানিতে পারিতেছে না। এই ছোট কবিতাটির মধ্যে স্বল্পকথায় কবি দূরপ্রসারী কল্পনার চমৎকার রূপ দিয়াছেন।

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজীর খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা লয়ে
যুগযুগান্তরের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।
প্রস্থানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি
দীপশিখা ম্লান হয়ে এল,

ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ,
শ্লথ হয়ে এল ধীরে
সুখদুঃখ নাট্যসজ্জাগুলি।
দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী॥

১০ সংখ্যক কবিতায় কবি ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়া ভারতের অতীত ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অতীতে কত রাজা ভারতে রাজত্ব করিতে আসিয়াছে, আসিয়াছে পাঠান, আসিয়াছে মোগল, তারপর ইংরেজ আসিয়া তাহার শক্তির তীব্র আলোকে সকলের চোখ ধাঁধিয়া দিতেছে। কবি জানেন, পূর্বের বিজয়ী রাজা-বাদশাদের সাম্রাজ্যের মত তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্যও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, লোকের দৈনন্দিন জীবনে তাহাদের স্মৃতির অস্তিত্ব থাকিবে না। কালের নির্মম হাত হইতে কোন শক্তিমদমত্ত সাম্রাজ্যলোভীর নিস্তার নাই—এক যুগের বহুজনশোষিত ঐশ্বর্য পরবর্তী যুগে ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা সাধারণ লোক, যাহারা নগরে পল্লীতে, ঘাটে-মাঠে-বাটে কায়িকশ্রমে রত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে, খাদ্য-শস্য উৎপাদন করিতেছে তাহাদের ধারা সমান ভাবেই চলিতেছে। একদল আসিয়া অন্যদলের স্থান গ্রহণ করিতেছে। রাজা ও শাসকসম্প্রদায়ের রাজ্য, কীর্তি প্রভৃতি বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া যাইতেছে, কিন্তু কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি মেহনতি জনতার ধারা সমানভাবেই চলিতেছে এবং মানুষের সর্বকালের স্মৃতিতে তাহা অক্ষয় হইয়া আছে।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরুগুরু গর্জন গুন্‌গুন স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

শেষ-বিদায়ের কালে কবি এ জীবনের অজস্রদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছেন,—

এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীর্বাদ,
মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি সুধার আস্বাদ।
দুঃসহ দুঃখের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয়নি দুর্বল পরাভব।
মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হইনি বঞ্চিত,
তাঁদের অমৃত বাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।
জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞ মনে॥ (২৯নং)

গভীর শান্তি ও স্নিগ্ধতার মধ্যে কবি শেষ যাত্রা করিতে চাহিতেছেন,—

সময় যাবার
শান্ত হোক স্তব্ধ হোক, স্মরণসভার সমারোহে
না রচুক শোকের সম্মোহ।
বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে
ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক্‌ মৌন পল্লবসম্ভারে।
নামিয়া আসুক ধীরে রাত্রির নিঃশব্দ আশীর্বাদ
সপ্তর্ষির জ্যোতির প্রসাদ॥ (৩১নং)

আজ তাঁহার সত্য-স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হোক—চরম আত্মোপলব্ধি হোক ইহাই কবির প্রার্থনা,—

এ আমির আবরণ সহজে খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি' কুহেলিকা
সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত। (৩৩নং)

৪২

জন্মদিনে

(১ বৈশাখ, ১৩৪৮)

'জন্মদিনে'-এ কবি নিজের জন্মদিন উপলক্ষ করিয়া বিশ্বসৃষ্টির অনাদি, বহু-বিচিত্র ও অত্যাশ্চর্য ধারা, নিজের অন্তরতম রহস্য ও অপরিমেয়তা, এই পৃথিবীর সঞ্চয়ের মূল্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে নিজের কবি-কৃতির মূল্য সম্বন্ধেও দুই একটি কবিতা আছে। কয়েকটি কবিতায় বিগত বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় কবিমনের প্রতিক্রিয়া রূপলাভ করিয়াছে।

জন্মদিনের উৎসব এই মর্ত্যের জীবনকেই কেন্দ্র করিয়া সম্পন্ন হয়, কিন্তু এই জীবনের অন্তরতম সত্তা তো বহুদূরের পথিক। তাই কবি জন্মদিনে সেই দূরত্ব অনুভব করিতেছেন,—

আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে,
অলক্ষ্য পথের যাত্রী অজানা তাহার পরিণাম।
আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে। (১নং)

বিদায়ের শেষ মুহূর্তে জন্মদিনের অনুষ্ঠান তো জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের মুখোমুখি বসা। কবি বলিতেছেন, আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি যখন ঝরিয়া পড়ে, তখন

মাটি তাহাকে ঘৃণা করে না, তাহার মধ্যে মৃত্যুর বিকৃতি নাই, আছে কেবল একটা ম্লান অবশেষ। রূপ-রস-গন্ধে টলমল গোলাপের মতো তাঁহার জীবনও যখন ঝরিয়া পড়িবে, তখন যেন মৃত্যু তাহাকে ব্যঙ্গ না করে। জীবন ও মৃত্যুর সশ্রদ্ধ ও সুন্দর মিলন যেন হয়,—

জন্মদিন মৃত্যুদিন দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচল অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান। (২৬নং)

এটি একটি সার্থক ও রসোত্তীর্ণ কবিতা। ২৭নং কবিতায় সন্ধ্যা ও প্রভাতের উপমায় মৃত্যু ও নবজীবনের রহস্য চমৎকার ফুটিয়াছে।

নব জন্মদিন তারে বলি
আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে॥

এক অসীম প্রাণ-তরঙ্গিণী কবির জীবনকে জন্মদান করিয়াছিল; কবির জীবন তাহারই পালিত, তাই চিরদিন নদীর স্রোতেই তাঁহার চলমান বাসা—তিনি চিরপথিক,—

সে আমার রচেছিল-জন্মদিন,
চিরদিন তার স্রোতে
বাঁধন-বাহিরে মোর চলমান বাসা
ভেসে চলে তীর হতে তীরে।
আমি ব্রাত্য আমি পথচারী
অবারিত আতিথ্যের অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে মোর জন্মদিবসের ডালি॥ (২৮নং)

সৃষ্টির আদি হইতে কবি তাঁহার জীবনে বহু জন্মদিন প্রত্যক্ষ করিতেছেন, নিজেকে বিচিত্র রূপের সমাবেশে দেখিয়াছেন। অতলান্ত প্রাণসমুদ্রের 'তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে' যখন তাঁহার সৃষ্টি হইল, তাহার পর হইতে রঙ্গের যবনিকা দ্বারা প্রাণের রহস্য ঢাকাই রহিল, তাহা আর উদ্ঘাটিত হইল না।

চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম
এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন-আবরণ,
সম্পূর্ণ যে-আমি
রয়েছে গোপন অগোচরে।

নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব
চারিদিকে অব্যক্তর বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে॥ (৭নং)

৫নং কবিতায় কবি সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ক্রমাভিব্যক্তির ধারা ধরিয়া নিজের সত্তার ক্রমাভিব্যক্তি লক্ষ্য করিতেছেন। সৃষ্টির প্রথমে অগ্নিবন্যাধারা অসীম শূন্য প্লাবিত করিয়াছিল, তখন স্ফুলিঙ্গের মতো তিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করিয়াছিলেন। তারপর পৃথিবীতে জড়পিণ্ড হইয়া কল্প কল্প ছিলেন, তারপর বৃক্ষরূপে রূপান্তরিত হইলেন, তারপর পশুরূপে, শেষে 'মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে'. অবতরণ করিলেন। তারপর পৃথিবীর নূতন নূতন দ্বীপে নূতন নূতন ভাষাভাষী হইয়া শেষে বর্তমান জীবন গ্রহণ করিয়াছেন। আবার এখান হইতে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।

সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্ত্যনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ;
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশিবর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

১০নং কবিতায় কবি বলিতেছেন, তিনি যে আজীবন বাণীর সাধনা করিয়াছিলেন তাহা আজ বৃথা বোধ হইতেছে। তবুও তাঁহার বাক্যে ও ইঙ্গিতে অজানার পরিচয় ব্যাপ্ত ছিল।

সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে,
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম,
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

কিন্তু আজ তাহা নিরর্থক। তিনি এখন নাম-হারা পরিচয়-হারা দেশে যাত্রা করিতেছেন।

দিন শেষে কর্মশালা ভাষা রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।

পড়ে থাক পিছে
বহু আবর্জনা বহু মিছে।
বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে।

পুরাতন 'শ্লথবৃন্ত ফলের মতন' জীবন ছিন্ন হইয়া আসিতেছে, আজ তিনি তাঁহার অন্তরতম সত্তার দর্শনলাভাকাঙ্ক্ষী,—

প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি।

আর তাঁহার প্রণাম রহিল তাঁহাদের উদ্দেশে যাঁহারা জীবনের প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা,—

রেখে যাই আমার প্রণাম
তাদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো॥

১০নং কবিতায় কবি তাঁহার কাব্যের অপূর্ণতা স্বীকার করিতেছেন। মানুষের অন্তর-তলের যে 'দুর্গম' নিত্য-মানুষ, সে দেশকালের মধ্যে, উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্রের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সে সর্বত্রব্যাপী, সকল দেশের সকল মানুষের অন্তরতম সে, সেই মানুষের পরিচয় পাইতে হইলে সর্বসাধারণের অন্তরের পরিচয় লাভ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার জীবনযাত্রার বাধা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ দেয় নাই। তাঁতী, জেলে, চাষীর সঙ্গে তাঁহার জীবনের যোগ ছিল না, তাই তাঁহার কাব্যে সুরের অপূর্ণতা আসিয়াছে। তিনি এজন্য ভাবীকালের 'অখ্যাত জনের নির্বাক মনের' কবির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন,—

আমার কবিতা-জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,

সে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পা'র না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা এই সব কবিদের কাব্য সত্য অভিজ্ঞতার রূপায়ণ যেন হয়, কেবল ভঙ্গীসর্বস্ব তথাকথিত বাস্তববাদীদের কৃত্রিম সাহিত্য যেন না হয়,—

সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।

২১নং কবিতাটিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র আছে। শত শত গ্রাম-নগরের উপর দিয়া হত্যা, ধ্বংস, মৃত্যুর স্রোত বহিয়া যাইতেছে। শান্তিবাদী, আশাবাদী কবি মনে করেন,

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ-যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী-বেশে
চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

২২নং কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শোষকের পরিণামের চমৎকার চিত্র কবি আঁকিয়াছেন,—

মহা ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহে চর্মসার,
শোষণ করিছে দিন রাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত,

সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহাদায়।
এক পাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির,—
সমুচ্চ আকাশ হতে ধূলায় পড়িবে অঙ্গহীন
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীকৃত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তা'র বাঁধিবে কঙ্কালে॥

৪৩

শেষ লেখা

(ভাদ্র, ১৩৪৮)

ইহাই কবির শেষ রচনা। মৃত্যুর পর এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবি-পুত্র 'বিজ্ঞপ্তি'তে বলিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই। "শেষ লেখা"র অধিকাংশ কবিতা গত সাত-আট মাসের মধ্যে রচিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি তাঁহার স্বহস্তলিখিত, অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা সেগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে, তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন।

'সম্মুখে শান্তি-পারাবার' গানটি "ডাকঘর" নাটিকা অভিনয়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। গানটি পূজনীয় পিতৃদেবের দেহান্তের পর গীত হয় তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।.........

'ঐ মহামানব আসে' গানটি গত নববর্ষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে গীত হয়। এইটি তাঁহার রচিত শেষ সংগীত।

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে' কবিতাটি তিনি মুখে মুখে বলিয়াছিলেন এবং পরে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।"

'প্রান্তিক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে'-এর মধ্য দিয়া জীবন-মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে কবির যে অনুভূতির ধারা চলিয়া আসিয়াছে, 'শেষ লেখা'য় আসিয়া তাহা একটা চরম রূপ লাভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে এ সমস্ত গ্রন্থে কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত, নিরাভরণ, সরল, নিঃসংশয়দৃঢ়, শক্তিশালী রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে এই গ্রন্থে।

কাব্যরচনার দিকে কবির একেবারেই দৃষ্টি নাই, কেবল তাঁহার অনুভূতিগুলি ভাষায় রূপ দিয়াছেন। তাই এগুলি মন্ত্রের মতো হ্রস্ব, কঠিন ও তেজোগর্ভ। এই স্তরে রবীন্দ্রনাথ আর কবি নন, জীবনের সত্যদ্রষ্টা ঋষি।

দুঃসহ তেজে মৃত্যুকে পরাভূত করিয়া তাঁহার আত্ম-স্বরূপের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। পরম জ্ঞান আজ তাঁহার লাভ হইয়াছে, তাই তাঁহার এতদিনের কাব্যসাধনা একেবারেই অর্থহীন, আবর্জনার মতো পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে

বাগানের মূর্তি গাড়
একমনে
নির্জন প্রাঙ্গণে
পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি
অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে
নিরুৎসুক।
গর্বিত মূর্তির পদানত
মাথা ক'রে থাকে নিচু
কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু।
বহুগুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে
এককালে যাহা রূপ পেয়ে
কালে কালে অর্থহীনতায়
ক্রমশ মিলায়।
নিমন্ত্রণ ছিল কোথা শুধাইলে তারে
উত্তর কিছু না দিতে পারে,
কোন্ স্বপ্ন বাঁধিবারে
বহিয়া ধূলার ঋণ
দেখা দিল
মানবের দ্বারে।
বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্তপটে
বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি,

তোমার বাহন রূপে
ডেকেছিল
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি
আদিম আত্মীয় তব ধূলি,
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্-বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
এই ভালো,
বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পঙ্গু আবর্জনা
নিয়ত গঞ্জনা
কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে,
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে॥ (৯নং)

দারুণ দুঃখ-বেদনার মধ্যে দিয়া এই দিব্যজ্ঞান তাঁহার লাভ হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন মৃত্যু-বিভীষিকা ছায়াবাজির মতো অবাস্তব, ইহা অন্ধকারের পটভূমিকায় নিপুণ শিল্পরচনা। ইহার মধ্যে কোনো সত্যবস্তু নাই, কেবল শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শনমাত্র।

ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে॥ (১৪নং)

মৃত্যুর ছলনা ও মিথ্যা আশ্বাসের প্রতারণা যে বুঝিতে পারে, সেই 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' লাভ করে। কঠোর দুঃখর তপস্যা করিয়া তিনি আত্মস্বরূপ দেখিতে পারিয়াছেন,—

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ-জীবন
সত্যের দারুণ মূল্যে লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে॥ (১১নং)

মানবের সেই অন্তর্নিহিত স্বরূপ—তাহার সেই নিত্যসত্তা দুরবগাহ ও অনন্ত-রহস্যময়,—

প্রথম দিনের সূর্য,
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর॥

কী অপূর্ব অর্থগৌরব সমৃদ্ধ এই ক্ষুদ্র কবিতাটি!

আলোচিত কাব্যগ্রন্থসমূহের প্রথম প্রকাশ ও পরবর্তী সংস্করণগুলির সময়-তালিকা

সন্ধ্যাসংগীত

প্রথম প্রকাশ : ১২৮৸
১২৯৯
১৩১৮
ভাদ্র : ১৩৩৪

প্রভাতসংগীত

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র : ১২৯০
১২৯৯
১৩১৮
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৩২
অগ্রহায়ণ : ১৩৪৫

ছবি ও গান

প্রথম প্রকাশ : ১২৯০
আশ্বিন : ১৩৩৫

কড়ি ও কোমল

প্রথম প্রকাশ : ১২৯৩
১৩০১
মাঘ : ১৩৩৫
পৌষ : ১৩৫৫
আশ্বিন : ১৩৬৫
বৈশাখ : ১৩৬৯

মানসী

প্রথম প্রকাশ : পৌষ : ১২৯৭
১৩১৯
১৩২৮
আষাঢ় : ১৩৩৮
বৈশাখ : ১৩৪৮
শ্রাবণ : ১৩৫০
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৫১
পৌষ : ১৩৫৩
অগ্রহায়ণ : ১৩৫৯
আশ্বিন : ১৩৬১
আষাঢ় : ১৩৬৫
ভাদ্র : ১৩৬৭
ভাদ্র : ১৩৬৯
চৈত্র : ১৩৭০

সোনার তরী

প্রথম প্রকাশ : ১৩০০
১৩১৯
১৩২৯
১৩৩৪
বৈশাখ : ১৩৩৯
চৈত্র : ১৩৪১
১৩৪৮
কার্তিক : ১৩৫০
মাঘ : ১৩৫১
পৌষ : ১৩৫৩
মাঘ : ১৩৫৫
পৌষ : ১৩৫৭
পৌষ : ১৩৫৯
শ্রাবণ : ১৩৬২
ভাদ্র : ১৩৬৩
ভাদ্র : ১৩৬৪
পৌষ : ১৩৬৭
আশ্বিন : ১৩৭০
ফাল্গুন : ১৩৭১

চিত্রা

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন : ১৩০২
ফাল্গুন : ১৩১৯
ফাল্গুন : ১৩৩১
ফাল্গুন : ১৩৩৯
অগ্রহায়ণ : ১৩৪৯
ভাদ্র : ১৩৫০
পৌষ : ১৩৫১
পৌষ : ১৩৫৪
শ্রাবণ : ১৩৫৯
আশ্বিন : ১৩৬৩
আশ্বিন : ১৩৬৫

চিত্রা

মাঘ : ১৩৬৬
অগ্রহায়ণ : ১৩৬৮

চৈতালি

প্রথম প্রকাশ : কাব্যগ্রন্থাবলী
আশ্বিন : ১৩০৩
মাঘ : ১৩৫১
পৌষ : ১৩৫৩
ভাদ্র : ১৩৬৪
ভাদ্র : ১৩৬৭
ভাদ্র : ১৩৭১

কণিকা

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ : ১৩০৬
১৩১৯
১৩২৯
মাঘ : ১৩৩৪
ভাদ্র : ১৩৪১
১৩৫০
১৩৫১
১৩৫৫
১৩৫৬
১৩৫৮
শ্রাবণ : ১৩৬১
চৈত্র : ১৩৬৩
ফাল্গুন : ১৩৬৫
ভাদ্র : ১৩৬৮
বৈশাখ : ১৩৭০

কথা

প্রথম প্রকাশ : মাঘ : ১৩০৬
চৈত্র : ১৩৩৪
অগ্রহায়ণ : ১৩৪৫

কল্পনা

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ : ১৩০৭

কল্পনা

চৈত্র : ১৩৩৪
ভাদ্র : ১৩৫৫
শ্রাবণ : ১৩৫৬
শ্রাবণ : ১৩৫৯
মাঘ : ১৩৬৬
পৌষ : ১৩৬৮
শ্রাবণ : ১৩৭০
চৈত্র : ১৩৭১

ক্ষণিকা

প্রথম প্রকাশ : ১৩০৭
১৩১৫
ফাল্গুন : ১৩৩৪
মাঘ : ১৩৪৩
শ্রাবণ : ১৩৫২
পৌষ : ১৩৫৯
আশ্বিন : ১৩৬৫
চৈত্র : ১৩৬৭
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭২

নৈবেদ্য

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় : ১৩০৮
১৩১৬
১৩২০
১৩২৫
১৩২৮
১৩৩৫
১৩৩৯
১৩৪৩
শ্রাবণ : ১৩৪৮
আশ্বিন : ১৩৫০
শ্রাবণ : ১৩৫২
ভাদ্র : ১৩৫৫
বৈশাখ : ১৩৫৮
পৌষ : ১৩৬২

নৈবেদ্য

পৌষ ১৩৬৮
আষাঢ় ১৩৭২

স্মরণ

প্রথম প্রকাশ : ১৩২১
ফাল্গুন : ১৩৩৭
আষাঢ় : ১৩৪২
আষাঢ় : ১৩৬০
আষাঢ় : ১৩৬৫
আষাঢ় : ১৩৬৮
বৈশাখ : ১৩৭১

শিশু

প্রথম প্রকাশ : কাব্যগ্রন্থ
১৩২৬
১৩৩০
মাঘ : ১৩৩২
আশ্বিন : ১৩৩৮
ভাদ্র : ১৩৪০
পৌষ : ১৩৪২
পৌষ : ১৩৪৪
মাঘ : ১৩৪৫
মাঘ : ১৩৪৬
মাঘ : ১৩৪৮
অগ্রহায়ণ : ১৩৫০
: ১৩৫১
পৌষ : ১৩৫৪
মাঘ : ১৩৫৫
বৈশাখ : ১৩৫৮
মাঘ : ১৩৫৯
পৌষ : ১৩৬১
অগ্রহায়ণ : ১৩৬২
বৈশাখ : ১৩৬৩
ফাল্গুন : ১৩৬৪
বৈশাখ : ১৩৬৬

শিশু

মাঘ : ১৩৬৭
মাঘ : ১৩৬৮
মাঘ : ১৩৬৯
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭২

উৎসর্গ

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ : ১৩২১
অগ্রহায়ণ : ১৩৩৯
ফাল্গুন : ১৩৫১
আশ্বিন : ১৩৫৯
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৬
আষাঢ় : ১৩৬৯

খেয়া

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় : ১৩১৩
১৩২৮
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৩৫
১৩৪৮
আষাঢ় : ১৩৫৩
ভাদ্র : ১৩৫৮
মাঘ : ১৩৫৯
শ্রাবণ : ১৩৬১
শ্রাবণ : ১৩৬৩
আষাঢ় : ১৩৬৮
শ্রাবণ : ১৩৭০

গীতাঞ্জলি

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ : ১৩১৭
১৩২৯
মাঘ : ১৩৩০
মাঘ : ১৩৩৫
ফাল্গুন : ১৩৩৪
অগ্রহায়ণ : ১৩৩৭
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৪৩
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৪৯

গীতাঞ্জলি

বৈশাখ	১৩৪৮
	১৩৪৯
কার্তিক	১৩৫০
আশ্বিন	১৩৫১
আষাঢ়	১৩৫২
ফাল্গুন	১৩৫৫
জ্যৈষ্ঠ	১৩৫৮
বৈশাখ	১৩৬১
বৈশাখ	১৩৬৩
ফাল্গুন	১৩৬৫
বৈশাখ	১৩৬৮
বৈশাখ	১৩৬৯
শ্রাবণ	১৩৭১
গীতাঞ্জলি (পকেট সংস্করণ)	১৩৬৭
	১৩৬৮

গীতিমাল্য

প্রথম প্রকাশ	১৩২১
	১৩২৪
	১৩২৭
	১৩৩৩
	১৩৫৩
	১৩৬৯

গীতালি

প্রথম প্রকাশ	১৩২১
	১৩২৯
	১৩৩৩
শ্রাবণ	১৩৫৩
বৈশাখ	১৩৬৯

বলাকা

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ	১৩২৩
	১৩২৬
	১৩৩৩
বৈশাখ	১৩৩৯
মাঘ	১৩৪৫

বলাকা

ফাল্গুন	১৩৪৯
কার্তিক	১৩৫০
মাঘ	১৩৫১
মাঘ	১৩৫২
আশ্বিন	১৩৫৭
মাঘ	১৩৬০
শ্রাবণ	১৩৬৩
আষাঢ়	১৩৬৬
ফাল্গুন	১৩৬৭
ফাল্গুন	১৩৬৯
ভাদ্র	১৩৭১

পলাতকা

প্রথম প্রকাশ	১৩২৫
	১৩৩০
মাঘ	১৩৩৫
চৈত্র	১৩৪৮
শ্রাবণ	১৩৫২
শ্রাবণ	১৩৫৭
শ্রাবণ	১৩৬১
মাঘ	১৩৬৪
ফাল্গুন	১৩৬৭
শ্রাবণ	১৩৭০

শিশু ভোলানাথ

প্রথম প্রকাশ	১৩২৯
আষাঢ়	১৩৫০
পৌষ	১৩৫২
মাঘ	১৩৫৫
চৈত্র	১৩৫৬
পৌষ	১৩৫৮
মাঘ	১৩৬০
আশ্বিন	১৩৬২
শ্রাবণ	১৩৬৪
জ্যৈষ্ঠ	১৩৬৭
মাঘ	১৩৬৮

শিশু ভোলানাথ

অগ্রহায়ণ ১৩৭০
বৈশাখ ১৩৭২

পূরবী

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৩২
ভাদ্র ১৩৩৮
ফাল্গুন ১৩৪৯
আষাঢ় ১৩৫১
কার্তিক ১৩৫২
মাঘ ১৩৫৮
ভাদ্র ১৩৬৩
ভাদ্র ১৩৬৫
মাঘ ১৩৬৭

লেখন

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৩৪
আশ্বিন ১৩৬৮

স্ফুলিঙ্গ

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৫২
·বৈশাখ ১৩৫৬
চৈত্র ১৩৬৭

মহুয়া

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩৬
বৈশাখ ১৩৪১
ফাল্গুন ১৩৪৫
অগ্রহায়ণ ১৩৫০
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩
আশ্বিন ১৩৫৫
অগ্রহায়ণ ১৩৫৭
শ্রাবণ ১৩৬০
বৈশাখ ১৩৬৩
আশ্বিন ১৩৬৫
বৈশাখ ১৩৬৭
বৈশাখ ১৩৭০

বনবাণী

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন : ১৩৩৮
অগ্রহায়ণ : ১৩৫৩
শ্রাবণ : ১৩৬৪

পরিশেষ

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র : ১৩৩৯
বৈশাখ : ১৩৫০
আশ্বিন : ১৩৫৪
মাঘ : ১৩৬৫

পুনশ্চ

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩৯
ফাল্গুন ১৩৪০
কার্তিক ১৩৫১
বৈশাখ ১৩৫৪
ভাদ্র ১৩৬৩
পৌষ ১৩৬৬
চৈত্র ১৩৬৮
আশ্বিন ১৩৭১

বিচিত্রিতা

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ :

শেষ সপ্তক

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ : ১৩৪২
আষাঢ় : ১৩৫৩
ভাদ্র : ১৩৫৫
শ্রাবণ : ১৩৬৭

বীথিকা

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র : ১৩৪২
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৫১
ভাদ্র : ১৩৫২
মাঘ : ১৩৬৯
১৩৬৮

পত্রপুট

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ : ১৩৪৩
কার্তিক : ১৩৫৫

পত্রপুট

ফাল্গুন : ১৩৫০
বৈশাখ : ১৩৫৩

শ্যামলী

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র : ১৩৪৩
শ্রাবণ : ১৩৪৫
ফাল্গুন : ১৩৪৮
চৈত্র : ১৩৫০
অগ্রহায়ণ : ১৩৫৪
বৈশাখ : ১৩৫৯
শ্রাবণ : ১৩৬৬
শ্রাবণ : ১৩৬৮
ভাদ্র : ১৩৭০

খাপছাড়া

প্রথম প্রকাশ : মাঘ : ১৩৪৩
বৈশাখ : ১৩৭২

ছড়ার ছবি

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন : ১৩৪৪
ফাল্গুন : ১৩৫২
চৈত্র : ১৩৬৭
শ্রাবণ : ১৩৭২

প্রহাসিনী

প্রথম প্রকাশ : পৌষ : ১৩৪৫
পৌষ : ১৩৫২

ছড়া

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র : ১৩৪৮
অগ্রহায়ণ : ১৩৫০
মাঘ : ১৩৫১
আষাঢ় : ১৩৫৭
বৈশাখ : ১৩৬২
পৌষ : ১৩৬৪
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৭
পৌষ : ১৩৬৯

প্রান্তিক

প্রথম প্রকাশ : পৌষ : ১৩৪৪
কার্তিক : ১৩৪৬
ফাল্গুন : ১৩৫৩
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৭

সেঁজুতি

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র : ১৩৪৫
আশ্বিন : ১৩৪৮
শ্রাবণ : ১৩৫২
ভাদ্র : ১৩৬৩
ভাদ্র : ১৩৬৫
মাঘ : ১৩৬৭
শ্রাবণ : ১৩৭০

আকাশ প্রদীপ

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ : ১৩৪৬
চৈত্র : ১৩৫০
ভাদ্র : ১৩৫৩
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭০

নবজাতক

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ : ১৩৪৭
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৫০
শ্রাবণ : ১৩৫২
আশ্বিন : ১৩৬১
আশ্বিন : ১৩৬২
ভাদ্র : ১৩৬৫
ফাল্গুন : ১৩৬৮

সানাই

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় : ১৩৪৭
পৌষ : ১৩৫০
শ্রাবণ : ১৩৫১
মাঘ : ১৩৫৩
বৈশাখ : ১৩৬৪
ভাদ্র : ১৩৬৬
অগ্রহায়ণ : ১৩৬৮
আশ্বিন : ১৩৭০

রোগশয্যায়

প্রথম প্রকাশ : পৌষ	:	১৩৪৭
শ্রাবণ	:	১৩৪৯
আষাঢ়	:	১৩৫১
পৌষ	:	১৩৫৫
আষাঢ়	:	১৩৬৮

আরোগ্য

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন	:	১৩৪৭
আশ্বিন	:	১৩৫০
ফাল্গুন	:	১৩৫১
আশ্বিন	:	১৩৫৯
বৈশাখ	:	১৩৬৭
পৌষ	:	১৩৬৯

জন্মদিনে

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ	:	১৩৪৮
মাঘ	:	১৩৪৯
আষাঢ়	:	১৩৫১
শ্রাবণ	:	১৩৫৩
বৈশাখ	:	১৩৫৯
বৈশাখ	:	১৩৬২
ভাদ্র	:	১৩৬৪
বৈশাখ	:	১৩৬৭
অগ্রহায়ণ	:	১৩৬৯

শেষ লেখা

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র	:	১৩৪৮
বৈশাখ	:	১৩৪৯
কার্তিক	:	১৩৫০
ফাল্গুন	:	১৩৫১
ভাদ্র	:	১৩৫৫
বৈশাখ	:	১৩৬৩
ফাল্গুন	:	১৩৬৭

শব্দসূচী

শব্দসূচী

॥ রবীন্দ্র-সমালোচনা-সাহিত্য ॥

THE POET OF HINDUSTAN 5·00

Anthony Elenjimittam D. D.
forwored by Sarvepalli Radhakrishnan

বাংলা কবিতার নবজন্ম ১৫·০০

ডক্টর স্থরেশচন্দ্র মৈত্র

রবীন্দ্র-হৃদয় ৫·০০

রেণু মিত্র
ভূমিকা: ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা ১০·০০

জনগণের রবীন্দ্রনাথ ১০·০০

শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ ১৫·০০

কবি-কথা ৬·৫০

সুধীরচন্দ্র কর

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৬·০০

প্রতিভা গুপ্ত

শারদোৎসব দর্শন ২·৫০

গুরু-দর্শন ২·০০

পুনশ্চের কবি রবীন্দ্রনাথ ৬·০০

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৫·০০

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ
ভূমিকা: ডক্টর সুকুমার সেন

॥ রবীন্দ্র-সমালোচনা-সাহিত্য ॥

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ [পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ]	১৫·০০
রবীন্দ্র-বিচিত্রা	৫·৫০
নানা-রকম	৬·০
প্রমথনাথ বিশী	
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা	১২·০০
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা	২৫·০০
ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	
রবীন্দ্র গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য	১২·৫০
ডক্টর প্রণয়কুমার কুণ্ডু	
ভূমিকা: ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়	
আটপৌরে রবীন্দ্রনাথ	৫·০০
গৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়	
রবীন্দ্র চিত্রকলা	১২·০০
মনোরঞ্জন গুপ্ত	
মানসী-মঞ্জুষা	৩·০০
রাজা ও রানী পরিক্রমা	২·৫০
অধ্যাপক ভট্টাচার্য ও বসু	
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ	৫·০০
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	
শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ	৮·০০
প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	